প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের
বাছাই গল্প

সম্পাদনা

প্রফুল্ল কুমার পাত্র

পাত্র'জ পাবলিকেশন

২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ
এপ্রিল ১৯৬০

প্রকাশক
মানস কুমার পাত্র
পাত্র'জ পাবলিকেশন
২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

প্রচ্ছদ
প্রদোষকান্তি বর্ম'ণ

মূল্য ঃ পঁচিশ টাকা

মুদ্রক
ডি. পি. গাঙ্গুলী
আশুতোষ লিথোগ্রাফি কোঃ
১৩/১, ছিদাম মুদী লেন
কলিকাতা-৬

সূচীপত্র

একটি রৌপ্যমুদ্রার জীবন-চরিত	...	১
শ্রীবিলাসের দুর্ব্বুদ্ধি	...	৯
বেনামী চিঠি	...	১৫
অঙ্গহানী	...	২৩
হিমানী	...	৩৫
ভুলভাঙ্গা	...	৫৪
কুড়ানো মেয়ে	...	৫৭
পত্নীহারা	...	৬৮
দেবী	...	৭৭
ভিখারী সাহেব	...	৮৬
বিষয়বৃক্ষের ফল	...	৯৫
প্রিয়তম	...	১০৩
সারদার কীর্ত্তি	...	১১১
বউ-চুরি	...	১১৯
বন্য শিশু	...	১৩২
কাশীবাসিনী	...	১৩৮
ধর্ম্মের কল	...	১৪৮
প্রণয় পরিণাম	...	১৫৫
কলির মেয়ে	...	১৬৫
একদাগ ঔষধ	...	১৭২
ছদ্মনাম	...	১৭৪
সচ্চরিত্র	...	১৮২
বাস্তুসাপ	...	১৯০
ভুলশিক্ষার বিপদ	...	১৯৩
অযোধ্যার উপহার	...	২০০
প্রতিজ্ঞা-পূরণ	...	২০[illegible]
খুড় মহাশয়	...	২১১
আধুনিক সন্ন্যাসী	...	২১৮
গুরুজনের কথা	...	২২২
বিবাহের বিজ্ঞাপন	...	২২৮

স্বর্ণ-সিংহ	…	২৩৫
মুক্তি	…	২৪২
ফুলের মূল্য	…	২৫৮
পুনর্মূষিক	…	২৭০
বলবান জামাতা	…	২৮১
আমার উপন্যাস	…	২৮৯
খালাস	…	৩০২
মাতঙ্গিনীর কাহিনী	…	৩১৭
পরের চিঠি	…	৩২০
বাপকী বেটী	…	৩২৫
দিব্যদৃষ্টি	…	৩৩৫
সুশোভনা	…	৩৪৩

একটি রৌপ্যমুদ্রার জীবন-চরিত

আমি একদিন রাত্রে আহারের পর রাস্তার ধারে বারান্দায় ঈজিচেয়ারে অর্দ্ধশয়না-বস্থায় আলবোলার নলটি মুখে দিয়া ঢুলিতেছিলাম। দারুণ গ্রীষ্মকাল, কিন্তু সে দিন সন্ধ্যা হইতে ঘণ্টা দুই বেশ এক পশলা বৃষ্টি হইয়া যাওয়াতে কিছু ঠাণ্ডা ছিল। পল্লীগ্রাম,—অধিক রাত্রি হইবার বহুপূর্ব্বেই পথে লোক-চলাচল বন্ধ হইয়াছে। হালদার-দের বাগানের ভিতর একটা নারিকেল গাছে দুইটা পেচক বাস করিত, তাহারাই মধ্যে মধ্যে ঝঙ্কার দিতেছিল, আর সব নিস্তব্ধ। ঢুলিতে ঢুলিতে হঠাৎ যেন মনে হইল, আমার মুখনলটা আস্তে আস্তে বলিতেছে "বলি শুনিতেছ? এত ত লেখ, আমার জীবনের ইতিহাসটা লিখিয়া ছাপাইয়া দাও না; বেশ একটা গল্প হইবে।" আমি ঘুমের ঘোরে বলিলাম—"তুমি অচেতন পদার্থ, একস্থান হইতে অন্য স্থানে যাতায়াত করিতে পার না—তোমার আবার ইতিহাস কি?" সে বলিল—"আমি এখনই অচল হইয়াছি, চিরদিনই কি এমন ছিলাম? যখন জীবিত ছিলাম, তখন আমি যেমন দ্রুত ও নিয়ত একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাতায়াত করিতাম তেমন তোমার জীবজগতের কেহ পারে না কি!" আমি বলিলাম—"ভাল, তুমি না হয় সচলই ছিলে, তা বলিয়া তোমার ইতিহাস আবার কি?" মুখনল একমুখ হাসিয়া উত্তর করিল—"বৃথা এতকাল তোমায় ধূমপান করাইয়াছি! মানুষেরই বুঝি সুখ-দুঃখ, বিপদ-সম্পদ, সোণারূপার বুঝি সে সবকিছুই নাই? তবে আমার জীবনের কাহিনী শ্রবণ কর, তাহার পর বিচার করিও।" বলিয়া আরম্ভ করিল ঃ—

আমার জন্মদিনটা ঠিক মনে নাই, বৎসরটা গায়ে লেখা ছিল, দেখিয়াছিলে কি? তখন মাস—শীঘ্র পূজার বন্ধ হইবে বলিয়া টাঁকশালে কাযের ভারি ধূম পড়িয়া গিছল। দিবারাত্রি যন্ত্রের ঘটঘট শব্দে মনে হইত, যদি চিরবধির হইয়া জন্মিতাম তবে ভাল ছিল। আমার জন্মের তিন চারি দিন পরেই বড়বাজারের এক মাড়োয়ারি মহাজন বড় বড় থলি করিয়া দশ হাজার টাকার নোট ভাঙ্গাইয়া লইয়া গেল—আমাকেও তার সঙ্গে যাইতে হইল। আমি তখন সংসারের ব্যাপার কিছুই জানি না; মনে করিলাম, ভারি মহাজনের দোকানে যাইতেছি, দোকানে বসিয়া কত কি দেখিতে পাইব, শুনিতে পাইব, কত আমোদ হইবে। ও মহাশয়, গাড়ী হইতে নামিয়া দুষ্ট মহাজন দুইজন ভৃত্যের সাহায্যে থলিগুলা একটা অন্ধকূপের মত ঘরে লইয়া গিয়া মেঝেতে দমদম্ করিয়া ফেলিল, তাহার পর ক্যাঁচকড়াং করিয়া একটা শব্দ হইল, তাহার পর ঘড়ঘড় করিয়া আর একটা শব্দ হইল, তাহার পর বলিল, "লে আও।" তাহার পর এক একে করিয়া থলিগুলার নিম্নকর্ণ দুইটা ধরিয়া লোহার সিন্দুকে হুড়হুড় করিয়া ঢালিতে লাগিল। আমাদের শরীরটা শৈশব হইতেই কিছু কঠিন, নচেৎ সেই পতনেই, বিয়োগান্ত নাটকের পঞ্চমাঙ্কে রাজা বা রাণীর ন্যায়, মৃত্যু অনিবার্য্য হইত।

মহাজন যখন সিন্দুক বন্ধ করিয়া চাবি দিয়া চলিয়া গেল, তখন আমরা সকলে চিন্তিত ভীত হইয়া পড়িলাম। সকলেই ছেলেমানুষ, সংসারের কিছুই জানি না। কাঙ্গালীর ঘরের কচিমেয়ে শ্বশুরবাড়ী আসিলে তাহার যে কি মনে হয়, তাহা অন্তরে অন্তরে বেশ অনুভব করিতে পারিলাম। যাহা হউক, সকলে মিলিয়া নীরবে আপন আপন অদৃষ্টের নিন্দা করিতেছি, এমন সময় মহাজন আসিয়া সিন্দুক খুলিল। একমুঠা টাকা বাহির করিয়া গণিয়া দেখিল আরও দুই তিনটা লইল, লইয়া, সিন্দুক বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল। তখন পূজার বাজার, প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি দশটা বারোটা অবধি দোকানে ক্রেতাগণের অবিশ্রাম কোলাহল শুনিতে পাইতাম। অধিকাংশ লোকই নোট লইয়া

আসিত, তাহাদের বাকী টাকা ফিরাইয়া দিবার সময় সিন্দুক খোলা হইতে লাগিল, এবং মুঠা মুঠা টাকা বাহির হইয়া যাইতে লাগিল। দেখিয়া শুনিয়া আমাদের আশা হইল, এ অন্ধ-কারাগার হইতে মুক্তিলাভ হইবে,—শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক। দুই দিন পরেই আমি বাহির হইলাম। পল্লীবাসী এক বৃদ্ধ তাঁহার পুত্রবধূর জন্য একখানি বোম্বাই শাড়ী ও অন্যান্য বস্ত্রাদি ক্রয় করিলেন, পঞ্চাশ টাকার একখানি নোট ছিল, ফেরৎ টাকার সঙ্গে আমি তাঁহার হাতে গিয়া পড়িলাম।

কিন্তু বৃদ্ধের নিকট আমাকে বহুক্ষণ থাকিতে হইল না। বড়বাজার ছাড়াইবার পূর্ব্বেই এক ব্যক্তি কাঁচি দিয়া তাঁহার পিরাণের পকেট ছিন্ন করিল এবং সেই বৃদ্ধ আমাদের লইয়া সরিয়া পড়িল। বোধ করি বাসায় ফিরিয়া তিনি আমাদের বিরহে অনেক অশ্রুপাত হা হুতাশ করিয়াছিলেন; আমরা তাহার কোনও সংবাদ পাই নাই। আমরা দুর্গন্ধময় গলির ভিতর দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া একটি খোলার চালের ঘরে নীত হইলাম এবং সেখানে কিছুদিন রহিলাম। সমস্ত দিন ঘরে কেহ থাকিত না; সন্ধ্যা ৮টার পরে সহসা বহুলোকের সমাগম হইত, বোতল বোতল মদ আসিত, গান বাজনা হইত, অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প চলিত;—তাহারা সমস্ত দিন কেমন করিয়া কৌশলে লোককে ঠকাইয়া অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছে, তাহারই কাহিনী তাহারা এক ভাগ সত্যের সহিত তিনভাগ মিথ্যা মিলাইয়া বলিত, শুনিয়া বিস্ময়ে আমরা স্তম্ভিত হইয়া থাকিতাম। একদিন টাকা ভাগ হইল, আমি যাহার ভাগে পড়িলাম সে আমাকে লইয়া যাইতে যাইতে পথে এক দোকানে আমাকে দিয়া এক যোড়া জুতা কিনিয়া লইয়া গেল। পরদিন প্রভাতে ভাড়ার টাকার মধ্যে আমি জুতাবিক্রেতার বাড়ীওয়ালার হাতে গিয়া পড়িলাম।

যাঁহার বাড়ী, তিনি মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, নিজে চাকরি করেন, দুইটি পুত্র চাকরি করে, আর দুইটি বিবাহিতা কন্যা, তাহার মধ্যে ছোটটি পিত্রালয়ে ছিল, সেই আমাকে আশ্রয় করিল, বাড়ীভাড়া আদায় করিয়া আসিয়া বাবুটি টাকাগুলি বাক্সে রাখিবার সময় দেখিলেন, আমিই সর্ব্বাপেক্ষা নূতন ও উজ্জ্বল। মেয়েকে ডাকিয়া বলিলেন,—"চারু, এ জিনিস নিবি ?"

"কি বাবা ?"

"এই দেখ্"—বলিয়া তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জ্জনীর মধ্যে আমাকে ধরিয়া হাসি হাসিতে ঘুরাইতে লাগিলেন।

মেয়ে বলিল—"দাও বাবা, দাও বাবা, দাও।"

"রোজ কিন্তু আমার পাকা চুল তুলে দিতে হবে।"

"তা দোব।"

"তবে এই নে।"

মেয়েটি আমাকে পাইয়া ভারি খুসী—বারম্বার উল্টিয়া পাল্টিয়া দেখিতে লাগিল, দেখা শেষ হইলে সিন্দুরের কৌটার ভিতর আমাকে রাখিয়া দিল।

তাহার সিন্দুরের কৌটার ভিতর আমাকে অনেক মাস থাকিতে হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে সেই নোলকপরা ছোট মেয়েটি আমাকে বাহির করিয়া দেখিত, আছি কি নাই। আমি কি পালাই ? পা ত নাই সুতরাং এ কথা বলা আমার সাজে না; কিন্তু যদি থাকিত তবে শপথ করিয়া বলিতে পারি, আমি পলাইতাম না। তত সুখ, তত যত্ন আর কোথা পাইতাম ? আমি তখন দেখিতে কি সুন্দরই হইয়াছিলাম! যন্ত্র হইতে সদ্য বাহির হইয়াছি; ঝক্‌মক্ করিতেছি; দেহে স্থানে স্থানে সিন্দুর মাখা, এমন রূপ অল্প টাকারই ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে।

একদিন বাড়ীতে "জামাই এসেছে, জামাই এসেছে" এই কোলাহল শুনিতে পাইলাম। দুইদিন খুব লোকজন, হাস্যপরিহাসে বাড়ী গুলজার রহিল; তাহার পরদিন ক্রন্দন— মেয়েটি ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতে লাগিল। জামাইটার উপর ভারী রাগ হইল; মনে

হইতে লাগিল, যদি আমি উহার হইতাম, তবে এই দণ্ডেই হারাইয়া যাইতাম। যেন হারাইয়া যাওয়াটা আমার সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন! তোমার পাঠকেরা বোধ হয় এ কথায় কেহ আপত্তি করিবেন না; তাঁহারা কি শত সহস্রবার এমন ইচ্ছা করেন নাই যাহা তাঁহাদের পক্ষে এমনই অসম্ভব? সে কথা যাক্। ঘোড়ার গাড়ী, তাহার পর রেলের গাড়ী, তাহার পর ষ্টীমারে চড়িয়া আমি অনেক দূর গেলাম; ক্রমে মেয়েটির শ্বশুরবাড়ী পৌঁছিলাম। বিবাহের পর বধূ এই প্রথম "ঘরবসত" করিতে আসিল। দেখিলাম, তাহার শ্বশুর শাশুড়ী দরিদ্র; ছেলেটি গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা করে, গুটিকত টাকা বেতন পায় তাহাতেই কষ্টে-সৃষ্টে সংসারটি চলিয়া যায়। ছেলের মা-টি রুগ্না, মাসের মধ্যে পনেরো দিন তাঁহাকে শয্যাশায়ী থাকিতে হয়। চারু আসিয়া রন্ধনশালায় তাঁহার "প্রবেশ নিষেধ" করিল। যে চারু কলিকাতার অট্টালিকায় বাস করিত, মায়ের কোলের মেয়েটি, কত আদরের, তিনি কখনও তাহাকে একটি কায করিতে দেন নাই, সেই চারু সকালে উঠিয়াই চৌকাঠে জল দিতে লাগিল, ঘর বারান্দা অঙ্গন পরিষ্কার করিতে লাগিল, দেখিয়া আমার যেমন দুঃখ হইত, তেমনই আহ্লাদও হইত। একটি ঠিকা ঝি ছিল, সে-ই বাসন মাজিয়া কাপড় কাচিয়া দিয়া যাইত; চারু ধুচুনি করিয়া পুকুরের ঘাট হইতে চাউল ধুইয়া আনিয়া তরকারি কুটিয়া, মসলা বাটিয়া দশটার সময় স্বামীর "স্কুলের ভাত" প্রস্তুত করিয়া দিত। চারু তাহাদের পরিবারে আসিয়া যত শোভা করিল, তত কাজ করিল, তত সহাও করিল। তাহার স্বামীটিও দেখিলাম বেশ মানুষ, অর্দ্ধরাত্রি অবধি তাহাদের কত গল্প হইত, কত হাসিখুসি হইত, কোন কোনও দিন প্রদীপ লইয়া দুইজনে তাস খেলিতে বসিত। কিন্তু তাহাদের এ সুখ অধিক দিন রহিল না। তাহার স্বামী জ্বরে পড়িল, তিন মাস মাহিনা পাইল না; সংসারে দৈন্যদশা ঘিরিয়া আসিল। পিতার নিকট চারু সাহায্য প্রার্থনা করে নাই—নিজের যতগুলি টাকা ছিল, সব খরচ করিয়া ফেলিয়াছে; শেষে একদিন বাক্স খুলিয়া আমার থাকিবার কৌটাটি বাহির করিয়া আমাকে লইয়া আমার গায়ের সিন্দুর বস্ত্রে ঘষিয়া ঘষিয়া মুছিয়া ফেলিল, তাহার পর জলে ধুইয়া ফেলিল, যখন দেখিল কোথাও সিন্দুরের আর চিহ্নমাত্রও নাই, তখন দাসী-হস্তে দিয়া চাউল কিনিতে পাঠাইল। একটুও দুঃখ করিল না, একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল না, অকাতরচিত্তে আমাকে বিদায় দিল। তাহা দেখিয়া প্রথমটা আমি অত্যন্ত মনঃকষ্ট পাইয়াছিলাম। পরে ভাবিয়া দেখিলাম, আমাদের জাতিটাই বড় খারাপ; আমাদের যে অধিক ভালবাসে, সেই নিন্দার পাত্র হয়। চারু যদি আমায় বিদায় দিবার সময় অশ্রুপাত করিত, তবে সে কায়টা নিতান্ত অচারু হইত সন্দেহ নাই। যাহা হউক, আমি সে রাত্রি মুদির তহবিল বাক্সে যাপন করিলাম।

পরদিন প্রভাতে বাক্সে বসিয়া বেচাকেনা, দরদস্তুর, তাগাদা স্তোকবাক্যের বিচিত্র কোলাহল শুনিতে লাগিলাম। যত বেলা হইতে লাগিল, ততই খরিদ্দার বাড়িতে লাগিল। বেলা নয়টার পর ক্রমে কমিয়া আসিল, ঘণ্টা দুই পরে দোকান একেবারে নিস্তব্ধ। কেবল মধ্যে মধ্যে পথে দুই এক খানা গোরুর গাড়ীর চাকার ক্যাঁচকোঁচ এবং চালকের জিহ্বা ও তালুর সাহায্যে উচ্চারিত অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দ কর্ণগোচর হইতে লাগিল। বেলা যখন দ্বিপ্রহর, তখন মাথায় গামছা বাঁধিয়া পাণ চিবাইতে চিবাইতে মুদির ছেলে আসিয়া বলিল, "বাবা খেয়ে আসগে আমি আগলুই।" মুদি তহবিল বাক্সে চাবি বন্ধ করিয়া চাবির গোছা ঘুনসিতে বাঁধিয়া লইল; ছেলেকে বলিল, "দেখিস্ যেন খদ্দের ঠকিয়ে না যায়—আর বেশী টাকার জিনিস চায় ত বলিস্, বসো তামুক খাও, বাবা এল বলে।" মুদি চলিয়া গেল; অল্পক্ষণ পরে গুন্ গুন্ করিয়া মুদিপুত্র গান ধরিল,—

প্রাণপতি করি এই মিনতি
আমার জীবন রামকে বনে দি-ই-ওনা।

একবার পথে নামিয়া দেখিয়া আসিল, বাবা অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে। তখন সে আপনার ঘুনসি হইতে একটি চাবি বাহির করিয়া তহবিল বাক্সটি খুলিয়া ফেলিল। তৈলোজ্জ্বল কৃষ্ণমুখমণ্ডলে শুভ্রদন্তপংক্তির শোভা বিস্তার করিয়া বলিল,—"এঃ, আজ আর মেলা নেই; বেশী নিলে বাবা শালা টপ্ করে ধরে ফেলবে"—বলিয়া আমাকে তুলিয়া লইল আর একটা আধুলি লইল, লইয়া কোঁচার খুঁটে বাঁধিল, বাঁধিয়া সমস্তটা পেট-কাপড়ে গুঁজিয়া রাখিল। বাক্স বন্ধ করিয়া তখন আবার পূর্ব্বমত ঘাড় কাঁপাইয়া তাহার সংগীতচর্চ্চা চলিতে লাগিল,—

জীবন রামকে সঙ্গে করে, না হয় খাব ভিক্ষা করে,
অযোধ্যা পুরে।
জীবন রামকে বনে দিল
জীবনে জীবন রবে না—আ-আ-আ। ইত্যাদি

তাহার আচরণ দেখিয়া আমি মনে মনে হাসিতে লাগিলাম: ভাবিলাম, দেখ একবার, কলিকালে বাপ-বেটায় বিশ্বাস নাই, অন্য লোকের মধ্যে থাকিবে কি করিয়া? সেই দিন বৈকালে তাহার পেটকাপড় হইতে একটি ময়লা ছিটের থলির মধ্যে আশ্রয়প্রাপ্ত হইয়া একটি ভাঙ্গা টিনের পেটারায় বন্ধ হইলাম। এ অবস্থায় আমায় মাস দুই থাকিতে হইয়াছিল।

একদিন শুনিলাম, মুদিপুত্র মামার বাড়ী যাইতেছে। যাহা আশা করিয়াছিলাম, তাহাই ঘটিল; যাত্রা করিবার সময় আমার থলিটি চুপে চুপে বাহির করিয়া লইয়া গেল। পথে যাইতে যাইতে পিতৃদত্ত সদুপায়ে অর্জ্জিত আরও কয়েকটি টাকা থলির ভিতর রাখিয়া দিল। গোরুর গাড়ীর গাড়োয়ান, কৃষাণ, রাস্তামেরামতকারী কন্ট্রাক্টর-মিস্ত্রী প্রভৃতি বহুলোকের নিকট হইতে কলিকা লইয়া তামাক খাইতে খাইতে, কখনও উচ্চৈঃস্বরে কখনও গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতে গাহিতে, সহচারী লোকদিগের নাম, ধাম, গন্তব্যস্থান, পিতৃপুরুষের পরিচয় সম্বন্ধে সহস্র অনর্থক প্রশ্ন করিতে করিতে, বগলে ছাতা, বামহস্তে জুতা ও দক্ষিণে পুঁটুলী লইয়া অবশেষে ষ্টেশনে উত্তীর্ণ হইল। টিকিট কিনিবার সময় আমাকে ছাড়িয়া দিল, আমি সেই দুর্গন্ধময় বস্ত্রকারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বাঁচিলাম।

টিকিটবাবু আমাকে পাইবামাত্র একবার ঠং করিয়া টেবিলে আছাড় দিলেন,—আমি ভাবিলাম, "বাবা, বহুদিন হইল মন্দ নয়, এইরূপ বারকতক হইলেই ত গিয়াছি!" যতক্ষণ টিকিট বিক্রয় চলিতে লাগিল, ততক্ষণ আমি চিৎ হইয়া টেবিলের উপরই পড়িয়া রহিলাম। আমার উপরে, পার্শ্বে, ঝন্ঝন্ করিয়া আরও টাকা, আধুলি, সিকি, দুয়ানি, পয়সা আসিয়া পড়িতে লাগিল। বিক্রয় শেষ হইলে, বাবু ভিন্ন ভিন্ন মূল্যের মুদ্রা পৃথক্ করিয়া গণিয়া সাজাইয়া ক্যাশ মিলাইতে লাগিলেন। শেষে আলমারি বন্ধ করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। অনেকক্ষণ পরে পুনরায় টিকিটের ঘণ্টা বাজিল। আবার আলমারি খুলিল। কিয়ৎক্ষণ পরে টিকিটবাবুর একটি কার্য্য দেখিয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। আলমারির একটি কোণে একটি টাকা একাকী পড়িয়া ছিল; বেশ করিয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখিলাম সেটি অভিজাতবংশীয় নহে,—অর্থাৎ তোমরা যাহাকে বল মেকি টাকা। টিকিটবাবু এক ব্যক্তির নিকট টাকা লইয়া, সাঁ করিয়া সেই টাকা বাহির করিয়া তাহাকে ফিরিয়া দিলেন, বলিলেন,—"বদলাইয়া দাও, এটা চলিবে না।" সে বেচারী তাঁহার জুয়াচুরী ধরিতে পারিল না; বলিল, "দোহাই হুজুর, আর আমার একটিও টাকা নেই, এই দ্যাখেন আমার কাপড়-চোপড়; যেমন করে হোক্, দ্যান আমার নিব্বাহ করে কত্তা।" বাবু রূঢ়স্বরে বলিলেন—"একি কত্তার বাবার ঘরের কথা? কি করে তোমায় নিব্বাহ করে দেব? যখন আমার মাইনে থেকে কেটে নেবে তখন কোন বেটাকে ধরবো?" লোকটা যত কাকুতি মিনতি করিতে লাগিল, বাবু মহাশয় ততই সপ্তমে চড়িতে লাগিলেন। তিনি অনায়াসেই সেই টাকা পরে অন্য কাহারও স্কন্ধে চাপাইতে পারিতেন,

কিন্তু কি জানি কেন তিনি রণে ভঙ্গ দিতে চাহিলেন না। বাবু অবশেষে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া তাহার বাকী টাকা পয়সাগুলি মুঠা করিয়া হুহুঙ্কারের সহিত সেই গরীবের গায়ে ছড়াইয়া ফেলিয়া দিলেন; সে ব্যক্তির আর যাওয়া হইল না। আহা, আবার বোধ হয় তাহাকে পাঁচ সাত ক্রোশ হাঁটিয়া বাড়ী ফিরিয়া একটি ভাল টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিতে হইয়াছিল।

সেই দিন রাত্রে ডাকগাড়ীর পূর্বে এক সাহেব আসিয়া বোম্বাইয়ের টিকিট চাহিলেন। নোট দিয়া তাঁহার যে টাকা ফিরিল, তাহার সহিত আমাকেও যাইতে হইল। আমি সুকোমল চর্ম্মপেটিকায় বদ্ধ হইয়া সাহেবের পকেটে বাসা করিলাম। পথে যাইতে যাইতে কথায় বার্ত্তায় জানিতে পারিলাম, তিনি নূতন ম্যাজিস্ট্রেট্ হইয়া ইংলণ্ড হইতে আসিয়াছিলেন, সম্প্রতি ছুটি লইয়া বিবাহ করিতে যাইতেছেন। আমি মনে করিলাম, এই সুযোগে একবার বিলাতটা বেড়াইয়া আসা হইবে; আশায় উৎফুল্ল হইয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলাম। কিন্তু আমার মনোরথ পূর্ণ হইল না; সাহেব জাহাজে আরোহণ করিবার পূর্বে যে হোটেলে পানাহার করিলেন, তথায় আমায় পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। আমি হোটেলের ক্যাশবাক্সে এবং ক্যাশবাক্স হইতে আয়রণচেষ্টে স্থান প্রাপ্ত হইলাম।

আমি এই সময় তাহাকে বাধা দিয়া বলিলাম,—"ওহে তোমার গল্প যে ক্রমশঃ 'ডল্' হইয়া পড়িতেছে; আমার পাঠকেরা যে বিরক্ত হইয়া উঠিবেন; তাহা ছাড়া তোমার জীবনের প্রতি ঘটনা এরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিখিতে গেলে প্রবন্ধের কলেবর যে নিতান্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িবে। তুমি বরং তোমার জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি সংক্ষেপে বলিয়া যাও।" মুখনল বলিল,— বটে? আচ্ছা তাহাই হইবে। আর আমার জীবনের বেশী বাকীও নাই, কিন্তু আসল ঘটনাগুলিই বাকী রহিয়াছে। উঃ—আমি এত দুঃখ সহ্য করিয়াছি, এত সুখভোগ করিয়াছি যে, তোমরা হইলে আতিশয্যে দম ফাটিয়া মরিয়া যাইতে। মন দিয়া শুন।

হোটেলের আয়রণচেষ্টে প্রতিদিন টাকা যাহা জমা হয়, পরদিন সমস্ত ব্যাঙ্কে গিয়া পৌঁছে—কিন্তু আমাকে ব্যাঙ্কে যাইতে হইল না। হোটেল-সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্রটি অত্যন্ত শিকারপ্রিয়। সে সেই দিন বহু বন্ধু সমভিব্যাহারে দূরদেশে শিকার করিতে চলিল। পথখরচের জন্য একখানা নোট ভাঙ্গাইয়া টাকা লইল, তাহার মধ্যে আমি পড়িয়া গেলাম। সাহেবতনয়গণ বোম্বাই ষ্টেশনে গাড়ী চড়িয়া পাঁচ ছয় ঘণ্টার পর এক স্থানে অবতরণ করিল; ষ্টেশনের কিছু দূরে তাম্বু ফেলা ছিল। সেখানে পানাহার করিয়া হিপ্ হিপ্ হুররে নাদে দিগন্ত প্রকম্পিত করিতে করিতে জঙ্গলে প্রবেশ করিল। দুম্‌দাম্ বন্দুকের আওয়াজ, বিজাতীয় চীৎকার, কখনও ধীরপদে গমন, কখনও ধাবন, কখনও লম্ফন এইরূপ করিয়া সন্ধ্যা হইয়া আসিলে সকলে তাম্বুতে ফিরিল। এইরূপ সাহেবের পকেটে থাকিয়া প্রতিদিন শিকারে যাইতে লাগিলাম। একদিন একটা কৃষ্ণসার-জাতীয় হরিণ সাহেবদের লক্ষ্য ব্যর্থ করিয়া একটা গভীর জংগলে লুক্কায়িত হইল। সে জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিতে সাহেবেরা অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু পথ খুঁজিয়া পাইল না। সেই স্থানে কাঠুরিয়াদের একটি ছোট মেয়ে কাঁসার মল পরিয়া দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতেছিল, সে বলিল,—"সাহেব লোক, আমি প্রবেশের পথ দেখাইয়া দিতে পারি, আমায় কি দিবে আগে বল।" আমার সাহেব, পেণ্টালুনের পকেট হইতে আমাকে বাহির করিয়া মেয়েটিকে দেখাইল; দেখাইয়া আমাকে বুক-পকেটে ফেলিয়া দিল। মেয়ে আগে চলিল, সাহেবেরা তাহার অনুগমন করিল। শেষে মেয়েটির দর্শিত পথে এ স্থানে খুব ঝুঁকিয়া দুই হাতে ডালপালা ঠেলিয়া জঙ্গলে প্রবেশ করিল। মেয়েটি তখ প্রতিশ্রুত পুরস্কার চাহিল; সাহেব বন্দুক উঠাইয়া বিকৃত মোটা গলায় বলিল "ব্যা—গো।" সে বেচারী সুবিধা নয় দেখিয়া সরিয়া পড়িল। সাহেবের এ আচর দেখিয়া আমার বড় লজ্জা হইতে লাগিল; ইচ্ছা করিতে লাগিল, এই দুরাচারের কা

হইতে হারাইয়া যাই। এবার আমার অভীষ্ট সফলও হইল এবং আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা সুখের কাল আরম্ভ হইল। সাহেবগণ হরিণের জন্য অনেক ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া জঙ্গল হইতে বাহিরে আসিল। যখন সন্ধ্যা হয় হয়, মোটা ঘাসগুলি বেশ দেখা যাইতেছে, সূক্ষ্মগুলি ভাল দেখা যাইতেছে না, তখন সাহেবেরা এক অনতিউচ্চ প্রস্তর-বেদীর উপর উঠিল। সেখান হইতে কিছু দূরে খালের ধারে বনহংস চরিতেছিল। সাহেবেরা তাহাদের প্রতি লক্ষ্য করিবার চেষ্টা করিল। একটা বৃক্ষের স্থূলবক্রশাখার উপর ভর দিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া আমার সাহেব যখন নিশানা করিতেছিল, তখন আমি তাহার বুক-পকেট হইতে ঠন্ করিয়া পড়িয়া গেলাম। সাহেব আমার পতনশব্দ বোধ হয় শুনিতে পাইল, কারণ তাহার মুখে "ড্যাম্" এইরূপ শব্দের অস্ফুটধ্বনি শুনিয়াছিলাম, কিন্তু সে যেমন করিতেছিল, তেমনি করিতে রহিল। আমি এই অবসরে পাথরের উপর দিয়া, ঘাসের উপর দিয়া, বালির উপর দিয়া, গড়াইয়া ঠিকরাইয়া একটা গাবভেরেণ্ডার ঝোপের পাশে গিয়া পড়িলাম। সাহেবের বন্দুক সেবার বিশ্বাস রাখিল। পাখীর ঝাঁক উড়িয়া গেল কিন্তু দুইটা পড়িয়া মৃত্যুযন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। সাহেব মত্ত হইয়া সেইদিকে ছুটিল, আমার কথা আর খেয়াল হইল না।

সাহেবেরা চলিয়া গেলে, আমি মুক্ত আকাশের তলে, মুক্ত বাতাসে পড়িয়া রহিলাম। আজ আমার জীবনের বড় শুভরাত্রি। এমন আরাম, এমন স্বাধীনতা জন্মের পর আমার ভাগ্যে এই প্রথম ঘটিল। সে রাত্রি অতি আহ্লাদে আমি নিদ্রা যাইতে পারিলাম না। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল, মৃদুমন্দ বাতাস বহিতে লাগিল, দূরে কাছে ঝোপে ঝাপে বনপুষ্প ফুটিয়া উঠিতে লাগিল, তাহার গন্ধ এক প্রকার নূতনতর। আমি বাক্সে বাক্সে আতর ও বিলাতী এসেন্স, বাগানে বাগানে গোলাপ, বেলা, রজনীগন্ধা, কত পুষ্পের আঘ্রাণ পাইয়াছি, কিন্তু এমনটি আর কোথাও পাই নাই—সে অতি অপূর্ব।

আমি বলিলাম,—"ভুল; তোমার ওটি ভুল। সৃষ্টির আদিকালে বাগানের ফুলও বনে ফুটিত, কিন্তু যে সকল ফুলকে শোভায় সৌরভে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানুষ বিবেচনা করিল, তাহাদিগকেই তুলিয়া আনিয়া বাগান সাজাইল। বাগানের ফুল অপেক্ষা বন-ফুলকে শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া আধুনিক কবিদিগের একটা ফ্যাসান্ হইয়াছে বটে, কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ অবিচার।"

মুখনল বলিল,—আমি ত আর কবি নহি, কোনও আধুনিক কাব্যও পাঠ করি নাই, তবে আমার সে গন্ধ এত ভাল লাগিয়াছিল কেন?

আমি অধ্যাপকোচিত গাম্ভীর্যের সহিত বলিলাম,—"উহার ভিতর একটু মনস্তত্ত্ব-ঘটিত জটিলতা আছে। যখন তুমি আতর, এসেন্স, বেলা, গোলাপের গন্ধ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে অনুভব করিয়াছিলে, তখন তুমি পরাধীন। এখন তুমি স্বাধীন। তখন ভালও মন্দ লাগিবার কথা, এখন মন্দও সুধাবৎ লাগিবে; সেই শ্লোকটা জান না?"

মুখনল বলিল—থাম, থাম, অত বিদ্যা আমার নাই। আচ্ছা, না হয় তোমার থিওরিই মানিয়া লইলাম। শুনিয়া যাও, বৃথা তর্ক করিয়া রসভঙ্গ করিও না। হাঁ, কি বলিতে-ছিলাম? চারিদিক্ হইতে ফুলের গন্ধ আসিতেছিল, আকাশে দুইটি একটি করিয়া শত সহস্র নক্ষত্র জ্বলিয়া উঠিল, জীবজন্তুর কোথাও আর কোনও চিহ্ন দেখা গেল না, কেবল অনেক রাত্রে একটা নেকড়ে বাঘ জল খাইতে আসিয়াছিল, তাহার পা লাগিয়া একটা পাথর গড়াইয়া আমার অতি নিকট দিয়া নীচে গড়াইয়া গেল। রাত্রি গভীর হইল, আকাশে কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রখণ্ড ভাসিয়া উঠিল, শিশির পড়িতে লাগিল,—সে কি স্নিগ্ধ! প্রাণমন শীতল হইল; ভাবিলাম, এই ভারতবর্ষে সম্রাজ্ঞীর মুখমণ্ডল-চিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়া কত কোটি কোটি আমার স্বজাতীয়গণ বিচরণ করিতেছে, তাহাদের মধ্যে কয়জন এমন করিয়া শিশির জলে স্নান করিতে পাইতেছে? সকলে আয়রণ-চেস্টে না হয় কাঠের বাক্সে,—না হয় চর্ম্মপেটকে বা রুমালে, নয় ত দেশী লোকের কাপড়ের কিম্বা

চাদরের খুঁটে ট্যাঁকে, এবং অবস্থাবিশেষে কচ্ছে আবদ্ধ আছে, ভাল করিয়া নিঃশ্বাসও ফেলিতে পাইতেছে না। আমি নিশ্চয়ই পূর্ব্বজন্মে কোনও বৃহৎ পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম, সেই সুকৃতির বলে আমার এই সুখলাভ হইল। যদি কেহ লোকালয়ে পথে ঘাটে দৈবাৎ পড়িয়াও থাকে, তবে সেও আমার ন্যায় এমনি আরামে আছে বটে, কিন্তু সে তাহার কতক্ষণ? প্রভাত হইতে না হইতেই কোনও উষাচারী পথিক তাহাকে কবলিত করিয়া পকেটে ফেলিবে, আবার যে দুর্দ্দশা সেই দুর্দ্দশা! আর আমি দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি এইখানে পড়িয়া বিশুদ্ধতম বনবায়ু সেবন করিব, শিশিরে অঙ্গধাবন করিব, পাখীর গান শুনিয়া ঘুমাইয়া পড়িব, মুখে প্রভাতের রৌদ্র আসিয়া লাগিলে জাগিয়া উঠিব। আহা! যদি চলিতে পারিতাম, তবে ঐ স্ফটিকস্বচ্ছ ঝরণার জল একটু পান করিয়া আসিতাম, আর গোটাকত ঐ ফুল তুলিয়া আনিয়া বিছাইয়া শয়ন করিতাম, আর ঐ কি একটা লাল টুকটুকে ফল পাকিয়া রহিয়াছে; উহার রস নিয়া মুখটি একটু রাঙাইয়া লইতাম। বাসনার এইরূপ নিস্ফল আবেগ প্রতিনিয়ত আমার বক্ষঃপঞ্জরে আঘাত করিত, তথাপি বড় সুখে ছিলাম, কিন্তু প্রতিদিন আমার উপরে ধূলিস্তর জমা হইতে লাগিল। দেখিলাম, ক্রমেই আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছি। একটু দুঃখ হইল, কিন্তু কি করিব, উপায় নাই। মাসের পর মাস চলিয়া গেল, আমি সম্পূর্ণরূপে আবৃত হইয়া গেলাম। আর পাখীর গান শুনিতে পাই না ফুলের গন্ধ পাই না, নবরৌদ্ররাগে রঞ্জিত প্রভাতগগনের শোভা দেখিতে পাই না, আমি যেন গভীর নিদ্রায় মগ্ন রহিলাম। কতকাল পরে বলিতে পারি না, একদিন কিঞ্চিৎ শীতলতা অনুভব করিলাম। দেখিলাম আমার দেহের মৃত্তিকাবরণ সিক্ত হইতেছে: ক্রমে তাহা গলিয়া ধৌত হইয়া গেল; আমার যেন নিদ্রাভঙ্গ হইল; দেখিলাম, পাংশুবর্ণ মেঘে আকাশটা পূরিয়া গিয়াছে, মুষলধারায় বৃষ্টি পড়িতেছে, আমার এমন সুখবোধ হইল যে, সে আর তুমি কি বুঝিবে! তোমরা বৃষ্টির সময় ছাতা, ওয়াটারপ্রুফ্ ব্যবহার কর, প্রকৃতিদত্ত একটা মহাসুখ হইতে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত হইয়া থাক, তোমাদের কথাই স্বতন্ত্র। আমি দেখিলাম, বনের সমস্ত গাছপালা উন্মুখ হইয়া দাঁড়াইয়া ভিজিতেছে, যেন কতদিনকার তৃষ্ণা আজ সাগ্রহে মিটাইতেছে। আকাশে বিদ্যুতের ঝিলিক্ দিতে লাগিল; সেই এক চমৎকার ব্যাপার, একবার করিয়া বিদ্যুৎ চমকে, আর আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া থাকি—যতক্ষণ মেঘ না ডাকিবে, ততক্ষণ নিঃশ্বাস ফেলিব না। সে একটা খেলা মাত্র, তাহার কোনও বৈজ্ঞানিক বা আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য ছিল না। ক্রমে জল ছাড়িয়া গেল; পূর্ব্বদিকে রামধনু দেখা দিল; ক্রমে সন্ধ্যায় চারিদিক অন্ধকার হইয়া আসিল। বর্ষাকাল, প্রায়ই এইরূপ জল হইত; ক্রমে বর্ষা ছাড়িয়া শরৎ আসিল, হেমন্ত আসিল, আমি আবার ঢাকা পড়িয়া দুরন্ত শীত হইতে আত্মরক্ষা করিলাম। আবার বর্ষাকালে সহসা একদিন বাহির হইলাম। এইরূপ প্রতিবৎসর হইতে লাগিল; কয়বৎসর কাটিয়া গেল, তাহার কোনও হিসাব রাখিতে পারি নাই; একদিন আমার অবস্থার আকস্মিক পরিবর্ত্তন ঘটিল।

ডিটেকটিভ-পুলিশের এক দেশীয় কর্ম্মচারী অশ্বারোহণে সেই বনে প্রবেশ করিয়া, যেখানে আমি পড়িয়াছিলাম, তাহার অতি নিকট দিয়াই যাইতেছিলেন। যেই আমাকে দেখিতে পাওয়া, অমনি অশ্ব হইতে লম্ফ দান, এবং বাক্যব্যয় মাত্র না করিয়া আমাকে পকেটে গ্রহণ।

তুমি আমার জীবনচরিত সংক্ষেপে বলিতে বলিয়াছ; সুতরাং কেমন করিয়া আমি পুলিশ কর্ম্মচারীর হস্ত হইতে পোষ্ট আফিসে এবং তৎপরদিন সেভিংস্ ব্যাঙ্কের টাকার সহিত স্কুলের হেডমাষ্টারের নিকট ও ক্রমে ক্রমে ফল-বিক্রেতা, সাহেবের খানসামা, মৎস্য-বিক্রেতা, আয়কর কর্ম্মচারী, গবর্ণমেণ্ট ট্রেজারি এবং তথা হইতে বহুলোকের হস্ত অতিক্রম করিয়া মিরজাপুরের এক পূজারীর হস্তে আসিয়া পড়িলাম, তাহার সবিস্তার বর্ণনায় আর প্রয়োজন নাই। পূজারী মহাশয় আমাকে ট্যাঁকে গুঁজিয়া গঙ্গার ঘাটে

স্নান করিতেছিলেন, কম্পিতস্বরে উচ্চারণদুষ্ট সংস্কৃত মন্ত্র পাঠ করিতেছিলেন এবং বিরলকেশ সমসৃণ মস্তকখানিতে সঘন করসঞ্চালন করিতে করিতে ডুবের পর ডুব দিতেছিলেন। সহসা তাঁহার নীবিবন্ধ শিথিল হইল, আমি তাঁহার ট্যাঁক হইতে স্খলিত হইয়া অতি কোমল মৃত্তিকাশয়ন লাভ করিলাম। স্নানান্তে তীরে উঠিলে তিনি জানিতে পারিলেন আমি হারাইয়াছি। আবার জলে নামিয়া দুই দণ্ড ধরিয়া ডুব পাড়িয়া অনেক ব্যর্থ অন্বেষণ করিলেন; আমার আশে পাশে তাঁহার হস্ত আসিয়া পড়িতে লাগিল, কিন্তু আমি যেখানকার সেইখানেই রহিলাম। স্রোতে স্রোতে চুল পরিমাণ সরিয়া সরিয়া সমস্ত দিবারাত্রে, যেখানে পড়িয়াছিলাম সেখান হইতে দুই হস্ত পরিমিত দূরে গিয়া পড়িলাম। সেখানে মগ্ন-জল, সুতরাং পরদিন স্নানের বেলা কেহই সেখানে আসিল না। আমি জলের ভিতর দিয়া জলতলবিহারী প্রাণিগণের আহার, ক্রীড়া, দ্বন্দ্ব প্রভৃতি সমস্ত উদ্যম দেখিতে লাগিলাম। সে রাজ্য সম্পূর্ণ অরাজক। সবল দুর্ব্বলের প্রতি অবাধে নির্ভয়ে অত্যাচার করে; কেহ তাহার প্রতিবাদ বা প্রতিবিধান করিতে অগ্রসর হয় না। কুম্ভীর, রাজার মত গম্ভীর হইয়া বসিয়া থাকেন, কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন না। আর করিবেনই বা কাহার সঙ্গে? কেহ তাঁহার নিকট ঘেঁসিতেই সাহস করে না। মৎস্যগণ খুব আনন্দ করিয়া বেড়াইতেছে। চুনা পুঁটিরা কিছু চপল প্রকৃতির, প্রপিতামহ রোহিতের স্কন্ধে, পুচ্ছে উঠিয়া নৃত্য করিতেছে। কর্কটকুল আপন আপন বিবরে বসিয়া দাড়া নাড়িতেছে। এইরূপ জলবাসে আমার অনেক মাস অতিবাহিত হইল। জ্যৈষ্ঠের প্রচণ্ড গ্রীষ্মে গঙ্গা আপনার জল সরাইয়া সরাইয়া একদিন আমাকে স্বীয় কুক্ষি হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন, কিন্তু আমার উপর কিয়দংশ কর্দ্দমের আচ্ছাদন রাখিয়া গেলেন; বোধ হয় আশা ছিল, আবার শ্রাবণ ভাদ্র মাসে সময় ভাল হইলে আমাকে অধিকার করিবেন। কিন্তু তাহা হইল না। একটি প্রৌঢ়া দাসী তীরে বসিয়া কটাহ মাজিতে মাজিতে অঙ্গুলি দিয়া মৃত্তিকা সংগ্রহ করিতেছিল, সে আমাকে দৈবধন বলিয়া ললাটে স্পর্শ করিয়া উত্তমরূপ ধৌত করণান্তর অঞ্চলবন্ধ করিল।

অনেক রাত্রি হইয়াছে। তোমাকে আবার প্রভাতে গ্রামান্তরে রোগী দেখিতে যাইতে হইবে, সুতরাং গল্প শেষ করি। সেই দাসীর হস্ত হইতে ক্রমে আমি বহুলোকের হস্ত অতিক্রম করিয়া ভিজিট স্বরূপ কেমন করিয়া তোমার হাতে আসিয়া পড়িলাম, সে কথায় আর কাজ নাই, বিশেষ, উল্লেখযোগ্য ঘটনা তেমন কিছুই ঘটে নাই। একবার কেবল এক দুই বৎসরের শিশু কর্ত্তৃক তাহার মাতার অজ্ঞাতে ফুটন্ত ভাতের হাঁড়ির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া বিলক্ষণ বিপদে পড়িয়াছিলাম; কিন্তু হায় হায়! তাহার পর যে বিপদ ঘটিয়াছে, তুলনা করিলে ভাতের হাঁড়ির সেই উত্তাপকে শীতলতাই বলিতে হয়। তুমি যখন গৃহিণীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া একটা নূতন মুখনল গড়াইবার জন্য স্বর্ণকার ডাকিয়া খুকীর মলের ভগ্নাংশের সহিত আমাকে অর্পণ করিলে, তখনি আমার আত্মা-পুরুষ শুকাইয়া গেল! তাহার পর সেই সদ্যরচিত মৃৎপাত্র হাফরে রাখিয়া বাঁশের চোঙায় ফুৎকার দিকে দিতে যখন আমার সাক্ষাৎ যমরূপী কৈলাস সেকরা আমাকে তাহাতে ফেলিল, তখন উঃ—"

আমি বলিলাম—"ভাই! আর কায নাই; কিন্তু আমাকে অপরাধী কর কেন? আমার দোষ কি?"

মুখনল বলিল,—তোমার আর দোষ কি? অদৃষ্ট ভিন্ন পথ নাই। আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল, তাহা ঘটিয়াছে। আমার জীবনী জনসমাজে প্রচার করিয়া তোমার এই অজ্ঞান-কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিও।

[ভাদ্র, ১৩০৩]

শ্রীবিলাসের দুর্ব্বুদ্ধি

প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্রীবিলাসবাবুর বিবাহিত-জীবন সুখের ছিল কি দুঃখের ছিল, তাহা তিনি ঠিক বুঝিতে পারিতেন না। তাঁহার স্ত্রী সরোজবাসিনী যে তাঁহাকে যথেষ্ট ভালবাসেন, তাহার পরিচয় শ্রীবিলাস শত সহস্রবার পাইয়াছেন। কিন্তু এই ভালবাসার মধুরাশির মধ্যে, মাঝে মাঝে মধুমক্ষিকার হুলের দংশনজ্বালা অনুভব করিয়া তিনি অস্থির হইয়া পড়িতেন। আসল কথাটা এই যে, তাঁহার স্ত্রীটি কিছু মুখরা ছিল। আর শ্রীবিলাসও বোধ হয় একটু অযথা পরিমাণে অভিমানী ছিলেন। তাই মাঝে মাঝে তাঁহাদের দাম্পত্য-জীবনের ঐক্যতানবাদনে সুর সহসা কাটিয়া গিয়া আগাগোড়া খাপছাড়া হইয়া যাইত।

পূর্ব্বের কথা এই। শ্রীবিলাসের শ্বশুর হরিগোপালবাবু—লক্ষ্ণৌয়ের সেই প্রসিদ্ধ হরিগোপালবাবু। ও অঞ্চলের লোক, কে না তাঁহার নাম শুনিয়াছে; এবং—ধনী হউক, দরিদ্র হউক, পরিচিত হউক, অপরিচিত হউক,—কোন ভ্রমণকারী বাঙ্গালী তাঁহার বাড়ীতে অন্ততঃ একটিবারও পাত পাড়ে নাই? তিনি বাসায় রাখিয়া খাওয়াইয়া, পরাইয়া, কত লোকের যে চাকুরি করিয়া দিয়াছেন তাহার কি সংখ্যা আছে? আহা, ওদিককার গরীব লোকে আজিও তাঁহার নাম করিয়া কাঁদিয়া মরে! সে কথা যাউক,—তাঁহাদের মেয়ের বিবাহ দেওয়া বড়ই কঠিন ব্যাপার ছিল। সারা বাঙ্গালা দেশে দুই তিনখানি মাত্র গ্রামে তাঁহাদের "ফেরতা ঘর"—অর্থাৎ যাহাদের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া চলে—ছিল। পাত্র যুটানই মুস্কিল ছিল; কিন্তু যদি পাত্রও বা যুটিল, তবে হয় সে একটি হস্তীমূর্খ, নয় ত একেবারে নিঃস্ব। একবার তিনি পূজার সময় সপরিবারে কাশীতে আসিয়াছিলেন, সেই সময় পিতৃমাতৃহীন দশ বৎসর বয়স্ক শ্রীবিলাস তাঁহার আশ্রয়ে আসিয়া পড়িল। তাহাকে স্বজাতীয় এবং "স্বঘরের" দেখিয়া হরিগোপালবাবু আগ্রহের সহিত কুড়াইয়া লইলেন; এবং লক্ষ্ণৌয়ে লইয়া গিয়া বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। ছেলেটির সৎ স্বভাব ও বুদ্ধিমত্তা দেখিয়া, তখন হইতেই তাহাকে স্বীয় ভাবী জামাতা বলিয়া স্থির করিয়া রাখিলেন। সেই ভাবেই লালনপালন এবং শিক্ষার বন্দোবস্ত করিলেন। আঠারো বৎসর বয়সে শ্রীবিলাস প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল; তখন কন্যার বয়ঃক্রম বারো বৎসর হইয়াছে দেখিয়া হরিগোপালবাবু দুইজনকে প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে বাঁধিয়া দিলেন। এই শুভ ঘটনার পর তিনি একবৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন।

শ্রীবিলাস তখন এফ-এ পড়িতেছেন। হঠাৎ তাঁহার শ্বশুরমহাশয়ের বসন্তরোগে মৃত্যু হইল। এই আকস্মিক দৈবদুর্ঘটনায় শ্রীবিলাসের পড়া বন্ধ হইল। শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে তাঁহার শ্বশ্রূঠাকুরাণী বলিলেন,—"চল বাছা, আমরা দেশে গিয়ে থাকি। এই যমপুরী লক্ষ্ণৌ সহরে আমি আর একদিনও টিঁকিতে পারিব না।"

তাহাই হইল। লক্ষ্ণৌয়ের ত্রিতল বাড়ীটা একপ্রকার সিকি মূল্যেই বিক্রীত হইল। জিনিষপত্র কতক বিক্রীত, কতক বিতরিত এবং অবশিষ্ট গোলেমালে অপহৃত হইল। দিন পনের কুড়ির মধ্যে সমস্ত পরিষ্কার। তখন সেই পরিবার চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে বঙ্গদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

শ্রীবিলাসের স্ত্রী, হরিগোপালবাবুর সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যা ছিলেন। সরোজবাসিনীর আর দুই ভগ্নী এবং একটি ভ্রাতা ছিল। ভগ্নী দুইটি নিজ নিজ শ্বশুরালয়ে ছিল। ভ্রাতাটির নাম সতীশ, সাত আট বৎসর বয়স। সুতরাং শ্রীবিলাসই এখন এ পরিবারের অভিভাবক। দেশে বাস করিতে লাগিলেন। বৎসরখানেক ধরিয়া চতুর্দ্দিক হইতে আত্মীয় কুটুম্বগণ একে একে আসিয়া বিগত দুর্ঘটনার জন্য সমবেদনা জানাইয়া গেলেন। সকলেই গৃহিণীকে কহিলেন,—"জামাইটিকে বসাইয়া রাখা ভাল হইতেছে না। ইহাকে কলিকাতার

কলেজে পাঠাইয়া দাও। ঈশ্বরেচ্ছায় তোমাদের ত কোন বিষয়ের অভাব নাই!"—বিধবা এই পরামর্শ যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিলেন। শ্রীবিলাস কলিকাতায় গিয়া এফ্-এ বি-এ, এবং দুইবার অনুত্তীর্ণ হইবার পর আইন পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হইলেন। এইরূপ সাত আট বৎসর অতীত হইল।

শ্রীবিলাসের এখন সাতাশ আঠাশ বৎসর বয়স হইয়াছে—কিন্তু এ পর্য্যন্ত সন্তানাদি কিছুই হয় নাই। স্বামীর উপর সরোজবাসিনীর আরও অসন্তোষের কারণ ছিল যে, তাঁহার এতখানি বয়স হইল, তথাপি তিনি সিকি পয়সাও উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইলেন না। এই সকল কারণে শ্রীবিলাস স্ত্রীর নিকট কিছু অপ্রতিভ হইয়া থাকিতেন। এই সময় তাঁহার আইন পরীক্ষার শেষ ফল বাহির হইল। এখন হইতে নিজেকে আর নিতান্ত অপদার্থ জীব বলিয়া মনে হইত না। সরোজবাসিনী তাঁহার অকৃতিত্ব সম্বন্ধে কোন কথা বলিলে, আর মৌনভাবে সহ্য না করিয়া একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিতেন। বলা-বাহুল্য ইহাতে সরোজবাসিনীর সর্ব্বাঙ্গটা জ্বলিয়া যাইত। এইরূপে আরও কয়েক মাস কাটিল।

বঙ্গদেশের দূষিত জলবায়ুর প্রভাবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়রূপ ষ্টিমহ্যামারের সুদীর্ঘ-কালব্যাপী ক্রিয়ায় শ্রীবিলাসের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। তাই তিনি পরামর্শ করিলেন, পাটনায় গিয়া ওকালতীর ব্যবসা করিবেন। শ্বশ্রূ বলিলেন,—"সেই ভাল, তুমিও সেখানে ওকালতী কর, আর সতীশও স্কুলে পড়ুক।" শুভদিনে দুই জনে পাটনা যাত্রা করিলেন। পাটনার আদালত ইত্যাদি বাঁকীপুরে। সেইখানে বাসা করা হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দুই বৎসর অতীত হইয়াছে। শ্রীবিলাস এখনও ভাল পসার জমাইতে পারেন নাই। কোনও মাসের আয়ে বাসাখরচটার সংকুলান হয়—কোনও মাসে তাহাও হয় না। প্রথমে উকিলী পাস করিয়া শ্রীবিলাসের মনে যে আত্মমর্যাদার উন্নত ভাব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা এখন সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত। সরোজবাসিনী আসিয়াছেন। সতীশ স্কুলে পড়িতেছে। শাশুড়ী ঠাকুরাণী এ পর্য্যন্ত বরাবর শ্রীবিলাসকে টাকা যোগাইয়া আসিয়া-ছেন; কিন্তু এখন ভারি অসন্তোষের ভাব। তিনি দেশে প্রায়ই আত্মীয় প্রতিবেশীদের কাছে স্বীয় মৃত স্বামীর বুদ্ধির দোষ দিয়া বলিতেন,—"দেখ দেখি, এমন জামাই করিয়া গেলেন যে, তাহার টাকা যোগাইতে যোগাইতে আমাকে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যাইতে হইল। খতাইয়া দেখ, যে টাকা খরচ হইয়াছে, ইহার অর্দ্ধেক টাকা বিবাহে ব্যয় করিলে একটা রাজা জামাই পাওয়া যাইতে পারিত। এত টাকা খরচ করিলাম, তবুও জামাইটি মানুষের মত হইল না।" ইদানীং শ্রীবিলাসও নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত শাশুড়ীর সাহায্য গ্রহণ করিতেছিলেন, কারণ "গতিরন্যথা" ছিল না।

যখনকার যাহা, ঠিক সেই সময়ে মানুষের যদি তাহা হয়, তবে আর কোনই গোল থাকে না। কিন্তু শতকরা নিরানব্বই জনের অদৃষ্টে তাহা ঘটে না। একে ত শ্রীবিলাসের ত্রিংশ বৎসর বয়স হইলেও সন্তান হইল না;—হিন্দু, বিশেষতঃ বাঙ্গালীর ঘরে ইহা একটা সামান্য দুর্ভাগ্যের কথা নহে। তাহার উপর উপার্জ্জন আশানুরূপ ত নহেই—প্রয়োজনানু-রূপও নহে। এই দুইটি কারণে তাঁহার জীবনটা দুর্ব্বহ বলিয়া মনে হইত। এ সমস্ত বেশ সহ্য হয়, যদি পত্নী অনুকূলা হয়েন। এমন কোন সাংসারিক কষ্ট আছে, যাহা দাম্পত্য প্রণয়ের স্নিগ্ধমধুর স্পর্শে নিতান্ত লঘু হইয়া না যায়? কিন্তু শ্রীবিলাসের স্ত্রী প্রণয়বতী হইলেও এই দুইটি ত্রুটি ক্ষমা করিতে প্রস্তুত ছিলেন না।

সে দিন রবিবারের সন্ধ্যা। সকাল হইতে বৃষ্টি হইতেছিল। আমাদের উকীল-বাবুর বৈঠকখানা ঘরে একটিও মক্কেলনামক সেই প্রিয়দর্শন জীব উপস্থিত ছিল না।

কালীর মোটা মোটা দাগ উভয়ের চক্ষে পড়িল।

ঠাকুরদাদা বলিলেন—"এ কালীর দাগ কে দিলে?"

শ্রীবিলাসের বুঝিতে বাকী রহিল না দাগ কে দিয়াছে। ক্ষোভে, অপমানে তাঁহার সর্ব্বশরীর সর্পদষ্ট মনুষ্যের মত ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। স্বর বন্ধ হইয়া আসিল। চক্ষু দিয়া যেন আগুন বাহির হইতে লাগিল। তিনি আত্মগোপন করিবার জন্য বিপুল চেষ্টা করিলেন; কিন্তু পারিলেন না।

ঠাকুরদাদা এতক্ষণ পত্র পাঠ করিতেছিলেন। পাঠ শেষ হইলে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ কালীর দাগ কে দিয়েছে হে?"

শ্রীবিলাস প্রথমবারে কথা কহিতে পারেন নাই বলিয়া ঠাকুরদার প্রশ্নের উত্তর দেন নাই; এবার বলিলেন—"যখন আমি পত্র খুলি, তখন এ দাগ ছিল না। আমার স্ত্রী এ দাগ দিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

বৃদ্ধ বলিলেন—"দেখিলে একবার! স্ত্রীলোকের স্পর্দ্ধা দেখিলে! স্বামী—যে স্বামী গুরুর গুরু—তাহার এমন করিয়া অপমান! হায়রে কলিকাল! এই বয়সে (ষষ্ঠি বৎসরের কম ত নহে!) কত দেখিলাম, আরও কত দেখিতে হইবে! এমন শয়তানী স্ত্রীলোকের নরকেও স্থান হইবে না। মনুর আইন—

ভর্ত্তারং লঙ্ঘয়েদ্ যা তু স্ত্রী স্বজ্ঞাতিগুণদর্পিতা
তাং শ্বভিঃ খাদয়েদ্রাজা সংস্থানে বহুসংস্থিতে।

অর্থাৎ কিনা যে স্ত্রী আপনাকে ধনিকন্যা বা রূপবতী মনে করিয়া ভর্ত্তারং—নিজ পতিকে লঙ্ঘয়েৎ—অর্থাৎ অপমানিত করে, রাজা তাহাকে বহুসংস্থিতে—কিনা অনেক লোকের সমক্ষে আনিয়া শ্বভিঃ বলতে কুক্কুর দিয়া খাওয়াইবেন।—কিন্তু এখন মনুর আইন চলে না—এখন হনুর রাজ্য। কিন্তু শ্রীবিলাস তুমি যদি এই অপমান, এই নারীপদাঘাত সহ্য কর, তবে ধিক্ ধিক্ তোমাকে। তোমায় ধিক, তোমার পুরুষত্বে ধিক। তুমি আবার বিবাহ করিয়া ও স্ত্রীকে বাড়ী হইতে দূর করিয়া তাড়াইয়া দাও।"

শ্রীবিলাস চুপ করিয়া মনের মধ্যে কথাটা তোলাপাড়া করিতে লাগিলেন।

তাঁহাকে নীরব দেখিয়া ঠাকুরদাদার বক্তৃতার স্রোত পুনরায় খুলিয়া গেল। বলিলেন, —"আজকাল ইংরাজি পড়িয়া লোকে স্ত্রীগুলোকে আদর দিয়া দিয়া—মাথায় চড়াইয়া চড়াইয়াই ত এই সর্ব্বনাশটা করিল। সাহেব বেটাদের মত স্ত্রৈণ জাতি আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নাই—ইষ্টেশনে দেখিয়াছি—বেটারা বেটীদের মাথায় ছাতা ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে যায়—যেন খানসামা! সেই সাহেবের শিষ্য ত তোমরা! তুমি যদি স্ত্রীর এই অতি গর্হিত আচরণ ক্ষমা কর—প্রশ্রয় দাও—তবে তাহার দেখাদেখি দশটা ভাল প্রকৃতির স্ত্রীলোকও বিগড়াইয়া যাইবে। আর যদি তুমি যথার্থ পুরুষ হও—ইহার উপযুক্ত শাস্তিবিধান কর, তবে ভয় পাইয়া দশটা বজ্জাৎ স্ত্রীও শান্ত হইয়া আসিবে। এটা একটা সামাজিক কর্ত্তব্য বলিয়া জানিবে শ্রীবিলাস! কোম্পানী বাহাদুর যে খুনীর ফাঁসী দেন, সে কেন? খুন হইল, কোম্পানীর একটা প্রজা গেল। আর একটা প্রজার প্রাণ বধ করিয়া রাজস্ব কমাইবার প্রয়োজন কি? না—দশ জনে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিবে—বাপুরে, খুন করলে ত ফাঁসী যেতে হয়! সুতরাং তুমি আর ইতস্ততঃ করিও না। এই ১৭ই দিন আছে, বিবাহ করিয়া ফেল। আমি পাত্রী স্থির করিবার ভার লইলাম।"

অবস্থাবিশেষে পড়িয়া মানুষের মন যে কি ভয়ানক পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ঊনবিংশতি শতাব্দীর এই শেষভাগে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত যুবক শ্রীবিলাস,—মিল্, বেকন্, কার্লাইলের ছাত্র শ্রীবিলাস,—মিল্টন—সেক্সপিয়ার—শেলি—মাইকেল—বঙ্কিম—রবীন্দ্রের কাব্যোদ্যানের মধু-রসগ্রাহী শ্রীবিলাস, অম্লান বদনে বলিল,—"আমি বিবাহ করিব!"

পঞ্জিকার মতে শুভদিনে ও শুভক্ষণে, এই পরম অশুভকর বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল।

আশা করি, আমার পাঠকেরা না বলিলেও বুঝিতে পারিবেন যে, কন্যাটি বক্তৃতাকারী ঠাকুরদাদার অতি নিকট-সম্পর্কীয়া।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এই ঘটনার পর এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। শ্রীবিলাসের একটু পসার বাড়িয়াছে, কিন্তু মনের শান্তি বহুদূরে নির্ব্বাসিত।

সরোজবাসিনী পিত্রালয়ে। তাহার যে কি অবস্থা হইয়াছে, তাহা আর লিখিবার প্রয়োজন কি? সে গর্ব্বিতা মদোন্ধতা, সরোজবাসিনী এখন "ধরার ধূলির চেয়ে নীচে" হইয়া গিয়াছে। লোকগঞ্জনায় তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। বাড়ীর লোক, পাড়ার লোক, গ্রামের লোক, আত্মীয় কুটুম্বালয়ের লোক, তাহাকে একবাক্যে নিন্দা করিতেছে। দিন নাই, রাত্রি নাই, গ্রামে যেখানে সেখানে সরোজবাসিনীর কথা উঠিলেই অমনি পাঁচজনে বলে—"ছি ছি ছি—এমন বুদ্ধি! আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মারিল! একটা সামান্য জিদের জন্য চির-জীবনটার দুঃখ কিনিল! গলায় দড়ি!"—ইত্যাদি। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া সরোজার মরিবার ইচ্ছা করিত।

এই সময়ে সরোজার মাতা মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে সরোজার হস্ত ধারণ করিয়া তিনি বলিয়া গেলেন—"মা, আমার এই শেষ অনুরোধ। এটি রাখিও। পুরুষ স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু স্ত্রীলোকের স্বামী ভিন্ন আর গতি নাই। তুমি স্বয়ং বাঁকীপুরে যাইয়া স্বামীর পায়ে ধরিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিবে। সতীন হইয়াছে, তার জন্য আর কি করিবে মা? সতীন ত কত লোকের থাকে। আজকালই কমিয়াছে-নহিলে সে কালে সতীনের জ্বালা ভোগে নাই এমন কয়টা স্ত্রীলোক ছিল? তুমি পূর্ব্ব-জন্মে কোনও গুরুতর পাপ করিয়াছিলে, তাহার ফলে এই কষ্ট পাইতেছ। এই জন্মে ভাল করিয়া ভক্তি করিয়া পতিসেবা কর, পরজন্মে আবার ভাল হইবে। আমি চলিলাম—তুমি পিতৃহীন ছিলে, মাতৃহীনও হইলে। এখন আর কে তোমার আশ্রয় রহিল মা? আমার এ অনুরোধ না রাখিলে পরলোকে আমি শান্তি পাইব না।"

সরোজা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"মা, অত করিয়া বলিতে হইবে না। আমি তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিব।"

সরোজার মাতার মৃত্যু হইল। শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া যথাসময়ে এক রকম করিয়া সম্পন্ন হইল।

কিছুদিন পরে বাড়ীঘরের বন্দোবস্ত করিয়া, সতীশকে লইয়া সরোজবাসিনী বাঁকীপুরে যাত্রা করিলেন। পৌঁছিয়া, একেবারে গিয়া শ্রীবিলাসের বাসায় উঠিলেন। শ্রীবিলাস তখন কাছারিতে। চাকর-বাকেরেরা, "মা-জী" আসিয়াছেন দেখিয়া সসম্ভ্রমে প্রণাম করিল। তিনিও তাহাদিগকে যথাযোগ্য কুশল প্রশ্নাদি করিয়া আপ্যায়িত করিলেন। বাড়ী ঘর দুয়ারের আর সে শ্রী নাই—দেখিয়া সরোজার চক্ষে জল আসিল। কোথাকার জিনিষ কোথায় পড়িয়া আছে তাহার ঠিকানা নাই। বিছানাগুলোর আচ্ছাদন নাই। আলমারি, টেবিল, সিন্দুক, বাক্স ধূলায় বুজিয়া গিয়াছে। দেওয়ালের ছবিগুলায় মাকড়সার জাল। ঘরের কোণে তামাকের গুল, ছাই ছড়ান। উঠানে ঘাস গজাইয়াছে। একদিকটা ত একেবারে জঙ্গল বলিলেই হয়। দাসদাসীরা আপনা হইতে এ সব করে না,—কেহ তাহাদিগকে করিতে বলেও না। সরোজবাসিনী তাহাদিগকে লইয়া কায করিতে লাগিয়া গেলেন। সমস্ত ঝাড়িয়া ধুইয়া মুছিয়া সাজাইয়া যথাসম্ভব পারিপাট্যবিধান করিলেন। ঘটী বাটী ইত্যাদি ব্যবহারের জিনিষগুলা মাজাইয়া ঘসাইয়া তকতকে ঝকঝকে করিয়া ফেলিলেন। তাহার পর বেলা পড়িলে রসুই-ঘরে গিয়া স্বহস্তে নানাপ্রকার জলখাবার প্রস্তুত করিলেন। পাণ সাজিয়া কাপড় বদলাইয়া, স্বামীসম্ভাষণের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। মনে হইল, সে সব দিনে মিলনের এইরূপ অনতিপূর্ব্বে কি উৎকণ্ঠা, কি হর্ষ,

কি চঞ্চলতা আসিয়া বুকের ভিতর দৌরাত্ম্য করিত! আর আজ এ কি ভাব! ভাবিতে ভাবিতে সরোজার মুখখানি যেন মেঘ করিয়া আসিল।

শ্রীবিলাস কাছারি হইতে ফিরিলেন। প্রথমেই বাহিরে সতীশের সাক্ষাৎ পাইয়া সমস্ত অবগত হইলেন। বাড়ীতে প্রবেশ করিবেন—পা যেন উঠে না!

সরোজার সঙ্গে দেখা হইল। উভয়ের তখনকার মনের ভাব কে বর্ণনা করিবে? অনেক পুরাতন কথা মনে আসিয়া উভয়ের চক্ষে জল বহাইল। সেই রাত্রি সে দম্পতির কি ভাবে কাটিল কে বলিতে পারে? দিনের দিন দিন গেল, সংসার চলিতে লাগিল; কাহারও মনে সুখ নাই, মুখে হাসি নাই; অথচ উভয়ে স্বামী স্ত্রী সাজিয়াই সংসার করিতে লাগিল।

আমার পাঠকেরা না হউন্, পাঠিকারা নিশ্চয়ই শ্রীবিলাসের কৃত দুষ্কর্মের প্রতিফল-স্বরূপ তাহার জীবনব্যাপী যন্ত্রণার চিত্র দেখিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। কিন্তু তাহা হইতে পাইল না। শ্রীবিলাসের নবপরিণীতা বধূটি বঙ্গদেশের এক নিভৃত গ্রামে, জ্বরে ও প্লীহায় ভুগিতেছিল। হঠাৎ একদিন তাহার মৃত্যু সংবাদ আসিল।

শ্রীবিলাস বিবাহ করিয়া অবধি শুভদৃষ্টির বস্ত্রাবরণ মধ্যে ভিন্ন সে স্ত্রীর সাক্ষাৎ পান নাই। ফুলশয্যার রাত্রে কম্প দিয়া তাহার ও ভারি জ্বর আসিয়াছিল। তাহার মৃত্যুতে শ্রীবিলাসের কোনও কষ্ট হইবার কথা নহে। আমাদের সরোজবাসিনীও আদর্শ রমণী নহেন; তিনি সপত্নীর মৃত্যু সংবাদে খুসী হইয়া দাস দাসীকে বখ্‌সিস্ এবং দেবতাকে হরিনুট দেন নাই বটে;—কিন্তু তাহার পর হইতে হাসিতে গল্পেতে মনের প্রফুল্লতা ও লঘুভাবের যথেষ্ট পরিচয় দিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। ইহা দেখিয়া শ্রীবিলাসেরও অনুতাপক্লিষ্ট মুখমণ্ডলের বিবর্ণতা দিন দিন দূর হইতে লাগিল।

এখন হইতে এই দম্পতি, প্রত্যেক উপকথার নায়ক নায়িকার মতই, সুখে ঘর সংসার করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রভেদ এই যে, শ্রীবিলাস এখনও রাজ্যলাভ করিতে পারেন নাই; এবং শত পুত্রের একটি মাত্র এ পর্য্যন্ত পৃথিবীর আলোক দর্শন করিতে পাইয়াছে।

[বৈশাখ, ১৩০৫]

বেনামী চিঠি

প্রথম পরিচ্ছেদ

কত সামান্য তুচ্ছ ঘটনার মূলভিত্তির উপর কত বড় বড় ব্যাপারের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা চিন্তা করিলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। কথিত আছে, কোনও দেশের রাজা মৃগয়া করিতে যাইবার মানসে ভৃত্যকে অশ্ব সজ্জিত করিতে আজ্ঞা দেন। ভৃত্য যখন এই কার্য্যে ব্যস্ত ছিল, তখন তাহার শিশুপুত্র আসিয়া মিঠাই খাইবার জন্য মহা আব্দার আরম্ভ করে। পিতা বিরক্ত হইয়া পুত্রকে চপেটাঘাত করিল, ইহাতে সেই ক্রুদ্ধ শিশু একটা বংশদণ্ড তুলিয়া পিতার পদে নিক্ষেপ করিল। আঘাতের যন্ত্রণায় ও মনের বিরক্তিতে ভৃত্য ভাল করিয়া জিন কষিতে পারিল না। এই ত্রুটিবশতঃ মৃগয়াকালে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া গিয়া রাজার মৃত্যু হয়। পরবর্ত্তী রাজাটি ভয়ানক অত্যাচারী হইল। দেশসুদ্ধ লোক তাহার কু-শাসনে অশ্রুপাত করিতে লাগিল। অবশেষে একটা ভয়ঙ্কর বিদ্রোহ উপস্থিত হইল, সহস্র সহস্র লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইল, শত শত গৃহ দগ্ধ হইয়া গেল,—এক কথায়, রাজ্যটা লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল। এখন এত বড় একটা ব্যাপারের মূল কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে, সেই সাহসপুত্রের সন্দেশ খাইবার লোভে আসিয়া পৌঁছিতে হয়!—আমাদের এই আখ্যায়িকাটিতেও একটি সামান্য ঘটনায় একটি বৃহৎ ফল ফলিয়াছিল। বুদ্ধিহীনা বালিকার লিখিত একখানি দুই তিন ছত্র বেনামী চিঠিতে, একটি মনুষ্যজীবনের গতি আশ্চর্য্যরূপে ভিন্নদিকে ধাবিত হইয়াছিল। যাহা হউক, এখন

গল্প আরম্ভ করি।

আজ প্রায় দুই বৎসর হইল রামসুন্দরের বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু অহো দুর্ভাগ্য!—সে এখন পর্য্যন্ত একটিবারও শ্বশুরবাড়ী যাইতে পাইল না। সে যখন বি-এ শ্রেণীর ছাত্র, তখন তাহার বিবাহ হয়। তখন পরীক্ষা সন্নিকট বলিয়া "যোড়ে" শ্বশুরবাড়ী যাওয়া হয় নাই। বিবাহের কিছুদিন পরে, তাহার শ্বশুর সপরিবারে নিজ কর্ম্মস্থান এলাহাবাদে ফিরিয়া যান। জ্যৈষ্ঠ মাসে জামাইষষ্ঠী উপলক্ষে যথাসময়ে নিমন্ত্রণ আসিল। সে বৎসর উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে দারুণ গ্রীষ্ম;—কলেরা ও বসন্ত সেই দিকটাতেই নিজেদের দিগ্বিজয়ের শিবির স্থাপনা করিয়াছিল। সংবাদপত্রের স্তম্ভ হইতে এই সমাচার প্রাপ্ত হইয়া রামসুন্দরের পিতা পুত্রকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাইতে আপত্তি করিলেন। তাহার পর পূজার ছুটির সময় আবার যথারীতি নিমন্ত্রণ আসিল। কিন্তু রামসুন্দর জ্বরে পড়িল, যাওয়া হইল না। জ্যৈষ্ঠ মাসে জামাইষষ্ঠীর দিন আবার নিকটে আসিতে লাগিল। এবার রামসুন্দর যাইবেই। এবার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বেশ বৃষ্টি হইতেছে; কোনও প্রকার রোগের উপদ্রব নাই। এবার আর রামসুন্দরের আশালতা পুষ্পিত হইতে বাকী থাকিবে না। কলিকাতা হইতে আসিবার সময় সে একখানা 'টাইম-টেবিল' সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল। সেই টাইম-টেবিলখানি এখন তাহার "বেদ"—অথবা একালের এঁচোড়ে পাকা ছেলেদের "গীতা" হইয়া দাঁড়াইল। রাত্রি দশটার সময় হুগলিতে গাড়ী চাড়িতে হইবে। ছাড়িবার পূর্ব্বে, "অমুক সময়ে পৌঁছিতেছি" বলিয়া এলাহাবাদে একখানা টেলিগ্রাম্ পাঠাইতে হইবে। তাহার পর গাড়ীতে উঠিয়া উপরের বঙ্কে বিছানা পাতিয়া নিদ্রা;—নিদ্রা হইবে কি? গ্রীষ্মকালের রাত্রে রেলপথে ভ্রমণ কি আরামদায়ক। কি সুন্দর শীতল বায়ু! তাহার উপর রজনী যদি চন্দ্রালোকিত হয়!—মোকামায় গিয়া প্রভাত হইবে। তখন এক পেয়ালা গরম গরম চা। নিশ্চয়ই খুব আরাম হইবে। বেলা দুইটার সময় এলাহাবাদে পৌঁছান যাইবে।—ইত্যাদি প্রকারে রামসুন্দর-মিস্ত্রী কল্পনার মালমসলায় আকাশে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে ব্যস্ত রহিল। কিন্তু হরি হরি, সব পণ্ড হইয়া গেল! যাত্রার অবধারিত দিনের কিয়ৎপূর্ব্বে রামসুন্দরের মাতার ভয়ানক জ্বর।—আর যাওয়া হইল না। আমরা রামসুন্দরের প্রতি অবিচার করিব না। সে এমন কথা ভাবে নাই, আমি যাত্রা করিলে পর তখন মার জ্বর হইল না কেন? অথবা আমার যাত্রা করিবার দিন আরও কিছু পূর্ব্বে ধার্য্য হয় নাই কেন?—সে প্রাণপণে জননীদেবীর সেবা করিল। শ্বশুরবাড়ী যাওয়া হইল না, ইহার দরুণ কোনও ক্ষোভ কোনও অসন্তোষ তাহার মনে স্থান পাইল না। রামসুন্দরের মাতা আরোগ্যলাভ করিলেন। গ্রীষ্মাবকাশ ফুরাইয়া আসিল। এখন রামসুন্দর আইন পড়িতেছিল, বাক্স বিছানা পুস্তকাদির তল্পী বাঁধিয়া পুনরায় কলিকাতা যাত্রা করিল।

কলেজে তাহার সহপাঠী বিবাহিত বন্ধুরা আসিয়া নিজের নিজের শ্বশুরবাড়ীর গল্প ফাঁদিল। রামসুন্দর তাহাদের গল্পে নিজের কোনও অভিজ্ঞতা যোগ করিতে পারিল না। মাঝে মাঝে বিদ্রূপের বাণ আসিয়া তাহার মস্তকে পড়িতে লাগিল। সে মুখটি চূণ করিয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত ছুরীর অগ্রভাগ দিয়া পেন্সিলের মস্তকে নিজ নামের আদ্যাক্ষরটি খোদিত করিয়া সময় কাটাইল।

এ বৎসর রামসুন্দরের আইন পরীক্ষা। পূজার ছুটীর পূর্ব্বে বাড়ীতে লিখিয়া পাঠাইল, "পরীক্ষা নিকট, পড়াশুনার চাপ অত্যন্ত অধিক, এবার বাড়ী যাইব না।" রামসুন্দরের জননী ইহাতে প্রথমে আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে আপত্তি টিকিল না। ছুটীতে রামসুন্দরের মেসের বাসার সকলে স্ব স্ব গৃহে গমন করিল; রামসুন্দর একা হইয়া পড়াশুনা করিতে লাগিল। দুই চারি দিন এইরূপে কাটিলে, একদিন ভোরের বেলায় নিদ্রাভঙ্গের পর বিছানায় পড়িয়া হঠাৎ তাহার মস্তকে একটা মৎলবের আবির্ভাব হইল, একবার এই ফাঁকে এলাহাবাদ সহরটা দেখিয়া আসিলে হয় না?—সেদিন প্রভাতে

আর তাহার পড়াশুনা কিছুই হইল না। কেবল "যাব কি যাব না"—এই ভাবনায় মগ্ন রহিল। অবশেষে যাইবার পরামর্শই স্থির করিল। আহারান্তে বাজারে বাহির হইয়া স্ত্রীর জন্য নানাপ্রকার সাবান, চিরুণী, এসেন্স, সুগন্ধি তৈল, লতা-পাতা-ফুল-আঁকা চিঠির কাগজ ও খাম, দুই একখানি গল্পের ও কবিতার বহি এবং আরও কত কি সব আমাদের স্মরণ নাই—ক্রয় করিল। সন্ধ্যার পর হাওড়ায় গিয়া, যাত্রা করিবার সংবাদ এলাহাবাদে টেলিগ্রাম করিয়া, ডাকগাড়ীতে আরোহণ করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যথাসময়ে রামসুন্দর এলাহাবাদে পৌঁছিয়াছে। তাহার শ্বশুর স্বয়ং ষ্টেশনে সাদর সম্ভাষণে প্রাণাধিক জামাতাকে গৃহে লইয়া গিয়াছেন। রামসুন্দরের শ্বশুরের নাম নিমাই বাবু। সেকালের অনেক লোকে নিজ নাম অদ্ভুত রকমে ইংরাজিতে বানান করিয়া থাকেন,—ইঁহারও নিজের নাম Nemye Loll এইরূপ লিখিতেন। নিমাইবাবু বাল্য-কালে মিশনারী স্কুলে পড়িতেন, কিঞ্চিৎ সাহেবী ধরণের লোক। ষ্টেশনে গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া রামসুন্দর হ্যাট্‌কোটধারী শ্বশুরকে প্রথমে চিনিতেই পারে নাই, বিবাহের রাত্রে তাঁহাকে নামাবলী গায়ে দিয়া কন্যা সম্প্রদান করিতে দেখিয়াছিল কি না! তাহার পর চিনিতে পারিয়া যখন তাঁহাকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইল, তখন তিনি তাহাকে বাধা দিয়া শেক্‌হ্যাণ্ড করিলেন। নিমাইবাবু ইংলিশ ডিনারের ভয়ানক পক্ষপাতী, মোগল-ডিসগুলির প্রতিও তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ অল্প ছিল না। কিন্তু তাঁহার সাহেবিয়ানা বন্ধুসমাজে ও বৈঠকখানায়; অন্তঃপুরে তাহা মোটেই প্রশ্রয় পাইত না। সেখানে তিনি যতক্ষণ থাকিতেন, "জুজুটি" হইয়া থাকিতেন।

রামসুন্দর নূতন শ্বশুরবাড়ী আসিয়া খুব আমোদে দিন কাটাইতেছে। তাহার স্ত্রীর কোনও সহোদর বা সহোদরা ছিল না; কিন্তু খুড়তুতো ও পিস্‌তুতো একটি দুইটি তিনটি শ্যালিকা-রত্ন সমস্তদিন তাহাকে খেলার পুতুল করিয়া তুলিল। এই তিনটির মধ্যে বড়টির সম্প্রতি বিবাহ হইয়াছিল, অপর দুইটির মধ্যে একটির দুধে দাঁত ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছিল, অন্যটির মাথায় একগাছিও চুল ছিল না। সম্প্রতি রোগশয্যা হইতে উঠিয়া তাহার এ বিপত্তি ঘটিয়াছিল। রামসুন্দরের বড় শ্যালিকাটি চিরদিনই বাঙ্গালা দেশের বাহিরে—তথাপি তাহার সংবাদ পাইতে বাকী ছিল না যে, ভগ্নীপতির সঙ্গে ঠাট্টা তামাসা করিতে হয়। অতএব সে এই কর্ত্তব্যভার স্বীয় মস্তকে গ্রহণ করিতে নিমেষ-মাত্রকাল বিলম্ব করিল না। ছোট বোন দুইটিকে লইয়া সে একটি ফৌজ গঠন করিয়া, রামসুন্দরের ভগ্নপতিত্ব-দুর্গে অবিশ্রান্তভাবে আক্রমণ আরম্ভ করিল। পাণের ভিতর সুপারির পরিবর্ত্তে কয়লার গুঁড়া ভরিয়া দিয়া, জলের গেলাসে লবণ মিশাইয়া দিয়া, আল্‌তা গুলিয়া চা করিয়া দিয়া, রুমালে বাঁধা পোর্টম্যান্টোর চাবি হরণ করিয়া লইয়া এমন কি জুতা একপাটি পর্য্যন্ত লুকাইয়া রাখিয়া রামসুন্দরকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। পরিবারস্থ একটি সুরসিকা, পরিচিত তাবৎ দম্পতির নামে ছড়া বাঁধিয়াছিলেন:—রামসুন্দর ও তাহার পত্নীর নামেও বাঁধিয়াছিলেন। সেই ছড়াটি তিনজনে সমস্বরে আবৃত্তি করিয়া কিছুতেই ক্লান্তি মানিল না। পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণার্থ সেই ছড়াটি এখানে বলিতেছি।

বেল ফুলের গড়ে মালা
রামসুন্দরের সুরবালা!

এই কাহিনীর অন্যান্য কবিতায় তাঁহার আরও অদ্ভুত রচনা-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। জগতের হিতার্থে তাহার দুই একটির নমুনা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

১। আমার কি হৈল
অক্ষয়ের শৈল।

২। আমি কি হয়েছি কালা (!)

যতীশের নগেন্দ্রবালা।

এইরূপে জ্বালাতন হইয়া, রামসুন্দর তাহার বড় শ্যালিটিকে বিরক্ত করিবার এক অভিনব উপায় অকস্মাৎ আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। এই বালিকাটির নাম চিরদিনই ডেমি ছিল, কিন্তু বিবাহের পর হইতে সে হঠাৎ ইন্দুবালা হইয়া গিয়াছে। এই নূতন নাম পুরাতন মেয়েটিকে মানাইয়া লইবার জন্য বাড়ীর লোকেরা প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে সর্ব্বদাই তাহাকে ইন্দুবালা বলিয়া ডাকিতেন। রামসুন্দর তাহাকে দুই একবার ডেমি বলিয়া ডাকিল, তাহাতে ইন্দুবালা কিঞ্চিৎ ক্রোধের সহিত আপত্তি জানাইল। রামসুন্দর আর ছাড়িবে কেন? সে তাহাকে ক্রমাগত ডেমি বলিতে লাগিল। ইহাতে সেই দাঁতপড়া মেয়েটির পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল; সে এবং তাহার অনুকরণে ছোট মেয়েটি "ডেমি-ড্যাম্-ডেমি" এই পুরাতন বিস্মৃতপ্রায় খ্যাপানটি সুর করিয়া উচ্চস্বরে বলিতে বলিতে বাহু তুলিয়া তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করিল। "কণ্টকেনৈব কণ্টকং" এই নীতিবাক্যের সার্থকতা দেখিয়া রামসুন্দর মনে মনে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিল। ইন্দুবালা প্রথম প্রথম অন্তঃপুরে গিয়া নালিশ করিতে লাগিল। কিন্তু তত্রস্থ ধর্ম্মাধিকরণেরা হাসিয়া এই মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করিতে লাগিলেন। ইহাতে বালিকার অভিমান অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। সে কাঁদিয়া ফেলিল, তাহাতে রামসুন্দর কিছু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল।

সে দিন গেল। পর দিন আবার এই অভিনযের সূত্রপাত হইল। আর কিন্তু ডেমি অন্তঃপুরে নালিশ করিতে গেল না। সে কিছুদিন পূর্ব্বে একখানি গল্পের বহিতে পড়িয়াছিল, কোনও লোক তাহার শ্বশুরবাড়ীতে অবস্থান করিতে করিতে বিলাত পলাইয়া যাইবার আয়োজন করে। তাহার পিতা মাতা ইহা জানিতে পারিয়া সময়মত আসিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করেন। এই ঘটনা উপলক্ষে জামাইবাবুর নাকাল্লের শেষ থাকে নাই। ইন্দুবালা ভাবিয়া চিন্তিয়া ঘরে খিল বন্ধ করিয়া এক টুক্‌রা কাগজে বামহস্তে লিখিল :—

"তোমার ছেলে বিলাত পলাইয়া যাইবার আয়োজন করিয়াছে, সাবধান।"

এই কাগজখানি খামে ভরিয়া, রামসুন্দরের পিতার নামে ঠিকানা দিয়া দাসীহস্তে ডাকঘরে পাঠাইয়া দিল। পত্র তৃতীয় দিবসে বেলা দশটার সময় রামসুন্দরের পিতার হস্তগত হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রামসুন্দরের পিতার নাম হরিবল্লভবাবু। লোকটি সম্পূর্ণ সে কালেরও নহেন, এ কালেরও নহেন। সামান্য ইংরাজি জানেন। বয়স পঞ্চাশ। পূর্ব্বে কোথাকার নীল-কুঠিতে চাকরি করিতেন। শুনা যায় সে কার্য্যটিতে তাঁহার বেশ 'দু পয়সা' ছিল। এই 'দু পয়সা' সম্বন্ধীয় কি গোলযোগে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে কর্ম্মত্যাগ করিতে হয়। এখন বাড়ীতে বসিয়া বিষয় কর্ম্ম দেখিতেছেন। পৈতৃক ও স্বোপার্জ্জিত জমিদারী সম্পত্তির আয় হইতে সংসারটি বেশ চলিয়া যায় এবং "কোম্পানির" কাগজের সংখ্যা প্রতি বৎসর বৃদ্ধিই হইতে থাকে।

হরিবল্লভবাবু বৈঠকখানার ঘরে বসিয়া ঘোষেদের কন্যা-বিবাহের একটা ফর্দ্দ করিয়া দিতেছিলেন। এমন সময় উল্লিখিত পত্রখানি তাঁহার হাতে পৌঁছিল। খুলিয়া পাঠ করিয়া তাঁহার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তৎক্ষণাৎ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া এ সংবাদ গৃহিণীকে অবগত করাইলেন। তিনি ত ইহা শুনিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে পাড়াময় এ কথা রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। প্রতিবেশী, বন্ধু, আত্মীয় স্বজন অনেকগুলি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলেই বৃদ্ধকে পরামর্শ দিলেন, আর ক্ষণ-

মাত্রও বিলম্ব করা উচিত নহে, কলিকাতায় গিয়া, যাহাতে ছেলেকে পাওয়া যায়, সেই চেষ্টা করিতে হইবে। তৎক্ষণাৎ পাল্কী বেহারা ডাকিতে লোক ছুটিল। অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত প্রস্তুত। রামসুন্দরের পিতা অস্নাত ও অভুক্ত অবস্থাতেই যাত্রা করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। পাড়ার ভদ্রলোকদের অনুরোধে তাহা আর হইতে পাইল না। হরিবল্লভবাবু গৃহদেবতাকে সজলনেত্রে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া কলিকাতা যাত্রা করিলেন। গৃহিণী বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন, যদি মা কালী মা দুর্গার ইচ্ছায় এখনও সে বিলাত না গিয়া থাকে, তবে যেন তাহাকে বাড়ীতে আনা হয়; আর ছাই ইংরাজি পড়িয়া কায নাই, বামুনের ছেলে ঠাকুরপূজা করিয়া খাইবে।

হরিবল্লভবাবু কলিকাতায় পৌঁছিয়া রামসুন্দরের বাসা খুঁজিয়া বাহির করিলেন। দরজায় চাবি বন্ধ। পাশে একটি মুসলমান দোকানদার ছিল, সে বলিল, ছুটিতে সব বাবুরাই চলিয়া গিয়াছেন, কেবল একটি বাবু ছিলেন, কয়দিন হইতে তাঁহাকেও দেখিতে পাইতেছি না।

বৃদ্ধ হরিবল্লভের দুই চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। ছেলে যে বিলাত গিয়াছে, এ বিষয়ে আর তাঁহার কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না। এমনটা যে হইবে, তাহা কি তিনি কখনও স্বপ্নেও ভাবিয়াছিলেন? এত কাল বুকের রক্ত দিয়া যাহাকে পোষণ করিয়াছেন, সে তাঁহার এই বৃদ্ধ দশায় বুকে শেল মারিয়া বিলাত চলিয়া গেল? ভাবিলেন—আর কি সে বাঁচিয়া থাকিয়া ফিরিয়া আসিবে? যদি ফিরিয়া আসে তবে জাতিচ্যুত, সমাজচ্যুত হইয়া আসিবে; তাহাকে আর ঘরে রাখিতে পারিব না—শ্রাদ্ধের পর্য্যন্ত সে অধিকারী থাকিবে না। হয় ত একটা খৃষ্টানীকে বিবাহ করিয়া আনিবে;—এমনও ত অনেক লোকে করিয়াছে। সকলই ইংরাজি শিক্ষার দোষ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ভাবিলেন, রামসুন্দর যখন প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, সেই সময় গ্রামের স্কুলে যে মাষ্টারিটি যুটিয়াছিল, তাহা করিতে দিলে কলিকাতায় আসিয়া কুসংগে পড়িয়া ছেলেটি খারাপ হইত না। বাসার দরজার বাহিরে দুই ধারে যে ইষ্টক নির্ম্মিত দুইটি বসিবার স্থান আছে, সেইখানে বসিয়া বৃদ্ধ ব্যথিতমনে এই সমস্ত চিন্তা ও অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। তখন উঠিয়া ধীরপদে আশ্রয়ের সন্ধানে বাহির হইলেন। তাঁহার এক বাল্যসখা জীবনকৃষ্ণবাবু হাইকোর্টে ওকালতী করিতেন বাসা বাগবাজারে. তাঁহারই কাছে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

বন্ধুর সংগে বন্ধুর অনেককালের পর সাক্ষাৎ হইল। পরস্পর কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসার পর, হরিবল্লভবাবু নিজের বিপদের কাহিনী আদ্যোপান্ত বিবৃত করিলেন। জীবনকৃষ্ণবাবু সমস্ত শুনিয়া নীরবে কিয়ৎকাল চিন্তা করিলেন। পরে বলিলেন—"আচ্ছা, বিলাত যে গেল, টাকা পাইল কোথায়?" হরিবল্লভ বলিলেন—"টাকা কোথায় পাইল, তাহা ত আমিও কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।" জীবনকৃষ্ণবাবু বলিলেন—"বিলাত যাওয়া ত মুখের কথা নহে, বিস্তর টাকার প্রয়োজন। তা ছাড়া, সেখানে ত অবশ্য পড়িতে গিয়াছে. সেখানে তাহার খরচ যোগাইবে কে?"—এই কথাটা শুনিয়া হরিবল্লভবাবু যেন কতকটা আশ্বস্ত হইলেন। তখন তাঁহার মনে হইল ইহার ভিতর নিশ্চয়ই কিছু গোলযোগ আছে। পকেট হইতে বেনামী চিঠিখানা বাহির করিয়া, জীবনকৃষ্ণবাবুর হাতে দিলেন। জীবনকৃষ্ণবাবু পত্রখানি টেবিলের উপর রাখিয়া, দেরাজ হইতে চশমাটি বাহির করিলেন। বাতিটা একটু উজ্জ্বল করিয়া দিয়া চশমাটি সাবরের চামড়ায় বেশ করিয়া মুছিলেন। চশমা পরিয়া উকীলোচিত গাম্ভীর্য্যের সহিত পত্রখানি অত্যন্ত সাবধানে পাঠ করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ হাতের লেখা কার, তাহা তুমি কিছু আন্দাজ করিতে পার? অবশ্য বাম হাতের লেখা।"—হরিবল্লভবাবু "না" উত্তরসূচক শিরশ্চালন করিলেন। আরও কিছুক্ষণ গেল। জীবনকৃষ্ণবাবু বলিলেন—"ছেলের বিবাহ দিয়াছিলে এলাহাবাদে না?" হরিবল্লভবাবু বলিলেন—"হাঁ। কেন বল দেখি?"—জীবনবাবু উত্তর করিলেন. "পত্র

এলাহাবাদ হইতে আসিয়াছে। এই দেখ এলাহাবাদের ছাপ রহিয়াছে।"

হরিবল্লভবাবু সাগ্রহে বলিলেন—"তবে ত সে নিশ্চয়ই এলাহাবাদে গিয়াছে।"

জীবনবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—"শুন। হয় ত এ চিঠির কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা। কোনও লোকের দুষ্টামি। কিন্তু তথাপি রামসুন্দর হঠাৎ বাসা ছাড়িয়া নিরুদ্দেশ হইয়া কোথায় চলিয়া গেল, তাহার মীমাংসা হয় না। নহে ত সে বিলাত যাইবার বাস্তবিকই আয়োজন করিয়াছে। পত্রে এ কথা বৌমাকে লিখিয়া থাকিতে পারে কিম্বা হয় ত এই মুহূর্ত্তে সে এলাহাবাদেই অবস্থান করিতেছে।"

হরিবল্লভবাবু প্রস্তাব করিলেন,—"তবে এলাহাবাদে টেলিগ্রাফ্ করিয়া দিই, যাহাতে সে না যাইতে পারে।" জীবনবাবু বলিলেন,—"পূর্ব্বে সংবাদ লওয়ার প্রয়োজন, সে এলাহাবাদে আছে কি না।" হরিবল্লভবাবু ইহাই উচিত বিবেচনা করিলেন। বলিলেন—"যদি এলাহাবাদে থাকে, তবে আবার টেলিগ্রাফ্ করিয়া দিব যাহাতে বিলাত না যাইতে পারে, এবং কল্যকার ডাকগাড়ীতে আমি স্বয়ং এলাহাবাদে গিয়া ছেলেকে ফিরাইয়া আনিব।"

তৎক্ষণাৎ নিমাইবাবুকে আর্জ্জেণ্ট টেলিগ্রাম্ প্রেরিত হইল—"রামসুন্দর ওখানে আছে কি না এবং কেমন আছে।"

জীবনকৃষ্ণবাবু বলিলেন—"যদি সে বাস্তবিকই বিলাত যাইবার ইচ্ছা করিয়া থাকে, তবে পথের মাঝে এলাহাবাদ, ওখানে না হইয়া কখনই যাইবে না। আজকালকার ছেলে কি না! —যদি এখনও না গিয়া থাকে, তবে আবার টেলিগ্রাফ্ করিয়া এলাহাবাদে তাহাকে আটক করান যাইবে। আর যদি কোনও উপায়ে জাহাজের ভাড়া সংগ্রহ করিয়া যাত্রা করিয়া থাকে তবে তাহার পড়িবার খরচ তোমাকে যোগাইতেই হইবে। অদৃষ্টে থাকে ত ছেলেটা মানুষ হইয়া আসিবে।"

তখন রাত্রি নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। জীবনকৃষ্ণবাবুর বারম্বার অনুরোধে হরিবল্লভবাবু হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিয়া সন্ধ্যার্চ্চনায় মনোনিবেশ করিলেন।

আহারাদি শেষ হইতে এগারোটা বাজিয়া গেল। এই সময়ে এলাহাবাদ হইতে উত্তর আসিল—"রামসুন্দর এখানে আছে। ভাল আছে।"

বৃদ্ধ হরিবল্লভ এ সংবাদ পাইয়া আনন্দের অশ্রুধারা রোধ করিতে পারিলেন না। জীবনবাবুর হাতটি ধরিয়া বলিলেন—"ভাই, তুমি আজ আমার প্রাণদান দিলে। আজ আমার যে উপকার করিলে, তাহা আমি এজন্মে বিস্মৃত হইতে পারিব না। ঈশ্বর তোমাকে ধনে পুত্রে লক্ষ্মীশ্বর করুন।"

জীবনকৃষ্ণবাবু হাসিয়া বলিলেন—"আমি আর তোমার উপকারটা কি করিলাম?" হরিবল্লভ বলিলেন,—"বিলক্ষণ! তুমি না পরামর্শ দিলে ও সব বুদ্ধি কি আমার পাড়াগেঁয়ে মাথায় প্রবেশ করিত?"

তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয়বার এলাহাবাদে আর্জ্জেণ্ট টেলিগ্রাফ প্রেরিত হইল—"রামসুন্দর বিলাত পলাইবার আয়োজন করিয়াছে। তাহাকে আটক কর। আমি আসিতেছি।"

ইহার পর দুই বন্ধু রাত্রের মত পরস্পরের নিকট বিদায় লইয়া শয্যাশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মানসিক উৎকণ্ঠাবশতঃ সমস্ত রাত্রি হরিবল্লভবাবুর নিদ্রা হইল না বলিলেই হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পরদিনের প্রভাত বড় সুন্দর হইয়া এলাহাবাদ সহরে দেখা দিয়াছে। পূর্ব্বদিনের মেঘ ও বৃষ্টি একেবারে অন্তর্হিত। রামসুন্দর প্রাতর্ভ্রমণের পর ফিরিল। তখন বেলা ৭টা হইবে। বৈঠকখানার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, তাহার শ্বশুরমহাশয় সেই মাত্র চা পান শেষ করিয়া আরামকেদারায় বসিয়া চুরুট সেবা করিতেছেন এবং একখানি সংবাদ-

পত্র পাঠ করিতেছেন।

রামসুন্দর তাঁহার কাছের চেয়ারখানিতে উপবেশন করিল। জামাতাকে দেখিয়া নিমাইবাবু সংবাদপত্রখানি টেবিলে রাখিয়া দিলেন। লেংলগ চশমাটি ঠিক করিয়া, চুরুটটি দন্তে দংশন করিয়া, ইংরাজি ভাষায় বলিলেন—"তুমি বিলাত যাইবার ইচ্ছা করিয়াছ? বেশ ত—অতি উত্তম কথা।"

রামসুন্দর ইহার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া বোকার মত চাহিয়া রহিল।

নিমাইবাবু স্বীয় জামাতার ভাবী পদগৌরব কল্পনায় সূচিত করিয়া হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন, এবং সেই উচ্ছ্বাসে কেবল ইংরাজি কথাই বলিতে লাগিলেন। আমরা তাহার বঙ্গানুবাদগুলিই নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

জামাতাকে নিরুত্তর দেখিয়া নিমাইবাবু বলিলেন—"আমার কাছে আর লুকাও কেন? আমি সকলই জানিতে পারিয়াছি। তুমি যে বিলাত যাইবার কল্পনা করিয়াছ, তাহাতে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। তুমি খরচের কি বন্দোবস্ত করিয়াছ জানি না, হয় ত বিলাতে পৌঁছিয়া পিতাকে সংবাদ দিলে, তিনি খরচ না দিয়া থাকিতে পারিবেন না, ইহাই ভাবিয়াছ। এইরূপ কেহ কেহ করিয়াছে শুনিতে পাই। তোমার পিতা দায়ে পড়িয়া তোমাকে খরচ যোগাইবেন সত্য, কিন্তু তোমার আচরণে তিনি দুঃখিত ও রুষ্ট হইবেন। তাহাতে কায নাই। আমি তোমার সমস্ত খরচের ভার লইলাম।"

রামসুন্দর এ সমস্ত কথা শুনিয়া অবাক হইয়া রহিল। আকাশ পাতাল ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। প্রথমে মনে হইয়াছিল, শ্বশুর বুঝি পরিহাস করিতেছেন। কিন্তু বিশেষ মনোযোগ দিয়া দেখিয়া তাঁহার মুখে কথাবার্ত্তার ভঙ্গিতে সে ভাবের কণিকামাত্রও লক্ষিত হইল না। উত্তরে সে যে কি বলিবে কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। নিমাইবাবু উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া আবার বলিতে লাগিলেন—

"তোমরা নব্যসম্প্রদায়েরা শ্বশুরের টাকা লইতে নিতান্ত নারাজ, আমি তাহা জানি। আমাদের সময়ে এরূপ ছিল না। আমার শ্বশুর মহাশয়ই ত আমাকে খাওয়াইয়া পরাইয়া, লেখা পড়া শিখাইয়া, চাকরি করিয়া দিয়াছিলেন, তিনি তাহা না করিলে আমি এতদিন কোথায় থাকিতাম? আমার একটিমাত্র কন্যা। আমার যাহা কিছু আছে তাহা ভবিষ্যতে তোমার হইবে। তুমি তোমার নিজের টাকায় বিলাতের ব্যয় নির্ব্বাহ কর। আজকাল যে দিন সময় পড়িয়াছে, তাহাতে এখানে থাকিয়া আর কিছুই হয় না। সুতরাং মনে কোনও প্রকার দ্বিভাব করিও না।"

তখন রামসুন্দর মনে করিল, "বাঃ, এ ত দেখিতেছি ব্যাপার মন্দ নয়। শ্বশুরের অর্থে যদি একটা 'কেষ্ট-বিষ্ণু' হইয়া আসিতে পারা যায়, তবে সে সুযোগ ছাড়ে এমন হস্তিমূর্খ কে আছে? প্রকাশ্যে সাহস করিয়া গম্ভীরভাবে বলিল—"আমি বিলাত যাইব আপনি কেমন করিয়া জানিলেন?"

নিমাইবাবু পকেট হইতে টেলিগ্রাম দুইখানি বাহির করিয়া, হাসিতে হাসিতে রামসুন্দরের হাতে দিলেন। রামসুন্দর সে দুইটি আদ্যোপান্ত নিরীক্ষণ করিয়া ভাবিল—"আর কিছুই নয়, বাবা কোনও কার্য্য উপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়া আমাকে দেখিতে পান নাই। অনুসন্ধান করিয়াছেন, কেহ তাঁহাকে মিথ্যা কথা বলিয়া একটু মজা দেখিয়াছে। বাল্যকাল হইতে আমার বিলাত যাইবার ঝোঁক, ইহা তিনি অবগত আছেন, এইজন্য এ কথা সহজেই বিশ্বাস হইয়াছে। যাহা হউক, তিনি নিশ্চয়ই আমাকে ধরিতে আসিবেন। সুতরাং আর কাল-বিলম্ব করা উচিত নহে।" শ্বশুরকে বলিল—"বাবা ইহাতে রাগ করিবেন, মা কাঁদিবেন, এমন কায করা কি আমার উচিত?"

নিমাইবাবু একটু যেন উত্তেজিত স্বরে বলিলেন—"কোন্ পিতা কোন্ সন্তানের উপর রাগ না করেন? আর কান্না ত স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। তোমার পিতা এখানে আসিলে তাঁহাকে আমি ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিব। বলিব আমিই তোমাকে পাঠাই-

য়াছি, তোমার ইহাতে কোন দোষ নাই। বরং প্রথমে তুমি অসম্মত ছিলে। আর তাঁহার সহিত সুরবালাকে পাঠাইয়া দিব। তোমার মা বধূকে পাইয়া পুত্রবিচ্ছেদশোকে সান্ত্বনা লাভ করিবেন। যখন তুমি মনে জানিতেছ এ কায গর্হিত নয়, ইহার ভাবীফল সর্ব্বাংশে শুভই হইবে, তখন একটু আধটু অসুবিধা ও সেণ্টিমেণ্টালিটির জন্য কায হারান নিতান্ত বোকামি।"—এই পর্য্যন্ত বলিয়া, অল্প হাসির ভূমিকার সহিত বলিলেন —"আর তোমার উপর তোমার সে পিতার অপেক্ষা আমারই অধিকার বেশী—কারণ আমি হইলাম ফাদার্-ইন্-লা;—আমিই তোমার আইনসঙ্গত পিতা।" এই বলিয়া তিনি হোঃ—ওহ্—ওহ্ করিয়া উচ্চহাস্য করিলেন, এবং নির্ব্বাপিত চুরুট্টি পুনর্ব্বার প্রজ্জ্বলিত করিয়া স্বচ্ছন্দমনে সতেজে ধূমপান করিতে লাগিলেন।

সেই দিন বৈকালে দুই তিন ঘণ্টাকাল রামসুন্দর শ্বশুরের সহিত দোকানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পোষাক পরিচ্ছদ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করিল। সন্ধ্যার পর এক পরিচিত সাহেব ব্যারিষ্টারের নিকট নিমাইবাবু তাহাকে লইয়া গেলেন। তাঁহার কাছে বিলাতে বাস করা সম্বন্ধে নানাপ্রকার উপদেশ এবং কয়েকখানি পরিচয়-পত্র পাওয়া গেল। জাহাজে স্থান রাখিবার জন্য বোম্বাইয়ে টেলিগ্রাফ্ করা হইল। সেইদিন রাত্রেই তিনটার মেল-ট্রেণে রামসুন্দর সাহেব সাজিয়া যাত্রা করিল।

কোনওরূপ বিদ্রোহাশঙ্কায় এই সংবাদ অন্তঃপুরে প্রচারিত হইল না। নিমাইবাবু গৃহিণীকে বড়ই ভয় করিতেন। মেয়েরা জানিলেন, রামসুন্দর কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়াছে। কিন্তু পরদিনই হরিবল্লভবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন সকল কথা ফাঁস হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণের জন্য অন্তঃপুরে বিলক্ষণ কোলাহল উত্থিত হইল। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি, ইন্দুবালা এই ব্যাপারসম্বন্ধে একটি কথাও বলে নাই।

সুখের বিষয়, হরিবল্লভবাবুকে ঠাণ্ডা করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইল না। বেহাই তাঁহার পুত্রের জন্য অত টাকা খরচ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, বেহাইয়ের উপর রাগ করা অসম্ভব হইয়া পড়িল। বিশেষতঃ নিমাইবাবু এবং তাঁহার বন্ধুগণ বৃদ্ধকে ভাল করিয়া বুঝাইলেন, বিলাতে প্রবাসকালে অথবা পথে কোনও বিপদসম্ভাবনা নাই, কোনও ভয় নাই, কোনও চিন্তা নাই, কত লোক যাইতেছে ইত্যাদি।

পূর্ব্বপরামর্শমত সুরবালাকে তাঁহার সঙ্গে পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

উপসংহার

আমরা গল্পলেখকেরা বিধাতার বরে অনেক অসাধ্য সাধন করিতে পারি বটে, কিন্তু আমাদেরও ক্ষমতার একটা সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে। বিলাত-ফেরত ব্যক্তিগণ আমাদের গল্পের বিষয়ীভূত হইলে, তাঁহাদিগকে মিষ্টার ছাড়া অন্য কিছু বলা আমাদের সেই ক্ষমতা-সীমার অতীত। মিষ্টার রামসুন্দর বিলাত হইতে ফিরিয়া এলাহাবাদ হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন। দুই বৎসরেই বেশ পশার জমিয়া গিয়াছে। পিতা মাতা পুত্রের সম্পদে তাহার পূর্ব্বকৃত অপরাধ বিস্মৃত হইয়াছেন। একটা জাঁকাল রকমের প্রায়শ্চিত্ত ক্রিয়ায় সমাজও রামসুন্দরকে মার্জ্জনা করিয়াছে। আপাততঃ মার্জ্জনা করিয়াছে বটে কিন্তু কন্যার বিবাহের সময় কোনও গোল উঠিবে কিনা বলা যায় না। রামসুন্দর দেশের বাড়ীতে চাবি বন্ধ করিয়া পিতা মাতাকে মাঝে মাঝে লইয়া আসেন, কিন্তু এখানে অত্যন্ত গরম বলিয়া তাঁহারা অধিক দিন থাকিতে চাহেন না।

এক বেনামী চিঠিই যে তাঁহার বিলাত যাওয়ার মূলসূত্র, তাহা রামসুন্দর অনেক দিন জানিতে পারিয়াছে। কিন্তু কে যে তাহার লেখক, বহু চেষ্টাতেও আবিষ্কার করিতে পারে নাই। আমাদের পাঠিকাগণের প্রতি ইন্দুবালার বিশেষ অনুরোধ, যদি কখনও তাঁহারা নিমন্ত্রণ সমাজে তাহার সুরিদিদির সহিত মিলিত হন, তবে যেন কথায় কথায় এটা প্রকাশ করিয়া না ফেলেন।

[ভাদ্র, ১৩০৫]

অঙ্গহানা

প্রথম পরিচ্ছেদ ॥ কন্যাদায়

চোরবাগানের শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়কে লোকে বলে "বোম্‌ভোলানাথ।" নিজে তিনি নিতান্ত ভালমানুষ; পৃথিবীসুদ্ধ লোককেও ঠিক সেইরূপ ভালমানুষ মনে করেন। সকলকে অত্যন্ত অধিক বিশ্বাস করা যেন তাঁহার একটা মানসিক রোগ। জিনিষ কিনিয়া কখনও টাকার ফেরত পয়সা গণিয়া লন না। কেহ বিপদে পড়িলেই শ্যামাচরণবাবু তাহার উপকার করেন; তিনি নিজে বিপদে পড়িলে সে যে আসিয়া বুক দিয়া পড়িয়া তাঁহার উপকার করিবে, সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিন্ত।

শ্যামাচরণবাবু বেঁটেখাটো রকমের মানুষটি। চোখদুটি ভাসা ভাসা হাসি হাসি। গৌরবর্ণ প্রৌঢ় পুরুষ; মাথাটি নাড়িয়া নাড়িয়া চিবাইয়া চিবাইয়া কথা কহেন। সওদাগরি আফিসে চাকরি;—বেতন অল্প, ষাট টাকা মাত্র। একটি প্রাইভেট্ ট্যুষণ্‌ও আছে। এই সামান্য আয়ের উপর নির্ভর করিয়া কলিকাতা সহরে সপরিবারে বাস করা কম দুঃসাহসের কায নহে। একটি ঠিকা ঝি আছে সে কতক কাযকর্ম্ম করিয়া দিয়া যায়। বাকী কর্ম্ম নিজেদের করিয়া লইতে হয়। কষ্ট হয় বটে কিন্তু উপায় ত নাই।

শ্যামাচরণবাবুর একটি ছেলে, তিনটি মেয়ে। ছেলেটির বয়স সতেরো আঠারো বৎসর বি-এ ক্লাসে পড়ে। বড় মেয়ের নাম সুলোচনা, হরিপুরে বিবাহ হইয়াছে। তাহার ছোট শৈলবালা, তাহার ছোট ক্ষান্তমণি। শৈলবালার আজিও বিবাহ হয় নাই,. দিলেই হয়। ক্ষান্তমণি ছোট।

শ্যামাচরণবাবুর হাতে পৈত্রিক আমলের কিছু টাকা ছিল, তাহা বড় মেয়েটির বিবাহে সমস্তই খরচ করিয়া ফেলিয়াছেন। এই ত অবস্থা;—রাখিয়া ঢাকিয়া বুঝিয়া সুঝিয়া খরচ করিতে হয়! কিন্তু বোমভোলানাথকে তখন সে কথা বুঝায় কাহার সাধ্য? তখন শৈল ছোট ছিল;—এখন সে বারো তেরো বছরের হইয়াছে—এখন শ্যামাচরণ নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিতেছেন। কন্যাদায় এমনি জিনিষ, বোম্‌ভোলানাথ শ্যামাচরণকেও চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। দুর্ভাবনায় এই দরিদ্র-দম্পতির মুখ ক্লিষ্ট, মন বিষাদভারাক্রান্ত। গৃহিণী বলিলেন—"আমার গায়ের যা কিছু গহনা আছে, সব বিক্রয় কর। হাজার টাকার উপর পাওয়া যাইবে। তাহাতেই এ যাত্রা জাতি রক্ষা হউক।"

শ্যামাচরণ ঠেকিয়া শিখিয়াছে; বলিলেন—"তাহার পর? ক্ষেন্তির বেলায় কি উপায় হইবে?"

গৃহিণী বলিলেন, "আশু ততদিন যদি নারায়ণের ইচ্ছায় মানুষ হয় তাহা হইলে আর ভাবনা কি?"

ক্ষান্তমণি শৈলবালার চেয়ে দুই তিন বৎসরের মাত্র ছোট। আজিকালিকার বাজারে বি-এ ক্লাসের ছাত্র আশুতোষ যে দুই তিন বৎসরে মানুষ হইতে পারিবে, সে আশা অপর কেহ হইলে সাহস করিয়া মনে স্থান দিতে পারিত না. কিন্তু শ্যামাচরণবাবু দিলেন। গহনা বিক্রয়ের পরামর্শই স্থির হইল।

কিন্তু আবার মনের মত পাত্রও ত চাই। গৃহিণী বলিলেন, "যখন আমি গা খালি করিয়া সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া মেয়ের বিবাহ দিতেছি, তখন যে-সে-একটাকে ধরিয়া দিলে চলিবে না। জামাই দেখিতে সুশ্রী হইবে, দুইটা কি একটা পাস করা হইবে, খাইবার পরিবার সংস্থান থাকিবে—এইরূপ চাই।"

শ্রীমান আশুতোষের একজন সহপাঠী বন্ধু ছিল, তাহার নাম মোহিনীমোহন। সে জমিদারের ছেলে; কলিকাতায় মেসের বাসায় থাকিয়া পড়াশুনা করিত। মাঝে মাঝে আশুর সঙ্গে তাহাদের বাড়ীতে আসিত। অনেক বার নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাকে খাওয়ান

হইয়াছে। যে লক্ষণগুলি গৃহিণী জামাতায় চাহিয়াছেন, এই মোহিনীমোহনে তাহার সকলগুলিই বিদ্যমান। সুতরাং স্বভাবতঃ তাহারই কথা সকলের মনে হইল।

যেমন কর্ত্তা, তেমনি গৃহিণী তেমনি ছেলেটি। জমিদারের ছেলে; বি-এ পড়িতেছে; গহনা বেচিয়া হাজার টাকা পাওয়া যাইবে, তাহাতেই তাহাকে ক্রয় করিবেন! সত্যযুগ আর কি! শ্যামাচরণবাবু বামন, প্রাংশুলভ্যফল মোহিনীমোহনকে জামাতা করিবার জন্য বাহু বাড়াইলেন। ইহার প্রতিফলস্বরূপ "উপহাস" নহে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু সে পরের কথা পরে বলিব।

আশু বলিল,—মোহিনীর বিবাহ হয় নাই বটে, কিন্তু তাহারা কাহার সন্তান, কয় পুরুষে, নৈকুষ্য অথবা ভঙ্গকুলীন, এ সব আশু কিছুই বলিতে পারিল না।

পরদিন কলেজে কথায় কথায় কৌশল করিয়া বন্ধুর নিকট হইতে আশু সমস্ত সংবাদ আদায় করিয়া লইল। সমস্তই মিলিয়াছে। বড় সুখের কথা। আশু একে ত শ্যামাচরণবাবুর পুত্র, তাহাতে অল্পবয়স্ক সাংসারিক অভিজ্ঞতা কিছুই নাই,—সে মনে করিল যেন বিবাহ হইয়াই গিয়াছে। প্রথম হইতেই মোহিনীর সঙ্গে তাহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। এখন মনে মনে তাহাকে ভাবী ভগ্নীপতি স্থির করিয়া সেই বন্ধুত্ব প্রগাঢ়তর করিয়া তুলিল। ইহার ফলস্বরূপ আশুদের বাড়ীতে মোহিনীর যাতায়াত বৃদ্ধি পাইল। শনিবার কলেজের ছুটির পর সে প্রায়ই আসিয়া আশুদের বাড়ীতে সন্ধ্যাযাপন করিত। রবিবারে এবং অন্য ছুটির দিনে মাঝে মাঝে আশুর মা তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন। ইঁহাদের গোপন অভিপ্রায় জানিতে মোহিনীমোহনের অধিক দিন বিলম্ব হইল না।

বিবাহের কথাবার্ত্তা হইবার পূর্ব্বে শৈলবালা মোহিনীর সঙ্গে স্পষ্ট কথা কহিত না বটে, কিন্তু তাহার সম্মুখে বাহির হইত এবং প্রতিদিনই দুই একবার পরস্পরে চোখোচোখি হইয়া যাইত। আশু ও মোহিনী আহারে বসিলে আশুর মা পরিবেশন করিতেন, প্রয়োজন হইলেই শৈল আসিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিত। কিন্তু যেদিন শৈলবালা এই বিবাহের কথা শুনিল, সে দিন হইতে মোহিনীর সাক্ষাতে আর সে প্রাণান্তেও বাহির হইত না। মোহিনী আসিলেই ক্ষান্তমণি সুর করিয়া বলিতে থাকিত, "দিদির বর এসেছে গো!" মোহিনী বাহির হইতে এই গান শুনিয়া মনে মনে হাসিত—ভাবিত কোথায় কি তাহার ঠিক নাই, বিবাহ! কিন্তু শ্যামাচরণের কন্যা শৈলবালার ত সে বুদ্ধি ছিল না। সে যখন মোহিনীমোহনকে দেখিত, তখন তাহাকে স্বীয় ভাবী পতিস্বরূপ দেখিত। নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের যে কোনও অংশের কল্পনা করিত সেই অংশেই দেখিতে পাইত, মোহিনীমোহন সুন্দর শান্ত সমুজ্জ্বল চক্ষু দুটিতে স্নেহ ভরিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

কিন্তু ক্রমে মোহিনীমোহনেরও বুদ্ধি-বিপর্য্যয় ঘটিল। তাহার সমস্ত তর্কযুক্তি শীঘ্রই তাহাকে কল্পনার কমনীয় হস্তে সমর্পণ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। অনেক রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইলে মোহিনী ভাবিত, যদি শৈলবালার সঙ্গেই আমার বিবাহ হয়, তবে কেমন হয়? মনে হইত, বেশ হয়। বেশ নামটিও কিন্তু। শৈলবালার লজ্জাটা বড় বেশী—কখনও ভাবিত তা বেশ ত, লজ্জাই ত স্ত্রীলোকের ভূষণ। আবার কখনও বা ভাবিত, এই ভূষণবাহুল্যে আমার নব-প্রণয়ের কোমল হৃদয় ক্ষত বিক্ষত হইবে না ত? লজ্জা ভাঙ্গাইতে অনেক আয়াস স্বীকার করিতে হইবে। এখন ত দেখিলেই পলাইয়া যায়; ফুলশয্যার রাত্রে কথা কহাইতে অনেক সাধ্যসাধনার প্রয়োজন হইবে। কল্পনায় সেই ফুলশয্যা-রাত্রিটির অভিনয় করিত। শৈলবালা যেন খস্‌খসে কাপড় পরিয়া, সাটিনের বডিস পরিয়া, কপালে একটি খয়েরের টিপ কাটিয়া, চুলে সুগন্ধি মাখিয়া, জড়সড় হইয়া, মুখখানি ঢাকিয়া, পাশ ফিরিয়া শুইয়া আছে। শয্যায় প্রবেশ করিয়া সে শৈলকে কি বলিয়া ডাকিবে? নাম করিয়াই ডাকিবে। শৈল কি তার উত্তর দিবে? সে ফিরিবেও না, চাহিবেও না, কথাও কহিবে না! অনেক চেষ্টাতে যেন কথা কহিল। কিন্তু সে যেন শৈলর নিজ কণ্ঠস্বর নহে। সে [illegible]

কোমল কণ্ঠস্বর কি এই? এ যে ভাঙ্গা জড়ান, সংকুচিত, বাধাপ্রাপ্ত স্বর, কিন্তু নিরতিশয় মধুর।—এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে রজনীশেষে তাহার নিদ্রাকর্ষণ হইত। স্বপ্ন দেখিত—সে স্বপ্নও যেন শৈলবালার স্মৃতিপরিমলে আমোদিত। যে রাত্রিতে পূর্ণিমার চন্দ্র পৃথিবীর উপর বেশী করিয়া উন্মাদনা বর্ষণ করিত, সে রাত্রিতে হয় ত কল্পনা করিত যেন এক সমুদ্রবেষ্টিত জনহীন দ্বীপের প্রান্তরে বেড়াইতে বেড়াইতে সহসা শৈলবালার সাক্ষাৎ পাইল। তখন নূতন নূতন বিবাহ হইয়াছে। শৈল, তুমি এখানে কেমন করিয়া আসিলে?—কেমন করিয়া আসিয়াছে, তা ত শৈল জানে না। বাড়ীতে বিছানায় মা'র কাছে শুইয়া ঘুমাইতেছিল, জাগিয়া দেখিল এই বনে আসিয়া পড়িয়াছে। বোধ হয়, আরব্যোপন্যাসের জিনি-দৈত্য অথবা পরীদের রাজা উড়াইয়া আনিয়া থাকিবে। সমুদ্র-গর্জ্জন শুনিয়া ভয় পাইয়া শৈলবালা কাঁদিতেছিল। এখন আর ভয় করিতেছে না। মোহিনী যেন বলিল, তোমার ক্ষুধা পাইয়াছে, তোমার জন্য ফল সংগ্রহ করিয়া আনি? শৈল বলিল, না আমি একলা থাকিতে পারিব না, আমার ভয় করিবে যে। তবে চল দুইজনেই যাই। কিন্তু শৈল কি সেই কঙ্করাকীর্ণ পথে চলিতে পারে? চল তোমায় কোলে করিয়া লইয়া যাইব।—ফল যদি না পাওয়া যায়? ফল যদি থাকে, আর জল যদি না থাকে? কি হইবে?—বিধাতা যেন মূর্ত্তিমান হইয়া বলিয়া গেলেন—তোমাদের পরস্পরের জন্য পরস্পরের মুখে চুম্বনের অমৃত সঞ্চিত রাখিয়াছি, ফল ও জলের প্রয়োজন হইবে না।—আর কত সমস্ত অসম্ভব কল্পনা। সে আর বলিয়া কায নাই। শুনিলে বিজ্ঞ লোকে বিদ্রূপের হাসি হাসিবেন। নাটক নভেল মোহিনীর বিস্তর পড়া ছিল। সে যে ভালবাসার পথে পদার্পণ করিল, তাহা বেশ জানিয়া শুনিয়াই করিল। সে পথ বড় পিচ্ছিল। প্রণয়ের সে বাপীতে নামিতে নামিতেই জল একগলা হইল। দেখিতে দেখিতে অগাধ জলে গিয়া পড়িল। কি স্নিগ্ধতা তাহার সর্ব্বশরীরকে আলিঙ্গন করিল। চারিদিকে পদ্মবিকাশ। ডুবিয়া মরিতেও সুখ আছে।

এখন অবধি আশু ডাকিলে মোহিনী আর সহজে তাহাদের বাড়ীতে যাইতে চাহিত না। মনে ষোল আনা ইচ্ছা যাইবার;—কিন্তু বোধ হইত, যেন সকলে তাহার এ ভাব-পরিবর্ত্তন ধরিয়া ফেলিয়াছে। যেন কত অপ্রতিভ হইয়া থাকিত।

একদিন শ্যামাচরণবাবু মোহিনীকে দেখিয়া বলিলেন, "বাপু, আমার অনেক দিনের সাধ, শৈলর সঙ্গে তোমার বিবাহ দিই। তাহাকে তুমি ত দেখিয়াছ? তোমার যদি সম্মতি থাকে ত বল, তোমার পিতাঠাকুরের নিকট আমি বিবাহের প্রস্তাব করি।"

মোহিনী প্রথমটা চুপ করিয়া রহিল। মাটির পানে চাহিয়া কোটের বোতাম ঘুরাইতে ঘুরাইতে অল্প অল্প হাসিতে লাগিল। শ্যামবাবু ভাব বুঝিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন —"কি বল?" মোহিনী হাসিতে হাসিতে বলিল—"তা বেশ ত।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥ সম্বন্ধ

গৃহিণী মাঝে মাঝে তাগাদা করেন,—"মোহিনীর বাপকে যে চিঠি লিখিবে বলিয়াছিলে তাহার কি হইল?"—শ্যামাচরণবাবুর আঠারো মাসে বৎসর;—তিনি বলেন, এই লিখিব এবার। গৃহিণী বলেন—মেয়ে যে এ দিকে বলতে নেই বড় সড় হয়ে উঠল আর আইবুড় রাখা কি ভাল হয়? এর পরে পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলবে যে! শ্যামাচরণ বাবু বলেন,—এখন পড়াশুনার ব্যাঘাত হবে—পরীক্ষাটা হয়ে যাক্‌ তার পরে প্রস্তাব করব।

"এখন পড়াশুনার ব্যাঘাত হবে"—কথা শুনিয়া হাসি পায়। যেন বিবাহের জন্য আর কিছুরই প্রয়োজন নাই; প্রয়োজন শুধু শ্যামাচরণবাবুর প্রস্তাব করাটা। সাধে লোকে তাঁহাকে বলিত "বোম্‌ ভোলানাথ!"

পরীক্ষা শেষ হইল। মোহিনী বাড়ী গেল। আরও দুই তিন মাস কাটিল। আর

লিখি কাল লিখি করিয়া এখনও শ্যামাচরণবাবু পত্র লেখেন নাই। বোধ হয় বিশ্বাস ছিল, বৈশাখের পূর্ব্বে ত বিবাহের দিন নাই;—এখন অবধি অনর্থক পত্র লিখিয়া কি হইবে!

বৈশাখ মাসে পরীক্ষার ফল বাহির হইল। আশু মোহিনী উভয়েই উত্তীর্ণ হইয়াছে। আশু এই শুভসংবাদ মোহিনীকে টেলিগ্রাফ্ করিয়া জানাইল। বাড়ীতে আনন্দ উৎসব পড়িয়া গেল।

এইবার শ্যামাচরণবাবু চিঠি লিখিলেন। মোহিনী ও আশুতোষের পরস্পরের সৌহৃদ্য বর্ণনা করিয়া, মোহিনীর পরীক্ষা-ফলে আনন্দ প্রকাশ করিয়া, অতিশয় বিনয়-সহকারে বিবাহের প্রস্তাব করিলেন।

সপ্তাহখানেক পরে পত্রের উত্তর আসিল। মোহিনীর পিতা বল্লভপুরের জমিদার হরেকৃষ্ণ রায় মহাশয় লিখিয়াছেন, মোহিনীর সহিত আশুতোষের বন্ধুত্বের কথা পূর্ব্ব হইতেই তিনি অবগত আছেন এবং শ্যামাচরণবাবুর গুণের কথাও তিনি মোহিনীর নিকট সর্ব্বদাই শুনিতে পান। তাঁহার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয় ইহা অতি সুখের কথা। তবে দেনা পাওনা সম্বন্ধে একটা কথা কহা যে এখন রীতি হইয়াছে, সেটা চুকিয়া গেলেই সমস্ত ঠিকঠাক করা যাইতে পারে। সেটা পত্রের দ্বারায় না হইয়া বাচনিক হইলেই উভয়পক্ষের সুবিধা ও সময়সংক্ষেপ হইবে। অতএব এই অভিপ্রায়ে একবার যদি শ্যামা-চরণবাবু অনুগ্রহ করিয়া দীনের কুটীরে পদধূলি দেন, তবে তিনি অত্যন্ত আপ্যায়িত হইবেন।

এই পত্র পড়িয়া শ্যামাচরণবাবু যারপরনাই সন্তোষলাভ করিলেন। গৃহিণীকে বলিলেন,—"আহা দেখেছ! যেমন ছেলেটি, তেমন বাপটি। আজকালকার দিনে এমন কুটুম্ব পাওয়া অতি সৌভাগ্যের কথা।"—স্থির হইল, আগামী শনিবার আফিসের পর যাত্রা করিবেন।

পরদিবস এক সময় নিরিবিলি পাইয়া শৈলবালা লুকাইয়া উপরোক্ত পত্রখানি পাঠ করিতেছিল,—তাহার দিদি সুলোচনা আসিয়া এই চৌর্য্যকার্য্যে তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। ধরা পড়িয়া শৈলর মুখ চোখ কাণ রাঙা হইয়া উঠিল: দিদি পরিহাস করিয়া বলিলেন, —"শৈলি, তোর যে আর দেরী সইচে না! বাবাকে বলব এখন, যেন এই মাসেই বিয়ের সব ঠিকঠাক করে আসেন।"

বাস্তবিকই পিতার যাত্রাকালে সুলোচনা তাঁহাকে বলিয়া দিল—"বাবা, যদি সব ঠিক হয়, তবে এই মাসেই নয়ত জ্যৈষ্ঠ মাস পড়তেই বিবাহের দিন স্থির করে এস। সামনের জামাইষষ্ঠীতে যেন আমরা আমোদ আহ্লাদ করতে পাই।"

শ্যামাচরণবাবু যথাসময়ে বল্লভপুরে উপস্থিত হইলেন। হরেকৃষ্ণ রায় আদর অভ্যর্থনা করিতে ত্রুটি করিলেন না। মোহিনীদের বাড়ীঘর, লোকজন, সোর সরাবৎ দেখিয়া, সেই প্রথম শ্যামাচরণবাবু ভাবিলেন,—এমন লোকের ছেলেকে মেয়ে দেওয়া তাঁহার মত অবস্থার লোকের পক্ষে অত্যন্ত উচ্চাভিলাষ।—তবে নাকি মোহিনীর পিতার পত্রে যথেষ্ট অভয় পাইয়াছিলেন, তাই অনেকটা ভরসা করিলেন।

বেলা নয়টার সময় তিনি মোহিনীদের বাড়ীতে পোঁছিয়াছিলেন। স্নানাহার করিতে অনেক বেলা হইয়া গেল। রায় মহাশয় বলিলেন,—"পথশ্রমে আপনার ক্লেশ হয়েছে। এ বেলা বিশ্রাম করুন। ও বেলা তখন সে সমস্ত কথাবার্ত্তা কওয়া যাবে।"

অপরাহ্ণে রায় মহাশয়দের বহির্ব্বাটিতে কতকগুলি ভদ্রলোকের সমাগম হইল। অনতি-বৃহৎ কক্ষটির মধ্যস্থলে দুইখানি চৌকী যোড়া করিয়া পাতা। তাহার উপর আগ্রার একখানি শতরঞ্চ। তাহার উপর রজকালয় হইতে সদ্যপ্রাপ্ত একখানি চাদর বিছান। কয়েকটি তাকিয়াও স্থানে স্থানে সজ্জিত। রায় মহাশয় জমিদারগর্ব্বে মধ্যস্থলে সুখা-সীন। শ্যামাচরণবাবুকে তিনি সকলের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। সকলেই বলিলেন—"শ্যামাচরণবাবুর মত মহাশয় লোকের সঙ্গে কুটুম্বিতা করার চেয়ে আর কি

রায় মহাশয় এ কালের লোক ও আচার ব্যবহারের নিন্দা করিয়া সভাকার্য্যের সূচনা করিলেন। বিবাহে টাকা লওয়া যে একটা রীতি হইয়াছে, তাহার প্রতিই নিন্দার বেশী ঝোঁকটা পড়িল। বলিলেন—"আমাদের সে সব দিন কাল এক আলাহিদা রকমের গিয়াছে। আমার যখন বিবাহ হইয়াছিল, তখন মনে আছে, একশত-এক টাকা পণ, একটি সোণার আংটি, আর একটি চেলির যোড় মাত্র পাইয়াছিলাম। আর বুঝি ভরি দশ পনরো সোণা আর ভরি পঞ্চাশ ষাট রূপা। ইহাতেই একেবারে ধন্য ধন্য পড়িয়া গিয়াছিল। স্বর্গীয় পিতৃদেব কতই লজ্জিত। বলেন 'বৈবাহিক মহাশয়, আমি ছেলের বিবাহ দিতে আসিয়াছি বই ত ছেলে বিক্রয় করিতে আসি নাই।'—আর এখন?—এখন মহাশয় সে দিন আমার বড় সম্বন্ধীটির মেয়ের বিবাহ হইল; পঞ্চাশ ভরি সোণা, দুই শত ভরি রূপা, হাজার-এক টাকা নগদ, তাহার উপর দানসামগ্রী আছে, খাট বিছানা আছে, বরাভরণ আছে। বরাভরণ কি যা তা মহাশয়? এই ধরুন ঘড়ি—সোণার ঘড়ি, সোণার গার্ডচেন, হীরার আংটি, চেলীর যোড়, তা ছাড়া আবার রূপার টী-সেট্। জামাই বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া চা খাওয়াইবেন, তাই রূপার টী-সেট্ চাই। এই নূতন বরাভরণ সাহেব-বাড়ী হইতে আনাইতে প্রায় দুই শত টাকা লাগিয়া গেল। জামাইয়ের গুণের মধ্যে কি? —না, এল-এ পাশ করিয়া বি-এ পড়িতেছেন। বাপ জজকোর্টের সেরেস্তাদার। বিষয় আশয় কিছুই নাই, চাকরি ভরসা। চাকরি ত তালপত্রের ছায়া। আজ যদি চাকরি যায় তবে কাল কি খাইবেন তাহার ঠিকানা নাই। আরে ছি-ছি—একালে কেবল অর্থ, কেবল অর্থ, কেবল অর্থ। অর্থ ছাড়া আর কথাটি নাই।"

সভাস্থ সকলেই একবাক্যে রায় মহাশয়ের এ মত সমর্থন করিলেন। শ্যামাচরণবাবু মনে মনে বলিলেন, যে যথার্থ ভদ্রলোক হয়, সে সর্ব্বদোষাবহ একালেও আপনার ভদ্রতার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলে।

একজন ভদ্রলোক বলিলেন—"তাহা হইলে এইবার উপস্থিত বিবাহের কথাবার্ত্তা হইয়া যাক্।"

কর্ত্তা বলিলেন—"তবে আমি একবার বাড়ীর ভিতর ওঁয়াদের জিজ্ঞাসা করে' আসি।"

বাড়ীর ভিতর হইতে ফিরিয়া আসিতে তাঁহার বিস্তর বিলম্ব হইল না। তিনি বালির কাগজে লেখা এক সুদীর্ঘ ফর্দ্দ হাতে করিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। বাড়ীর মেয়েরা ছেলেপিলেকে দিয়া নিজেদের মনের মত এই ফর্দ্দ লেখাইয়া রাখিয়াছিলেন। রায় মহাশয় বলিলেন—"বাড়ীর ওঁয়ারা অলঙ্কার এই চাহেন। তাহার পর আর আর যাহা কিছু আছে, সে সম্বন্ধে তাঁহারা কোন কথা কহিবেন না বলিয়াছেন—আমারই উপর সম্পূর্ণ ভার দিয়াছেন। আমার এক্তারের মধ্যে যাহা রাখিয়াছেন, তাহাতে অবশ্যই যথাসম্ভব সুলভে আমি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে নিষ্কৃতি দিব. কিন্তু মেয়েদের এই ফর্দ্দ হইতে অধিক কমান আমার সাধ্যায়ত্ত হইবে না."

ফর্দ্দ পড়া হইল। তাহার বিস্তারিত বিবরণে পাঠককে ক্লিষ্ট করিব না। এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে শ্যামাচরণবাবুর মুখের হাসি শুকাইয়া গেল, চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। পৃথিবী যেন পদতল হইতে সরিয়া দূরে চলিয়া যাইতে লাগিল।

গহনার যাহা ফর্দ্দ বাহির হইয়াছে, তাহা খুব টানাটানি কসাকসি করিয়া দিলে দুই হাজার টাকার একটি পয়সা কমে হইবে না।

তাহার পর গণ আছে, পণ আছে, ফুলশয্যা আছে, নমস্কারী আছে নিজেদের খরচ আছে। মোটকথা মোহিনীমোহনকে জামাতা করিতে হইলে অন্যূন তিন হাজার টাকার প্রয়োজন।

সম্বল মাত্র গৃহিণীর অলঙ্কারগুলি। বিক্রয় করিয়া বড়জোর দেড় হাজার টাকা হইতে পারে।

এত দিন ধরিয়া এত সাধে দরিদ্র ব্রাহ্মণ আকাশে যে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, মুহূর্ত্তের মধ্যেই তাহা ধূলিসাৎ হইয়া গেল।

অনুনয় বিনয় করিয়া, হাতে পায়ে ধরিয়া বলিলে, হয়ত কিছু কমিতে পারে। কিন্তু সে আর কত কমিবে? নিজের সাধ্যের মধ্যে আসিবে না। ভূমিকায় ত রায় মহাশয় বলিয়াই দিয়াছেন যে, গহনার তালিকা হইতে বিশেষ কিছু কমান তাঁহার ক্ষমতার বহির্ভূত। কিন্তু—"মজ্জমান জন, শুনিয়াছি ধরে তৃণে, যদি আর কিছু না পায় সম্মুখে" —সুতরাং শ্যামাচরণ মনে করিলেন, কর্ত্তা ইচ্ছা করিলে কি আর অলঙ্কারের তালিকাকে সংক্ষিপ্ত করিতে পারেন না? স্ত্রীলোকের কথাই কথা থাকিয়া যাইবে, এও কখন হয়? নিজের স্ত্রীর কথা স্মরণ করিলেন। তিনি যদি স্ত্রীকে বলেন—ইহা করিতে হইবে তাহাতে স্ত্রী কি দ্বিরুক্তি করিবেন? কখনই না। তাই শ্যামাচরণবাবু সহসা হাত দুইটি যোড় করিয়া, রায় মহাশয়ের প্রতি করুণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—"মহাশয় আমি কন্যাদায় হইতে যাহাতে উদ্ধার হই, তাহা আপনাকে করিয়া দিতে হইবে।"

রায় মহাশয় অমনি—"হাঁ হাঁ করেন কি?—আমার সম্মুখে হাত যোড় করিয়া আমাকে অপরাধী করেন কেন? আপনি মহাশয় ব্যক্তি"—ইত্যাদি প্রকার উক্তি করিয়া সবলে শ্যামাচরণবাবুর দুই হাত ছাড়াইয়া দিলেন।

শ্যামাচরণবাবু বলিলেন—"আমি মহাশয় ব্যক্তি নহি। মহাশয় ব্যক্তি আপনি। আমি অতি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র লোক। আমাকে কৃপা করিয়া এ যাত্রা রক্ষা করিতে হইবে।"

সভার একজন বলিলেন—"অত টাকা ব্যয় করা যদি আপনার সাধ্যাতীত হয়, তবে কত ব্যয় আপনি করিতে পারেন, তাহাই বলুন না।"

শ্যামাচরণবাবু বলিলেন—"মহাশয়গণ, আমার সমস্ত অবস্থা আমি অকপটে নিবেদন করিতেছি, সমস্ত শুনিয়া আমার প্রতি যাহা বিচার হয় করিবেন।—আমি ষাটটি টাকা মাহিনা পাই। একটি ছেলে তিনটি মেয়ে, এই কাচ্ছাবাচ্ছাগুলি লইয়া ঘর করি। হাতে কিঞ্চিৎ পিতৃদত্ত অর্থ ছিল, তাহাতেই কষ্টেসৃষ্টে বড় মেয়েটির বিবাহ দিয়াছি। সে টাকার একটি কাণা কড়িও আর অবশিষ্ট নাই। আছে এখন কেবল ব্রাহ্মণীর গায়ের অলংকার কয়খানি। সেইগুলি বিক্রয় করিলে হাজার বারোশত টাকা হইতে পারে। ঐ টাকার ভিতর যাহাতে আমার জাতি রক্ষা হয়, সব দিক রক্ষা হয়, সাপও মরে লাঠিও না ভাঙ্গে —তাহাই আপনারা পাঁচজনে করিয়া দিন।"

এ কথা শুনিয়া সভাস্থ সকলে শ্যামাচরণের দুঃখে আন্তরিক দুঃখিত হইলেন। রায় মহাশয়ের মুখে কিন্তু একটু অবিশ্বাসের মৃদু হাসি দেখা দিল। শ্যামাচরণের মত বোম্ ভোলানাথ লোক যে পৃথিবীতে আছে, তাহা তাঁহার জ্ঞানের অগোচর ছিল। জমিদারের ঘরে বি এ পাস করা ছেলে সন্ধানে আসিয়াছেন, হাতে কিছু নাই সে কি হইতে পারে? সওদাগরি আফিসে চাকরি করেন, বেতন ষাট টাকাতে কি আসে যায়? —অমন কত ষাট টাকা রোজগার করেন তাহার কি কোনও হিসাব আছে?

তথাপি রায় মহাশয় বলিলেন,—"আচ্ছা তবে একবার বাড়ীর ভিতর যাই। বলিয়া কহিয়া দেখিগে, মেয়েরা যদি কিছু কমাইতে রাজি হন।"—বলিয়া উঠিয়া গেলেন।

ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,—"কমাইবার কথা শুনিয়া মেয়েরা অত্যন্ত রুষ্ট হইয়াছেন। বলিয়াছেন, তোমার যাহা খুসী তাহাই কর। আমাদের কথা যদি থাকিবেই না তবে জিজ্ঞাসা করিবার কি প্রয়োজন ছিল?"

ইহার পর খোসামোদ করা চলে না। সকল জিনিসেরই একটা সীমা আছে ত? কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তিরও আত্মসম্মান একটা সীমার পর আর মাথা নোয়াইতে ঘৃণা বোধ করে। শ্যামাচরণবাবু এইবার একটু "শ্লেষ শ্বেত হাসি" হাসিলেন—তাহা "জমাট অশ্রুর মত তুষারকঠিন।" বলিলেন—তাহা হইলে ত আপনার সঙ্গে কুটুম্বিতার সম্মান আমার অদৃষ্টে নাই।"

ইহাতে রায় মহাশয় এমন ভাবটা প্রকাশ করিলেন, যেন তিনিও অত্যন্ত দুঃখিত। তিনি আর শ্যামাচরণ যেন উভয়েই এক অত্যাচারী রাজার শাসনাধীনে পীড়িত—তাই সমবেদনা অনুভব করিতেছেন। অপর সকলে মনে মনে ভাবিল, ছি এমন স্ত্রীবশ!

যাহা হউক, নিরাশার পাথর বুকে বাঁধিয়া সেই রাত্রেই শ্যামাচরণ গৃহে ফিরিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥ বিবাহ

বাড়ীতে একটা আশা আনন্দের যে কোলাহল উঠিয়াছিল, শ্যামাচরণ ফিরিবা মাত্র তাহা থামিয়া গেল। বাড়ীসুদ্ধ লোকের মুখ শুকাইয়া গেল। গৃহিণীর কান্না পাইতে লাগিল। আর শৈলবালা অত্যন্ত গোপনে বাস্তবিকই ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিল।—শুধু কি মা বাপের দুঃখ দেখিয়া কাঁদিল, না আরও কিছু কারণ ছিল?—আমার ত বিশ্বাস ছিল। কিন্তু সে পণ করিয়া বসিল না—যাহাকে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছি সে ছাড়া আর কাহাকেও আত্মদান করিব না;—আমি চিরকুমারী থাকিব। সে এতশত জানিত না। তাহার বুকে যে কিসের বেদনা আসিয়া বাজিল, তাহা সে ভাল বুঝিতেই পারিল না।

গৃহিণী বলিলেন—"এখন উপায়?"

শ্যামাচরণ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"আমি আর কি উপায় করিব। ঈশ্বর কি উপায় করেন দেখি। আমি ত হাল ছাড়িয়া দিয়াছি।"

কিন্তু হাল ছাড়িয়া দিয়া বেশী দিন থাকিতে পারিলেন না। পাত্রের সন্ধানে বাহির হইতে হইল। হাজার বারো শত টাকায় হয় এমন একটি পাত্র। পাস-টাস হোক আর নাই হোক্,—দুইটা খাইতে পরিতে দিতে পারে। আর নিতান্ত মূর্খ গোঁয়ার, মাতাল, দুশ্চরিত্র না হয়। অনেক সন্ধান করিতে হইল। অধিক আর কি বর্ণনা করিব,—এ ভোগ কাহাকে না ভুগিতে হইয়াছে? কয়েকটা স্থানে ত এই হইল—এই হইল—সব 'ঠক্‌ঠাক'—আর হইল না। সেই বৈশাখ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া পূজা পর্য্যন্ত এই ভাবে কাটিল। পূজার সময় একস্থানে স্থির হইল। হাজার টাকা দিতে হইবে। পাত্রটি উকীল, কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষের। তাই বলিয়া বয়স অধিক নয়,—এই ত্রিশের মধ্যে। মেয়েটি বয়স্থা ও সুন্দরী, "বি-এ বি-এল্"-এর পিতা তাই হাজার টাকাতেই স্বীকৃত হইয়াছেন। স্বীকৃত হইবার আরও একটু বিশেষ গোপনীয় কারণ ছিল। পাঁচ বৎসর ছেলের স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছে, এই পাঁচ বৎসর ভিতর সাধ্য সাধনাতেও ছেলেকে বিবাহে সম্মত করিতে পারেন নাই। এবার কোন শুভগ্রহবশে ছেলে রাজি হইয়াছে। সুতরাং টাকা ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য না করিয়া কার্যটা শীঘ্র সম্পন্ন করিয়া ফেলা আবশ্যক হইয়াছিল। কারণ কি জানি, যদি বিলম্বে মতি ফিরিয়া যায়।

১৭ই অগ্রহায়ণ বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে। শ্যামাচরণ গহনাগুলি একে একে বিক্রয় করিয়া সমস্ত আয়োজন করিতে লাগিলেন।

কিন্তু বিবাহের মাসখানেক পূর্বে একটি ভারি দুর্ঘটনা ঘটিল। রান্নাঘরের সম্মুখেই বারান্দায় শৈল বসিয়া ছিল। একটি জল খাবার ছোট ঘটির ভিতর বামহস্তের মাঝের আঙ্গুলটি দিয়া, ঘটিটি ঘুরাইতে ঘুরাইতে, রান্নাঘরের ভিতর সুলোচনার সঙ্গে গল্প করিতেছিল। এমন সময় উপর হইতে চুণ সুরকীর একটা চাঙড় খসিয়া সেই হাতের উপর পড়িল। ঘটির কানাটা ভাঙ্গিয়া গেল, আঙ্গুলও আধখানা সেই সঙ্গে কাটিয়া গেল।

সন্ধ্যা হইতে না হইতেই খুব জ্বর। পূর্ব্বেই ডাক্তার আসিয়া আঙ্গুলটি দ্বিতীয়বার শাণিত অস্ত্রে কাটিয়া, ঔষধাদি প্রয়োগ করিয়া গিয়াছিল। চারি পাঁচ দিনে জ্বর ছাড়িল: কিন্তু আঙ্গুল ভাল হইতে পনেরো কুড়ি দিন লাগিয়া গেল।

একে মেয়ের বিবাহ হয় না, তাহার উপর আবার আঙ্গুল কাটিয়া গেল! খুব সাবধান, যেন প্রকাশ হইয়া সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া না যায়।

দেখিতে দেখিতে বিবাহের দিন আসিয়া পড়িল। বরপক্ষীয়েরা পল্লীগ্রাম হইতে প্রভাতেই আসিয়া পৌঁছিলেন। তাঁহাদের জন্য কাছেই একটা বড় বাড়ী ভাড়া লওয়া হিল, তাঁহারা সেইখানে উঠিলেন।

বাড়ীতে সকলেই আনন্দ করিয়া বেড়াইতেছে, কেবল শৈলবালার মুখখানি মলিন। মাঝে মাঝে তাহার চক্ষু দুইটি জলে পূরিয়া উঠিতেছে। তাহার আর সে পূর্ব্বেকার আকার নাই। যেন সে সম্প্রতি ছয় মাসের রোগশয্যা হইতে উঠিয়াছে।

বেলা দশটার সময় গায়ে হলুদ হইল। বরপক্ষীয়দের একটা দাসী গায়ে হলুদের সময় বাড়ীতে আসিয়া পড়িয়াছিল। এত সাবধানতা সত্ত্বেও সে দেখিয়া গেল, মেয়ের একটি আঙ্গুল কাটা। যথাসময়ে সে বরের পিতার নিকট গোপনে এ সংবাদ দিতে ভুলিল না। বরকর্ত্তা শুনিয়া ত আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। তিনি নিজে পূজার সময় মেয়েকে দেখিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু হয়ত বাম হাতটা কাপড়ের ভিতর লুকান ছিল, তাই কি অত লক্ষ্য করেন নাই? যাহা হউক প্রিয়বন্ধু ক্ষুদিরাম খুড়ার সহিত অত্যন্ত গোপনে পরামর্শ আঁটিলেন, বিবাহের পূর্ব্বে কৌশলে এইটা জানাজানি করিয়া দিয়া, আরও দুই একশত আদায় করিয়া লইতে হইবে।

সন্ধ্যা হইল। বিবাহের বাজনা বাজিয়া উঠিল। বর আসিয়া সভাস্থ হইল। ইয়া গোঁফ—ইয়া চেহারা—পাড়ার ছেলেরা বরকে যে সকল ঠাট্টা বিদ্রূপ করিবে ভাবিয়া আসিয়াছিল, বরের গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া সে সব কিছুই করিতে সাহস করিল না।

কিছুক্ষণ পরে কন্যাকর্ত্তা যথারীতি গলবস্ত্র হইয়া সভায় নিবেদন করিলেন—"লগ্ন উপস্থিত, গাত্রোত্থান করিতে অনুমতি হউক।"

বর গিয়া বিবাহ-মণ্ডপে উপবেশন করিল। শ্যামাচরণ জামাতাকে বরণ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় বরকর্ত্তা বলিলেন—"আমাদের একটা চিরকালের কৌলিক প্রথা আছে, তাহা পালন করিতে হইবে। কনেকে সভায় আনা হউক। বর কনের হাতে কিছু মিষ্টান্ন দিবে। তাহার পর বরণ হইবে।"

ইহা শুনিয়া কন্যাপক্ষীয়রা নিজেদের পুরোহিতের মুখপানে চাহিলেন। পুরোহিত বলিলেন—"তাহাতে ক্ষতি নাই। যাহা উঁহাদের করিবার প্রথা আছে তাহা স্বচ্ছন্দে করিতে পারেন। আমাদের তাহাতে আপত্তি কি?"

কনেকে আনা হইল। বরকর্ত্তা বরের হাতে একটি সন্দেশ দিয়া বলিলেন—"এইটি তুমি কনের হাতে দাও।" কনেকে বলিলেন—"মা লক্ষ্মী হাত পাত।" শৈল বস্ত্রাঞ্চলের মধ্য হইতে কম্পিত দক্ষিণ হস্তখানি বাহির করিয়া দিল। বরকর্ত্তা বলিলেন—"না না, এক হাতে কি নিতে আছে মা? দুইটি হাতই পাতিতে হয়।" শৈল ত কিছুতেই বাম হস্ত বাহির করে না। শ্যামাচরণ দাঁড়াইয়া পলকে প্রলয় জ্ঞান করিতেছেন। অনেক পীড়াপীড়ির পর শৈল বাম হস্তখানি বাহির করিল। সকলেই দেখিল, মাঝের আঙ্গুলটির আধখানা নাই।

বরকর্ত্তা বলিয়া উঠিলেন—"একি! অঙ্গহীন!" পুরোহিত ঠাকুর বলিলেন—"শ্রীগুরু! অঙ্গহীনা কন্যা গ্রহণ করিতে শাস্ত্রে যে নিষেধ আছে! মুখুয্যে মহাশয়, বিবাহ স্থগিত করুন।"

বিবাহ স্থগিত করুন! কন্যাপক্ষীয়েরা অতিশয় উষ্ণ হইয়া উঠিল। একজন বলিল—"কোথাকার অশাস্ত্রজ্ঞ ভট্টাচার্য্য! একটা আঙ্গুল কাটিয়া গেলে অঙ্গহীন হয় একথা কোন্ শাস্ত্রে পড়িয়াছেন?"

ভট্টাচার্য্য অশাস্ত্রজ্ঞ! ভট্টাচার্য্য কোন্ শাস্ত্রে পড়িয়াছেন! তিনি অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বলিলেন—"কে হে বেল্লিক অকালকুষ্মাণ্ড, আমার চেয়ে তোমার শাস্ত্রজ্ঞান অধিক নাকি?"

শ্যামাচরণ প্রমাদ গণিয়া বলিলেন—"আপনারা যদি এখন বিবাহ স্থগিত করেন, তাহা হইলে আমার জাতি থাকে কেমন করিয়া

এইবার ক্ষুদিরাম খুড়া সর্ব্বসমক্ষে বরকর্ত্তাকে বলিলেন—"কন্যাকর্ত্তা পণস্বরূপ আর দুইশত টাকা ধরিয়া দিউন, মিটমাট করিয়া ফেলা যাইতেছে। কি বল হে ভট্টাচার্য্য?" —সেই মাত্র একজন ভট্টাচার্য্যকে অশাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া উপহাস করিয়াছে। ভট্টাচার্য্য প্রমাণ করিবেন, শাস্ত্রজ্ঞান তাঁহার পূর্ণমাত্রায় আছে। তিনি বলিলেন—"টাকা ধরিয়া দিলে শাস্ত্রের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় নাকি?"

সেই স্থানে কন্যাযাত্রী কলেজের একজন জ্যাঠা ছোকরা চশমা আঁটিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সে বলিল—"ঢের দেখেছি, আর ভট্টাচার্য্যগিরি ফলাতে হবে না। নর শব্দ রূপ কর দেখি?"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে আসন ছাড়িয়া একলম্ফে উঠানে নামিয়া পড়িলেন। দুই হাত অতি বেগে ঝাড়িয়া বলিলেন—"এ বিবাহে যদি আমি মন্ত্র বলাই তবে আমার চতুর্দ্দশ পুরুষ নরকস্থ হইবে।"

বরপক্ষীয় পাঁচজন হাঁ হাঁ করিয়া পড়িল—"ভট্টাচার্য্য মহাশয়, করেন কি! করেন কি!" ভট্টাচার্য্য বরকর্ত্তাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"যদি ব্রহ্মশাপের ভয় থাকে তবে উঠাও বর।"

বর বলিল—"আমি ও আংগুলকাটা মেয়েকে বিবাহ করিব না"—বলিয়া সে আসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল।

পাড়ার যাহারা উপস্থিত ছিল, তাহারা বরের এবম্বিধ আচরণ দেখিয়া বলিয়া উঠিল "কি! বিবাহ করিবে না? লাঠির চোটে মাথায় খুলি ভাংগিয়া দিব না!"

শৈলবালার মূর্চ্ছা হইয়াছিল। এতক্ষণ কেহ তাহার খবর রাখে নাই। একটা দাসী শ্যামাচরণকে ঠেলিয়া বলিল—"ওগো বাবু, মেয়ে যে এলিয়ে পড়ল।" তৎক্ষণাৎ শৈলকে ধরাধরি করিয়া অন্যত্র পাঠান হইল।

এই গোলমালটা থামিলে বরকে আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। বলিয়াছি, প্রথমাবধিই সে বিবাহ করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক ছিল। পিতামাতার একান্ত উৎপীড়নে বিবাহ করিতে আসিয়াছিল। সে এই সুযোগে চম্পট দিল।

মুখে চোখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপ্টা দিয়া, বাতাস করিয়া, অনেক কষ্টে, শৈলবালার চেতনা সম্পাদিত হইল। শৈলর মা কাঁদিয়া বলিলেন—"উহাকে আর বাঁচাইয়া কি হবে গো। উহার যে কপাল পুড়িল।"

আমরা এতক্ষণ মোহিনীর কোনও উল্লেখ করি নাই। সে কলিকাতাতেই ছিল। আশু বলিল—"বাবা, আমি মোহিনীকে আনিয়া বিবাহ দিব।" এই বলিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে নিজের ডেস্ক হইতে একখানা বৃহৎ ছুরী বাহির করিয়া লইয়া পাগলের মত মোহিনীর বাসার উদ্দেশে ছুটিল। বাসার দরজা তখনও বন্ধ হয় নাই। দুইটা তিনটা করিয়া সিঁড়ি ডিঙাইয়া দোতলার ছাদে গিয়া পৌঁছিল। দোতলার ছাদে একটি মাত্র কক্ষ, তাহাতে মোহিনী একাকী থাকিত। দুয়ার বন্ধ, ঘরে আলো জ্বলিতেছে। কম্পিত স্বরে আশু ডাকিল—"মোহিনী, মোহিনী!" মোহিনী উঠিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল। সংক্ষেপে আশু মোহিনীকে সমস্ত ঘটনা বলিয়া বলিল,—"ভাই তুমি এ রাত্রিতে আমার ভগ্নীকে বিবাহ করিয়া আমাদের জাতি কুলমান রক্ষা কর। নহে ত বল, এই ছুরী আনিয়াছি, তোমার সম্মুখে আত্মহত্যা করিব।"

মোহিনী আপাদমস্তক শিহরিয়া আশুর হাত হইতে ছুরী কাড়িয়া লইল। বলিল, "ভাই, চল, আমি তোমার ভগ্নীকে বিবাহ করিব। আত্মহত্যা করিতে হইবে না।"

মোহিনীর চক্ষু দিয়া দরদর ধারায় অশ্রু বহিল। এই রাত্রে যে শৈলবালার বিবাহ, তাহা সে পূর্ব্বাবধিই অবগত ছিল। টেবিলের উপর একখানি কাগজ পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাতে সে দুই মিনিট পূর্ব্বে "বিসর্জ্জন" নাম দিয়া একটি কবিতা আরম্ভ করিয়াছে:—তাহার শেষ পংক্তিটির কালি এখনও শুকোয় নাই।

চটিজুতা পায়ে, আলুথালু বেশে, মোহিনী আশুর সঙ্গে চলিল। তখন রাত্রি দশটা হইবে। একটার মধ্যে শৈলবালার সঙ্গে মোহিনীর শুভবিবাহ যথাশাস্ত্র সম্পন্ন হইয়া গেল।

পাঠক, রাগ করিবেন না। ঘটনাটা কিছু নভেলিয়ানা রকমের হইল বটে;—কিন্তু এ জগতে বাস্তবজীবনেও যে প্রতিদিন শত শত নভেলের ঘটনা ঘটিতেছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥ দ্বিরাগমন

মোহিনী পিতার বিনা অনুমতিতে তাঁহার অজ্ঞাতসারে বিবাহ করিয়া ফেলিল। কিন্তু পিতা ইহা শুনিয়া কি বলিবেন? তিনি যদি এই অপরাধ ক্ষমা না করেন?—বিবাহের পর এই ভাবনা মোহিনীর ও তাহার শ্বশুরের প্রধান ভাবনা হইল।

শ্যামাচরণবাবু কন্যাদায় হইতে উদ্ধার হইয়াছেন; মোহিনীকে জামাতা পাইয়া তাহার বহুদিনের সযত্নপালিত আকাঙ্ক্ষাটি পূর্ণ হইয়াছে; কিন্তু, এই একটা সমস্যার জন্য আনন্দটুকু প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিতে পারিতেছেন না। গৃহিণী বলেন,—"কে জানে বাপু, কপালে কি আছে! ছেলের মা বাপ বউকে নিলে হয়।"

শ্বশুরবাড়ীতে প্রায়ই মোহিনীর নিমন্ত্রণ হইতে লাগিল। শনিবার ত ফাঁক যায় না। মোহিনী একদিন শৈলকে বলিল—"দেখ শৈল, আমি মনে মনে ভাবি যে ভাগ্যে তোমার ব্যাগুলোটি কাটিয়াছিল—তাইত—নহিলে এতদিন তুমি—।" আর বলিতে পারিল না। সে অবস্থা কি কল্পনাতেও আনিতে পারা যায়? শৈল স্বামীর এই অসমাপ্ত কথাটুকু বুঝিল। পাটাপুকুরের অনেক কথা তখনও সে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয় নাই। মনে মনে বলিল—ঈশ্বর যাহা করেন, মঙ্গলের জন্যই করেন।

মোহিনী যখনই আসিত, তখনই শৈলর জন্য কিছু না কিছু সখের জিনিষ লইয়া আসিত, কিন্তু শৈল মহা আপত্তি করিত—কিছুতেই লইবে না। বলিত,—"কোথায় রাখব? সবাই দেখে ফেলবে।" মোহিনীও ছাড়িত না, বলিত,—"দেখে দেখবে, তুমি ত আর চুরি করছ না।" শেষকালে শৈলকে লইতে হইত, নহিলে স্বামী রাগ করেন। বিশেষ চেষ্টা করিত, যাহাতে কেহ জানিতে না পারে, কিন্তু প্রত্যেক বারেই তাহার সকল চেষ্টা নিষ্ফল হইত। ধরা পড়িয়া প্রথম প্রথম লজ্জায় যেন সে মরিয়া যাইত; কিন্তু বারকতক এইরূপ হইতে হইতেই লজ্জা অনেক হ্রাস হইয়া আসিল।

মোহিনী শৈলকে একবার বলিল,—"আমাকে পত্র লিখো, নইলে এ শনিবার আমি আসব না।" শৈল অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া বলিল,—"কি লিখতে হয় আমি কি তা জানি?"

"তোমার দিদি তাঁর স্বামীকে যে সব চিঠি লেখেন, তা কি তুমি দেখনি?"

"হাঁ, কতবার দিদি আমাকে দেখিয়েছে।"

"সেই রকম তুমিও লিখবে।"

শৈল মাথা নাড়িয়া বলিল—"সে আমার ভারি লজ্জা করবে;—সে আমি পারব না।"

"দিদির কেন লজ্জা করে না?"

"আগে দিদির মত বড় হই"—একথা বলিয়াই শৈল হাসিয়া ফেলিল। সে বেশ বুঝিল এ ওজরটি নিতান্তই "পঙ্গু" হইতেছে। তাহার সমবয়স্কাদের সকলেরই বিবাহ হইয়া গিয়াছে। স্বামীকে সকলেই চিঠি লেখে। চিঠি লিখিতে ইচ্ছা তাহারও হইত কিন্তু সে কথা কি স্বামীর কাছে স্বীকার করিতে আছে? ছি! বেহায়া মনে করিবেন যে

চিঠি লিখিবার জন্য শৈলকে বেশী বড় হইতে হইল না; দুই তিন সপ্তাহ বয়স বাড়িতে না বাড়িতেই সে স্বামীকে চিঠি লিখিতে আরম্ভ করিল। প্রথম প্রথম চিঠিগুলি নিতান্তই [illegible] হইত। ক্রমে বাড়িয়া বাড়িয়া দুই তিন পৃষ্ঠা করিয়া হইতে

লাগিল। কোন বিশেষ কথা থাকলে চার পৃষ্ঠাও পূরিয়া যাইত।

ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা দারুণ দুর্ভাবনা বহন করিয়াও এই নবদম্পতীর জীবন বেশ সুখে কাটিতে লাগিল। ক্রমে গ্রীষ্মাবকাশ নিকটে আসিল। মোহিনীকে বাড়ী যাইতে হইবে। দুই তিন মাস দেখাশুনা হইবে না, এই আশঙ্কায় দুই জনে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িল। শৈল বলিল,—"কোনও উপলক্ষ্য করিয়া মাঝখানে একবার কলিকাতায় আসিতে পারিবে না?"

মোহিনী বাড়ী গেলে বাড়ীর লোক তাহাকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। মুখ-চক্ষুর ভাব যেন সমস্তই পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মোহিনী কি ভাবে,, ভাবিতে ভাবিতে একদিক পানে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে। কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া কেহ কিছু উত্তর পায় না।

একদিন পাড়ার একজন প্রবীণা দিদিমা, মোহিনীর সাক্ষাতে তাহার মাকে বলিলেন, "ছেলে ষেটের বড় হয়েছে—বিয়ে দাওনি—তাই মন গুমিয়ে থাকে।" ইহা শুনিয়া মোহিনী ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। পরক্ষণেই তাহার মুখ শুকাইয়া বিবর্ণ হইয়া গেল। মোহিনীর মা ইহা লক্ষ্য করিলেন। সে অন্যত্র চলিয়া গেলে দিদিকে বলিলেন,—"ঠিক বলেছ বাছা। আমি কর্ত্তাকে বলে শীঘ্রই ওর বিবাহ দিচ্ছি।"

গ্রামের পোষ্টমাষ্টার মোহিনীর একজন প্রিয় বন্ধু। তাহাকে বলা ছিল, মোহিনীর পত্রাদি বাড়ীতে না পাঠাইয়া যেন ডাকঘরেই রাখা হয়, মোহিনী স্বয়ং গিয়া লইবে। একদিন পোষ্টমাষ্টার কার্য্য উপলক্ষ্যে গ্রামান্তরে গিয়াছিল। যথাসময়ে ডাক আসিল। অধীনস্থ পিয়ন নিজেই ব্যাগ খুলিয়া পত্রগুলি বিলি করিল। পল্লীগ্রামের ডাকঘরে এরূপ মধ্যে মধ্যে হইয়া থাকে। দৈবক্রমে সেই সঙ্গে শৈলবালার লিখিত, মোহিনীর একখানি পত্র ছিল; তাহা মোহিনীদের বাড়ীতে আসিয়া পড়িল। এত লোক থাকিতে, পত্রখানি কি ছাই মোহিনীর ছোট বোন্ মালতীর হাতেই পড়িতে হয়? মোহিনী তখন বাড়ী নাই। পত্রখানির আবরণ রঙ্গীন সমচতুষ্কোণ, এসেন্সের গন্ধে ভুর ভুর করিতেছে। মালতীর কেমন সন্দেহ হইল। তৎক্ষণাৎ সে জল দিয়া পত্রখানি খুলিয়া ফেলিল।

পত্র পড়িয়া মালতী অবাক্। ছুটিয়া মার কাছে গিয়া বলিল,—"মা সর্ব্বনাশ হয়েছে। দাদার স্বভাব চরিত্র বিগড়ে গেছে।"

মা পত্রখানি পড়িয়া দেখিলেন। মেয়ের কথায় তাঁহার কোনও সংশয় রহিল না।

ওবাড়ীর বড়বউ এই সময় আসিয়া পেঁছিলেন। তিনি পত্র পড়িয়া বলিলেন,—"আমি জানি, আমার খুড়তুতো ভাই কলকাতায় পড়ত। তারও ঐ রকম হয়। সেও চিঠি ধরা পড়াতে জানাজানি হয়েছিল। তারপর আমরা ধরে বেঁধে তার বিয়ে দিলাম। এখন রোগ শুধ্রেছে। একেবারে বউয়ের কেনা গোলাম হয়ে রয়েছে। তা তোমরাও মোহিনীর বিয়ে দিয়ে ফেল।"

গৃহিণী বলিলেন,—"আমরা যে জানতে পেরেছি, তা যেন মোহিনী না শোনে! হয়ত বাছা লজ্জায় আত্মহত্যা করে ফেলবে; নয়ত বিবাগী হয় বেরিয়ে যাবে। চিঠি জুড়ে ঠিকঠাক করে তোমরা রেখে দাওগে।"

তাহাই হইল। মোহিনী যথাসময়ে আসিয়া পত্র পাইল। খুলিতে গিয়া দেখে, পরিষ্কার একটি জলের দাগ। একবার বন্ধ করিয়া যে আবার খোলা হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ রহিল না। ভাবিল বাড়ীতে কেহ নিশ্চয়ই ইহা খুলিয়াছে। কিন্তু পত্রের ভিতর একটা পুনশ্চ ছিল। হয়ত শৈলবালাই পত্র বন্ধ করিয়া ঐ পুনশ্চটির জন্য আবার খুলিয়া থাকিবে। যাহা হউক বিস্ময়ে সন্দেহে মোহিনী পত্রখানি ডেস্কে বন্ধ করিয়া রাখিল।

গৃহিণী যথাসময়ে একথা কর্ত্তার কাণে তুলিলেন। কর্ত্তা বলিলেন,—"ক্ষেপেছ, তাও কি সম্ভব? ও হয়ত কোনও বন্ধু এয়ার্কি করে ওরকম লিখেছে। ছেলের ছেলের

অমন করে।" গৃহিণী মনে মনে বলিলেন,—"হে মা কালীঘাটের কালী! তাই যেন হয়। আমার বাছার এ দুর্নাম যেন বেঁচে থাকতে আমায় শুনতে না হয়।"

পরদিন একথা শুনিয়া ওবাড়ীর বড়বউ বলিলেন,—"আচ্ছা, এ বিষয়ের তদন্ত আমরা করছি।"

মোহিনীর অনুপস্থিতিতে, বড়বউ মালতীকে লইয়া ভিন্ন চাবি দিয়া মোহিনীর কলি-কাতার তোরংগ খুলিয়া ফেলিলেন। বিস্তর খুঁজিতে হইল না। একখানি লাল রেশমী রুমালে বাঁধা এক তাড়া চিঠি। সবই এক হস্তাক্ষরে লিখিত। সবগুলিই প্রণয়ের চিঠি। প্রিয়তম, প্রাণসখা, অভিন্ন হৃদয় ইত্যাদি বলিয়া আরম্ভ। তোমার শৈলবালা, তোমার আমি, তোমার শৈ, তোমার সাধের সই—ইত্যাদি বলিয়া শেষ। অনেকগুলাতেই লেখা, তুমি শনিবারে নিশ্চয় আসিবে। আশা দিয়া নিরাশ করিও না। অধিনী আশাপথ চাহিয়া রহিল।

বেশী পড়িবার সময় নাই, কি জানি যদি হঠাৎ মোহিনী আসিয়া পড়ে। সমস্ত চিঠি পড়িলে কিন্তু প্রকৃত কথা প্রকাশ পাইতে পারিত। কারণ আমরা জানি একখানিতে লেখা ছিল—"আমাকে গোপনে বিবাহ করিলে, মা বাপ জানিলেন না, কি উপায় হইবে", —ইত্যাদি।

বড়বউ ও মালতী আসিয়া মাকে বলিল,—"মা, আর কোনও সন্দেহ নেই। গাদা গাদা চিঠি।" এই বলিয়া সংক্ষেপে দুই চারিখানির মর্ম্ম ও শুনাইয়া দিল। মা শুনিয়া বাষ্পাকুললোচনে ঠাকুর দেবতার কাছে মানত করিলেন—"বাছাকে আমার ডাকিনীর হাত থেকে উদ্ধার কর,—আমি পূজো দিব।"

সমস্ত কথা শুনিয়া কর্ত্তা আর কিছু বলিতে পারিলেন না। গৃহিণী বলিলেন,—"আর ওকে কলকাতায় পাঠিয়ে কায নেই। একটি সুন্দরী ডাগর মেয়ে দেখে বিয়ে দাও, আমি একটি পয়সাও চাই নে।"

কর্ত্তা বিরক্তির সহিত বলিলেন—"এতদিন ত কোনকালে বিবাহ হয়ে যেত। তুমি যে এক বারোহাত লম্বা ফর্দ্দ বের করে বসলে। ব্রাহ্মণ মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে অভিশাপ দিতে দিতে চলে গেল। তার শাপেই ত এ সব হল।"

গৃহিণী বলিলন—"তার মেয়েকে যদি মোহিনীর পছন্দ হয়ে থাকে তবে তারই সংগে বিয়ে দাও। তারা যা পারে তাই দেবে।"

কিন্তু কর্ত্তা এ প্রস্তাবে রাজি হইলেন না। বলিলেন,—"তাও কি হয়? একবার ফিরিয়ে দিয়েছি। আবার কোন মুখে বিবাহের প্রস্তাব পাঠাব? দেশে কি আর সুন্দরী বড় মেয়ে নেই?"

গৃহিণী বলিলেন—"ত যেখানে হয় দাও। আর কিন্তু দেরী করলে চলবে না।"

সেই গ্রামেই অবিলম্বে এক বিবাহযোগ্যা কন্যা বাহির হইল। যখন টাকাকড়ি সম্বন্ধে আর হাংগামা নাই, তখন মনোমত পাত্রীর অভাব কি?

এক সপ্তাহের পর বিবাহের দিন স্থির হইল। মোহিনী বলিল, আমি বিবাহ করিব না। অনেক পীড়াপীড়ি কান্নাকাটি চলিল। শেষে মোহিনী মাকে বলিল—"আমার একটা প্রস্তাব আছে, তাতে যদি আপত্তি না কর, তবেই আমি এ বিবাহে সম্মতি দিতে পারি।"

"কি প্রস্তাব?"

"শ্যামাচরণবাবুদের সপরিবারে এ বিবাহে নিমন্ত্রণ করে আনতে হবে।"

"সে আর বিচিত্র কি? তবে কেমন কেমন দেখায় না? যে মেয়ের সংগে তোমার বিয়ের কথা হয়েছিল, তার বিয়ে হয়ে গিয়েছে?"

"হাঁ, সে গত অগ্রহায়ণ মাসেই হয়ে গিয়েছে।"

মা বলিলেন—"আচ্ছা, কর্ত্তাকে বলে' দেখব।"

বহু কষ্টে কর্ত্তা রাজি হইলেন। মোহিনী স্বয়ং কলিকাতায় গিয়া ইঁহাদিগকে আনিতে চাহিল। কিন্তু তাহাতে কেহই সম্মত হইলেন না। সকলেই সন্দেহ করিলেন,

এ কেবল পলাইয়া বিবাহ বন্ধ করিবার একটা ছল মাত্র।

অগত্যা মোহিনী এক দীর্ঘ পত্রে সমস্ত কথা শ্বশুরকে জানাইল। যাহা যাহা ঘটিয়াছে অকপটে তৎসমুদয়ই বর্ণনা করিল। বলিল, ঘটনা আর গোপনে রাখা চলে না। আমি যেমন আপনার বিপদে সহায়তা করিয়াছি, আপনি সেইরূপ আমাকে এ বিপদ হইতে মুক্ত করুন। আমি পারিব না,—আপনি আসিয়া সমস্ত খুলিয়া বাবাকে বলুন। আর যে ব্রাহ্মণকে কন্যাদায় হইতে মুক্ত করিবেন বলিয়া বাবা প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, সেই ব্রাহ্মণের কন্যার সহিত আশুর বিবাহ দিন। তাহা হইলেই সকল দিক রক্ষা হয়।

শ্যামাচরণ পত্র পাইয়া অনেক কষ্টে আফিসে ছুটি লইলেন। যে দিন বিবাহ সেই দিন বেলা দশটার সময় সপরিবারে মোহিনীদের বাড়ীতে পৌঁছিলেন।

সেই বৈঠকখানা আবার আজ লোকপূর্ণ। স্বর্ণকার বিবাহের অলঙ্কার লইয়া উপস্থিত। রায় মহাশয় মধ্যস্থলে বসিয়া সভা উজ্জ্বল করিতেছেন। শ্যামাচরণবাবুও সেইখানে বসিলেন। রায় মহাশয় ভারি অপ্রতিভ;—আদর অভ্যর্থনা যেন একটু অতিরিক্ত মাত্রায় করিলেন। বেলা হইয়াছে, স্নানাহারের জন্য অনুরোধ করিলেন।

শ্যামাচরণবাবু বলিলেন—"আমাকে যদি একটি ভিক্ষা দেন, তবেই আমি আহার করিব।" অত্যন্ত উৎসুক হইয়া কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—"ব্যাপারখানা কি বলুন দেখি?"

তখন সেই গৃহপূর্ণ লোকের সম্মুখে শ্যামাচরণবাবু কন্যার বিবাহের ইতিহাস আদ্যোপান্ত বিবৃত করিলেন। তাহার পর মোহিনীর পত্রখানি বাহির করিয়া পাঠ করিলেন। শেষে সহসা রায় মহাশয়ের পা দুখানি জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—"আপনার বিনা অনুমতিতে যে এ কার্য্য হইয়া গিয়াছে, আর এতদিন যে আপনার নিকট ইহা গোপন রাখা হইয়াছে, তাহার জন্য আমাকে আর আপনার পুত্রকে ক্ষমা করিতে হইবে।"

সকলেই বলিল,—যাহা হইয়াছে, তাহা ভালই হইয়াছে। এমন বিপদে মোহিনী যে ব্রাহ্মণের জাতি রক্ষা করিয়াছে, সে কুলোচিত কার্য্যই করিয়াছে। রায় মহাশয়েরা গ্রামের জমিদার; বংশাবলীক্রমে চিরদিনই বিপন্নের বন্ধু।

হরেকৃষ্ণবাবু বৈবাহিককে সাদরে উঠাইয়া বলিলেন,—"ভাই, আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তোমাকে ক্ষমা করিলাম। তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ-বন্ধন হয় ইহা পূর্ব্ব হইতেই আমার ইচ্ছা ছিল। নারায়ণ সে ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন। এখন তোমরা বস, আমি বধূমাতার মুখ দেখিয়া আসি।"

স্বর্ণকারের নিকট হইতে কয়েকখানা অলঙ্কার লইয়া রায় মহাশয় বধূ দেখিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। বাড়ীর লোকে শুনিয়া অবাক্। বিস্ময়ের ঢেউ কতকটা প্রশমিত হইলে বধূকে বরণ করিবার ধূম পড়িয়া গেল।

সন্ধ্যাবেলায় শ্রীমান্ আশুতোষের সহিত সেই কন্যার শুভবিবাহ সম্পন্ন হইল। মেয়েরা ছাড়ে নাই: মোহিনীকেও বাসরে গিয়া গান গাহিতে হইয়াছিল।

[চৈত্র, ১৩০৫]

হিমানী

প্রথম পরিচ্ছেদ

মণিভূষণ আজ হিমানীর নিকট চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিতে আসিয়াছে।

হিমানীর পিতা বাবু কালিদাস মিত্র খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী,—কলিকাতার একটি প্রসিদ্ধ মিশনারি কলেজের অধ্যাপক। মণিভূষণ আজ পাঁচ বৎসর যাবৎ এই কলেজের ছাত্র। কলেজে মণিভূষণের মত প্রতিভাসম্পন্ন ছাত্র দুইটি ছিল না। যেমন তাহার মেধা, তেমনি বুদ্ধি;—তাহার উপর আবার ঈশ্বর তাহাকে প্রচুর দেহসৌন্দর্য্যের অধিকারী করিয়া মণি-কাঞ্চনযোগ সাধন করিয়াছিলেন। অধ্যাপক মিত্র মণিভূষণকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন।

মণিভূষণ তাঁহার বাটীতে সর্ব্বদাই যাতায়াত করিত। অনেকবার চা পান করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া, রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত সে গুরুগৃহে অতিবাহিত করিয়া গিয়াছে। অধ্যাপকের পরিবারস্থ সকল স্ত্রী-পুরুষের সহিত সে অবাধে মিশিতে পাইত। মণিভূষণ সুকণ্ঠ গায়ক, চিত্রবিদ্যানিপুণ, চমৎকার করিয়া ইংরাজি ও বাঙ্গালা কবিতা আবৃত্তি করিতে পারে, —এই সমস্ত গুণের জন্য সে সকলেরই স্নেহভাজন হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সে যে সর্ব্বনাশ করিয়া বসিয়াছে! আপনার পায়ে আপনি কুঠার মারিয়াছে—এবং অন্যের পায়েও মারিয়াছে। দিনে দিনে অল্পে অল্পে সে অধ্যাপকের কুমারী কন্যা হিমানীর হৃদয় অধিকার করিয়াছে এবং নিজেও হিমানীকে ভালবাসিয়া মরিয়াছে! মণিভূষণ হিন্দু,— তাহার পিতা মাতা, আত্মীয় স্বজন, সকলেই গোঁড়া হিন্দু। তাহাতে আবার সে বিবাহিত! খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া যে হিমানীর পাণিগ্রহণ করিবে, সে পথও বন্ধ। সে যে বিবাহিত, তাহা এই পরিবারে কাহারও অবিদিত ছিল না,—হিমানীও তাহা প্রথমাবধিই জানিত। তাহাদের পরিণয় অসম্ভব জানিয়াও কেন তাহারা যে পরস্পরকে প্রথমে ভালবাসিতে আরম্ভ করিল,—কেন যে সেই ভালবাসা অঙ্কুরে বিনাশ না করিয়া মনোমধ্যে স্নেহবারিসিঞ্চনে পরিপুষ্ট, পল্লবিত, মঞ্জরিত করিয়া তুলিল, আমি তাহার কি সদুত্তর দিব?

উভয়ের মনোভাব যখন ক্রমে বিপজ্জনক অবস্থায় পরিণত হইল, যখন জানাজানি হইল, তখন সেই প্রবীণ অধ্যাপক ও তাঁহার পত্নী, কি উপায় হইবে, এই পরামর্শ স্থির করিতে বসিলেন। ইহাদিগকে চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া ছাড়া আর অন্য উপায় দেখা গেল না। অধ্যাপক মিত্রের অন্তঃকরণটি বড়ই কোমল ছিল;—তিনি সাশ্রুনয়নে মণিভূষণকে পরামর্শের কথা জানাইলেন। মণিভূষণ বুদ্ধিমান—বলিবামাত্রই সম্মত হইল। কিন্তু বলিল—"যাহা হইবার, তাহা ত হইয়াই গিয়াছে, একবার হিমানীর নিকট জীবনের শেষ বিদায় গ্রহণ করিবার অনুমতি দিন।" তাহার ভিক্ষামিনতিপূর্ণ সকাতর চক্ষু দুইটি দেখিয়া অধ্যাপক প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না,—সম্মত হইতে হইল।

তাই আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বে মণিভূষণ আসিয়া, সযত্নরক্ষিত হিমানীর ফোটোগ্রাফখানি, তাহার হাতের খান চারি পাঁচ পত্র—এই সাধারণ নিমন্ত্রণ পত্র—হিমানীর উপহার একটি শুষ্ক পুষ্পগুচ্ছ এবং একখানি কবিতাপুস্তক, এই সমস্ত প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর দ্রব্যগুলি হিমানীর পিতার হস্তে সমর্পণ করিয়া হিমানীর সঙ্গে শেষ দেখা করিতে চলিল।

আজ সমস্ত দিন হিমানী একাকিনী নিজকক্ষে অবস্থান করিয়াছে। কিয়দ্দূরে টেবিলে তাহার ভোজনসামগ্রী অভুক্ত পড়িয়া। শরীর অতিশয় উষ্ণ। চক্ষু দুইটি রক্তকমলের মত বর্ণ ধারণ করিয়াছে। গণ্ডস্থলে অশ্রুধারা একটিবার শুকাইবার অবসর পায় নাই। মণিভূষণ অতি সঙ্কুচিত পদক্ষেপে তাহার কক্ষে প্রবেশ করিল। জানালার কাছে টেবিলের নিকট একখানি সোফায় হিমানী মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ছিল, মণিভূষণ গিয়া সেই সোফায় উপবেশন করিল। ইতিপূর্ব্বে আর সে কখনও হিমানীর সহিত একাসনে বসিবার সুখ উপভোগ করে নাই। হিমানীর একখানি সুকোমল তপ্ত হস্ত লইয়া মণিভূষণ নিজ হস্তযুগলের মধ্যে রক্ষা করিল। কথা যাহা যাহা বলিবে মনে করিয়া আসিয়াছিল, তাহার একটিও বলিতে পারিল না। সন্ধ্যা দশটার মেলে মণিভূষণ দেশে যাইবে। ক্রমে তাহার বিদায়গ্রহণের নিষ্ঠুর মুহূর্ত্ত নিকট হইতে নিকটতর হইতে লাগিল। অনেক কষ্টে অশ্রুরোধ করিয়া গদ্গদস্বরে দুই চারি কথা বলিতে পারিল মাত্র। হিমানী তাহার উত্তর দিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। ইহজগৎকে কেন জানি না মণিভূষণের পরজগৎ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। হিমানীর অশ্রুধৌত ক্ষুদ্র সুন্দর মুখখানি হাতে করিয়া তুলিয়া সেই স্বল্পালোকে নিরীক্ষণ করিল। আত্মবিস্মৃতির মোহে সে সমাজ ভুলিল, নীতি ভুলিল, পাপপুণ্য ভুলিল, বিবেকবুদ্ধি বিসর্জ্জন দিল; সহসা আপনার পিপাসাদগ্ধ ওষ্ঠযুগল হিমানীর ওষ্ঠে

মিলিত করিল। হিমানীর চক্ষু মুদ্রিত ছিল; সে চমকিল, কিন্তু মুখ সরাইল না।

সহসা যেন মণিভূষণের হৃদয়ে অশান্তির তুফান কিয়ৎ পরিমাণে প্রশমিত হইল। সে উঠিয়া হিমানীকে বলিল,—"তবে যাই।"—"তবে আসি" কথাটাই মুখে আসিয়াছিল, কিন্তু সংশোধন করিয়া বলিল, "তবে যাই।" বলিয়া ঠিক মাতালের মত টলিতে টলিতে সেই গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

হিমানী সেই সোফায় মুখ লুকাইয়া লুটাইয়া পড়িল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উল্লিখিত ঘটনার পর তিনটি বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে আমাদের মণিভূষণের জীবনে প্রভূত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সামন্তপুর গ্রামের উত্তর সীমা হইতে কিছুদূরে সরস্বতী নামে একটি ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত। প্রস্থে চারি পাঁচ হাতের বেশী হইবে না। বৎসরের অধিকাংশ সময়ই হাঁটিয়া পার হওয়া চলে। দুই তীরে আমবাগান, বাঁশঝাড়, ঝাউবন প্রভৃতি শাখাবিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া সূর্য্যাতাপ হইতে এই ক্ষীণতোয়া নদীটিকে রক্ষা করিতেছে।

এই নদীর তীরে মণিভূষণের নবনির্ম্মিত আবাস গৃহ। বাংলো ধরণের একটি ক্ষুদ্র বাড়ী। চারিপার্শ্বে দেশী বিলাতী নানাজাতীয় ফল ফুল ও পাতার গাছ। বাগান ঘিরিয়া সবুজ রং করা লোহার রেলিং।

এই গৃহে মণিভূষণ একাকী বাস করে। এখন তাহার বিস্তৃত ইষ্টকের ব্যবসায়। সরস্বতীর উভয়তীরে যতগুলি পাঁজা দেখা যাইতেছে, সমস্তই তাহার। যখন কলেজে পড়িত, তখন রসায়ন শাস্ত্রের প্রতিই তাহার অধিক অনুরাগ ছিল। বিভিন্ন স্থানের মৃত্তিকার রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়া সে জানিয়াছে, এই স্থানের মৃত্তিকাই ইষ্টক নির্ম্মাণের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী। বিলাত হইতে এই ব্যবসায় সম্বন্ধীয় রাশি রাশি পুস্তক আনাইয়া সে পাঠ করিয়াছে। এক বৎসরকাল ক্রমাগত টেষ্টট্যুব্ ভাঙ্গিয়া এবং স্পিরিট্ পোড়াইয়া একটি চূর্ণ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছে, যাহা কাদায় মিশাইলে ইষ্টক বেশ লাল আর খুব শক্ত হয়। এই উৎকর্ষের জন্যই মণিভূষণের ইষ্টকের অনেকদূর পর্য্যন্ত এত আদর।

এই গৃহে একটি অনতিপ্রশস্ত সুসজ্জিত কক্ষ আছে, সেটি মণিভূষণের আফিস। খাতা ও পুস্তকভরা কাচের আলমারি, টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি সমস্ত আসবাবই সাহেবী কেতায় সজ্জিত;—এমন কি চুরুটের ছাই ঝাড়িবার পাত্রটি পর্য্যন্ত যথাস্থানে রক্ষিত আছে। আজ বৈশাখের মধ্যাহ্নে মণিভূষণ আপনার নির্জ্জন আফিসগৃহে উপবিষ্ট হইয়া ইষ্টকের হিসাব করিতেছিল না,—কবিতা লিখিতেছিল। তাহার পরিচ্ছদও সাহেবী;—খৃষ্টানদের সঙ্গে মেলামেশা করার দরুণ পূর্ব্বাবধিই তাহার আদব কায়দা সমস্ত সাহেবী হইয়া গিয়াছিল।

মণিভূষণের সম্মুখে যে একখানি সুন্দর বিলাতী বাঁধাইকরা খাতা রহিয়াছে সেখানি প্রেমের কবিতা পরিপূর্ণ। এক একবার সে খাতাখানির এখানে ওখানে খুলিয়া পড়িতেছিল, আবার বন্ধ করিয়া রাখিতেছিল। কবিতাগুলি সমস্তই স্ত্রীলোকের উক্তি। আগাগোড়া লেখা, শ্রীমতী হিমানী দেবী বিরচিত।

কিয়ৎক্ষণ কবিতা লেখার পর দেরাজ হইতে মণিভূষণ তিনখানি চিত্র বাহির করিল;—তিনখানিতেই হিমানী। প্রথমখানিতে হিমানীর কুমারী-বেশ; সুন্দর ঢল ঢল মুখখানি; চক্ষু দিয়া সরলতা উছলিয়া পড়িতেছে; যেন কাহার নিকট কি শুনিয়া, ঈষৎ বিস্ময়ের হাসি হাসিতেছে। দ্বিতীয়খানিতে হিমানী বিবাহসাজে সজ্জিতা;—মুখে সলজ্জ সুরক্তিম হাসির আভা ফুটিয়া উঠিতেছে। চক্ষু আনত। হিমানী যেন

আপনাকে আপনি লুকাইবার জন্য ব্যস্ত। শেষের খানিতে যুগলমূর্ত্তি। হিমানী ও মণিভূষণ পরস্পরের মুখের পানে সপ্রেম দৃষ্টিতে চাহিয়া। সে দৃষ্টিতে অতৃপ্তি, মোহ ও চাঞ্চল্য মাখান একটা ভাব নিপুণতার সহিত চিত্রিত।

যদি কেহ মনে করিয়া থাকেন যে, হিমানীর সঙ্গে মণিভূষণের বিবাহ হইয়া গিয়াছে, তবে তিনি ভ্রম করিয়াছেন। কলিকাতা পরিত্যাগের পর হইতেই মণিভূষণ হিমানী অথবা তাহার মাতাপিতার কোন সংবাদ পায় নাই এবং লয়ও নাই। হিমানী বাঁচিয়া আছে কি মরিয়া গিয়াছে তাহাও সে অবগত ছিল না।

বলিতে ভুলিয়াছি যে, মণিভূষণ এখন একটা বিষম চিত্তব্যাধিতে আক্রান্ত। ডাক্তারেরা ইহাকে 'মনোমেনিয়া' বলেন। এক প্রকার পাগল আর কি—সম্পূর্ণ পাগল নহে। এ রোগ যাহার হয় তাহার কেবল একটা কোনও নির্দিষ্ট বিষয়ে চিত্তবিকার ঘটে;—আর আর সমস্ত বিষয়ে তাহার মন সম্পূর্ণ অবিকৃত থাকে। কিন্তু একটু পূর্ব্বের ইতিহাস বলার প্রয়োজন।

বাড়ী আসিয়া মণিভূষণ অনেক চেষ্টা করিয়াছিল যাহাতে সে হিমানীকে ভুলিয়া তাহার পরিণীতা, ধর্ম্মপত্নী নবদুর্গাকে ভালবাসিতে পারে। জলমগ্ন মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে [illegible] মুখপথে ফুৎকারবায়ু প্রেরণ করিয়া কৃত্রিম নিশ্বাস প্রশ্বাস [illegible] স্বাভাবিক নিঃশ্বাস প্রশ্বাস পুনরাগমন করে। মণিভূষণ প্রথমে নবদুর্গাকে এইরূপ কৃত্রিম মৌখিক ভালবাসা জানাইতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে কিছু ফল দর্শিল না। সে নিজের সঙ্গে যে প্রাণান্তকর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, সেই যুদ্ধে যদি নবদুর্গার সহায়তা ও সহানুভূতি লাভ করিতে পারে, এই দুরাশায় একদিন তাহাকে সমুদয় আত্মবৃত্তান্ত অকপটে জ্ঞাত করিল। কিন্তু তাহাতে হিত না হইয়া বিপরীত হইল। স্বামীর মুখে যাহা শুনিল, তাহা ত নবদুর্গা বিশ্বাস করিলই, তাহা ছাড়া স্বামীর প্রতি অন্য সন্দেহ করিল; এবং স্বামীকে মিথ্যাবাদী, প্রতারক, ভণ্ডতপস্বী বলিয়া [illegible] হিমানীর প্রতিও আক্রমণ করিল। তাহার পর একটা বীভৎস [illegible] স্বামীকে বলিল, "তুমি আর আমায় স্পর্শ করিও না।"

ইহার পর স্বামী স্ত্রীতে বিচ্ছেদ হইল। মণিভূষণ জ্বরে পড়িল; কয়েকদিনকাল খুব জ্বর রহিল; মস্তিষ্কবিকারের সূত্রপাত তখন হইতেই। নবদুর্গা যদি আত্মীয় স্বজনের একান্ত অনুরোধে মণিভূষণকে শুশ্রূষা করিবার জন্য তাহার কাছে যাইত, তাহা হইলে সে রাগিয়া চেঁচাইয়া অনর্থপাত করিয়া তুলিত। তাহার নিকট নবদুর্গা নাম পর্য্যন্ত করিবার যো ছিল না।

জ্বর নরম পড়িল, কিন্তু একেবারে ছাড়ে না। ডাক্তার বৈদ্যেরা পরামর্শ করিয়া নবদুর্গাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। কারণ নবদুর্গার প্রতি বিদ্বেষই এখন মণিভূষণের ব্যাধির প্রধান লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইল। জ্বর ক্রমে ছাড়িল বটে, কিন্তু মস্তিষ্ক সম্বন্ধে একটু গোলযোগ রহিয়া গেল। নবদুর্গার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলেই সে কেমন একরকম হইয়া যাইত। নবদুর্গাকে এই কারণে পিত্রালয় হইতে আনা হইল না, এবং পরিবার-মণ্ডলীতে তাহার সর্ব্বপ্রকার প্রসঙ্গ বর্জ্জিত হইল।

ইহার পর গ্রামের চতুর্দ্দিকে মণিভূষণ মৃত্তিকা পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিল। গ্রাম হইতে এক ক্রোশ দূরে সরস্বতী তীরে তাহার আফিসগৃহ পাঠক দেখিয়াছেন।

নির্জ্জনেই সে ভাল থাকিত; কেহই তাহার নির্জ্জনবাস সম্বন্ধে আপত্তি করিল না। যে দিন খেয়াল হইত, সেই দিন বাড়ী আসিত। দুই তিন দিন থাকিয়া আবার চলিয়া যাইত। সুতরাং নবদুর্গা পিত্রালয়েই রহিয়া গেল।

অতঃপর মণি আর হিমানীকে ভুলিতে চেষ্টা করিল না। মধ্যাহ্নে বিজন আফিস-গৃহে বসিয়া হিমানীর কথা ভাবিত। বাড়ী আসিবার সময় স্বেচ্ছায় হিমানীর ফোটো-গ্রাফখানি তাহার পিতাকে ফিরাইয়া দিয়া আসিয়াছিল, এখন সেজন্য অনুশোচনা উপস্থিত

হইল। কলেজে পাঠকালে সে চলনসই রকম ছবি আঁকিতে জানিত: হিমানীর একখানি ছবির জন্য সেই বিদ্যার শরণাপন্ন হইল। প্রথম প্রথম কিছুই মিলিল না; ক্রমে একটু আধটু সাদৃশ্যের ছায়া আসিতে লাগিল। চক্ষু দুইটির ভাব যেন কিছু কিছু মিলিল। ক্রমে ওষ্ঠযুগলের ভাবও আসিল। দুই মাস পরিশ্রমের পর হিমানীর একখানি অতি সুন্দর ছবি সমাপ্ত হইল। সে দিন মণিভূষণের কি আনন্দের দিন। কত আদরে সে স্বহস্তাঙ্কিত প্রিয়ামূর্ত্তিতে চুম্বন করিল: এখানি হিমানীর কুমারীবেশের ছবি।

ছবি শেষ হইলে মণিভূষণ ভাবিল, এখানি বাঁধাইয়া না রাখিলে নষ্ট হইয়া যাইবে। অন্য কাহারও হস্তে কলিকাতায় পাঠাইতে বিশ্বাস হইল না। স্বয়ং কলিকাতায় আসিয়া দোকানে বসিয়া থাকিয়া ছবি বাঁধাইল। কিন্তু যে দিন ছবি বাঁধাইল, সেই দিনই রাত্রে তাহার কাচ ভাঙিয়া ফেলিল। ছবিখানি বক্ষে চাপিলে আর পূর্ণ মিলন হইল না, মাঝমানে কাচের ব্যবধান রহিয়া গেল। ইহা কি সহ্য হয়? বিদ্যাপতির রাধিকাও ত ঐ কারণে গলায় হার পরিতেন না!

তাহার পর হিমানীর হইয়া সে নিজে কবিতা রচনা করিতে লাগিল। সংস্কৃত কবিরা লিখিয়াছিলেন, প্রেমিকা নায়িকা বিরহ-বিকারে নিজেকে নায়ক ভ্রম করিয়া নিজের প্রতি প্রেম সম্ভাষণ করিয়া থাকেন। মণিও তাহাই করিল। সে শুধু হিমানীর হইয়া কবিতা লিখিয়াই ক্ষান্ত রহিল না, হিমানীর হস্তাক্ষর পর্য্যন্ত অনুকরণ করিল: সে চিত্র-বিদ্যায় নিপুণ, তাহার পক্ষে ইহা বিশেষ কঠিন নহে। হিমানীর হস্তাক্ষরে কবিতা হিমানীর কবিতাবলী খাতায় তুলিতে লাগিল। হিমানীর ছবিখানি বাক্সের গায়ে দাঁড় করাইয়া কল্পনা করিত যেন হিমানী তাহার কবিতাগুলি একে একে আবৃত্তি করিয়া যাইতেছে। যেখানে ভাবের উন্মাদ গভীরতা আসিত, সেখানেই ছবিখানি লইয়া চুম্বন করিত। ক্রমে তাহার স্বরচিত হিমানীকে বিবাহের বেশে সাজাইয়া ছবিতে তাহাকে বিবাহ করিল। পাগল আর কাহাকে বলে?

এইরূপ করিয়া তিন বৎসর কাটিয়াছে: আজ সে তাহার নিভৃত নিকুঞ্জগৃহে বসিয়া কবিতা লিখিতেছিল।

বেলা একটা হইতে আকাশে মেঘ করিল। কিছুক্ষণ পরে ধূলায় চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া ঝড় উঠিল। খুব ঝড়। মণিভূষণের গৃহের উপরিস্থিত টিনের ছাদ পর্য্যন্ত কাঁপিতেছে। সে একবার বাহির হইয়া আকাশের পানে চাহিল। জল আসিতে বিলম্ব নাই।

ফিরিয়া চেয়ারে আসিয়া বসিল। মধ্যাহ্নের মেঘাচ্ছন্ন আলোক ঠিক সন্ধ্যালোকের মত দেখাইতেছিল। জানালার কাচের মধ্য দিয়া মণিভূষণ প্রকৃতির উন্মাদনৃত্য দেখিতে লাগিল। সহসা দেখিল, তাহার কম্পাউণ্ডের ভিতর, বাগানে, একটি স্ত্রী-মূর্ত্তি। চিনিতে মুহূর্ত্তও বিলম্ব হইল না,—হিমানী। হিমানীর বস্ত্রাদি বাতাসে উড়িতেছে; বাগানের গোলাপফুলের পাপড়ি খসিয়া আসিয়া তাহার চারিদিকে পড়িতেছে। হিমানী দাঁড়াইয়া চকিতা হরিণীর মত ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিতেছে।

মণিভূষণ কলের পুতুলের মত আসন ছাড়িয়া উঠিয়া গেল। বাগানে গিয়া হিমানীর মুখপানে চাহিল। তাহার পর হাতখানি ধরিয়া বলিল—"এস।"

হিমানী মণিভূষণের সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

তাহার পরিধানে একখানি মেখলা রঙের দেশী শাড়ী, সেই কাপড়েরই জ্যাকেট; শাড়ীখানি ঈষৎ তুলিয়া মাথায় দেওয়া, এদিকে ওদিকে একটি আধটি ব্রোচ্‌ দিয়া আটকানো, যাহাতে মাথা হইতে সরিয়া না যায়। বামস্কন্ধের একটু নিম্নভাগে হরতনের আকারে একটি ছোট কালো ঘড়ি, অলংকার এবং আবশ্যকতা দুই সম্পাদন করিতেছে। বেশে কোনও আড়ম্বর নাই, কিন্তু পারিপাট্য-গুণে নয়নাকর্ষক।

ঘরে প্রবেশ করিয়া মণিভূষণ হিমানীকে একখানি চেয়ারে বসাইল। হু হু করিয়া

বাতাস আসিতেছিল, সুতরাং কপাট বন্ধ করিয়া দিতে হইল। এইবার বৃষ্টিও আসি মাথার উপর টিনের ছাদে নববর্ষাজলপাতে বিচিত্র সঙ্গীত উৎপন্ন হইল।

তখনও হিমানী নীরবে বসিয়া। মণিভূষণ ডাকিল—"হিমানী।"

হিমানী কম্পিতস্বরে উত্তর করিল,—"কি, মণি ?"

"একি স্বপ্ন দেখিতেছি না সত্য ?"

"সত্য। স্বপ্ন হইলে বেশ হইত।"

"কেন বেশ হইত ? আমার ত শঙ্কা হইতেছে, পাছে ইহা স্বপ্ন হইয়া যায়।"

"দুঃসংবাদ আনিয়াছি। তোমার স্ত্রী সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছেন। তোমায় দেখিতে চাহিয়াছেন। তাই আমি তোমায় লইতে আসিয়াছি।"

"আমার স্ত্রী! আমার স্ত্রীর সংবাদ তুমি কেমন করিয়া জানিলে ?"

"কৃষ্ণনগর হইতে আসিয়াছি।"

"কৃষ্ণনগর!—কৃষ্ণনগরে কি করিতে গিয়াছিলে ?"

হিমানী তখন সংক্ষেপে পূর্ব্বকথা বলিল। বলিল—"তুমি কলিকাতা পরিত্যাগ করিলে তিন মাস পরে আমার পিতার অকস্মাৎ মৃত্যু হয়। শোকে সান্ত্বনা পাইবার জন্য আমার মা যীশুখৃষ্টের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। কৃষ্ণনগরে যে জেনানা-মিশন্ খুলিয়াছে, তিনি তাহার কর্ত্রী। আমিও তাঁহার কাছে থাকিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় করি। এইরূপ দুই বৎসর আমরা কৃষ্ণনগরে।"

শুনিয়া মণিভূষণ বলিল—"আমার স্ত্রীর পীড়ার সংবাদকে দুঃসংবাদ কেন বলিতেছ হিমা ? আমার স্ত্রী যতদিন বাঁচিয়া থাকিবে, ততদিন তাহারও জীবন দুঃখময়, আমারও তাহাই।"

হিমানী বলিল,—"ছি মণি, ওকথা মুখে আনিও না। স্বর্গে ঈশ্বর আছেন, তিনি ইহা শুনিয়া কি মনে করিবেন ? আমি তোমার কথায় লজ্জিত হইতেছি।"

মণিভূষণ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। পরে বলিল—"দুটি প্রাণীকে চিরপিপাসায় দগ্ধ করা কি ঈশ্বরের মত কায ?"

হিমানী বলিল—"ছি মণি, ওকথা বলিও না। ঈশ্বরের উপর বিচার করিবার অধিকার আমাদের নাই। তাহা ছাড়া, কেন তুমি ভুলিয়া যাও যে তুমি বিবাহিত ব্যক্তি এবং তোমার স্ত্রী বর্ত্তমান ?"

মণিভূষণ বলিল—"সত্য বলিয়াছ হিমানী, আমার স্ত্রী বর্ত্তমান এবং তিনি এই ঘরেই আছেন। দেখিবে ? তোমাকেও ঠিক আমার স্ত্রীর মত দেখিতে, তাই ভ্রম করিয়াছিলাম।"

হিমানী ভয় ও বিস্ময়ের সহিত মণিভূষণের মুখপানে চাহিল। তাহার উন্মাদব্যাধির কথা সে পূর্ব্বেই শুনিয়াছিল।

মণিভূষণ ছবি তিনখানি বাহির করিয়া হিমানীর হাতে দিল। হিমানী অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই অল্প আলোকে ছবিগুলি দেখিল। ওদিকে মুখ ফিরাইয়া গোপনে দুই ফোঁটা অশ্রুমোচন করিল। মনে মনে ভাবিল,—মানুষ-জন্ম অপেক্ষা ছবি-জন্ম অনেক ভাল। শেষে ছবিগুলি ফিরাইয়া দিয়া বলিল—"এ তুমি কোথায় পাইলে ?"

মণিভূষণ উত্তর করিল—"তুমি দিয়াছিলে মনে নাই ? আমার বুকের ভিতর রাখা ছিল, তিল তিল করিয়া বাহির করিয়াছি।"

আর হিমানী পারিল না। ঝর ঝর করিয়া অশ্রুধারা বহিয়া তাহার কপোল ভাসাইল মণিও কাঁদিল। হিমানী একটু সুস্থ হইয়া বলিল—"মণি, এতদিন তবে কি করিলে ?"

মণিভূষণ বলিল—"তুমিই বা কি করিলে ?"

হিমানী বলিল—"আমি যে কি করিয়াছি তা ঈশ্বরই জানেন।"

মণিভূষণ বলিল—"আমিও জানি, এই দেখ।" বলিয়া কবিতার খাতাখানি হিমানী

হিমানী বলিল—"মণি, আমি মনে করিয়াছিলাম, আমার নারীজন্ম বিফল হইবে। কিন্তু এখন তাহা কতকটা সফল করিতে পারিলাম মনে হইতেছে। তুমি যদি ব্যাঘাত না দাও তবেই হয়।"

মণিভূষণ বলিল—"সে কি হিমা। আমি ব্যাঘাত দিব?"

হিমানী জড়ান জড়ান এলান এলান কথায় ধীরে ধীরে বলিল—"দেখ, আমার শরীরের যাহা সার পদার্থ—রক্ত—তাহা আমি নবদুর্গাকে দিলাম। উহার আত্মা লইয়া যদি আমার আত্মাটাও উহাকে দিতে পারিতাম, তাহা হইলে সম্পূর্ণভাবে ওই তোমার হিমানী হইতে পারিত।"

মণিভূষণ নীরবে দুই বিন্দু অশ্রু মোচন করিল।

হিমানী বলিল—"মণি, আমার কি নেশা হইয়াছে? আমি যেন কত কি দেখিতেছি, শুনিতেছি। ভারি আশ্চর্য্য। ভারি চমৎকার। যেন ঈশ্বর আমাকে লইতে পাঠাইয়াছেন, দেবদূতেরা আসিয়াছে। আমি ত যাইব না, নবদুর্গা যাউক।"

মণিভূষণ বলিল—"হিমা, তুমি অমন করিতেছ কেন? আর একটু দুধ দিব?"

হিমানী আবার দুগ্ধ পান করিল। আবার একটু সুস্থ হইয়া বলিল—"কতকগুলো কি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, কিন্তু বড় মেজেকার মনে। যেন মণি আমি যেন নবদুর্গা হইয়া জন্মিয়াছিলাম, আর তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ হইতেছিল। আমি যদি নবদুর্গা হইয়া জন্মাই, তবে তুমি কি আমায় এমনি ভালবাসিবে?"

মণিভূষণ বাষ্পাকুলস্বরে বলিল—"হাঁ হিমা, এমনিই ভালবাসিব।"

হিমানী বলিল—"তবে কাল প্রাতে আমার আত্মা নবদুর্গার সঙ্গে বিনিময় করিব।"

এই সময় নিশীথ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া দূরে কোন একজন হিন্দুস্থানী গলা কাঁপাইয়া গাহিয়া উঠিল ঃ—

সুখসাগরমে আয়কে ন যাইও রে পেয়াসা।

হিমানীর কাণে এই গান পৌঁছিল, সে জাগিয়া উঠিল। জ্যোৎস্নার অল্পালোকে মণিভূষণের ম্লান মুখখানির পানে চাহিল। মণিভূষণ তখন হিমানীকে নিদ্রাতুর দেখিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছে। হিমানী ডাকিল—"মণি"।

মণিভূষণ এই সোহাগের স্বরে গলিয়া উত্তর করিল—"কি হিমা?"

হিমানী বলিল—"মনে পড়ে?"

মণি হিমানীর মুখের পানে চাহিল। হিমানী বলিল—"সেই একদিন কলিকাতায় যে দিন তুমি আমাকে ফেলিয়া আসিয়াছিলে?"

সেই হিন্দুস্থানী তখনও গলা কাঁপাইয়া পুনঃ পুনঃ গাহিতেছে—

সুখসাগরমে আয়কে ন যাইও রে পেয়াসা।

মণিভূষণের মনে পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে একটি সুগভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। হিমানী বলিল—"আমার বড় ঘুম পাইতেছে; সে দিন যাইবার সময় যাহা দিয়াছিলে, তাই দিয়া যাও।"

মণিভূষণ হিমানীর বিবর্ণ শীতল ওষ্ঠাধরে একটি প্রগাঢ় চুম্বন অঙ্কিত করিল। হিমানী বলিল—"সেবারে দুইজনেই মনে করিয়াছিলাম, এই দেখা শেষ দেখা। কিন্তু আবার দেখা ত হইল। সে দিনের বিদায়-চুম্বনের যাহা গুণ ছিল, এটিতেও যেন তাহাই থাকে। আবার যেন দেখা হয়। আমার ঘুম পাইতেছে, এখন তুমি যাও।"

মণিভূষণ বাহির হইয়া গেল।

হিমানীকে একাকী রাখিয়া আসিয়া তাহার মনে নানারূপ আশঙ্কা হইতে লাগিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া সে তাহার শালাজকে হিমানীর শয়নকক্ষে পাঠাইয়া দিল।

তিনি গিয়া দেখিলেন, হিমানীর বিছানা রক্তে ভাসিয়া গিয়াছে, বুকে হাত দিয়া দেখিলেন, হৃৎ-স্পন্দনও থামিয়াছে। নিঃশ্বাসও বহিতেছে না।

কালো গর্ণেটের কোট পরিয়া, সোণার চেন ঝুলাইয়া, বার্নিশ করা জুতা পায়ে দিয়া, টেরি কাটিয়া, সুগন্ধি মাখিয়া, রূপা-বাঁধান ছড়ি হাতে করিয়া তিনি একদিন আমাদের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত। আমাকে দেখিলেন, আমার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন, কি লেখা পড়া করি জিজ্ঞাসা করিলেন;—আমার লজ্জাও নাই, সরমও নাই, দ্বিধাও নাই, সঙ্কোচও নাই;—মুখ মাটির দিকে না নামাইয়া তাঁহার পানে নির্ভীক নেত্রপাত করিয়া স্পষ্ট কথায় চট্‌পট্‌ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিলাম।

তিনি চলিয়া গেলে বাড়ীর লোকের কাছে আমাকে ভর্ৎসনা শুনিতে হইল। সবাই বলিল—"তোর কি ভয়, লজ্জা কিছুই নেই? লেখা পড়া শিখেছিস্ বলেই কি অমন বাহাদুরী না করলেই নয়?" আমি ভাল মন্দ কিছুই বলিলাম না। কিছু দিন পরে সংবাদ আসিল, পাত্র বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছেন। আমরা যাহা দিব তাহাতেই রাজি। ফল-কথা আমাকে বিবাহ না করিয়া ছাড়িবেন না।

ভাবিলাম, তা না ছাড়ুন। বিবাহ যখন আমাকে করিতেই হইবে, তখন আর কথা কি! রামে মারিলেও মরিব, রাবণে মারিলেও মরিব।

শুভদিনে শুভক্ষণে বিবাহ হইয়া গেল। পরদিন শ্বশুরবাড়ী যাত্রা করিলাম।

শ্রীরামপুরের নিকট আমার শ্বশুরবাড়ী। আমার স্বামী একমাসের ছুটি লইয়া বাড়ী আসিয়াছিলেন। আমি নববধূ,—নববধূর যেরূপ লজ্জা সরম থাকা আবশ্যক, আমার সেরূপ নাই দেখিয়া কেহ কেহ নিন্দা করিল। শ্বাশুড়ী বলিলেন—"আহা, তা হোক্ --ছেলেমানুষ—বুদ্ধি হলেই সব হবে এখন।" আমার সম্বন্ধে কে কি বলিল কে কি না বলিল তাহা আমি গ্রাহ্য করিতাম না; নিজের পড়াশুনা লইয়াই থাকিতাম। পড়া-শুনার জন্যও কিছু কিছু বিদ্রূপ সহিতে হইয়াছিল। সপ্তাহকাল ছিলাম। স্বামী আমার মন ভুলাইবার জন্য প্রতিরাত্রেই কিছু-না-কিছু নূতন জিনিষ উপহার দিতেন। নিস্পৃহস্য তৃণং জগৎ। আমি লইতাম—কিন্তু মনে মনে হাসিতাম। আমি বুঝিয়াছিলাম, পৃথিবী অসার, ইহলোকের সুখ দুঃখ কিছুই সত্য নহে—আমি দুইটা ফুলের তোড়া অথবা দুই শিশি গন্ধ লইয়া কি করিব? তবু লইতাম;—স্বামীর মনে বৃথা কষ্ট দিবার প্রয়োজন কি? স্বামী আমাকে আদরে সোহাগে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। ঠিক ভাল লাগিত না বলিতে পারি না। জনকজননীর জীবিত কালে আদর সোহাগ আমার প্রচুর পরিমাণেই ছিল, দুই বৎসর যাবৎ আমি তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলাম। স্বামীর আদর শুষ্কহৃদয়ে নববর্ষার জলবিন্দুর মত বোধ হইত। কিন্তু বড় ভয় করিত। নির্জ্জনে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতাম, "হে দয়াময় প্রভু, যেন সংসারের মায়াকুহকে ভুলিয়া যাই না, রক্ষা করিও।"—বধূজনোচিত লজ্জার অভাবে অন্যের কাছে নিন্দাভাজন হইতাম বটে, কিন্তু স্বামী তাহাতে সন্তুষ্ট ছিলেন বুঝিতে পারিতাম। একে তিনি একটু বেশী বয়সে বিবাহ করিয়াছেন,—তাহার উপর আবার কাঁচিয়া ছেলেমানুষ সাজিয়া যে কচি খুকীটির মত লজ্জা ভাঙ্গাইতে হইল না, ইহাতে তিনি আমার প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন।

সাতদিন শ্বশুরবাড়ীতে থাকিয়া আমি পিত্রালয়ে ফিরিলাম। স্বামী আমার সঙ্গে "যোড়ে" আসিলেন। বাড়ীর লোকে তাঁহাকে লইয়া কত আমোদ করিল। তাঁহার ছুটি ক্রমে ফুরাইয়া আসিল, তিনি দেশে ফিরিলেন। যাত্রা করিবার সময় দেখিলাম, তাঁহার

বিবাহের পর প্রায় তিন বৎসর কাল আমি বরাহনগরে রহিলাম। পূজা ও বড়দিনের

চক্ষু ছলছল করিতেছে। আমাকে বলিয়া গেলেন—"চিঠি লিখো।"

ছুটিতে স্বামী আসিতেন। আমাকে লইয়া যাইবার জন্য কয়েকবার বন্দোবস্ত করিয়া-ছিলেন, কিন্তু একটা না একটা বিঘ্নবশতঃ হয় নাই; একবার সব ঠিকঠাক;—শেষ মুহূর্ত্তে পত্র আসিল সাহেব তাঁহাকে ছুটি দিল না। আর একবার যাইবার সময় আমার পীড়া উপস্থিত হইল। আরও একবার ঐ রকম কি একটা ব্যাঘাত হয়।

এই তিন বৎসরে দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিল। প্রথম দাদার বিবাহ।

দ্বিতীয় আমাদের উভয়ের গুরুলাভ।

এই সময়ে দাদা শাস্ত্রচর্চ্চার অবসরে মাঝে মাঝে কলিকাতায় যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। বলিলেন, সেখানে একজন গুপ্তবিদ্যায় পারদর্শী পরম জ্ঞানীপুরুষের দর্শন পাইয়াছেন, সেখানে উপদেশার্থে গমন করেন। দাদা যাহাই শিখুন, ভবিষ্যতে একদিন আমিও তাঁহার সেই বিদ্যার অধিকারিণী হইব, এই আশায় উৎফুল্ল হইতাম। দাদা সেখানে কি শিখিয়াছিলেন না শিখিয়াছিলেন সে পরিচয়লাভ আর আমার অদৃষ্টে ঘটে নাই, কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখিলাম, তাঁহার উপদেষ্টা স্বীয় পঞ্চদশবর্ষীয়া ভগ্নীটিকে দাদার গলায় বাঁধিয়া দিলেন;—দাদা বিবাহ করিলেন। আত্মীয়-স্বজন ইহাতে সকলেই সুখী। দাদার বয়স তখন প্রায় ত্রিংশবর্ষ। দাদা বলিলেন—"মহাত্মাগণ এত দিনে আমার বিবাহে অনুমতি দিয়াছেন।" যাহা হউক, বিবাহ করিয়া শাস্ত্রচর্চ্চায় দাদার আগ্রহ বাড়িল বই কমিল না। যোগশাস্ত্র সম্বন্ধে নিত্য নূতন গ্রন্থাদি বোম্বাই ও কাশী হইতে আসিতে লাগিল। আমি ক্রমে উপযুক্ত হইতেছি বিবেচনা করিয়া দাদা আমাকেও যোগের দুই চারিটি জিনিষ শিখাইতে লাগিলেন। লেখা পড়া আমি যত শীঘ্র শিখিয়াছিলাম, এগুলি কিন্তু তত শীঘ্র আয়ত্ত করিতে পারিলাম না। একদিন দাদা রাগ করিয়া বলিলেন—"তোর কর্ম্ম নয়,—তোর মন চঞ্চল হয়েছে।"

আমার মুখ শুকাইয়া গেল। ধরা পড়িলাম। বাস্তবিকই ইদানীং আমার মনে চাঞ্চল্য আসিয়াছিল: মাঝে মাঝে একখানি হাসিমাখা, স্নেহভরা মুখ মনে পড়িয়া দেহমন অবশ করিয়া দিত।

সে দিন সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাঁদিলাম আর প্রার্থনা করিলাম—হা জগদীশ, এত শিখিলাম, এত সাধনা করিলাম, আমার সব ব্যর্থ হইবে? ফিরিতে হইবে জানিলে, এ পথে কে পদার্পণ করিত। আমি কি এখন সব ছাড়িয়া বেশবিন্যাস করিয়া, নাটক পড়িয়া, স্বামীকে প্রণয়-পত্র লিখিয়া দিন কাটাইতে পারিব? বাসুদেব! কুরুক্ষেত্রে তুমি পাণ্ডবদিগকে জয়শ্রী দান করিয়াছিলে, আমার এই মানসক্ষেত্রে আসিয়া বরাভয় মূর্ত্তিতে দর্শন দাও—আমি মোহরূপ দুর্য্যোধনকে সংহার করি। তুমি জগতের স্বামী,—তুমি আমারও স্বামী;—তোমার ভাবনা ছাড়া আর কাহারও ভাবনা আমার মনে যেন প্রবেশ করিতে না পারে।

ইহার পর দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত যোগচর্চ্চায় মনোনিবেশ করিলাম। অজপাসাধন, ষট্‌চক্র, নাদ ও মুদ্রার একটা মোটামুটি ধারণা জন্মিল। কিন্তু মনে সেই গুপ্ত চাঞ্চল্য সম্পূর্ণরূপে দূর করিতে কৃতকার্য্য হইলাম না। সে ভাবনাকে যত বলিতাম—আসিও না, তত সে আসিয়া মনের দুয়ারে মাথা কুটাকুটি করিত। তথাপি আমি কিছু কিছু শিখিলাম।

এই সময় একদিন গুপ্তবিদ্যায় পারদর্শী দাদার সেই বন্ধু—আপাততঃ শ্যালক—স্বীয় গুরুদেবের সঙ্গে আসিয়া দর্শন দিলেন। গুরুদেব উন্নত ললাট গৌরবর্ণ বৃদ্ধ পুরুষ, সর্ব্বাঙ্গ হইতে যেন একটা ব্রহ্মচর্য্যের জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতেছে। বয়ঃক্রম পঞ্চাশৎ বৎসরের কম হইবে না। চক্ষে ও ওষ্ঠাধরে প্রশান্ত হাস্যরেখা দেদীপ্যমান!

তাঁহার সঙ্গে দুই তিন দিন শাস্ত্রালাপ করিয়া দাদা আমাকে বলিলেন—"হরি, আমরা ইঁহার নিকট দীক্ষাগ্রহণ করি আয়; সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ মহামহোপাধ্যায় সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিত, —এমন গুরুলাভ সকলের অদৃষ্টে ঘটে না।"

উপযুক্ত দিনে আমরা ভাই বোনে তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলাম। এতদিন আমি ইষ্টদেবতাবিহীন ছিলাম; ইষ্টদেবতা পাইয়া এইবার সাধনার সুবিধা হইল। ত্রিসন্ধ্যা ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে লাগিলাম। পূজার ধূম দেখে কে! কিছুদিন পরে গুরুদেব কলিকাতায় গেলেন। দাদা তাঁহার সঙ্গে গেলেন। তাঁহার হাতে পায়ে ধরিয়া সম্মত করিয়া বহুব্যয়ে সাহেব-বাড়ীতে তাঁহার ছবি তোলান হইল। সেই ছবি বহুব্যয়ে বাঁধাইয়া দাদা

স্বয়ং একখানি রাখিলেন, আমাকে একখানি দিলেন। পূজাকালে সেখানিকেও রীতিমত পূজা করিতাম। বেশ দিন কাটিতে লাগিল।

আশ্বিন মাসে আমার স্বামী দাদাকে পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন—ছুটিতে আসিয়া বিজয়া-দশমীর দিন আমায় লইয়া যাইবেন। শ্বশুরবাড়ীতে গিয়া কেমন করিয়া পড়াশুনা হইবে, পূজার্চ্চনাই বা কেমন করিয়া হইবে? বড় ভাবনা হইল। যাহা হউক, ইহার জন্য পূর্ব্বাবধিই প্রস্তুত ছিলাম। ভাবনা যাদৃশীর্যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। তবে আমার বিঘ্নাশঙ্কা কোথায়? নির্দ্দিষ্ট দিনে দাদার চরণে প্রণাম করিয়া অশ্রুহীন চক্ষে স্বামীর সহিত গাড়ীতে উঠিলাম। দাদাকে অনেক করিয়া বলিয়া গেলাম, যদি গুরুদেব আসেন তবে অবশ্য অবশ্য আমাকে গিয়া লইয়া আসিও।

আমার স্বামী আমাকে লইয়া একেবারে জামালপুরে উপস্থিত হইলেন। শ্বশ্রূদেবী মিষ্ট কথায় আমাকে সাদর সম্ভাষণ করিলেন। যে স্থানে আমাদের বাসা, তাহাকে বৈদ্য-পাড়া বলে। জানালা খুলিলে আধ মাইল দূরে পাহাড় দেখা যায়। বৈদ্যপাড়ায় সবই বাঙ্গালী;—শুনিলাম জামালপুরময় সবই বাঙ্গালী। হিন্দুস্থানীর সংখ্যা জামালপুরে মুষ্টিমেয়। হিন্দুস্থানী যত, তাহারা সব জামালপুরের বাহিরে আশেপাশে পল্লীগ্রামে থাকে। জামালপুরে সমস্তই আফিসের বাবু। নয়টা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত জামাল-পুরসুদ্ধ বাবু আফিসে আবদ্ধ থাকেন, সুতরাং ঐ সময়ের জন্য জামালপুরটা স্ত্রীলোকের রাজ্য হইয়া দাঁড়ায়। মেয়েরা সম্পূর্ণ স্বাধীনতার সহিত প্রকাশ্য রাজপথ অতিক্রম করিয়া এবাড়ী ওবাড়ী করিয়া বেড়ায়। প্রয়োজন হইলে দল বাঁধিয়া এপাড়া ওপাড়া করাও চলে। এইটি জামালপুরের স্ত্রীসমাজের বিশেষত্ব। বঙ্গদেশের বাহিরে আর কোথাও স্ত্রীলোকদের এ সুযোগ নাই। অন্যের পক্ষে ইহা যতই সুবিধাজনক হউক, আমার মহা বিপদ হইল। পাড়ার লোকে দলে দলে আমাকে দেখিতে আসিতে লাগিল। আমার সম্বন্ধে যে সব সমালোচনা হইতে লাগিল, সেগুলা তাহারা আমার অসাক্ষাতে করার শিষ্টাচার পর্য্যন্ত দেখাইল না। আমি অসঙ্কোচে সরলভাবে তাহাদের প্রশ্নের উত্তর করিতাম, প্রতিফল-স্বরূপ কেহ আমাকে বেহায়া বলিত, কেহ বলিত দেমাকে, কেহ বলিত কিছু। ক্রমে ক্রমে আমার বিরক্তি ধরিয়া গেল। আমার পড়াশুনা পূজার্চ্চনার অত্যন্ত ব্যাঘাত হইতে লাগিল। তাহারা আসিলেই আমি লেপ-মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িতাম। হাজার ডাকা-ডাকি করিলেও উত্তর দিতাম না। তাহারা আমার প্রতি চোখা চোখা বাক্যবাণ প্রয়োগ করিয়া আমার ঘর ছাড়িয়া যাইত। বাড়ী ছাড়িয়া যাইত না, তাহা হইলে ত বাঁচিতাম। কখনও বারান্দায় কখনও উঠানে পেয়ারা গাছের ছায়ায় বসিয়া জটলা পাকাইত। তাহারা চলিয়া না গেলে আর আমি বিছানা ছাড়িতাম না। শ্বাশুড়ী মাঝে মাঝে আমাকে বলিতেন—"বাছা, ওরা সব তোমার দেখতে আসে, তুমি মাথাঠারোপনা করে বিছানায় পড়ে থাক, ওঠ না, কথা কও না, দেখ্তে কি সেটা ভাল হয়? ভারি সবাই নিন্দে করে।" তাকে আমি কিছু বলিতাম না, ভাবিতাম ভাল হয় না ত হয় না, নিন্দা করে ত করে। এরূপ অলস নিন্দার ভয়ে কি আমি ভীত হইব? তাহা হইলে আমি ঐ শত সহস্র সাধারণ স্ত্রীলোকের সাগরে জলবিন্দুর মত মিশাইয়া যাই না কেন? তাহা ছাড়া আরও একটা কারণ ছিল। সমস্ত দিন আমার পূজা ও শাস্ত্রচর্চ্চা কিছুই হইত না;—রাত্রে আমাকে সে সব করিতে হইত। রাত্রি দুইটা তিনটা পর্য্যন্ত জাগিতাম। সুতরাং দিবা-নিদ্রা ভিন্ন উপায় ছিল না।

প্রতিবেশিনীরা আমার বিরুদ্ধে আমার শ্বাশুড়ীর নিকট নানাপ্রকার অভিযোগ করিয়া আমার বিপক্ষতাচরণ আরম্ভ করিল। আমি যে তাহাদের সঙ্গে সংস্রব মাত্র রাখিতে স্বীকৃত হইলাম না, ইহাই তাহাদের চক্ষে আমাকে মহা অপরাধে অপরাধিণী করিল। তাহারা যত আমার অনিষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিল, আমি তত তাহাদিগকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে লাগিলাম।

নানা কারণে আমি লোকের বিরাগভাজন হইতে লাগিলাম। আমার শ্বাশুড়ীর নিকট তাহারা শুনিয়াছিল যে আমি সর্ব্বদা পড়াশুনো করি। দুই চারিজন নবীনা, নাটক নভেলের দুরাশায় আমার সঙ্গে ভাব করিল। একজন আসিয়া একদিন বলিল,—"বউ, তোমার কাছে নাকি সব অনেক ভাল ভাল বই আছে, কি কি বই দেখাও না ভাই।"

আমি মনে মনে হাসিয়া বাক্স হইতে দুই চারিখানি বহি বাহির করিয়া দেখাইলাম। বইগুলি সে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল. দেখিয়া বলিল—"এই বই তুমি পড় ?"

আমি বলিলাম—"পড়বার জন্যেই ত এনেছি।"

"এ যে শাস্ত্র।"

"শাস্ত্র কি পড়তে নেই ?"

"পড় ভাই। আমরা মুখ্যু সুখ্যু মেয়েমানুষ।"—হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"আমি কি পুরুষমানুষ নাকি ?" বলিয়া বহি তুলিয়া রাখিলাম। ঐ যে একটু হাসিলাম, তাহাতেই বোধ হয় সখী মনে করিলেন. আমি তাঁহাকে অপমান করিলাম। যাহা হউক তিনি অভিমানে গস্ গস্ করিয়া চলিয়া গেলেন।

আমার সঙ্গে যাহাদের আলাপ হইত, বারান্তরে দেখা হইলে তাহাদের সকলকে চিনিতে পারিতাম না। কে অত মনে করিয়া রাখে বাপু! ইহাও আমার প্রতি তাহাদের ক্রোধের সঞ্চার করিল। কেহ কেহ আমাকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিত—"তা হোক্ বড় মানুষের মেয়ে, তাই বলে কি অমনিই করতে হয় ? আমি কি ওঁর দ্বারস্থ হতে গিয়েছিলাম যে আমাকে চিনতে পারলেন না ?"

এই সকল ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা আমি আবশ্যক বোধ করিতাম না। তাহারাও তিল তিল করিয়া আমার শ্বাশুড়ীর মন বিষাক্ত করিয়া প্রতিশোধ লইতে লাগিল।

শ্বাশুড়ী আমায় মাঝে মাঝে একটু আধটু ভর্ৎসনা আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ক্রমে সুর উচ্চ হইতে উচ্চে উঠিল। কিন্তু আমি তাঁহার ভর্ৎসনায় দুঃখিত বা বিরক্ত হইতাম না; বোধ হয় সেই কারণে তাঁহার ক্রোধও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া চলিল।

নিজমুখে নিজদোষের কথা বলিতেছি, রাখিয়া ঢাকিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। মনের ভাব যেমন যেমনটি হইয়াছিল, তেমনি বলিয়া যাইতেছি। আমার বলিবার ভঙ্গী দেখিয়া যেন তোমরা আমাকে ভুল বুঝিও না;—যেন মনে করিও না যে, আমার ভাবখানা—দেখ দেখি আমি কেমন বাহাদুরী করিয়াছিলাম! আমি যাহা করিয়াছিলাম, তাহা অতি গর্হিত কার্য্য করিয়াছিলাম, কিন্তু তখন মনে হইত বুঝি ভারি বীরত্ব করিতেছি। আমার শ্বাশুড়ী বাল্যবিধবা। চিরদিন পাঁচটার সংসারে খাটিয়া খাটিয়া পরের মন যোগাইতে যোগাইতে তাঁহার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছিল। কেবল ছেলেটিকে মানুষ করিবার জন্যই না ? সেই ছেলের বউ আসিল—কত সাধের বউ—তিনি মনে ভারি আশা করিয়াছিলেন, বধূর হাতে সংসারের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন, বসিয়া আপনার হরিনাম করিবেন। বধূ যে সমস্ত রাত্রি ধরিয়া পূজা করিবে আর গীতা মুখস্থ করিবে, আর সমস্ত দিন লেপমুড়ি দিয়া ঘুমাইবে, তাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই।

অনেক দিন হইতে প্রথা আছে, ছেলে বিবাহ করিতে যাইবার সময় মা জিজ্ঞাসা করেন—"বাবা তুমি কোথায় যাইতেছ ?" ছেলে বলে—"মা আমি তোমার জন্য দাসী আনিতে যাইতেছি।" স্কুলের পণ্ডিত মহাশয় একালের বধূগণের গুণকীর্ত্তন করিবার সময় বলেন যে, ঐ উত্তর পরিবর্ত্তন করিয়া এখন বলা উচিত—"মা তোমার মুগুর আনিতে যাইতেছি।"—আমার শ্বাশুড়ীর পক্ষে আমি ঠিক মুগুর হই নাই বটে, কিন্তু দাসী যে হই নাই তাহা নিঃসন্দেহ। বরং তিনি দাসীর মত আমার সেবা করিতেন। লিখিতে লজ্জা করিতেছে—কত দিন হয়ত দাই আসে নাই, আমার ছাড়া কাপড় পর্য্যন্ত মাকে কাচিতে হইয়াছে। আমি কি যে ভাবিতাম, কি অহঙ্কারে যে মত্ত থাকিতাম, তাহা বলিতে পারি না। শ্বাশুড়ী যে আমাকে ভর্ৎসনা করিতেন, তাহার জন্য

যদি ক্ষমা কর, তবে এই স্থানটা অতি সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া যাই। যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহা কার্য্যে পরিণত করিলাম। দলিলে লেখাপড়া করিয়া দিলাম। টেলিগ্রাফ করিয়া দাদাকে আনাইলাম।

আমার এরূপ আচরণের পর আমার প্রতি আমার স্বামীর মনের ভাব কিরূপ হইল বল দেখি?—অন্য স্বামী হইলে আর অতঃপর আমার মুখদর্শন করিতেন না। কিন্তু আমার স্বামী আমায় কত বুঝাইলেন—বলিলেন—"হরি! এখনও মতি পরিবর্ত্তন কর। বড় ভুল করছ।"

আমি তখন ভাবে মত্ত। তাঁহার এই অনন্যসুলভ সহৃদয় উদারতা আমি হৃদয়ে গ্রহণ করিতে পারিলাম না। যাইবার সময় তিনি বলিয়া দিলেন—"বলে রাখছি, যদি কখনও বিপদে পড়, তবে আমাকে সংবাদ দিতে সঙ্কোচ কোরো না।"

দাদার সঙ্গে যাত্রা করিলাম। তাঁহার নিকট কৃতকার্য্যের জন্য যে পরিমাণ প্রশংসা ও উৎসাহ পাইব আশা করিয়াছিলাম, তাহার কিছুই পাইলাম না। তিনি যেন কিছু অপ্রসন্ন। গাড়ীতে যতক্ষণ দুইজনে ছিলাম, ততক্ষণ তিনি বিমর্ষ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন—"হরি! কাযটা ভাল করলে না।"

শুনিয়া আমার কান্না পাইতে লাগিল। দাদার মুখে এই কথা? কিন্তু কে আমায় এ পথের পথিক করিল? লক্ষকোটি বঙ্গরমণীর জীবনের স্রোত যে পথে প্রবাহিত, আমার জীবনের স্রোত সে পথে বহিতে দিল না কে? তিনি আমার জীবনে হস্তক্ষেপ না করিলে, এই ভর্ৎসনার সুযোগ ত পাইতেন না!

আমার চোখে জল দেখিয়া দাদা আমায় সান্ত্বনা করিতে আরম্ভ করিলেন। যে উৎসাহের কথা আশা করিয়াছিলাম, তাহা দিয়া আমাকে সুস্থ করিলেন। ভবিষ্যতে আমরা কোন্ পথে চলিব, কি করিব, কি পড়িব, এই সমস্ত আলোচনার অবতারণা করিয়া আমার প্রাণে মধুবৃষ্টি করিলেন।

বাড়ী আসিয়া রীতিমত পূজার্চ্চনা ও শাস্ত্রচর্চ্চা আরম্ভ করিয়া দিলাম। প্রথমটা দাদাও খুব উৎসাহ দেখাইলেন, কিন্তু মাঝে মাঝে সে উৎসাহ ক্ষীণ হইয়া আসিত। আমি যেমন সমানে ছুটিতাম, তিনি তেমন পারিতেন না। তিনি যেন খানিক ছুটিতেন, খানিক বসিয়া বিশ্রাম করিতেন। আমার কথা স্বতন্ত্র;—আমি এখন স্বাধীন জীবন যাপন করিতেছিলাম, আমার স্বামী নাই, কোনও বন্ধন নাই, আমি বনবিহঙ্গীর মত যেমন দ্রুত উড়িতেছিলাম, দাদা তেমন পারিবেন কেন? তাঁহার স্ত্রী তাঁহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া। একটু ছুটিয়াই হাঁফাইয়া পড়িতেন। আমি একদিন সুযোগ দেখিয়া বলিলাম, —"দাদা। তোমার কর্ম্ম নয়, তোমার মন চঞ্চল হয়েছে।"

তোমরা বুঝিতে পারিলে ত, আমি কেমন মজার প্রতিশোধটি লইলাম? দাদাও একদিন আমাকে ঠিক এই কথা বলিয়াছিলেন। সে দিন আমার সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়া কাটিয়াছিল। দাদার মুখে চক্ষে সে ভাবের লেশমাত্র না দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। যেন ভাবটা, এ আপদ চুকিলেই বাঁচি। হায় মহাত্মাগণ! কেন তোমরা দাদাকে বিবাহ করিতে অনুমতি দিয়াছিলে?

ছোটবউ শুধু দাদার বিঘ্ন জন্মাইয়া ক্ষান্ত ছিলেন না, সুযোগ পাইলেই আমারও পথরোধ করিবার চেষ্টা করিতেন। দাদার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তাঁহার গতির খর্ব্বতা করিয়াছিলেন, আমাকে নিকটে পাইলেই, যথাস্থানে বসিয়া আমার পৃষ্ঠে চাবুক হাঁকাইতেন। উপমার খাতিরে কথাটা যেমন লঘুভাবে বলিলাম, তাহা নয়। পরের মুখে অনেক কথা শুনিতে পাইতাম;—একদিন স্বকর্ণে শুনিলাম—তাঁহার একটি প্রিয় সখীকে বলিতেছেন—"এমন ত কখন সাতজন্মেও শুনিনি।"

ছোটবউয়ের সখী বলিলেন—"আমার ত বিশ্বাস হয় না ভাই যে ও ইচ্ছে করে স্বামীত্যাগ করে এসেছে। বোধ করি ওর স্বভাব চরিত্র দেখে স্বামী দূর করে তাড়িয়ে দিয়ে

থাকবে।"

বলা বাহুল্য এ কথা আমি কাণে তুলিলাম না; কিন্তু একদিন আরও অত্যন্ত ভয়ঙ্কর অশ্রাব্য কথা শুনিলাম। সে দিন আমার সহনাতীত হইল।

তাহার পর গুরুদেব দর্শন দিলেন। তিনি আমার স্বামীগৃহত্যাগের কথা শুনিয়াছিলেন। বলিলেন—"মা, তুমি যে জীবন নির্ব্বাচন করিলে, তাহা একান্ত কঠিন। এ সমুদ্রে যখন ডুব দিলে, তখন গভীরতর গভীরতম প্রদেশে নামিতে হইবে, নহিলে রত্ন মিলিবে না। শুধু শিকারার্থী হাঙ্গর-কুম্ভীরের দংশনে প্রাণান্ত হইবে। প্রথম অবস্থায় পদে পদে বিপদ।"

তিনি আমাদের বাড়ীতে রহিলেন, এবং স্বয়ং আমাকে শিখাইবার ভার লইলেন। বলিতে ভুলিয়াছি, কিছু কিছু সংস্কৃত শিখিয়া ফেলিয়াছিলাম। সমস্ত দিন এত পরিশ্রম করিয়া পড়াশুনা আরম্ভ করিয়া দিলাম যে কলেজের আসন্ন-পরীক্ষা-ভীত ছেলেরাও তত পারে না। গুরুদেব আমাকে অধ্যাপনা করিতে করিতে আমার তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া যাইতেন। দাদার কাছে আমার প্রশংসা আর তাঁহার ফুরাইত না।

কিন্তু ছোটবউ আমার উপর বড় উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন। আমার অদৃষ্টটা বড় মন্দ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। কি কুক্ষণেই জন্মিয়াছিলাম, যেখানেই যাইব, সেই-খানেই পরিবারে ঘোর অশান্তির ঝড় বহিবে। দাদা ভালমানুষ, বধূর সঙ্গে পারিয়া উঠিতেন না। বধূ তাঁহাকে কি মন্ত্রে কি ঔষধিতে বশীভূত করিয়াছিল বলিতে পারি না,—যেন তাঁহার বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। দাদার আচরণ দেখিয়া মনে মনে ভারি ঘৃণা হইত; তাঁহার উপর সেই পূর্ব্বেকার ভক্তি আমি কিছুতেই রক্ষা করিতে পারিলাম না। ক্রমে ক্রমে আমার পড়াশুনা পূজার্চ্চনার বিশেষ ব্যাঘাত হইতে লাগিল।

কাঁদিতে কাঁদিতে দিবারাত্রি প্রার্থনা করিতে লাগিলাম—"বিপদের কাণ্ডারী হরি, আমার কি দুই কূল যাইবে!"

একদিন গুরুদেব আমাকে নির্জ্জনে বলিলেন—"দেখ, এখানে তোমার সাধন ভজনাদির বড়ই বিঘ্ন হইতেছে। এ অবস্থায় সংসারাশ্রমে থাকাও ঠিক নয়। আমি বলি কি, আমার সঙ্গে আমার আশ্রমে চল। জব্বলপুরের নিকট পাহাড়ে নর্ম্মদা নদীর তীরে আমার কুটীর আছে। সেখানে তোমাকে কন্যাবৎ পালন করিব, শিক্ষা দীক্ষার পরম সুযোগ হইবে।"

আমি সম্মত হইলাম। একদিন গভীর রাত্রে, ঋষিতুল্য পিতৃতুল্য গুরুদেবের হস্ত-ধারণ করিয়া গৃহ ত্যাগ করিয়া গেলাম। কাহাকেও জিজ্ঞাসা করি নাই, গুরুদেবের নিষেধ ছিল। গুরুদেব স্বহস্তে পত্র লিখিয়া সব কথা জানাইয়া শয্যার উপর রাখিয়া গেলেন।

অনেক পথ চলিয়া রাত্রি শেষ হইয়া আসিল। সে একটা প্রকাণ্ড মাঠ। চতুর্দ্দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত মনুষ্যবাস দৃষ্ট হইল না। একটা বিপুলদেহ বটবৃক্ষ ছিল, তাহার মূলে বসিয়া দুইজনে শ্রান্তি দূর করিতে লাগিলাম। গুরুদেব তাঁহার পোঁটলা হইতে সন্ন্যাসীর উপযোগী গৈরিক বস্ত্রাদি বাহির করিলেন। আমাকে বলিলেন—"বাছা, তুমি এইগুলি পরিধান করিয়া সন্ন্যাসীবেশ ধারণ কর, নহিলে পথে বিপদ ঘটিতে পারে।"

বলিয়া তিনি আড়ালে সরিয়া গেলেন। আমি বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া সন্ন্যাসী-পুরুষ সাজিলাম। পথে পদার্পণ করিয়াই এই ছলনা! মনটা যেন বিমর্ষ হইল; কিন্তু গুরুদেব যখন বলিয়াছেন, তখন আর কথা কি?

গুরুদেব শুষ্ককাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া একটা অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করিলেন। তাহাতে আমার পরিত্যক্ত বস্ত্রাদি ভস্মীভূত করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে কাঁচি দিয়া আমার চুলগুলি কাটিয়া ফেলিলাম। গায়ে মাথায় বিভূতি মাখিলাম। সেই বেশ, অন্যের কথা দূরে থাকুক, আমার মা যদি আসিয়া আমাকে দেখিতেন তাহা হইলে তিনিও চিনিতে

পারিতেন না।

সমস্ত দিন পথ চলিয়া, সন্ধ্যার পূর্ব্বে একস্থানে আসিয়া রেল পাইলাম। রেলে চড়িয়া তৃতীয় দিনে কাশীধামে পৌঁছিলাম।

কাশীতে পাঁচ সাত দিন কাটিল। সমস্ত দিবাভাগ ঠাকুর দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কত আনন্দ!

কাশী হইতে প্রয়াগ। প্রয়াগেও কয়েক দিন কাটিল। প্রয়াগ হইতে জব্বলপুরে গমন করিলাম।

জব্বলপুরে নামিয়া গুরুদেবের আশ্রমাভিমুখে অগ্রসর হইলাম। কি সুন্দর পার্ব্বতীয় দৃশ্য। কোথাও কোথাও জঙ্গল। দুই একটা বন্যজন্তু বাহির হইয়া চকিতের মধ্যে আবার বনে প্রবেশ করিতেছে। আমি তৎপূর্ব্বে আর কখনও পর্ব্বতারোহণ করি নাই। পর্ব্বতারোহণ করিতে অত্যন্ত আনন্দ হইতে লাগিল। কলনাদিনী নৃত্যপরা নর্ম্মদার তীরে গুরুদেবের আশ্রম গৃহ। সম্মুখে পশ্চাতে কয়েকটি মহাবলী শালতরু দণ্ডায়মান। পাথরের গাঁথা তিনটি শ্রীহীন কক্ষ। পাহাড়ীরা আসিয়া গুরুদেবকে ও আমাকে ভূমিস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতে লাগিল। আমি নীরব রহিলাম, গুরুদেব সস্মিতমুখে আশীর্ব্বচন বিতরণ করিতে লাগিলেন। তাহারা তৃণসংগ্রহ করিয়া আনিল। দুইটি কক্ষে আমরা দুইটি শয্যা প্রস্তুত করিলাম। কেহ কেহ বনজাত ফলমূল আনিয়া দিল। একজনকে পল্লী হইতে তণ্ডুলাদি কিনিয়া আনিতে পাঠান গেল।

কয়েকদিন পড়াশুনা পূজার্চ্চনা বেশ চলিল। চারিদিকে যেন শান্তির রাজ্য, কোলাহল নাই, সংসারের শতপ্রকার বাধাবিঘ্ন কিছুই নাই। সাধন ভজনের পক্ষে এই উপযুক্ত স্থান বটে। কিন্তু এইবার আমি এই আখ্যায়িকার পরম সঙ্কটস্থানে আসিয়াছি। আমার জীবনের গতি ভিন্ন দিকে কেমন করিয়া ফিরিল, এইবার তাহাই বলিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

এখন মনে হইতেছে বটে, যাহা হইয়াছিল তাহা ভালই হইয়াছিল, কিন্তু তখন স্বর্গ আর মর্ত্ত্য, রসাতলের মত অন্ধকার ও ভুজঙ্গমসঙ্কুল মনে হইয়াছিল। আমি ফিরিলাম, কিন্তু কি নিষ্ঠুর আঘাত পাইয়া ফিরিলাম! স্মরণ করিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। আমি কল্পনায় যে পুণ্যময় প্রভাময় স্বর্গরাজ্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম, একদিন মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ধূলায় মিশিয়া গেল। যে গুরুকে দেবতাজ্ঞানে এতদিন পূজা করিলাম, মুহূর্ত্তের মধ্যে তাঁহার ভিতর হইতে পাপের ক্ষুধাশীর্ণ কঙ্কালমূর্ত্তি বাহির হইয়া পড়িল।

তোমরা স্তম্ভিত হইয়াছ? স্তম্ভিত হইবার কথা বটে। মানুষকে কখনও বিশ্বাস করিও না। যে যত বড় জ্ঞানী, যত বড় ধার্ম্মিক, যত বড় জিতেন্দ্রিয় পুরুষ হউক, বিশ্বাস করিও না। পুরাণে যে মহা মহা ঋষি তপস্বীর পদস্খলনের বর্ণনা আছে, তাহার এক কণিকামাত্র অতিরঞ্জন নহে। যখন আমার পিত্রালয়ে গুরুদেব সমস্ত দিন, সমস্ত সন্ধ্যা ধরিয়া আমার অন্তরে জ্ঞানামৃত সঞ্চার করিতেন, আমি কি জানিতাম যে, আমি তত্তক্ষণ অজ্ঞাতসারে তাঁহার হৃদয়ে কুবাসনার বিষকীটের সঞ্চার করিতেছি? তিনি যখন আমাকে বলিলেন,—"বৎসে, এখানে তোমার সাধন ভজনাদির ব্যাঘাত হইতেছে, আমার সঙ্গে আমার আশ্রমে চল", তখন যদি তাঁহার অন্তরের অন্তস্তল পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতাম, তবে সুপ্তিভঙ্গে শয্যাশিয়রে সর্প দেখিলে মানুষ যেমন চমকিয়া উঠে, আমি কি সেইরূপ চমকিত হইতাম না? আমি নিজের জন্য কিছুমাত্র দুঃখিত নহি; আমার যাহা হইয়াছে তাহা ভালই হইয়াছে; কিন্তু তাঁহার অবস্থাটা স্মরণ করিলে চক্ষে জল আসে। সারা-জীবনের তপস্যা তিনি আমার পায়ে ঢালিয়া দিলেন! মাঝে মাঝে আমার মনে হয় তাঁহার এই দুর্দ্দশার জন্য আমিই আংশিকরূপে দায়ী কি না; আমার কি দোষ? আমি কিসের জন্য দায়ী হইব?

কিন্তু হয়ত আমি তাঁহার প্রতি কিঞ্চিৎ অবিচার করিতেছি। গুরু স্বভাবতঃ নীচ বা কুপ্রবৃত্তিশালী নহেন, আমি তাঁহার শতসহস্র প্রমাণ পাইয়াছি। হয়ত পূর্ব্ব হইতে তাঁহার কোনও দুরভিসন্ধি ছিল না। ঘটনাক্রমে মুহূর্ত্তের প্রলোভনে তিনি হয়ত আত্ম-বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী ব্যবহার হইতেও ইহাই অনুমান করা সংগত। শুনিতে পাই তিনি সে আশ্রম ত্যাগ করিয়াছেন। আপনার সন্ন্যাসীবেশকে ভণ্ডামি জ্ঞান করিয়া তাহাও দূরে নিক্ষেপ করিয়াছেন। এখন নাকি বাহ্যাড়ম্বরহীন সাধুতার জীবন যাপন করিতে প্রবৃত্ত আছেন।

আর একবার তোমাদের নিকট আমাকে মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতে হইল। সে ঘটনাও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আমি বর্ণনা করিতে পারিব না। শুধু তাহার পরিণাম মাত্র বলি। একদিন গভীর রাত্রে যে গুরুদেবের হস্ত ধারণ করিয়া পিতৃগৃহ হইতে অপসৃত হইয়াছিলাম, সেই জব্বলপুরের পাহাড়ে আর একদিন গভীর রাত্রে—গুরুদেব আর বলিব না—সেই গুরু-দানবকে গর্ব্বিত পদাঘাতে ধরাশায়ী করিয়া স্বীয় অমূল্য সতীত্ব মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া স্বামীগৃহাভিমুখে যাত্রা করিলাম। আমার ভুল ভাঙ্গিল।

তৃতীয় দিন রাত্রি দুইটার সময় জামালপুর ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। তখনও আমার অঙ্গে সেই পূর্ব্বধৃত সন্ন্যাসীপুরুষের বেশ।

রাত্রি আছে দেখিয়া আমি মোসাফিরখানায় বসিয়া রহিলাম। আকাশ পাতাল কত কি চিন্তা করিতে লাগিলাম। মনে পড়িল, দুই বৎসর পূর্ব্বে এই জামালপুর ষ্টেশনে দাদার সঙ্গে গাড়ীতে উঠি। তাহার পর হইতে আর স্বামীর কোনও সংবাদ পাই নাই। তিনিও আমার কোনও সংবাদ লন নাই—যদি গোপনে লইয়া থাকেন তবে আমি জানি না। এত দিন কি আর তিনি বিবাহ করেন নাই? বিবাহ না করিলেও আমাকে যে গ্রহণ করিবেন, তাহার কি সম্ভাবনা আছে? তিনি কি আমার নির্দ্দোষিতায় বিশ্বাস করিবেন? তিনি যদি করেন, তবে আমার শ্বাশুড়ী বিশ্বাস করিবেন কেন? যদি শ্বাশুড়ীও বিশ্বাস করেন, তবে পাঁচজনে বিশ্বাস করিবে কেন? এই পাঁচজনের জন্যই ত রামচন্দ্র সতীকুলের আরাধ্যা দেবী সীতাসুন্দরীকে বনবাসে পাঠাইয়াছিলেন। স্বামী যদি বিবাহ করিয়া থাকেন, তবে কি আমি তাঁহার সংসারের দাসী হইয়া থাকিতে পাইব না? না হয় আত্মপরিচয় দিব না। আর একবার বনে যাইব। বনে গিয়া এ পোড়ামুখ আগুন দিয়া স্থানে স্থানে পোড়াইয়া দিব। ক্ষত শুষ্ক হইলে আমার মুখ বিকৃত হইবে; কেহ আর চিনিতে পারিবে না। তখন আসিয়া স্বামীর সংসারে দাসী হইব। যদি না রাখেন?—আমি বলিব, "আমি অর্থ চাহি না, শুধু একবেলা দুইটি খাইতে দিও। আমি ভিখারিণী, আমায় দয়া কর।" ইহাতেও কি দয়া হইবে না? আমার স্বামীর দয়ার শরীর। আমার শ্বাশুড়ীরও সেইরূপ।—আর যদি দেখি বিবাহ করেন নাই? ছদ্মবেশে থাকিয়া কৌশলে মনের ভাব বুঝিতে চেষ্টা করিব। সুযোগ পাইলেই আত্মপ্রকাশ করিব। তাহার পর কপালে যাহা আছে তাহাই হইবে। দাদার বাড়ী আর ফিরিব না। বউ পোড়ারমুখী বাঁচিয়া থাকিতে নয়। কোনও উপায় না হয়, মা গঙ্গার কোলে আশ্রয় লইব। সে ত আর কেহ রোধ করিতে পারিবে না!

ফর্সা হইল। আমি ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া ষ্টেশন ছাড়িলাম। বৈদ্যপাড়ায় সদর রাস্তার ধারেই আমাদের বাড়ী। চিনিয়া চিনিয়া গেলাম। বাড়ীর বাহিরেই দুইটা ঘোড়ানিমের গাছ ছিল, বাড়ী চিনিতে কষ্ট হইল না। কাছাকাছি গিয়া দেখিলাম, সদর দরজা খোলা; একটা হিন্দুস্থানী ছেলে, পিতলের ঘড়া মাথায় করিয়া বাহির হইল। পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমার শ্বশ্রূদেবী নামাবলী গায়ে জড়াইয়া হরিনামের মালা হাতে করিয়া বাহির হইলেন। সে দিন পূর্ণিমা, বুঝিলাম না ভোরের গাড়ীতে মুঙ্গেরে গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেছেন। গাছের আড়ালে সরিয়া দাঁড়াইলাম। প্রথম দর্শনে তাঁহাকে প্রণাম করিতে পারিলাম না।

মা দৃষ্টিপথের বাহির হইলে, সাহসে ভর করিয়া বাড়ী ঢুকিলাম। শরীর কাঁপিতে লাগিল। চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলাম, কই, কোথাও ত নোলকপরা একটি নববধূ দেখিতে পাইলাম না। স্বামী তখন শয্যাত্যাগ করিয়া বাহির হইতেছেন। নবীন সন্ন্যাসীকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে প্রণাম করিলেন। হায়, আমার কপালে এতও ছিল! আমি মনে মনে তাঁহার পায়ে সহস্রবার মাথা খুঁড়িলাম।

তাঁহার সঙ্গে কথাবার্তা আরম্ভ হইল। মাঝে মাঝে কৌতূহলপূর্ণ সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তিনি আমার পানে চাহিতেছিলেন। আমি সাবধানে চাপা গলায় বিকৃত স্বরে কথা কহিতে লাগিলাম। স্ত্রী এখানে নাই কেন, কোথায়? ইত্যাদি প্রশ্ন করিয়া পরিষ্কার উত্তর পাইলাম না, চাপিয়া গেলেন। অন্যান্য কথাবার্ত্তায় জানিলাম, দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন নাই। স্ত্রীর প্রসঙ্গে তাঁহার চক্ষুর কোণে করুণার জলরেখা দেখা দিল;—বুঝিলাম এ পোড়ারমুখীকে এখনও ভুলেন নাই। কতবার মনে করিলাম, আত্মপ্রকাশ করি কিন্তু পারিলাম না। ভাবিলাম শ্বাশুড়ী আসুন তাহার পর যাহা হয় হইবে।

স্বামী স্নান করিয়া, পাশের মেসের বাসায় আহার করিয়া, আফিসের জন্য প্রস্তুত হইলেন। বেলা দশটার গাড়ীতে মা ফিরিয়া আসিলেন। সন্ন্যাসীর সেবাদি সম্বন্ধে মাকে গোপনে কিছু বলিয়া স্বামী আফিসযাত্রা করিলেন। একে পূর্ণিমা—পুণ্যাহ;—বাড়ীতে সন্ন্যাসীকে অতিথি লাভ করিয়া মা যেন কৃতার্থ হইয়া গেলেন।

এই সময় দাই চলিয়া গেল। বাড়ী নির্জ্জন হইল। আমি বুঝিলাম এই শুভ সুযোগ উপস্থিত। বলিলাম, "স্নান করিব, তোমাদের একখানা কাপড় দাও।"

স্নানান্তে সেই কাপড়খানিকে শাড়ীর মত করিয়া পরিলাম। ঘোমটা দিয়া স্নানের স্থান হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। মা নিশ্চয়ই বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে আমার পানে চাহিয়া থাকিবেন—ঘোমটার ভিতর হইতে তাঁহার মুখ আমি দেখি নাই! শুধু পা দুখানি দেখিতে পাইতেছিলাম,—টিপ করিয়া একটা প্রণাম করিলাম।

মা বলিয়া উঠিলেন—"ওমা, ওমা, ওমা—সন্ন্যাসী না পাগল?"—বলিয়া ক্ষিপ্রহস্তে আমার অবগুণ্ঠন অপসৃত করিলেন। চোখোচোখী হইবামাত্র চিনিয়া ফেলিলেন—রুদ্ধ-শ্বাসে বলিলেন—"একি! বউমা!!"

কেমন করিয়া তাঁহার পা ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সব কথা আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলাম, তাহা আর বিস্তারিত বলিবার প্রয়োজন নাই। প্রথমে বিস্ময়ে তাঁহার মুখে কথা বাহির হইল না। তাহার পর আমার সঙ্গে তিনিও কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিলেন। বুকে টানিয়া লইয়া স্নেহভরে বারম্বার আমার মুখচুম্বন করিলেন। শেষে বলিলেন,—"বাছা, ছেলে বাড়ী আসুক, নইলে আমি কিছুই বলতে পারছিনে।"

বলিলেন, গুরুর সঙ্গে আমার পিতৃগৃহত্যাগের সংবাদমাত্র তাঁহারা পান নাই।—সুতরাং "পাঁচজন" সম্বন্ধে আর কোনও আশঙ্কা রহিল না। কিন্তু তথাপি বাড়ীতে লোকজন আসিয়া পাছে আমায় দেখিয়া ফেলে, পাছে কিছু সন্দেহ করে, সেইজন্য তিনি আমাকে একটা ঘরে পুরিয়া চাবি বন্ধ করিলেন।

শ্বাশুড়ী ক্ষমা করিলেন;—স্বামীর সম্বন্ধে একপ্রকার নিশ্চিন্ত ছিলাম। আর্সি চিরুণী লইয়া সমস্তদিন স্বল্পাবশিষ্ট চুলের জটা ছাড়াইলাম। দুইখানা চিরুণী ছিল, দুইখানারই প্রায় সব কটা দাঁত ভাঙ্গিয়া গেল।

সেই পূর্ণিমারজনীতে স্বামীর সঙ্গে আমার সুখসম্মিলন হইল। তোমরা যদি আমাকে ক্ষমা করিতে পারিয়া থাক, তবে এইবার আমার কল্যাণে শাঁখ বাজাইয়া দাও।

[জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬]

কুড়ানো মেয়ে

প্রথম পরিচ্ছেদ ॥ বেহাই বাড়ী

অপরাহ্ণ কাল। শ্রাবণ মাসের ভরা গঙ্গা মতিগঞ্জের ঘাটের অশ্বত্থমূল লেহন করিয়া বহিতেছে। একখানি জীর্ণকলেবর ভাউলে আসিয়া ঘাটে লাগিল। একটি শীর্ণকায় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সাবধানে সন্তর্পণে তীরে অবতরণ করিলেন। মাঝি তাঁহার ব্যাগটি, ছাতাটি লাঠিখানি নামাইয়া দিল। তিনি সেইগুলি হাতে লইয়া, দাঁড়ী মাঝির খোরাকীর জন্য একটি সিকি বাহির করিয়া দিলেন। মাঝি সিকিটি হাতে করিয়া বলিল—"কর্ত্তা, আমরা পাঁচটি প্রাণী, চার আনায় কি করে পেট ভরবে?"

"সে কিরে চার আনা কি অল্প হল?"

"ঠাকুর, চার সের চাউল কিনতেই ত চার আনা যাবে। হাঁড়ি আছে, কাঠ আছে, নুনতেল আছে—"

"নে নে—আর দু গণ্ডা পয়সা নে।" বলিয়া বৃদ্ধ অত্যন্ত সাবধানে দুই তিনবার গণিয়া আটটি পয়সা মাঝির হাতে দিলেন। তবু মাঝি সন্তুষ্ট হইল না। বলিল—"মশাই পাঁচ পাঁচটা পেট, সমস্ত দিন হাড়ভাংগা মেহন্নতের পর—না হয় আট গণ্ডাই পুরোপুরি দিন।"

উভয়পক্ষে কিয়ৎক্ষণ কথা কাটাকাটির পর বৃদ্ধ চারিটা পয়সা ফেলিয়া দিলেন। তাহার পর চারিদিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে মাঝিকে বলিলেন—"যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে তোমরা কি করতে এসেছ, বলিস্ আমাদের ঠাকুরমশাই একটা বিয়ের সম্বন্ধ করতে এসেছেন।"

তাহার পর বৃদ্ধ ধীরে ধীরে রাস্তায় উঠিলেন। ধীরে ধীরে পথ অতিক্রম করিয়া গন্তব্যস্থান অভিমুখে চলিলেন। দোকানী পশারীরা এই নূতন লোকটির পানে মুহূর্ত্তের জন্য কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আবার স্ব স্ব কার্য্যে মন দিল।

বৃদ্ধের নাম সীতানাথ মুখোপাধ্যায়। নিবাস নবগ্রাম। সকালবেলায় লিখিতে বসিয়াছি, অদৃষ্টে কি আছে বলিতে পারি না;—নবগ্রামের কেহ আহারের পূর্ব্বে এই বৃদ্ধের নামোচ্চারণ করে না। তাঁহার কৃপণতাখ্যাতি বহুদূর ব্যাপ্ত। মতিগঞ্জে তাঁহার বেহাই বাড়ী। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রামের শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যার সহিত তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান অন্নদাচরণের বিবাহ হইয়াছিল। বৎসরখানেক হইবে তাঁহার বধূমাতা সন্তানসম্ভাবনাবশতঃ পিতৃগৃহে আনীত হইয়াছিলেন। আজ পাঁচ ছয় মাস হইল, একটি কচি মেয়ে রাখিয়া বধূটি ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। একদা উৎসববেশ পরিধান করিয়া বাদ্যভাণ্ডের সহিত সীতানাথ এই পথে পাল্কী করিয়া বর লইয়া গিয়াছিলেন, আজ সেই সমস্ত অতীত কথা স্মরণ হইতে লাগিল। মনটা বিশেষ নহে, একটু যেন বিষন্ন হইল।

বৈবাহিকের বাটী পৌঁছিতে অধিকক্ষণ লাগিল না। বৈঠকখানা খোলা ছিল, সীতানাথ সেইখানে গিয়া উপবেশন করিলেন। সেই কক্ষের ভিত্তিগাত্রে বসুধারার সপ্তরেখা আজিও বিদ্যমান। মনে হইল, পুত্রের বিবাহান্তে এই কক্ষে কুশণ্ডিকা সম্পন্ন হইয়াছিল। বিবাহের সমকালে তাঁহার বৈবাহিক হৃষীকেশের অবস্থা বেশ স্বচ্ছল ছিল। তিন হাজার টাকা খরচ করিয়া তিনি একমাত্র কন্যাটির বিবাহ দিয়াছিলেন। হৃষীকেশ চালানের ব্যবসায় করেন। পাঁচ বৎসরকাল উপর্যুপরি লোকসান দিয়া তিনি এখন শুধু নিঃস্ব নহেন, ঋণে জড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। বসুধারার চিহ্নগুলি যে রহিয়া গিয়াছে, পাঁচ বৎসরের মধ্যে সে কক্ষভিত্তিতে যে একটিবারও চূণ পড়ে নাই, সামান্য হইলেও তাহাও এই অস্বচ্ছলতার একটা নিদর্শন।

এক ছোঁড়া চাকর বাহিরে বাগানের বেড়া বাঁধিতে বাঁধিতে সীতানাথের প্রতি আড়চক্ষে

চাহিতেছিল। বোধ হয় ভাবিতেছিল, বড়ো নিশ্চয়ই তামাক চাহিবে, এবং তামাক সাজিতে গিয়া নিশ্চয়ই সেও দুটান টানিয়া লইবে। বেচারী নূতন তামাক খাইতে শিখিয়াছিল, ধূমপিপাসাটা তখন তাহার অত্যন্ত বলবতী। কিন্তু সীতানাথের দৃষ্টি তাহার উপর পতিত হইবামাত্রই বলিলেন—"ওহে বাবুকে একবার খবর দাও, নগাঁয়ের সীতেনাথ মুখুয্যে এসেছেন।"

আশাহত বালক এ অনুরোধে বাক্যমাত্র ব্যয় না করিয়া নীরবে আগন্তুকের প্রতি একবার চাহিল। গম্ভীরভাবে কাস্তেখানি বেড়ার গায়ে ঝুলাইল। দড়ির তালটা ধীরে ধীরে গুটাইয়া ভাল যায়গায় রাখিল। তাহার পর অপ্রসন্নমুখে মন্থরপদে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল।

অনতিবিলম্বে হৃষীকেশ আধময়লা ধুতি পরিয়া, একটা মোটা চাদর গায়ে দিয়া, বাহির হইয়া আসিলেন। সীতানাথ দেখিলেন, বৈবাহিকের সে স্থূলবপু নাই, অঙ্গে সে লাবণ্য নাই, চক্ষু কোটরগত। দুইজনে নমস্কারের আদান প্রদান হইল, কোলাকুলি হইল, কুশলপ্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা হইল। হৃষীকেশের চক্ষু ছলছল; গোটাকত বড় বড় জলবিন্দু গণ্ড বহিয়া তাঁহার গাত্রবস্ত্রে পতিত হইল।

ভৃত্য আসিয়া তামাক দিয়া গেল। দুইজনে অনেকক্ষণ ধরিয়া পর্য্যায়ক্রমে ধূমপান করিলেন, কাহারও মুখে কথাটি নাই।

অবশেষে সীতানাথ বলিলেন—"ভাই, যাহা হইবার তাহা ত হইয়াছে, সে ত আর ফিরিবে না, বৃথা আক্ষেপ করিয়া কি হইবে বল? মেয়েটিকে একবার আন দেখি।"

হৃষীকেশ উঠিয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বাহির হইয়া আসিলেন। পশ্চাতে ঝি, তাহার কোলে ফরাসী ছিটে দোলাই জড়ান, মাতৃস্তনবঞ্চিত শীর্ণকায় শিশুকন্যা। সে হাসিতেছে না, কাঁদিতেছে না, নিতান্ত নির্লিপ্তের মত একদিক পানে চাহিয়া আছে।

তাহার পিতামহ তাহার মুখ দেখিবার জন্য নগদ একটি আধুলি বাহির করিয়াছিলেন। কি ভাবিয়া আবার আধুলিটি রাখিয়া একটি টাকা বাহির করিলেন। মুখুয্যে মহাশয় ইহজীবনে এরূপ বদান্যতা ও ত্যাগস্বীকারের পরিচয় আর কখনও দেন নাই—এবার একটু বিশেষ কারণ ছিল। টাকাটি দিয়া নাতিনীর মুখ দেখিলেন।

ঝি টাকাটি হাতে লইয়া অসন্তুষ্টের মত অন্যদিকে মুখ ফিরাইল। বলা বাহুল্য, মেয়ের আদর এখন সহর ছাড়িয়া পল্লীগ্রামেও প্রবেশ করিয়াছে। কলেজের নবাবাবু শ্বশুরালয়ে গিয়া, গিনি দিয়া প্রথমা কন্যার মুখ দেখিলে, পাড়ার লোকে সেটাকে বাড়া-বাড়ি বলিয়া আর হাস্য করে না। সুতরাং টাকাটি ঝির মনে ধরিবে কেন? সে ভাবিল "মর মিন্‌ষে, এত কষ্টের প্রথম মেয়েটি,—আহা, তাতে আবার মা-মরা,—একটু সোণা জুট্‌ল না মুখ দেখতে!"

ক্রমে অন্ধকার হইল। মুখোপাধ্যায় হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিয়া সন্ধ্যাবন্দনার জন্য বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। পূজার আসনে বসিবামাত্র শুনিতে পাইলেন, তাঁহার বেহাইন, "ওগো মা আমার কোথায় গেলিগো" বলিয়া উচ্চস্বরে ক্রন্দন আরম্ভ করিয়াছেন। মাতৃহৃদয়ের সেই উচ্ছ্বসিত শোকার্ত্তরবে সন্ধ্যাদেবী যেন শিহরিয়া উঠিলেন। হৃষীকেশের চক্ষু হইতেও ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। সীতানাথ মূঢ়ের মত পূজার আসনে বসিয়া রহিলেন। মধ্যে মধ্যে কেবল মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন—"হা নারায়ণ, কি করলে?"

কান্না থামিলে সীতানাথ সন্ধ্যাহ্নিক শেষ করিলেন। তাহার পর জলযোগে বসিলেন। কিন্তু তাঁহার মনের ভিতরটা কে যেন টিপিয়া ধরিয়া থাকিল। যে কাযের জন্য এতখানি গঙ্গাপথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে ত এখন পর্যন্ত একটি কথাও বলা হইল না। বৈকাল হইতে কতবার বলি বলি করিয়া আর বলিতে পারেন নাই। শেষকালে স্থির করিলেন—"দূর হোক গে, কাল সকালেই বলব; রাত্রিটা কোন মতে কাটিয়ে দিই।"

আহারান্তে বৈঠকখানাতেই তাঁহার শয্যা প্রস্তুত হইল। হৃষীকেশ রাত্রির মত বিদায় গ্রহণ করিলেন। পূর্ব্বকথিত ভৃত্যবালক একপাশে কম্বল পাতিয়া শুইল।

দুশ্চিন্তায় সমস্তরাত্রি ব্রাহ্মণের নিদ্রা হইল না। যে কাযের জন্য আসিয়াছেন, তাহা সফল হইবে কি হইবে না, এই ভাবিয়া ভাবিযাই রাত্রি কাটিল। তামাক সাজিতে সাজিতে চাকর ছোঁড়ার প্রাণান্ত হইল। রাত্রি তিনটার সময় যখন সীতানাথ তামাক সাজিবার জন্য আবার তাহাকে জাগাইলেন, তখন সে বলিল, "তামুক আর নেই ঠাকুর, সব ফুরিয়ে গিয়েছে।" বেগতিক দেখিয়া শেষবারে তামাক সাজিবার সময় সে বাকী তামাকটুকু জানালা গলাইয়া বাহিরে ফেলিয়া দিয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥ কার্য্যোদ্ধার

সকাল হইলে দুর্গা দুর্গা বলিয়া সীতানাথ গাত্রোত্থান করিলেন। বৈবাহিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। ধূমপান করিতে করিতে সীতানাথ স্থির করিলেন এইবার বলি। মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার সূচনাটা এইরূপ হইল।—

"বেয়াই মশাই—অদৃষ্ট ছাড়া ত আর পথ নেই, আমাদের যা অদৃষ্টে ছিল তা কে খণ্ডন করবে বল ? আমার আর চারটি বউ আছে, কিন্তু ছোট বউমা যেমন ছিলেন, তেমনটি কেউ নয়। আমার এত গুণের বউকে গিন্নী দেখে যেতে পারলেন না, সেই দুঃখই চিরকাল থাকবে। মার আমার যেমন রূপ তেমনি গুণ ছিল। তাঁর গুণে পশুপক্ষী পর্য্যন্ত বশ হয়েছিল। বাড়ীতে রাঙী বলে একটা গাই আছে, এমনি বজ্জাৎ, তার ত্রিসীমানায় কেউ যেতে পারে না, শিঙ পেতে গুঁতোতে আসে, কেবল ছোট বউমা কাছে গেলে সে কিছু বলত না। জায়ে জায়ে ঝগড়া কলহ, এ ত চিরদিন সকল সংসারে চলে আসছে, কিন্তু আমার অন্য বউরা ছোট বউমাকে নিজেদের সহোদরা ভগ্নীর মত মনে করতেন। দুঃসংবাদটা শুনে বড় বউমা একবারে আছাড় খেয়ে পড়েছিলেন। তিন দিন তিন রাত্রি, জলস্পর্শ করেন নি। আজও বলেন, আমার পেটের সন্তান গেলে এতটা হত না।"

হৃষীকেশ চক্ষুর জলে মাটি ভিজাইতেছিলেন। কম্পিতস্বরে বলিলেন—"বেয়াই মশাই, থাক আর সে সব কথা কয়ে ফল কি, অন্য কথা বলুন।"

সীতানাথ চুপ করিলেন। তাঁহার ভূমিকাই তাঁহাকে মাটি করিয়া দিল। নীরবে নিজের বুদ্ধিকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ আবার এ কথা সে কথা পাঁচ কথায় কাটিল। এবার সীতানাথ নিজের উপর অত্যন্ত রাগ করিয়া, ভূমিকামাত্র বর্জ্জন করিয়া, কথাটা বলিয়া ফেলিলেন। শুনিতে এমন কাঠখোট্টা রকম ঠেকিল যে নিজেরই লজ্জা করিতে লাগিল।

কথাটা আর কিছুই নয় বধূমাতার অলঙ্কারগুলির কথা। তাহাই বুঝি আদায় করিতে আসিয়াছেন।

প্রস্তাবটা শুনিয়া হৃষীকেশ অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। বৈবাহিকের আগমনসংবাদ প্রাপ্তিমাত্রই, তিনি ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন।—আর, এ ত জানা কথা। তবু তাঁহার মনে এক একবার দুরাশা উপস্থিত হইল, গহনাগুলি আটকাইবেন, দিবেন না। নাতিনীটি যদি বাঁচে—কুলীনের ঘরের মেয়ে, বাঁচিবারই ষোল আনা সম্ভাবনা—তবে তাঁহারই ঘাড়ে পড়িল। ঐ অলঙ্কারগুলি অবলম্বন করিয়া তাহার বিবাহ দিবেন। দুই হাজার টাকার অলঙ্কার দিয়া তিনি যখন একমাত্র কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন, তখন তাঁহার অবস্থা খুব ভাল ছিল। উপর্য্যুপরি কয়েক বৎসর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া এখন সে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাঁহার ছেলেগুলাও কেহ মানুষের মত হয় নাই। তাঁহার অবর্ত্ত-মানে, কি করিয়া যে তাহারা সংসার চালাইবে, তাহাই তিনি মাঝে মাঝে ভাবিয়া আকুল হইতেন। এই সকল পাঁচ রকম ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি অলঙ্কারগুলি রাখিবার দুরাশা মনোমধ্যে পোষণ করিয়াছিলেন। অন্ততঃ শুভস্য শীঘ্রম অশুভস্য কালহরণং, যত বিলম্ব হয়, তাহার

চেষ্টা করিবেন স্থির করিলেন। বলিলেন—"মুখুয্যে মশাই, সেই জিনিষগুলি আপনারই। যখন একবার আপনার পুত্রকে দান করেছি, তখন আর তার একরতি মাত্রও ফিরে নেব না। তবে কিছুদিন আপনাকে অপেক্ষা করতে হচ্ছে, আপাততঃ আপনাকে দিতে পারছিনে।"

শুনিয়া মুখুয্যে মহাশয়ের মুখ শুকাইয়া গেল। ভাবিলেন, বুঝি বেহাই অলঙ্কার-গুলি কোথাও বন্ধক দিয়াছে। তাহা হইলে ত সর্ব্বনাশ! বলিলেন—"কেন, এখন দিতে বাধা কি?"

হৃষীকেশ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"এই সদ্য শোকটা পাওয়া গিয়েছে, এখনও ছ মাস হয়নি। আর কিছু দিন যেতে দিন। বাক্স থেকে সে অলঙ্কার এখন বের করে কে বলুন? মেয়েদের কোথায় কি থাকে কোথায় কি না থাকে, আমি ত কিছুই জানিনে। গিন্নী সে কালরাত্রির পর থেকে সে ঘরেই আর ঢোকেন নি। তাঁর বড় আদরের শেষ মেয়েটি, কিছুতেই তাঁকে বোঝাতে পারিনে। তার ঘরে পদার্পণ করেন না, তার কোন জিনিষটি ছুঁতে হলে কেঁদে আকুল হন। এমন অবস্থায় কি করে তাঁকে বলি, তোমার মেয়ের বাক্স খুলে গহনাগুলি বের করে দাও। শোকটা এখন বড্ড নতুন, কিছু দিন আর যেতে দিন।"

গহনা দেওয়ার বাধাস্বরূপ হৃষীকেশ কারণ যাহা দেখাইলেন, তাহা নিতান্তই সত্য; —তবে সকলের কাছে এ কারণ যথেষ্ট বলিয়া মনে না হইতে পারে। সীতানাথেরও মনে হইল না। একটু রাগ হইল। বলিলেন—

"ভাই, শোক আমারই কি লাগেনি? তবে কি করব? সংসার করতে গেলে শোক তাপ ত আছেই। এ থেকে কেউ নিস্তার পেলে এমন ত দেখলাম না,—তা সে রাজাই বল, বাদ্‌সাই বল, আর পথের ভিখারীই বল। তবু সংসারী লোককে দুদিনে তা ভুলে গিয়ে খেতে হয়, শুতে হয়, হাসতে হয়, সংসার ধর্ম্মের সবই করতে হয়। তা তাঁর যদি অত শোকই হয়ে থাকে, তবে তুমিই না হয় চাবিটা চেয়ে খুলে আনগে না।"

হৃষীকেশ আবার কিছুক্ষণ মৌনভাবে তামাক টানিতে লাগিলেন। বিলম্ব দেখিয়া সীতানাথ একবার তাগাদা করিলেন। তখনও হৃষীকেশ গহনাগুলি রাখিবার আশা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। একটু কাতর ভাবে বলিলেন—"বেয়াই মশায়, একটা বৎসর যেতে দিন। তখন এসে গহনাগুলি নিয়ে যাবেন। যদি আজ্ঞা করেন ত আমিই মাথায় করে সেগুলি আপনার বাড়ী পৌঁছে দেব।"

সীতানাথ রুক্ষস্বরে উত্তর করিলেন—"মানুষের শরীর—পদ্মপত্রের জল। আজ আছে কাল নেই। এক দণ্ডের কথা বলা যায় না, এক বৎসর যদি আমি না বাঁচি?"

হৃষীকেশ মনে মনে বলিলেন—"না বাঁচ ত ঐ গহনাতে তোমার শ্রাদ্ধের যোগাড় করা যাবে।" প্রকাশ্যে বলিলেন—"তা হলে আপনার গহনা আমাদেরই কাছে থাকবে। ঐ গহনা দিয়ে আপনার পৌত্রীর বিবাহ দেব।"

সীতানাথ শ্লেষের স্বরে বলিলেন—"তুমি কি মনে করেছ আমার নাত্‌নী চিরদিনই তোমার ঘরে থাকবে? একটু বড় হলেই ওকে আমি নিয়ে যাব। বড় বউমা মেয়েটিকে দেখবার জন্যে পাগল। আসবার সময় আমাকে বললেন—'বাবা আমিও তোমার সঙ্গে যাব? খুকিকে দেখে আসব?' বিবাহের কথা বলছ, তা ভাই আমাদের এমন কপাল কি হবে? ঐ মেয়ে কি বাঁচবে? ওর যে রকম চেহারা দেখলাম তাতে কোন মতেই ত সে আশা করা যায় না।"

হৃষীকেশ ব্যবসায়বুদ্ধি-সম্পন্ন লোক;—স্তোকবাক্যে ভুলিবার পাত্র নহেন। বলিয়া ফেলিলেন—"তা গহনা এখন থাকুক না। যখন মেয়ে নিয়ে যাবেন তখনই গহনা নিয়ে যাবেন।"

কথাটা শুনিয়া সীতানাথ জ্বলিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"ভায়া হে, আমাকে কি অবিশ্বাস করলে? জিনিসগুলি আটক করে ব্রাহ্মণকে মনঃক্ষুণ্ণ করে ফিরিয়ে দিলে কি তোমার মঙ্গল হবে?"

হৃষীকেশ বেহাইয়ের চরিত্র পূর্ব্বাবধিই জানিতেন। তিনি যখন ধরিয়াছেন গহনা লইয়া যাইব, তখন যে না লইয়া ফিরিবেন এমন আশা নাই। সুতরাং আর আপত্তি উত্থাপন করা নিস্ফল মনে করিলেন। বলিলেন—"তবে নিয়ে যান।"

সীতানাথের মুখ প্রফুল্লভাব ধারণ করিল। বলিলেন,—"আহারাদির পর সকাল সকাল আজই বেরুতে হবে। তুমি তবে সেগুলো বের করে ঠিক করে রাখ, আমি গঙ্গা-স্নানটা সেরে আসি।"

গঙ্গার ঘাটে আসিয়া অনেক দূর হইতে মাঝিকে উচ্চস্বরে সীতানাথ বলিলেন—"ও মাঝি যে বিয়ের সম্বন্ধ করতে এসেছিলাম, সে তারা রাজি নয়। বলে অত গরীবের ঘরে আমরা মেয়ে দেব না। নৌকো ঠিক করে রাখ, খাওয়া দাওয়ার পর ছাড়া যাবে।"—বলিয়া ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণ চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, ঘাটসুদ্ধ লোক তাহার কথাগুলি শুনিতে পাইয়াছে কি না। যেরূপ উচ্চকণ্ঠে কথাগুলি উচ্চারিত হইয়াছিল তাহাতে নিতান্ত বধির ভিন্ন আর কাহারও না শুনিতে পাইবার সম্ভাবনা ছিল না। লোকে মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিল।

তাহার পর সীতানাথ গঙ্গাস্নান সমাপ্ত করিয়া অত্যন্ত আড়ম্বরের সহিত ঘাটে আহ্নিক করিতে বসিলেন। আজ দেবতাগণের বড়ই শুভাদৃষ্ট। এরূপ ভক্তিবাহুল্যের সহিত পূজো সীতানাথ অনেককাল করেন নাই।

বাড়ী ফিরিয়া গিয়া আহারাদি শীঘ্র শীঘ্র শেষ করিলেন। বুড়ার আর দেরী সহে না। হৃষীকেশকে বলিলেন—"ভাই এইবার জিনিষগুলি নিয়ে এস, দুর্গা বলে সকাল সকাল যাত্রা করি।"

হৃষীকেশ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া বড় বিলম্ব করিতে লাগিলেন। সীতানাথ ভাবিলেন সেই দিতেই হইবে, তবু কেমন যে কৃপণের স্বভাব, যতক্ষণ পারে ততক্ষণ দেরী করিতেছে। যাহা হউক মনটার অবস্থা বেশ উৎফুল্ল থাকার দরুণ সীতানাথ গুণ্ গুণ্ করিয়া একটা রাগিণী ধরিলেন—

ছাড়ো মন বিষয়েরি ভাবনা অসার,
শুধু রাধানাথো পদো করো চিন্তা অনিবার।

হৃষীকেশকে রিক্তহস্তে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া সীতানাথের গান সহসা বাধাপ্রাপ্ত হইল। বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"কি হল?"

"হল না।"

"সে কি?"

হৃষীকেশ ব্যাপারখানা বুঝাইলেন—"মুখুয্যে মশাই, জিনিষগুলি আপনাকে দিতে প্রস্তুতই হয়েছিলাম। গিন্নীকে গিয়ে বলাতে প্রথম তিনি কেঁদে ভাসিয়ে দিলেন। শেষে বললেন—চাবি ত নেই, চাবি আমার মায়ের কাঁকালে ছিল, সে তাঁরই সঙ্গে চিতায় উঠেছে।"

কথাটা সীতানাথের বিশ্বাস হইল না। রাগিয়া বলিলেন—"সে আমি শুনব না। চাবি না থাকে বাক্স ভাঙ্গ। জিনিষ আমি না নিয়ে যাচ্ছিনে।"

হৃষীকেশ বলিলেন—"যদি না যান তবে বসে থাকুন। চাবি নেই, আমি কি করব? এই ত অবস্থা। এর ওপর কি কামার ডেকে এনে দমাদ্দম করে সিন্দুক ভাঙ্গান ভাল দেখায়, না সেটা করান আপনারই কর্ত্তব্য কর্ম্ম হয়?"

সীতানাথ মুখ চোখ বিকৃত করিয়া চেঁচাইয়া বলিলেন—"না, আমার কর্ত্তব্যকর্ম্ম হয় না। ব্রাহ্মণকে ফাঁকি দেওয়াটাই তোমার কর্ত্তব্যকর্ম্ম হয়। দেবে কি না দেবে সেটা খোলসা করে বল দেখি। যদি না দাও তবে পৈতে ছিঁড়ে অভিশাপ দিয়ে যাব, উচ্ছন্ন যাবে,

তেরাত্তির পোয়াবে না।"

বৈবাহিক-প্রবরের মুখচোখের ভঙ্গিমা দেখিয়া হৃষীকেশ বড় অপমান বোধ করিলেন; মনে মনে ভারি ঘৃণা হইল। স্বয়ং গিয়া কামার ডাকিয়া আনিলেন। দোতলার উপর তাহাকে লইয়া গিয়া সিন্দুক ভাঙ্গাইলেন। মেয়ের মা এই নিষ্ঠুর কাণ্ড দেখিয়া মাটিতে লুটোপুটি করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

বৈবাহিক গহনা লইয়া বিদায় হইলে হৃষীকেশও শয্যাতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

সে দিন আর এই দম্পতীর মুখে অন্নগ্রাস উঠিল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥ বুড়া বর

ভাগীরথীর তীরে বৃক্ষরাজিবেষ্টিত নবগ্রাম। ভোর হইয়াছে। সকল পাখী এখনও প্রভাতী কলকূজন আরম্ভ করে নাই। একখানি ছেঁড়া বালাপোষ গায়ে দিয়া মাথায় পাগ্ড়ি বাঁধিয়া বৃদ্ধ সীতানাথ ধীরে ধীরে স্বীয় ভবনাভিমুখে চলিতেছেন। পূর্ব্বরাত্রির বৃষ্টিজল বৃক্ষপল্লব হইতে টপ্ টপ্ করিয়া ঝরিয়া তাঁহার পাগড়ি ও বালাপোষ ভিজাইয়া দিতেছে।

ক্রমে তিনি নিজবাটীর সদর দরজার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দরজা বন্ধ। দুই পাশে দুইটি ইষ্টকনির্ম্মিত দেউড়ি বা বসিবার স্থান। তাহা বহুকাল সংস্কারের অভাবে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। দুই দিকে দুইটি কলিকাফুলের গাছ এক গা করিয়া ফুলের গহনা পরিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

দ্বারে উপস্থিত হইয়া ক্ষীণরুগ্নকণ্ঠে সীতানাথ ডাকিলেন—"নিতাই।" একবার, দুইবার, তিনবার ডাকাডাকির পর বাড়ীর ভিতর হইতে উত্তর পাওয়া গেল—"যাই গো।" নিতাই ছুটিয়া আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। প্রভুর পানে চাহিয়া সে অবাক্। সপ্তাহের মধ্যে আকার প্রকার যেন একবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। সে ছাতা নাই, লাঠি নাই, ব্যাগ নাই, এ বালাপোষ কোথা হইতে আসিল! ভাবিয়া নিতাই কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। নিতাই তাঁতির ছেলে ভৃত্য বালক—এপ্রেণ্টিস করিতেছিল, মাহিনা পায় না, "প্রসাদ" পায় মাত্র। সীতানাথ জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি রে নিতাই, বাড়ীর সব ভাল?"

নিতাই বলিল—"ভাল। আপনার লাঠি আর ছাতা কই?"

বৃদ্ধ অতি করুণভাবে নিতাইয়ের প্রতি নেত্রপাত করিলেন। নিতাই বলিল—"ফেলে এসেছেন বুঝি?" বৃদ্ধ কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিলেন—"হাঁ নিতাই, সে গেছে।"

পাকা বাঁশের লাঠিগাছটির উপর নিতাইয়ের অনেক দিন হইতে লোভ পড়িয়াছিল। একদিন সুযোগ পাইলে লাঠিখানি সে চুরি করিয়া বাড়ী রাখিয়া আসিবে, অনেক দিন হইতেই ইহা তাহার মনে মনে ছিল। সেই জন্য সে কিঞ্চিৎ দুঃখ অনুভব করিল। মনে করিল নিশ্চয়ই সেই মতিগঞ্জের বাড়ীর কোনও ছোঁড়া চাকরের কায, সেই লইয়াছে, লোভ সামলাইতে পারে নাই। কিন্তু ছাতাটাও লইল! সে ছাতা এমন ছেঁড়া ছিল যে তাহা মনিব তাহাকে বথ্সিস্ করিলেও নিতাই লইত কি না সন্দেহ। যদিও বা লইত, তবে তাহার বেতের শিকগুলি খুলিয়া লইয়া ধনুকের তীর করা চলিত মাত্র, সে ছাতা আর কোনও কাযে লাগিত না।

সীতানাথ একবারে নিজের ঘরে গিয়া বসিলেন। নিতাই চক্মকি ঠুকিয়া সোলায় আগুন ধরাইল। তামাক সাজিয়া কর্ত্তার হাতে দিল।

কর্ত্তা হুঁকাটি কলঙ্কধরা পিতলের বৈঠকের উপর রাখিয়া দিলেন। তাম্রকূটের প্রতি তাঁহার এতাদৃশ বিরাগ ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই। চক্ষু নত করিয়া মাথাটি নাড়িয়া নাড়িয়া, সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসের সহিত বলিলেন,—

"হা হা হা হা—সর্ব্বনাশ হয়ে গেল।"

ব্যাপারখানা দেখিয়া নিতাই সেখান হইতে সরিয়া পড়িল। বড় বধূঠাকুরাণী তখন উঠিয়া বারান্দা মার্জ্জনা করিতেছিলেন, তাঁহাকে নিতাই কর্ত্তার অবস্থা জানাইল। তিনি বলিলেন,—"বড়বাবুকে উঠাগে যা।"

বড়বাবু সীতানাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র, নাম শ্রীনিবাস। শ্রীনিবাস উঠিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে পিতার ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"একি! আপনার চেহারা এমন হয়ে গেছে কেন? কোন বিপদ আপদ হয়নি ত?"

বৃদ্ধ লম্বিত মস্তক দুলাইয়া করুণস্বরে বলিলেন—"হা হা হা হা, সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে।"

"কি হল, দিলে না?"

"দিয়েছিল রে দিয়েছিল—সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে।"

পিতা যদি আরও কিছু বলেন, এই আশায় শ্রীনিবাস তাঁহার মুখের পানে উৎসুক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। বৃদ্ধের মুখ হইতে হা হুতাশের অস্ফুটধ্বনি ছাড়া আর কিছুই নির্গত হইল না।

অবশেষে শ্রীনিবাস বলিলেন—"তবে কি হল? খোয়া গেল?"

বৃদ্ধ ঘাড় নাড়িয়া পূর্ব্ববৎ উত্তর করিলেন—"হা হা হা হা, সর্ব্বনাশ হয়ে গেল।"

শ্রীনিবাস এইবার একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"কি হল, খুলেই বলুন না।"

বৃদ্ধ বলিলেন—"সে গেছে রে, নোকসান্ হয়ে গেছে।"

"কেমন করে গেল? চুরি গেছে?"

"না।"

"ডাকাতে নিয়েছে?"

"না।"

"তবে?"

অনেক কষ্টে এবার বৃদ্ধ বলিলেন—"চাঁদবাড়ীর ভূধর চাটুয্যে নিয়েছে।"

পুত্র রাগিয়া বলিল—"সে আবার কে? সে কি করে গহনার বাক্স নিলে? ছিনিয়ে নিলে? আপনি চুপ চাপ চলে এলেন, পুলিসের সাহায্য নিলেন না?"

"পুলিসে কি আমি যাইনি? পুলিসেও গিয়েছিলাম। থানার দারোগা ভূধর চাটুয্যের ভগ্নীপতি রে ভগ্নীপতি।"

"ভগ্নীপতিই হোক্ আর বাবাই হোক্। এত্তেলা দিলে ডাইরিতে তাকে লিখে নিতেই হবে, অনুসন্ধান করতেই হবে।"

"লিখে নেবে কি, উল্টে সে আমায় মিথ্যে নালিসের দায়ে জেলে দেবার ভয় দেখালে।"

কলিকাতায় যে মেসের বাসায় থাকিয়া শ্রীনিবাস লেখাপড়া করিতেন, সেই বাসায় আইন অধ্যয়নকারী একটি ছাত্র ছিল। তাহার মুখে শ্রীনিবাস মাঝে মাঝে আইন সম্পর্কীয় অনেক তর্ক বিতর্ক শুনিতে পাইতেন। সে অবধি শ্রীনিবাস নিজেকে একজন আইনজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। নগদ আট আনা খরচ করিয়া একখানি "মোক্তার গাইড্" পুস্তক ক্রয় করিয়াছেন। গ্রামের লোকের মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে, প্রায়ই শ্রীনিবাস কোন না কোন পক্ষের সহায়তা করিয়া পরামর্শ দান করেন। গম্ভীরভাবে পিতাকে বলিলেন—"ব্যাপারটা কি হয়েছে, সব আদ্যোপান্ত খুলে বলুন, দেখি আমি এর কিছু প্রতিকার করতে পারি কি না।"

তখন বৃদ্ধ বলিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সেই এক ঘণ্টা কালব্যাপী সকরুণ বক্তৃতার ভিতর হইতে সমস্ত হা-হুতাশ, অশ্রুপাত, অনাবশ্যক মন্তব্য বাদ দিয়া আমরা সারাংশটুকু মাত্র লিপিবদ্ধ করিলাম।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে নৌকা গুণ টানিয়া আসিতেছিল। হঠাৎ গুণ ছিঁড়িয়া গিয়া নৌকা

বিপরীত দিকে মহাবেগে ছুটিয়া যায়। চন্দ্রবাটীর ঘাটে একখানা মাল বোঝাই প্রকান্ড ভড়ে ঠেকিয়া ভাঙ্গিয়া গেল। গহনার বাক্স চাদর দিয়া সীতানাথের পিঠে বাঁধা ছিল। অচেতন অবস্থায় সীতানাথকে জল হইতে তুলিয়া ভূধর চট্টোপাধ্যায় তাঁহাকে গৃহে লইয়া যায়। শুশ্রূষা করিয়া তাঁহার প্রাণ বাঁচাইয়াছে, কিন্তু গহনার বাক্স দিল না।

শ্রীনিবাস ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"গহনার কথা সে নিজমুখে স্বীকার করেছে?"

"প্রথম স্বীকার করেনি। আমার যখন জ্ঞান হল তখন জিজ্ঞাসা করলাম, আমার পিঠে যে একটা বাক্স বাঁধা ছিল সেটা কোথায়? বললে, তা ত কই আমরা পাইনি। তখন আমি চীৎকার করে বললাম, আমার সর্ব্বস্ব গেল রে, ব্রহ্মহত্যে করলে রে,—বলে আবার আমি অজ্ঞান হয়ে যাই। ফের যখন জ্ঞান হল, তখন দেখি কোথা থেকে একটা ডাক্তার নিয়ে এসেছে—ডাক্তারটি বললে তোমার কোনও ভাবনা নেই, তোমার বাক্স আছে। আমার সমস্ত পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে, নাড়ি দেখে ওষুধ দিলে, বলে গেল তোমার কোনও ভয় নেই, তিন দিনের মধ্যে তুমি সেরে উঠবে।"

শ্রীনিবাস উৎসাহের সহিত বলিলেন—"তবে আদালতে নালিস করে ডাক্তারকে সাক্ষী মানব। কাণ ধরে ভূধর চাটুয্যের কাছ থেকে গহনা আদায় করে নেব না!"

বৃদ্ধ বলিলেন—"সে দফাও রফা রে, সে দফাও রফা। ডাক্তারের কাছে কি যাইনি, ডাক্তারের কাছেও গিয়েছিলাম। ডাক্তার বললে গহনার কথা সে কিছুই জানে না। কেবল আমায় সান্ত্বনা করবার জন্যে মিছে করে বলেছিল। আদালতে নালিস করলে আর কি হবে, ডাক্তার ঐ কথা বলে বসবে।"

"তবে কি করে জানলেন ভূধর চাটুয্যে নিয়েছে?"

"তার পরে ভূধর চাটুয্যে নিজেই বলেছে।"

"স্বীকার করলে নিয়েছে, অথচ দিলে না? বাঃ—বেশ লোক ত! তবে তার স্বীকার করবার উদ্দেশ্যটা কি? অস্বীকার করাই ত তার পক্ষে সুবিধে ছিল।"

"উদ্দেশ্য আছে রে, উদ্দেশ্য আছে। বলে, তোমার ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দাও। তা হলে ঐ গহনাগুলি সব পাবে। আমি গরীব, আমার মেয়ের বিয়ে হয় না; তোমার গহনা তোমার ঘরেই যাবে; পুরস্কারের স্বরূপ আমাকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করবে।"

কথাটা শুনিয়া শ্রীনিবাস বলিলেন—"তবেই ত দেখছি গোলযোগ।"—বলিয়া অভ্যাস-বশতঃ গুম্ফপ্রান্ত দন্তে দংশন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

সীতানাথের কনিষ্ঠ পুত্রের নাম শ্রীমান অন্নদাচরণ। তিনি এল, এ, ফেল করা নব্য-যুবক। মেজাজটা নিতান্তই সাহেবী ধরণের। প্রাতে ও সন্ধ্যায় বিস্কুট সহযোগে নিয়মিতরূপে চা পান করিয়া থাকেন। গ্রামের বালকদিগের মধ্যে বিদ্বান বলিয়া তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি আছে। চেহারাটি দিব্য,—রবীন্দ্রীয় কেশদাম তাঁহার কমনীয় মুখসৌন্দর্য্য বহুগুণ বর্দ্ধিত করিয়াছিল। স্ত্রীবিয়োগের পর তিনি বিস্তর কবিত্ব প্রকাশ করিয়া, "ভগ্নহৃদয়ের মহাশোকাশ্রু" নামধেয় একখানি চটি কবিতা পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করিয়াছেন। যতবার বিবাহের প্রস্তাব আসিয়াছে, অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। বন্ধুসমাজে পত্নীবৎসল বলিয়া তাঁহার সম্মানের আর সীমা নাই। তাঁহাকে এ বিবাহে রাজি করা যাইবে, এমন কোনও আশা ছিল না, তাই শ্রীনিবাস বলিয়াছিলেন—"তবেই ত দেখছি গোলযোগ।"

বৃদ্ধ বলিলেন—"দেখ চেষ্টা করে, বলে কয়ে দেখ, নইলে এ বুড়ো বয়সে অত টাকার গহনার শোক আমি সহ্য করতে পারব না, আমি মারা যাব। ওকে বোলো বিয়ে না করলে পিতৃহত্যার পাপ ওকে লাগবে।"

অন্নদার চারিটি দাদা অন্নদাকে পাকড়াও করিয়া আনিয়া তাহাকে ঘিরিয়া বসিলেন। সমস্ত দিন ধরিয়া কত রকমে তাহাকে বুঝাইলেন; কত মিনতি করিলেন, তর্ক করিলেন,

রাগ করিলেন,—কিন্তু কিছুতেই অন্নদার মন টলিল না।

অন্নদার অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধবগণকে খোসামোদ করিয়া তাহাদের দ্বারায় অনুরোধ চলিতে লাগিল। পুনর্ব্বার দারগ্রহণের বিরুদ্ধে অন্নদা যত প্রকার যুক্তির অবতারণা করিল, তাহার বন্ধুরা সেগুলি, যখন যেরূপ সুবিধা হইল, সুতর্ক বা কুতর্কের সাহায্যে একে একে খণ্ডন করিল। কার্য্যের কথা ছাড়িয়া যখন ভাবের কথা আসিয়া পড়িল, তখন তাহারা বিজয়ীর মত অবজ্ঞাহাস্য করিয়া চতুর্দ্দিক হইতে শোকবিহ্বল মৃতপত্নীকের দ্বিতীয় দারগ্রহণের অজস্র উদাহরণ আনিয়া স্তূপীকৃত করিল। "দেখ, অমুক স্ত্রীবিয়োগের পর সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করিয়া গেল, বনে জঙ্গলে পাহাড়ে পাহাড়ে লোটা কম্বল কাঁধে করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইল, কিন্তু এক বৎসর যাইতে না যাইতে ফিরিয়া আসিয়া নিজে মেয়ে দেখিয়া বিবাহ করিল।—দেখ, অমুক স্ত্রীবিয়োগের পর এক জন যশস্বী কবি হইয়া পড়িল, বঙ্কিমবাবু হইতে আরম্ভ করিয়া দেশসুদ্ধ সকলেই সমস্বরে বলিল, বাংগালা ভাষায় একখানা কাব্য জন্মিয়াছে বটে, কিন্তু সে-ই আবার একটা আধটা নয়, দুই দুইটা বিবাহ করিল!"—ইত্যাদি প্রকারের যুক্তিতর্ক-সমরে অন্নদা শেষে পরাজয় স্বীকার করিল বটে, কিন্তু বিবাহ করিতে রাজি হইল না।

এ দিকে আর সময় নাই। ভূধর চট্টোপাধ্যায় দশদিন মাত্র সময় দিয়াছিল। ২০শে শ্রাবণ বিবাহের শেষ দিন। তাহার তিন দিন কাটিয়াছে. সপ্তাহ মাত্র বাকী।

ছেলে যখন কিছুতেই রাজি হইল না, তখন বাপ বলিল, "তবে আমিই বিবাহ করিব। দু-দুহাজার টাকার গহনা আমি কোন মতেই হাতছাড়া করিতে পারিব না, ইহাতে আমার কপালে যাহাই থাকুক।"

এই সংবাদ গ্রামে রাষ্ট্র হইবামাত্র একটা মহা হাসি টিট্‌কারি পড়িয়া গেল। লোকে বলিল, গহনা হারান, নৌকা উল্টান সব ছল মাত্র। সুন্দরী যুবতী মেয়েটিকে দেখিয়া হারাইয়াছে বুড়ার মন, আর উল্টাইয়াছে বুড়ার বুদ্ধিশুদ্ধি। কেহ বলিল, বুড়াকে চেনা ভার, দুধটুকু মরিয়া ক্ষীরটুকু হইয়াছে। কেহ বলিল, দীনবন্ধু মিত্রের একখানা "বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো" নাটক কিনিয়া উহাকে প্রেজেন্ট কর! কেহ বলিল, বুড়ার প্রাণের ভিতরটা যে এমন করিয়া হামাগুড়ি দিতেছে তাহা ত আমরা জানিতাম না! একজন গান বাঁধিতে জানিত, সে বহুলোকের অনুরোধে এই উপলক্ষে একটা মজাদার গান বাঁধিয়া দিল।

যাঁহারা সমাজের বিজ্ঞ লোক বলিয়া খ্যাত, তাঁহাদের দুই একজন আসিয়া সীতানাথকে বলিলেন, "মুখুয্যে মশাই আপনি ত বিবাহ করতে যাচ্ছেন, তারা যদি আপনাকে মেয়ে না দেয়? আপনি কিঞ্চিৎ বয়সপ্রাপ্ত হয়েছেন কিনা, হঠাৎ মেয়ে দিতে সম্মত নাও হতে পারে।"

সীতানাথ বলিলেন—"ও পাজি যে বিবাহ করবে না তা আমি আগে থেকেই জানতাম। ছেলে যদি বিবাহ না করে, তবে আমি বিবাহ করলেও অলঙ্কার দেবে বলেছে! পেল্লায় মেয়ে এত বড়, অর্থাভাবে আজও বিবাহ হয়নি, ওদের আর জাত থাকে না যুবো বুড়ো বিচার করলে তাদের কি করে চলবে?"

পাড়ার লোকের গ্রামের লোকের যতই আমোদ হউক, বাড়ীর লোকের মাথায় এ কথা শুনিয়া যেন বজ্রাঘাত হইল। চাঁর ছেলে চাঁর বধূ ভাবিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তাহারা স্বতঃ পরতঃ নানা উপায়ে নানা প্রকারে বুড়াকে বুঝাইতে লাগিল।

সীতানাথ বলিলেন—"দেখ, আমার বিবাহ করবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই। তোমরা অন্নদাকে রাজি কর, আমি ছেলের বিবাহ দিয়ে সোণার চাঁদ বউ ঘরে আনি।"

অন্নদা বেচারি কিয়ৎ পরিমাণে রেহাই পাইয়াছিল, এই কথার পর দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত আবার তাহার উপর উৎপীড়ন আরম্ভ হইল। শেষে অন্নদা চোখ মুখ লাল করিয়া রাগিয়া বলিল—"তোমরা যদি আমাকে এমন করে দিক্ কর, তবে আমি বিবাগী হয়ে এক দিক্ পানে চলে যাব।" বড় বধূ রাগিয়া বলিলেন—"ঢের দেখেছি ঢের দেখেছি ঠাকুরপো, এই বয়সে যত দেখলাম বাকি ত আরও কত দেখবো। এখন এ কাজ করা

কিন্তু শেষরক্ষে হলে হয়!"

২৪শে শ্রাবণ। বিবাহের আর পাঁচদিন মাত্র বাকী। সীতানাথ টাকাকড়ি লইয়া কলিকাতায় গেলেন। বলিয়া গেলেন, আবশ্যকীয় জিনিষপত্র কিনিয়া সেইখান হইতেই নিজে বিবাহ করিতে যাইবেন।

বৃদ্ধ যাত্রা করিলে পর বাড়ীতে নূতন করিয়া মহা গণ্ডগোল পড়িয়া গেল। ছোটবড় সকলেই অন্নদার প্রতি একেবারে খড়্গহস্ত। প্রায় দশ বৎসর কাল গৃহিণীর মৃত্যু হইয়াছে; —ছেলে মেয়ে নাতি পুতি ভরা সংসার,—সীতানাথ আর দারপরিগ্রহ করেন নাই,—লোকেও সে পরামর্শ দেয় নাই। আজ দশবৎসরকাল বড়বধূ ঘরের গৃহিণী। হঠাৎ নোলকপরা মূর্ত্তিমতী উপদ্রবরূপিণী একটা কচি মেয়ে আসিয়া তাঁহার হস্ত হইতে গৃহস্থালীর শাসনদণ্ড কাড়িয়া লইবে, এ কল্পনা মাত্র নিতান্তই যন্ত্রণাদায়ক হইল। বড়বধূ আবার কাঁদিতে কাঁদিতে অন্নদাকে মিনতি করিতে আরম্ভ করিলেন—"অনু ভাই লক্ষ্মীটি, এখনও সময় আছে, এখনও বিবাহ কর, নইলে সোণার সংসার ছারেখারে যায়।"

অন্নদা হঠাৎ বলিল—"দেখ বউদিদি, আমি একটা মৎলব স্থির করেছি। শুনলাম তারা বড় গরীব, তাই মেয়েটির বিয়ে হয় না। তোমরা কোন রকমে হাজারখানেক টাকা আমাকে সংগ্রহ করে দাও, আমি সেই টাকা ভূধর চাটুয্যেকে দিয়ে বলি আপনি ব্রাহ্মণ, কন্যাদায়গ্রস্ত, কিঞ্চিৎ সাহায্য করলাম, মনোমত সৎপাত্র এনে মেয়ের বিবাহ দিন। আমার গহনাগুলি ফিরিয়ে দিন। তা তারা দিতে পারে। তারা যে অধার্ম্মিক নয়, তাদের ব্যবহারে জানা যাচ্ছে। অনায়াসেই ত গহনাগুলির কথা অস্বীকার করতে পারত।"

কথাটা সকলে মিলিয়া তোলাপাড়া করিয়া বলিল, হাঁ এ পরামর্শ মন্দ নহে। চেষ্টা করিয়া দেখিতে ক্ষতি কি?

প্রাণের দায়;—পরিবারস্থ সকলের মধ্যে চাঁদা করিয়া, কিছু ঋণ করিয়া, হাজার টাকা জমা হইল। সকালে সীতানাথ রেলপথে কলিকাতা যাত্রা করিয়াছিলেন, সন্ধ্যার সময় অন্নদার নৌকা চন্দ্রবাটী অভিমুখে রওয়ানা হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥ একখানি পত্র

চন্দ্রবাটী,
২৭শে শ্রাবণ

পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত পিতাঠাকুর মহাশয়
শ্রীচরণকমলেষু

সংখ্যাতীত প্রণামান্তে নিবেদন,

আপনি কলিকাতায় রওয়ানা হইবার পরদিবস আমি কার্য্যগতিকে চন্দ্রবাটী গ্রামে উপস্থিত হই। প্রথমেই মহাশয়ের জীবনদাতা বন্ধু শ্রীযুক্ত ভূধরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত সাক্ষাৎ করি। উক্ত মহাশয় পরম সজ্জনব্যক্তি;—যারপরনাই আদর অভ্যর্থনায় আমাকে আপ্যায়িত করিয়াছেন। এই পর্য্যন্ত আমি তাঁহারই গৃহে অতিথি।

আমার পরিচয় পাইয়া গ্রামের কয়েকটি ভদ্রলোক আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন এবং একজন বিজ্ঞব্যক্তি আমাকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া বলিলেন—"বাপু হে, শুনিতেছি নাকি তুমি এই ভূধর চট্টোপাধ্যায়ের কন্যাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইয়াছ?" আমি সবিনয় প্রতিবাদ করিয়া বলিলাম যে আমি নহি, পরন্তু আমার পূজনীয় পিতৃদেব উক্তা বালিকাটির পাণিপীড়ন করিতে অভিলাষী। কথাটা শুনিয়া বিজ্ঞলোকটি থতমত খাইয়া গেলেন। মনে করিলেন বুঝি আমি তাঁহার সঙ্গে বিদ্রূপ করিতেছি। অবস্থা দেখিয়া আমি তাঁহাকে সব কথা বুঝাইয়া বলিলাম। শুনিয়া বিজ্ঞভদ্রলোকটি বলিলেন—"সর্ব্বনাশ, তোমার পিতাঠাকুর যেন এমন কার্য্য না করেন। ও মেয়েটির জাতিকুলের ঠিকানা নাই। ওটি কুড়ানো মেয়ে। বারো তেরো বৎসর পূর্ব্বে যেবার মহাবারুণীযোগে ত্রিবেণীতে লক্ষ

লোকের সমাগম হইয়াছিল, সেই বৎসর সপরিবারে সেখানে গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া চট্টো পাধ্যায় ঐ মেয়েকে কুড়াইয়া পায়। ও মেয়ের বয়স তখন বছর দুই আন্দাজ। নিঃসন্তান বলিয়া চট্টোপাধ্যায় মেয়েটিকে কন্যার মত প্রতিপালন করিয়াছে। অনেকবার ও মেয়ের বিবাহের সম্বন্ধও হইয়াছিল, কিন্তু পাছে কোনও সৎকুলীন ব্যক্তির জাতিনাশ হয়, এই আশঙ্কায় আমরা প্রতিবারেই বরপক্ষীয়গণকে সাবধান করিয়া দিয়াছি;—তোমাদিগকেও সাবধান করিয়া দিলাম।"

মহাবারুণীযোগের সময় ত্রিবেণীর ঘাটে মেয়েটিকে কুড়াইয়া পাওয়া গিয়াছিল শুনিয়া আমার মনে একটা সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। মেয়েটিকে একবার দেখিবার নিতান্ত ইচ্ছা হইল। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে বলিলাম, আমার পিতাঠাকুর যখন আপনার কন্যার পাণিগ্রহণার্থী হইয়াছেন, তখন মেয়েটিকে একবার দেখা আমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য চট্টোপাধ্যায় কন্যাকে যথাসাধ্য বসন ভূষণে সাজাইয়া আমার সম্মুখীন করেন। মেয়েটিকে দেখিয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হই। মুখখানি অবিকল আমাদের পরলোকগতা ছোটবধূর মত।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, মেয়েটির কোনও স্থায়ী রকমের ব্যাধি আছে কি না। তিনি প্রথমতঃ কিছুতেই স্বীকার করেন না। অনেক জেরা করিয়া বাহির করিলাম যে, মাঝে মাঝে মেয়ের বুকে অম্লশূলের মত একটা বেদনা দেখা যায়, দুই দিন কখনও বা তিন দিন বুক যায় বুক যায় শব্দ,—তাহার পর ভাল হইয়া যায়। বৎসরে এরূপ দুই একবার হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে যাহা সন্দেহ করিয়াছিলাম তাহাই বিশ্বাসে পরিণত হইল। মেয়েটি আমার শ্যালিকা। হিসাব করিয়া দেখিলাম, দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বেই আমার শ্বশ্রূঠাকুরাণী মেয়েটিকে ত্রিবেণীর ঘাটে হারাইয়া আসেন। তখন তাহার বয়স দুই বৎসর মাত্র। সপ্তাহ ধরিয়া ত্রিবেণীর চতুর্দ্দিকে অনেক নিস্ফল অনুসন্ধান হয়। মেয়েটির গায়ে অনেক সোণার গহনা ছিল, এই নিমিত্ত সকলে সিদ্ধান্ত করেন যে, গহনার লোভে কেহ তাহাকে হত্যা করিয়া থাকিবে। এ সমস্ত ইতিহাস আপনি অবশ্যই জ্ঞাত আছেন। অম্লশূলের ব্যারামটা—উহাও একটা প্রধান কথা। আমার শ্বশ্রূঠাকুরাণীর উহা আছে, আমার স্ত্রীর ছিল, আমার শ্যালকগণও অল্পাধিক পরিমাণে ঐ পীড়াক্রান্ত।

যাহা হউক আমি এই তথ্য আবিষ্কার করিয়াই শ্বশুর মহাশয়কে তারযোগে সংবাদ প্রেরণ করি। অদ্য প্রভাতে তিনি আমার শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণীকে সমভিব্যাহারে লইয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। মেয়েটি যে তাঁহারই, সে বিষয়ে শ্বশ্রূদেবীর আর সংশয়মাত্র নাই।

অতঃপর আপনি যদি কন্যাটিকে বিবাহ করেন তাহা হইলে কতকটা সম্পর্কবিরুদ্ধ হয়। এই কারণেও বটে, আর মহাশয়কে এই বয়সে একটা গলগ্রহ করিয়া দিয়া (বিশেষতঃ কন্যাটি বয়স্থা) কষ্টে ফেলা উপযুক্ত সন্তানের কর্ত্তব্য কর্ম্ম হয় না ভাবিয়া, আমিই অগত্যা তাহাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইয়াছি। অতএব আপনি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়া সত্বর আগমন করিবেন। বাড়ীতে দাদামহাশয়গণকে পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম। নিবেদনমিতি।

শ্রীঅন্নদাচরণ দেবশর্ম্মা

পুনশ্চ

যদি সময় থাকে তবে আসিবার পূর্ব্বে একবার গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকের দোকানে উপস্থিত হইয়া মদ্রচিত "ভগ্নহৃদয়ের মহাশোকাশ্রু" নামক কাব্যখানির সমস্ত অবিক্রীত খণ্ডগুলি সঙ্গে আনয়ন করিবেন। চট্টোপাধ্যায়ের নামে একখানি পত্র লিখিয়া এই সঙ্গে দিলাম, আপনার প্রতি তাঁহার অবিশ্বাসের কোনও কারণ থাকিবে না। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিবেন, আমি যদি "আত্মজীবন চরিত" নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করি, তবে তিনি সে পুস্তক নিজব্যয়ে প্রকাশ করিতে প্রস্তুত আছেন কি না। এই অলিখিত পুস্তকখানি অতীব মনোরম ও কৌতুকাবহ হইবার সম্ভাবনা।—ইতি শ্রীঅন্নদা

পুঃ—ঃ

ভূধর চট্টোপাধ্যায় যে আমার প্রথমা পত্নীর অলংকারের কথা বলিয়াছিলেন, এখন বলিতেছেন তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। পাছে মহাশয় সেগুলির অপ্রাপ্তিতে নিরাশা-দুঃখ অনুভব করেন, তাই এখন অবধি বলিয়া রাখিলাম। আমাকে বিবাহ করিতে কৃতসংকল্প দেখিয়া তিনি এ কথা প্রকাশ করিয়াছেন। এই মিথ্যাচরণের জন্য আমি তাঁহার কৈফিয়ৎ চাহিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন—"মুখুয্যে মহাশয় সম্বিত পাইয়া যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন বাক্স কোথায়—আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম ও সত্য বলিয়াছিলাম কোন বাক্স পাই নাই। তাহার পর ডাক্তার আসে, এবং পরামর্শ দেয় ও কথা বলিও না, পীড়া বাড়িবে: বলিও বাক্স আছে; উহাকে ভাল হইতে দাও। আমিও মনে করিলাম এই সুযোগে মেয়েটিকে পার করিবার চেষ্টা করি। বাপু হে আমার মেয়ের কিনারা হইতেছিল না। তাই দুইটা মিথ্যা কথা বলিয়াছিলাম। তা সে মিথ্যা কতক্ষণ টিকিত? বিবাহ হইলেই সমস্ত প্রকাশ হইত। তখন ত আর তোমরা মেয়ে ফিরিয়া দিতে পারিতে না।" চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যতই বিনয়ী ও অতিথিবৎসল হউন, নীতিজ্ঞান তাঁহার অতি শোচনীয়। এরূপ শিথিলনীতি মনুষ্য যে আমার শ্বশুর হইলেন না. ইহাতে আমি নিজেকে নিজে অভিনন্দন করিতেছি। ইতি—

শ্রীঃঃ

[আষাঢ় ১৩০৬

পত্নীহারা

চুঁচুড়ার গঙ্গাতীরে একটি সুন্দর ত্রিতল অট্টালিকা। তাহার একটি সুসজ্জিত কক্ষে সেই গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সপ্তদশবর্ষীয়া যুবতী শ্রীমতী সুনীতিবালা বসিয়া কবিতা পাঠ করিতেছেন। তাঁহার মুখখানি অতি সুন্দর। চোখে এখনও বালিকাসুলভ চপলতা পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করিতেছে। স্নান সমাপ্ত হইয়াছে; চুল এখনও ভাল শুকায় নাই, তাই সেইগুলি খোলা অবস্থায় পিঠের কাপড়ের উপর পড়িয়া আছে। জানালা দিয়া গঙ্গার বায়ু আসিয়া সেগুলি শুকাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে।

বেলা ক্রমে বাড়িয়া উঠিল. নয়টা বাজিয়া গেল। কাব্য আর সেই সুন্দরী পাঠিকার মন তেমন বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না। বাহির হইতে পদশব্দের আভাসমাত্র কাণে আসিলেই তিনি চমকিত হইয়া উঠিতে লাগিলেন। গঙ্গার ঘাটে বিস্তর স্নানার্থীর সমাগম হইয়াছে, সুনীতি মাঝে মাঝে গবাক্ষপথে তাহাদের প্রতিও দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

তাঁহার এই মানসিক চঞ্চলতা শীঘ্রই বিদূরিত হইল। একখানি দৈনিক সংবাদপত্র হাতে করিয়া সহাস্যমুখে সুনীতির স্বামী প্রবেশ করিলেন।

সুনীতির স্বামীটি সম্পূর্ণভাবে সুনীতির উপযুক্ত। বিধাতা যোগ্যকে যোগ্যের সহিতই যোজনা করিয়াছেন;—ইহার অপেক্ষা সুবোধচন্দ্রের আর বেশী বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন।

কবিতাপুস্তকখানি পার্শ্বস্থ টেবিলের উপর ফেলিয়া সুনীতি জিজ্ঞাসা করিল,—"অত হাসি কেন?"

সুবোধ হাসিয়া বলিল—"সহ্য হয় না নাকি?"

"না।"

"কেন?"

"তুমি বাইরে থেকে হাসতে হাসতে এসেছ। তা ত হবে না। আমার কাছে এসে আমার সঙ্গে তুমি হাসবে।"

"তুমি কি শুধু ঘরে আছ? তুমি কি বাইরে নেই?"

সুনীতি হাসিয়া বলিল—"আচ্ছা, পরাজয় স্বীকার করলাম। 'রাজন্! তোমারি আমি অন্তরে বাহিরে।' এখন ব্যাপারখানা কি, বল দেখি শুনি।"

"দেখবে আবার শুনবে?"

"চালাকি রাখ। কাগজে তোমার বয়ের সুখ্যাতি বেরিয়েছে নাকি?"

"আমার বউয়ের?"

"কি জ্বালা! তোমার কেতাবের গো মশাই কেতাবের। তোমার ফুলহারের সুখ্যাতি করে কাগজে কেউ সমালোচনা করেছে বুঝি?'

"যদি বলি তাই!"

"তবে আমি রাগ করব।"

"অপরাধ?"

সুনীতি হাসিয়া বলিল—"আচ্ছা. পরাজয় স্বীকার করলাম। রাজন্! তোমারি স্পর্শ করবে কেন?"

সুবোধ হাসিয়া বলিল—"তবে তা নয়।"

"তবে কি?"

"আন্দাজ কর।"

সুনীতি তাহার সেই হাসিমাখা চক্ষু দুইটি উল্টাইয়া দুই তিন বার ঢোক গিলিয়া শেষকালে বলিল—"বুঝেছি।"

"কি বল দেখি?"

দুষ্টামির হাসি হাসিয়া সুনীতি বলিল—"বলব কেন?"

সুবোধ বলিল—"না তোমায় বলতেই হবে।"

সুনীতি চক্ষু ঘুরাইয়া বলিল—"ইস্! হুকুম নাকি?"

"নয়ত কি?"

"বটে! জাননা 'আমি রাণী, তুমি মোর প্রজা'।"

"তবে তোমার সখীদের ডাক। আমায় ফুলপাশে বেঁধে ফেলুক। দুটো গান শুনে নিই।"—বলিয়া সুবোধ সুর করিয়া আরম্ভ করিল—"যদি আসে তবে কেন যে-এ-এ-তে চায়।"

সুনীতি রাগ করিয়া বলিল—"রঙ্গ রাখ। কি হয়েছে বল।"

"তুমি কি আন্দাজ করেছ সেইটে আগে বল।"

"সে আমি বলব না। তুমি বল চাই নাই বল।"

সুবোধ বলিল—"না, সে আমি শুনব না। তোমায় বলতেই হবে।"

সুনীতি মুখখানি গম্ভীর করিয়া বলিল—"নাঃ—যদি না মেলে, তবে তুমি ভারি হাসবে।"

"হাসলামই বা?"

"আমি যে ভারি অপ্রতিভ হয়ে যাব।"

"হলেই বা?"

"আমার চোখ যে ছল্‌ছল্ করবে।"

"তোমার চোখে একটি ওষুধ দিয়ে সে ছল্‌ছল্ ভাব ভাল করে দেব।"

এই বলিয়া সুবোধ স্নেহভরে প্রিয়তমার চক্ষু দুটিতে দুটি চুম্বন মুদ্রিত করিল।

সনীতি বলিল—"একি, রোগ না হতেই ওষুধ!"

সুবোধ হাসিয়া উত্তর করিল—"Prevention is better than cure"—সুনীতি অল্প ইংরাজি জানিত।

সুনীতি বলিল—"ধন্যবাদ, ডাক্তার মশাই।"

"শুধু ধন্যবাদে ডাক্তার সন্তুষ্ট হয় না, ভিজিট চাই"—বলিয়া ডাক্তার মহাশয় রোগিণীর

ওষ্ঠাধর হইতে ভিজিট আদায় করিয়া লইলেন।

তখন সুবোধ সুনীতির স্কন্ধে হস্তযুগল অর্পণ করিয়া বলিল—"আন্দাজটা তুমি কি করেছ বল সত্যি। আমার ভারী কৌতূহল হচ্ছে।"

সুনীতি বলিল—"বিলক্ষণ, নিজের কথা যা বলবার আছে তা বলবেন না, আমায় খালি খালি জেরা করবেন। ভারী মজার লোক ত! তুমি বল আর না বল, আমি সে কথা বলছিনে।"

সুবোধের কৌতূহল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিতে সুনীতি সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইল। শেষে সুবোধ বলিল—"আচ্ছা, আমিই আগে বলি; কিন্তু তুমি বলবে বল?"

"বলব।"

"আমার শুনে শুনে যদি বল যে আমিও তাই মনে করেছিলাম!"

"আচ্ছা, আমি কাগজে লিখে রাখি। বলা হলে তুমি খুলে দেখো।"

সুনীতি হাসিতে হাসিতে একখানি কাগজে কয়েকটি কথা লিখিল। লিখিয়া বলিল—"বল এইবার।"

সুবোধ বলিল—"আজ সন্ধ্যেবেলা বহুকাল পরে আবার ষ্টারে চন্দ্রশেখর। অনেক-দিন থেকে তোমার চন্দ্রশেখর অভিনয় দেখবার সাধ, আজ দুজনে যাই চল।"

শুনিয়া সুনীতি ভারি খুসী। লিখিত কাগজখানি হাতে লইয়া মাথা দুলাইয়া বলিল—"আচ্ছা, এতে কি লিখেছি এইবার তুমি আন্দাজ কর।"

"বাঃ সে কথা ত ছিল না।"

"নাই বা ছিল, তবু বল না।"

"আমি যদি আন্দাজ করি, তবে কি আন্দাজ করলাম সেটা ফের তোমায় আন্দাজ করে বলতে হবে কিন্তু।"

"বেশ, আমিও তোমায় আবার সেটা আন্দাজ করাব। তা হলে আন্দাজ করতে করতে চিরটা জীবন কেটে যাক্, আর কি!—আচ্ছা, তুমি আমায় যে রকম খুসী করেছ. তোমাকে আর কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। এই দেখ।"

সুবোধ কাগজ খুলিল। তাহাতে লেখা আছে—"হিজি বিজি কি লিখি ছাই আমি ত কিছুই আন্দাজ করিতে পারিতেছি না। তোমার মনে কৌতূহল সঞ্চার করিবার চেষ্টা করিতেছি মাত্র।"

পড়িয়া সুবোধ হাসিয়া উঠিল। বলিল—"তুমি ভারি দুষ্টু।"

"কি সাজা দেব?"

"সাজা দেব? সাজা দিয়েছি! আসল কথা এখনও বলিনি! তোমাকে মেম সাজাব।"

"সে আবার কি কথা!"

সুবোধ বলিল—"না, সত্যি। অনেক দিন থেকে আমার সাধ, মেমের পোষাকে তোমাকে কেমন দেখায় দেখব। তোমার জন্যে একটা পোষাক আনিয়ে রেখেছি। থিয়েটারে যাব, দুজনে আলাদা আলাদা বসে দেখলে কি সুখ হয়? বক্স রিজার্ভ করে দুজনে একত্র বসতে হবে। পোড়া বাঙ্গালীর পরিচ্ছদে ত সে হবার যো নেই—দুজনে সাহেব মেম সেজে যাই চল।"

সুনীতি বলিল—"আ সর্ব্বনাশ! সে আমি পারব না। হাজার লোকের সমুখে কি আমি বেরুতে পারি?"

"ছদ্মবেশে আর লজ্জা কি? যে তোমাকে দেখবে সে ত আর তোমাকে তুমি বলে চিনতে পারবে না! তোমাকে সকলে খাঁটি বিলিতি মেম মনে করবে, আমাকে বরং ট্যাঁস্ ফিরিঙ্গির মত দেখাবে। সাহেবেরা হিংসেতে ফেটে মরবে আর ভাববে বিধাতা 'বানর গলে দিল মোতিম হার'।"

সুনীতি বলিল—"যাও যাও ভারি ঠাট্টা শিখেছ। তোমার আর পাগলামি করতে

হবে না। সে সব হবে টবে না।"

অনেক মিনতি, অনেক সাধাসাধি, অনেক মান অভিমানের পর সুনীতি বলিল, "আচ্ছা ঘরে পরে দেখি কেমন দেখায়, তার পরে বলব।"

আহারাদির পর সুবোধ দুইটা তোরঙ্গ শয়নকক্ষে আনাইয়া লইল। সে দুইটার ভিতর সুনীতি ও সুবোধের দুই সুট সাহেবী পরিচ্ছদ।

সুনীতি বলিল—"তুমি আগে সাহেব সাজ।"

সুবোধ বলিল—"আমার সাহেবী বেশ তুমি কখনও দেখনি নাকি?"

সুনীতি বলিল—"না, তবু সাজ। দেখে আমার ভরসা হোক্।"

সুবোধ সাহেব সাজিল। এইবার সুনীতির পালা। সুনীতি অনেক মেম দেখিয়াছিল বটে, এবং মেম শিক্ষয়িত্রীর কাছে কিছুদিন লেখাপড়াও শিখিয়াছিল, কিন্তু কোথায় কি পরিতে হয়, তাহা অত লক্ষ্য করে নাই। যাহা হউক তথাপি পাশের ঘরে গিয়া আন্দাজি এক রকম করিয়া পরিয়া আসিল। যা কিছু ভুলচুক ছিল, সুবোধও আন্দাজে সংশোধন করিয়া দিল।

সুনীতির সজ্জা সম্পূর্ণ হইলে, সুবোধ সসম্ভ্রমে তাহাকে বলিল—"গুড্ মর্ণিং মেম সাহেব।"

সুনীতি হাসিয়া আকুল। সেও বলিল—"গুড্ মর্ণিং সাহেব সাহেব।"

তাহার পর দুইজনে দর্পণের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। সোণার হলকরা ফ্রেমে আঁটা প্রশস্ত মুকুর ভিত্তিগাত্রে লম্বিত ছিল। তাহাতে সুনীতির প্রতিবিম্ব দেখিয়া সুবোধ হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। সুনীতিও হি হি করিয়া তাহার সহিত যোগ দিল। মানুষকে যেমন ভূতে পায়, আজ সকালে তেমনি এই দুইটা প্রাণীকে যেন হাসিতে পাইয়াছে। সুনীতি হাসিয়া হাসিয়া বলিল—"এ বেশে আমি বাইরে যেতে পারব না, তুমি যাই বল। ঝি চাকরেরাই বা কি মনে করবে!"

সুবোধ বলিল—"এক কায করা যাবে। বাড়ী থেকে শাড়ী পরে বেরুবে। ট্রেণে পোষাক বদলে নিলেই হবে। একটা কামরা রিজার্ভ করে নেব এখন।"

সুনীতি বলিল—"সে পরামর্শ মন্দ নয়। কিন্তু আমার ভারি লজ্জা করচে। কায নেই আমার থিয়েটারে গিয়ে, যেমন আছি তেমনি থাকি।"

সুবোধ স্ত্রীর চিবুক ধরিয়া আদর করিয়া বলিল—"আমার এত দিনের সাধ তুমি পূর্ণ করবে না?"

দুই ঘণ্টা পর হুগলি ষ্টেশনে আসিয়া সুনীতি ও সুবোধ রিজার্ভ করা সেকেণ্ড ক্লাস কক্ষে আরোহণ করিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

সুবোধ গৃহ হইতেই সাহেবী পোষাক পরিয়া আসিয়াছিল। গাড়ী ছাড়িবামাত্র সুনীতিকে সে স্বহস্তে বিবি সাজাইয়া দিল। কেবল জুতার লেস্ সুনীতি নিজে বাঁধিল, সুবোধকে কিছুতেই বাঁধিয়া দিতে দিল না। সুনীতির শাড়ী ও বাহুল্য অলঙ্কারাদি তোরঙ্গে বন্ধ করিয়া রাখিল।

সেখানা প্যাসেঞ্জার গাড়ী। প্রত্যেক ষ্টেশনে থামিয়া থামিয়া চলিতেছে। গাড়ী ছাড়িয়া দিলে সুনীতি স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া বাহিরের দৃশ্য অবলোকন করে, ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী হইলেই পলাইয়া ও-কোণে গিয়া বসে, সুবোধ কিছুতেই তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। গাড়ীর ছাদে যেখানে লণ্ঠনের গহ্বর সেখানে চারিপাশে চারিখানা আর্শির টুকরা আঁটা আছে, সেই আর্শিতে সুনীতি নিজের প্রতিবিম্ব দেখে আর সুবোধের পানে চাহিয়া ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসে। এক একবার বলে—"খুব সঙ সাজালে যা হোক —মাগো—মাগো! এতও তোমার আসে!"

যখন হাওড়ায় আসিয়া গাড়ী থামিল, তখন ঠিক সন্ধ্যা হইয়াছে। আধ ঘণ্টার মধ্যে থিয়েটার আরম্ভ হইবে।

সুবোধ সুনীতির হাত ধরিয়া চলিল, একটা কুলী তোরঙ্গটা মাথায় লইয়া অগ্রসর হইল। সুবোধ সুনীতির পানে চাহে আর হাসে। সুনীতির কপালে ঘর্ম্ম; মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে। ছেলেবেলায় যা জুতা পায়ে দিয়াছিল, জুতা পায়ে দিয়া চলিতে পারিবে কেন? দুই পা তিন পা চলিয়াই হোঁচট্ খাইয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে।

সুবোধ গাড়ী ভাড়া করিল। গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাইতে হইবে?"

সুবোধ বলিল, "ষ্টার থিয়েটার, হাতিবাগান।"

সুনীতিকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া. সুবোধ বাহিরে দাঁড়াইয়াই তাহাকে বলিল—"তোরঙ্গটা সঙ্গে নিয়ে গিয়ে আর কি হবে, থিয়েটারের বাইরে গাড়ীতে পড়ে থাকবে, যদি কেউ উঠিয়ে নিয়ে যায়, কিংবা গাড়োয়ানটাও নিয়ে চম্পট দিতে পারে, ভিতরে ঢের জিনিষ রয়েছে, ষ্টেশন মাষ্টারের জিম্মায় রেখে আসি।"

সুনীতি সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল। সুবোধ কুলীটাকে লইয়া প্রস্থান করিল।

সুবোধকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া গাড়োয়ান হাঁকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কাঁহা জানে হোগা হুজুর?" সুবোধ মুখ ফিরাইয়া বলিল—"হাতিবাগান—ষ্টার থিয়েটার।"

সুবোধ গিয়া ষ্টেশন মাষ্টারের সন্ধান করিল, ষ্টেশন মাষ্টার নাই। কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিতেই ষ্টেশন মাষ্টার আসিল। সে বলিল—"প্যাসেঞ্জারগণের জিনিষপত্র আমি রাখি না, হেড্ পার্শেল্ ক্লার্কের কাছে যান, চারি আনা ফি লাগিবে, রসিদ পাইবেন।"

সুতরাং সুবোধ হেড্ পার্শেল্ ক্লার্কের সন্ধানে চলিল। অনেক কষ্টে তবে তাহাকে আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইল। তিনি একটি বাঙ্গালী বাবু—চক্ষু দেখিলে মনে হয় বিলক্ষণ অহিফেন সেবন করা অভ্যাস আছে।

অত্যন্ত ধীরভাবে সে ব্যক্তি সুবোধের প্রস্তাব শ্রবণ করিল। শেষে বলিল—"চারি আনা লাগিবে।" এই বলিয়া রসিদের বহি বাহির করিল। পেন্সিলটা খুঁজিতে কিয়ৎক্ষণ গেল। পেন্সিল যদি মিলিল, তবে কার্ব্বণ কাগজ আর পাওয়া যায় না।

এ দেরাজ সে দেরাজ, এ আলমারি সে আলমারি বহু অনুসন্ধানেও যখন কার্ব্বণ কাগজ পাওয়া গেল না, তখন সুবোধ বলিল—"মহাশয়! আমার সময় নাই, না হয় হাতেই লিখিয়া দেন না।"

সুবোধের অঙ্গে ইংরাজ-বেশ ছিল, সুতরাং অনুরোধটা উপেক্ষিত হইল না।

রসিদ লইয়া কুলীকে বিদায় দিয়া, সুবোধ তাড়াতাড়ি গাড়ীর কাছে ছুটিয়া গেল। গিয়া দেখিল, যেখানে সুনীতির গাড়ী ছিল, সেখানে নাই।

মুহূর্ত্তের মধ্যে পৃথিবীখানা বিদ্যুন্মণ্ডিত বলিয়া মনে হইল। কিন্তু সুবোধ তৎক্ষণাৎ আত্মসম্বরণ করিয়া ভাবিল, এইখানে কোথাও গাড়ী নিশ্চয়ই সরিয়া গিয়া দাঁড়াইয়াছে। ষ্টেশনের অঙ্গনে তখনও বহুসংখ্যক গাড়ী দণ্ডায়মান। সুবোধ প্রত্যেক গাড়ীর কাছে গিয়া উঁকি মারিয়া দেখিতে লাগিল। সেই গাড়ীর নম্বরটা কেন দেখিয়া রাখে নাই, কেন এমন মূর্খতা করিল, এই ভাবিয়া নিজ বুদ্ধিকে অত্যন্ত ধিক্কার দিতে লাগিল।

কিন্তু অনুশোচনার সময় নাই। ক্রমেই অন্ধকার বাড়িতেছে। একে একে গাড়ীগুলিও বাহির হইয়া যাইতেছে। সহসা একটা কথা সুবোধের মনে হইল। যখন গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, কোথায় যাইতে হইবে, তখন সে বলিয়াছিল ষ্টার থিয়েটার। গাড়োয়ান সুনীতিকে লইয়া যদি ষ্টারে উপস্থিত হইয়া থাকে?

এই কথাটা মনে হইবামাত্র সুবোধ একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া ষ্টার থিয়েটারে ছুটিল। গাড়ীতে বসিয়া ভাবিতে লাগিল, নিশ্চয়ই তাহাই হইয়াছে। সে যখন কুলী সঙ্গে করিয়া ষ্টেশন মাষ্টারের নিকট বাক্স রাখিতে গেল, তখন ত গাড়োয়ানকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া যায় নাই। মেমসাহেবেরা একাকীও ভ্রমণ করিয়া থাকেন, গাড়োয়ান কোনও সংশয় না করিয়া আপন মনে হাঁকাইয়া গিয়াছে আর কি। সুনীতি কি আর মুখ বাড়াইয়া চীৎকার করিয়া তাহাকে নিষেধ করিতে পারিয়াছে? এই ঘটনায় সে ভয়ে বিস্ময়ে ভ্যাবাগঙ্গারাম হইয়া গাড়ীর ভিতর বসিয়া কাঁপিতেছে—হয়ত কাঁদিতেছে—হয়ত মূর্চ্ছা গিয়াছে।

পরে থিয়েটারের সম্মুখে গাড়ী পৌঁছিল। মহা সমারোহে চন্দ্রশেখরের অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে। জনতা অত্যন্ত অধিক। বহুলোক স্থানাভাবে টিকিট পাইতেছে না, ফিরিয়া যাইতেছে।

সুবোধ লম্ফ দিয়া গাড়ী হইতে অবতরণ করিল। দণ্ডায়মান সমস্ত গাড়ীগুলি একে একে অন্বেষণ করিল। কোনও খানিতে সুনীতি নাই। তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ হইবার উপক্রম হইল।

ফিরিবার সময় প্রত্যেক গাড়ীর গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিল—"তুম্ কোই মেমসাহেবকো লায়া?" সকলেই বলিল—"না।" একজন বলিল—"হাঁ হুজুর লায়া।"

সুবোধের বুকের ভিতরটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল। মনে হইল এইবার যেন অকূল সমুদ্রে কূল পাইয়াছি। ঘোড়া দুইটা দেখিল, গাড়োয়ানের পানে চাহিল, ঠিক যেন সেই ঘোড়া ও সেই গাড়োয়ান বলিয়াই মনে হইল।

এক মুহূর্ত্তের মধ্যে এ সমস্ত ঘটিয়া গেল। দ্বিতীয় মুহূর্ত্তে সুবোধ গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিল—"কাঁহাসে লায়া? হাওড়া ষ্টেশনে সে?"

"হাঁ হুজুর, হাওড়া ষ্টেশন সে লায়া।"

"হাম্‌কো দেখা থা?"

কোচবাক্সে বসিয়া মুখ ঝুঁকাইয়া সেই অল্পালোকে গাড়োয়ান সুবোধের মুখ নিরীক্ষণ করিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল—"হাঁ হুজুর আপ্‌কো মাফিক্ একঠো সাহেবকো তো দেখা থা।"

সুবোধ তখন অত্যন্ত আগ্রহের সহিত বলিল—"মেমসাহেব কাঁধার গিয়া?"

"মেমসাহেব ভিতর মে তামাসা দেখ রহিহে!" শুনিয়া সুবোধ ভারি নিরাশ হইল। ভাবিল তবে এ ত সুনীতি নহে। সুনীতি হইলে সে কখনও গাড়ী ত্যাগ করিয়া টিকিট কিনিয়া থিয়েটারের ভিতর প্রবেশ করিত না। তাহা একান্তই অসম্ভব। তথাপি ভাবিল —একবার দেখা যাউক।

ভিড় ঠেলিয়া ফটক পার হইয়া সুবোধ থিয়েটারের অঙ্গনের ভিতর প্রবেশ করিল। যে ব্যক্তি টিকিট বিক্রয় করে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"ইংরেজবেশধারিণী কোনও বঙ্গ-মহিলা টিকিট ক্রয় করিয়াছেন কি?"

সে ব্যক্তির নাম ভবচরণ; বলিল—"মহাশয়, কত লোক টিকিট লইয়াছে, এই ভীড়ে কি কাহারও মুখের পানে চাহিয়া দেখিবার অবসর পাইয়াছি! তবে মনে হইতেছে যেন একজন লইয়াছেন।"

সুবোধ লোকটার হাতে একখানা নোট দিয়া বলিল, "মহাশয় একবার বাহিরে আসুন।"

ভবচরণ সসম্ভ্রমে বাহির হইয়া আসিল। ঔৎসুক্যের সহিত বলিল—"কি মহাশয়?"

সুবোধ বলিল—"আমাকে একটু সাহায্য করিতে হইবে। আপনাদের কোনও লোক দিয়া একবার সেই মহিলাটিকে সংবাদ দিতে হইবে। যদি আমার কার্য্য সফল হয়, তবে আর একখানি নোট দিব।"

ভবচরণ হাসিয়া বলিল—"তা মহাশয় নিশ্চয়ই করিব। একজন ভদ্রলোকের যদি উপকার করিতে পারি, তবে তা না করিব কেন? আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি এখনি আসিতেছি।"

বলিয়া ভবচরণ একটু অভূতপূর্ব্ব রকম আচরণ করিল। একটা গোলযোগের ব্যাপার সন্দেহ করিয়া, থিয়েটারের কোন ঝিকে ডাকিয়া তাহার দ্বারা উপরে সুবোধের বার্ত্তা না পাঠাইয়া, ইহা নির্ব্বিবাদে হাসিল করা কোন ঝির কর্ম্ম নয় মনে করিয়া, সে পশ্চাৎ দিক দিয়া থিয়েটারের সাজঘরে উপস্থিত হইল। দেখিল তাহার পরিচিতা রোহিণী নাম্নী নটী দলনী বেগমের পরিচ্ছদ পরিয়া চেয়ারে বসিয়া তামাক খাইতেছে।

তাহাকে গিয়া চুপি চুপি বলিল—"একটা কাজ করবে?"

"কি?"

ভবচরণ সংক্ষেপে ব্যাপারখানা রোহিণীকে বুঝাইয়া দিল। রোহিণী বলিল—"কি দেবে?"

"একটা ফোর্ ক্রাউন হুইস্কি।"

"আরে রামঃ—গলা জ্বলে। গ্রীন্ শীল্।"

"আচ্ছা তাই, এস তবে।"

বেগমের পরিচ্ছদ পরিত্যাগ না করিয়া বাহিরে যাওয়া চলে না; অথচ ছাড়িলে, আবার পরিতে অনেক কষ্ট ও সময় নষ্ট হইবে সুতরাং রোহিণী একখানা বিলাতী শালে আপাদ মস্তক আবৃত করিয়া, চটিজুতা পায়ে দিয়া ভবচরণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। ভবচরণ সুবোধবাবুকে দেখাইয়া বলিল—"এঁর কথা বলছিলাম।"

সুবোধ কার্ডকেস হইতে নিজের একখানি কার্ড বাহির করিয়া রোহিণীর হাতে দিল। বলিল—"যদি কোনও ইংরেজবেশধারিণী বঙ্গমহিলাকে ভিতরে দেখেন, তবে এই কার্ড দেখিয়ে অনুগ্রহ করে তাঁকে ডেকে আনবেন।"

রোহিণী সুবোধের পানে চাহিয়া একটু মুচকি হাসি হাসিল। কার্ডখানি লইয়া, হেলিয়া দুলিয়া সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিল।

সুবোধ দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

পাঁচ মিনিট পরে রোহিণী কার্ডখানি হাতে করিয়া নামিয়া আসিয়া বলিল—"ভিতরে ইংরেজবেশধারিণী' আপনার কোনও মহিলা নেই। একজন আছেন তিনি আপনার আত্মীয়তা অস্বীকার করলেন।"

সুবোধ কোন কথা না বলিয়া ম্লানমুখে সে স্থান হইতে চলিয়া গেল।

রোহিণী তাহার সঙ্গীকে বলিল, "আজ ভাল বিপদে ফেলেছিলে ভাই। একটা গ্রীণ-শীলের লোভে প্রাণটা গিয়েছিল আর কি! খুঁজে খুঁজে ইংরেজবেশধারিণী মহিলার কাছে উপস্থিত হয়ে বল্লাম—'আপনার স্বামী বাইরে অপেক্ষা করছেন, আপনি শীঘ্র আসুন।' বলে কার্ড দেখালাম। মাগী কার্ডখানা ছুঁড়ে আমার গায়ে ফেলে দিলে। চটে লাল। আমাকে মারে আর কি!"

"তুমি কোন সাহসে বল্লে—'তোমার স্বামী বাইরে অপেক্ষা করছেন'? স্বামী কি অন্য কেউ কি করে জানলে?"

"নিশ্চয় স্বামী। দেখছ না, লোকটা মণিহারা ফণী হয়ে বেড়াচ্চে। স্বাধীনতাওয়ালা আলোকপ্রাপ্ত লোক। স্ত্রীটি হারিয়ে বসে আছেন। অমৃত বোসকে বলব এখন, ভারি একটা মজার নতুন প্রহসন হবে।"

সুবোধ অঙ্গনের বাহিরে গিয়া কিয়ংক্ষণ দাঁড়াইয়া ভাবিল। এমন বিপদে সে ইহ-জন্মে আর কখনও পড়ে নাই। এক একবার মনে হইতে লাগিল—এ সকল কি সত্য, না স্বপ্ন দেখিতেছি। যদি ইহা স্বপ্ন হইয়া যায়, যদি ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া দেখি যে এ সব কিছু নহে, সুনীতি আমার পার্শ্বে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছে, তাহা হইলে কি সুখ, কি আনন্দ হয়!—সুবোধের দুইটি চক্ষু জলপূর্ণ হইল। মনে মনে বলিল—সুনীতি, কোথায় তুমি, কি অবস্থায় রহিয়াছ, কোন দস্যুহস্তে, কি মহাবিপদে তুমি পতিত হইয়াছ, আমি ত কিছুই জানিতে পারিতেছি না—হাওড়া ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে সুনীতির সেই লজ্জারক্তিম মুখখানি কেবলই সুবোধের মনে পড়িতে লাগিল। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, হায় হায় আমিই তোমার সর্ব্বনাশ করিলাম!

কিন্তু এমন ভাবে কালক্ষেপ করিয়া কি ফল হইবে! সুবোধ মনে করিল, আর একবার হাওড়ায় গিয়া অনুসন্ধান করি, যদি সে গাড়ীখানা এতক্ষণ ফিরিয়া আসিয়া থাকে। যে গাড়ী সুবোধ হাওড়া হইতে ভাড়া করিয়া আসিয়াছিল, তাহা এতক্ষণ অপেক্ষা করিতেছিল। সুবোধ তাহাতে আরোহণ করিয়া হাওড়ায় যাইতে কহিল।

ষ্টেশনে পৌঁছিয়া সুবোধ দেখিল, অঙ্গন বহু শকটে পরিপূর্ণ। পঞ্জাব ডাকগাড়ী

ছাড়িবার সময় উপস্থিত। হতবুদ্ধির মত সকল গাড়ীগুলির কাছে এক একবার দাঁড়াইল, কেমন করিয়া সে গাড়ী চিনিয়া বাহির করিবে।

ডাকগাড়ী ছাড়িয়া গেল। সুবোধ একটা মৎলব স্থির করিয়াছে। ষ্টেশন মাষ্টারের কাছে গিয়া বলিল—"মহাশয়, আপনার সমস্ত কুলীকে যদি দয়া করিয়া একত্র করেন, তবে অত্যন্ত উপকৃত হই। বৈকালের ট্রেণে যে ব্যক্তি আমার তোরঙ্গ নামাইয়াছিল, তাহাকে আমার বিশেষ প্রয়োজন।"

ষ্টেশন মাষ্টার গম্ভীরমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিলেন—"মহাশয়, জি-আর-পুলিসকে আবেদন করুন।"

চলিল সুবোধ রেলওয়ে পুলিসের দারোগার সন্ধানে। দারোগা সাহেব মুসলমান, চারপাই পাতিয়া নিদ্রার আয়োজন করিতেছিলেন। তাঁহার সমীপে সুবোধ উপস্থিত হইয়া আপনার "আবেদন" জানাইল।

প্রথমে ত দারোগা সাহেব কথা কাণেই তোলেন না। অবস্থা বুঝিয়া, প্রাণের দায়ে, সুবোধ তাঁহাকে কিঞ্চিৎ দক্ষিণান্ত করিল।

তখন দারোগা সাহেব সতেজে উঠিয়া বসিলেন। রাইটার কনেষ্টবলকে হুকুম দিলেন —"বোলাও সব শালা কুলী লোগকো।"

পুলিসের হাঁকডাকে ষ্টেশন প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। দলে দলে বহু কুলী আসিয়া সুবোধের সম্মুখে দাঁড়াইল। ক্রমে যে ব্যক্তি সুবোধের তোরঙ্গ নামাইয়াছিল, সে উপস্থিত হইল। সুবোধ তাহাকে চিনিল। জিজ্ঞাসা করিল—"বিকালের ট্রেণে নামিয়া, যে গাড়ী আমি ভাড়া করিয়াছিলাম, সে গাড়ীর গাড়োয়ানকে তুমি চেন কি?"

সে ব্যক্তি বলিল—"চিনি বইকি হুজুর, তার নাম রহিমবক্স।"

"রহিমবক্সের আড্ডা কোথায় জান?"

"যোড়াসাঁকো।"

"সেখানে আমাকে লইয়া যাইতে পার? ভাল করিয়া বখ্‌শিশ দিব।"

বখ্‌শিশের নাম শুনিয়া কুলিপুঙ্গব অত্যন্ত উল্লসিত হইয়া বলিল—"চলুন না হুজুর। এখনই যাইতেছি।"

কুলী সুবোধের সঙ্গে চলিল। পুলিসের সেই রাইটার কনেষ্টবল অর্থাৎ "মুন্সীজি" সুবোধের সম্মুখে দাঁড়াইয়া, তাহার মুখের পানে সহাস্য কটাক্ষপাত করিয়া বলিল—"বাবু-সাহেব।"

সুবোধ বলিল—"বখ্‌শিশ?"

সে ব্যক্তি গর্ব্বিত ভাবে বলিল—"বাবুজি, আমি চাপরাশি না দারোয়ান যে বখ্‌শিশ দিবেন? তবে পাণ খাইবার জন্য যদি কিছু দেন ত আলবৎ লইতে পারি।"

সুবোধ মনে মনে বলিল—"বাধিত করিতে পার।" সুবোধের মন তখন অত্যন্ত উদ্‌ভ্রান্ত। টাকার প্রতি মায়া মমতা সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হইয়াছিল। ঠন্ করিয়া একটা টাকা ফেলিয়া দিল।

টাকাটা কুড়াইয়া লইয়া মুন্সী বলিল—"বন্দিগি বাবু সাহেব।"

কুলীকে সঙ্গে লইয়া গাড়ী করিয়া সুবোধ যোড়াসাঁকোর এক অন্ধকার গলিতে উপস্থিত হইল। পথে বরাবর শঙ্কা করিতে করিতে আসিয়াছিল, হয়ত গাড়োয়ানের দেখা পাওয়া যাইবে না। কিন্তু সে আশঙ্কা অমূলক হইল। গাড়ী আছে। গাড়োয়ান পার্শ্বে খাটিয়ায় শুইয়া ঘুমাইতেছে।

কুলী তাহাকে জাগাইল—"রহিম—ও রহিম—ওঠ্ ওঠ্।" রহিম ঘুমের ঘোরে বলিল —"আজ আর আমি ভাড়া যাব না। আজ দাঁও মেরে নিয়েছি।"

শুনিয়া সুবোধের মনটা ছনাৎ করিয়া উঠিল। ভাবিল কি অমঙ্গলের কথাই শুনিব না জানি!

কুলী তাহাকে আশ্বাস দিল—"ওঠ্ ভাড়া যেতে হবে না। শীঘ্র ওঠ্।"

রহিম কোন মতে উঠিল। মুখে ভয়ানক মদের গন্ধ। বিড়্ বিড়্ করিয়া কি বকিতে লাগিল কিছুই বোঝা গেল না। বকিতে বকিতে আবার ধপাস্ করিয়া খাটিয়ায় বসিয়া পড়িল।

কুলী তখন গাড়ীর জ্বলন্ত লণ্ঠনটা খুলিয়া আনিয়া সুবোধের মুখে আলোক ধরিল। জিজ্ঞাসা করিল—"এ'কে চিনতে পারিস ?"

সুবোধকে দেখিবামাত্র গাড়োয়ান উঠিয়া দাঁড়াইল। হাত দুইটি যোড় করিয়া অত্যন্ত করুণস্বরে বলিল—"হুজুর, আপনার মেমসাহেব আজ আমাকে দশ টাকা বখ্শিশ দিয়েছেন।"

সুবোধ যেন হাতে স্বর্গ পাইল। জিজ্ঞাসা করিল—"আমার মেমসাহেবকে কোথায় রেখে এসেছিস ?"

গাড়োয়ানের মাথার ঠিক ছিল না। একে মদ্যের প্রভাব, তাহার উপর একদমে দশ টাকা লাভ করিয়াছে! কিয়ৎক্ষণ ভাবিল। ভাবিয়া, পূর্ব্ববৎ করুণস্বরে বলিল—"হুজুর, ভবানীপুর।"

"কোন স্থান ?"

"ছক্করবেড়িয়া।"

সুবোধের দেহে প্রাণ আসিল। ভবানীপুর চক্রবেড়িয়ায় সুবোধের ভায়রাভাই অবিনাশ-চন্দ্রের বাড়ী। সুনীতি নিশ্চয়ই সেখানে গিয়াছে। আর কোনও ভাবনা নাই। তবু সুবোধ জিজ্ঞাসা করিল—"কত নম্বর ?"

"নম্বর ত মনে নাই হুজুর।" বারম্বার এই কথা বলিতে বলিতে লোকটা হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

তাহার কান্না দেখিয়া সুবোধ অত্যন্ত বিস্মিত হইল। কুলীকে জিজ্ঞাসা করিল—"এ কাঁদে কেন ?"

কুলী জিজ্ঞাসা করিল—"রহিম! কাঁদিস্ কেন রে? ভয় কি তোর ?"

রহিম কাঁদিতে কাঁদিতে উত্তর করিল—"ভয় আবার কি ? বেশী দারু পিলেই আমার কান্না পায়। মনে হয় যেন আমার বিবি মরে গেছে।"

শুনিয়া সুবোধ মনে মনে হাসিল। 'বিবি'র বিরহে মানুষের অন্তরে যে কি ভাব উপস্থিত হয়, তাহা সে এতক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিল।

সুবোধ পকেট হইতে একখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া দিয়া বলিল—"তোমরা দুজনে এই পাঁচ পাঁচ টাকা বখশিশ নাও।"

পর মুহূর্ত্তেই সুবোধের গাড়ী ভবানীপুর অভিমুখে ধাবিত হইল। রাত্রি তখন এগারোটা। শীতল নৈশ বায়ু তাহার ললাটের ঘর্ম্ম অপনোদন করিয়া দিল। সুবোধ মনে এক প্রকার অভূতপূর্ব্ব লঘুতা অনুভব করিল। বারম্বার অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিল —"এ কি মুক্তি, এ কি পরিত্রাণ! কি আনন্দ হৃদয় মাঝারে!"

চক্রবেড়িয়া রোডে অবিনাশচন্দ্রের বাড়ীর সম্মুখে সুবোধের গাড়ী দাঁড়াইল। তাড়াতাড়ি গাড়োয়ানকে বিদায় করিয়া, মুক্ত দুয়ারে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল। একেবারে অবিনাশচন্দ্রের শয়নকক্ষে গিয়া উপস্থিত। কেরোসিনের ল্যাম্প মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছে। অবিনাশচন্দ্র বিছানায় আড় হইয়া শুইয়া। তাঁহাকে দেখিবামাত্র সুবোধ রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিল—"সুনীতি ?"

অবিনাশচন্দ্র হাই তুলিয়া বলিলেন—"সুনীতি কি ?"

"সুনীতি এসেছে ?"

অবিনাশচন্দ্র আবার হাই তুলিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—"কোথা থেকে নেশা করে এলে? বিভুল বকছ যে হে!"

সুবোধ হতাশ হইয়া নিকটস্থ চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

এই সময় তাহার শ্যালিকা সুমতি প্রবেশ করিলেন। সুবোধকে দেখিয়া হা হা করিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি গো সাহেব! চন্দ্রশেখর অভিনয়টা কেমন দেখলে?"

অবিনাশচন্দ্র স্ত্রীকে ভর্ৎসনা করিলেন—"আচ্ছা পাগল। পেটে এক মিনিট কথা থাকে না? আমি ভায়াকে একটু চান্‌কে নিচ্ছিলুম।"

সুবোধ বলিল—"খুব লোক যা হোক্! এ সব বিষয় নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করে!"

মহা হাসি পড়িয়া গেল। সুমতি ও অবিনাশচন্দ্র উভয়ে মিলিয়া সুনীতির দুর্গতির ইতিহাসটা বিবৃত করিলেন। সুবোধ কুলীর সঙ্গে ষ্টেশন মাষ্টারের সন্ধানে প্রস্থান করিলেই গাড়োয়ান গাড়ী হাঁকাইয়া একেবারে ষ্টার থিয়েটারে হাজির। গাড়ীও ছুটিল, সুনীতিও কান্না আরম্ভ করিয়া দিল। থিয়েটারের সম্মুখে গাড়ী দাঁড় করাইয়া গাড়োয়ান আসিয়া গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিল। গাড়োয়ানকে দেখিবামাত্র সাহসে ভর করিয়া সুনীতি বলিল—"চল্ আবার ষ্টেশনে চল্। আমার স্বামীকে ফেলিয়া আসিলি কেন?" গাড়োয়ান আবার হাওড়া ষ্টেশনে যায়। অনেক খুঁজিয়া সুবোধকে পাইল না। তখন কি ভাগ্যিস সুনীতির বুদ্ধি যোগাইল! এখানকার ঠিকানা বলিয়া দিল। দশ টাকা বখ্‌শিশ কবুল করিল। আমরা ত মেমসাহেবকে দেখিয়া চিনিতেই পারি না। শেষকালে সুমতি উপসংহার করিলেন—"আহা মরি কিবে ছিরিই বেরিয়েছিল! সে বেশ আর সে অবস্থা দেখে হাসব কি কাঁদব ভেবে ঠিক করতে পারিনি। যদি থিয়েটারে বক্সে নিয়ে যাবারই সাধ, তবে অমন কিম্ভূতকিমাকার না সাজিয়ে, পুজোর সময় সখ করে যে নতুন পোষাক তৈরী করিয়েছ তাই পরালেই ত হত। সেও শাড়ী হোক, কিন্তু এ কালের ছাঁদের, কত সুন্দর! যে সব মেয়েরা বাইরে বেরোন তাঁরা ত ঐ পরে বেরোন, তাঁরা ত আর গাউন পরতে যান না। এ বুদ্ধিটুকু তোমার ঘটে কেন জোটেনি?"

সুবোধ মহা অপ্রতিভ হইয়া ভাবিল—"তাই ত!"

বৃত্তান্ত শেষ হইলে সুমতি সুবোধকে ডাকিল—"এখন এস সাহেব মশাই! তোমার বিবির সঙ্গে দেখা করবে এস। সে ত এসে অবধি জল-গেলাসটি অবধি খায়নি, কেঁদে কেঁদে মরছে। এই এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়ল। তাকে ওঠাইগে চল। তোমার অবস্থাটা কি হয়েছিল বলবে এস।"

[শ্রাবণ, ১৩০৬]

দেবী

সে আজ কিঞ্চিদর্ধিক একশত বৎসরের কথা।

পৌষ মাসের দীর্ঘরজনী আর কিছুতেই পোহাইতে চাহে না। উমাপ্রসাদের নিদ্রাভঙ্গ হইল। লেপের ভিতর অনুসন্ধান করিল, স্ত্রী নাই। বিছানা হাতড়াইয়া দেখিল তাহার ষোড়শী পত্নী এক পাশে গুটিসুটি হইয়া পড়িয়া ঘুমাইতেছে। সরিয়া গিয়া অতি সন্তর্পণে তাহার গায়ে লেপখানা চাপাইয়া দিল। পাশে পায়ের দিকে হাত দিয়া দেখিল কোথাও ফাঁক রহিতেছে কি না।

উমাপ্রসাদ বিংশতিবর্ষীয় যুবক। সম্প্রতি সংস্কৃত ছাড়িয়া সখ করিয়া পারস্যভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। মা নাই;—পিতা পরম পণ্ডিত, পরম ধার্ম্মিক নিষ্ঠাবান শক্তি-উপাসক, গ্রামের জমিদার, সম্মানের সীমা নাই। অনেকের বিশ্বাস উমাপ্রসাদের পিতা কালীকিঙ্কর রায় মহাশয় একজন প্রকৃত সিদ্ধ পুরুষ, আদ্যাশক্তির বিশেষ অনুগৃহীত। গ্রামের আবালবৃদ্ধ তাঁহাকে দেবতার মত শ্রদ্ধা করে।

উমাপ্রসাদ আপনার নবীন জীবনে সম্প্রতি নবপ্রণয়ের মাদকতা অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছে। পাঁচ ছয় বৎসর পূর্ব্বে তাহার বিবাহ হইয়াছে বটে, কিন্তু পত্নীর সহিত ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত এই নূতন। স্ত্রীর নাম দয়াময়ী।

স্ত্রীর গাত্র আবৃত করিয়া উমাপ্রসাদ তাহার গণ্ডস্থলে একখানি হাত রাখিল—দেখিল সে স্থান শীতে শীতল হইয়া গিয়াছে। অত্যন্ত ধীরে ধীরে পত্নীর মুখচুম্বন করিল।

যেরূপ নিয়মিত তালে দয়াময়ীর নিঃশ্বাস বহিতেছিল, সহসা তাহার ব্যতিক্রম হইল। উমা জানিল স্ত্রী জাগিয়াছে। মৃদুস্বরে ডাকিল—"দয়া।"

দয়া বলিল—"কি"। "কি"টা খুব দীর্ঘ করিয়া বলিল।

"তুমি বুঝি জেগে রয়েছ ?"

দয়া ঢোক গিলিয়া বলিল—"না ঘুমুচ্ছিলাম।"

উমাপ্রসাদ আদর করিয়া স্ত্রীকে বুকের কাছে টানিয়া আনিল। বলিল—"ঘুমুচ্ছিলে ত উত্তর দিলে কে ?"

দয়া তখন আপনার ভুল বুঝিতে পারিয়া অপ্রতিভ হইল। বলিল—"আগে ঘুমুচ্ছিলাম, এখন জেগে উঠলাম।"

উমাপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করিল—"এখন কখন ? ঠিক কোন্ সময় ?"—উমা ভারি দুষ্ট।

"কোন সময় আবার ?—সেই তখন !"

"কখন ?"

"যাও আমি জানিনে।"—বলিয়া দয়া স্বামীর বাহুপাশ হইতে মুক্ত হইবার বৃথা চেষ্টা করিল।

ঠিক কখন জাগিয়াছে, দয়াও কিছুতে বলিবে না, তাহার স্বামীও কিছুতে ছাড়িবে না। কিয়ৎক্ষণ মান অভিমানের পর দয়ার পরাজয় হইল। উত্তর দিল "সেই যখন তুমি" —বলিয়া থামিল। "আমি কি করলাম ?"

দয়া খুব তাড়াতাড়ি করিয়া বলিল—"সেই যখন তুমি আমায় চুমু খেলে,—হল ! মাগো মা ! এত জান !"

তখনও এক প্রহরের অধিক রাত্রি আছে। দুজনে কত কথা আরম্ভ হইল। অধিকাংশ কথারই না আছে মাথা না আছে মুণ্ড। হায়, শত বৎসর পূর্ব্বে আমাদের প্রপিতামহগণের তরুণবয়স্ক পিতামাতাগণ, অসার অপদার্থ আমাদেরই মত 'এমনি চঞ্চল মতি গতি' ছিলেন। অত বড় শাক্ত পরিবারের সন্তান হইয়াও উমাপ্রসাদ সে পর্য্যন্ত একদিনও স্ত্রীর নিকট মুদ্রাপ্রকরণ বা মাতৃকান্যাসের কোনও প্রসঙ্গ উত্থাপন করে নাই এবং ধর্মনিয়মাদি সম্বন্ধে তাহাকে সম্পূর্ণ অজ্ঞ রাখিয়াছিল।

নানা কথার পর উমাপ্রসাদ বলিল—"দেখ, আমি পশ্চিমে চাকরি করতে বেরুব।"

দয়া বলিল—"তোমার আবার চাকরি করা কেন ? তোমার কিসের দুঃখ ? জমিদারের ছেলে হয়ে কেউ চাকরি করে নাকি ?"

"আমার এখানে দুঃখ আছে বইকি।"

"কি ?"

"তুমি যদি আমার দুঃখ বুঝবে তা হলে আর আমার দুঃখ কিসের !"

শুনিয়া দয়া ভারি অপ্রস্তুত হইয়া গেল। ভাবিতে লাগিল, কি দুঃখ ?—ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিল না। একটু দুষ্টামি বুদ্ধি আসিল। বলিল "তোমার কি দুঃখ ? আমি বুঝি মনের মত হইনি ?" দয়া জানিত এ কথা বলিলে উমাপ্রসাদকে আঘাত করা হইবে।

উমাপ্রসাদ প্রিয়ামুখে অজস্র চুম্বনবর্ষণ করিয়া এই আঘাতের প্রতিশোধ লইল। পরে বলিল—

"আমার দুঃখ তোমাকে নিয়েই বটে। সমস্ত দিন আমি তোমায় পাইনে। শুধু রাত্তিরটি পেয়ে সাধ মেটে না। বিদেশে চাকরি করতে যাব, সেখানে তোমায় নিয়ে যাব কেমন দুজনে একলা থাকব, সারাদিন সারারাত !"

"চাকরি করবে ত সারাদিন আমাকে নিয়ে থাকবে কেমন করে ? আমাকে ত একলা

ফেলে তুমি কাছারি চলে যাবে।"

"কাছারি গিয়ে খুব শিগগির শিগগির ফিরে আসব।"

দয়া ভাবিয়া দেখিল, তা হইতে পারে বটে। কিন্তু বাধা বিপত্তি যে অনেক!

"তুমি ত নিয়ে যাবে, সবাই যেতে দেবে কেন?"

"এখান থেকে কি নিয়ে যাব? যখন শুনব তুমি বাপের বাড়ী রয়েছ তখন চুপি চুপি এসে তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে যাব।"

শুনিয়া দয়া হাসিল। এও কি সম্ভব নাকি?

"কতদিন আমরা থাকব সেখানে?" "অনেক বচ্ছর থাকব।"

দয়া মুচকি মুচকি হাসিতেছিল, সহসা একটা কথা তার মনে পড়িয়া গেল। বলিল —"খোকাকে ফেলে কি অনেক বচ্ছর আমি বিদেশে থাকতে পারব?"

উমাপ্রসাদ স্ত্রীর গালে গাল রাখিয়া কাণের কাছে বলিল—"ততদিন তোমারও একটি খোকা হবে।" কথাটি শুনিয়া দয়ার ওষ্ঠপ্রান্ত হইতে কর্ণমূল পর্যন্ত লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল। কিন্তু অন্ধকারে তাহা কেহ দেখিতে পাইল না।

উল্লিখিত খোকাটি উমাপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ সহোদর তারাপ্রসাদের একমাত্র সন্তান। স্বয়ং উমাপ্রসাদ এ বাটীর শেষ খোকা। এই পরিবারে খোকা-রাজার সিংহাসন বহুকাল শূন্য ছিল, তাই খোকার বড় আদর; খোকা বাড়ীসুদ্ধ সকলের চক্ষে মণি। খোকার মা হরসুন্দরী,—তাঁর ত আর গরবে মাটিতে পা পড়ে না।

দয়া সহসা বলিল—"আজ এখনো খোকা এল না কেন?"—ভোর রাত্রে রোজ খোকা কাকীমার কাছে আসে। এটি তার নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য। যদিও বাটীতে দাসদাসীর অভাব নাই, তথাপি গৃহকার্য্যের অধিকাংশ দয়া স্বহস্তে করিত। বিশেষতঃ তাহার শ্বশুরের পূজাহ্নিক সম্পর্কীয় যাহা কিছু কার্য্য তাহাতে দয়া ছাড়া অপর কাহারও হস্ত-স্পর্শ করিবার অধিকার ছিল না। সারাদিন এই সমস্ত কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়াও খোকাকে সে একমুহূর্ত্তও চক্ষের আড়াল করিত না। কাকীমা গা মুছাইয়া না দিলে খোকা গা মুছে না, কাকীমা কাজল না পরাইয়া দিলে খোকা কাজল পরে না, কাকীমার কোলে ভিন্ন অন্য কোথাও শুইয়া খোকা দুধ খায় না। খোকার বিছানায় তার কাকীমা অনেক রাত্রি অবধি থাকিয়া ঘুম পাড়াইয়া আসে,—ভোর রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিলেই খোকা কাকীমা বলিয়া কান্না যুড়িয়া দেয়। এই প্রগলভতা, এই অন্যায় আবদারের জন্য মধ্যে মধ্যে তাহাকে হরসুন্দরীর নিকট হইতে চড়টা চাপড়টা পুরস্কার পাইতে হয়। কিন্তু বলাই বাহুল্য তাহাতে কান্না না থামিয়া আরও দশগুণ বাড়িয়া উঠে। তখন হরসুন্দরী তাহাকে কোলে করিয়া, ক্রোধে ও নিদ্রাঘোরে টলিতে টলিতে দয়ার শয়নকক্ষের দ্বারে আসিয়া ডাকেন—"ছোট বউ ও ছোট বউ, এই নে তোর খোকাকে।" বলিয়া, দয়ার দুয়ার খুলিবার অপেক্ষা না রাখিয়াই, খোকাকে মাটিতে বসাইয়া প্রস্থান করেন। দয়া প্রায়ই জাগিয়া থাকে, না থাকিলেও খোকার ক্রন্দনে শীঘ্রই জাগিয়া উঠে, ছুটিয়া আসিয়া খোকাকে বুকে করিয়া লইয়া যায়, "কে মেরেছে, কে মেরেছে" বলিয়া কত সোহাগ করে। মাথার শিয়রে পাণের ডিবায় কোনও দিন কদমা, কোনও দিন বাতাসা, কোনও দিন নারিকেল নাড়ু সঞ্চিত থাকে, তাই খোকা ভক্ষণ করে, তাহার পর নিশ্চিন্ত হইয়া কাকীমার কোলে শুইয়া ঘুমাইয়া যায়। আজ এখনও খোকা আসিল না বলিয়া দয়া কিছু উৎকণ্ঠিত হইল। বলিল— "বাছার অসুখ বিসুখ করেনি ত?"

উমাপ্রসাদ বলিল—"বোধ হয় এখনও রাত্রি আছে। দেখি দাঁড়াও।"

উমাপ্রসাদ বিছানা হইতে উঠিয়া জানালা খুলিল। বাহিরে আম ও নারিকেল বৃক্ষ-বহুল বাগান। তখনও চন্দ্রাস্ত হয় নাই,—কিন্তু অধিক বিলম্বও নাই। দয়া নিঃশব্দে আসিয়া স্বামীর পার্শ্বে দাঁড়াইল। বলিল—"রাত আর বেশী কই?"

শীতের হিমবায়ু হু হু করিয়া জানালা-পথে প্রবেশ করিতে লাগিল। তবু দুজনে

সেই অল্পালোকে পরস্পরের পানে চাহিয়া কতক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। অনেকক্ষণ তাহাদের চক্ষু যে উপবাসী ছিল!

দয়া বলিল—"দেখ, আজ আমার মনটা কেমন হয়ে গেছে। খোকা এখনও এল না। কি জানি কেন মনটা এমন হয়ে গেল।"

উমাপ্রসাদ বলিল—"এখনও খোকার আসবার সময় হয়নি। যে দিন ঘুমিয়ে পড়ে সে দিন ত আসতে দেরীও হয়। তোমার মন সেজন্যে খারাপ হয়নি। কেন হয়েছে আমি জানি।"

"কেন বল দেখি?"

"বলেছি কি না আমি পশ্চিমে যাব চাকরি করতে, তাই তোমার মন খারাপ হয়ে গেছে।"—বলিয়া উমাপ্রসাদ স্ত্রীকে নিজের আরও কাছে টানিয়া লইল।

দয়া একটি ছোট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"আমি বুঝতে পারছিনে। মনে হচ্ছে যেন আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে না।"

বাহিরে জ্যোৎস্না নিরতিশয় ম্লান। পত্নীর কথা শুনিয়া উমাপ্রসাদের মুখখানিও ম্লান হইয়া গেল।

অনেকক্ষণ দুইজনে দাঁড়াইয়া রহিল। চাঁদ ডুবিয়া গেল। গাছপালা অন্ধকারে গাঢাকা দিল। জানালা বন্ধ করিয়া উভয়ে শয্যায় ফিরিয়া আসিল।

ক্রমে একটা আধটা পাখীর ডাক শোনা গেল। পরস্পরের বক্ষোনিবদ্ধ হইয়া তাহারা ঘুমাইয়া পড়িল।

ক্রমে জানালার রন্ধ্রপথে প্রভাতের আলোকরশ্মি প্রবেশ করিতে লাগিল। তখনও দুই-জনে নিদ্রাভিভূত।

সহসা বাহির হইতে উমাপ্রসাদের পিতা ডাকিলেন,—"উমা"।

প্রথমে ঘুম ভাঙ্গিল দয়ার। সে গা ঠেলিয়া স্বামীকে জাগাইয়া দিল।

কালীকিঙ্কর আবার ডাকিলেন,—"উমা"। স্বরটা কম্পিত, যেন অন্যরূপ ইহা যে তাঁহারই কণ্ঠস্বর তাহা যেন কষ্টে বুঝা গেল।

এত ভোরে পিতা ত কখনও ডাকেন না। আর তাঁহার স্বরই বা এমন হইল কেন?—তবে সত্য সত্যই খোকার কিছু অসুখ বিসুখ করিয়াছে বুঝি! উমাপ্রসাদ তাড়াতাড়ি উঠিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল।

দেখিল পিতার পরিধানে রক্তবর্ণ কোঁশেয় বস্ত্র, স্কন্ধে নামাবলী উত্তরীয়, গলে রুদ্রাক্ষ-মাল্য লম্বমান। এ কি! এত ভোরে তাঁহার পূজার বেশ কেন? অন্য দিন গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়া তবে তিনি পূজার বেশ পরিধান করেন। মুহূর্ত্তকালের মধ্যে এই চিন্তাপরম্পরা উমাপ্রসাদের মস্তকে উদিত হইল।

দ্বার খুলিবামাত্র কালীকিঙ্কর পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবা, ছোটবউমা কোথায়?"

স্বর পূর্ব্ববৎ কম্পিত। উমাপ্রসাদ কক্ষের চারিদিকে চাহিল। দয়া শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া, কিছুদূরে জড়সড় হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল।

কালীকিঙ্করও সেইদিকে নেত্রপাত করিলেন। বধূকে দেখিতে পাইবামাত্র, নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহার পদতলে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন।

উমাপ্রসাদ বিস্ময়ে বাক্যহীন। দয়াময়ী শ্বশুরের এই অদ্ভুত আচরণ দেখিয়া নিস্পন্দ-ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রণামান্তে কালীকিঙ্কর বলিলেন—"মা আমার জন্ম সার্থক হল। কিন্তু এতদিন কেন বলিসনি মা?"

উমাপ্রসাদ বলিল—"বাবা!"

কালীকিঙ্কর বলিলেন—"বাবা ইঁহাকে প্রণাম কর।"

উমাপ্রসাদ বলিল—"বাবা!—আপনি কি উন্মাদ হয়েছেন?"

"উন্মাদ হইনি বাবা! এতদিন উন্মাদ ছিলাম বটে। আজ আরোগ্যলাভ করেছি, সেও মার কৃপায়।"

উমাপ্রসাদ পিতার কথার কিছুই অর্থগ্রহণ করিতে পারিল না। বলিল—"বাবা! আপনি কি বলছেন?"

কালীকিঙ্কর বলিলেন—"বাবা! আমার বড় সৌভাগ্য। যে কুলে জন্মেছি তা পবিত্র হ'ল। বাল্যকালে কালীমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছি, এত দিন যে সাধনা, যে আরাধনা করলাম, তা নিষ্ফল হয়নি। মা জগন্ময়ী কৃপা করে ছোটবউমার মূর্ত্তিতে আমার গৃহে স্বয়ং অবতীর্ণা হয়েছেন। গত রজনীতে স্বপ্নযোগে আমি এই প্রত্যাদেশ পেয়েছি। আমার জীবন ধন্য হ'ল।"

দয়াময়ী ছিল মানবী—সহসা দেবীত্বে অভিষিক্ত হইল।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর তিন দিন অতিবাহিত হইয়াছে; এই দিবসত্রয়ে এ সংবাদ বহুদূরে ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে। আশে-পাশের বহু গ্রাম হইতে বহুজন আসিয়া প্রসিদ্ধ শাক্ত-জমিদার কালীকিঙ্কর রায়ের বাটীতে দয়াময়ী-রূপিণী আদ্যাশক্তিকে দর্শন করিয়া গিয়াছে।

দয়াময়ীর রীতিমত পূজা আরম্ভ হইয়াছে। ধূপ দীপ জ্বালিয়া, শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া, ষোড়শোপচারে তাঁহার পূজা হয়। এ কয়দিনে দয়াময়ীর সম্মুখে বহুসংখ্যক ছাগবলি হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু এ তিন দিন দেবতার পূজা পাইয়াও দয়াময়ী কেবল কাঁদিতেছে। আহার নিদ্রা এক প্রকার ত্যাগ করিয়াছে বলিলেই হয়। এই আকস্মিক অদ্ভুত ঘটনায় তাহাকে এমন অভিভূত বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছে যে, সে দুই দিন আগে এ বাটীর বধূ ছিল, শ্বশুর ও ভাসুরের সাক্ষাতে বাহির হইত না, এ সমস্তই বিস্মৃত হইয়াছে। এখন আর তাহার মুখে অবগুণ্ঠন নাই,—যাহার তাহার পানে শূন্য-দৃষ্টিতে পাগলিনীর মত চাহিয়া থাকে। তাহার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত মৃদুভাবাপন্ন হইয়াছে, রক্তবর্ণ চক্ষু দুইটি ফুলিয়াছে, বেশবাস সুসম্বৃত নহে।

রাত্রি দ্বিপ্রহর। পূজার ঘরে একটি কোণে ঘৃতদীপ মিটি মিটি করিয়া জ্বলিতেছে। পুরু কম্বলের বিছানায় রেশমী বস্ত্রের আবরণ, তাহার উপর দয়াময়ী শয়ন করিয়া আছে' গায়ে একখানি মোটা শাল। দুয়ার বন্ধ ছিল মাত্র, অর্গলিত ছিল না। অত্যন্ত ধীরে ধীরে সে দুয়ার খুলিতে লাগিল। চোরের মত সন্তর্পণে উমাপ্রসাদ প্রবেশ করিল। দুয়ার বন্ধ করিয়া খিল দিল।

উমাপ্রসাদ দয়াময়ীর বিছানায় আসিয়া বসিল। সে দিন উষাকালের ঘটনার পর স্ত্রীর সহিত এই তাহার প্রথম নিভৃত সাক্ষাৎ।

দয়াময়ী জাগিয়া ছিল, স্বামীকে দেখিয়া উঠিয়া বসিল।

উমাপ্রসাদ বলিল—"দয়া! একি হ'ল?"

আঃ—আজ তিন দিনের পর দয়া স্বামীর মুখে একটি স্নেহমাখা কথা শুনিল। এ-তিন দিন কাল ভক্তগণের 'মা মা' শব্দে তাহার হৃদয়দেশ মরুভূমির মত শুষ্ক হইয়া পড়িয়াছিল। স্বামীর মুখনিঃসৃত এই আদরের বাণী তাহার প্রাণে যেন অকস্মাৎ সুধাবৃষ্টি করিয়া দিল। দয়া স্বামীর বুকে মুখ লুকাইল।

উমাপ্রসাদ স্ত্রীর গায়ের শাল মোচন করিয়া তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিল। উচ্ছ্বসিত-স্বরে বারংবার বলিতে লাগিল—"দয়া! একি হ'ল—একি হ'ল?" দয়া নির্ব্বাক্।

উমাপ্রসাদও কিয়ৎক্ষণ নীরব রহিল। তারপরে বলিল—"দয়া! তোমার কি মনে হয় যে এ কথা সত্যি? তুমি আমার দয়া নও, তুমি দেবী?"

এইবার দয়া কথা কহিল,—বলিল—"না, আমি তোমার স্ত্রী ছাড়া আর কিছু নই, আমি তোমার দয়া ছাড়া আর কিছু নই,—আমি দেবী নই—আমি কালী নই।"

এই কথা শুনিয়া উমাপ্রসাদ সাগ্রহে স্ত্রীর মুখচুম্বন করিল। বলিল—"দয়া! তবে চল, আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাই। এমন কোনও দূরদেশে গিয়ে থাকব, যেখানে কেউ আর আমাদের সন্ধান পাবে না।"

দয়া বলিল—"তাই চল। কিন্তু কি উপায়ে যাবে?"

উমাপ্রসাদ বলিল—"সে সমস্ত আমি ঠিক করব, কিছু সময় যাবে।"

দয়া বলিল—"কবে? কবে? শীগ্‌গির ঠিক কর—নইলে বেশী দিন আমি বাঁচব না। আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছে। যদি মৃত্যুও না হয়, তবে আমি পাগল হয়ে যাব।"

উমাপ্রসাদ বলিল—"না দয়া!—তুমি কিছু ভেবো না। দিন সাত তুমি ধৈর্য্য ধরে থাক। আজ শনিবার। আগামী শনিবার রাত্রে তোমার কাছে আসব আবার—তোমাকে নিয়ে গৃহত্যাগ করব। এই সাত দিন তুমি আশায় বুক বেঁধে কাটিয়ে দাও, লক্ষ্মী আমার, সোণা আমার।" দয়া বলিল—"আচ্ছা।"

উমাপ্রসাদ বলিল—"এখন তবে যাই, কেউ আবার এসে না পড়ে"—বলিয়া সে পত্নীকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বিদায় লইল।

পরদিন প্রভাতে দয়াময়ীর পূজো যখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, তখন গ্রামের একজন অশীতিবর্ষ-বয়স্ক বৃদ্ধ লাঠিতে ভর করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার কোটরান্তর্গত চক্ষু দিয়া দর দর ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হইতেছে। আসিয়াই দয়াময়ীকে দেখিয়া গলবস্ত্র হইয়া তাহার সম্মুখে জানু পাতিয়া যুক্তকরে বলিতে লাগিলেন—"মা! আমি চিরকাল তোমায় পূজো করে এসেছি। আজ আমার বড় বিপদ মা! আজ ভক্তকে রক্ষা কর।"

দয়াময়ী বৃদ্ধের পানে ফ্যাল ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। পুরোহিত বলিলেন—"কেন দাদা! তোমার কি বিপদ হয়েছে?"

বৃদ্ধ বলিলেন—"আমার নাতিটি কয়দিন জ্বরবিকারে ভুগছিল। আজ সকালে কবরেজ জবাব দিয়ে গেছে। সে না বাঁচলে আমার বংশলোপ হবে আমার ভিটেয় সন্ধ্যে দেবার আর কেউ থাকবে না। তাই মার কাছে তার প্রাণভিক্ষা চাইতে এসেছি।"

কালীকিঙ্কর চণ্ডীপাঠ করিতেছিলেন, তিনি বৃদ্ধের দুঃখে নিরতিশয় দুঃখিত হইয়া দয়াময়ীর মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন—"মা গো! বুড়োর নাতিটিকে বাঁচিয়ে দিতে হবে মা"—বলিয়া তিনি বৃদ্ধকে বলিলেন—"দাদা! তোমার নাতিকে এনে মার পায়ের কাছে ফেলে রাখ, যমের বাবার সাধ্য হবে না এখান থেকে নিয়ে যেতে।"

এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধ মহা আশ্বস্ত হইলেন। যষ্টিতে ভর দিয়া গৃহাভিমুখে ছুটিলেন।

একদণ্ডকাল পরে বিধবা পুত্রবধূর কোলে নাতিটির সহিত বৃদ্ধ ফিরিয়া আসিলেন। দয়াময়ীর পদতলে বিছানা করিয়া মৃতকল্প শিশুটিকে রাখা হইল। কেবল মাঝে মাঝে চরণামৃতের পাত্র হইতে কুশি করিয়া একটু একটু চরণামৃত লইয়া পুরোহিত তাহার মুখে দিতে লাগিলেন।

শিশুর মাতা বিধবা যুবতী, দয়াময়ীর সখী। তাহার ব্যথাকাতর মুখ দেখিয়া দয়াময়ীর হৃদয় ব্যথিত হইল। শিশুটির পানে চাহিয়া দয়াময়ীর চক্ষে অশ্রু ভরিল। একান্ত মনে দেবতাকে প্রার্থনা করিতে লাগিল, "হে ঠাকুর, আমি দেবতা হই, কালী হই, মানুষ হই, যেই হই—এই ছেলেটিকে বাঁচিয়ে দাও ঠাকুর।"

দয়াময়ীর চক্ষে অশ্রু দেখিয়া সকলে বলিয়া উঠিল—"জয় মা কালী, জয় মা দয়াময়ী, মায়ের দয়া হয়েছে—মায়ের চোখে জল।" কালীকিঙ্কর দ্বিগুণ ভক্তির সহিত চণ্ডীপাঠ করিতে লাগিলেন। বেলা যত বাড়িতে লাগিল, শিশুটির অবস্থা উত্তরোত্তর ততই ভাল হইতে লাগিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে সকলে মত প্রকাশ করিলেন, আর শিশুর জীবনের কোনও আশঙ্কা নাই, স্বচ্ছন্দে বাড়ী পাঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

দয়াময়ীর দেবীত্ব আবিষ্কারের সংবাদ যত না শীঘ্র চৌদিকে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, তাহার কৃপায় মুমূর্ষ শিশুর প্রাণরক্ষার সংবাদ অতি সত্বর প্রচারিত হইয়া পড়িল। পর দিন প্রাতেই অপর একজন আসিয়া দয়াময়ীর চরণে নিবেদন জানাইল যে, তাহার কন্যাটি আজ

তিন দিন হইতে প্রসব যন্ত্রণায় অস্থির,—মেয়ে বুঝি বাঁচে না। কালীকিঙ্কর বলিলেন—"তার জন্যে আর চিন্তা কি? মার চরণামৃত নিয়ে গিয়ে মেয়েকে পান করিয়ে দাওগে। এখনি আরাম হবে।"

সে ব্যক্তি গলদশ্রুলোচনে দয়াময়ীর চরণামৃতের পাত্রটি মাথায় বহন করিয়া লইয়া গেল। বেলা এক প্রহর অতীত হইবার পূর্ব্বেই সংবাদ আসিল, মেয়েটি চরণামৃত পান করিবার অব্যবহিত পরেই নিরাপদে রাজপুত্রের মত সুন্দর সুলক্ষণসম্পন্ন পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছে।

আজ শনিবার। আজ উমাপ্রসাদ স্ত্রীকে লইয়া গোপনে পলায়ন করিবে। সে সমস্ত আয়োজন করিয়াছে। অর্থ সংগ্রহ করিয়াছে। মুর্শিদাবাদ কিম্বা রাজমহল কিম্বা বর্দ্ধমান এরূপ কোনও নিকটবর্ত্তী প্রসিদ্ধ স্থানে সে যাইবে না;—যাইলে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা। নৌকাপথে পশ্চিম যাইবে। অনেক দূর যাইবে;—কোথায় এখনও তাহার কিছু স্থিরতা নাই। হয় ভাগলপুর, নয় মুঙ্গের। সেখানে চাকরির চেষ্টা করিবে। পথ-খরচের মত অর্থ তাহার নিকট আছে। তাহার স্ত্রীর গায়ে যাহা অলংকার আছে, তাহা বিক্রয় করিলে কোন্ না দুই বৎসর উভয়ের গ্রাসাচ্ছাদন চলিতে পারিবে? দুই বৎসরেও কি তাহার একটা চাকরি জুটিবে না? নিশ্চয় জুটিবে। চেষ্টার অসাধ্য কিছু আছে নাকি?

এইরূপ নানা চিন্তায় উমাপ্রসাদ দিবাভাগ অতিবাহিত করিল। ক্রমে সন্ধ্যা হইল। আজ সে দয়াময়ীর আরতি দেখিবে। একদিনও ত দেখে নাই। যখন শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনিতে চণ্ডীমণ্ডপ ফাটিয়া যায়, পূজা আরম্ভ হয়, তখন উমাপ্রসাদ বাড়ী ছাড়িয়া গ্রামের বাহিরে পলায়ন করে। আজ দয়াময়ীর শেষ আরতি, আজ সে দেখিবে। দেখিবে আর মনে মনে হাসিবে। কল্য প্রভাতে পুরোহিত ঠাকুর যখন সর্ব্বাগ্রে আসিয়া দেখিবেন যে দেবী অন্তর্ধান করিয়াছেন তখন তাঁহার কিরূপ অবস্থা হইবে, তাহাই উমাপ্রসাদ কল্পনা করিতে লাগিল।

রাত্রি দ্বিপ্রহর সমাগত। গৃহস্থ সকলে নিদ্রাগত। চোরের মত উমাপ্রসাদ শয্যাত্যাগ করিল। অন্ধকারে ধীরপদে পূজার ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। ধীরে ধীরে দ্বার মোচন করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। কোণে সেইরূপ ঘৃতদীপ মিটি মিটি করিয়া জ্বলিতেছে। দয়াময়ীর শয্যায় উমাপ্রসাদ গিয়া বসিল। দয়াময়ী নিদ্রামগ্ন।

প্রথমে উমাপ্রসাদ সস্নেহে দয়াময়ীর মুখচুম্বন করিল। পরে গা ঠেলিয়া তাহাকে জাগাইল। নিদ্রাভঙ্গে দয়াময়ী ধড়মড় করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিল।

উমাপ্রসাদ বলিল—"দয়া—এত ঘুম? ওঠ, চল।"

দয়া বিস্মিতের মত বলিল—"কোথায়?"

"কোথায়?—যাবার সময় তুমি জিজ্ঞাসা করছ কোথায়?—চল, আজ রাত্রে নৌকো করে আমরা পশ্চিমে চলে যাই।"

দয়া কিয়ৎক্ষণ নীরবে চিন্তা করিল। উমাপ্রসাদ বলিল—"ওঠ—ওঠ, পথে গিয়ে ভেবো এখন। সব ঠিক্‌ঠাক করে রেখেছি। চল চল।"

এই কথা বলিয়া উমাপ্রসাদ স্ত্রীর হস্তধারণ করিল।

দয়া সহসা হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল—"তুমি আর স্ত্রীভাবে আমাকে স্পর্শ করো না। আমি যে দেবী নই, আমি যে তোমার স্ত্রী, তা আর আমি নিশ্চয় করে বলতে পারিনে।"

কথাটা শুনিয়া উমাপ্রসাদ হাসিয়া উঠিল। স্ত্রীর গলা ধরিয়া তাহাকে চুম্বন করিতে যাইতেছিল। কিন্তু দয়াময়ী সহসা তাহার নিকট হইতে অপসৃত হইয়া দূরে বসিল। বলিল—"না না, হয় ত তোমার অকল্যাণ হবে।"

এ কথায় উমাপ্রসাদ যেন বজ্রাহত হইল। বলিল—"দয়া, তুমিও পাগল হলে?"

দয়া বলিল—"তবে এত লোকের রোগ আরাম হল কেন? তা হলে কি দেশসুদ্ধ লোক পাগল?"

উমাপ্রসাদ অনেক করিয়া বুঝাইল। অনেক অনুনয় করিল। অনেক কাঁদিল। দয়াময়ীর মুখে কেবল সেই কথা—"না না, তোমার অকল্যাণ হবে। হয় ত আমি তোমার স্ত্রী নই, হয় ত আমি দেবী।"

শেষকালে উমাপ্রসাদ বলিল—"তুমি দেবী হলে এমন পাষাণী হতে না। এততেও তোমার মন অচল অটল রইল ?"

দয়াময়ী এইবার কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"ওগো, তুমি আমাকে বুঝতে পারলে না।"

উমাপ্রসাদ দয়াময়ীর শয্যা ত্যাগ করিয়া কিয়ৎক্ষণ ক্ষিপ্তের মত সেই কক্ষে অস্থিরভাবে পদচারণা করিয়া বেড়াইল। পরে হঠাৎ দয়াময়ীর কাছে আসিয়া বলিল—"দয়া, আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ হয়েছিল ?"

দয়া বলিল—"তা হয়েছিল বই কি!"

"তুমি যদি দেবী, তুমি যদি কালী, আমি ত তা হলে মহাদেব, নইলে তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ হল কি করে ?"

এ কথার দয়া কি উত্তর দিবে ? সে চুপ করিয়া রহিল।

উমাপ্রসাদ আবার আরম্ভ করিল—"তুমি যদি আদ্যাশক্তি ভগবতী হও—তবে নরলোকে কার সাধ্য যে তোমাকে বিবাহ করে ? আমি যে তোমাকে বিবাহ করেছি, এতদিন যে আমি তোমার স্বামীর আসনে অধিষ্ঠিত রয়েছি, এতেই ত বোঝা যাচ্ছে যে আমিও মানুষ নই, —আমিও দেবতা, আমি স্বয়ং মহেশ্বর!"

দয়াময়ী বলিল—"যদি তাই হয়, তবে আমি তোমার স্ত্রী। দেবী হই, মানুষ হই, আমি তোমার স্ত্রী।"

এ কথা শুনিয়া উমাপ্রসাদ যেন হাতে স্বর্গ পাইল। স্ত্রীকে বক্ষে চাপিয়া ধরিল। বলিল—"চল, তবে আমরা যাই। এখানে যত দিন থাকব, ততদিন তোমায় আমায় বিচ্ছেদ থাকবে।"

দয়াময়ী বলিল—"তবে চল।"

খানিকটা হাঁটিয়া গঙ্গার ধারে পেঁৗছিয়া নৌকা চড়িতে হইবে। কিন্তু কিছু দূর চলিয়া দয়া সহসা থামিয়া আবার বলিল, "আমি যাব না!" এবার স্বর অত্যন্ত দৃঢ়। উমাপ্রসাদ আবার অনুনয়ের সাধ্যসাধনার পালা আরম্ভ করিল। কিছুতেই কিছু ফলোদয় হইল না। দয়া বলিল, "আমি যদি দেবী, তুমি আমার স্বামী মহেশ্বর, তবে দুজনেই এখানে থাকি, দুজনেই পুজো গ্রহণ করি, পালাব কেন ? এত জনের ভক্তিতে আঘাত দেব কেন ? আমি পালাব না, চল ফিরে যাই।"

উমাপ্রসাদ মর্ম্মাহত হইয়া বলিল—"তুমি একা ফিরে যাও, আমি যাব না।"

তাহাই হইল। দয়া একা দেবীত্বে ফিরিয়া গেল। উমাপ্রসাদ সেই নিশীথ অন্ধকারে মিলাইয়া গেল, পরদিন তাহার আর কোন উদ্দেশ পাওয়া গেল না।

দয়াময়ীর দেবীত্বে সকলেই বিশ্বাসবান, কেবল বিশ্বাস করে নাই তাহার বড়বধূ হরসুন্দরী—খোকার মা। প্রথম দুই চারি দিন তাই বড়বধূই দয়াময়ীর জুড়াবার ঠাঁই হইয়াছিলেন। প্রথম যখন স্বয়ং দয়াময়ীই বিশ্বাস করিতে চাহে নাই যে সে দেবী, তখন সে একদিন বড়বধূর কাছে গিয়া কাঁদিয়া পড়িয়াছিল—"দিদি, আমার এ কি হল ?" তিনি বলিয়াছিলেন—"কি করবো বোন, ঠাকুর পাগল হয়ে গিয়েছেন। বুড়ো বয়সে ওনার ভীমরতি ধরেছে।"

উমাপ্রসাদের নিরুদ্দেশের পর দুই সপ্তাহ গেল। তৃতীয় সপ্তাহে খোকার জ্বর হইল। দিন দিন ছেলে শুকাইয়া যাইতে লাগিল।

বৈদ্য আসিল, কিন্তু কালীকিঙ্কর তাহাকে চিকিৎসা করিতে দিলেন না। বলিলেন—"আমার বাড়ীতে স্বয়ং যার অধিষ্ঠান, কত কত দুঃসাধ্য রোগ যার চরণামৃত পান করে ভাল হয়ে গেল, আর আমার বাড়ীতে রোগ হলে বৈদ্য এসে চিকিৎসা করবে ?"

বড়বধূ নিজ স্বামী তারাপ্রসাদের কাছে কাঁদিয়া পড়িলেন—"ওগো ছেলেকে বদ্দি দেখাও গো, নইলে আমার ছেলে বাঁচবে না। ও রাক্ষুসি ডাইনি আমার ছেলেকে বাঁচাতে পারবে না। ওর কি সাধ্যি!"

তারাপ্রসাদ অত্যন্ত পিতৃভক্ত। পিতার বিশ্বাস, মাতার বিধান, এ সমস্ত তিনি বেদের মত মান্য করেন। তিনি স্ত্রীকে বলিলেন—"খবরদার, ও কথা বোলো না, ছেলের অকল্যাণ হবে। মা যা করবেন তাই হবে।"

কিন্তু বড়বধূর প্রতিদিনকার কাকুতি মিনতি ও ক্রন্দনে কর্ত্তা এক দিন গলবস্ত্র হইয়া দয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা, খোকার যে ব্যারাম হয়েছে, তাতে বৈদ্য দেখাবার কোন প্রয়োজন আছে কি?"

দয়াময়ী বলিল—"না, আমিই ওকে ভাল করে দেব।"

কালীকিঙ্কর নিশ্চিন্ত হইলেন। তারাপ্রসাদও নিশ্চিন্ত হইলেন।

খোকার মা একদিন একটি বিশ্বস্ত ঝিকে কবিরাজের কাছে পাঠাইয়া দিলেন—যাহা কিছু রোগের বিবরণ সব বলিয়া দিলেন। ঔষধ চাই। কবিরাজ মহাশয় এ প্রস্তাব শুনিয়া দন্তে জিহ্বা দংশন করিয়া বলিলেন—"মাঠাকুরুণকে বলিস, যখন স্বয়ং শক্তি বলেছেন তিনিই খোকাকে আরোগ্য করে দেবেন, তখন আমি ওষুধের ব্যবস্থা করে অপরাধী হতে পারব না।"

যাহার সঙ্গে দেখা হয়, তাহাকেই খোকার মা কাঁদিয়া বলেন—"ওগো কিছু ওষুধ বলে দাও, আমার ছেলে বাঁচে না।" সকলেই বলে—"ওমা ও কথা বোলো না, তোমার ভাবনা কি? তোমার ঘরে স্বয়ং আদ্যাশক্তি বিরাজ করছেন।"

খোকার ব্যারাম ক্রমেই বাড়িয়া উঠিল। দয়া বলিল, "খোকাকে এনে আমার কোলে দাও।"

খোকাকে কোলে করিয়া দয়া সমস্ত দিন বসিয়া রহিল। খোকা অনেকটা ভাল রহিল। কিন্তু রাত্রে আবার খোকার ব্যারাম বৃদ্ধি হইল।

দয়াময়ী একান্ত মনে একান্ত প্রাণে কত করিয়া খোকাকে আশীর্ব্বাদ করিল, খোকার গায়ে হাত বুলাইল, কিন্তু কিছুতেই খোকা বাঁচিল না।

যখন খোকার মৃত্যুসংবাদ বাড়ীতে প্রচারিত হইল তখন তারাপ্রসাদ অধীর হইয়া ছুটিয়া আসিল—দয়াময়ীকে বলিল—"রাক্ষসি, খোকাকে নিলি? কিছুতেই মায়া ত্যাগ করতে পারলি নে?"

খোকার মা প্রথমে শোকে অত্যন্ত বিহ্বল হইল। যখন কতকটা সুস্থ হইল তখন দয়াময়ীকে যা মুখে আসিল তাই বলিয়া গালি দিল। বলিল—"ও দেবী কোথায়? ও ডাইনি। দেবী কখন ছেলে খায়?"

কালীকিঙ্কর ছল ছল নেত্রে দয়ার পানে চাহিয়া বলিলেন—"মা, খোকাকে ফিরিয়ে দে। এখনও দেহ নষ্ট হয়নি। ফিরিয়ে দে মা ফিরিয়ে দে।"

দয়াময়ী ঝর ঝর করিয়া কাঁদিতে লাগিল। মনে মনে যমরাজকে উদ্দেশ করিয়া আজ্ঞা করিল, এখনি খোকার আত্মা খোকার শরীরে ফিরাইয়া দেওয়া হউক।

তাহাতে যখন হইল না, তখন মিনতি করিল;—আদ্যাশক্তির মিনতিতেও যমরাজা খোকার প্রাণ ফিরাইয়া দিলেন না।

তখন নিজের দেবীত্বে দয়ার অবিশ্বাস জন্মিল।

আজ তাহার পূজা ইত্যাদি প্রায় বন্ধ বলিলেই হয়। সমস্ত দিন কেহ তাহার কাছে আসিল না। দয়া একাকিনী বসিয়া সারাদিন চিন্তা করিল।

সন্ধ্যা হইল। আরতির সময় উপস্থিত। যেমন তেমন করিয়া আরতি হইল।

পরদিন কালীকিঙ্কর উঠিয়া পূজার ঘরে গিয়া দেখিলেন. সর্ব্বনাশ!—পরিধেয় বস্ত্র রজ্জুর মত করিয়া পাকাইয়া, কড়িকাঠে ল্যাগাইয়া দেবী আত্মহত্যা করিয়াছেন!

ভিখারী সাহেব

প্রথম পরিচ্ছেদ

তাড়াতাড়ি করিয়া, গাড়োয়ানকে ডবল বখসিসের প্রলোভন দেখাইয়া ষ্টেশনেত পৌঁছিলাম, আর ট্রেনখানিও ছাড়িয়া দিল। মহা মুস্কিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে আর গাড়ী নাই। ঘড়ি খুলিয়া দেখিলাম একটা বাজিয়া গিয়াছে। কলিয়ারিতে ফিরিবার এমন যে কিছু তাড়াতাড়ি ছিল তাহা নহে, তবে এখন হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত ট্রেণের প্রতীক্ষায় এই দীর্ঘ কালটা যে কাটাইব তাহার কিছু সম্বল ছিল না।

গাড়ী হইতে নামিলাম। ঘোড়া দুইটা তখনও হাঁফাইতেছে। তাহাদের গাত্র বহিয়া টস্ টস্ করিয়া ঘর্ম্মজল মাটিতে পড়িতেছে। গাড়োয়ান বেচারার মুখখানি ম্রিয়মাণ; সেলাম করিয়া বলিল—"হুজুর, আমার কিছু অপরাধ নাই। জানোয়ার দুটাকে মারিয়া ফেলিয়াছি বলিলেই হয়।"—কথাটা মিথ্যা নহে। আমি তাহাকে প্রতিশ্রুত দ্বিগুণ পুরস্কারই দিলাম। তখন তাহার মুখে হাসি ফুটিল।

আমার চাকর হরি তেওয়ারি বলিল—"বাবু! ওয়েটিং রুমে জিনিষপত্রগুলো লইয়া যাই?" নিকটে একটা প্রকাণ্ড সুচ্ছায় নিমগাছ, ফুর ফুর করিয়া প্রাণ-কাড়িয়া-নেওয়া চৈত্রী হাওয়া বহিতেছে—গাছটার তলদেশের প্রতি আমি কিয়ৎক্ষণ লুব্ধনেত্রে চাহিয়া রহিলাম। চাকরটা অনেককাল আমার সঙ্গে ঘুরিয়াছে—আমার মুখ দেখিয়া আমার মনের ভাব বুঝিতে পারে। বলিল—"হুকুম হয় ত এই গাছের তলাতেই বিছানা বিছাই।" আমি বলিলাম—"তাই বিছাও, এইখানেই একটু আরাম করি।"

বৃক্ষতলে সুকোমল হরিদ্বর্ণ শষ্পরাজির উপর একখানি কম্বল বিছাইয়া, তাহার উপর শতরঞ্চ বিছাইয়া, একটি তাকিয়া রাখিয়া, হরি তেওয়ারি আমার বিছানা করিয়া দিল। আমি জুতা ছাড়িয়া কোটটা খুলিয়া রাখিয়া, একটা সুদীর্ঘ আঃ শব্দ উচ্চারণ-পূর্ব্বক তাকিয়া হেলান দিলাম। তেওয়ারি গুড়গুড়িতে জল ফিরাইয়া তামাক সাজিতে গেল।

তেওয়ারি চক্ষুর অন্তরাল হইবামাত্র একটি দীর্ঘাকৃতি বৃদ্ধ ইংরাজ আসিয়া আমার বিছানার কাছে দাঁড়াইল। টুপি খুলিয়া ইংরাজিতে বলিল—"যীশু খ্রীষ্টের নামে আমাকে একটি পয়সা দিন।"

লোকটার পরিচ্ছদ একটু মূল্যবান কিন্তু খুব পুরাতন সিল্ক হ্যাট্; তাহার উপর-কার কাপড়টিতে এত ধূলা জমিয়াছে যে তাহার আদিম কৃষ্ণবর্ণ এখন ধূসরবর্ণ ধারণ করিয়াছে। তাহা যে সিল্ক তাহাও কষ্টে ঠাহর হয়। বস্ত্রাদি, তাহাও তদবস্থ। কলার, নেকটাই—অনুষ্ঠানের ত্রুটি কিছুই ছিল না। মাথার চুলগুলা বড় বড়,—বাতাসে এদিক ওদিক উড়িতেছে। বয়স ষষ্টি বৎসরের কম হইবে না। লোকটাকে দেখিয়া হঠাৎ বিনা কারণে আমার মনে এমন একটা কৌতূহল জাগিয়া উঠিল। ভাবিলাম ইহার অন্তরালে নিশ্চয়ই একটা ভগ্নজীবনের সকরুণ ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাস শ্রবণ করিবার জন্য আমার মন ব্যগ্র হইয়া উঠিল ভাবিলাম যতক্ষণ নিদ্রা না আসে ততক্ষণ ইহাকে লইয়াই সময় যাপন করি।

তাহাকে বলিলাম—"এইখানে বস।" কি আপদ! আমার বিছানায় বসিতে চায়। যদিও আমি ব্রাহ্ম মানুষ, স্পর্শদোষ মানি না, তথাপি ঐ একটা জীবন্ত ভূতকে কি বিছানায় বসিতে দিতে পারি? তাড়াতাড়ি বলিলাম—"এই নীচে ঘাসেই বস না।" লোকটা গর্ব্বিত ভাবে বলিল,—"মহাশয়! আমার কাপড় ময়লা হইয়া যাইবে যে।"

শুনিয়া হাসি পাইল। ভারি পরিষ্কার কাপড় কিনা! আমার বিছানার তলা হইতে কম্বলখানা টানিয়া বাহির করিয়া দিলাম। লোকটা পা দুটা ছড়াইয়া বসিল। আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—"চুরুট খাইবে?" আমি বলিলাম—"না, তুমি খাও।"

লোকটা চুরুট বাহির করিল। অতি উৎকৃষ্ট হাভানা জাতীর চুরুট। বড় বিস্মিত হইলাম। এই ভিখারী এত মূল্যবান হাভানা কোথায় পাইল? কাহারও চুরি টুরি করিয়া আনে নাই ত?

ইত্যবসরে আমার চাকর গুড়গুড়ি ভরিয়া উপস্থিত হইল। আমিও তাম্রকূট সেবন আরম্ভ করিলাম। তেওয়ারি অপ্রসন্ন কুটিল দৃষ্টিতে ভিখারী সাহেবের পানে চাহিয়া রহিল।

উভয়ে ধূমপান করিতে করিতে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইতে লাগিল। নাম বলিল—হেন্‌রি। আমি বলিলাম—"ও ত গেল তোমার ক্রিশ্চান নেম্, তোমার সর্‌নেম কি?" সে বলিল—"আমার সর্‌নেম নাই।" জীবনের ইতিহাস কিছুই বলিতে চাহে না। শুধু বলে—"আমি অতি দরিদ্র, খাইতে পাই না, পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াই।" জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তোমার আর কেহ আছে?" সে বলিল—"আমার মা বাপ কেহই নাই, আমি একটি অনাথ বালক।" বালকই বটে! আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—"স্ত্রী, পুত্র পরিবার?" সে বলিল—"স্ত্রী পুত্র পরিবার আমার কেহই নাই।"

আমার মনে একটা মৎলব আসিল। ভাবিলাম অনেক বাঙ্গালীই ত সাহেব হইয়াছে, একটা সাহেবকে বাঙ্গালী করিয়া দেখিলে হয়। ইহাকে আমার কয়লার খনিতে লইয়া গিয়া কুলীর সর্দ্দার করিব, ভাত ডাল খাওয়াইব, ধুতি চাদর পরাইয়া রাখিব। যদি রাজি হয়, তবে এ একটা অভিনব দর্শনীয় পদার্থ হইবে—ইহাকে কুড়াইয়া লইয়া যাই।

প্রস্তাব করিলাম। হেন্‌রি মহা উৎসাহের সহিত সম্মতি জানাইল। বলিল—"ও ইয়েস বাবু, আমি বাঙ্গালী হইব। আমাদের জাতি বাঙ্গালীকে অত্যন্ত ঘৃণা করে। আমি স্বয়ং বাঙ্গালী হইয়া আমাদের স্বজাতির পাপের কতকটা প্রায়শ্চিত্ত করিব। জগৎকে দেখাইব যে বাঙ্গালীরা হেয় পদার্থ নহে।"

আমি মনে মনে হাসিলাম। ভাবিলাম জগতের কর্ণে যদি তোমার বাঙ্গালী হওয়ার সমাচার পৌঁছে তবে জগৎ বলিবে, তুমি অন্নদায়ে এ কাজ করিয়াছ। বলিলাম—"তবে চল। সন্ধ্যার সময় গাড়ী। কোথাও তোমার কিছু জিনিষপত্র থাকে যদি লইয়া আইস।"

সে বলিল—"বাবু, আমার আর কোথাও কিছু নাই। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমাদের সেখানে ভাল হাভানা পাওয়া যায় ত?"

আমি বলিলাম—"এত খবর রাখি না, বোধ হয় পাওয়া যায় না।"

হেন্‌রি মুখখানি গম্ভীর করিয়া বলিল—"বাবু! তবে আমার যাওয়া হইল না।"

অদ্ভুত লোক! এ দিকে অন্ন যুটে না, অথচ হাভানা চুরুটটি চাই। পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে, আশ্রয় দিতে চাহিলাম, অন্নের সংস্থান করিয়া দিতে চাহিলাম, কিন্তু এক হাভানা চুরুটের জন্য সকল ত্যাগ করিতে প্রস্তুত! কিন্তু এই অদ্ভুতত্বের জন্যই তাহাকে সংগ্রহ করিবার নেশা আমার বাড়িয়া উঠিল। বলিলাম, "তুমি যদি চাও ত আমি কলিকাতা হইতে হাভানা আনাইয়া দিতে পারিব। প্রতি সপ্তাহে একজন করিয়া আমার চাপরাসি কলিকাতায় যায়।"

শুনিয়া হেন্‌রি মহা খুসী। আমাকে অগণ্য ধন্যবাদ দিতে লাগিল। বলিল—"বাবু, আমার একটি হাভানা তোমাকে খাইয়া দেখিতেই হইবে।" আমি চুরুট বড় একটা খাই না, কিন্তু হেন্‌রি নাছোড়বান্দা। লইলাম একটা। দিব্য জিনিস।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হেন্‌রি খুব কাজের লোক বটে। আমার বাহিরের ঘরে তাহাকে স্থান দিয়াছি। বাঙ্গালী সাজাইয়াছি। বাঙ্গালীর বেশ তাহার অঙ্গে এমন মানায়! সম্প্রতি আমার একটি ইংরাজ বন্ধু আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি হেন্‌রিকে দেখিয়া হেন্‌রির ইতিহাস শুনিয়া অত্যন্ত আমোদ পাইয়াছেন। তাহার একখানি ফোটোগ্রাফ তুলিয়া "ষ্ট্যাণ্ড

ম্যাগাজিন"এর "কিউরিয়াসিটি কলম"এর জন্য পাঠাইয়া দিয়াছেন। নিম্নে লিখিয়া দিয়াছেন—"বাঙ্গালী পরিচ্ছদে ইংরাজ।" হেন্‌রির একটু সংক্ষিপ্ত ইতিহাসও লিখিয়া দিয়াছেন। ছবিটি স্ট্যান্ডে প্রকাশিত হইলে অনেক সাহেব বাঙ্গালী পরিচ্ছদের পক্ষপাতী হইয়া পড়িতে পারেন। খাইয়া-দাইয়া এখন হেন্‌রির চেহারায় অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বাস্তবিক সেই তেজোদৃপ্ত ইংরাজ-মূর্ত্তি বাঙ্গালীর পরিচ্ছদে এক অভিনব অপূর্ব্ব দৃশ্য। কুলীগুলো তাহার এমনি বশীভূত হইয়াছে! আমাকে যদি দিনে দুইবার সেলাম করে ত তাহাকে দশবার করে।

শুধু হেন্‌রি আমার কুলী খাটাইয়া নিরস্ত নহে;—আমার বড় মেয়ে গিরিবালাকে ইংরাজি পড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। মেয়েটাও হেন্‌রির এমন নেওটো হইয়াছে! এই মাসখানেকের মধ্যেই তাহাকে এক রকম চলনসই বাঙ্গালা শিখাইয়া লইয়াছে। তাহাকে সে বলিত হেন্‌রি কাকা। প্রথম দিন শুনিয়া ত আমার হাড় জ্বলিয়া গেল। গিরিকে (গৃহিণীর সাক্ষাতে) বলিলাম, "কাকা কি রে রাক্কুসি? ও তোর বাবার চেয়ে বয়সে ছোট না কি? জ্যেঠা বল্। নয় ত মামা বল্।"—তাহার পর হইতে গিরি তাহাকে হেন্‌রি দাদা বলিয়া ডাকিত।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে গিরিবালা জ্বরে পড়িল। দুই তিন দিন সকালবেলা ভিজিয়া ভিজিয়া ফুল তুলিয়াছিল। আমি ভোরে চা খাইয়া আফিসে চলিয়া যাইতাম। আমার স্ত্রীর কথা সে গ্রাহ্য করিত না। এই অত্যাচারের ফলস্বরূপ তাহার সর্দ্দিজ্বরের মত হইল। প্রথমে আমরা ততটা খেয়াল করি নাই;—অমন জ্বর ত ছেলেপিলের মাঝে মাঝে হইয়া থাকে। দুইটা উপবাস দিলেই সারিয়া যাইবে।

পাঁচ ছয় দিনে জ্বরটা বিকারে দাঁড়াইল। অবস্থা উত্তরোত্তর সঙ্কটাপন্ন হইতে লাগিল। প্রথমে আমাদের কলিয়ারির নেটিভ্ ডাক্তারবাবুটি চিকিৎসা করিতেছিলেন, কিন্তু ক্রমে লক্ষণ ভাল নয় দেখিয়া রাণীগঞ্জ হইতে এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জনকে প্রত্যহ একবার করিয়া আনাইবার বন্দোবস্ত করিলাম।

হেন্‌রি তাহার ছাত্রীর মাথার শিয়রে বসিয়া খুব সেবাটা করিতে লাগিল। আমরা বাপ মায়ে যা সেবা না করিলাম, তা সে হেন্‌রি করিল। তাহার আহার নিদ্রা বন্ধ হইল বলিলেই হয়। ঔষধ পথ্যাদির সম্বন্ধে আমাদের তিলমাত্র ত্রুটি হইলে হেন্‌রি রাগিয়া অনর্থপাত করিত।

মাঝে একদিন এমন অবস্থা হইল যে, বুঝি রাত্রি আর কাটে না। আমার স্ত্রী ত মেয়ের রোগশয্যা ছাড়িয়া ও ঘরের মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আমারও হাত পা অবশ হইয়া আসিতে লাগিল। রাণীগঞ্জের ডাক্তারবাবুটি অন্য দিন সন্ধ্যার গাড়ীতে ফিরিয়া যাইতেন, সে দিন আর যাইতে পারেন নাই। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঔষধ পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। যখন রাত্রি দুইটা হইবে তখন ডাক্তারবাবু নূতন একটা ঔষধ প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। যখন যে ঔষধ দেওয়া হইত হেন্‌রি সাবধানতার সহিত সমস্ত দেখিত। প্রশ্ন করিয়া করিয়া ডাক্তারকে বিরক্ত করিয়া তুলিত। এবার বলিল, "Now, I won't allow that"—অর্থাৎ ও ঔষধ আমি দিতে দিব না। ডাক্তার চটিয়া গেলেন। বলিলেন —"মহাশয়, এ ব্যক্তি এমন করিয়া বাধা দেয় কেন?"

হেন্‌রি লোকটা এ দিকে ভাল, কিন্তু মাঝে মাঝে ভারি খামখেয়ালি করে। অন্য সময় তাহাতে বরং আমোদ পাইয়াছি, কিন্তু এখন ভারি বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল।

হেন্‌রি ডাক্তারকে ষ্টুপিড্ ফুল বলিয়া গালি দিল। আমাকে বলিল—"এ কিছু জানে না, ইহাকে তাড়াইয়া দাও। এখনি রোগীকে মারিয়া ফেলিয়াছিল আর কি!" ডাক্তার বলিলেন—"যদি অমন করিয়া আমার চিকিৎসা কার্য্যে বাধা দিবে তবে আমি চিকিৎসা ত্যাগ করিয়া যাইব।"—বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

এই ব্যাপারে আমাদের স্ত্রীপুরুষের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। হেন্‌রিকে বলিলাম

—"কর কি? তুমি চিকিৎসার কি জান? ডাক্তার যা ভাল বোঝেন তাই করুন, তার পর আমাদের অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে।"

হেন্‌রি বলিল—"অদৃষ্ট আবার কি? জানিয়া শুনিয়া এ ঔষধ এখন খাওয়াইলে নিশ্চিত মৃত্যু। আধঘণ্টার মধ্যে গা হিম হইয়া নাড়ী ছাড়িয়া যাইবে।"

ডাক্তারবাবু হেন্‌রিকে বলিলেন—"তুমি ত ভারি পণ্ডিত দেখিতেছি! কেন, নাড়ী ছাড়িয়া যাইবে কেন?"

আমি বলিলাম—"হেন্‌রি, ডাক্তারবাবু যাহা বলিতেছেন তাহাই আমার ঠিক বলিয়া মনে হইতেছে। তুমি কোনও আশঙ্কা করিও না।"

শেষকালে হেন্‌রি ডাক্তারকে বলিল,—"আচ্ছা তবে তোমার ঔষধই দাও। কিন্তু যদি আমার মেয়ে মরিয়া যায় তাহা হইলে তোমাকে তাহার হত্যাকারী বলিয়া পুলিসে দিব। আর তুমি যে ঔষধ দিতেছ, তাহার একটা তালিকা করিয়া নাম দস্তখৎ করিয়া রাখ।"

এই বলিয়া ক্ষিপ্রহস্তে হেন্‌রি প্রেস্‌ক্রিপসনখানা লিখিয়া ফেলিল। ডাক্তারকে বলিল, —"সহি কর।"

ডাক্তারবাবু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। আমি দেখিলাম ইহাদের বিবাদের মধ্যে পড়িয়া আমার মেয়ের প্রাণ যায়। আমি ডাক্তারবাবুর হাতটি ধরিয়া বলিলাম—"মহাশয়! ওটা পাগল, ওর কথা শুনিবেন না। আপনি যে ঔষধ ইচ্ছা তাহাই দিন।" প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন-খানা হেনরির হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া আমি খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলাম।

ঔষধ দেওয়া হইল। হেন্‌রি রোষকষায়িত লোচনে বলিল—"ঈশ্বর তোমাকে মার্জ্জনা করুন।" ডাক্তারের কাছে একটা উৎকৃষ্ট থার্ম্মমিটার ছিল, অর্দ্ধ মিনিট রাখিলেই কার্য্য সম্পন্ন হয়। পাঁচ মিনিট অন্তর তাপ লওয়া হইতে লাগিল। হু হু করিয়া টেম্পারেচার নামিতেছে।

ডাক্তারের মুখ শুকাইয়া গেল। মেয়ের হাত পা শীতল হইয়া আসিতেছে দেখিয়া আমার স্ত্রী কাঁদিয়া উঠিলেন। ডাক্তার উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

হেন্‌রি মহা উত্তেজিত হইয়া বলিল—"দেখ মেয়েকে মারিয়া ফেলিল। আমি উহাকে হত্যা করিব।" এই বলিয়া সে ক্ষিপ্তের মত ডাক্তারের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে চাহিল। তাহাকে ধরিয়া রাখা ভার। ডাক্তারবাবু এ ব্যাপার দেখেন নাই। দেখিলে তাঁহার বাঙ্গালী-প্রাণ আর তাঁহাকে চিকিৎসা ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিতে দিত কি না সন্দেহ। আমি হেন্‌রিকে বলিলাম,—"দেখ, তুমি যখন এতই জান, তবে এখনও যদি কিছু প্রতিকার থাকে ত কর।" আমার স্ত্রী বলিলেন—"হেন্‌রি, এ মেয়েকে তুমি যদি বাঁচাতে পার, তবে এ মেয়ে তোমাকে দিলাম।"

হেন্‌রি বলিল—"এ মেয়ে আমাকে দিলে?" আমার স্ত্রী বলিলেন—"দিলাম।"

হেন্‌রির মুখ আনন্দপূর্ণ হইল। সেই বিপদের সময়ও তাহার ভাব দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। লোকটা পাগল নাকি?

হেন্‌রি বলিল—"ঈশ্বর সাক্ষী, এ মেয়েকে যদি বাঁচাইতে পারি, তবে এ মেয়ে আমার?"

আমার স্ত্রী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"হাঁ হেন্‌রি, এ মেয়েকে যদি বাঁচাইতে পার ত এ মেয়ে তোমার।"

হেন্‌রি বলিল—"আচ্ছা তবে একবার চেষ্টা করিয়া দেখি।" বলিয়া ডাক্তারের ঔষধের বাক্সটা কাছে টানিয়া লইল। ক্ষিপ্র হস্তে একটা ঔষধ প্রস্তুত করিল। খানিকটা গিরির মুখে ঢালিয়া দিল, কিন্তু কে গিলিবে? ঔষধ ঠোঁটের কোণ দিয়া গড়াইয়া পড়িল।

দেখিয়া হেন্‌রি সূচের মত কি একটা যন্ত্র বাহির করিল। তাহা ঔষধে সিক্ত করিয়া গিরির দেহের স্থানে স্থানে বিদ্ধ করিয়া দিল।

পাঁচ মিনিট পরে শরীরে উত্তাপ বৃদ্ধি পাইল। দশ মিনিট, পনেরো মিনিট, আধ ঘণ্টা; তখন আবার গিরিবালার পূর্ণ জ্বর! হেন্‌রি আহ্লাদে আটখানা। বলিল—

ঈশ্বরকে সহস্র ধন্যবাদ; এ যাত্রা ইহাকে বাঁচাইতে পারিলাম।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ঈশ্বরের কৃপায়, হেন্‌রির চিকিৎসা-গুণে, গিরিবালা আরোগ্যলাভ করিয়াছে। সপ্তাহের পর পথ্য লাভ করিল। হেন্‌রি সর্ব্বদা তাহার কাছে কাছে থাকে। কুলীর সর্দ্দারি করা সে একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছে।

দিন দিন কিন্তু হেন্‌রির পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছে। আজ দুই দিন তাহার হাভানা ফুরাইয়াছে. কিন্তু কলিকাতায় চাপরাসি পাঠাইল না। হেন্‌রির হাভানা ফুরাইলে নিয়মিত দিনের দুই চারি দিন পূর্ব্বেও চাপরাসিকে এখন কলিকাতায় পাঠান হয়। হেন্‌রি সদাই অন্যমনস্ক, কি ভাবে। মুখখানি ম্লান করিয়া থাকে। কেবল গিরিবালা কাছে আসিলেই যেন তাহার মনের অন্ধকার দূর হয়, মুখে হাসি ফুটে।

একদিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম. "হেন্‌রি তোমার কি হইয়াছে বল ত. তুমি সর্ব্বদা ভাব কি?"

হেন্‌রি বলিল—"বাবু আমি আমার ভূত জীবনের ইতিহাস ভাবি। একটু একটু করিয়া আমার সব মনে পড়িতেছে। আমি মাঝে মাঝে পাগল হইয়া যাই, আবার ভাল হই। এবার আমার ভাল হইবার সময় আসিয়াছে।"

ভারি বিস্মিত হইলাম হেন্‌রি পাগল? কই পাগলের কোনও লক্ষণ ত দেখি নাই! তথাপি কথাটা নিতান্ত অবিশ্বাসযোগ্য মনে হইল না। এটা আমি বরাবর লক্ষ্য করিয়াছি, হেন্‌রির কথাবার্ত্তা নিতান্ত পথে কুড়ানো ভিখারীর মত নহে। তা ছাড়া, গিরিবালার রোগের সময় চিকিৎসাশাস্ত্রে সে ত অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিল। ও হয়ত কোথাও একটা বড়গোছের ডাক্তার ছিল. এখন পাগল হইয়া গিয়াছে। হেন্‌রিকে নানারূপ প্রশ্ন করিলাম। সে স্বয়ং স্বেচ্ছায় যাহা বলিয়াছিল. তার বেশী আর একটি কথাও তাহার মুখ হইতে বাহির করিতে পারিলাম না।

এই সময়ে গিরিবালা আসিয়া হেন্‌রিকে ডাকিল। হেন্‌রি বালকের মত প্রফুল্ল ও চঞ্চল হইয়া গিরিবালার সঙ্গে চলিয়া গেল।

আমি ভাবিলাম, পাগলই বটে। নহিলে এত সত্বর উহার ভাব-পরিবর্ত্তন হয় কেন? সহজ মানুষ বিষণ্ন হইলে, প্রফুল্লতা লাভ করিতে কিছু সময় লাগে। পাগলের সে সময়-টুকু আবশ্যক হয় না।

কিয়দ্দিন পরে আমি কলিয়ারির আফিসে বসিয়া হিসাব দেখিতেছি, সন্ধ্যা হইবার আর বিলম্ব নাই, দরোয়ান একখানি কার্ড আনিয়া আমার হাতে দিল। পূর্ব্বে উল্লিখিত আমার সেই ইংরাজ-বন্ধু মরিসন্ আসিয়াছেন,—সেই যিনি বাঙ্গালী-পরিচ্ছদে হেন্‌রির ফোটোগ্রাফ তুলিয়াছিলেন। আমি স্বয়ং উঠিয়া গিয়া সমাদর করিয়া বন্ধুকে লইয়া আসিলাম। অভিবাদন ও প্রথম শিষ্টাচার বচনাদির পর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন —"আপনার সে ইংরাজ বাঙ্গালী কুলীর সর্দ্দারটি আছে ত?"

"আছে বইকি! কেন বলুন দেখি?"

"তাহা হইলে আপনি ভারি বিপদে পড়িয়াছেন!" এই বলিয়া মরিসন্ মুখখানি অতিশয় গম্ভীর করিলেন।

আমি একটু শঙ্কিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"কেন কেন, ব্যাপার কি?"

"ব্যাপার গুরুতর। হেন্‌রি একজন ফেরারি আসামী। ও লণ্ডনের নিকট একটা জেলে আবদ্ধ ছিল। দস্যুবৃত্তি ও নরহত্যার অপরাধে অপরাধী; উহার প্রাণদণ্ড হইত। জেল ভাঙ্গিয়া পলাইয়া আসিয়াছে। তাহাকে আশ্রয় দিয়া আপনি আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইয়াছেন।"

আমি চিন্তিত হইয়া পড়িলাম! নিজের জন্য নহে, হেন্‌রির জন্য। হেন্‌রিকে

আমরা ভালবাসিয়া ফেলিয়াছি। হেন্‌রি এমন ভাল, উহার ভূত জীবন নরশোণিতে কলঙ্কিত? দস্যুবৃত্তি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত? উহার প্রাণদণ্ড হইবে? হেন্‌রি যে আমাদের পরমাত্মীয়ের মত! হেন্‌রি যে আমার প্রাণাধিকা কন্যার জীবনদাতা! উহার ফাঁসী হইবে?

বন্ধু বলিলেন—"এখন কি উপায় ভাবিতেছেন? এইবেলা পুলিস ডাকিয়া উহাকে ধরাইয়া দিন, তাহা হইলে প্রমাণ করা সহজ হইবে যে আপনি যে উহাকে আশ্রয় দিয়াছেন, তাহা না জানিয়া।"

আমি উত্তেজিত হইয়া বলিলাম—"হেন্‌রিকে আমি ধরাইয়া দিব? বরং উহাকে এখনি গিয়া সাবধান করিয়া দিব।"

মরিসন্ পা দুটা খুব ফাঁক করিয়া দিয়া, চেয়ারের পৃষ্ঠে এলাইয়া পড়িয়া, যেন ভারি নিরাশ হইয়া বলিলেন—"বাবু, আপনি একজন সুশিক্ষিত পদস্থ ব্যক্তি হইয়া এমন কথা বলিতেছেন? আইনের কবল হইতে তাহার ন্যায্য শিকারকে কাড়িয়া লইবেন? সকলেই যদি আপনার মত এইরূপ ভাবাপন্ন হয় তবে ত এই সুবিপুল সুখময় জনসমাজস্বরূপ অট্টালিকা দুইদিনে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া ধূলিসাৎ হইয়া যায়!"

আমি ভারি দমিয়া গেলাম; কথাটা ঠিক বটে। কিন্তু আমি কোন্ ধর্ম্ম বা কোন্ নীতি অনুসারে আমার কন্যার প্রাণদাতার প্রাণদণ্ডে সহায়তা করিব?

মরিসন্‌কে বলিলাম—"হেন্‌রি যদি প্রকৃতই অপরাধী হয়, তাহা হইলে সে রাজদণ্ডের উপযুক্ত সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি স্বয়ং আয়োজন করিয়া উহাকে ধরাইয়া দিতে একান্ত অক্ষম।"

মরিসন্ বলিলেন—"আপনি ত বলিয়াছেন যে উহাকে আপনি সাবধান করিয়া দিবেন এবং যাহাতে সে ধৃত না হয় সে চেষ্টা করিবেন।"

আমি বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলাম—"কই তাহা ত আমি বলি নাই! উহাকে সাবধান করিয়া দিব বলিয়াছিলাম বটে, কিন্তু যাহাতে সে ধৃত না হয় সে চেষ্টা করিব এমন কথা কখন বলিলাম?" মরিসন্ ইহার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই আবার বলিলাম—"যদিও ধর্ম্মতঃ আমার তাহাই করা উচিত বটে।"

বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন?" আমি গিরিবালার রোগ এবং হেন্‌রি কেমন করিয়া তাহার জীবনরক্ষা করিয়াছে, তাহার সমস্ত ইতিহাস আনুপূর্ব্বিক বলিলাম।

শুনিয়া তিনি কিয়ৎকাল মৌন হইয়া রহিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কিন্তু এ সকল সংবাদ আপনি পাইলেন কোথা বলুন দেখি?"

তিনি বলিলেন—"মনে আছে হেন্‌রি যখন প্রথম আসিয়াছিল তখন আমি তাহার বাঙ্গালী-পরিচ্ছদ দেখিয়া অত্যন্ত হাসি এবং তাহার ফোটোগ্রাফ তুলিয়া লই?"

"মনে আছে।"

"সেই ফোটোগ্রাফ্ আমি লণ্ডনের 'স্ট্রাণ্ড ম্যাগাজিনে' পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। উহা ঐ পত্রের ক্যুরিয়সিটির ভিতর মুদ্রিত হইয়াছে। সে ছবি দেখিয়া লণ্ডন-পুলিস হেন্‌রিকে চিনিতে পারিয়াছে। হেন্‌রিকে ধৃত করিবার জন্য কলিকাতার পুলিস-কমিসনারকে তাহারা অনুরোধ করিয়াছে। পুলিস-কমিসনার আমার কাছে হেন্‌রির ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য লোক পাঠাইয়াছিলন।"

"আপনি ঠিকানা বলিয়াছেন?"

"কি করিব, আইন অনসারে আমি বলিতে বাধ্য।"

শুনিয়া আমি অত্যন্ত হতাশ হইয়া পড়িলাম। হেন্‌রিকে বাঁচাইবার আশা ছাড়িয়া দিতে হইল। আহা! বুড়া বয়সে বেচারির অদৃষ্টে এই লেখা ছিল? আর আমার চোখের সম্মুখে তাহাকে হাত-কড়ি লাগাইয়া ধরিয়া লইয়া যাইবে, তাহাই বা কি করিয়া সহ্য করি! আমি কি তাহার এন্য কিছুই করিবার অধিকারী নহি? আমিই ত তাহার মৃত্যুর কারণ হইলাম। কেন আমি বাহাদুরী করিয়া তাহাকে বাঙ্গালীর কাপড় পরাইলাম;

তাহা না করিলে ত ষ্ট্র্যাণ্ডে তাহার প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইবার অবসর হইত না! আমি যদি আমার প্রাণাধিকা দুহিতার জীবনদাতার প্রাণরক্ষার জন্য সচেষ্ট হই, তবে কি তাহা অন্যায়—অধর্ম্ম? আইনের চক্ষে আমি দোষী হইলেও, হে ঈশ্বর, তোমার চক্ষেও কি তাহা পাপ বলিয়া পরিগণিত হইবে? পরোপকার কি সকল সময়েই সকল অবস্থাতেই ধর্ম্ম নহে?

আমি মনে মনে এই সকল চিন্তা করিতেছি,—হঠাৎ চমকিয়া উঠিলাম। আমার বন্ধু হা হা করিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। ভারি বিরক্ত হইলাম। মানুষ না পিশাচ? এই কি হাসিবার সময়? বিরক্তভাবে তাঁহার মুখপানে চাহিলাম।

তিনি বলিলেন—"আপনি দেখিতেছি অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইয়া পড়িয়াছেন। তবে আর আপনাকে কষ্ট দিব না। হেন্‌রি আপনার এবং আমার মতই সাধু সজ্জন ব্যক্তি। এবং উঁহার নাম শুধু হেন্‌রি নহে—সার হেন্‌রি রবিন্সন্।"

আমি ত অবাক। সার হেন্‌রি রবিন্সন্ কি আবার? আমার বন্ধু উন্মাদ হইয়াছেন নাকি? বলিলাম—"কি বলিতেছেন আপনি?"

"বলিতেছি এই কথা যে, আপনার ঐ কুলীর সর্দ্দারটি একদিন হাউস অব্ কমন্সে বক্তৃতা করিয়া স্বদেশবাসীকে মুগ্ধ করিয়াছেন।"

আমার মনে হইল এ সকল প্রসঙ্গ এমনি অসম্ভব যে, হয় ত আমি জাগিয়া নাই, স্বপ্ন দেখিতেছি মাত্র। বন্ধু আমার মুখের ভাব দর্শনে সমস্তই বোধ হয় বুঝিতে পারিলেন। আমার হাতে একখানি বড় লেফাফা দিলেন। তাঁহারই স্বনামীয় পত্র, বিলাতী ডাকে আসিয়াছিল, শীলমোহর করা রেজেস্ট্রী করা ছিল। চিঠি বাহির করিয়া আলোকের কাছে ধরিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলাম।

পত্রখানি ষ্ট্র্যাণ্ড ম্যাগাজিনের কার্য্যালয় হইতে আসিয়াছে। নিম্নে তাহার মর্ম্মানুবাদ প্রদত্ত হইল।

মহাশয়,

আপনার প্রেরিত "বাঙ্গালী পরিচ্ছদে ইংরাজ" ফোটোগ্রাফ্‌খানি আমরা সাদরে ষ্ট্র্যাণ্ড ম্যাগাজিনের কিউরিয়সিটি পৃষ্ঠায় মুদ্রিত করিলাম। ইহার মূল্যস্বরূপ একখানি চেক্ পাঠাইলাম, প্রাপ্তিস্বীকার করিলে বাধিত হইব।

আপনি এই ফোটোগ্রাফ্‌খানি পাঠাইয়া শুধু আমাদের পাঠকের আমোদের আয়োজন করেন নাই, পরন্তু বেচারি "হেন্‌রির" বড়ই উপকার করিয়াছেন। উঁহার পুরো নাম সার হেন্‌রি রবিন্সন্। অদ্য প্রাতে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন।

সার হেন্‌রি লণ্ডন-সমাজের একজন গণ্যমান্য লোক। উন্মাদ ব্যাধিতে আক্রান্ত হইবার পূর্ব্বে তিনি দুইবার পার্লামেণ্টের মেম্বর নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। চিকিৎসা-শাস্ত্রেও তিনি একজন পারদর্শী ব্যক্তি। গত দশ বৎসর হইতে তিনি এইরূপ ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। মাঝে মাঝে পাগল হইয়া যান;—গৃহ ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া যান কেহ সন্ধান পায় না। তাঁহার পাগলামির লক্ষণ এই যে, তিনি নিজেকে দরিদ্র ভিক্ষুক বলিয়া মনে করেন এবং পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়ান। আত্মীয়স্বজনেরা অন্বেষণ করিয়া আবার তাঁহাকে ধরিয়া আনেন; সব সময়ে যে অন্বেষণে কৃতকার্য্য হন তাহা নহে। একবার পাগল হইলে ছয় মাস আট মাস বা এক বৎসর ব্যাধিগ্রস্ত থাকেন। যেবার ধৃত না হন সেবার আরোগ্যলাভ করিলে নিজেই আবার গৃহে ফিরিয়া আসেন। যত দিন ভাল থাকেন, তত দিন উঁহার প্রধান কায, নিজের জমিদারীভুক্ত দীন দুঃখী প্রজাদের রোগ হইলে চিকিৎসা করিয়া বেড়ানো।

গত বৎসর শীত-ঋতুতে ইনি রোগমুক্তাবস্থায় বন্ধুগণের সহিত ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিতে যান। তথায় পৌঁছিবার মাস দুই পরে বন্ধুসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্দ্ধান

করেন। তাহার পর হইতে বেচারি সার হেন্‌রির জন্য অনেক বিফল অনুসন্ধান হইয়াছে। ষ্ট্র্যাণ্ডে তাঁহার ছবি না বাহির হইলে আরও কত দিন যে এরূপ অনুসন্ধান হইত তাহার স্থিরতা নাই। শুধু ছবি হইতে আমার বন্ধু তাঁহার খুল্লতাতকে হয়ত নাও চিনিতে পারিতেন, কিন্তু আপনি যে তাঁহার হাভানা সিগারের প্রতি একান্ত আনুরক্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাতেই তাঁহাকে সনাক্ত করিবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া সার হেন্‌রির বর্ত্তমান ঠিকানা আমাদিগকে জানান, তবে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহাকে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া আসিবার বন্দোবস্ত করিবেন।

(স্বাক্ষর)

পত্রখানি পাঠ করিয়া বন্ধুকে প্রত্যর্পণ করিলাম। বলিলাম—"এমন ব্যাপার!"

মরিসন্ জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচ্ছা, আপনি এতদিন সার হেন্‌রির আচার ব্যবহারে, কথাবার্ত্তায় কোনও রূপে তাঁহার পরিচয়ে সন্দিহান হইয়াছিলেন?"

হেন্‌রি সেদিন আমাকে তাহার ভূতজীবন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিল, তাহাই মরিসন্‌কে বলিলাম। শুনিয়া তিনি বলিলেন—"সুসংবাদ বটে। সার হেন্‌রি তবে আরোগ্যের পথে আসিয়াছেন।"

আমি অনেকক্ষণ নীরব রহিলাম। শেষে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি তাঁহাদিগকে হেন্‌রির—অর্থাৎ সার হেন্‌রির—ঠিকানা জানাইয়াছেন?"

"না। জানাইব বলিয়াই ত সংবাদ লইতে আসিয়াছি যে এখনও এখানে তিনি আছেন কি না।"

"তবে সংবাদ দিন। আহা, বেচারা কত কষ্টই পাইয়াছে!"

"তা আর নয়? অত বড়মানুষ হইয়া পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়ান! কেমন করিয়া উঁহার দিন গুজরাণ হইত কে জানে?"

"দিন গুজরাণ শুধু নহে, হাভানা সিগার কোথা হইতে আসিত? পাগল সব ভুলিত,—পরিবার, পরিজন, বিষয়, পদমর্য্যাদা,—কিছুই মনে থাকিত না; কেবল হাভানা সিগারটি ভুলিতে পারিত না। মৌতাত এমনি জিনিস!"

মরিসন্ বিদায় গ্রহণ করিতে চাহিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—"সার হেন্‌রিকে কখন, কি ভাবে একথা জানাইবেন?"

আমি বলিলাম—"অবসর বুঝিয়া এক সময় কথা পাড়িব।"

বন্ধু সাবধান করিয়া দিলেন—"দেখিবেন, হঠাৎ না হয়। তাহা হইলে হয়ত বিপরীত ফল হইবে। একটু যা আরোগ্যর লক্ষণ দেখা গিয়াছে তাহা অন্তর্হিত না হইয়া যায়।"

আমি বলিলাম—"সে সাবধানতা অবশ্য গ্রহণীয়। আপনার ষ্ট্র্যাণ্ড-খানা আর চিঠিখানা দিয়া যান।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রভাতে হেন্‌রির সঙ্গে দেখা হইলে প্রথমে তাহাকে ষ্ট্র্যাণ্ড ম্যাগাজিনে তাহার প্রতিমূর্ত্তি দেখাইলাম। ছবি দেখিয়া এবং ছবির নিম্নস্থ বিবরণ পড়িয়া সে মৌন হইয়া রহিল।

অপরাহ্নে তাহার সহিত আম-বাগানে পদচারণা করিতেছিলাম। খোকার অসুখ করিয়াছে বলিয়া গিরিবালা বেচারি বেড়াইতে আসিতে পায় নাই। ষ্ট্র্যাণ্ডের কথা তুলিলাম। এ কথা সে কথার পর সহসা জিজ্ঞাসা করিলাম—"ষ্ট্র্যাণ্ডের সম্পাদকের সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে?"

হেন্‌রি বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে বলিল—"আছে। কেন?"

আমি একটু ইতস্ততঃ করিয়া হেন্‌রির হাতে ষ্ট্র্যাণ্ড সম্পাদকের পত্রখানি দিলাম।

তখনও যথেষ্ট দিবালোক ছিল। হেন্‌রি পত্রখানি হাতে করিয়া এ পিঠ ও পিঠ দেখিতে লাগিল। মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"এ কার পত্র?"

"স্ট্র্যান্ড সম্পাদকের পত্র।"

"না। এ কাহার নামে আসিয়াছে? মরিসন্‌ কে?"

"সেই যে আমার সেই বন্ধু, যিনি তোমার ফোটো তুলিয়াছিলেন, তাঁহার নাম মরিসন্‌। পড় না।"

হেন্‌রি পত্রখানি পড়িল। আমি তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম। যতক্ষণ পত্র পড়িতেছিল, ততক্ষণ তাহার স্বচ্ছ সুন্দর বার্দ্ধক্য-রেখাঙ্কিত মুখে কত রকমের ভাব খেলিয়া গেল!

পত্র পড়িয়া হেন্‌রি মুখখানি ম্লান করিয়া রহিল। আমি বলিলাম—"সার হেন্‌রি।"

হেন্‌রি যেন চমকিয়া উঠিল। বুঝিলাম এখনও হেন্‌রি সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিতে পারে নাই। পত্রে পড়িল আমরা তাহার প্রকৃত পরিচয় অবগত হইয়াছি, অথচ তাহার। প্রকৃত নামে ডাকাতে সে চমকিল।

হেন্‌রি বলিল—"কি?"

আমি বলিলাম—"আমাদিগকে মাপ কর।"

"কেন?"

"তোমার প্রকৃত পরিচয় অবগত ছিলাম না; আতিথ্যের কত ত্রুটি হইয়াছে! কত কষ্ট পাইয়াছ। আমাদের এই অজ্ঞানকৃত অপরাধ ক্ষমা কর।"

হেন্‌রি অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া বলিল—"আমার সঙ্গে তোমরা যেরূপ ব্যবহার করিয়াছ, তাহাতে তোমাদের আশ্চর্য্য সহৃদয়তা, অমায়িকতা ও পরদুঃখকাতরতা প্রকাশ পাইয়াছে। আমি যতদিন বাঁচিয়া থাকিব, তোমাদের উপকার বিস্মৃত হইব না।"

"আমি আর তোমার কি উপকার করিয়াছি সার হেন্‌রি? তুমিই বরং আমার মেয়ের প্রাণ বাঁচাইয়াছ।"

হেন্‌রির মুখে এতক্ষণে একটু হাসি দেখা দিল। গিরিবালার প্রসঙ্গ মাত্রেই সে আনন্দিত হইত। বলিল—"আমি যদি তোমার মেয়েকে বাঁচাইয়া থাকি, তুমিও ত আমাকে তাহার জন্য যথেষ্ট মূল্য দিয়াছ।"

আমি মনে করিলাম, হেন্‌রি আতিথ্যের উল্লেখ করিতেছে। বলিলাম—"আমি আর তোমায় কি দিয়াছি? আমি যৎসামান্য যাহা তোমার জন্য করিয়াছি, তুমি আমার কর্ম্মে সহায়তা করিয়া তাহার ঋণ শোধ করিয়াছ।"

হেন্‌রি আবার হাসিল; বলিল—"না না, তাহার অপেক্ষা তুমি আমাকে ঢের বেশী মূল্যবান জিনিষ দিয়াছ।"

"কি?"

"কেন, গিরিবালাকে আমায় দিয়াছ। হাসিলে যে। কেন? ভারি অসম্ভব নাকি? তুমি ত ব্রাহ্ম, তোমার ত জাতিচ্যুতির ভয় নাই। গিরিবালাকে আমি বিলাতে লইয়া গিয়া উহাকে সেখানে কোনও প্রথম শ্রেণীর বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিব, উহাকে মানুষ করিব, লেখাপড়া শিখাইব, তাহার পর হয়ত কোনও সম্ভ্রান্তবংশীয় সচ্চরিত্র সুশিক্ষিত লণ্ডন প্রবাসী বঙ্গীয় যুবকের সহিত উহার বিবাহ দিব।"

আমি বলিলাম—"না! সে কি হয়? আমি ছাড়িলেও, আমার স্ত্রী ছাড়িবেন কেন?"

হেন্‌রি ভ্রূকুটি বিস্তার করিয়া বলিল—"বেশ! মনে নাই? তিনি ত গিরিবালাকে আমায় দান করিয়াছেন।"

সার হেন্‌রি এখন বিলাতে। সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। উল্লিখিত কথাবার্ত্তার একমাস পরে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র স্বয়ং আসিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছেন। প্রায় প্রতি মেলেই চিঠি পাই।

গিরিবালাকে লইয়া যাইবার জন্য হেনরি মহা হাঙ্গামা করিয়াছিল। পাগলামী প্রায় অন্তর্হিত হইলেও, এই বিষয়ে তাহার আগ্রহ প্রশমিত হয় নাই। এক একসময় বুঝিত অন্যায় আব্দার করিতেছে, কিন্তু তবু আত্মসম্বরণ করিতে পারিত না। শেষকালটা আমি সম্মত করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার স্ত্রী কিছুতেই সম্মতি দিলেন না! তাঁহাকে আমি কত বুঝাইলাম, তাঁহার শপথ স্মরণ করাইলাম, কিছুতেই তিনি শুনিলেন না। এইবার গিরিবালাকে বেথুন স্কুলে পাঠাইয়া দিব ভাবিতেছি, নাহিলে মেয়েটা মূর্খ হইবে যে। গিরির মা যেরূপ কন্যাগত প্রাণ, মেয়ের সঙ্গে যাইতে না চাহিলে হয়। তা. গেলে মন্দ হয় না। তাঁহার বিদ্যার দৌড়—

থাক্ আর ঘরের কথা বেশী প্রকাশ করিব না।

[আশ্বিন, ১৩০৬]

বিষবৃক্ষের ফল

প্রথম পরিচ্ছেদ

কলিকাতা বারাণসী ঘোষের স্ট্রীটে একটি দ্বিতল অট্টালিকা। বাড়ীটি অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, দুর্গন্ধবিহীন। প্রবেশ করিলেই তাহাকে "মেসের বাসা" বলিয়া ভ্রম জন্মে না। সিঁড়িগুলি প্রশস্ত,—জলে কাদায় পিচ্ছিল নহে, অন্ধকার নহে। উপরের কক্ষগুলি কোনটিতে একাধিক শয্যা নাই এবং সেগুলি টেবিল. চেয়ার, পুস্তকাধার, কাঁচের আলমারি প্রভৃতিতে সুসজ্জিত। ভিত্তিগাত্র দুই চারিখানি করিয়া সুরুচিসঙ্গত নয়নাকর্ষক চিত্রে অলঙ্কৃত। গৃহটির সর্বত্রই আরাম ও স্বচ্ছলতার একটা ভাব বিদ্যমান।

এটি কিন্তু মেসের বাসা না হইলেও পুরুষের বাসা বটে। নোনাদীঘির জমিদার বিখ্যাত বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের দুইটি যুবক এ বাটীতে থাকিয়া লেখাপড়া করে। দুইজনের একজন কার্য্যোপলক্ষে বাটী গিয়াছে। যে আছে তাহার নাম চারু, বি-এ ক্লাসে অধ্যয়ন করে। বয়ঃক্রম দ্বাবিংশতি বৎসর। মুখশ্রী স্ত্রীলোকের মত কোমল. ঢল ঢল ভাবাপন্ন, চক্ষু দুইটি সরলতামাখা, দেখিলেই তাহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মে।

আজ জন্মাষ্টমীর ছুটি। কলেজ বন্ধ। আহারান্তে চারু একখানি উপন্যাস হস্তে শয্যাগ্রহণ করিয়া দিবানিদ্রার আয়োজন করিতেছিল, এমন সময় তাহার দুজন বন্ধু বিপিন ও নগেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইল। বিপিন ও নগেন্দ্র চারুর সমবয়স্ক। ইহারা বি-এ পাস করিয়া আইন পড়িতেছে। নগেন্দ্র মহা ধনীর সন্তান, বিপিন মধ্যবিত্ত অবস্থার লোক। ইহারা চারুর ন্যায় সুকোমল নহে। ক্রিকেটে, ফুটবলে খুব নাম; বাল্যকাল হইতে জিমন্যাষ্টিক-পরায়ণ। নব্যতন্ত্রের এক একটি গুণ্ডা বলিলেই হয়। নগেন্দ্র ত দুইবার পাহারাওয়ালাকে প্রহার করিয়া পুলিসকোর্টে জরিমানা দিয়াছে।

চারুকে দেখিয়াই দুইজনে যুগপৎ বলিয়া উঠিল—"কি চারু, শ্বশুরবাড়ী যাওনি?"

চারু শ্বশুরবাড়ী গিয়াছে কি না, এই বিষয় লইয়া নগেন্দ্র ও বিপিন পথে মহা তর্ক-বিতর্ক করিতে করিতে আসিয়াছিল। প্রথমে তাহারা হাসিতে হাসিতে সেই সকল গল্প করিল। তাহার পর নানা কথা আসিয়া পড়িল। কথাবার্তার স্রোত মন্দা হইলে, চারু নগেন্দ্রকে গাহিতে অনুরোধ করিল। নগেন্দ্রর পিতা ওস্তাদ রাখিয়া বাল্যকালে কয়েক বৎসর তাহাকে গীত বাদ্য শিখাইয়াছিলেন—দিব্য গাহিতে পারিত। বলিল—"কি গাইব?"

"আজ জন্মাষ্টমী—একটা কৃষ্ণবিষয় গাও।"

নগেন্দ্র রাগিয়া বলিল—"দেখ তোমার ভণ্ডামীগুলো আমি দুচক্ষে দেখতে পারিনে। নোনাদিঘির বাঁড়ুয্যেরা যে পরম বৈষ্ণব তা আমি জানি। কিন্তু তুমি হতভাগা যে আমাদের চেয়েও যবন, ম্লেচ্ছভাবাপন্ন তাও বিলক্ষণ জানি। তোমার কৃষ্ণভক্তির ভান আমার

অসহ্য।"

বিপিন হাসিয়া বলিল—"অত চট কেন হে? সেদিন তোমাদের বাড়ীতে শ্যামবাজারের নাট্যসমিতি বিষবৃক্ষের যে অভিনয় করেছিল, তাতে হরিদাসী বৈষ্ণবীর গানটি কেমন হয়েছিল বল দেখি?—সেইটি গাও না,—আমার ত ভারি চমৎকার লেগেছিল ভাই।"

চারু বলিল—"খবরদার অশ্লীল গানটান আমাদের বাড়ীতে গেও না—আমরা কৃষ্ণপ্রেমী লোক।"

হাসিয়া নগেন গুণ গুণ করিয়া সুর ধরিল; বিপিনকে জিজ্ঞাসা করিল—"গোড়াটা কি হে?"

"শ্রীমুখ পঙ্কজ—"

নগেন্দ্র গাহিল—

শ্রীমুখ পঙ্কজ দেখব বলে হে,
তাই এসেছিলাম এ গোকুলে।
আমায় স্থান দিও রাই চরণ তলে।

ইত্যাদি।

সুর ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চে উঠিতে লাগিল। চারু ও বিপিন একে একে যোগ দিল। গান খুব জমিয়া গেল। স্তব্ধ মধ্যাহ্ন। নিম্নে পথচারী লোকজন ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া শুনিয়া লইল। একবার—দুইবার—তিনবার গাহিয়া গান শেষ হইল। ক্ষণকাল বিশ্রামের পর নগেন্দ্র আবার গুণ গুণ গুণ করিয়া ধরিল—

মানের দায়ে তুই মানিনী,
তাই সেজেছি বিদেশিনী।

—গানটার নেশা যেন আর কিছুতেই ছুটিতেছে না।

বিপিন হাসিয়া বলিল—"নগেন, তোর বউ মান করেছে নাকি রে? মিন মান করে অত ক্ষেপলি কেন তুই?"

নগেন গান বন্ধ করিয়া বলিল—"আমার বউ ত এখানে নেই। আমার শালীর বিয়ের সময় গেছে এখনও আসেনি।"

"চিঠিতেও ত মান হয়।"

"কি জানি ভাই মান হয়েছে কিনা, এক হপ্তা কিন্তু চিঠি পাইনি।"

"তবে যাও বৈষ্ণবী সেজে গিয়ে মান ভাঙিয়ে এসগে। বেশ গলাটি আছে, গান শোনাবে: যখন পুরস্কার দেবার সময় হবে তখন বলবে, 'ধনি তব মান-রতন দেহ মোয়। যথারীতি 'গদগদ' হয়ে বলবে, হেসে ফেলো না যেন।"

চারু গম্ভীর হইয়া বলিল—"আর ভাই! ইংরিজি শিক্ষার জ্বালায় মান-টান সব দেশ থেকে উঠে গেল।"

এই উৎকট নূতন মন্তব্যটা শুনিয়া নগেন ও বিপিন চমকিয়া উঠিল! বলিল—"কি রকম—কি রকম?"

চারু বলিল—"ইংরিজি পড়ে লোকে যে রকম স্ত্রীবৎসল হয়ে উঠছে—চব্বিশ ঘণ্টা স্ত্রীর 'শ্রীচরণের ছুঁচো' হয়ে পড়ে থাকলে সে বেচারি মান করবার অবসর পাবে কখন বল?"

বিপিন ও নগেন চারুর এই গবেষণায় বিস্মিত হইয়া পড়িল। বিপিন বলিল—"ব্রাভো চারু!—মনোজগতে তোমার এই আবিষ্কার, জড়জগতে কলম্বসীয় আবিষ্কারের চেয়ে একটুও কম নয়।"

নগেন বলিল—"বাঃ চারু! তুই দুদিন বিয়ে করে প্রেমশাস্ত্রে এমন পরিপক্ক হয়ে উঠলি? আমি দু বছরে যে এ তত্ত্ব পাইনি!"

বর্দ্ধিত উৎসাহে চারু বলিল—"মানটা প্রণয়ে অপরাধের দণ্ডস্বরূপ। অপরাধ আবার

যে সে অপরাধ নয়—সন্দেহ হওয়া চাই যে প্রণয়পাত্র অবিশ্বাসী—"

বাধা দিয়া নগেন্দ্র বলিল—"না চারু! তোমার থিওরি ভারি খেলো হয়ে পড়ল। তুমি প্রেমতত্ত্বের কিছু জান না,—তুমি নিরেট মুখ্যু শর্টপিড় ফুল। তুমি ক'বার শ্বশুর-বাড়ী গিয়েছ?"

"এই ত সেদিন গিয়েছিলাম। বল ত আবার যাই।"

"যাও, আজই যাও। বরং আমরাও সঙ্গে যাই।"

বিপিন বলিল—"তীর্থের পান্ডা হয়ে নাকি? বাস্তবিক চারু! তোর বউকে এখনও দেখাতে পারলিনে। এইবেলা দেখা, এখনও কনে আছে। এর পর ধেড়ে মাগী হয়ে উঠলে কি আর দেখাতে পারবি না দেখাতে পাবি?"

চারু বলিল—"কেন? জান ত আমি অবরোধপ্রথার পক্ষপাতী নই। আমি কোন দিন আমার স্ত্রীকে এ বাড়ীতে নিয়ে এসে তোমাদের সকলকে ডিনারে নেমন্তন্ন করব। তাঁর সঙ্গে তোমাদের আলাপ করিয়ে দেব।"

নগেন্দ্র বলিল—"দেখ, ও সব বাজে কথা রেখে দাও। তোমার স্ত্রীকে আমরা দেখতে চাই—এবং অবিলম্বে। চল তোমার শ্বশুরবাড়ী।"

"চল"—বলিয়া চারু ঝটিতি উঠিয়া দাঁড়াইল। চাদর লইয়া ছাতা লইয়া যাইবার ভান করিল।

নগেন বলিল—"ও সব চালাকি নয়। সত্যি আমি একটা মৎলব ঠাউরেছি। ভারি নূতন আর ভারি সাহসিক।"

বিপিন ও চারু বিস্মিত হইয়া নগেন্দ্রনাথের মুখপানে চাহিল।

নগেন্দ্র বলিল—"দেখ চারু, তুমি শ্বশুড়বাড়ীতে দু'তিনবার মাত্র গিয়েছ। একদিনের বেশী কখনও ছিলে না। বাস্তবজীবনে একবার বিষবৃক্ষের অভিনয় করা যাক এস। আমরা তিনজনে বৈষ্ণবী সেজে তোমার শ্বশুরবাড়ীতে গোটা দুই গান শুনিয়ে আসি চল।"

চারু ও বিপিন হাসিল। কারণ এ প্রস্তাবটা কার্য্যে পরিণত করা নিতান্তই অসম্ভব বলিয়া মনে হইল। নগেন্দ্রকে তাহারা সে কথা বলিল।

শুনিয়া নগেন্দ্রর মুখ হইতে তর্কযুক্তির বৈদ্যুতী প্রবাহিত হইল। ফলতঃ অনতি-বিলম্বে চারু ও বিপিনকে তাহার সহিত একমত হইতে হইল।

তাহাদের মন উল্লাসে নাচিয়া উঠিল, উৎসাহে মাতিয়া উঠিল। কি সুন্দর! কি চমৎকার! কি মজা! বাস্তবিক ইহা এমন একটা জিনিষ যাহার জন্য অনেক বিপদের সম্মুখীন হওয়া যাইতে পারে। ভবিষ্যতে গল্প করিবার কত বড় একটা উপাদান হইবে!

এই বিষয়ে বহুক্ষণ ধরিয়া কথাবার্ত্তা হইল। বারুদের স্তূপে আগুন লাগিবামাত্র তাহা যেমন অগ্নিময় হইয়া উঠে, এই নবীন বন্ধুত্রয়ের কল্পনাও তেমনি অগ্নিময়ী হইয়া উঠিল।

চারু বলিল—"আমরা বৈষ্ণবীর সাজপোষাক সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সেটার বিষয় কি ভাবছ?"

নগেন্দ্র বলিল "কেন, আমাদের করুণাময় রয়েছে। সে সাজিয়ে দেবে এখন। সাজ-পোষাকও সব তার আছে।"

"করুণাময় আবার কে?"

"করুণাময়,—আমাদের করুণাময় হে। শ্যামবাজার নাট্যসমিতির ড্রেসিং মাণ্টার। ও সব বিষয়ে সে একজন খুব পাকা লোক।"

"আর, গোটাকতক বৈষ্ণবীর গান শিখে অভ্যাস করে নিতে হবে, শ্রীমুখপঙ্কজটা ত আর সেখানে গাওয়া চলবে না।"

"নিশ্চয় না। সন্দেহ করবে যে। বিষবৃক্ষ আর কোন মেয়ে পড়েনি?"

পরামর্শ সমস্ত ঠিক হইলে বিপিন বলিল—"সব যেন হল, কিন্তু চারুর বউকে কে

চিনিয়ে দেবে?'

নগেন্দ্র বলিল—"তার জন্যে ভাবনা কি? কথায়বার্ত্তায় আমি সে সব বের করে নেব।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এই ঘটনার দুই দিন পরে, বেলা বারোটার সময়, চাঁদপাল ঘাট হইতে নবীনা বৈষ্ণবী-ত্রয়ের নৌকা ছাড়িল।

করুণাময়ের বাহাদুরী আছে বটে। তিনজন যুবাকে সে চমৎকার ছদ্মবেশে সাজাইয়াছে। মুখমণ্ডল হইতে গুম্ফশ্মশ্রুর চিহ্নমাত্র তিরোহিত। চুলেরই বা কি বাহার! কে বলিবে তাহা কৃত্রিম। ছদ্মবেশে সাজাইতে করুণাময় বিশিষ্ট প্রতিভান্বিত।

আন্দুলমৌরি গ্রামে চারুর শ্বশুরালয়। দিবসে চারিবার ষ্টীমার ছাড়ে। ষ্টীমারে এক ঘণ্টার পথ, নৌকায় যাইলে দুই তিন ঘণ্টা লাগে। প্রথম ষ্টীমারে যাইবার পরামর্শ হইয়াছিল। কিন্তু ষ্টীমারে সহস্রলোকের নয়নপথবর্ত্তী হওয়াটা যুক্তিযুক্ত ও নিরাপদ মনে হইল না। তাই যাতায়াতের জন্য একখানি নৌকা ভাড়া করা হইয়াছে।

নৌকাও ছাড়িল, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইতে আরম্ভ হইল। বিপিন বলিল—"বিধাতার কি বিচিত্র লীলা! বিষবৃক্ষ গোড়া থেকেই বিষবৃক্ষ। আকাশে মেঘের ঘটাখানা দেখ একবার। ওহে নগেন্দ্র, তোমার সূর্য্যমুখী কি বলে দিয়েছেন?"

নগেন্দ্র বলিল—"ভার্য্যা সূর্য্যমুখী বলে দিয়েছেন, মেঘ উঠলে ঝড়ের সম্ভাবনা দেখলে নৌকা ঘাটে লাগাতে। মাথার দিব্যি দিয়ে দিয়েছেন। তা, আন্দুলের ঘাটে নৌকা বেঁধে একবার কুন্দনন্দিনীদের বাড়ীতে যাওয়া যাবে এখন।"

চারু কৃত্রিম ক্রোধের সহিত বলিল—"দূর হতভাগা!"

আকাশে মেঘ, গঙ্গাবক্ষে স্নিগ্ধ সমীর-সঞ্চার। দেহ দোদুলামান, মন পুলকপূর্ণ। তিনজনে নৌকার মুখের কাছে বসিয়া ক্ষেপণীর তালে তালে গান আরম্ভ করিল। এই গানগুলো তাহারা দুই তিন দিন ধরিয়া ক্রমাগত অভ্যাস করিতেছে। পরীক্ষার অব্যবহিত-কাল পূর্ব্বে হলে প্রবেশ করিবার সময়, বালকেরা যেমন বহিগুলো একবার শেষবার উল্টাইয়া লয় সেইরূপ আর কি।

বর্ব্বর মাঝিগুলো দাঁড় টানিতে টানিতে সহাস্য নেত্রে উহাদের পানে কটাক্ষপাত করিতে লাগিল। বোধ হয় তাহারা ভাবিতেছিল, এমন আরোহী বহুভাগ্যে মিলে। বিপিন তাহাদের একটা ধমক দিয়া বলিল—"কি দেখছিস্ হাঁ করে?"

গানে গল্পে তিন ঘণ্টার পথ অতিবাহিত হইল। মেঘ মেঘই রহিল, বৃষ্টি হইল না, ঝড়ও উঠিল না। লাভের মধ্যে রৌদ্রক্লেশ নিবারিত হইল।

রাজগঞ্জের ঘাটে নৌকা ভিড়িবামাত্র, বৈষ্ণবী তিনজন এক এক লম্ফে নিম্নে অবতরণ করিল। সুন্দরী স্ত্রীলোকের এইরূপ চপলতা ও তৎপরতা দেখিয়া সমস্ত লোক অবাক হইয়া ইহাদের পানে চাহিয়া রহিল। দুই চারিটা কুরসিকতার বাক্যও বৈষ্ণবীদের কর্ণে আসিয়া প্রবেশ করিল। বিপিন হাসিল, নগেন রাগিল, চারুর কপাল ঘামিয়া উঠিল। রাজগঞ্জের ঘাট হইতে আন্দুলে চারুর শ্বশুরালয় একক্রোশ পথ। চারু বলিল—"একটু ধীরে সুস্থে যাওয়া যাক্ চল। চারটের কমে আমার শ্বশুর ডিস্পেন্সারিতে যান না।"

চারুর শ্বশুর আন্দুলের প্রসিদ্ধ ডাক্তার রমণীমোহনবাবু। বেশ হাতযশ, খুব পশার প্রতিপত্তি। বেলা এগারোটা বারোটার সময় তিনি "কল্" হইতে ফিরিয়া আসিয়া স্নানাহার করেন। তাহার পর একটু বিশ্রাম করিয়া আবার বৈকাল চারিটার সময় বাহির হন। বাজারে তাঁহার ডিস্পেন্সারি আছে, তাহারই তত্ত্বাবধান করিতে যান। আবার সন্ধ্যা সাতটা সাড়ে সাতটার সময় বাড়ী আসেন। চারুর এ সমস্ত জানা ছিল। গৃহস্বামী ভিন্ন অপর কেহ কি চুরি করিতে যাইতে সাহস পায়?

তিন বন্ধু অত্যন্ত ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। পাকা রাস্তা হইতে নামিয়া বনপথ। সঙ্কীর্ণ পথ, দুইধারে বন। এই বনের দৃশ্য কলিকাতাবাসী যুবকগণের পিপাসিত

চক্ষুতে বড়ই ভাল লাগিল। কখনও গাছের পাতা ছিঁড়িয়া বটানি বিদ্যার আলোচনা করে, কখনও কোনও পচা শৈবালময় পুষ্করিণীর তীরে দাঁড়াইয়া বঙ্গদেশের ম্যালেরিয়ার কারণ আবিষ্কার করে, কখনও একটা ভাঙ্গা শিবমন্দিরের সোপানে বসিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদের ন্যায় গাম্ভীর্য্যের সহিত তাহার বয়স নির্ণয় করে, আর কখনও বা একটা বনের ফল তুলিয়া দংশন করিয়া দেখে তাহা আহারযোগ্য কি না। একবার একটা ছেলে সাপ বাহির হইয়া কিলবিল্ করিতে করিতে তাহাদের পায়ের অতি নিকট দিয়া চলিয়া গেল। সাপ দেখিবামাত্র তাহারা আঁৎকাইয়া সাত হাত পিছু হটিয়া গেল এবং ওজস্বিনী ভাষায় সর্প-জাতির বিরুদ্ধে বক্তৃতা ও মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল।

এই সময় হঠাৎ বৃষ্টি আসিল। কোথায় আশ্রয়? চারিদিকে বন। দূরে কেবল একটা ভগ্ন জীর্ণ মন্দির রহিয়াছে। চারু ও বিপিন বলিল—"এই তেঁতুল গাছটার তলায় দাঁড়াই এস। কোথায় ও মন্দিরে যাবে, সাপ আছে না কি আছে!"

নগেন বলিল—"যদি বেশী আসে," বলিয়া সে মন্দির লক্ষ্য করিয়া ছুটিল। চারু ও বিপিন বৃক্ষতলেই দাঁড়াইয়া রহিল। মন্দিরে পৌঁছিয়া নগেন্দ্র দেখিল, ভিতরে কোন দেবমূর্ত্তি নাই, কেবল একটা ছাগল দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। একজন দরোয়ানবেশী ষণ্ডামার্ক খোট্টা সেও ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া প্রবেশ করিল।

নগেন্দ্রকে দেখিয়াই সে ব্যক্তি ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। নগেন্দ্র নিতান্ত আমোদ বোধ করিল। তাহাকে স্ত্রীজনোচিত কোমলতার সহিত জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কে গো?"

"আমার নাম নাথু মণ্ডল। আমি রাজাদের বাড়ীর দারোয়ান।"

এই সময় অন্ধকার করিয়া জলটা খুব জোরে আসিল। সে ব্যক্তি নগেনের কাছে ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। একগাল হাসিয়া বলিল—"বোষ্টমী দিদি তুমি বড় খপসুরত।" নগেন্দ্র সরিয়া দাঁড়াইল এবং বিরক্তির সহিত অন্যদিকে চাহিল। সহসা লোকটা নগেন্দ্রের স্কন্ধে হস্তার্পণ করিল।

মুহূর্ত্তের মধ্যে নগেন্দ্রের বজ্রমুষ্টি প্রচণ্ডবেগে তাহার নাসিকায় পতিত হইল। এই অতর্কিত আঘাতে সে ঠিকরাইয়া দেওয়ালের উপর পড়িল। তাহার নাসিকা দিয়া ঝর ঝর করিয়া রক্ত বহিল।

স্ত্রীলোকের নিকট এ প্রকার মার খাইয়া সে ব্যক্তি প্রথমটা হতভম্ব হইয়া পড়িল। কয়েক মুহূর্ত্ত অতীত হইলে, তাহার রসিকতা দারুণ রোষে পরিণত হইল।

চক্ষু পাকাইয়া দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া সে বলিল—"মেয়েমানুষ হয়ে আমার সঙ্গে লড়বি হারামজাদি? আমি তোকে খুন করে এইখানে পুঁতে ফেলব।"

বলিয়া সে নগেন্দ্রকে আক্রমণ করিল। নগেন্দ্র দুর্বৃত্তটার উপর শিক্ষিত হস্তে ঘুঁসির উপর ঘুঁসি চালাইতে লাগিল। ক্রমে রসিকচূড়ামণি জখম হইয়া পড়িলেন। তখন নগেন্দ্র তাহাকে মন্দিরের কোণে ঠাসিয়া বিপুল বলের সহিত বামহস্তে তাহার বক্ষ এবং দক্ষিণ হস্তে তাহার গলা চাপিয়া ধরিল। সে ব্যক্তি যাতনায় কাতর হইয়া গোঁ গোঁ শব্দ করিতে লাগিল।

জলটা ছাড়িয়া যাওয়াতে এই সময়ে চারু ও বিপিন আসিয়া পৌঁছিল। ব্যাপার দেখিয়া নিমেষের মধ্যে তাহারা সমস্তই বুঝিতে পারিল। বলিল—"নগেন কল্লি কি? শেষে কীচক বধ? ছাড়্ ছাড়্—মরে যাবে বেটা।"

কীচক দেখিল, একজন দ্রৌপদী ছিল, তিনজন হইল—আতঙ্কে তাহার প্রাণ উড়িয়া গেল। কাতর কণ্ঠে বলিতে লাগিল—"ছেড়ে দে মায়ি! দোহাই মায়ি! তোদের পায়ে পড়ি মায়ি!"

নগেন্দ্র বলিল—"আর কখনো করবি এমন কাজ?"

"না মায়ি। আর কখনো করব না মায়ি।"

নগেন্দ্র তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া বলিল—"দে বেটা নাকে খৎ দে। এক হাত মেপে।"

প্রাণের দায়ে নাথু মণ্ডল যথাদিষ্ট কার্য্য করিল।

তাহার পর নগেন্দ্র তাহাকে ধরিয়া ধাক্কা দিয়া পথে নামাইয়া দিল। সে ব্যক্তি খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে কাতরাইতে কাতরাইতে অদৃশ্য হইল।

তিনজনে তখন মন্দিরে দাঁড়াইয়া মহা হাসি। নগেন্দ্র গাত্রের ধূলা ঝাড়িয়া কস্ত্রাদি সুসম্বৃত করিয়া লইল। চারিটা বাজিয়া গিয়াছে, গন্তব্য পথাভিমুখে সকলে অগ্রসর হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অপরাহ্ণকাল। চারুর শ্বশুরবাড়ীতে, রান্নাঘরের রকে বসিয়া বড়বধূ একখানি আধুনিক উপন্যাস পাঠে ব্যাপৃত আছেন। গৃহিণী (চারুর শ্বশ্রূ) এবং একপাল মেয়ে তাহা শ্রবণতৎপর।

গৃহিণী বলিলেন—"বউমা, আর না. বেলা গেল—আজ বই বন্ধ কর।"

নবীনারা বলিল—"তাও কি হয়?—আগে সুবালার সঙ্গে শরৎকুমারের বিয়েটা হোক।"

গৃহিণী বলিলেন—"তবে তোমরা বিয়ে দাও বাছা, আমি উঠি।"

এই সময়ে সদর দরজার বাহিরে শব্দ শ্রুত হইল—"জয় রাধে।"

বড়বউ তাঁহার ছোট মেয়ে সুশীলাকে বলিলেন,—"দেখ্ ত দেখ্ ত কে?"

সুশীলা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিল। সদর দরজাকে আড়াল করিয়া একটুখানি ইণ্টকের প্রাচীর। সুশীলা প্রাচীরের সীমান্তে দাঁড়াইয়া উঁকি মারিয়া বাহিরে দেখিল। পরক্ষণেই পুলকহাস্যের সহিত চীৎকার করিয়া বলিল—"ওমা বোষ্টুমি মা—গান গাইতে এসেছে মা।"

তাহার মা শ্বশ্রূর প্রতি চাহিলেন। তিনি সম্মতিসূচক শিরশ্চালনা করিলেন। বড়-বউ মেয়েকে ইসারা করিয়া বলিলেন—"ডাক্ ডাক্।"

সুশীলা বৈষ্ণবীগণকে লইয়া আসিল।

বৈষ্ণবীগণের বেশবিন্যাস, ধরণধারণ ও উজ্জ্বল প্রদীপ্ত চক্ষু দেখিয়া রমণীমণ্ডলীর মনে একটা সম্ভ্রমের ভাব উদয় হইল। অরক্ষিত অভুক্ত প্রভুবিহীন দেশী বিড়ালের সঙ্গে সযত্নপালিত শুভ্রকান্তি আদরের বিলাতী বিড়ালের যে প্রকার বিভিন্নতা, সচরাচর দৃষ্ট বৈষ্ণবী ভিক্ষুকের সঙ্গে ইহাদের সেই প্রকার বিভিন্নতা অনুভূত হইল।

বৈষ্ণবীরা বারান্দায় উঠিয়া দাঁড়াইল। কোথায় বসিবে? ভূমিতে বসিতে তাহারা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া গৃহিণী একজনকে বলিলেন—"একখানা কম্বল এনে দে।"

বৈষ্ণবীরা কম্বলের উপর উপবেশন করিল। চারু বধূ্ধি করিয়া দুইজনের পশ্চাতে একটু আড়ালে বসিল।

নগেন্দ্র খঞ্জনীতে একটু আওয়াজ দিল। জিজ্ঞাসা করিল—"কি শুনবেন?"

কেহ "গোবিন্দ অধিকারী" কেহ "গোপাল উড়ে" কেহ "দাশুরায়" ফরমাস করিল না। হায়! এখনকার মেয়েরা এ সকলের আস্বাদন কি জানিবে? গৃহিণী বাল্যকালে এ সকল শুনিয়াছেন বটে. কিন্তু তিনিও কুসঙ্গে পড়িয়া তৎসমুদয় বিসর্জ্জন দিয়া বসিয়া আছেন। তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বেই এই সভায় রামায়ণ কিংবা মহাভারতের পরিবর্ত্তে প্রণয়প্রাণ উপন্যাস পাঠ চলিতেছিল। রামায়ণ মহাভারতাদির অপেক্ষা আধুনিক নাটক নভেলই গৃহিণীর বিশেষ রুচিকর লাগিত। যদিও তিনি তাহা মুখে কখনও স্বীকার করিতেন না, তথাপি তাঁহার কন্যারা পুত্রবধূরা ইহা জানিত। তাই তাহারা তাঁহার মৌখিক অনিচ্ছার বিরুদ্ধে আব্দার করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া আনিত। তিনি সারাক্ষণ আগ্রহের সহিত কাণ খাড়া করিয়া সমস্ত শুনিতেন। কিন্তু শেষ হইলে বলিতেন—"কি সব বাপু! ঠাকুর দেবতাদের কথা নয় কিছু নয়!"

যাহা হউক, সকলে পরামর্শ করিয়া বলিল—"আমরা আর কি বলব বাছা! তোমাদের যা ভাল আছে তাই গাও।"

নগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল—"কৃষ্ণবিষয়?"

গৃহিণী বলিলেন—"বেশ, কৃষ্ণবিষয়ই গাও।"

নগেন্দ্র গান আরম্ভ করিল, তাহার পর বিপিন যোগ দিল। সুর যখন উচ্চে উঠিল, তখন পশ্চাৎ হইতে চারু সাবধানে নিজ কণ্ঠ মিলাইল। গানটি জ্ঞানদাসের একটি পদ। শ্রোত্রীগণ তাহার সকল কথা বুঝিতে পারিল না। কিন্তু জ্ঞানদাসের সুমধুর পদবিন্যাস এবং সুকণ্ঠ গায়কগণের মিলিত উচ্ছ্বসিত সুস্বরলহরীতে সকলে একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়িল। দুইবার, তিনবার গাহিয়া তবে গান শেষ হইল।

এই সময় ঝম্ ঝম্ করিয়া আবার বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বড়বধূ বলিলেন—"কি বাছা তোমাদের হিন্দীমিন্দী আমরা সকল কথা বুঝতে পারিনে। এইবার একটা বাংগালা গাও। একটা থিয়েটারের গান গাও না। আজকাল ত কত বোষ্টুমি এসে থিয়েটারের গান গায়—নন্দবিদায়, তবে গিয়ে প্রভাস মিলন. আরও সব কত কি।"

নগেন্দ্র বলিল—"আচ্ছা, একটা আধুনিক গান গাই তবে শুনুন।" এই বলিয়া আরম্ভ করিল —

বঁধুয়া, অসময়ে কেন হে প্রকাশ?
সকলি যে স্বপন বলে হতেছে বিশ্বাস!
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে ছিলে, সেথায় ত সোহাগ মিলে,
এরি মধ্যে মিটিল কি প্রণয়েরি আশ?
এখনো ত নিশি শেষে ওঠেনিক শুক-তারা,
এখনো ত রাধিকার শুকায়নিক অশ্রুধারা!
সেথাকার কুঞ্জগৃহে. পুষ্প ঝরে' গেল কিহে?
চকোর হে সেই চন্দ্রমুখে ফুরায়ে কি গেল হাস?

দুইবার উপর্য্যুপরি গলা ছাড়িয়া গাহিয়া বৈষ্ণবীরা যেন কিঞ্চিৎ শ্রান্ত হইয়া পড়িল। গৃহিণী ইহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"তোমরা একটু জিরিয়ে নাও বাছা,—চেঁচিয়ে ভারি মেহন্নত হয়।"

গান বন্ধ করিয়া কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল। নগেন্দ্র বলিল—"মা ঠাকরুণ.. আপনি ভাগ্যবতী, তার সমস্ত লক্ষণ আপনাতে দেখতে পাচ্ছি।"

কয়েকজন নবীনা ইহা শুনিয়াই বলিয়া উঠিল—"হাঁগা তোমরা কি সামুদ্রিক জান?"

"জানি, কিন্তু হাত দেখতে পারিনে; মুখ, চক্ষু, চুল, কণ্ঠস্বর থেকে কিছু কিছু অনুমান করতে পারি। তা গিন্নিমা, আপনার ছেলেমেয়ে কটি?"

"বাছা, আমার দুটি ছেলে আর তিনটি মেয়ে। এই বড়বউমা; ছোটবউমা বাপের বাড়ী আছেন, বড় মেয়ে মেজ মেয়ে শ্বশুরবাড়ীতে, এইটি ছোট মেয়ে—এর এই সম্প্রতি বিয়ে হয়েছে।" এই বলিয়া গৃহিণী চারুর স্ত্রী কুমুদিনীকে দেখাইয়া দিলেন।

বন্ধুত্রয়ের চোখে চোখে বিদ্যুৎবার্ত্তার আদান প্রদান হইয়া গেল। চারু উভয়ের প্রতি চোখ রাঙাইয়া যেন বলিল—"কি ছেলেমানুষি কর? শেষকালে কি ধরা পড়বে?"

আর একটা গান হইতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া পড়িল। বৈষ্ণবীরা বিদায় চাহিল।

বড়বধূ তাঁহার শ্বশ্রূদেবীর কাণে কাণে গোপনে কি বলিলেন।

গৃহিণী বৈষ্ণবীদিগকে বলিলেন—"তোমরা বাছা আজ নেইবা ফিরে গেলে! রাত্তিরে এখানে থাক; সিধেপত্তর দিই, রাঁধ বাড় খাও দাও। কাল সকালে যেও এখন।"

কি সর্ব্বনাশ! তাহারা রন্ধন করিতে জানে নাকি? আর বাড়াবাড়ি করিলে ধরা পড়িবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। সুতরাং তাহারা সম্মত হইল না।

একজন প্রতিবেশিনী—সম্পর্কে গৃহিণীর নাতবৌ—তিনি বলিলেন—"তোমার যে অন্যায়, দিদি! এই কাঁচা বয়সে ওরা কি আপন আপন বোষ্টম ছেড়ে থাকতে পারে?"

রমণী-সভায় হাসির ফোয়ারা ছুটিল। বৈষ্ণবীরাও পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া হাসিল।

নগেন বলিল—"তা যা বল বাছা, রাত্তিরে আমরা থাকতে পারব না।"

যথাবিধি পুরস্কৃত হইয়া, বৈষ্ণবীরা বাহিরে আসিয়া দেখিল একজন কনেস্টবল দরজার কাছে প্রহরায় নিযুক্ত। ইহাদিগকে দেখিবামাত্র সে হাঁকিল—"জমাদার সাহেব! আসামী নিক্‌লি।"

তিনজন সবিস্ময়ে বৈঠকখানার বারান্দার পানে চাহিল। দেখিল পুলিসের জমাদার সদলবলে আসিয়া বসিয়া আছে।

জমাদার সাহেব হুকুম দিলেন—"গিরেফতার করো।"

এই কথার সঙ্গে সঙ্গে একটা উচ্চ হাস্যধ্বনি শ্রুত হইল। হাস্যকারী আর কেহ নয়, সেই দারোয়ান নাথু মণ্ডল। নিরাপদ ব্যবধানে দাঁড়াইয়া সে নগেন্দ্রকে বলিল—"কি গো বোষ্টুমি দিদি! কুস্তি লড়বি ?"

রাত্রি দশটার সময় চারু তাহার শ্বশুরবাড়ীর একটি শয়নকক্ষে চেয়ারে বসিয়া রহিয়াছে। তাহার কাছে দাঁড়াইয়া তাহার শালাজ—পূর্ব্বকথিত বড়বউ। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন—

"ছি ছি ছি—একি বুদ্ধি চারু? তোমার দুটো বন্ধুকে এনে কি করে তুমি আমাদের বাড়ীসুদ্ধ মেয়েকে দেখিয়ে দিলে? আর তোমার বন্ধুরাই বা কি রকম লোক? কি রকম তাদের আক্কেল? সাহসও ধন্যি! ভদ্রলোকের বাড়ীর ভেতর কি করেই বা ঢুকলো? একটু লজ্জা একটু আত্মসম্ভ্রম নেই?"

চারু বলিল—"আর বউদিদি। যা হবার তা হয়ে গেছে। কিন্তু দোহাই আপনাদের, পায়ে পড়ি, এ কথা যেন বাইরে প্রকাশ করবেন না। তা হলে কিন্তু আর কখনো এমুখো হতে পারব না।"

বড়বধূ একটু অভয়হাস্য হাসিলেন। বলিলেন—"আচ্ছা, বাবা যদি থানায় গিয়ে তোমাদের ছাড়িয়ে না আনতেন তা হলে কি দশা হত তোমাদের ?"

চারু বলিল—"সমস্ত রাত্তির আজ হাজতে পচতে হত। তারপর কাল সকালে যা হয় হত। কিন্তু ভাগ্যিস ব্যাপারখানা কি দেখবার জন্যে বাবা থানায় গিয়েছিলেন!"

"বাবা তোমাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে যান নি। বাড়ী এসেই শুনলেন যে এই রকম হয়েছিল। তখন তাঁর মনে নানা রকম সন্দেহ, নানা রকম আশঙ্কা উপস্থিত হল। তাই তিনি থানায় ছুটে দেখতে গিয়েছিলেন!"

"বাবার কিন্তু আশ্চর্য্য চক্ষু। আপনারা এতগুলো মেয়েতে আমায় চিনতে পারেন নি দিনের বেলায়, আর তিনি রাত্তিরে কেমন আমায় চিনে ফেললেন!"

বড়বধূ হাত নাড়িয়া বলিলেন—"আমরা চিনবো কোত্থেকে, তুমি যে আড়ালে বসেছিলে মশাই! আর একটিও কি কথা কয়েছিলে?—তা হলেও না হয় চেনা সম্ভব হত গলার স্বর শুনে। বাবা তোমার স্বর শুনেই চিনতে পেরেছেন বললেন।"

"বাবার কিন্ত খুব উপস্থিত বুদ্ধি। আমাকে চিনে কোন রকম বিস্ময় প্রকাশ করলেন না;—কিছু নয়। ধীরে ধীরে শান্তভাবে দারোগাকে বললেন—'সাহেব! যে রকম শুনছি তাতে ত দারোয়ানটারই সম্পূর্ণ দোষ। মারের কথা কি বলছ, ও রকম অবস্থায় পড়লে স্ত্রীলোকে খুন পর্যন্ত করেছে এমন কত শোনা যায়। তা এরা ফকিরণী, ভিক্ষে করে খায়, এদের ছেড়ে দাও। নাথু মণ্ডলকে আমি পাঁচটা টাকা বখসিস দিচ্ছি—ও মোকদ্দমা তুলে নিক। আমি ত লজ্জায় মাথা হেঁট করে বাবার সঙ্গে সঙ্গে এলাম। নগেন বিপিন যে অন্ধকারে কোথায় সরে পড়ল কে জানে!"

"বাবাকে সব কথা বুঝিয়ে বলতে তিনি কি বললেন?"

"হাসলেন। পাছে আমি অপ্রতিভ হই তার জন্যে কত রকম কথা বলে আমায় সান্ত্বনা

করলেন। কিন্তু তাঁর প্রতি কথায় আমার মাথা কাটা যেতে লাগল।"

বড়বধূ ঘড়ির পানে চাহিলেন। বলিলেন—"কাল আবার সব গল্প হবে ভাই, আজ রাত্তির হল—কুমিকে নিয়ে আসি।"

চারু বলিল—"কাল আমি থাকব বুঝি? ভোরে উঠে অন্ধকারে অন্ধকারে চম্পট।"

বড়বধূ কৃত্রিম রোষের সহিত বলিলেন—"খবরদার চারু—অমন কাজটি কোরো না—তা হলে পাড়াশুদ্ধ ঢাক পিটিয়ে দেব, খবরের কাগজে পর্যন্ত তুলিয়ে দেব।"

চারু অত্যন্ত শিহরিয়া বলিল—"না না মাফ করুন, মাফ করুন, বিনা অনুমতিতে আমি যাব না।"

"এই সুবুদ্ধির কথা বলেছ। যাই কুমিকে তুলে আনি।" এই বলিয়া বউদিদি প্রস্থান করিলেন।

চারু বসিয়া একখানা পুস্তক উল্টাইতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে বাহিরে ঝম্ ঝম্ করিয়া মলের শব্দ উঠিল। চারুর বক্ষশোণিতও সেই তালে তালে নৃত্য করিতে লাগিল।

দুয়ারের কাছে আসিয়া মলের শব্দ থামিয়া গেল। বড়বধূর স্বর শুনা গেল, রাগিয়া বলিতেছেন—"দাঁড়ালি কেন লা পোড়ারমুখি? সঙ আর কি! দিনে দিনে কচি খুকি হচ্ছেন। দেখে আর বাঁচিনে।" এই বলিয়া তিনি কুমুদিনীকে ঠেলিয়া ঘরে ঢুকাইয়া দিলেন। বেচারি পড়িতে পড়িতে সামলাইয়া গেল।

[কার্ত্তিক, ১৩০৬]

প্রিয়তম

॥ ১ ॥

প্রিয়তমার সঙ্গে তরঙ্গিণীর সম্বন্ধটা একটু অদ্ভুত রকমের—তাহাকে ঠিক সখিত্ব বলা যাইতে পারে না। তাহারা পরস্পরের প্রতি প্রণয়ী ও প্রণয়িণীর মতই আচরণ করিত। তাহাদের পত্রগুলি প্রেমলিপি ছাড়া আর কিছুই নহে। তাহাতে আদর সোহাগ ও মান অভিমানের প্রাচুর্য্য থাকিত। দেখা হইলে দুইজনে নিভৃত স্থানে গিয়া উপবেশন করিত; কোনও তৃতীয় ব্যক্তির সাক্ষাতে তাহাদের মুখে কথা ফুটিত না। তরঙ্গিণী কতদিন প্রিয়তমার গলা ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছে—'প্রিয়, ভাই, আমাকে বেশী ভালবাসিস না তোর বরকে?' প্রিয়তমা বলিয়াছে—'তোকে।' একদিন প্রিয়তমা তাহার স্বামীর প্রতি অধিক অনুরাগ ব্যক্ত করিয়াছিল, সেদিন আর তরঙ্গিণী অন্নজল মুখে তুলিল না। কত করিয়া তবে প্রিয়তমা সখীর মান ভাঙ্গাইল। সেই অবধি প্রিয়তমা কপটতাচরণ আরম্ভ করিয়াছে।

তরঙ্গিণী সপ্তদশবর্ষীয়া যুবতী। তাহার পরিধানে কালাপেড়ে দেশীয় সূক্ষ্ম বসন এবং হাতে সোণার চুড়ী আছে বটে, কিন্তু সীমন্তে সিন্দূর নাই। আট বৎসর বয়সে বিবাহিত হইয়া নয় বৎসর বয়সে সে বিধবা হইয়াছে।

তরঙ্গিণী যখন প্রথম শ্বশুরগৃহবাসে আসে, তখন তাহার সঙ্গিনীর মধ্যে ছিলেন শুধু শ্বাশুড়ী ও দিদিশ্বাশুড়ী। প্রিয়তমা তাহাদের প্রতিবেশিনী, কিন্তু তাহার সাহচর্য্য লাভ প্রথমেই হয় নাই, সেও তখন নিজ শ্বশুরালয়ে ছিল। প্রিয়তমা ফিরিয়া আসিলে প্রথম সাক্ষাতেই তরঙ্গিণী তাহাকে ভালবাসিল।

বিধবা বালিকা তাহার ক্ষুধিত হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা সখীর প্রতি অর্পণ করিল। তাহাকে সে কখনও ডাকিত প্রিয় বলিয়া, কখনও বলিত প্রিয়তম। চিঠিতেও তাহাকে প্রিয়তমা না বলিয়া, প্রিয়তম বলিয়া সম্বোধন করিত। প্রতি সন্ধ্যায় নিজ নিজ ছাদে উঠিয়া পরস্পরের সহিত দেখা হইত, তাহা ছাড়া তরঙ্গিণী প্রতিদিন প্রিয়কে চিঠিও পাঠাইত। তরঙ্গিণীর শ্বশুরালয়, কিন্তু প্রিয়তমার পিত্রালয়। প্রিয়তমা মনে করিলেই তরঙ্গিণীর

কাছে আসিতে পারিত; প্রকাশ্য রাজপথ অতিক্রম করিতে হইত না। খিড়কী খুলিয়া পুকুরের ধার দিয়া বাগানের ভিতর দিয়া তরঙ্গিণীদের খিড়কী দরজায় উপস্থিত হইবার সুযোগ ছিল। পথ উভয়ের সমান, কিন্তু তরঙ্গিণীর শ্বাশুড়ী তাহাকে কোথাও যাইতে আসিতে দিতে ভালবাসিতেন না। তাহাতে কিছু ক্ষতি ছিল না; তরঙ্গিণীদের বাড়ীটি অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত ও নির্জ্জন হওয়াতে এইখানেই দুই সখীর বিশ্রম্ভালাপের, আমোদ প্রমোদের সুবিধা হইত।

তরঙ্গিণীর ভালবাসার অত্যাচার প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল—কিন্তু প্রিয়তমা সে সমস্ত সকরুণ সহিষ্ণুতার সহিত সহ্য করিতে থাকিল। সে ভাবিত আমার স্বামী আছে, ভালবাসার পাত্র আছে; আহা তরঙ্গিণীর যে কেহ নাই, কিছু নাই। তাই সব সময় মনে না আসিলেও মুখে তাহাকে আদর করিত।

প্রিয়তমা তরঙ্গিণীকে সচরাচর বলিত তরী, কখনও বলিত তরণী, কখনও বলিত সাধের তরণী। একবার শ্বশুরবাড়ীতে থাকিতে থিয়েটারে 'মৃণালিনী'র অভিনয় দেখিয়াছিল; সে অবধি মাঝে মাঝে সে তরঙ্গিণীর গলাটি ধরিয়া হাসিতে হাসিতে গান করে—

সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে।

প্রিয়তমা শুধু তরঙ্গিণীকে আদর করিয়াই নিস্কৃতি পাইত না। তরঙ্গিণী যেমন কথায় কথায় তাহার উপর অভিমান করিত, প্রিয়তমাকেও সেইরূপ করিতে হইত। যদি কোনও দিন রাগ না করিত, তাহা হইলে তরঙ্গিণী বলিত—'তোমার ত বয়ে গেল। তুমি কি আমাকে ভালবাস যে রাগ করবে?' প্রথম প্রথম এই মৌখিক মান অভিমান প্রিয়তমার নিকট অত্যন্ত বিসদৃশ মনে হইত, কিন্তু ক্রমে সমস্ত বেশ অভ্যস্ত হইয়া গেল। নিতান্ত কর্ত্তব্য পালন করিতেছি বলিয়া আর মনে হইত না।

॥ ২ ॥

সন্ধ্যার অনতিপূর্ব্বে একটি নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া তরঙ্গিণী আপনার মনে গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতেছিল—

"দারুণ মানেরি ভরে করেছি তার অপমান।
কোথায় সে গেল সখি, আন্ তারে ডেকে আন্।"

তরঙ্গিণীর কণ্ঠবিনিঃসৃত মৃদুতান ভ্রমর গুঞ্জনের মত শুনাইতেছিল। আজ প্রভাতে যখন প্রিয়তমা তরঙ্গিণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল তখন তরঙ্গিণী রাগে তাহার সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কহে নাই।—প্রিয়তমা কাঁদকাদ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে। অন্য দিন তাহারা দিনে দশবার করিয়া নিজ নিজ ছাদে উঠিয়া পরস্পরকে দর্শন করে; আজ সারাদিন তরঙ্গিণী প্রায় ছাদেই যাপন করিয়াছে, তথাপি একটিবারও প্রিয়তমার দেখা পায় নাই। নিরাশ হইয়া তরঙ্গিণী এইমাত্র ছাদ হইতে নামিয়া আসিয়াছে। সন্ধ্যা হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই। তরঙ্গিণী একবার ভাবিল প্রিয়কে একখানা চিঠি লেখে। কিন্তু আজ প্রভাতে তাহার অভিমানের কারণ, পূর্ব্বদিনে লিখিত পত্রখানির উত্তর না পাওয়া। সুতরাং চিঠি লিখিতে তরঙ্গিণী ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। অথচ সকাল-বেলার আচরণটা নিতান্তই রূঢ় হইয়াছে। কিন্তু প্রিয়তমারও কি যথেষ্ট দোষ নাই? প্রিয়তমার স্বামী আসিয়াছে সত্য; তাই বলিয়া কি সে একটিবার ছাদে আসিবার অবসর পায় না? আর তরঙ্গিণী যে রাগ করিল, তা কাহার দোষ? প্রিয়তমারই ত দোষ! কেন সে নিয়মিত সময়ে পত্রোত্তর দেয় নাই? স্বামী কি তাহার হাত বাঁধিয়া রাখিয়াছিল? না, কলম ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল? না, কালি ফেলিয়া দিয়াছিল?

ক্রমে অন্ধকার হইল। দাসী আসিয়া টেবিলের উপর একটি জ্বলন্ত বাতি রাখিয়া গেল। তরঙ্গিণী টেবিলের সম্মুখে বসিয়া, বাক্সটি খুলিয়া চিঠি লিখিবার সরঞ্জাম বাহির করিল। একখানি সুন্দর রঙীন কাগজ লইয়া চিঠি লিখিল। তরঙ্গিণী উত্তম

লেখাপড়া জানিত। বিধবা হওয়া অবধি ছয় বৎসরকাল সে পিত্রালয়ে ছিল। তাহার দাদা তাহাকে সযত্নে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন; তিনি ভাবিয়াছিলেন, জ্ঞানচর্চ্চা করিবার অবসর পাইলে দুঃখিনী ভগিনীটির আজন্মবৈধব্য তবু কিয়ৎ পরিমাণে সহনীয় হইবে।

চিঠিখানি শেষ করিয়া তরঙ্গিণী সেখানিকে খামের মধ্যে পুরিল। শিরোনামা লিখিবার পূর্ব্বে আর একবার ভাবিল চিঠি পাঠাইবে কিনা। এ কি পায়ে ধরিয়া মানভিক্ষা করা হইতেছে না?

এই সময় তরঙ্গিণীর মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করিতে আরম্ভ করিল। হিষ্টিরিয়ার পূর্ব্বলক্ষণ। পনেরো বৎসর বয়স হইতে মাঝে মাঝে তাহার হিষ্টিরিয়া হইতেছে। বেশী অধ্যয়ন অথবা বেশী চিন্তা করিলে, কিংবা বেশীক্ষণ মন খারাপ করিয়া থাকিলে এই রোগ তাহাকে আক্রমণ করিত। আজ ত সারা দিনটা সে মন খারাপ করিয়াই আছে। ডাক্তারেরা পরামর্শ দিয়াছিল, রোগ আসন্ন জানিতে পারিলে শীতল জল পান করিবে এবং মুখে চক্ষে জলের ঝাপটা দিবে। ঘরের কোণে জল রাখা ছিল. তরঙ্গিণী জল পান করিয়া মুখে চোখে জল দিয়া চেয়ারে আসিয়া বসিল। কিন্তু আক্রমণ রোধ করিতে পারিল না। চেয়ারে অজ্ঞান হইয়া পড়িল। হাত পা ছুঁড়িতে লাগিল। ক্রমে চেয়ার সুদ্ধ সশব্দে মেঝেতে পড়িয়া গেল।

তরঙ্গিণীর এই ব্যাধি আছে বলিয়া, বাটীর লোক সর্ব্বদা সতর্ক থাকিত। পাশের ঘরে এক দাসী ছিল. সে শব্দ শুনিয়া ছুটিয়া আসিল। ব্যাপার দেখিয়া তৎক্ষণাৎ নিম্নে সংবাদ দিল।

গতকল্য তরঙ্গিণীর খুড়শ্বশুর হৃদয়নাথবাবু স্ত্রী পুত্র লইয়া বাটী আসিয়াছেন, পুত্র সুধীরচন্দ্রের শুভ উপনয়ন।

তরঙ্গিণীর শাশুড়ী তখন মাকে লইয়া পাল্কী করিয়া সুধীরের উপনয়নে পাড়ার মেয়েদের নিমন্ত্রণ করিতে বাহির হইয়াছেন। বাড়ী ছিলেন শুধু নবাগতা ছোটকাকী। তিনি ছুটিয়া আসিলেন। তাঁহার এক বোনের হিষ্টিরিয়া আছে; মূর্চ্ছাভঙ্গ করিবার নিয়মাদি সব তাঁহার জানা ছিল। ঝির সাহায্যে তরঙ্গিণীকে উঠাইয়া পালঙ্কের উপর শয়ন করাইলেন এবং চেতনা সম্পাদনের জন্য সচেষ্ট হইলেন। হঠাৎ নিকটস্থ টেবিলের উপর রঙীন খামখানির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। দক্ষিণ হস্তে তরঙ্গিণীকে পাখা করিতে করিতে, বাম হস্তে খামখানি তুলিয়া লইলেন। অঙ্গুলি সাহায্যে চিঠিখানি বাহির করিয়া খামখানি টেবিলের উপর ফেলিয়া দিলেন। চিঠির ভাঁজ খুলিয়া আলোকে পড়িলেন—'প্রিয়তম'!

তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। হাত পা অবশ হইয়া আসিল। নিঃশ্বাস জোরে বহিতে লাগিল। ঝিকে বলিলেন, "তুই বাতাস কর্, আমি শীগগির আসছি।"—বলিয়া পাখা ফেলিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

ইঁহার স্বামী হৃদয়নাথ মীরাটের প্রধান ডাক্তার। বিলক্ষণ উপার্জ্জন করেন। লোকটি পরম হিন্দু। এক সময়ে নাকি গোমাংসও ইঁহার উদরস্থ হইয়াছিল; কিন্তু সে সব ভূত-কথা। আপাততঃ তাঁহার মস্তকে একটি প্রকাণ্ড 'শিখা' দোদুল্যমান। স্ত্রীশিক্ষার অত্যন্ত বিরোধী। ইঁহার প্রথমা পত্নী পরলোকগতা। সুধীর সেই প্রথমার গর্ভজাত। এই দ্বিতীয় সংসারটি এখনও কোন সন্তান-সন্ততি সংসারে আনিতে কৃতকার্য্য হন নাই। আর বড় আশাও নাই কারণ ইঁহার বয়ঃক্রম এখন পঞ্চবিংশতি বর্ষ হইয়াছে।

হৃদয়নাথ একটি ঘরে একাকী বসিয়া কি লিখিতেছিলেন, সহসা তাঁহার পত্নীকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার স্ত্রী চিঠিখানি তাঁহার হাতে দিয়া বলিলেন, পড়।"

হৃদয়নাথ চশমা-আঁটা চক্ষু দুইটি স্ত্রীর পানে ফিরাইয়া বলিলেন, "ব্যাপারখানা কি?"

"দেখ না পড়ে।" "কে লিখেছে?"

"যেই লিখুক—দেখ না।"

হৃদয়নাথ চিঠিখানি অনুচ্চস্বরে পাঠ করিলেন ঃ—

প্রিয়তম,

তুমি এমন নিষ্ঠুর? এই তুমি আমায় ভালবাস? আমি যদি রাগ করি, অভিমান করি, তাহা হইলে কি তুমি সে অভিমান ভাঙ্গাইবে না? ফেলিয়া চলিয়া যাইবে? কাল সকালে আমি তোমাকে যে চিঠি লিখিয়াছিলাম, তার জবাব দাও নাই কেন? তাইত আমি রাগ করিয়াছিলাম, তাইত তোমার সঙ্গে দেখা হইলে ভাল করিয়া কথা কহিলাম না। আমি কেন রাগ করিয়াছিলাম, তাহা কি তুমি জানিতে না? যদি না জানিতে তবে জিজ্ঞাসা করিলেও ত পারিতে। তুমি চলিয়া গেলে পর আমার ভারি কষ্ট হইল। আজ প্রায় সারাদিন আমি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া ছাদে কাটাইলাম, তুমি তোমাদের ছাদে আসিলে না কেন? শেষে আমি মান খোয়াইয়া তোমাকে চিঠি লিখিতে বসিয়াছি। তুমি যদি আমার বেদনা না বুঝিবে তবে কে বুঝিবে প্রিয়তম? তোমার সাধের তরণী বুঝি পুরাণো হইয়াছে, তাই এ অনাদর?

তোমারই।

চিঠি পড়িয়া হৃদয়নাথ বলিলেন, "এ কার চিঠি?"

"কার আবার, মেজবউয়ের।"

"আমাদের মেজবউমার?"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তোমাদের মেজবউমার। সর্ব্বনাশী শেষে এই করলে! কুলে কালি দিলে! এ ত আমি তখনি জানি। যার কপাল পুড়েছে, তার আবার কালাপেড়ে কাপড় পরা কেন? গহনা পরা কেন? পাণ খাওয়া কেন?"

স্ত্রীর বক্তৃতা-স্রোতে হৃদয়নাথ বাধা দিয়া বলিলেন, "দেখ, তুমি ঠিক জান এ তাঁরই হস্তাক্ষর?"

"তোমার কথা শুনে গা জ্বলে যায়! এ আবার নতুন করে জানতে হবে নাকি? আজ চার বচ্ছর ধরে যে কালামুখী আমায় চিঠি লিখছে।"

"তা হলে, এখন কি হয়?"

"কি হয়, ঝাঁটা মেরে বাড়ী থেকে বিদায় করে দাও। কাশীতে পাঠিয়ে দাও।"

"লোকে শুনবে না?"

"শুনতে কি কারু বাকী থাকবে? তুমি কার মুখে সরা চাপা দেবে?"

হৃদয়নাথ স্ত্রীর হস্তে পত্রখানি প্রত্যর্পণ করিয়া কিয়ৎকাল চিন্তা করিলেন। শেষে বলিলেন, "দেখ, বোধ হয় তা নয়; এমনটাই কি হতে পারে?"

"না তা কি আর হতে পারে? তুমি যেমন ভালমানুষটি, সবাইকে নিজের স্ত্রীর মত সতীলক্ষ্মী মনে কর।"

হৃদয়নাথের ওষ্ঠপ্রান্তে মুহূর্ত্তের জন্য একটু মৃদুহাস্য খেলিয়া গেল। বলিলেন, "দেখ, আমার ত সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয় না যে, বউমা পাপে ডুবেছেন। আর যদি, তুমি যা বলছ তাই হয়, তা হলে এখনও হয়ত উনি ধর্ম্মচ্যুত হননি, হবার উপক্রম হয়েছে মাত্র।"

"উপক্রম হয়েছে মাত্র বইকি! তুমি বুঝি ভেবেছ শুধু চিঠিপত্র চলেছে?"

"আমার ত তাই মনে হয়।"

"যেমন তোমার বুদ্ধি, তার উপযুক্ত কথাই বলেছ। কেন, চিঠিতে ত স্পষ্ট লেখাই রয়েছে!"

"কি লেখা রয়েছে?"

"তবে কি পড়লে চিঠি? তুমি ত নিজে পড়েছ, আমি শুধু শুনেছি। চিঠিতে ত লেখাই রয়েছে 'তোমার সঙ্গে যখন দেখা হল তখন ভাল ক'রে কথা কইলাম না।' শুধু কি চিঠি চলেছে? দেখাশুনো হয়েছে সব হয়েছে।"

এই সময় ঝি আসিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে সংবাদ দিল—"ছোটমা শীগগির এসগো, মেজ-

বউমা বড্ড কি রকম করছেন।"

ছোটগিন্নি ঝির সহিত চলিয়া গেলেন। হৃদয়নাথ একাকী বসিয়া নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। ইঁহার প্রকৃতিটি কিছু শীতল। মনোবৃত্তিগুলি সহসা উত্তেজিত হয় না; কোনও একটা বিষয়ে সহসা বিশ্বাস স্থাপন করেন না। কিন্তু যে প্রকারে হউক, একবার তিনি জাগ্রত হইলে, কোনও বিষয়কে সত্য বলিয়া স্থির করিলে, আর কিছুতেই তাহা হইতে স্খলিত হন না। ভ্রাতুষ্পুত্রবধূর সম্বন্ধে তিনি অনেক চিন্তা করিতে লাগিলেন। যে আজন্মবিধবা, সংসারের শত প্রকার প্রলোভন অতিক্রম করিয়া স্বীয় ব্রহ্মচর্য্যব্রত অক্ষুণ্ণ রাখা তাহার পক্ষে একান্ত কঠিন বটে। তাহাতে আবার তরঙ্গিণী লেখাপড়া জানে। স্ত্রীশিক্ষার বিপক্ষে যে সমস্ত তর্ক উত্থাপিত হইয়া থাকে তাহাদের মধ্যে একটি এই যে, স্ত্রীলোক লিপিলিখনক্ষম হইলে সমাজে অপবিত্র প্রণয়ের প্রসার বৃদ্ধি হইবে। হৃদয়নাথ স্বচক্ষে ইহার প্রমাণ দেখিয়া অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়িলেন। স্ত্রীশিক্ষাবিদ্বেষ তাঁহার মনকে তরঙ্গিণীর বিরুদ্ধে প্রতি মুহূর্ত্তে বিষাক্ত করিতে লাগিল। ভাবিলেন, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে ইহা বলা উচিত কি না। না বলিলেও ত প্রতিকারের কোনও সম্ভাবনা নাই। এখানে তরঙ্গিণীকে রাখা আর কোনও মতে চলিতে পারে না। আজিও জানাজানি হয় নাই; কিন্তু ব্যাপার যেরূপ গড়াইয়াছে, তাহার ত আর অধিক বিলম্বও নাই। তখন যে সমাজে মুখ দেখান দুষ্কর হইবে। পুত্রকন্যাগণের বিবাহ দেওয়াও কঠিন হইবে। উহাকে স্থানান্তরে পাঠাইলেই বা ফল কি? যেখানে যাইবে, সেখানেই মরিবে।

যখন রাত্রি আটটা বাজিল, তখন বড় গৃহিণী ও তাঁহার জননী ফিরিয়া আসিলেন। তিনি বধূগতপ্রাণা। তরঙ্গিণীর মূর্চ্ছার সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ উপরে গেলেন। গিয়া দেখেন তখনও মূর্চ্ছাভঙ্গ হয় নাই। ঝি ও ছোটগিন্নি তাহার শুশ্রূষা করিতেছে।

এমন ত কখনও হয় না, এতক্ষণ ত মূর্চ্ছা কখনও থাকে না। এ কি সর্ব্বনাশ হইল?

কখন মূর্চ্ছা হইয়াছিল, তাহার পর হইতে কি কি উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে, সমস্ত খুঁটিনাটি জিজ্ঞাসা করিয়া গৃহিণী বলিলেন, 'ভারি অন্যায় হয়েছে।' ছোটগিন্নীকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, অতক্ষণ ধরিয়া একা ঝির হাতে রোগীকে সমর্পণ করিয়া যাওয়া ভাল হয় নাই।

ঝি বলিল, "বাছা, আমার গায়ে কি ক্ষ্যামতা আছে? আমি কি একলা ওনারে ধরে রাখতে পারি? হাত পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে গড়িয়ে খাট থেকে দুম্ করে প'ড়ে গেলেন, সেই অবধি মুখে একটু একটু রক্ত উঠছে।"

ক্রমে কর্ত্তা বাড়ী আসিয়া সকল কথা শুনিলেন। শুনিয়া বলিলেন, "হৃদয়, তুমি এতক্ষণ কি করছ?—যাও যাও, কিছু বিহিত কর। ক্রমেই যে কেস খারাপ হয়ে যাচ্চে।"

হৃদয়নাথ অনিচ্ছুকের মত রোগিণীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরীক্ষার পর বলিলেন, পড়িয়া গিয়া হৃদ্‌পিণ্ডস্থ রক্তকোষে আঘাত লাগিয়াছে।

সমস্ত রাত্রি ধরিয়া তরঙ্গিণীর চিকিৎসা ও শুশ্রূষা চলিতে লাগিল।

॥ ৩ ॥

প্রিয়তমার স্বামীর নাম অনঙ্গমোহন। গ্রীষ্মাবকাশে কলেজ বন্ধ হওয়ায় সে কল্য প্রভাতে শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছে। তরঙ্গিণীর সহিত প্রিয়তমার সখিত্ব সংবাদ সে পত্রেই পাইয়াছিল। মিলনের প্রথম রাত্রে তাহারা পরস্পরকে লইয়া বিভোর, তরিঙ্গণীর কথা কহিবার অবসর পায় নাই। পরদিন রাত্রি দশটার সময় প্রিয়তমা স্বামীর নিকট আসিল। প্রথম কথাবার্ত্তার পরই অনঙ্গ বলিল, "তোমার তরঙ্গিণীর চিঠিপত্র দেখাও না।"

প্রিয়তমা বলিল, "সে কি দেখাতে পারি? সে যে বারণ ক'রে দিয়েছে কারুকে

দেখাতে।"

অনঙ্গ বলিল, "আমি বুঝি কারুর মধ্যে গণ্য হলাম! আমাকে দেখাতে হবে।"

প্রিয় বলিল, "তবে তরীকে জিজ্ঞাসা করি আগে।"

"সে যদি হুকুম না দেয়?"

"না দেয় ত কেমন করে দেখাব?"

অনঙ্গ রাগ করিল। বলিল, "না দেখাও না দেখাবে। আমি তোমার পর, সেই তোমার আপনার।"

প্রিয়তমা এ কথায় প্রতিবাদ না করিয়া নীরব হইয়া রহিল।

পরদিন গিয়া সে তরঙ্গিণীকে সব কথা বলিল। তরঙ্গিণী বলিল, "না ভাই না ভাই, লক্ষ্মীটি আমার, তোর পায়ে পড়ি, চিঠি তাঁকে দেখাসনে।"

সে রাত্রে অনঙ্গমোহন স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, "হুকুম পেলে?"

প্রিয় বলিল, "না, সে ত কিছুতেই রাজি হয় না।"

ইহাতে তাহার স্বামী ভারি অভিমান করিল। আজকালকার দিনে লিখিতে লজ্জা হয়—আমাদের স্ত্রীবৎসল যুবা নায়কটি বালকের মত অশ্রুপাত করিতে লাগিল।

প্রিয়তমা তখন বাক্স হইতে চিঠির বাণ্ডিল বাহির করিয়া আনিয়া স্বামীর হাতে দিয়া বলিল, "ওগো দেখ গো দেখ। অত দুঃখুতে কায নেই।"

অনঙ্গ চিঠির বাণ্ডিল দূরে ফেলিয়া দিল। বলিল, "যাও আমি দেখতে চাইনে।"

এই অপমানে প্রিয়তমা মর্ম্মাহত হইল। মেঝের উপর বসিয়া চোখে আঁচল দিয়া কাঁদিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ তাহাকে তদবস্থ থাকিতে দেখিয়া অনঙ্গের রাগ ভাঙ্গিল। স্ত্রীর কাছে গিয়া বলিল, "ওগো কাঁদতে হবে না।"

ইহাতে প্রিয়তমা আরও বেশী কাঁদিতে লাগিল। অনঙ্গ তখন নানাপ্রকারে স্ত্রীকে আদর করিয়া সান্ত্বনা করিয়া তাহাকে সুস্থ করিল। চিঠির বাণ্ডিলটি কুড়াইয়া আনিয়া প্রথম চিঠিখানির প্রতি চক্ষু রাখিয়া বলিল, "তরঙ্গিণীর ত হাতের লেখাটি বেশ, না?"

"খাসা লেখা, ঠিক পুরুষমানুষের মত!"

"আচ্ছা তুমি দু' চারখানি ভাল ভাল চিঠি বেছে দাও, আমি পড়ি।"

প্রিয়তমা একখানি নির্ব্বাচন করিয়া বলিল, "এইখানা পড়।"

অনঙ্গ যতক্ষণ সেখানি পড়িতে লাগিল, প্রিয়তমা ততক্ষণ আরও খানকয়েক চিঠি বাছিয়া বাছিয়া স্বামীর হাতে দিল। অনঙ্গ সবগুলি একে একে পড়িয়া মুখখানি বিমর্ষ করিয়া রহিল।

প্রিয়তমা জিজ্ঞাসা করিল, "ভাবছ কি?"

অনঙ্গ বলিল, "দেখ, তুমি আর তোমার সখীর সঙ্গে ভাব রাখতে পাবে না।"

"কেন?"

"না। এ যে রকম চিঠি, তাতে যদি আমি সব না জানতাম, ত মনে করতাম প্রণয়ের চিঠি।"

"কেন সখীতে সখীতে প্রণয় কি দোষের?"

"দোষের কি না সে বিচারে কায নেই। আমি ছাড়া আর কাউকে তুমি ভালবাসতে পাবে না। কোনও সখীকে এতদূর ভালবাসলে আমার প্রাপ্য ভালবাসায় কম পড়ে যাবে।"

প্রিয়তমা হাসিয়া বলিল, "তুমি পাগল নাকি?"

"হাসির কথা নয়, আমার প্রাণটা কেমন করছে এ সব চিঠি পড়ে। সখীতে সখীতে এ রকম চিঠি লেখালেখি করে কস্মিনকালে আমি স্বপ্নেও জানতাম না।"

"সে যে নিত্যি আমায় চিঠি লেখে, তাকে জবাব না দিলে সে আবার রাগ করবে।"

"তা করে করবে।"

"তার আবার যে অভিমান! কথায় কথায় অভিমান করে। কাল আমাকে একখানা চিঠি লিখেছিল; অবসর পাইনি ব'লে তার জবাব দিতে পারিনি; রোজ সন্ধ্যেবেলা ছাদে উঠি, দুজনে দেখা হয়। কাল সন্ধ্যেবেলা আর সে ছাদে পর্যন্ত উঠল না। সকাল-বেলা আজ কাউকে না বলে কয়ে তাদের ওখানে গিয়েছিলাম; আমার সঙ্গে কথাই কইলে না, এত রাগ। আমি বললাম, 'ভাই কেন রাগ করিস—জানিস ত, অবসর পাইনে।' বললে, জানি গো জানি তোমার স্বামী এসেছেন। তাই তুমি অবসর পাও না। আমরা বিধবা মানুষ, আমাদের সদাই অবসর।'—কথাটা শুনতে আমার এমন খারাপ লাগল; আমি চ'লে এলাম। আমিও আজ ছাদে যাইনি, প্রতিশোধ নিচ্ছি। কেন আমি কি রাগ করতে জানিনে?"

ভোর রাত্রে এই দম্পতী সবেমাত্র জাগিয়া কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিয়াছিল। প্রিয়তমার মা দুয়ারের কাছে আসিয়া ডাকিলেন—"পিরি।"

প্রিয়তমা উঠিয়া গিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল।

মা বলিলেন, "শোন্ একটা কথা বলি।"

মার কণ্ঠস্বরে ও ভাবভঙ্গিতে প্রিয়তমা শঙ্কিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি মা? কি হয়েছে?"

মা তাহাকে বারান্ডায় লইয়া গিয়া বলিলেন, "তরীর বড় ব্যামো। তাদের ঝি তোকে ডাকতে এসেছে।"

প্রিয়তমা রুদ্ধশ্বাসে বলিল, "কি ব্যামো মা? কই ঝি?"

"ওঘরে বসে রয়েছে। আয়, তোকে নিয়ে যেতে চাচ্চে।"

মাতা কন্যাতে একটি ঘরে প্রবেশ করিল। তরঙ্গিণীদের ঝি দাঁড়াইয়া ছিল। প্রিয়তমাকে দেখিয়া সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "দিদিমণি, মেজবউ বুঝি আর বাঁচে না। তোমাকে দেখতে চাইচে। যখনি জ্ঞান হচ্চে, তখনি শুধু তোমার নাম করে ডাকচে। চল শীগগির।"

এ সংবাদ শ্রবণে প্রিয়তমার হস্ত পদ ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। জননীর অনুমতি লইয়া ঝির সহিত সে তরঙ্গিণীর কাছে চলিল।

যখন তরঙ্গিণীর বাটীর খিড়কী দরজায় পৌঁছিল, তখন ক্রন্দনের রোল তাহাদের কর্ণে গেল।

ঝি বলিল—"যাঃ সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে গো! হায় হায় হায়।"

প্রিয়তমা সেখান হইতেই ফিরিল। ঝির কাঁধে ভর দিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল।

॥ ৪ ॥

এক মাস পরে হৃদয়নাথ বাটীর সকলকে লইয়া মীরাট যাত্রা করিলেন। বাড়ীতে রহিলেন কেবল তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা এবং তাঁহার শাশুড়ী।

জ্যৈষ্ঠ মাস, মীরাটে দারুণ গ্রীষ্ম পড়িয়াছে। সূর্য্যদেব রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সমস্ত দিন অগ্নিবর্ষণ করেন। সহরের রাজপথে লোকচলাচল দশটা বাজিলেই কমিতে আরম্ভ হয়। দ্বিপ্রহরে সমস্ত দোকান-পাট বন্ধ; রাজপথ লোকশূন্য, নীরব শ্মশানের ন্যায় মনে হয়। অফিস আদালত ইত্যাদি সমস্তই প্রভাতে। সেই আবার সন্ধ্যার পূর্ব্বে পথে মানুষ বাহির হয়।

একটি অন্ধকারপ্রায় ঘরে, দিবা দ্বিপ্রহরের সময়, হৃদয়নাথ শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। বাড়ীতে যতগুলি ঘর আছে, সর্ব্বাপেক্ষা এইটিই শীতল, তাই মধ্যাহ্নকালে পরিবারস্থ সকলেই এইখানেই আশ্রয় গ্রহণ করে। দুয়ার ও জানালা খস-খসের পরদা দিয়া রুদ্ধ। ঘরের ভিতরেই বসিয়া এক ছোঁড়া চাকর পাখা টানিতেছিল।

দূরে ছোটবধূ ছেলেপিলেকে লইয়া ঘুম পাড়াইতেছিলেন। বড়বধূ ধোয়া শাণের মেঝেতে একটি বালিশ মাথায় দিয়া শুইয়া দেবরের সঙ্গে গল্প করিতেছিলেন। ক্রমে তরঙ্গিণীর কথা উঠিল। বড়বধূ দুঃখ করিয়া বলিলেন, "আহা বাছা যে এমন ক'রে দাগা দিয়ে যাবে তা আমি কখনও ভাবিনি।"

হৃদয়নাথ বলিলেন, "বড়বউ, তার জন্যে আর দুঃখ ক'রে কি হবে ? যা হবার তা হয়েছে। তিনি বেঁচে থাকলেও সুখ হ'ত না।"

বড়বধূ আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "কেন এ কথা বলছ ঠাকুরপো ?"

"অনেক দিন থেকে একটা কথা বলব মনে করি, কিন্তু বলতে পারিনে বড়বউ। তিনি গিয়েছেন, সে ভালই হয়েছে।"

বড়বধূ কুতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কথা ঠাকুরপো ? কি হয়েছিল ?"

হৃদয়নাথ কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "আর কি বলব মাথামুণ্ডু। তাঁর স্বভাব চরিত্র খারাপ হয়েছিল।"

এ কথা শুনিয়া বড়বধূ যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। বলিলেন, "ও কি কথা ঠাকুরপো ? অমন বোলো না। তিনি আমার সতীলক্ষ্মী ছিলেন।"

হৃদয়নাথ দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত বলিলেন, "বড়বউ—আমি স্বচক্ষে তাঁর হাতের চিঠি দেখেছি।" "কি চিঠি ?"

"সে আর কি বলব ?"

"কাকে লেখা ?"

"কে আমাদের সর্ব্বনাশ করেছে তা ঈশ্বরই জানেন।"

বড়বধূ উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "ঠাকুরপো, ভুল করেছ। তা হতেই পারে না।"

হৃদয়নাথ পূর্ব্ববৎ বিষণ্ণ স্বরে বলিলেন, "চিঠি যে আমার কাছে রয়েছে বড়বউ।"

"কই দেখি।"

হৃদয়নাথ ধীরে ধীরে উঠিয়া বাক্স খুলিয়া চিঠি বাহির করিলেন। বড়বধূ তাঁহার হাত হইতে চিঠিখানি লইয়া জানালার কাছে গেলেন। খসখসের পর্দ্দা ফাঁক করিয়া আলোকে চিঠিখানি এক মুহূর্ত্তের জন্য মাত্র দেখিলেন। তাহার পর শয্যায় ফিরিয়া আসিয়া, চিঠিখানি হৃদয়নাথকে প্রত্যর্পণ করিলেন। বলিলেন, "তবু ভাল। দেহে প্রাণ এল।"

হৃদয়নাথ পরম বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কেন ?"

বড়বউ ধীরে ধীরে বলিলেন, "ও তো তার সখী প্রিয়তমাকে লেখা, সেই ও বাড়ীর চাটুয্যেদের পিরি, তার সঙ্গে ভারি ভাব ছিল কিনা। রোজ দুজনে চিঠি লেখালেখি করত। আহা পিরি ছুঁড়ি শ্বশুরবাড়ী যাবার দিন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল; কেঁদে আর বাঁচে না।"

হৃদয়নাথের কপাল ঘামিয়া উঠিল। নিঃশ্বাস জোরে বহিতে লাগিল। বলিলেন, "তবে চিঠির উপরে 'প্রিয়তম' লেখা রয়েছে কেন ?"

"ঐ বলেই ত সে ডাকত। পিরি ওকে বলত তরুণী, সে পিরিকে বলত প্রিয়তম।"

হৃদয়নাথের মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। আলোকাভাবে কেহ তাঁহার মুখের বিবর্ণতা লক্ষ্য করিতে পারিল না। কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া যেন আপনা-আপনি বলিলেন, "হায় রে, এ কথা যদি আগে জানতাম !"

বড়বধূ তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "আগে জানলে কি হ'ত ঠাকুরপো ? অ হলে তাকে ধরে রাখতে পারতে ? তাই কি তার চিকিৎসায় তেমন মনোযোগ করনি ?"

হৃদয়নাথের মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। বড়বধূ বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "তবে কি চেষ্টা করলে বাঁচাতে পারতে ?"

হৃদয়নাথ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "বড়বউ, যার নিয়তি উঠেচে, মানুষের চেষ্টায়

কি তাকে বাঁচান যায়? অদৃষ্টলিখন খণ্ডন করা কি মানুষের সাধ্য?"

বড়বধূর মন এ উত্তরে সন্তোষ মানিল না। তিনি আজিও নির্জ্জনে হরিদাসীকে চিন্তা করিতে করিতে নানা কথা ভাবেন।

[অগ্রহায়ণ, ১৩০৬]

সারদার কীর্ত্তি

॥ ১ ॥

ষ্টীমারে খুলনা যাইতেছিলাম—সঙ্গে স্ত্রী ছিলেন। ক্যাবিন রিজার্ভ করা ছিল। সারা দ্বিপ্রহর দুইজনে বসিয়া গল্প করিয়া কাটাইলাম। সন্ধ্যার কিয়ৎ পূর্ব্বে তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। আমি ভাবিলাম এই অবকাশে ছাদে গিয়া একটু সন্ধ্যাবায়ু সেবন করিয়া আসি।

সেইমাত্র ষ্টীমার মাণিকদহঘাট ছাড়িয়াছে। ক্যাবিনের ভিতর বসিয়া মনে হইয়াছিল, আর বেলা নাই; বাহির হইয়া দেখিলাম সূর্য্যাস্ত হইতে তখনও বিলম্ব রহিয়াছে। সুতরাং ছাদে যাওয়া হইল না। অলসভাবে ইতস্ততঃ পদচারণা করিয়া বেড়াইতেছি, হঠাৎ একটি অপরিচিত যুবা আমার কাছে আসিয়া আমাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

দূরের দৃশ্য দেখিবার জন্য চশমা বদলাইয়া ক্যাবিন হইতে বাহির হইয়াছিলাম। চশমা খুলিয়া যুবকটির মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম। পূর্ব্বে তাহাকে কখনও দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হইল না।

লোকটির বয়স পঁচিশ বৎসর হইবে। একহারা চেহারা, চক্ষু বসা, মাথায় বড় বড় চুল। পরিচ্ছদ অতি সামান্য অবস্থার পরিচায়ক।

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কে?"

"আজ্ঞে আমার নাম শ্রীসারদাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। নিবাস কুমারখালি।"

"আমাকে চিনলেন কি করে?"

যুবক একটু বিনীত হাস্য করিয়া বলিল, "মশায়কে বাঙ্গলা দেশে কে আর না চেনে? আপনার তুল্য স্বদেশহিতৈষী বাগ্মী—"

আমি তাহাকে বাধা দিয়া বলিলাম, "কি চান আপনি?"

"আমি যা চাই, তা ক্রমে নিবেদন করছি। সে অনেক কথা। যদি দয়া করে শোনেন, তবে কৃতার্থ হই।"—বলিয়া লোকটা ডেকের তক্তার পানে চাহিয়া রহিল।

ব্যাপারটা কি আমি কিছু অনুমান করিতে পারিলাম না। ভাবিলাম হয়ত কিছু অর্থসাহায্য চাহে। অন্যদিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিলাম, "তা বলুন শুনছি।"

"মশায়, একটু নির্জ্জন স্থান আবশ্যক। একটু ওদিকটেয় যাবেন কি?"

"চলুন"—বলিয়া আমি অগ্রসর হইলাম।

সে আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিল। রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইলাম। আমার পাশে দাঁড়াইয়া আমার মুখের পানে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া রহিল।

তাহার ভাব দেখিয়া মনে করিলাম, পূর্ব্বে হয়ত এ অবস্থাপন্ন ছিল, এখন এরূপ দশা হইয়াছে। যাচ্ঞার ভাষা বুঝি মুখে আসিয়া বাধিয়া যাইতেছে।

"আপনাকে আমি প্রণাম করলাম কেন বুঝতে পেরেছেন?"

"না, কেন বলুন দেখি?"

"আপনি আমার পিতা।"

শুনিয়া হাহা করিয়া হাসিয়া ফেলিলাম। বলিলাম, "কি রকম?"

লোকটা একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "আপনি আমার পিতা কিনা ঠিক বলতে পারিনে, আপনার স্ত্রী আমার মাতা।" বলিয়া আকাশের পানে চাহিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে

প্রণাম করিল।

বুঝিলাম, লোকটা পাগল। পূর্ব্বের অশ্রদ্ধার ভাবটা মন হইতে তিরোহিত হইয়া, একটা দয়া হইল।

সে বলিতে লাগিল, "আপনি অবিশ্বাস করছেন? আপনি ভাবছেন লোকটা পাগল? তিনি আমার মা বটেন, তবে এ জন্মের মা নন। আসল কথাটা তবে খুলে বলি। আমি পাঁচ বচ্ছর ধ'রে কাসরোগে কষ্ট পাচ্ছি। কত রকম চিকিৎসা করালাম, কিছুই হল না। মেট্রোপলিটনে বি-এ পড়ছিলাম, পড়া বন্ধ করতে হল। দেখুন না চেহারাখানা, একেবারে অস্থিচর্ম্মসার হয়ে পড়েছি। বেশী দিন আর বাঁচতে হবে না। দিন সাতেক হল, গ্রামের বাইরে বিশালাক্ষীর মন্দিরে গিয়ে সারা সন্ধ্যেটা উপুড় হয়ে পড়ে রইলাম। 'মা মা' বলে কত কাঁদলাম, কত প্রার্থনা করলাম। সন্ধ্যের পর বাড়ী ফিরে এলাম। রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম, যেন মা বিশালাক্ষী আমার মাথার শিয়রে দাঁড়িয়ে বলছেন—আপনার নাম ক'রে—তাঁর যিনি স্ত্রী—তিনি আর জন্মে তোর মা ছিলেন। তুই তাঁকে মদ খেয়ে একদিন বাপান্ত ক'রে গাল দিয়েছিলি, সেই পাপে তোর এই কঠিন রোগ হয়েছে। তাঁর কাছে যা, তাঁর পাদোদক পান করুগে যা. ভাল হয়ে যাবি। ব'লেই মা বিশালাক্ষী অন্তর্দ্ধান করলেন।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া সে চুপ করিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কোথায় যাচ্চেন?"

হাত দুটি যোড় করিয়া সে বলিল, "সব শুনেছেন, আর এ অধমকে 'আপনি' বলে কেন সম্ভাষণ করেন? 'তুমি' বলুন বা 'তুই' বলুন।"—বলিয়া হেঁট হইয়া আমার জুতা দুইটা ছুঁইয়া স্বীয় ললাটস্পর্শ করিল।

"তুমি এখন কোথা যাচ্চ?"

"আমি যাচ্চি দৌলতপুর। সেখানে আমার মামার বাড়ী। সেখান থেকে কলকাতায় যেতাম, আপনার সন্ধানে।"

"আমি কলকাতায় যাচ্চি, এ সংবাদ আপনাকে কে দিলে?

আকুলস্বরে সে বলিল, "আবার 'আপনাকে'?"

"তোমায় কে বললে?"

"কেউ বলেনি। আমি কি জানিনে যে কলকাতায় এবার কন্‌গ্রেসের অধিবেশন? আমি কি জানিনে যে ব্যারিষ্টারশ্রেষ্ঠ মিষ্টার অতুল ব্যানার্জ্জি না হলে স্বদেশহিতকর কোন কার্য্যই হবার যো নেই? দেশের মধ্যে কে এমন—"

আমি তাহাকে বাধা দিয়া বলিলাম, "তা ভালই হয়েছে। আপনার—তোমার অনেক পরিশ্রম বেঁচে গেল।"

অত্যন্ত আগ্রহের সহিত সারদা জিজ্ঞাসা করিল, "আমার মা কি আপনার সঙ্গেই আছেন?"

"আছেন। আজই চাও পাদোদক?"

"আজ পেলে কি আর কালকের জন্যে অপেক্ষা করিতে পারি?"

"তবে দাঁড়াও এখানে।" বলিয়া আমি ক্যাবিন অভিমুখে অগ্রসর হইলাম।

ক্যাবিন পরিত্যাগের পর বোধ হয় অর্দ্ধঘণ্টা অতীত হইয়াছিল। ভিতরে গিয়া দেখিলাম আমার স্ত্রীর ঘুম ভাঙ্গিয়াছে। আমাকে দেখিয়াই মুখে হাতের আড়াল করিয়া একটি হাই তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় ছিলে এতক্ষণ?"

আমি তাঁহার শয্যার নিকট বসিয়া তাঁর হাতখানিতে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলাম, "একটি বড় মজা হয়েছে।"

"কি গা?"

"তোমার ছেলে এসেছে।" বলিয়াই অনুশোচনায় মরিয়া গেলাম! আমাদের একটি দুই বৎসরের সন্তান ছিল, সে এই ঘটনার দেড় বৎসর পূর্ব্বে চলিয়া গিয়াছে। আমি

একটা অসাবধানতায় আমার স্ত্রীর মনে কি শোকস্মৃতি জ্বালিয়া দিলাম!

তিনি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া বসিলেন। আমার মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, "কি বলছ?"

আমি তাঁহাকে কাছে টানিয়া বলিলাম, "ষ্টীমারে একজন সন্ন্যাসীর দর্শন পেয়েছি। তিনি আমার হাত দেখে বলেছেন শীগ্‌গির আমার ছেলে হবে।"

উপস্থিত বুদ্ধিতে এইটুকুর বেশী যোগাইল না। কিন্তু কোনও ফল হইল না। তাঁহার দুইটি চোখের কোণে জল দেখা দিল। আমি তাঁহাকে বক্ষে বাঁধিলাম। মুখ-চুম্বন করিলাম। রুমাল দিয়া চোখ মুছাইয়া দিলাম, নিজের চোখও মুছিলাম। কি কথা বলিয়া চিন্তাস্রোত অন্যদিকে ফিরাই ভাবিতে লাগিলাম।

গবাক্ষপথে দেখিলাম, সূর্য্যাস্তকাল সমুপস্থিত। বলিলাম. "চল, ছাদে চল সূর্য্যাস্ত দেখিগে। পদ্মাবক্ষে সূর্য্যাস্ত কখনো ত দেখিনি।"

তিনি উঠিলেন। পাশের কামরায় গিয়া মুখ চক্ষু ধৌত করিয়া, কেশবেশ বাহিরে যাইবার মত করিয়া আসিলেন।

দুইজনে ছাদে গিয়া পদচারণা করিতে লাগিলাম। সূর্য্য অস্ত গেল. সন্ধ্যা হইল। ষ্টীমার হুহু শব্দে জল কাটিয়া ছুটিতেছে। ক্রমে নাগরকান্দি ষ্টেশন ঘাট নিকটবর্ত্তী হইল. আমরা ছাদ হইতে নামিয়া গেলাম।

সিঁড়ির পাশে সারদা দাঁড়াইয়া। আমাদের দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ইনি আমার মা?"—উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই আমার স্ত্রীকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

এই ব্যাপার দেখিয়া আমার স্ত্রী থতমত খাইয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন। অবাক হইয়া আমার পানে চাহিয়া রহিলেন।

আমি বলিলাম, "একটা কথা আছে, ক্যাবিনে গিয়ে বলব।"

সারদার প্রতি মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইলাম। কোথা হইতে ভাল আপদ জুটিয়াছে! বলিলাম, "অপেক্ষা করুন না। আপনি অত ব্যস্ত হচ্চেন কেন?"

সারদা সসম্ভ্রমে সরিয়া গেল। বলিয়া গেল, "আমি ঐ এঞ্জিনের কাছে থাকব।"

স্ত্রীকে লইয়া ক্যাবিনে গিয়া সকল কথা বলিলাম। শুনিয়া তিনি বলিলেন, "আমি পাদোকজল দিতে পারব না।" আমি বলিলাম, "তাতে আর হানি কি?"

"তুমি ঐ গাঁজাখুরী কথা বিশ্বাস কর নাকি?"

"করিনে। কিন্তু ওর মনে যদি ঐ বিশ্বাস হয়, তবে হয়ত উপকার পাবে। এমন অনেক শুনতে পাই।"

'কি শুনতে পাও? জন্মান্তরের মা বাপকে স্বপ্ন দেখে, ডাক্তারকে ফাঁকি দিয়ে তাদের পাদোকজল খেতে যায়?"

"না;—একটা কিছুতে দৃঢ় বিশ্বাস করলে রোগ অনেক সময় আরাম হয়।"

এ কথা শুনিয়া আমার স্ত্রী চুপ করিয়া রহিলেন; কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন, "তা, শুধু জলই একটু দাওগে না। বিশ্বাস হলেই হল যে পাদোকজল।"

"তার দরকার কি? সে যে ছলনা করা হবে"—বলিয়া চায়ের একটা পেয়ালাতে একটু জল ঢালিলাম।

আমার স্ত্রী হাসিতে হাসিতে মোজা খুলিলেন। বলিলেন. "ভাল জ্বালা! তোমাকে যেমন বোকা ভালমানুষটি পেয়েছে! বিলেতে যে কোনও মেম ভুলিয়ে তোমায় বিয়ে করে ফেলেনি. সেই আমি আশ্চর্য্য হই।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "তা হলে তোমার কপালের এ কষ্টটা কোথায় যায় বল? এতদিন তুমি ত তাহলে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের স্ত্রী।"

ঠাট্টা করার লোভটি আমার স্ত্রী সম্বরণ করিতে পারেন না. কিন্তু উল্টিয়া একটু ঠাট্টা কর দেখি. তাহা আর সহ্য হয় না। বলিলেন. "যাও যাও. তোমার আর চালাকি করতে

হবে না। ভারি রসিকতা হল কিনা!"

আমি বাক্যব্যয় না করিয়া পেয়ালাটি লইয়া তাঁহার কোমল পদপল্লব ধারণ করিলাম। তন্মুহূর্ত্তেই তিনি পা কাড়িয়া লইলেন। রাগ করিয়া বলিলেন, "পা ছোঁয়া কেন?" আমার উত্তরের অবসর না দিয়া, আমার হাত হইতে পেয়ালা লইয়া জলে পদাঙ্গুলি স্পর্শ করিলেন। পার্শ্বস্থ টেবিলে সেটি রাখিয়া বলিলেন, "বেয়ারাকে বল দিয়ে আসুক।"

আমি উঠিয়া বলিলাম, "বেয়ারা কি তাকে চেনে? আমিই দিয়ে আসি।"। বলিয়া পেয়ালাটি তুলিয়া লইলাম।

তিনি বলিলেন, "ও কি কর? কথা বললে শোন না কেন?"

আমি গম্ভীর হইয়া বলিলাম, "দেখ, মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো একেবারে ভস্মে ঘি ঢালা। এত লেখাপড়া শিখলে ভাই, তবু এই সামান্য প্রেজুডিস্‌টে গেল না?"

বলিয়া বাহির হইয়া গেলাম।

॥ ২ ॥

কন্‌গ্রেস শেষ হইয়াছে, ঢাকায় ফিরিয়া আসিয়াছি, একদিন সন্ধ্যার সময় দরোয়ান শ্লেট হাতে করিয়া উপস্থিত হইল। যাহারা দেখা করিতে আসিলে কার্ড আনে না, তাহাদের জন্য একখানা শ্লেট রাখিয়া দিয়াছিলাম। শ্লেটে ইংরাজীতে লেখা রহিয়াছে, "সারদাপ্রসন্ন চাটার্জ্জি।"

দুই মাসের পুরাতন কথা সহসা স্মরণ করিতে পারিলাম না। ভাবিলাম, বুঝি কোনও নূতন মক্কেল আসিয়াছে।

ডাকিয়া পাঠাইলাম। চেহারা দেখিবামাত্র সারদাকে অবশ্য চিনিতে পারিলাম। আসিয়াই সে আমাকে গলায় বস্ত্র দিয়া ভূমিস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল।

"কি হে? কেমন আছ বল দিকিন? কিছু উপকার টুপকার পেলে?"

সারদা প্রথমতঃ কথার কোন উত্তর না দিয়া, বুকে হাত দিয়া বারকতক কাসিল। শেষ কালে বলিল, "বেশ দিনকতক সেরে গিয়েছিল (খক্ খক্)—আবার (খক্ খক্)—দিন পাঁচ সাত" (খক্ খক্ খক্)—আর বলিতে পারিল না, কাসিতে কাসিতে নিকটস্থ চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

তাহার কাসির ধমক থামিলে বলিলাম, "পাদোকজলের কর্ম্ম নয়। ওষুধ খাও।"

"পাই কোথা?"—বলিয়া আবার কাসিতে আরম্ভ করিল।

সাড়ে সাতটা বাজে। বাড়ীতে একটা ডিনার পার্টি ছিল। এখনি লোকজন আসিতে আরম্ভ হইবে। এ সময় এ আসিয়া জুটিল কেন? তাহাকে শীঘ্র শীঘ্র বিদায় করিবার অভিপ্রায়ে পকেট হইতে পাঁচটা টাকা বাহির করিলাম। সারদাকে দিয়া বলিলাম, "এই নাও, কোনও ভাল ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করে একটা ওষুধপত্র খাওগে, পাদোকজলে কি রোগ ভাল হয়?"

এই সময় মিষ্টার বোসের গাড়ী আসিয়া পৌঁছিল। আমি সারদাকে তাড়াতাড়ি বলিলাম, "আজ আমি ভারি ব্যস্ত আছি—যাও!"

সারদা টাকা কয়টি পকেটে ফেলিয়া চলিয়া গেল।

পরদিন যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন অনেক বেলা হইয়াছে। উঠিয়া সার্সির কাছে দাঁড়াইয়া নিম্নে বাগানের পানে দৃষ্টিপাত করিলাম। কালো সার্জ্জের চাদর গায়ে দিয়া কে একজন পায়চারি করিতেছে। আমার পানে যতক্ষণ পিছন ফিরিয়া ছিল, ততক্ষণ তাহাকে চিনিতে পারি নাই, সম্মুখ ফিরিলেই দেখিলাম সারদা। পিত্ত জ্বলিয়া গেল। প্রভাত হইতে না হইতেই আসিয়া জুটিয়াছে! এখনি দরোয়ান শ্লেট লইয়া আসে দেখিতেছি!

চায়ের টেবিলে প্রাতঃকালীন সংবাদপত্রের সহিত তাহার কার্ড উপস্থিত। আমার

স্ত্রী তখনও নামেন নাই। সারদা আসিয়া প্রথমেই আমাকে ভক্তিভরে প্রণাম করি তাহার পর বলিল, "কাল সারা রাত আমার নিদ্রা হয়নি। আমার প্রতি আপনার অহেতুক স্নেহ দেখে আমি অবাক হয়ে আছি। আমি কোথাকার কে তার ঠিকানা আমার চিকিৎসার জন্যে পাঁচ পাঁচটা টাকা! এ টাকা ক'টি ফিরিয়ে নিন।" বলি টাকা কয়টি টেবিলে রাখিয়া দিল।

সারদার এই প্রকার আচরণ দেখিয়া তাহার প্রতি আমার একটু শ্রদ্ধার উদ্রেক হইল বলিলাম, "না না, ও টাকা আর ফিরে দিতে হবে না; তোমার চিকিৎসা ব্যয়ের জন্যে দিয়েছি।"

সারদা বারকতক কাসিয়া বলিল, "দেখুন, দৈবশক্তিতেই আমার বেশী বিশ্বাস। ডাক্তারি কবিরাজিতে আমার বিশ্বাস নেই। এ অবস্থায় ওতে অর্থব্যয় কি মিছে হবে না?"

আমি কিঞ্চিৎ ভাবিয়া বলিলাম, "একেবারে বিশ্বাস না থাকলে ফল হওয়া শক্ত বটে।"

সে বলিল, "আমার আন্তরিক বিশ্বাস, দৃঢ় বিশ্বাস, যদি মা ঠাকরুণের (উদ্দেশে করপুটে প্রণাম করিল) পাদোকজল দুবেলা খেতে পাই, আর তাঁকে দুবেলা প্রণাম করতে পাই, তা হলে আমি একেবারে আরাম হয়ে যাই। নইলে এ যাত্রা আমার নিস্কৃতি নেই।" বলিতে তাহার চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল।

আমি কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলাম। দুইবেলা পাদোদক দিতে এবং প্রণাম লইতে আমার স্ত্রী রাজি হইবেন কি? এই সময় লোকটা অত্যন্ত কাসিতে লাগিল। তাহার বিশীর্ণ পাণ্ডুর মুখমণ্ডল দেখিয়া আমার মনে ভারি দয়া হইল। ভাবিলাম—আহা রাজি হওয়া উচিত। আমার স্ত্রীকে রাজি করাইব। কত রকমে লোকে পরের উপকার করে। এই সামান্য উপায়ে যদি ইহার উপকার হয়, যদি ইহার প্রাণটা বাঁচে, তাহা হইলে করা উচিত।

সারদাকে বলিলাম, "তুমি নীচে গিয়ে কর্ম্মচারীদের ঘরে অপেক্ষা কর। আমি তোমায় ডেকে পাঠাব।"

স্ত্রীর সন্ধানে গেলাম। শুনিলাম তিনি স্নানের ঘরে। অর্দ্ধঘণ্টা পরে তাঁহার দর্শন পাইলাম।

বারান্দায় একখানা চৌকি টানিয়া লইয়া তিনি চুল শুকাইতে বসিলেন। আমি বলিলাম, "সারদা আবার এসেছে।"

"সেই ষ্টীমারের সারদা? আবার কেন এসেছে?"

বাঃ—আমার স্ত্রীর কি স্মরণশক্তি! আমি কিন্তু শ্লেটে সারদার নাম দেখিয়া প্রথমতঃ উহাকে চিনি নাই।

"তার কাসি আবার বেড়েছে।"

"আর আমি পাদোকজল দিতে পারব না কিন্তু। একবার দিয়ে বিশ্বাস-বিরুদ্ধ কাষ করেছি। আমি পীর না পয়গম্বর যে আমার পাদোকজল খেয়ে ওর ব্যারাম ভাল হবে?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "আমার মত সকলে ত উচ্চশিক্ষিত, নব্য আলোকপ্রাপ্ত নয়: —ওর যদি তাই বিশ্বাস হয়! সেবার ত ভাল হয়ে গিয়েছিল বললে।"

আমি দেখিলাম, এবার একটু বেগ পাইতে হইবে। স্পষ্টতঃ ইনি মনে করিয়াছেন, সেবারকার মত এক পেয়ালা পাদোদক দিলেই চুকিয়া যাইবে। যদি শুনেন, তা নয়, এখন কিছুদিন ধরিয়া ক্রমাগত দুইবেলা উক্ত মহার্ঘ দ্রব্যটি বিতরণ করিতে হইবে, তাহা হইলে একেবারে ধৈর্য্যহারা হইয়া পড়িবেন।

তথাপি বলিয়া ফেলিলাম। কিন্তু যতটা বিদ্রোহের আশংকা করিয়াছিলাম—ততটা হইল না। আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "ডাক্তারি কবিরাজি কোন ওষুধে ওর কিছুমাত্র বিশ্বাস নেই? দুবেলা আমার পাদোকজল খাবে? তাতেই ও ভাল হবে?"

"ও ত তাই বলছে। বলছে নইলে এ যাত্রা ও বাঁচবে না। আহা ওর প্রার্থনা পূর্ণ কর।"

আমার স্ত্রী মৌন থাকিয়া সম্মতিলক্ষণ প্রকাশ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আমরা

নীচে নামিয়া গেলাম।

সারদাকে এ শুভ সংবাদ জ্ঞাত করাতে সে আনন্দে অধীর হইল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার বাসা কোথায় ?"

"আমার এখানে কেউ নেই।"

"কোথায় থাকবে ?"

"এখানে আমাকে একটু স্থান দিতে পারেন না দয়া করে ? যদি এত দয়া করলেন" বলিয়া চুপ করিল।

আমি বলিলাম, "আমার কর্ম্মচারিদের একটা মেসের মত আছে। সেখানেই থাকতে পার।"

সারদা বলিল, "সে ত বেশ হবে। কাল রাত্রে আমি সেইখানেই খেয়েছিলাম কিনা" —বলিয়া সারদা কাসিতে আরম্ভ করিল।

কাসি থামিলে বলিল, "আজ একবার যদি অনুমতি করেন, তবে মার শ্রীচরণ দর্শন করি।"

স্ত্রীর কাছে তাহাকে লইয়া গেলাম। সারদা তাঁহাকে প্রণাম করিল। আর স্ত্রী তাহার মুখপানে সকরুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

টেবিলে প্লাসে জল ছিল। সারদা তাহাই একটু হাতে লইয়া মাটীতে বসিয়া, পাদোদক খাইল। পান করিয়া অবশিষ্ট অংশ মাথায় মুছিয়া ফেলিল।

এইরূপ দুই তিন দিন করিল। তাহার রোগের কিছুমাত্র উপশম দেখা গেল না। আমাকে সারদা বলিল, "মা কি ভাল মনে আমায় পাদোদক দিচ্ছেন না ? এবার সারছে না কেন ?"—বলিতে বলিতে তাহার চক্ষু দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

সেদিন এই কথা আমার স্ত্রীকে বলিলাম। তিনি বলিলেন, "ওষুধ খাবে না বিষুধ খাবে না, পাদোকজল খেয়ে মানুষের রোগ ভাল হয় ? যত সব অনাসৃষ্টি আবদার !"

আমি বলিলাম, "দেখ, ইচ্ছাশক্তিতে বোধ হয় কিছু কায হয়। তুমি পাদোকজল দেবার সময় মনে মনে খুব আগ্রহের সহিত ভেবো, এই জলে এর রোগ ভাল হবে।"

স্ত্রী হাসিয়া বলিলেন, "দিনকের দিন যেন সং হচ্চ। বিলিতি ময়ূরপুচ্ছ ক্রমশঃই তোমার গা থেকে খসে খসে পড়ছে।"

আমি কপট অভিমান সহকারে বলিলাম, "অর্থাৎ আমাকে প্রকারান্তরে দাঁড়কাক বলা হল। এতই যদি কালো দেখছিলে, তবে বিয়ে করলে কেন ? ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব—"

আমার স্ত্রী এবার আর চটিলেন না। বলিলেন, "হ্যাঁ গো হ্যাঁ, সবাই তোমার মত কালো হলে জগৎ আলো হয়ে যেত!"

কথাটা বোধ হয় মিথ্যা নয়। আমি যে একজন সুপুরুষ, তাহা বিলাতের অনেক বিবিই স্বীকার করিয়াছিলেন।

॥ ৩ ॥

প্রতিদিন সারদার শারীরিক অবস্থার উন্নতি দেখা যাইতে লাগিল। তাহার কাসি প্রায় সারিয়া উঠিল, মুখের ফ্যাকাসে রঙ কালো হইতে লাগিল। চোখের কোলে মাংস জমিতে লাগিল। দেখিয়া আমি আহ্লাদিত হইলাম। আমার স্ত্রীও তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। তিনি প্রায়ই সারদাকে ডাকাইয়া ফায়ফরমাস করিতে লাগিলেন। কর্ম্মচারিদিগকে বিশ্বাস করিয়া যে সকল দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে না পাঠাইতে পারিতেন, তাহা সারদাকে ভার দিতেন।

২৭শে বৈশাখ একটি বিবাহ উপলক্ষ্যে বন্ধুগৃহে নিমন্ত্রণ ছিল। সেখানে অনেক রাত্রি অবধি থাকিবার কথা ছিল। বিবাহান্তে থিয়েটারের অভিনয় হইবে। বাড়ী ফিরিতে অন্ততঃ রাত্রি দুইটা বাজিবে, ইহা আমাদের চাকরবাকর কর্ম্মচারীদিগকে বলিয়াছিলাম।

সারদাকে কিছুদিন হইতে আমার আইন পুস্তকের লাইব্রেরীর তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত করিয়া ছিলাম। তাহাকে বলিলাম, "আজ লাইব্রেরীতে শুয়ো। একটু সজাগ থেকো।"

সে বলিল, "আমাকে বলতে হবে না, আমি আজ জেগেই থাকব এখন, যতক্ষণ আপনারা না ফেরেন।"

জাগিয়াই সে ছিল বটে, পরে প্রমাণ পাইলাম।

ফিরিতে রাত্রি তিনটা বাজিল। আমার স্ত্রী বেশপরিবর্ত্তন করিবার জন্য কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন। আমি একা শয়নকক্ষের দ্বারমুক্ত করিয়া যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহাতে আমার চক্ষুস্থির হইয়া গেল।

বড় সিন্দুকের সম্মুখে সারদা বসিয়া আছে। আশে পাশে খানকতক রূপার বাসন ছড়ান। বাসনের আলমারী খোলা। আমাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই সারদা 'বাবা—বাবা' বলিয়া অস্ফুটস্বরে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিল।

তাহার কাছে গিয়া দেখিলাম, সে বন্দী। এই সিন্দুকে যে কলটি লাগান ছিল, তাহার একটু ইতিহাস আছে। বিলাতে অবস্থানকালীন আমি নীলামে অনেক মূল্য দিয়া উহা ক্রয় করিয়াছিলাম। একটি ব্যাঙ্ক ফেল হইয়া যায়, কলটা সেই ব্যাঙ্কের। কলে একটা তালা আছে কিন্তু তাহার চাবি নাই। ঘূর্ণ্যমান কয়েকটা অঙ্গুরীয়াকার ধাতুখণ্ডের যথা-সন্নিবেশে একটা নির্দ্দিষ্ট ইংরাজি নাম সাজাইতে হয়, তাহার পর টানিলেই খুলিয়া যায়। কিন্তু খুলিবার পূর্ব্বে তৎসলগ্ন একটা পিন স্থানভ্রষ্ট করা আবশ্যক। তাহা না করিয়া খুলিতে চেষ্টা করিলে, যে খুলিতেছে সে তৎক্ষণাৎ বন্দী হইবে। দুইদিক হইতে দুইটা লৌহখণ্ড স্প্রিঙের জোরে ছুটিয়া গিয়া হাত বাঁধিয়া ফেলিবে। আমার স্ত্রীর অসাবধান-তায় সারদা কোনও দিন খুলিবার নামটি জানিতে পারিয়াছিল, কিন্তু ইহার মধ্যে যে আবার এ ব্যাপার আছে. তাহা ত সে জানিত না!

পৃথিবীতে কাহাকেও বিশ্বাস করিয়া সুখ নাই। সারদাকে দেখিতে নিরীহ ভাল-মানুষটি। যাহারা বলে, মানুষের মুখ দেখিয়া স্বভাব চরিত্রের আভাস পাওয়া যায় তাহারা মূর্খের মূর্খ। আইনের ব্যবসায় করিতে করিতে আমি এ মতের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িতেছিলাম; সারদার এই আচরণে আমার বিপক্ষমত স্থায়ী হইয়া পড়িল।

তাহার কাছে গিয়া রোষকষায়িত নেত্রে বলিলাম. "খুব কায করেছিস—উপযুক্ত পুত্রের কাজ করেছিস।" রাগে আমার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া যাইতেছিল।

সারদা কাতর স্বরে বলিল. "বাবা, আমার দোষ নেই।"

ইচ্ছা করিল তাহার মুখে একটা প্রকাণ্ড চপেটাঘাত করি। কিন্তু আত্মসম্বরণ করিলাম।

এই সময়ে আমার স্ত্রী প্রবেশ করিলেন। সারদাকে তদবস্থ দেখিয়া চমকিত হইলেন। কাঁপিতে লাগিলেন। আমার পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "একি কাণ্ড!"

আমার স্ত্রীকে দেখিয়া সারদা দ্বিগুণ ক্রন্দন আরম্ভ করিয়া দিল। আমি রাগিয় বলিলাম, "চুপ রও শুয়ার—মেরে হাঁড় গুঁড়ো করে ফেলব।"

আমার স্ত্রী বলিলেন. "ও ঘরে চল।"—বলিয়া আমার হস্তধারণ করিয়া প্রায় টানিয় লইয়া গেলেন।

একটা কৌচে বসিয়া পড়িয়া বলিলেন. "কি হবে?"

"কি আর হবে? পুলিশে দেবো।"

তিনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। পরে বলিলেন. "দেখ কায নেই পুলিশে দিয়ে। ছেড়ে দাও। লোভের বশবর্ত্তী হয়ে এ কায করে ফেলেছে। প্রথম অপরাধে মার্জ্জনা হওয়া উচিত। ও যদি অনুতাপ করে, নিজেকে সংশোধন করতে চেষ্টা করে তবে ওকে সে অবসর দাও। পুলিশে দিলে ওর জীবন একেবারে মাটি হয়ে যাবে।"

সারদা যদি চুরি করিয়া পলায়ন করিতে কৃতকার্য্য হইত তবে তাহাকে ক্ষমা কর অসম্ভব হইত বটে। কিন্তু সে নাকি অকৃতকার্য্য হইয়াছে. তাই তাহার প্রতি যেন কতকট

দয়া অনুভব করিলাম। কিন্তু সেটা করিলে কি সামাজিক কর্ত্তব্যের ত্রুটি হয় না? স্ত্রীকে সেই কথা বলিলাম।

তিনি বলিলেন, "না। পুলিশে দিলেই সামাজিক কর্ত্তব্যের ত্রুটি হয়। ব্যক্তিগত কর্ত্তব্যের উপরই সামাজিক কর্ত্তব্য প্রতিষ্ঠিত। একটা জীবনকে চিরদিনের জন্যে নষ্ট করে দিও না।"

সারদাকে ছাড়িয়া দিলাম।

কলিকাতায় কন্‌গ্রেস হইয়াছিল কবে?—১৮৯৬ সালে। তিন বৎসর পরে সারদার নিকট হইতে সে দিন একখানি পত্র পাইয়াছি। সে এখন জামালপুর মিউনিসিপালিটিতে ট্যাক্স দারোগার কার্য্য করিতেছে। তাহার মাতুল তাহার জন্য পাঁচশত টাকা জামিন দিয়া ঐ কার্যটি জুটাইয়া দিয়াছেন। কিছুদিন তাহার অত্যন্ত কষ্টে কাটিয়াছিল, প্রায় ভিক্ষাকে উপজীবিকা করিতে হইয়াছিল। তাহার প্রতি আমাদের 'অহেতুক স্নেহ' সম্বন্ধে অনেক কৃতজ্ঞতাপূর্ণ কথা লিখিয়াছে। লিখিয়াছে যে তাহার কাসিটা এবার অত্যন্ত বাড়িয়াছে। এবার বোধ হয় বাঁচিবে না। ইচ্ছাটা, এখানে আসে কিছুদিনের জন্য। অথচ সে প্রস্তাব করিতে সাহসী হইতেছে না। তাহার পত্রের শেষ কয় ছত্র এই:

"যদি আপনার কাছে যাইতে পারিতাম, যদি আমার মাতৃদেবীর পাদোদক পান করিতে পারিতাম, তাহা হইলে হয়ত আরোগ্য লাভ করিতাম। কিন্তু কোন্ মুখে আর সে প্রস্তাব করিব? আমার যদি মৃত্যু হয় তবে সেই শাস্তিই আমার উপযুক্ত।"

আমার স্ত্রী এই পত্রখানি দেখিয়া বলিলেন, "একটা কথা রাখবে?"

"কি?"

"তাকে আসতে লেখ।"

"চাকরি করছে, এখানে এসে কি করবে?"

"ছুটী নিয়ে আসুক।"

"কেন, পাদোক জল দেবে বলে?—তার চেয়ে একটা শিশি করে আউন্স চারেক পাদোক জল পার্শেলে পাঠিয়ে দিলেই হয়।"

"না না—তাকে আমার ভারি দেখতে ইচ্ছে করছে। তুমি জান, এ জীবনের জন্যে আমার কাছে সে ঋণী? আমার কাছে যে উপকৃত, তাকে আমার ভারি ভাল লাগে, এটা আমার একটা দুর্ব্বলতা।"

আমি গম্ভীর ভাবে বলিলাম, "আমিই ধন্য যার এমন স্ত্রী, পাদোদক খেয়ে কত লোক জীবন পেয়ে যায়।"

"আহা ঠাট্টা কর কেন? আমার পাদোদক পান ক'রে সে জীবন পেয়েছে আমি কি বলছি? জীবন মানে তার নৈতিক জীবন ভেবে বলেছিলাম। তুমি তাকে পুলিশে দিলে তার কি সর্ব্বনাশ হত বল দিকিনি!"

আমি বলিলাম, "নৈতিক জীবন ছাড়া ভৌতিক জীবনও তুমি দিয়েছ তাকে। তুমি পাদোদক না দিলে হয়ত এতদিন বাঁচত না।"

আমার স্ত্রী একথা শুনিয়া ভারি হাসিতে লাগিলেন। হাসির অর্থ ভাল বুঝিতে না পারিয়া আমি তাঁহার পানে নির্ব্বোধের মত চাহিয়া রহিলাম। হাসি থামিলে বলিলাম, "অত হাসছ কেন?"

"তুমি বুঝি মনে করেছ সারদা আমার পাদোদক খেয়ে ভাল হয়েছে?"

"তবে কি? তোমায় প্রণাম ক'রে ক'রে?"

"না গো না তাও না। একটা রহস্য আছে। প্রথম দু' তিনদিন যখন দেখলাম, ওর কাসিটা ক্রমশঃই বেড়েই যাচ্ছে, তখন জলে পদস্পর্শ করার পরিবর্ত্তে, এ বেলা একটা ও বেলা একটা হোমিওপ্যাথিক ওষুধের এক ফোঁটা করে স্পর্শ করাতে লাগলাম। ওয়াইন গ্লাসে ঔষধ তৈরি করে টেবিলে কাগজ চাপা দিয়ে রেখে দিতাম। সারদা এলে বলতাম—

ঐ জল রেখেছি নিয়ে যাও।"

স্ত্রীর বুদ্ধি শুনিয়া অবাক হইয়া গেলাম।

সারদাকে আসিতে লিখিলাম।—সে উত্তর দিল, 'এ কালামুখ আর আপনাদিগকে দেখাইতে ইচ্ছা নাই।' অগত্যা হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দুইটা কিনিয়া তাহাকে পাঠাইয়া দিলাম।

এক সপ্তাহ পরে পার্শেল ফিরিয়া আসিল। যে দিন প্রভাতে পার্শেল ফিরিল, সেই দিন দিন সন্ধ্যাবেলা একজন পুলিশ কর্ম্মচারী আসিয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। ইনি আমার পূর্ব্ব পরিচিত। সারদাকে লেখা আমার পত্রখানি বাহির করিয়া বলিলেন, "এর কোনও সন্ধান দিতে পারেন?"

ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, সারদা মিউনিসিপ্যালিটির বারো হাজার টাকা আত্মসাৎ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। আমার স্ত্রী এ সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন।

[মাঘ, ১৩০৬]

বউ-চুরি

॥ ১ ॥

যে সময়ে নব্য-বঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার একটা ভারি ধুম পড়িয়া গিয়াছিল, সেই সময়ের কথা বলিতেছি।

মহামায়া বর্দ্ধমান জেলার একটি সুনিবিড় পল্লীগ্রাম। সুনিবিড় অর্থাৎ রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে কুড়ি মাইল এবং পোষ্ট অফিস হইতে পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত। গ্রামের মধ্যভাগে দেবী মহামায়ার একটি বিগ্রহ স্থাপিত আছে—সেই হইতে ইহার নামোৎপত্তি।

এই ক্ষুদ্র গ্রামটির একটি ক্ষুদ্র জমিদার আছেন তাঁহার নাম বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহার মধ্যম পুত্র অনাথশরণ বি-এ পরীক্ষা দিয়া কয়েক দিন হইল বাড়ী আসিয়াছে। ছেলেটির বয়স বাইশ বৎসর হইবে, বেশে পারিপাট্য আছে, চেহারাটি মন্দ নহে। কিন্তু পিতা তাহার উপরে কয়েকটি কারণে অত্যন্ত চটা। প্রথমতঃ সে ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিয়া থাকে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, গৃহে ষোড়শী স্ত্রী রহিয়াছে, কিন্তু সে তাহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত করে না। তাহার কারণ কি জান? সে বলে, যাহাকে আমি ভালবাসিয়া বিবাহ করি নাই, সে আমার স্ত্রী নহে, ভগিনী। যদি জিজ্ঞাসা কর উহাকে বিবাহ করিলে কেন? সে বলিবে, যখন বিবাহ করিয়াছিলাম, তখন আমার এ সমস্ত মতাদি ছিল না। বালিকার দশা কি হইবে জিজ্ঞাসা করিলে বলে, আমরা উভয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইব, তাহার পর ব্রাহ্মবিবাহের যে নূতন আইন বিধিবদ্ধ হইতেছে, সেই আইন অনুসারে আমাদের বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিব; ও তখন ভাল-বাসিয়া আর যাহাকে ইচ্ছা স্বামিত্বে বরণ করিতে পারিবে।

বিবাহের পর কলিকাতায় গিয়া অনাথশরণের একটি প্রাণের বন্ধু জুটিয়াছিল, তাহার নাম হেমন্তকুমার সিংহ। সে দীক্ষিত ব্রাহ্ম। তাহার সহিত বন্ধুত্ব সূত্রপাতের অল্প-কাল পরেই অনাথের মনে ধারণা জন্মিল যে, সে হেমন্তকুমারের দূরসম্পর্কীয়া ভগিনী নগেন্দ্রবালাকে ভালবাসে। মনের এই চপলতায় প্রথমে অনাথ অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু হেমন্তকুমার তাহাকে সান্ত্বনা দিল। সে বলিল, ভালবাসা একটি ঐশ্বরিক শক্তির বিকাশ, কোনও অবস্থাতেই তাহাতে পাপ স্পর্শিতে পারে না। বিশেষতঃ হেমন্তকুমারের প্রবল বিশ্বাস, প্রেম-সম্পর্ক-বিহীন পূর্ব্বরাগ-বর্জ্জিত বিবাহ বিবাহই নয়। অনাথ মন্দাকিনীকে ভালবাসিয়া বিবাহ করে নাই, সুতরাং সে তাহার স্ত্রী নহে ভগিনী, এই অদ্ভুত মত হেমন্তই অনাথের মস্তিষ্কে প্রবেশ করাইয়াছে। নগেন্দ্রবালাও যে

অনাথের প্রতি প্রণয়শালিনী, ইহাও দুই বন্ধু অনুমান করিয়া লইয়াছে। এই বিবাহ হইলেই যথার্থ আদর্শ বিবাহ হয়, ইহাই হেমন্তকুমারের মত। কিন্তু অনাথের তথা-কথিত স্ত্রী বর্ত্তমানে তাহা অসম্ভব। নগেন্দ্রবালার প্রতি প্রণয় ব্যক্ত করিবার অধিকার পর্য্যন্ত অনাথের নাই। হেমন্ত প্রায়ই বলিত—প্রাণে প্রাণে যোগ, আত্মায় আত্মায় মিলন ইহাই ভালবাসার চরম সফলতা,—বিবাহ নাই হইল। কিন্তু নূতন ব্রাহ্মবিবাহ আইন হইবার কথা উঠা পর্য্যন্ত, তাহারা অন্যরূপ পরামর্শ করিয়াছে।

মধ্যাহ্নকাল বিগতপ্রায়। জ্যৈষ্ঠ মাসের আম-পাকানো রৌদ্র বাহিরে ঝাঁ ঝাঁ করি-তেছে। অনাথশরণ বহির্ব্বাটীর কক্ষে ডেস্কের সম্মুখে চেয়ারে উপবিষ্ট। এই কক্ষটি তাহার নিজস্ব। এইখানেই রাত্রে শয়ন করে। ভিত্তিগাত্রে কয়েকখানি বিলাতী ছবির সঙ্গে একটি একতারা টাঙ্গানো, প্রভাতে ও সায়াহ্নে এইটি বাজাইয়া সে ব্রহ্মসংগীত করিয়া থাকে। গৃহসজ্জার মধ্যে একটি ক্লক, একটি আলমারি, একটি আলনা এবং শয়নের খাট ছাড়া কিছুই নাই।

ডেস্কের ভিতর হইতে অনাথ হেমন্তকুমারের একখানি সদ্য-প্রাপ্ত চিঠি বাহির করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। তাহার যেখানে যেখানে নগেন্দ্রবালার নাম ছিল, সেখানে সেখানে চুম্বন করিল। চিঠি রাখিয়া, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, কি যেন ধ্যান করিতে লাগিল। ঠং ঠং করিয়া ঘড়িতে দুইটা বাজিয়া গেল।

অনাথ তখন ধীরে ধীরে চক্ষু খুলিয়া, পত্রখানি খামে বন্ধ করিল। এক টুকরা কাগজ লইয়া, ভাবিয়া চিন্তিয়া লিখিল:—

"আজ রাত্রি বারোটার পর সকলে নিদ্রিত হইলে তুমি একবার আমার ঘরে আসিও।"

লিখিয়া, কাগজখানিকে পাকাইয়া গুটাইয়া ছোট করিল। পূর্ব্বকথিত খামশুদ্ধ চিঠিখানি ডেস্কে বন্ধ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখে, অঙ্গন জনশূন্য। প্রথম কক্ষে, তাহার বউদিদি কয়েকজন সখীকে লইয়া তাস খেলিতেছেন। দ্বিতীয় কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, পালঙ্কের উপর জননী নিদ্রামগ্না। কুলুঙ্গীর কাছে তাহার বালক ভ্রাতুষ্পুত্রটি দাঁড়াইয়া চুরি করিয়া কুল-আচার ভক্ষণ করিতেছে। কাকাকে দেখিয়া সে অপ্রতিভ হইয়া হাসিয়া ফেলিল। কাকা তাহার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া সে স্থান ত্যাগ করিয়া গেলেন। তৃতীয়টি পূজার ঘর; নারায়ণশিলা আছেন; মূর্ত্তিবিদ্বেষবশতঃ ইদানীং অনাথশরণ এই কক্ষে প্রবেশ করিত না। বাহিরে দাঁড়াইয়া দেখিল, তাহার স্ত্রী মন্দাকিনী মেঝের উপর বঁটি পাতিয়া বসিয়া তেঁতুল কাটিতেছে। দক্ষিণ হস্তের কাছে কলার পাতার উপর কতকটা কাটা তেঁতুল; বঁটির নিম্নে একরাশি কাঁইবীচি ছড়ান। মন্দাকিনীর ওষ্ঠাধর তাম্বূলরাগরঞ্জিত; কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম; অঞ্চলাগ্র গলায় জড়ানো। মন্দা আপন মনে হেঁট হইয়া তেঁতুল কাটিতেছিল, স্বামীকে দেখিতে পায় নাই। অনাথ প্রায় এক মিনিটকাল বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া স্ত্রীর মুখপানে চাহিয়া রহিল। বিবাহের পর এই সে প্রথম মন্দাকে ভাল করিয়া দেখিতেছে!

উঠানে আমগাছের শাখা হইতে একটা পাকা আম বাতাসে পড়িয়া গেল। সেই শব্দে মন্দা চমকিয়া বাহিরের পানে চাহিল:—দেখিল বারান্দায় স্বামী দাঁড়াইয়া। তৎক্ষণাৎ সে বঁটি ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। আধহাত পরিমাণ ঘোমটা টানিয়া জানালার কাছে সরিয়া দাঁড়াইল। তাহার অঞ্চলবদ্ধ চাবিগুলি ঝিন্ ঝিন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল।

অনাথ মৃদুপদক্ষেপে ঘরে প্রবেশ করিল। মন্দাকিনীর পা লক্ষ্য করিয়া পাকানো কাগজখানি ছুঁড়িয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল।

সে চলিয়া গেলে মন্দা কাগজখানি কুড়াইয়া লইল। প্রথমতঃ দুয়ারটা বন্ধ করিয়া দিল। জানালার কাছে আসিয়া কাগজখানি খুলিয়া পাঠ করিল। তাহার পর বাহিরে চাহিল। একটা আমগাছে কাঁচা পাকা অসংখ্য আম ধরিয়া রহিয়াছে। তাহার ভিতরে

বসিয়া কোকিল ডাকিতেছে। অনেক দূরে ঘুঘু ডাকিতেছে। আবার কাগজখানি পড়িল; আবার আমগাছ পানে চাহিল। গাছের ফাঁকে আকাশ দেখা যাইতেছে। মন্দা কাগজখানি বুকে চাপিয়া ধরিল। গলবস্ত্র হইয়া নারায়ণশিলার সম্মুখে উপুড় হইয়া পড়িয়া প্রণাম করিতে লাগিল। উঠিয়া আবার জানালার কাছে গিয়া কাগজখানি পাঠ করিল।

আজ তাহার জীবনের কি দিন! বিবাহের পর এই প্রথম স্বামী তাহাকে সম্ভাষণ করিলেন। জ্বরগায়ে মন্দার বিবাহ হইয়াছিল: ফুলশয্যা হইতে পায় নাই। যে তিনদিন শ্বশুরবাড়ীতে ছিল, স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। তখন সে তেরো বৎসরের। মাঝে একবার আসিয়া কয়েক মাস ছিল, তখন অনাথের নূতন "মতাদি" হইয়াছে। পরিজনবর্গের বহু আকিঞ্চন সত্ত্বেও অনাথ অন্তঃপুরে শয়ন করে নাই। এবার রাগ করিয়া তাহাকে কেহ বাটীর ভিতর আনিবার চেষ্টা করে নাই। অনাথের মাতা প্রতিদিনই নবীনাগণকে এ বিষয়ে অনুরোধ করিতেন। কেহ কর্ণপাত করিত না। এতদিনে স্বামীর কি মনে পড়িয়াছে? মন্দার এ জীবনটা তবে কি বিফল হইবে না? তাহার আত্মীয়াগণের, সখীদের স্বামীর ভালবাসার কথা সোহাগের কথা শুনিয়া শুনিয়া তাহার বুক ফাটিয়া যাইত। মনে হইত, কি পাপ সে করিয়াছে যাহার জন্য ঈশ্বর তাহাকে এমন করিয়া শাস্তি দিতেছেন? এইবার কি সে সব দুঃখ তবে দূর হইবে?

হঠাৎ মন্দাকিনীর চিন্তাস্রোত বাধাপ্রাপ্ত হইল। অর্গলিত দুয়ারে বাহির হইতে কে গুম্ গুম্ করিয়া কিল মারিতেছে।

ব্যস্ত হইয়া মন্দাকিনী দুয়ার খুলিয়া দিল। তাহার ছোট ননদ হরিমতি। হরিমতি বালবিধবা। আজ পাঁচ বৎসর হইল তাহার এ দশা ঘটিয়াছে। হরিমতি মন্দার অপেক্ষা তিন বৎসরের বড়; তবু দুইজনে খুব ভাব। দুইজনে দুইজনের সকল সুখদুঃখের ভাগী!

মন্দাকে দেখিয়া হরিমতি চমকিয়া বলিল. "তোর কি হয়েছে লা?"

মন্দা ধীরে ধীরে উত্তর করিল, "হবে আবার কি?"

"দোর বন্ধ করে কি করছিলি?"

মন্দা চুপ করিয়া রহিল। তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া হরিমতির ভারি সন্দেহ হইল। সে মন্দার গলাটি জড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে বলবিনে ভাই?"

"বলব।" "কখন বলবি?"

"রাত্তিরে" "না এখন বল্।"

মন্দাও বলিবে না হরিমতিও ছাড়িবে না। শেষে মন্দা বলিল।

শুনিয়া হরিমতি প্রথমটা চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর অল্প অল্প হাসিতে লাগিল।

মন্দা জিজ্ঞাসা করিল, "হাসছিস কেন ভাই?"

হরিমতি বলিল, "হাসছি তোর ববটির রকম দেখে। আমি যা ভেবেছিলাম তাই। এবার এসে অবধি ছোড়দার উস্‌খুস্ করে বেড়ান হচ্চে। বলেওছিলাম বড় বউদিদিকে।"

"কি বলেছিলি?"

"বলেছিলাম, ওগো এবার হয়ত ছোড়দার মন হয়েছে। এবার তোমরা চেষ্টা করে দেখ, এবার হয়ত ঘরে আসবেন। তা বউদিদি বললেন—মন হয়েছে ত আসুক না, আমি কি বারণ করেছি নাকি? আমি বললাম—এতদিন আসেননি. এখন আপনা হতে কি আসতে পারেন? লজ্জা করে হয়ত। তিনি বললেন—সেবার অমন ক'রে আমাদের অপমান করলে, আবার আমি সাধতে যাব? আমি তেমন মেয়ে নই। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল! দু মাস ত ছুটী আছে। ভুগুক, জব্দ হোক।"

মন্দা বলিল, "আমি কিন্তু ভাই যেতে পারব না।"

"কেন?"

"সে আমার ভারি লজ্জা করবে।"

হরিমতি হাত নাড়িয়া বলিল "ওলো দেখিস! কচিখুকীটি কিনা! বরের কাছে

যেতে লজ্জা করবে! কতক্ষণে যাবি, ঘণ্টা গুণছিস, তাই বল্। মুখে আর ন্যাকামো করতে হবে না।"

মন্দা বলিল, "না ভাই, ঠাট্টা রাখ্। আমার ভয় হচ্চে।"

"প্রথম দিনটে ভয় হতে পারে! তা একদিন বই ত নয়।"

"রোজ রোজ আমি যাব বুঝি? তা হলে একদিন ধরা পড়তে হবে না?"

"ধরা না পড়লে আর উপায় কি ভাই? একদিন লজ্জা ত ভাঙ্গাতেই হবে?"

"তার চেয়ে তুই বরং বড়দিদিকে বল্‌গে আর একবার। তিনি যা হয় করবেন।"

"আচ্ছা তা বলব; কিন্তু আজকের দিনটা চুরি করেই তোদের দেখা হোক! দেখিস চুরির কাঁচা আমটা পেয়ারাটার মতন চুরির সব জিনিষই বড় মিষ্টি।"

॥ ২ ॥

"ছোটবউ, ও ছোটবউ, ঘুমুলি ভাই?"

রাত্রে শয্যায় হরিমতি মন্দাকিনীকে ডাকিল। মন্দাকিনী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। জিজ্ঞাসা করিল, "বারোটা হয়েছে?"

"বারোটা ছেড়ে এই একটা বাজলো ছোড়দার ঘড়িতে।"

"তুমি বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছিলে?"

"নাঃ—আমার চোখে কি আর ঘুম আছে? যত ঘুম তোর। যার বিয়ে তার হুঁস নেই, পাড়া পড়শীর ঘুম নেই।"

এই কথা বলিয়া হরিমতি প্রদীপ জ্বালিল। আলনা হইতে একখানা ধোয়া দেশী শাড়ী পাড়িয়া বলিল, "নে এইখানা পর্।"

মন্দা বলিল, "না ভাই,—আর অততে কায নেই।"

হরিমতি বলিল, "দূর ছুঁড়ি, এই ময়লা কাপড় প'রে বুঝি যায়?" বলিয়া মন্দার আঁচল ধরিয়া টান দিল। তখন মন্দা হরিমতির আদেশ পালন করিতে পথ পাইল না।

কাপড় পরা হইলে হরিমতি বলিল, "বল্, এগিয়ে দিয়ে আসতে হবে নাকি?"

মন্দাকিনী একটা প্রচলিত দেশীয় ঠাট্টা করিতে যাইতেছিল, কিন্তু সামলাইয়া লইল। কারণ এ সময় হরিমতিকে রাগানো সুবুদ্ধির কর্ম্ম হইবে না। সুতরাং বলিল, "নইলে আমি বউ মানুষ একলা যাব নাকি?"

দুইজনে দুয়ার খুলিয়া বারান্দায় বাহির হইল। নিস্তব্ধ জ্যোৎস্না রাত্রি। মন্দাকিনীর পায়ে মল ছিল, ঝম্ ঝম্ করিতে লাগিল। হরিমতি সে শব্দে চমকিয়া বলিল, "আ মরণ! মল চারগাছা খুলিসনি? ভাবে বিভোর হয়েছিস যে!"

মন্দাকিনী মল খুলিয়া বালিসের নীচে রাখিয়া আসিল। তার পর দুইজনে বৈঠকখানা অভিমুখে চলিল। কাছাকাছি পর্য্যন্ত গিয়া হরিমতি মন্দাকিনীর কাণে কাণে বলিয়া দিল, "দোর ভেজিয়ে রাখব; আস্তে আস্তে সাবধানে আসিস এখন।" বলিয়া সে ফিরিয়া গেল।

মন্দা ধীরে ধীরে সিঁড়ি চারিটি ভাঙ্গিয়া স্বামীর ঘরের বারান্দায় উঠিল। দুয়ারের ফাঁক দিয়া দেখিল, আলো জ্বলিতেছে। প্রবেশ করিতে তাহার অত্যন্ত ভয় হইতে লাগিল। বুকটি দুর্ দুর্ করিতে লাগিল। পা আর উঠে না। শেষে সাহসে ভর করিয়া দুয়ারটি নিঃশব্দে খুলিয়া প্রবেশ করিল।

দেখিল, মাথার শিয়রে বাতি জ্বালিয়া স্বামী নিদ্রা যাইতেছেন।

পিছু ফিরিয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া মন্দাকিনী খিল দিল। বাতিটা নিবাইয়া দিল। ঘরে জ্যোৎস্না প্রবেশ করিয়াছিল, এখন তাহা যেন হাসিয়া উঠিল। স্বামীর বিছানায়, স্বামীর মুখে, জ্যোৎস্না পড়িয়াছে। মন্দা দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ সেই সুপ্ত মুখখানি

দেখিল; ভাবিল—ইনি আমার স্বামী! আমার স্বামী ত বড় সুন্দর।

এইরূপে এক মিনিট অতিবাহিত হইল। মন্দা মনে মনে বলিল—"বেশ মানুষ ত! লোককে ডেকে এনে নিজে দিব্যি করে নিদ্রে হচ্ছে।"

কি করিবে কিয়ৎক্ষণ ভাবিল। শেষে স্থির করিল, কখনও ত পদসেবা করিতে পাই নাই; এই প্রথম সুযোগ ছাড়ি কেন?

তখন সে সন্তর্পণে স্বামীর পদতলে উপবেশন করিয়া, পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। আরামে অনাথশরণের নিদ্রা গভীরতর হইল। জানালা দিয়া মিঠা মিঠা দক্ষিণা বাতাস আসিতেছে। এই ভাবে কিয়ৎকাল—প্রায় আধ ঘণ্টা—কাটিলে, মন্দা স্বামীর পায়ের কাছে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

দুইটা বাজিবামাত্র অনাথের নিদ্রাভঙ্গ হইল। চেতনা প্রাপ্তির প্রথম কয়েক মুহূর্ত্ত অনুভব করিল, তাহার মন যেন কিসের প্রতীক্ষায় ব্যাপৃত রহিয়াছে। ক্রমে স্মরণ হইল, আজ মন্দাকিনীকে আসিতে বলিয়াছে; যতক্ষণ জাগিয়াছিল, তাহারই প্রতীক্ষা করিতে-ছিল। যখন সাড়ে বারোটা হইয়া গেল, তখন মন্দাকিনী আসিবে না বুঝিয়া শয়ন করিয়াছে। এই ভাবিতে ভাবিতে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিল। অমনি তাহার পা মন্দাকিনীর গায়ে ঠেকিল। কোমল স্পর্শে অনাথ বিস্মিত হইয়া উঠিয়া বসিল। দেখিল মন্দাকিনী ঘুমাইতেছে। জ্যোৎস্না তখন সরিয়া গিয়াছে; মন্দাকিনীর মুখখানির উপর পড়িয়াছে। সেই আলোকে অনাথ সুপ্তিমগ্না নবযৌবনা পত্নীকে দেখিতে লাগিল। বড় সুন্দর বলিয়া মনে হইল। ঠোঁট দুখানি এক একবার কাঁপিয়া উঠিতেছে; মন্দা বুঝি তখনও স্বপ্ন দেখিতেছিল?

স্ত্রীর মুখপানে চাহিয়া অনাথ ভাবিতে লাগিল, এ বড় সুন্দর ত! এ যেন নগেন্দ্র-বালার চেয়েও সুন্দর। দুই তিন মিনিট এই ভাবে কাটিলে অনাথ সহসা মুখ ফিরাইয়া লইল; চক্ষু বুজিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "হে ঈশ্বর, আমার হৃদয়ে বল দাও।"

চন্দ্রালোক হৃদয়ে দুর্ব্বলতা আনয়ন করে ভাবিয়া অনাথ তাড়াতাড়ি বাতিটা জ্বালিয়া ফেলিল। কেরোসিনের তীব্র আলোকে মনে হইল বুঝি স্বপ্নজড়িমা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মন্দাকিনীর পায়ে হাত দিয়া তাহাকে জাগাইল।

মন্দা উঠিয়া অত্যন্ত সংকুচিত হইয়া পড়িল। কাপড়চোপড়গুলা কিছুতেই যেন আর বাগ মানে না! অনেক চেষ্টার পর, রীতিমত ঘোমটা দিয়া অনাথের পানে একবার আড়চোখে চাহিয়া, মুখ নত করিয়া বসিল।

নাথ ডাকিল, "মন্দাকিনী।"

মন্দা নিমেষমাত্র কাল ঘোমটার ভিতর হইতে অনাথের পানে দু চক্ষু নামাইল।

"মন্দাকিনী আজ তোমায় কেন ডেকেছি জান?"

মন্দা ঘাড় নাড়িয়া বলিল সে জানে না।

অনাথ বলিল, "তবে শোন। আমার সঙ্গে তোমায় কলকাতায় যেতে হবে। যাবে?"

মন্দা উত্তর করিল না।

অনাথ বলিল, "যাবে কি?"

অতি মৃদুস্বরে মন্দা বলিল, "আমাকে যেখানে নিয়ে যাবে সেইখানে যাব।"

"আমার বাপ মার অমতে অজান্তে। যেতে পারবে?"

মন্দা কোনও উত্তর করে না।

অনাথ বলিল, "কথা কও। এখন লজ্জার সময় নয়। যেতে পারবে? বল।"

মন্দা বলিল, "মা বাপের অজান্তে কেন? তাঁদের অনুমতি নাও না! এখন ত সকলেই বিদেশে স্ত্রী নিয়ে যাচ্চে।"

"সে প্রস্তাব আমি হারু কাকাকে দিয়ে করিয়েছিলাম। বাবার মত নেই। বলেছেন

—ওর এখন মতিগতির স্থিরতা কি? নিজে যে চুলোয় ইচ্ছে হয় সেই চুলোয় যাক। বাড়ীর বউটাকে যে জুতো মোজা পরিয়ে ব্রাহ্মসমাজে নিয়ে যাবে, সে আমি বেঁচে থাকতে দেখতে পারব না।"

"তুমি আমায় ব্রাহ্মসমাজে নিয়ে যাবে সত্যি কি?"

"আমরা দুজনে পবিত্র ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হব।"

মন্দাকিনী প্রমাদ গণিল। স্বামী কি রহস্য করিতেছেন? বলিল, "আমি ঠাকুর দেবতা মানি, কি ক'রে ব্রহ্মজ্ঞানী হব?"

অনাথ রীতিমত গাম্ভীর্যের সহিত বলিল, "ও সকল বিশ্বাস তোমায় পরিত্যাগ করতে হবে। ওসব ভুল। আমি কি ক'রে এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করি?"

"তুমি লেখাপড়া শিখেছ। আমার কি বুদ্ধি আছে?"

"তোমাকে লেখাপড়া শেখাব। কলকাতায় গিয়ে সমস্ত বন্দোবস্ত করে দেবো। মেয়েদের স্কুলে ভর্তি করে দেবো।"

মন্দাকিনী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "লেখাপড়া যদি শিখতে হয় তবে আমি তোমার কাছে শিখব। বুড়ো বয়সে আমি ইস্কুলে যেতে পারব না।"

অনাথ কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "তুমি ভুল বুঝছ। আমরা দুজনে একত্রে এক বাড়ীতে থাকব না ত।"

মন্দাকিনী বিস্মিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তবে আমি কোথায় থাকব?"

"সেই ইস্কুলেই; সেইখানে মেয়েরা পড়ে, থাকে, রীতিমত সকল বন্দোবস্ত আছে।"

মন্দা স্থিরস্বরে বলিল, "তবে আমি যাব না।"

অনাথ দেখিল যেখানে রোগ, সেখানে চিকিৎসা হইতেছে না। সকল কথা খুলিয়া বলা আবশ্যক। বলিল, "কেন আমি এত দিন তোমার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিনি তুমি কিছু শুনেছ?"

মন্দা বলিল, "শুনেছি, কিন্তু ভাল বুঝতে পারিনি।"

"তবে বুঝিয়ে বলি শোন। প্রথমতঃ আমাদের বিবাহ ভালবাসার বিবাহ নয়। দ্বিতীয়তঃ, তার অনুষ্ঠানাদি পৌত্তলিক মত অনুসারে হয়েছে। এই দুটি কারণে, আমার মতে, আমাদের বিবাহ অসিদ্ধ। সুতরাং তুমি আমার স্ত্রী নও, বোনের মত। বুঝলে?" "না, ছিছি।"

"তবে আর একটা কথা খুব স্পষ্ট ক'রে বলি শোন। আমি তোমায় ভালবাসিনে।"

মন্দা বলিল, "তা ত দেখতেই পাচ্চি।"

"আমি আর একজনকে ভালবাসি।"

"তবে আমায় কলকাতায় নিয়ে কি করবে?"

"দেখ মন্দা, আমি তোমায় ভাল না বেসে বিয়ে করেছি, সেই তোমার প্রতি যথেষ্ট অত্যাচার করা হয়েছে। তার উপর তোমার বাকী জীবনটা নিষ্ফল করে দিয়ে আর সর্ব্বনাশ করব না। আমরা দুজনেই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করলে আমাদের বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করা যাবে। তখন তুমি স্বাধীন হবে, যাকে ইচ্ছে বিবাহ কোরো। এই জন্যে কলকাতায় গেলে আমাদের একত্র বাস অসম্ভব। সব কথা বুঝতে পারলে?"

মন্দাকিনী বেশী করিয়া ঘোমটা দিল। কোনও উত্তর করিল না, প্রশ্ন করিল না, কাঠের পুতুলের মত বসিয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে অনাথ জানিতে পারিল, মন্দা কাঁদিতেছে।

ইহাতে অনাথ মনে ক্লেশ অনুভব করিল। ইচ্ছা করিল মন্দার মুখের আবরণ খুলিয়া তাহার চক্ষু দুইটি মুছাইয়া দেয়; কিন্তু তাহার তীক্ষ্ণ কর্ত্তব্যজ্ঞান তাহাকে বাধা দিল। এই গভীর রাত্রে, নির্জ্জন গৃহে, যুবতী স্ত্রীলোকের অঙ্গস্পর্শ করা নীতিসঙ্গত বলিয়া মনে হইল না। সুতরাং শুধু বলিল, "মন্দা, কাঁদ কেন? আমি তোমার মঙ্গলের

জন্যেই ত বলছি।"

কিন্তু মন্দাকিনী কিছুই বলিল না, তাহার ক্রন্দনও থামিল না।

অনাথ ডাকিল, "মন্দা!"—এবার স্বর অন্যরূপ; এ যেন আদরের স্বর। এ স্বর শুনিয়া মন্দা বেশী কাঁদিতে লাগিল।

অনাথ বিস্মিত হইয়া ভাবিল—এ কথায় মন্দার এত দুঃখ কেন? এত ক্লেশ কেন? একটা ভাবী পরিত্রাণের আনন্দ অনুভব করিল না? আমি ভালবাসি না—ভালবাসিতে পারি না,—তাহা জানে; এ বন্ধন ছিন্ন হইলে, জীবনের সুখময় পথে চলিবার অবসর পাইবে। তথাপি এ প্রস্তাবে এত দুঃখ কেন? তবে কি আমায় ভালবাসে?

এই সময় ঘড়িতে টং টং করিয়া তিনটা বাজিল। মন্দা উঠিয়া বলিল, "আমি যাই।"

অনাথ মন্দাকে স্পর্শ করিল, তাহার হাতখানি ধরিল, ধরিয়া বলিল, "তোমার মনের কথা আমায় খুলে বল মন্দা।"

মন্দা কম্পিতস্বরে উত্তর করিল, "আমার এখন মাথার ঠিক নেই।"

"তবে কাল আবার এস। আসবে?"

"দেখব।"

"দেখব না মন্দা, কাল নিশ্চয় এস।" অনাথের কণ্ঠস্বরে একটা আগ্রহ ধ্বনিত হইল।

মন্দা বলিল, "আচ্ছা।"—বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

॥ ৩ ॥

পরদিন যখন অনাথের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন অনেক বেলা হইয়াছে। প্রথমেই মন্দাকিনীর অশ্রুপূর্ণ চক্ষু দুটি ছবির মত তাহার মনে উদয় হইল।

অনাথ উঠিয়া বসিল। দেখিল চুলে পরিবার একটি সোণার কাঁটা বিছানায় পড়িয়া রহিয়াছে। সেটি তাড়াতাড়ি বাক্সের মধ্যে লুকাইয়া ফেলিল।

প্রাতে সে প্রতিদিন সঙ্গীত ও উপাসনা করিয়া থাকে, কখনও বাদ যায় না। আজ আর তাহা হইয়া উঠিল না। আজ তাহার মনটা বড় উদ্‌ভ্রান্ত।

গ্রামের বাহিরে নদীতীরে গিয়া অনাথ পদচারণা করিতে লাগিল। কিয়ৎপরে দেখিতে পাইল, বাটির একজন ভৃত্য মাখন সর্দ্দার ছুটিতে ছুটিতে তাহার অভিমুখে আসিতেছে।

হঠাৎ অমঙ্গল আশঙ্কায় তাহার মন চমকিয়া উঠিল। কি হইয়াছে? ও কি আমাকে ডাকিতে আসিতেছে? মন্দাকিনীর কিছু হয় নাই ত? অথবা সে কিছু করিয়া বসে নাই ত?

মাখন সর্দ্দার নিকটস্থ হইলে অনাথ দেখিল সে কাঁদিতেছে।

দ্রুতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে মাখন? কি হয়েছে?"

মাখন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আর দাদাঠাকুর সর্ব্বনাশ হয়েছে। রোজা ডাকতে যাচ্ছি। কাটি ঘা।"

কাটি ঘা অর্থে সর্পাঘাত। অনাথ ভাবিল মন্দাকিনীকে সর্পে দংশন করিয়াছে। মাখন ততক্ষণ অনেক দূরে। কাহারে এরূপ হইয়াছে তাহা জিজ্ঞাসা করা হইল না।

তখনই অনাথ বাড়ী ফিরিল। প্রথমে সহজ পদবিক্ষেপ আরম্ভ করিয়াছিল, ক্রমে গতির বৃদ্ধি করিল; পরে দৌড়িতে লাগিল।

সদর দরজায় বাড়ীতে আসিতে একটু ঘুরিতে হয়। বাগানের দুয়ার দিয়া প্রবেশ করিল। বাগানে বাগানে বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া কিয়দ্দূরে গাছের আড়ালে হরিমতি ও মন্দাকিনীকে দেখিতে পাইল। তাহারা পুষ্করিণীতে স্নান করিতে যাইতেছে। দেখিয়া অনাথ হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। উভয়েরই মাথার কাপড় খোলা। মন্দাকিনীর মুখখানি বিষণ্ণতা মাখা, হরিমতির চক্ষু দুইটি কৌতুকপূর্ণ। প্রথমে হরিমতিরা অনাথকে

দেখিতে পায় নাই, কাছাকাছি আসিয়া দেখিতে পাইল। মন্দাকিনী ব্যস্ত হইয়া ঘোমটা দিল। হরিমতি অনাথের প্রতি যেন গোপনে হাস্য করিতেছে, যেন তাহার চক্ষু দুইটি দাদাকে বলিতেছে—'আমি সব জানি গো সব জানি।'

অনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "হরি কাকে সাপে কামড়েছে ?"

হরিমতি বিস্মিত হইয়া বলিল, "সাপে কামড়েছে? কই কাকে তা ত জানিনে।"

অনাথ বৈঠকখানায় গিয়া শুনিল, মাখন সর্দ্দারের স্ত্রীকে সর্পদংশন করিয়াছে। তখন সে মাখনের বাড়ীর অভিমুখে চলিল। সেখানে গিয়া দেখিল, অনেক লোক জমিয়াছে, রোজাগণ উচ্চস্বরে মন্ত্র পড়িতেছে। কিন্তু স্ত্রীলোকটি কিছুতেই বাঁচিল না। মাখন যখন রোজা লইয়া আসিল, তখন সব শেষ হইয়া গিয়াছে। তাই দেখিয়া মাখনের যে কান্না! পাঁচ বৎসরের বালকের মত ভূমিতে লুটাইয়া লুটাইয়া সে কাঁদিতে লাগিল। অনেকে সেই শোকাবহ দৃশ্য সহ্য করিতে পারিল না, হায় হায় করিতে করিতে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া গেল। অনাথও চক্ষু মুছিতে মুছিতে বাড়ী ফিরিল। অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিল, একজন কৃষকের অশিক্ষিত অমার্জ্জিত হৃদয়ে এত ভালবাসা? ইচ্ছা করিল হেমন্তকুমারকে আনিয়া একবার এ দৃশ্য দেখায়। সে সর্ব্বদা বলিয়া থাকে, পূর্ব্বরাগবর্জ্জিত, মন্ত্রপড়া বিবাহে ভালবাসা কিছুতেই জন্মিতে পারে না, তাহা একেবারেই অসম্ভব।

বাড়ী পৌঁছিয়া দেখিল হেমন্তকুমারের একখানি পত্র আসিয়াছে।

সত্যমেব জয়তে

কলিকাতা।
১৭ই জ্যৈষ্ঠ, সোমবার।

প্রিয় ভ্রাতঃ,

গত কল্য তোমাকে যে পত্রখানি লিখিয়াছি, তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে। অন্য একটা সুসংবাদ আছে। কান্তপুরের রাজা শ্রীযুক্ত অশ্বিনীরঞ্জন রায় বাহাদুর তাঁহার পুত্রের জন্য গৃহশিক্ষক অন্বেষণ করিতেছিলেন, বৈকালে দুই ঘণ্টা পড়াইতে হইবে। বেতন পঞ্চাশ টাকা। আমি ইহা শ্রবণ করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি। তোমায় তিনি ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারিলে অত্যন্ত সুখী হইবেন; কিন্তু তাহা হইলে তোমায় এক সপ্তাহের মধ্যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। অতএব তুমি পত্র পাঠমাত্র পূর্ব্ব পরামর্শমত শ্রীমতী মন্দাকিনীকে সমভিব্যাহারে লইয়া চলিয়া আইস। তোমার উত্তর পাইলেই বালিকাবিদ্যালয়ে তাঁহার জন্য সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া রাখিব।

আমার সহিত দেখা হইলেই নগেন্দ্রবালা তোমার কথা জিজ্ঞাসা করেন। তোমার প্রতি তাঁহার প্রেম যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভগিনী মন্দাকিনীকে লইয়া আসা সম্বন্ধে তুমি কিছুমাত্র দ্বিধা বা শঙ্কা করিও না। যদি বাধা প্রাপ্ত হও ত স্মরণ করিও, পৃথিবীতে অধিকাংশ শুভকার্য্য সম্পাদনেই বাধা অতিক্রম করিতে হইয়াছিল; ঈশা স্বীয় প্রিয় ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। সর্ব্বমঙ্গলবিধাতা তোমার সহায় হউন।

ভবদীয়
শ্রীহেমন্তকুমার সিংহ

অনাথ হেমন্তকুমারের পত্রের কোনও উত্তর দিল না। মন্দাকিনীর অশ্রুমাখা মুখখানি কেবল তাহার মনে পড়িতে লাগিল। সে যে সম্মত নয়! সে যে ভারি দুঃখিত! কি করিয়া তাহাকে কলিকাতায় লইয়া যাইবে?

অদ্য প্রভাতে মাখন সর্দ্দারের ব্যাপার দেখিয়া তাহার মত ও বিশ্বাসে একটু আঘাত লাগিয়াছে। হয়ত মন্দাকিনী তাহাকে ভালবাসে, তাই বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিবার প্রস্তাবে সে অত দুঃখাতুর! বিবাহের পূর্ব্বে প্রণয়সঞ্চার না হইলে পরে যে তাহা হইবেই না,

তাহার স্থিরতা সম্বন্ধে অনাথের মনে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে।

সন্ধ্যাবেলায় তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রটি আসিয়া তাহার হাতে একটি পত্র দিয়া সবেগে পলায়ন করিল। খাম আঠা দিয়া বন্ধ, ভিতরে চিঠি রহিয়াছে, অথচ কোন শিরোনামা নাই। অনাথ খামখানি ছিঁড়িয়া চিঠি বাহির করিয়া পড়িল; তাহাতে লেখা আছে ঃ—

প্রিয়তমেষু,

তুমি আমায় যেখানে লইয়া যাইবে, যাইতে প্রস্তুত আছি। যে দিন যে সময়ে বলিবে, আমি তোমার অনুগামিনী হইব। আজ রাত্রে সাক্ষাৎ করিতে পারিব না।

চরণাশ্রিতা দাসী
শ্রীমতী মন্দাকিনী দেবী

এই পত্র পাইয়া অনাথ ভারি বিস্মিত হইল। যাইতে প্রস্তুত? বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিতে আর দুঃখ নাই?

কয় পংক্তি অনাথ বারংবার পাঠ করিল। যদি দুঃখ নাই, তবে ভালবাসে না। অথচ লিখিয়াছে 'প্রিয়তমেষু'—'চরণাশ্রিতা দাসী'—ইহার অর্থ কি? ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে স্থির করিল, ওগুলা বাঁধিগৎ, ওগুলার বিশেষ কোনও অর্থ নাই। কিন্তু এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে তাহার মনে ব্যথা বাজিয়া উঠিল।

কিন্তু তাহা ক্ষণিক মাত্র। মনকে সে দুই তাড়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সে তোমাকে ভালবাসে না বাসে তাহাতে তোমার কি? মন বলিল—নাঃ—তাহার জন্য আমার কিছুমাত্র মাথাব্যথা নাই। নগেন্দ্রবালার মানসী প্রতিমাকে সে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত বুকে চাপিয়া ধরিল। ভাবিল, আর একদিনও বিলম্ব করা হইবে না। কলাই মন্দাকিনীকে লইয়া কলিকাতা যাত্রা করিতে হইবে। রাত্রি একটার সময় বাহির হইবে। দুই ক্রোশ দূরে রতনপুর গ্রাম; সে অবধি পদব্রজে যাইবে। সেখান হইতে গরুর গাড়ী করিয়া ষ্টেশনে যাইবে। তারকেশ্বর দিয়া যাইলে আট ক্রোশ, পাণ্ডুয়া দিয়া যাইলে এগার ক্রোশ; পাণ্ডুয়া দিয়া যাওয়াই শ্রেয়ঃ। গ্রামের লোকজনের সঙ্গে দেখা হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। একটু দূরে হইবে, বিলম্ব হইবে, তা আর কি হইবে? সারা রাত্রি তাহার নিদ্রা হইল না। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানা প্রকার কাল্পনিক আয়োজনে তাহার মস্তিষ্ক অত্যন্ত উষ্ণ হইয়া পড়িল।

পরদিন সকালে উঠিয়াই মন্দাকিনীকে লিখিল ঃ—

প্রিয় ভগিনী,

আজ রাত্রি একটার সময় যাত্রা করিতে হইবে। ঐ সময় আমার ঘরে আসিও। জিনিসপত্রের মধ্যে দ্বিতীয় একখানি বস্ত্র ভিন্ন আর কিছুই লইও না।

শ্রীঅনাথশরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

রাত্রি একটার সময়, স্ত্রীকে চুরি করিয়া অনাথ পলায়ন করিল।

॥ ৪ ॥

দুই দিন পরে বেলা বারোটার সময় যখন পাণ্ডুয়ার বাজারে অনাথশরণ গোশকট হইতে মন্দাকিনীর সহিত অবতরণ করিল, তখন রৌদ্র অত্যন্ত প্রচণ্ডভাব ধারণ করিয়াছে। দুইজনেই স্বেদাক্ত কলেবর। গাড়ীভাড়া চুকাইয়া দিয়া অনাথ একটা দোকানে উঠিল। দোকানী অভ্যর্থনা করিয়া মাদুর বিছাইয়া তাহাকে বসাইল। একটা ঝি আসিয়া মন্দাকিনীকে আড়ালে স্ত্রীলোকদের বসিবার স্থানে লইয়া গেল।

সেই ঘরের পশ্চাতেই বারান্দা। বারান্দার নিম্নেই একটা প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা। জল বড় নির্ম্মল, মন্দাকিনীর শরীর বড় উত্তপ্ত; পিপাসায় কণ্ঠাগত প্রাণ। ঝিকে বাজার করিতে পাঠাইয়া মন্দাকিনী স্নান করিতে নামিল। তখনও সে যথেষ্ট বিশ্রাম করে নাই; গায়ের ঘাম পর্য্যন্ত মরে নাই। যতক্ষণ ঝি ফিরিল না, ততক্ষণ,—আধঘণ্টা হইবে,—মন্দা জলে পড়িয়া রহিল। ঝি আসিলে উঠিয়া মাথা গা মুছিয়া রান্না চড়াইয়া দিল।

এই অত্যাচারের প্রতিফল পাইতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। রন্ধন সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই মন্দা প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইল।

অনাথ স্নান করিয়া জল খাইয়া ষ্টেশনে গিয়াছিল গাড়ীর খবর লইতে, এবং হেমন্ত-কুমারকে টেলিগ্রাম পাঠাইতে। ফিরিয়া আসিয়া দেখে, এই ব্যাপার। মন্দার গায়ে হাত দিল, গা একেবারে পুড়িয়া যাইতেছে। চক্ষু দুইটি জবাফুলের মত লালবর্ণ। শীতে হাত পা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে। সঙ্গে না আছে বিছানা বালিস, না আছে বাহুল্য বস্ত্র। মন্দা কিসেই বা শয়ন করে, কি বা গায়ে দেয়?

অনাথ বলিল, "একটু অপেক্ষা কর, আমি একখানা কম্বল চেয়ে এনে বিছানা ক'রে দিচ্ছি।"

মন্দাকিনী বলিল, "তুমি আগে খেতে বস। তোমাকে ভাত বেড়ে দিই, তারপর শোব এখন।"

অনাথ বলিল, "পাগল! এখন ভাত বাড়তে হবে না। তোমার এমন অসুখ, আমি কি খেতে পারি?"

মন্দা কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "আমার অসুখ তা কি? তা ব'লে তুমি উপবাসী থাকবে? দু'দিনের কষ্টে তোমার মুখ শুকিয়ে আধখানি হয়ে গেছে।"

অনাথ দোকানীর নিকট চাহিয়া একখানা বালাপোষ আর খান দুই তিন কম্বল লইয়া আসিল। সেইগুলি দিয়া বিছানা করিয়া মন্দাকে বলিল, "শোবে এস।"

মন্দা বলিল, "ওকি কথা? তুমি না খেলে আমি শোব না।"

অনাথ শুনিল না,—মন্দাকিনীকে শয়ন করাইল। বিছানায় শুইয়া মন্দাকিনী দুই তিন বার বলিল, "ভাত বেড়ে নিয়ে খাও তুমি আপনি। ঠাণ্ডা হয়ে গেলে খেতে কষ্ট হবে।" কিন্তু আর বেশীক্ষণ জিদ করিবার শক্তি তাহার রহিল না; অল্পে অল্পে জ্বরঘোরে অচেতন হইয়া পড়িল।

তিন দিন পরে যখন মন্দাকিনীর জ্ঞান হইল, তখন সে চক্ষু খুলিয়া দেখিল, বিছানার কাছে স্বামী বসিয়া। অনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "মন্দা কেমন আছ?'

মন্দা বলিল, "ভাল আছি। তুমি ভাত খেয়েছ?"—বলিতে বলিতে আশেপাশে দৃষ্টি করিয়া দেখিল, সে দোকান নহে, কাহার গৃহ; পালঙ্কের উপর শয়ন করিয়া রহিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল, "একি! আমি এ কোথায় রয়েছি?"

অনাথ বলিল, "মন্দা, তোমাকে যে আর কথা কইতে শুনব, তা ভাবিনি। তিন দিন কেটে গেছে। এ এখানকার জমিদারের বাগানবাড়ী।"

মন্দা বলিল, "তিন দিন!"

"হ্যাঁ মন্দা, তিন দিন তুমি অচেতন হয়ে ছিলে। এখন যদি বাঁচাতে পারি, তবেই সব সার্থক।"

মন্দা কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া অত্যন্ত ক্ষীণ স্বরে বলিল, "তোমায় একটা কথা বলব?"

অনাথ বলিল, "কি মন্দা?"

"আমাকে বাঁচিও না।"

এ কথা শুনিয়া অনাথের চক্ষু দিয়া জল আসিতে লাগিল। বলিল, "ছি মন্দা, ও কথা কি বলতে আছে? তুমি ভাল হবে, তুমি বাঁচবে।"

মন্দার ঠোঁট দুটি কাঁপিয়া উঠিল। জলভরা চোখ দুইটি অনাথের পানে ফিরাইয়া বলিল, "কি হবে আমার বেঁচে? আমায় যেতে দাও।"

অনাথ বলিল, "না মন্দা, তোমাকে আমি যেতে দেবো না।"

"কি করবে আমায় নিয়ে?"

"আমি তোমায় ভালবাসব।"

রোগিণীর দুর্ব্বল মস্তিষ্ক চিন্তার ভার আর সহিতে পারিল না। চক্ষু মুদিয়া মন্দা

ঘুমাইয়া পড়িল।

কিয়ৎক্ষণ পরে ডাক্তারবাবু আসিলেন। অনাথ সহাস্যমুখে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলিল, "দুপুরবেলাকার ওষুধটায় বেশ ফল হয়েছে। জ্ঞান হয়েছে! এই কিছুক্ষণ আগে কথাবার্ত্তা কয়েছেন।"

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "তবে আর ভাবনা নেই। এ জ্বরটুকু দুদিনে সারিয়ে দেবো; কিন্তু আপনি যে মারা গেলেন। এ তিন দিন ত এক রকম না খেয়ে আপনি ঠায় বসে আছেন। আপনার মত পত্নীপ্রেমিক স্বামী আমি খুব কম দেখেছি।"

অনাথ মনে মনে বলিল, 'খুব কমই বটে।' প্রকাশ্যে বলিল, "আমার স্ত্রী; আমি ত স্বভাবতঃই করব; কিন্তু আপনি যে সহৃদয়তার পরিচয় দিয়েছেন, তার তুলনা নেই।"

প্রবীণ ডাক্তারবাবু আত্মপ্রশংসায় সঙ্কুচিতচিত্ত হইয়া বলিলেন, "আমি বেশী কি করেছি? আমি যা করেছি, সেই ত আমার পেশা, জীবিকা।"

"আপনি যদি বাবুদের ব'লে এ বাগানবাড়ী খুলিয়ে না দিতেন, তাহলে দোকানের সেই স্যাঁৎসেঁতে মেঝেতে কম্বলের উপর শুয়ে আমার স্ত্রী ক'দিন বাঁচতেন?"

ডাক্তারবাবু কথা উল্টাইয়া, অন্য কথা পাড়িলেন। তাহার পর ঔষধ-পথ্যাদি সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া প্রস্থান করিলেন।

সেদিন রাত্রি দশটায় মন্দার জ্বর মগ্ন হইল। সে সারারাত্রি সুনিদ্রা উপভোগ করিল; তাহার পার্শ্বে শয়ন করিয়া অনাথও কয়দিনের পর খুব ঘুমাইল।

॥ ৫ ॥

প্রভাতে যখন ডাক্তারবাবু আসিলেন, তখন মন্দাকিনী তাঁহাকে দেখিয়া মাথায় কাপড় দিল। জ্বর ছাড়িয়াছে শুনিয়া ডাক্তারবাবু অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিলেন। বলিলেন, আর কিছুমাত্র ভয় নাই। এখন ইঁহাকে খুব প্রফুল্ল রাখা প্রয়োজন।

ডাক্তারবাবু চলিয়া গেলে, অনাথ মন্দাকে নিয়মিত ঔষধ-পথ্যাদি সেবন করাইল। তাহার পর দুইজনে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল।

মন্দা বলিল, "এ ক'দিন কি খেলে?"

"ডাক্তারবাবুদের বাড়ী থেকে ভাত আসত?"

"তবে চেহারা এমন হয়ে গেল কেন? একেবারে শুকিয়ে যে আধখানি হয়ে গেছ। আমিই তোমার যত কষ্টের মূল। আমার জন্যে কেন এত করলে?"

অনাথ মৃদু হাসিয়া বলিল, "যদি আমার ব্যারাম হয়, তা হ'লে তুমি আমার জন্যে করতে না?"

মন্দা বিছানার দিকে চাহিয়া, আস্তে আস্তে বলিল, "আর ব্যারামের প্রার্থনায় কাজ নেই।"

অনাথ মন্দার একখানি হাত ধরিয়া আদর করিয়া বলিল, "প্রার্থনা নাই করলাম, হলে করতে কি না?"

"করি না ত কি?"

"কেন?"

অশ্রুবদ্ধ কণ্ঠে মন্দা বলিল, "তুমি যে আমার স্বামী।"

অনাথ মন্দার হাতখানি চাপিয়া বলিল, "তুমি যে আমার স্ত্রী।"

মন্দা সস্মিত মুখে জিজ্ঞাসা করিল, "কবে থেকে?"

"যে দিন তোমায় ভালবেসেছি।"

মন্দাকিনী কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। শেষে বলিল, "তুমি না ব্রাহ্ম? তুমি না মিছে কথা বল না?"

অনাথ বলিল, "আমি ব্রাহ্ম, আমি মিছে কথা বলিনে, আমি তোমায় ভালবাসি।"

"তবে সে দিন বললে 'ভালবাসব'।"

অনাথ নিরুত্তর। বলিল, "তুমি ত আমায় ভালবাস না।"

"কিসে জানলে ?"

"তুমি ত আমাদের বিবাহবন্ধন ছিন্ন হতে দিতে সম্মত হয়েছিলে। তাই ত কলকাতায় যাচ্ছিলে।"

মন্দা হাসিয়া বলিল, "তা বুঝি ?"

"কি তবে ?"

"আমি বুঝি আসতে চেয়েছিলাম ? ঠাকুরঝিই ত আমাকে পাঠালে।"

"তার ভারি ইচ্ছে তোমার আর একটি বিয়ে হয় ?"

"হ্যাঁ—পাত্রও ঠিক করে দিয়েছিল।"

"কে ?"

"যমরাজা।"

অনাথ হাসিতে লাগিল। মন্দা বলিল, "ঠাকুরঝিই বলেছিল, তোকে যেমন দাদা বাড়ী থেকে চুরি ক'রে নিয়ে যাচ্ছে, তুই তেমনি পথে তার মন ডাকাতি করবি। না যদি পারিস, তবে—"

অনাথ বাধা দিয়া বলিল, "তবে ঐ বিয়ের বন্দোবস্ত ? তা ডাকাতিই করেছ বটে! এদিকে অন্য বিয়ের যোগাড়যন্ত্রটিও বেশ ক'রে তুলেছিলে।"

মন্দা বলিল, "কিন্তু সে ভালবাসার বিয়ে হচ্ছিল না। তাই ব্যাঘাত হল। কখন আমি তোমার মনে ডাকাতিটে করেছি, শুনতে পাইনে ?"

"সে সব পরে বলব।"

"কখন করেছি, সেইটে বল না!"

"কখন ? যে দিন আমার বিছানার পা'র তলায় শুয়ে ঘুমুচ্ছিলে, তখন আরম্ভ করেছ আর কি! তার পর সারাপথে।"

চাণক্যপণ্ডিত বুধগণের প্রতি উপদেশ দিয়াছেন, ঘৃতকুম্ভসমা নারী এবং তপ্তাঙ্গারসম পুরুষকে একত্র স্থাপন করিবে না, করিলে বিপদ ঘটিতে পারে। সেই নরনারী যদি স্বামী স্ত্রী হয় এবং তাহাদের বয়স যদি তরুণ হয়, তাহা হইলে কি আর রক্ষা আছে ?

মন্দা অল্প হাসিতে হাসিতে বলিল, "পথে কেন তবে আত্মসমর্পণ করনি ?"

অনাথ কিছু না বলিয়া স্ত্রীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

মন্দা মৃদুস্বরে বলিল, "নগেন্দ্রবালা ? আমার স্বামীকে নগেন্দ্রবালা নেবে, নগেন্দ্রবালার বড় সাধ্যি! চল একবার কলকাতায়, তাকে আমি দেখব!"

অনাথ বলিল, "কলকাতায় ত যাব না। পশ্চিম যাব তোমার শরীর সারাতে।"

মন্দা এ কথা যেন কাণে তুলিল না। জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি সে তোমায় ভালবাসে ? তা হলে তার ত ভারি দুঃখ হবে।"

"সে আমায় ভালবাসে কি না, সেই জানে আর ঈশ্বর জানেন।"

"বলেনি ? জিজ্ঞাসা করনি ?"

"তার সঙ্গে কখনও এ কথা হয়নি।"

"তুমি ভালবাসতে তা সে জানে ?" "কি করে জানবে ?"

মন্দা অভিমান ভরে বলিল, "সে না জানুক, তুমি ত বাসতে!"

অনাথ বলিল, "কই আর বাসতাম ? তা হলে তুমি এত শীঘ্র এত সম্পূর্ণভাবে আমাকে জয় করলে কি ক'রে ? এই ঘটনায় প্রমাণ হয়ে গেল আমি যথার্থ ভালবাসতাম না। শুধু চোখের ভালবাসা ছিল, অন্তরে প্রবেশ করেনি। তার বিদ্যা, তার বুদ্ধি, তার আচার ব্যবহারের সৌন্দর্য্য, এই সমস্ত আমাকে মুগ্ধ করেছিল।"

দুইদিন পরে মন্দা পথ্য পাইল। দুইটি দিন দুইজনে বাগানবাড়ীতে বড়ই আনন্দে যাপন করিল।

আজ সন্ধ্যায় ডাক্তারবাবুদের বাড়ী নিমন্ত্রণ খাইয়া, কল্য প্রভাতের গাড়ীতে তাহারা মুঙ্গের যাত্রা করিবে। সমস্ত ঠিকঠাক।

সন্ধ্যার পর ডাক্তারবাবুর বৈঠকখানায় বসিয়া অনাথ হেমন্তকুমারের নিকট হইতে এই পত্র পাইল —

ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং

কলিকাতা।

২৫ জ্যৈষ্ঠ। মঙ্গলবার।

প্রিয় ভ্রাতঃ,

ভগিনী মন্দাকিনীর অসুস্থতার সংবাদে অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। ঈশ্বর শীঘ্র তাঁহার আরোগ্যবিধান করুন।

আজ তোমায় একটি দারুণ দুঃসংবাদ দিব, প্রস্তুত হও। তুমি বলিয়াছিলে, তোমার দৃঢ় বিশ্বাস, নগেন্দ্রবালা তোমাকে ভালবাসেন। আমারও বিশ্বাস তাহাই ছিল; কিন্তু কল্য সন্ধ্যাকালে আমার সে ধারণা চূর্ণ হইয়াছে। শুনিলাম, শরতের সঙ্গে নগেন্দ্রবালার বিবাহ স্থির। আরও শুনিলাম, দুই বৎসর হইতে তাঁহারা পরস্পরের প্রণয়ে আবদ্ধ। সুতরাং নগেন্দ্রবালার ব্যবহারে তুমি যে অনুমান করিয়াছিলে তোমার প্রতি তিনি প্রণয়বতী, তাহা তোমার ভ্রান্তি মাত্র।

এখন তুমি কি করিবে? এ দুঃসহ শোক কেমন করিয়া বহন করিবে?

তোমার আর একটা ভুল হইয়াছে। হিন্দুমতে যে বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে, নূতন ব্রাহ্ম-বিবাহ আইনের সঙ্গে তাহার কোনও সম্পর্ক নাই। সুতরাং তোমরা উভয়ে ব্রাহ্ম হইলেও সে সম্বন্ধ ছিন্ন করিবার পথ বন্ধ।

তুমি কি কলিকাতায় আসিবে? চারি পাঁচ দিনের মধ্যেও যদি ভগিনী আরোগ্য লাভ করেন, এখানে আসিতে পার, তাহা হইলেও পূর্ব্বকথিত রাজবাড়ীর সেই কার্য্যটি হস্তান্তরিত হইবে না; কিন্তু আমার পরামর্শ, ভগিনীকে গৃহে পাঠাইয়া দিয়া তুমি কিয়দ্দিন হিমালয়ের কোনও নিভৃত প্রদেশে গমন করতঃ তপস্যা ও উপাসনার দ্বারায় চিত্তস্থির ও আত্মশান্তিবিধান করিবে।

ভবদীয়

শ্রীহেমন্তকুমার সিংহ

রাত্রি নয়টার পর ডাক্তারবাবুর বাড়ী হইতে ফিরিয়া অনাথ স্ত্রীকে পত্রখানি দেখাইল। মন্দা পড়িয়া হাসিয়া বলিল, "তবে আর নগেন্দ্রবালার উপর আমার রাগ নেই। মুঙ্গেরে না গিয়ে কলকাতাতেই চল, নগেন্দ্রবালার বিয়েটা দেখতে হবে।"

অনাথ বলিল, "তাই চল। মুঙ্গেরে যাবার আর একটা উদ্দেশ্য ছিল, আমায় ভুলে যেতে নগেন্দ্রবালাকে অবসর দেওয়া।"

শুনিয়া মন্দাকিনী ভারি অভিমানের ভান করিল। বলিল, "তাই তখন মনের কথা খুলে বললেই ত হত! বলা হল তোমার শরীর সারাবার জন্যে পশ্চিম যাচ্ছি।"

বাহিরে অন্ধকার বকুলগাছে একটা কোকিল বসিয়া ছিল, সে হয়ত মানবের ভাষা বুঝিতে পারে। বুঝি মন্দাকিনীর এ ছলনাময় মানকথা শুনিয়া সে ভারি আমোদ পাইল, তাই মুহুর্মুহু ঝঙ্কার দিতে আরম্ভ করিল। অনাথ স্ত্রীকে বক্ষের নিকট টানিয়া লইয়া, তাহার মুখচুম্বন করিয়া বলিল, "না গো, না,—তা নয়।"

[বৈশাখ, ১৩০৭]

বন্য-শিশু

॥ ১ ॥

প্রচুর পরিমাণে শীতবস্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া ১লা ডিসেম্বর কুমুদনাথ স্ত্রী ও দুই বৎসর বয়স্ক শিশুপুত্র সমভিব্যাহারে সিমলা পাহাড় যাত্রা করিলেন। শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষী-কৃত পঞ্জিকায় সে দিনটি যাত্রার পক্ষে শুভতম বলিয়া পরিগণিত ছিল। কিন্তু অলক্ষ্যে থাকিয়া অলখনিরঞ্জন মানুষের গণনায় কখন কি উলটপালট করিয়া দিলেন, গ্রহগণের অবস্থানের কোথায় কি বিপর্য্যয় ঘটাইলেন, কেহ জানে না। এই দম্পতীর পক্ষে এমন অশুভক্ষণে যাত্রা জীবনে আর ঘটে নাই।

বৎসরখানেক ধরিয়া ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিয়া কুমুদনাথের দেহখানি অস্থিচর্ম্মসার হইয়া পড়িয়াছিল। ডাক্তার বলিলেন, "আপনি পশ্চিমে গিয়ে শীতঋতুটা যাপন ক'রে আসুন।"

কুমুদবাবুর স্ত্রীর নাম গিরিবালা। সিমলা পাহাড় তাঁহার জন্মস্থান। নয় দশ বৎসর বয়স অবধি তিনি সিমলায় ছিলেন—তাঁহার পিতা কালীকান্ত মিত্র মহাশয় সিমলায় কর্ম্ম করিতেন। গিরিবালা স্বামীকে ধরিয়া বসিলেন, "সিমলা চল।"

কুমুদনাথ বলিলেন, "সর্ব্বনাশ! এই শীতে সিমলা?"

"ওগো যত ভয় করছ তত কিছুই নয়। সিমলায় শীত ভারি সুন্দর। বরফ পড়া ত কখনো দেখনি, তাও দেখবে; সে অতি চমৎকার দৃশ্য।"

কুমুদবাবু ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, "ক্ষতি নেই, সে বরং আরও ভাল। তবে যদি খুব সাবধানে থাকতে পারেন।"

ডাক্তারের উপদেশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালনপূর্ব্বক তাঁহারা যাত্রা করিলেন। তিন সপ্তাহকাল মহা আনন্দে সিমলায় কাটিল। সিমলা কালেক্টরী আফিসে কুমুদনাথের একটি সতীর্থ ছিলেন—যদুবাবু। তিনি একটি সুন্দর দ্বিতল বাটী ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। কুমুদনাথ প্রথম প্রথম বেশী চলাফেরা করিতে পারিতেন না। কখনও সোফায় শুইয়া সিমলা গাইডবুক হাতে সিমলার সর্ব্বত্র কল্পনায় পর্য্যটনের সুখ অনুভব করিতেন, কখনও বা বাতায়নের নিকট চৌকি পাতিয়া রাজপথে ভারবাহী উষ্ট্রশ্রেণী, এক্কা, টোঙ্গা কিংবা ঝাপানের গতিবিধি নিরীক্ষণ করিতেন। ভারি আনন্দ বোধ হইত—সবই নূতন। বিশেষতঃ একটা দুধে-আলতা বর্ণের পাহাড়ী মুখ দেখিলে কুমুদনাথের পরিতৃপ্তির সীমা থাকিত না। অদূরে কোনও খদের গায়ে সিঁড়ির মত থাক্ থাক্ কাটা শস্যক্ষেত্র, পাহাড়ীদের কুটীর, তাহাদের বেশভূষা, তাহাদের আকার প্রকার—এ সবেরই প্রতি কুমুদ-বাবু কেমন একটা অনির্ব্বচনীয় আকর্ষণ অনুভব করিতেন।

আবার নূতন বিস্ময়। ২০শে ডিসেম্বর ভাল রকম একটা তুষারপাত হইয়া গেল। কুমুদবাবু তাঁহার শিশু পুত্রেরই মত আনন্দে অধীর। গিরিবালা প্রসন্ন হাস্যে স্বামীর আনন্দে আনন্দিত হইলেন।

আজ ২৫শে ডিসেম্বর, বড়দিন। প্রাতে আটটার সময় যদুবাবু আলস্টার গায়ে দিয়া, বুটের উপর পট্টি বাঁধিয়া, সুদীর্ঘ 'বরফের লাঠি' হাতে করিয়া বালুগঞ্জে কুমুদবাবুর বাসায় আসিয়া দর্শন দিলেন। কুমুদনাথ তখন সবেমাত্র শয্যাত্যাগ করিতেছেন। দেখা হইবামাত্র যদুবাবু হাস্যমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন? গায়ে একটু বল পেলেন?"

"হ্যাঁ, অনেকটা উন্নতি দেখতে পাচ্ছি। দু' বেলায় আধসের তিনপোয়া মটন হজম করছি।"

যদুবাবু ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিয়া, যেন ভারি নিরাশ হইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "মোটে আধসের তিনপোয়া? তাও দুবেলায়?"

কুমুদবাবু হাসিয়া বলিলেন, "মশায়, কাল সন্ধ্যেবেলা আমাদের এখানে আপনার

নেমন্তন্ন রইল।"

যদুবাবু লোকটি বড় ভালমানুষ। একটু ঘুরান কথা হঠাৎ বুঝিতে পারেন না। বালকের মত বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করেন 'কি? কি?' বলিয়া দিলে, তখন বালকেরই মত হা হা করিয়া হাসিয়া আকুল হন। নিমন্ত্রণ করায় বলিলেন, "কেন বলুন দেখি? হঠাৎ নেমন্তন্ন করে বসলেন যে?"

কুমুদবাবু বলিলেন, "আধসের তিনপোয়া মাংস খাই শুনে নিরাশ হলেন, আপনি কত খান সেইটে আমি দেখতে চাই।"

যদুবাবু হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। এই সময় ভৃত্য চা আনিল।

হাসি থামিলে যদুবাবু বলিলেন, "আমি একবেলায় একসের দেড়সের অনায়াসে পার করি। এখন আর বেশী পারিনে; পূর্ব্বে যখন নীচে রাবলপিণ্ডিতে ছিলাম, একবার সখ হয়েছিল ভেড়ার মাথা খাবার। প্রত্যহ একটা করে এত বড় ভেড়ার মাথা ক্রমাগত চল্লিশ দিন খেলাম। চল্লিশ দিনের পর, চর্ব্বিতে গা ফাটতে লাগল। একজন ডাক্তার ছিল, সে বারণ করলে। বললে গায়ে বেশী চর্ব্বি হলে হৃদ্‌রোগে মারা পড়বে।"

কুমুদনাথ শুনিয়া অত্যন্ত আমোদ অনুভব করিলেন। বলিলেন, "কাল আপনার জন্যে একটা ভেড়ার মাথাও প্রস্তুত থাকবে।"

দুইজনে আরাম করিয়া উষ্ণ চা পান করিতে লাগিলেন। যদুবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "খুব বেড়াচ্ছেন ত?"

"হ্যাঁ—খুব নয়; তবে বেড়াচ্চি বইকি। কাল জ্যাকো প্রদক্ষিণ ক'রে এসেছি।"

"আর একটু সবল হোন, তারপর আমি আপনাকে নিয়ে বেড়াব। এখন আপনি পারবেন না আমার সঙ্গে, হাঁপিয়ে পড়বেন।"

প্রথম পাত্র নিঃশেষ করিয়া যদুবাবু দ্বিতীয় পাত্র চা গ্রহণ করিলেন। এতক্ষণ ঘরে বাতি জ্বলিতেছিল, বাহিরে আলো হইয়াছে দেখিয়া ভৃত্য সার্সির উপর হইতে পর্দ্দা সুরাইয়া দিল, বাতি নিভাইল।

দ্বিতীয় পাত্র নিঃশেষ করিয়া যদুবাবু বিদায় চাহিলেন।

কুমুদবাবু বলিলেন, "বসুন না, অত তাড়াতাড়ি কি?"

"একটু কায আছে।"

"যোগ-টোগ নাকি?"

যদুবাবু যে গোপনে যোগ অভ্যাস করিয়া থাকেন, এ কথা সিমলার আবালবৃদ্ধ সকল বাঙ্গালীই অবগত আছে।

সলজ্জ হাসি হাসিয়া যদুবাবু বলিলেন, "সে সব হয়েটয়ে গেছে।"

"তবে?"

"আজ একটু অন্য কায আছে। সকাল সকাল খেয়ে, একবার তারাদেবী যেতে হবে। মেয়েরা অনেক দিন থেকে ধরেছে।"

"তারাদেবী যাবেন? তা আমায় বলেননি কেন? আমার স্ত্রীও যে এসে অবধি একদিন যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছেন। কতদূর বলুন দেখি?" "এই, ছ সাত মাইল।"

"রিক্‌শ যায়?"

"নীচে অবধি যায়, টিব্বেতে অবিশ্যি কি করে উঠবে?"

"কখন বেরুলে সন্ধ্যের মধ্যে ফেরা যায়?"

"বারোটার সময় বেরুলেই যথেষ্ট।"

সমস্ত পরামর্শ ঠিক হইল। যদুবাবু বলিলেন—আরও সকালে—১১টার সময়—বাহির হওয়া ভাল। আজ সৌভাগ্যক্রমে আকাশটাও বেশ পরিষ্কার আছে। বিগত তুষারপাতের পর পাঁচ দিন অতীত হইয়াছে—তুষার গলিয়া শুকাইয়া পথও বোধ হয় পরিষ্কার হইয়া গিয়া থাকিবে।

যদুবাবু বলিলেন ১১টার সময় তাঁহাদের রিক্‌শ এবং ইঁহাদের জন্য তিনখানি খালি রিক্‌শ (একখানি খোকার চাকরের জন্য) আসিয়া উপস্থিত হইবে। বলিয়া তিনি বরফের লাঠি হাতে করিয়া হাসিতে হাসিতে মস্‌ মস্‌ শব্দে অন্তর্হিত হইলেন।

কুমুদবাবু ভাবিতে লাগিলেন, "বাস্‌রে! একটা যেন অসুর বিশেষ! কি ক'র্‌লে অমন হওয়া যায়?"

কিয়ৎক্ষণ পরে এই কক্ষে গিরিবালা আসিলেন। তিনি কিন্তু তারাদেবী যাইবার প্রস্তাব শুনিয়া ততটা হর্ষ প্রকাশ করিলেন না। বলিলেন, "আবার সঙ্গী যোটালে কেন? আমরা দুজনে যেতাম। তোমার সঙ্গে কথাও কইতে পাব না কিছুই নয়।"

কুমুদবাবু বলিলেন, "বিদেশে সঙ্গীহীন হয়ে কোথাও যাওয়া কিছু নয়—আর এঁরা সব জানেন শোনেন; ভাল ক'রে সব দেখিয়ে শুনিয়ে দিতে পারবেন।"

গিরিবালা মৃদুস্বরে বলিলেন, "আমিও এখানকার সব জানি, সব শুনি।"

তখন বেলা প্রায় ১০টা। ইঁহারা ক্রমশঃ স্নানাহার শেষ করিলেন। খোকাকে দুধ খাওয়ান হইল। তাহাকে কাজল পরান হইল। সাজসজ্জা হইল।

সাড়ে এগারোটার সময় যদুবাবুরা ফটকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যাত্রা করিবার সময় গিরিবালার দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দিত হয় নাই, ভাবী অমঙ্গলের কোন সূচনাই তাঁহাকে চঞ্চল করে নাই। তথাপি কেমন বিষণ্ণ-মনা হইয়া রহিলেন। এখন যখনই এই তারাদেবী যাত্রা ঘটনা তাঁহার স্মরণ পথে উদিত হয়, সমস্ত দেহ শিহরিয়া উঠে।

সিমলার সীমা পার হইয়া কুমুদবাবু রিক্‌শ হইতে অবতরণ করিয়া যদুবাবুর সহিত পদব্রজে চলিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া বধূদের সাধ হইল, তাঁহারাও হাঁটিয়া যাইবেন। নামিলেন; কিছুদূর যাইতে না যাইতে পরিশ্রান্ত হইয়া, আবার রিক্‌শয় উঠিলেন। যদুবাবু হাসিয়া মন্তব্য করিলেন, "মেয়েদের কোন ক্ষমতাই নেই, কেবল সকল কাযেই একটা লাফালাফি আছে। এই পাহাড়ের পথে চলা কি ওদের কায!"

গিরিবালা সঙ্গিনীদের সঙ্গে হাস্যালাপে আবার প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহার মনে আর কোনও বিষণ্ণতা নাই।

দুইটার সময় তারাদেবীতে রিক্‌শ পৌঁছিল। সে একটা পর্ব্বতচূড়া। স্বীয় পাদমূল হইতে প্রায় দুই শত ফিট উচ্চ। রিক্‌শ ছাড়িয়া ইঁহারা চূড়ারোহণ আরম্ভ করিলেন।

মন্দিরের অভ্যন্তরে পাথরে সিন্দুর মাখান তারাদেবী বিগ্রহ। দেখিলে ভীতির সঞ্চার হয়। মেয়েরা পূজা আদি করিলেন। পুরুষ দুইজন চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া স্বভাবের শোভা দর্শন করিতে লাগিলেন। একদিকে গভীর খদ, অন্যদিকে সমুচ্চ অরণ্য। অত্যন্ত নির্জ্জন, ভাবুক-জনপ্রিয় স্থান। অদূরে হিমালয়ের তুষারাবৃত শৃঙ্গ দেখা যাইতেছে। মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্রে অতি-ঔজ্জ্বল্যে ঝক্‌ঝক্‌ করিতেছে।

মন্দিরের পূজারী বাবাজী ইঁহাদের সহিত গল্প আরম্ভ করিল। বাবাজীর বাড়ী জিলা হোসিয়ারপুর। কিরূপ আয় হয়? সে অতি সামান্য। পাহাড়িয়াগণ প্রায়ই পয়সাকড়ি দেয় না, কেহ বা গোধূম, কেহ বা আলু, কেহ বা মধু দিয়া যায়। বড়লোক, দলপতি, রাজা মহারাজ আসিলে একদমে অনেক লাভ হইয়া যায়। জলের বড় কষ্ট। নীচে বাউলিতে ঝরণার জল সঞ্চিত থাকে, সেইখান হইতে কলসী ভরিয়া লইয়া আসিতে হয়। এই সময়, অদূরে চিড়বৃক্ষের তলে, শিশুর ক্রন্দনধ্বনি শুনা গেল। একটা পাহাড়িয়া শিশু রৌদ্রে শুইয়া ঘুমাইতেছিল, সে উঠিয়া বসিয়া ক্রন্দন আরম্ভ করিয়াছে।

তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া পুরোহিত বলিল, "বাবুজি, আজ দুইদিন উহাকে লইয়া মহা বিপদে পড়িয়াছি।"

বন্ধুদ্বয় ধীরে ধীরে শিশুর কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার গায়ে কিসের চামড়ার একটা জামা। মাথায় স-লোম চামড়ায় একটা অদ্ভুত টুপী। গলায় কতক-

গুলি নানাকৃতি হাড়গাঁথা মালা। বৎসর দুই বয়স হইবে। বাবাজী বলিল, দুইদিন হইল ছেলেটিকে সে কুড়াইয়া পাইয়াছে। কোনও পাহাড়িয়া রমণী ইহাকে হারাইয়া গিয়াছে, আজিও খুঁজিতে আসিল না। কেই বা ইহাকে খাওয়ায়, কেই বা কি করে!

কুমুদনাথ যদুবাবুকে বলিলেন, "চন্দন একে আমরা নিয়ে যাই।"

"পাগল হয়েছেন? কি করবেন একে নিয়ে?" "মানুষ করব।"

"যদি এর মা এখানে খুঁজতে আসে?"

"বাবাজীকে ঠিকানা দিয়ে যাব; মার ছেলে মাকে ফিরিয়ে দেবো।"—বলিয়া কুমুদনাথ স্ত্রীকে নির্জ্জনে ডাকিলেন। তাঁহাকে বলিতে প্রথমে তিনি স্বীকৃত হইলেন না। কুমুদনাথ অসহায় শিশুটির পক্ষ অবলম্বন করিয়া স্ত্রীকে অনেক বুঝাইলেন। বলিলেন, "দেখ, এরা অসভ্যজাতি, এদের কি ছেলে হারালে কোনও দুঃখ আছে? তা'হলে মা আসত, নিয়ে যেত। এখানে থাকলে ছেলেটি দু' দিনে মারা পড়বে।"

এ কথায় গিরিবালার মাতৃহৃদয় বিচলিত হইল। তিনি শিশুটিকে লইতে সম্মত হইলেন। বোতলে খোকার জন্য দুগ্ধ ছিল, তাহার কিয়দংশ তাহাকে পান করান হইল।

নামিবার সময় উপস্থিত। ৪টা বাজিতে বেশী বিলম্ব নাই। ৫টার সময় সূর্য্যাস্ত হইবে। খোকা স্বীয় পিতৃক্রোড় দখল করিল—তাহার চাকরের কোলে বন্য-শিশুকে দেওয়া হইল। রাত্রি ৭টার সময় ইঁহারা দলবলে সিমলায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

॥ ২ ॥

পরদিন গিরিবালা বন্য-শিশুকে উষ্ণজলে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া, গলার মালা খুলিয়া, ফ্ল্যানেলে মুড়িয়া, কাজল পরাইয়া, মানুষের মত করিয়া তুলিলেন। কুমুদনাথ বলিলেন, ইহার নাম রহিল 'বুনো'।

খোকা এইবার তাহার সহিত ভাব করিল। এতক্ষণ তাহার কিম্ভূতকিমাকার বেশ দেখিয়া ভয়ে তাহার কাছে ঘেঁসে নাই।

সন্ধ্যাবেলায় যদুবাবুর নিমন্ত্রণ ছিল। তিনি আসিয়া প্রমাণ করিয়া দিলেন যে বৃথা আস্ফালন করা তাঁহার অভ্যাস নহে। আহারান্তে বলিলেন, "কোত্থেকে একটা ছেলে কুড়িয়ে আনলেন, একদিন এর ফলভোগ করতে হবে।"

কুমুদনাথ হাসিলেন; বলিলেন, "মশায়, এ ত আর বাঘের শিশু নয় যে বড় হয়েও জাতিধর্ম্ম ভুলবে না, একদিন ঘাড় শুষে রক্ত খাবে!"

যদুবাবুর কোনও উত্তর যোগাইল না। একটু থমকিয়া গিয়া, এক মিনিট পরে উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন, "তা ঠিক, তা ঠিক। তা, দেখুন মানুষ করে, এ বুনো যদি পোষ মানে।"

বন্য-শিশু সারাদিন বেশ খেলা-ধুলো করিল; কিন্তু পরদিন প্রভাতে দেখা গেল, তাহার গা ভারি গরম হইয়াছে—জ্বর হইয়াছে।

সারাদিন ছেলেটা জ্বরঘোরে অচেতন হইয়া পড়িয়া রহিল। বৈকালে কুমুদনাথ ডাক্তার আনাইলেন। ডাক্তার বলিল, ঠাণ্ডা লাগিয়া ফুসফুসে বিকৃতি ঘটিয়াছে। ঔষধপত্রের ব্যবস্থা হইল। রীতিমত চিকিৎসায় দুইদিন কাটিল। কিন্তু শিশুটি কিছুতেই বাঁচিল না।

২৯শে ডিসেম্বর রাত্রি দুইটার সময় গিরিবালার কোলে তাহার মৃত্যু হইল।

গিরিবালা অনেক কাঁদিলেন। বলিতে লাগিলেন, "আহা কার বাছা? আমরা যদি না আনি ত ভালই করি। কেন এ কুবুদ্ধি হল? মিছামিছি নিমিত্তের ভাগী হতে হল। এখন যদি তার মা আসে তবে কি হবে, কি জবাব দেবো?"

সঙ্গীহারা হইয়া খোকা একটু বিমনা হইল। থাকে থাকে আর জিজ্ঞাসা করে, "বুনো কোথায় গেল?"

সারাটা দিন এই দম্পতির মনের অসুখে কাটিল।

রাত্রি প্রায় নয়টা; আহারাদির পর কুমুদবাবু শয়নের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, এমন সময়

নিম্নে ডাকপিয়নের কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল। ভৃত্যকে পত্র দিয়া সে ফিরিয়া গেল, তাহার পদশব্দও পাওয়া গেল। কুমুদনাথ প্রতিমুহূর্তে পত্রহস্তে ভৃত্যের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু সে আর আসে না। নাম করিয়া ডাকিবার জন্য জানালা খুলিলেন। অত্যন্ত শীতল বায়ুর সঙ্গে সঙ্গে একটা অস্ফুট কোলাহলধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিল। ব্যাপারটা কি জানিবার জন্য কুমুদনাথ লণ্ঠন লইয়া নিম্নে অবতরণ করিয়া গেলেন। দেখিলেন, চাকর বিশুয়া একটি সুন্দরী যুবতী পাহাড়িয়া স্ত্রীলোককে ধরিয়া রাহিয়াছে। স্ত্রীলোকটা অত্যন্ত বলপ্রয়োগ করিয়া ছাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। কুমুদনাথকে দেখিবামাত্র সে বস্ত্রাঞ্চল হইতে কুক্‌রী ছুরি বাহির করিল। তাহা দেখিয়া কুমুদনাথ পিছু সরিয়া আসিলেন, বিশুয়াও তাহাকে ত্যাগ করিল। তখন সে উন্মুক্ত দ্বারপথে বাহির হইয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিল।

বিশুয়া মহা উত্তেজিত হইয়া বলিল, "বাবু—চোর।"

কুমুদবাবু তাহার বুদ্ধির উপর দোষারোপ করিয়া বলিলেন, "ধরলি ধরলি, হাতদুটো যদি ধরতিস, তবে ছুরি বার করতে পারত না।"

বিশুয়া বলিল—উহাদের গায়ে ভারি জোর; জাপটাইয়া না ধরিলে রাখা যাইত না।

যাহা হউক, কুমুদনাথ বিবেচনা করিলেন, চোর চুরি করতে পারে নাই, পলাইয়াছে মাত্র, ইহাই ভাল। ধরিলে পুলিশে দিতে হইত এবং তাহা লইয়া অনেক হাঙ্গামা পোহাইতে হইত। ফিরিয়া, উপরে গিয়া শয়ন করিলেন। গিরিবালা সব শুনিয়া বলিলেন—"চোর নয়, তোমার চাকরের সখী। ধরা পড়বার ভয়ে উপস্থিত বুদ্ধির ব্যবহার করেছে।"

"তবে ছুরি কেন?"

"জান না বুঝি? ও পাহাড়ী মেয়েদের দস্তুর। সঙ্গে সর্ব্বদা ছুরি থাকে।"

পরদিন প্রভাতে কুমুদবাবু চাকরটাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন, কিন্তু সে কিছুতেই ঐ রমণীকে স্বীয় প্রণয়িণী বলিয়া স্বীকার করিল না।

॥ ৩ ॥

সেদিন আকাশ বেশ পরিষ্কার। খোকাকে ঠেলাগাড়ীতে বসাইয়া তাহার চাকর তাহাকে বেড়াইতে লইয়া গেল। তখন বেলা দুইটা। গিরিবালা চাকরকে বারংবার করিয়া বলিয়া দিলেন, যেন এক ঘণ্টার বেশী বিলম্ব না হয়!

তিনটা বাজিল তবু খোকা ফিরিল না। সাড়ে তিনটার সময় স্বামী স্ত্রী উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। খোকার অন্বেষণে চাকর পাঠাইবার পরামর্শ হইতেছে, এমন সময় পুলিশ আফিস হইতে পত্র আসিল; বিশেষ ঘটনা উপলক্ষ্যে দারোগা কুমুদবাবুকে এখনি থানায় আহ্বান করিতেছেন।

একে ছেলে ফিরিল না, তাহার উপর পুলিশ হইতে এই পত্র; একটা আসন্ন বিপদের ভয়ে দুই জনেই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

কুমুদবাবু তৎক্ষণাৎ বাহির হইলেন। গিরিবালা শূন্যগৃহে শরবিদ্ধ হরিণীর মত ছটফট করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ অতীত হইলে পর, গিরিবালা ভৃত্য বিশুয়াকে থানায় পাঠাইয়া দিলেন, বলিলেন বাবুর যদি আসিবার বিলম্ব থাকে, তুই যত শীঘ্র পারিস সংবাদ আনিবি কি হইয়াছে।

কুমুদবাবু থানায় গিয়া দেখিলেন, অত্যন্ত জনতা। বারান্দায় ঠেলাগাড়ীতে খোকা ক্রন্দন করিতেছে; একজন কনষ্টেবল প্রহরায় নিযুক্ত। কুমুদবাবু গিয়া খোকাকে কোলে করিলেন। তাহার মুখচুম্বন করিলেন। খোকা তখন আশ্বস্ত হইয়া চুপ করিল।

দারোগা সেলাম করিয়া বলিল, "বাবু, আর একটু হইলে আজ আপনার সর্ব্বনাশ হইয়াছিল। একটা লেপচা স্ত্রীলোক এই শিশুকে খুন করিতে উদ্যত হইয়াছিল। আপনার ভৃত্য বাধা দিতে তাহাকে ছুরিকাঘাত করিয়াছে।"

"চাকর কোথায় ?"

"তাহাকে রিপন হাসপাতালে পাঠাইয়াছি।"

"বাঁচিবে ত ?"

"শঙ্কা নাই, বাঁচিবে। ছেলেও খুন করিত, কিন্তু খোদাবক্স সিপাহী গিয়া তাহাকে ধৃত করে।"

কুমুদবাবু অতিশয় বিস্মিত হইয়া পড়িলেন। মনে হইল, কল্য রাত্রির সেই পাহাড়িয়া রমণী নহে ত? দারোগাকে বলিলেন, "বন্দিনী কোথায় ?"

দারোগা কুমুদবাবুকে গারদ ঘরে লইয়া গেল। কুমুদনাথ দেখিলেন, সেই বটে, সেই পাহাড়িয়া সুন্দরী। ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহার মনের রহস্য উদ্ভেদ করিতে পারিলেন না। সে কেন তাঁহার প্রতি এমন শত্রুতাপন্ন ?

দারোগাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কেন আমার ছেলেকে মারিতে চেষ্টা করিয়াছিল কিছু জানেন ? কিছু স্বীকার করিয়াছে ?"

দারোগা বলিল, "ও বলে, তারাদেবী পাহাড়ে ওর ছেলে হারাইয়া গিয়াছিল, আপনি আনিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছেন, তাই ও প্রতিশোধ লইতে চাহে।"

কুমুদবাবু বলিলেন, "আমি মারিয়া ফেলিয়াছি !—আমি—"

দারোগা বলিল, "সে আমি আপনার ভৃত্যের এজেহারে সমস্ত জানিতে পারিয়াছি। দেখুন বাবু, ইহারা অসভ্য জাতি, ইহারা কি বুঝিবে যে আপনি ধর্ম্ম ভাবিয়া, উহার শিশুর প্রাণ রক্ষার জন্যই লইয়া আসিয়াছিলেন? উহাদের বিশ্বাস, আপনি মারিয়া ফেলিবার জন্যই আনিয়াছিলেন এবং মারিয়াই ফেলিয়াছেন।"

কুমুদনাথ পূর্ব্বেই বিশুয়ার কোলে খোকাকে বাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। এখন তাঁহার নিজ এজেহার দিয়া, একটা কুলি ডাকিয়া খোকার ঠেলাগাড়ী সহ বাড়ী ফিরিলেন।

গিরিবালা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "আমার বাছার পুনর্জ্জন্ম হল আজ। কি কুক্ষণেই বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলাম। চল, ফিরে চল দেশে, এখানে আর একদণ্ডও আমার থাকতে ইচ্ছে নেই।"

পরদিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল। বৃষ্টিপাতের পর তুষারপাত আরম্ভ হইল। খোকার যে আমোদ! জানালা দিয়া হাত বাহির করিয়া তুষার স্পর্শ করিতে চায়।

ভারি অন্ধকার। চারটা বাজিতে না বাজিতে ঘরে আলো জ্বালিতে হইল। কুমুদবাবু বলিলেন আজ সকাল সকাল আহার করিয়া লওয়া যাউক।

খোকা সারাদিন খেলা করিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ছয়টার সময় কুমুদনাথ আহারে বসিলেন। গিরিবালা তাঁহার কাছে আগুন জ্বালিয়া বসিয়া গল্প করিতে লাগিলেন।

আহার শেষ হইলে কুমুদনাথ ঘেরা বারান্দায় বাহির হইলেন। দেখিলেন একটা স্ত্রী-লোক বিদ্যুতের মত তাঁহার সম্মুখ দিয়া দ্রুত ছুটিয়া গেল। সে আর কেহ নয়; সেই সর্ব্বনাশী লেপচা-রমণী; কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে রক্ষীকে হত্যা করিয়া গারদ হইতে পলাইয়া আসিয়াছে।

মুহূর্ত্তের উত্তেজনাবশতঃ কুমুদনাথ তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন; নিম্নে অবতরণ করিবামাত্র দেখিলেন, বিশুয়া চাকরের গলদেশ ছিন্ন, রক্তে ঘর প্লাবিত। দেখিয়া কুমুদনাথের গা ঝিমঝিম করিতে লাগিল। বুদ্ধি লোপ হইল। মাতালের মত টলিতে টলিতে সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া গেলেন।

শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন গিরিবালা মেঝের উপর লুটাইয়া লুটাইয়া ক্রন্দন করিতেছে; সেই রাক্ষসী খোকাকেও হত্যা করিয়া গিয়াছে!

বাহিরে শীত-রজনী অবিরাম তুষার বর্ষণ করিতে লাগিল।

[জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭]

কাশীবাসিনী

॥ ১ ॥

দানাপুর ষ্টেশন হইতে দানাপুর সহর পাঁচ মাইল দূরে, ষ্টেশনটি যে স্থানে অবস্থিত তাহার নাম খগোল।

খগোলের বাজার হইতে কিয়দ্দূরে, ষ্টেশনের মালগুদামের ছোটবাবু গিরীন্দ্রনাথের বাসাবাড়ী। মৃন্ময় গৃহখানি, খোলার চাল। রাস্তা হইতে তিনটি সিঁড়ি উঠিয়া একটু বারান্দা মত। তাহার পরই অন্তঃপুর। দুখানি শয়ন ঘর, একটি রসুই ঘর, একটি কাঠ রাখিবার ঘর (কপাট নাই);—উঠানটি টালি বিছান; মধ্যস্থানে উচ্চ আলিসাযুক্ত কূপ; মাসিক ভাড়া সাড়ে তিন টাকা।

গিরীন্দ্র চাকরিতে প্রবেশ করিয়া সংসর্গদোষে চরিত্র নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল। প্রায় দশ বৎসর কাল মদ্যপানাদি যথেচ্ছাচারে কাটাইয়া, সম্প্রতি বৎসর-দুই কিঞ্চিৎ ভদ্র হইয়াছে—অর্থাৎ বিবাহ করিয়াছে। স্ত্রীটি একটু বড় সড়;—বড় সড় দেখিয়াই বিবাহ করিয়াছিল। নাম মালতী। মুখখানি বেশ লালিত্যমাখা। রঙটি তত ফর্সা নহে। এই বয়সেই বেচারি বিদেশে একাকী স্বামীঘর করিতে আসিয়াছে। শ্বাশুড়ী নাই—ননদ নাই—দেখিবার, যত্ন করিবার কেহ নাই। স্বামী আপিস চলিয়া গেলে এমন কেহ নাই যাহার সঙ্গে বসিয়া মালতী দুই দণ্ড গল্প করে। সম্বলের মধ্যে এক বুড়ী দাই ভজুয়ার মা। দিনরাত্রি বাড়ীতে থাকিয়া বধূকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবে—এইজন্য বেতন এক টাকা বেশী। খগোলে অনেকদিন স্থায়ী একটি বাঙ্গালী পরিবার এই দাইটিকে পুরাতন ও বিশ্বাসী বলিয়া সুপারিশ করিয়া দিয়াছেন। সে যে পুরাতন তদ্বিষয়ে কাহারও কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। তাহার মস্তকের শুভ্র কেশ, দেহের স্থৌল্য, চর্ম্মের লোলতা এ বিষয়ে সাক্ষ্যদান করিতেছে। এবং বোধ হয় বিশ্বাসীও বটে, কারণ বাজার করিতে যাইতে তাহার অত্যন্ত অনিচ্ছা দেখা যায়। গিরীন্দ্র বেচারী অত্যন্ত ভালমানুষ; নিজেই হাটবাজার করিয়া কুলির মাথায় দিয়া লইয়া আসে। ভজুয়ার মা ততক্ষণ বারান্দার কোণে শুইয়া নিদ্রা উপভোগ করে।

শীতকাল, তিনটা বাজিয়া গিয়াছে, আর বেলা নাই। মালতী শয়নকক্ষ হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। যথাস্থানে চট বিছাইয়া, কালো কম্বল মুড়ি দিয়া ভজুয়ার মা নাসিকাধ্বনিপূর্ব্বক মালতীকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে। মালতী তাহার পানে চাহিয়া অনুচ্চস্বরে বলিল—'আঃ, হতভাগী কি ঘুমের বোঝা নিয়েই পৃথিবীতে এসেছিল!'

এমন সময় বাহিরে একটা পুরুষকণ্ঠ 'বাবু' 'বাবু' শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। মালতী ছুটিয়া সদর দরজার কাছে গেল। অজস্র ছিদ্রসঙ্কুল দরজাটি বন্ধ—একটি ছিদ্রে চক্ষু লগ্ন করিয়া দেখিল একজন রেলওয়ে কুলি, মাথায় একটা তোরঙ্গ, হাতে একটা পুঁটুলি—দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতেছে, তাহার পশ্চাতে একজন বিধবাবেশিনী প্রৌঢ়া বাঙ্গালী স্ত্রীলোক।

চকিতের মধ্যে মালতী ফিরিয়া, দাইকে ডাকাডাকি আরম্ভ করিল। কিছুতেই দাইয়ের নিদ্রাভঙ্গ হয় না দেখিয়া সে অবশেষে তাহার গায়ে হাত দিয়া—'আগে ভজুয়াকে মা—ঈ' বলিয়া খুব জোরে নাড়া দিতে লাগিল। দাই তখন উঠিল—শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে গিয়া দরজা খুলিয়া দিল।

এক মিনিট পরে স্ত্রীলোকটি আসিয়া বারান্দায় দাঁড়াইলেন। মালতীর মুখপানে শান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। মালতী ভাবিল, স্বামীর কোনও আত্মীয়া হইবেন—কিন্তু কাহারও আসিবার কথা ত ছিল না; প্রণাম করিবে কিনা ভাবিতে লাগিল।

নবাগতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই কি গিরীন্দ্রবাবুর বাড়ী?"

মালতী বলিল, "হ্যাঁ।"

"তুমি তাঁর বউ?"

মালতী অন্যদিকে চাহিয়া, মাথা হেলাইয়া জানাইল যে তাহাই। তাহার পর সাহস সংগ্রহ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনাকে যে চিনতে পারলাম না—কোথা থেকে আসছেন?"

"আমি আসছি কাশী থেকে। গাড়িতে যাচ্ছিলাম, টিকিট হারিয়ে গিয়েছিল তাই নামিয়ে দিলে। শুনলাম আবার সেই রাত একটায় গাড়ী। একলা মেয়েমানুষ কোথায় যাই —তাই একজন ভদ্রলোকের বাড়ী খুঁজে এলাম।"

মালতী বলিল, "তা বেশ করেছেন। হাত পা ধুয়ে ফেলুন।"

দাই জল দিল। তিনি হস্তপদাদি ধৌত করিলেন। মালতী ততক্ষণ একটি শতরঞ্চ আনিয়া বারান্দায় বিছাইল। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল, "কখন গাড়ীতে উঠেছিলেন? খাওয়াদাওয়া হয়নি বোধ হয়?"

তিনি হাসিয়া বলিলেন, "কই আর হয়েছে!"

মালতী দাইকে বলিল "শীঘ্র করে উনানটা জেবলে দে। দিয়ে বাজার যা, আলোচাল কিনে নিয়ে আয়।"

ইহা শুনিয়া নবাগতা সুমিষ্টস্বরে বলিলেন, "না মা, আলোচাল কিনতে দিতে হবে না। আলোচাল আমার পুঁটুলিতে বাঁধা আছে, তুমি ব্যস্ত হয়ো না।"

তিনি আসিয়া বারান্দায় বসিলেন। মালতীকেও কাছে বসাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার নাম কি বাছা?"

"আমার নাম মালতী।"

"বাপের বাড়ী?"

"উত্তরপাড়া।"

"তোমার মা, বাপ সবাই আছেন?"

মালতী মুখখানি অন্ধকার করিয়া বলিল, "বাবা ত মারা গেছেন আমি যখন আঁতুড়ে —মা মারা গেছেন যখন আমি এক বছরের।"—বলিয়া মালতী উঠিয়া গেল—উনান জ্বালিতে দেরী হইতেছে বলিয়া দাইকে বকিল, নিজে উনান ধরাইতে বসিয়া গেল।

কাশীবাসিনী উঠিয়া রান্নাঘরে আসিলেন। মালতী ধৌত বস্ত্র পরিয়া রান্না চড়াইল। সেইখানেই বসিয়াই আবার গল্প আরম্ভ হইল।

কাশীবাসিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কদ্দিন তোমার বিয়ে হয়েছে?"

"এই বোশেখ মাসে।"

"তবে ত অল্পদিনই হল। এখানে এসেছ কি মাসে?"

"এই দু'মাস।"

"তোমার স্বামী কখন আপিসে যান?"

স্বামী প্রসঙ্গে মালতীর লজ্জা হইল। মুখখানি নত করিয়া শতরঞ্চ খুঁটিতে খুঁটিতে বলিল, "ন'টার সময়।"

"কখন আসেন?"

"কোনও দিন ছ'টার সময় আসেন, কোনও দিন সাতটা বেজে যায়।"

"কত মাইনে পান?"

"ত্রিশ টাকা।"

"তা ছাড়া উপরি আছে?"

মালতী লজ্জিত হইয়া বলিল, "কি জানি।"

কাশীবাসিনী একটু খুসী হইলেন।

॥ ২ ॥

আজ প্রদীপ জ্বালিতে জ্বালিতে গিরীন্দ্র বাড়ী আসিল।

মালতী জিজ্ঞাসা করিল, "আজ ভারি সকাল সকাল যে?"

গিরীন্দ্র একটু হাসিল। বলিল, "তুমি একলাটি থাক, তাই এলাম আজ সকাল সকাল।"

মালতী বলিল, "আজ আমি ত একলা নই। আজ বাড়ীতে কে এসেছে বল দেখি?"

গিরীন্দ্র বিস্মিত হইয়া বলিল, "কে?"

"একটি বিধবা; তিনটের প্যাসেঞ্জারে কাশী থেকে দেশে যাচ্ছিলেন; টিকিট হারিয়ে যাওয়াতে নামিয়ে দিয়েছে।"

"কাশী থেকে? সঙ্গে কেউ ছিল না? কত বয়স?"

"সঙ্গে কেউ ছিল না, বয়স ত্রিশ চল্লিশ।"

গিরীন্দ্র মালতীর অনুমান শুনিয়া হাসিল। বলিল, "ত্রিশ আর চল্লিশে কত তফাৎ, নিজের ত্রিশ বছর বয়স না হলে তা তুমি বুঝতে পারবে না।"

এ কৌতুক ভাব কিন্তু বেশীক্ষণ রহিল না। গিরীন্দ্র বিরক্ত হইয়া বলিল, "এত লোক থাকতে আমাদের বাড়ীই কেন এল?"

মালতী একটু থমকিয়া গেল। স্বামী বিরক্ত হইবেন তাহা ত সে একবারও ভাবে নাই. সে ত খুব আমোদ করিয়াই সংবাদটা দিতে আসিয়াছিল।

গিরীন্দ্র ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "কাশী থেকে—একলা মেয়েমানুষ—কি রকম বিধবা তাই ভাবছি!"

মালতী বুঝিল। বলিল "না না—যা ভাবছ তা নয়। ভাল লোক।"

গিরীন্দ্র বলিল, "ভারি ত জ্ঞান! যেমন তোমার বুদ্ধি! কখন যাবে বলেছে?"

"তা ত কিছু বলেননি।"

"রাত একটার সময় আবার গাড়ী।"

"অত রাতে কি ক'রে একলা ষ্টেশনে যাবেন? কে পেঁছে দেবে?"

গিরীন্দ্র দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "আমি পেঁছে দেবো। এ পাপ যত শীঘ্র বিদায় হয় ততই ভাল। আমি যাব—সঙ্গে করে পেঁছে দেবো।"

মালতী মুখখানি বিষণ্ণ করিয়া বসিয়া রহিল। গিরীন্দ্র বাহিরে গিয়া হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিয়া আসিল।

তখনও মালতী সেই রকম করিয়া বসিয়া আছে। গিরীন্দ্র বলিল, "ব্যাপারখানা কি?"

মালতী বলিল, "বাড়ীতে মানুষ এসেছে, তাড়িয়ে দেবে কি করে? উনি নিজে থেকে বলেননি, কি ক'রে বলবে যে তুমি যাও রাত একটার গাড়ীতে?"

গিরীন্দ্র বিরক্ত হইয়া বলিল, "ওগো সে জন্যে তোমার ভাবনার দরকার কি? সে ভার আমার।"

ইহার পর গিরীন্দ্র তোরঙ্গ খুলিয়া একটি বোতল ও গেলাস বাহির করিয়া একটা সোডা ভাঙ্গিয়া কয়েকবার পান করিল।

মদ্যের প্রভাবে তাহার মুখের বিরক্তির ভাব শীঘ্র অপনোদিত হইতে লাগিল। মালতীর সঙ্গে প্রফুল্লভাবে গল্প আরম্ভ করিল।

কিয়ৎক্ষণ কাটিলে কাশীবাসিনী আসিয়া বাহিরের বারান্দায় দণ্ডায়মান হইলেন। গিরীন্দ্র হঠাৎ বাহিরে আসিয়া বলিল, "আপনার আসাতে বড়ই আনন্দিত হলাম।"—বলিয়া প্রণাম করিল। 'দিল্' তখন তার 'দরিয়া'।

তিনি চুপ করিয়া রহিলেন।

গিরীন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার নিবাস?"

"আপাততঃ কাশীবাস করছি বাবা।"

"কোথা যাওয়া হচ্ছিল?"

"একবার দেশে যাব ভেবেছিলাম—তা টিকিট হারিয়ে গেল—নামিয়ে দিলে। তাই মনে করলাম—"

গিরীন্দ্র বাধা দিয়া বলিল, "তা বেশ করেছেন, উত্তম করেছেন। আজ এখানে থাকুন, কাল বেলা তিনটের গাড়ীতে যাবেন এখন।"

"আজ রাত একটার গাড়ীতে—"

"পাগল! অত শীতে, বুড়োমানুষ মারা পড়বেন যে! কিছু বিশেষ প্রয়োজন ত নেই?"

"তা নেই যদিচ।"

অতঃপর গিরীন্দ্র শাল গায়ে দিয়া ছড়ি লইয়া পাণ চিবাইতে চিবাইতে বেড়াইতে বাহির হইল।

রাত্রি দশটার সময় ফিরিল। কাশীবাসিনী তখন শয়ন করিয়াছেন। দাই নিদ্রিত, মালতীও ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, ডাকাডাকিতে সেই উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিল।

দরজা খুলিবামাত্র গিরীন্দ্র মালতীকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিল। মুখে মদের গন্ধ, কিন্তু মালতীর সেটা সহিয়া গিয়াছিল।

মালতী বলিল, "এত রাত!"

"একটা ভাল খবর আছে।"

"কি?"

"বদলি হল তাড়িঘাটে।"

"মাইনে বেড়েছে?"

"পাঁচ টাকা।" "মোটে!"

কথা কহিতে কহিতে দুইজনে শয়নগৃহে আসিয়া পৌঁছিল। গিরীন্দ্র হাসিয়া বলিল, "তা দিক না দিক, সেখানে দু' পয়সা আছে।"

"কবে যেতে হবে?"

"তিন চার দিন পরে।"

গিরীন্দ্র বলিল বাহিরে সে অনেক খাইয়া আসিয়াছে—আহার করিবে না। মালতী আহার করিয়া আসিয়া দেখিল, স্বামী নিদ্রিত।

পরদিন প্রভাতে সাতটার সময় গিরীন্দ্র গাত্রোত্থান করিল। স্নানাদি করিতে আটটা বাজিল। কাশীবাসিনীকে দেখিয়া বিরক্ত হইয়া মালতীকে জিজ্ঞাসা করিল, "মাগী কাল যায়নি?"

মালতী বলিল, "বেশ! নিজে কাল মানা করলে ওঁকে যেতে। উনি ত একটার গাড়ীতে যেতে চেয়েছিলেন।"

গিরীন্দ্র বিরক্তিতে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া রহিল। বলিল, "আজ তিনটের প্যাসেঞ্জারের আগে কুলি পাঠিয়ে দেবো। পাণ দিয়ে করে দিও। যাবার সময় সাবধানে থেক. কিছু নিয়েটিয়ে না যায়।"

মালতী ডাগর বিষণ্ণ চোখ দুটিতে স্বামীর পানে চাহিয়া রহিল।

গিরীন্দ্র আপিসে বাহির হইয়া গেলে মালতী কাশীবাসিনীকে বলিল. "আসুন আমরা স্নান করে ফেলি।"

স্নান করিতে করিতে দুইজনে অনেক গল্প হইল। বিদেশে আসিয়া অবধি মালতী একদিনও এমন করিয়া গল্প করিতে পায় নাই। ভজুয়ার মাতার সঙ্গে হিন্দী কহিয়া কহিয়া প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া উঠিয়াছিল।

স্নানান্তে কাশীবাসিনী আহ্নিক করিতে বসিলেন। গঙ্গাজল নাই—কূপজলেই 'ইদং গঙ্গোদকং' বলিয়া সারিতে হইল।

আহারান্তে উঠানে কূপের আলিসায় বসিয়া কিয়ৎক্ষণ চুল শুকান এবং বিশ্রাম করা হইলে. মালতী চুল বাঁধিবার সমস্ত সরঞ্জাম বাহির করিয়া আনিল। এতদিন সে নিজে নিজে চুল বাঁধিয়াছে। নিজে কি ভাল করিয়া চুল বাঁধা যায়? তাহার চুলের অবস্থা দেখিয়া কাশীবাসিনী অনেক দুঃখ করিলেন। একটি ঘণ্টা ধরিয়া. অতি পরিপাটী করিয়া চুল বাঁধিয়া দিলেন।

ক্রমে দুইটা বাজিল। এইবার কুলি আসিবে। কাশীবাসিনী প্রস্তুত হইলেন।

বলিলেন, "মা, একদিনেই তোমার উপর মায়া জন্মে গেছে। যেতে কষ্ট হচ্চে।"

মালতীরও সেইরূপ বোধ হইতেছিল। বিদেশে কতদিন পরে একজন রমণীর স্নেহ-ব্যবহার পাইয়া তার যেন পরমাত্মীয় লাভ লাভ হইয়াছে মনে হইতেছিল। ইনি চলিয়া গেলে আবার সেই সারাদিন ধরিয়া একাকী নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতে হইবে। তাহারও বড় কষ্ট হইতে লাগিল।

মালতী বলিল, "আজ নেই বা গেলেন! দু'দিন থাকুন না। এ দু'দিন আপনার সঙ্গে কথা কয়ে বেঁচেছি। একলাটি প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। এক এক সময় কান্না পায়।"

কাশীবাসিনী বলিলেন, "আমি থেকে যেতে পারি, কিন্তু বাছা তোমার স্বামী কিছু ভাবেন যদি?"

মালতী মুখে বলিল, "ভাববেন আবার কি?"—কিন্তু মনটি তাহার সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। সত্যই ত, স্বামী যে ইঁহার উপর প্রসন্ন নহেন। কুলিটা আসিলে অবশ্য তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু স্বামী পাছে বেশী রাগ করেন?

তাহার পর ভাবিল—তা করেন, করিবেন। এমন কিছু গর্হিত কার্য্য করা হইতেছে না। আমি এই একলাটি এই সংসার ঘাড়ে করিয়া মরিতেছি, কেহ আহা বলিবার নাই, কথা কহিবার একটা মানুষ নাই—আমি একজন লোককে দুইদিন রাখিতে পারি না? —স্বামী আসিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করিলে মালতী কি কি বলিবে, কি রকম করিয়া রাগ করিবে সব মনে মনে গড়িয়া রাখিতে লাগিল।

দুইটা বাজিল, কুলি আসিল না। তিনটা বাজিয়া গেল, তথাপি কুলির দেখা নাই। মালতী হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল—তখন আবার মনের সুখে কাশীবাসিনীর সঙ্গে গল্প আরম্ভ করিয়া দিল।

বৈকালে মালতী জলখাবার কিনিতে দাইকে বাজারে পাঠাইতেছিল, কাশীবাসিনী বলিলেন, "ছাইপাঁশ বাজারের জলখাবারগুলো কেন খাও তোমরা? ঘরে খাবার তৈরি করতে জান না?"

মালতী বলিল, "কে অত হাঙ্গামা করে বাপু!"

"হাঙ্গামা আবার কি? আমি তোমায় আজ দেখিয়ে দিচ্চি।"—বলিয়া তিনি দাইকে অপেক্ষা করিতে বলিলেন। নিজের বাক্স হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া সুজি, চিনি ময়দা প্রভৃতি কিছু কিছু আনিবার আদেশ করিলেন।

মালতী বলিল, "ও কি কথা! আপনি টাকা দিচ্ছেন কেন? আমি টাকা দিই।" দাইকে বলিল, "টাকা ফিরিয়ে দে দাই।"

দাই টাকাটি কাশীবাসিনীর হাতে দিতে গেল—তিনি কিছুতেই লইবেন না। বলিলেন, "আমি তোমাদের জন্যে একটা টাকা খরচ করলামই বা; তোমরা আমায় কত যত্ন আদর করছ।"

মালতী বলিল, "ভারি আদর ভারি যত্ন করেছি আপনাকে কিনা! আদর যত্ন করতে জানি কিনা! নিন টাকাটা রাখুন।"

তিনি বলিলেন, "দেখ বাছা, তা হলে কিন্তু আজই রাত্তির একটার গাড়ীতে চলে যাব।"

তখন মালতী ক্ষান্ত হইল। বলিল, "কর বাছা তোমার যা ইচ্ছে তাই। কিন্তু অন্যায় হল ব'লে রাখছি।"

দাই টাকা লইয়া বাজারে গেল।

॥ ৩ ॥

আজ গিরীন্দ্র বাড়ী আসিল অনেক বিলম্বে; রাত্রি প্রায় তখন আটটা। আসিয়া কাশীবাসিনীকে বলিল, "আমার বড় অপরাধ হয়ে গেছে। আপিসে কাযের ভিড়ে আপনাকে নিতে কুলি পাঠাতে একেবারেই মনে ছিল না। দু' দিন যখন কষ্ট পেলেন,

আর একটা দিন তখন কষ্ট করুন। কাল আর আমার আপিস নেই, কাল নিজে গিয়ে আপনাকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসবো।"

মালতীর সংগে সাক্ষাৎ হইলে সে তাহার মুখে মদ্যগন্ধ পাইল। বলিল, "তোমার গতিক ভাল নয়। তাড়িঘাটে গেলে হাতে বেশী পয়সা পেলে তুমি আরও বিগড়ে যাবে।"

গিরীন্দ্র বলিল, "আরে রামঃ, সে ছোট স্টেশন. অজ পাড়াগাঁ, সেখানে কি কেলনার কোম্পানি আছে? সেখানে গিয়ে, গংগাস্নান ক'রে. সব ছেড়ে দেব—ব্যাস একদম।"

"তুমি কাল আপিসে যাবে না?"

"না, আমার এখানকার সব কায শেষ হয়ে গেছে। বাবুরা ধরেছে পরশু ভোজ দিতে হবে। কাল সব যোগাড়যন্ত্র করে রাখতে হবে।"

গিরীন্দ্র হস্তপদাদি ধৌত করিয়া আসিয়া বলিল, "আজ আর জলখাবার খাব না, কোথাও বেরুব না; রুটি দাও একেবারে খাই।

মালতী লুচি, মোহনভোগ, মাছের তরকারী প্রভৃতি বিবিধ উপকরণ যাহা কাশীবাসিনী প্রস্তুত করিয়াছিলেন—সমস্ত আনিয়া দিল। গিরীন্দ্র আহার করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইল। বলিল, "দেখ. উনি মাংস রাঁধতে জানেন কিনা জিজ্ঞাসা কর দিকিন।"

মালতী জিজ্ঞাসা করিয়া আসিয়া বলিল. "জানেন কিছু কিছু।"

"দেখ, আমি একটা কথা ভাবছি। ওঁকে যদি দুই এক দিন থাকতে বলা যায়, উনি থাকেন না? তা হলে পরশু ভোজ পর্য্যন্ত ওঁকে রাখা যাক। একবার জিজ্ঞাসা কর দেখি।"

মালতী মনে মনে অত্যন্ত খুসী হইয়া বলিল. "তুমি জিজ্ঞাসা কর না।"

গিরীন্দ্র জিভ কাটিয়া বলিল. "এ অবস্থায় কি ওঁর সংগে কথা কইতে পারি?"

মালতী বলিল, "আহা মরে যাই! আজ বাড়ী এসেই ওঁর সংগে কথা কইলে না?" —বলিয়া কাশীবাসিনীর কাছে গিয়া প্রস্তাবটা করিল। তিনি সম্মত হইলেন।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া গিরীন্দ্র ভোজের জিনিসের ফর্দ্দ করিল। কাশীবাসিনী তাহা শুনিয়া যে সকল মন্তব্য ও পরিবর্ত্তনাদি প্রস্তাব করিলেন, তাহা গিরীন্দ্রের নিকট অত্যন্ত সমীচীন বলিয়া বোধ হইল। আড়ালে মালতীকে বলিল. "দেখ ইনি একজন খলিফা লোক! কাশীতে শুধু ধর্ম্মকর্ম্ম নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন মনে কোরো না।"

মালতী রাগ করিয়া বলিল, "কি বল যাও! তোমার মন ভারি অশুদ্ধ।"

দুই ক্রোশ দূরে গুরুগাঁও নামক পল্লীতে দেবী আছেন। পরদিন প্রভাতে সেইখানে ছাগবলি পাঠান হইল।

রাত্রিকালে ভোজের ব্যাপার—নির্ব্বিঘ্নে বলিতে পারি না—সম্পন্ন হইয়া গেল। রন্ধনাদি চমৎকার হইয়াছিল। যদি ভোক্তারা সকলে সচেতন থাকিত, তবে সমস্বরে ধন্য ধন্য করিতে পারিত।

॥ ৪ ॥

আজ রবিবার। আজ রাত্রের গাড়ীতে গিরীন্দ্র তাড়িঘাট যাত্রা করিবে। কাশীবাসিনী বলিলেন, "আমি আর দেশে যাব না—আমিও কাশীতেই ফিরে যাই।"

মালতী বলিল, "বেশ ত, আপনিও আমাদের সংগেই চলুন। তাড়িঘাট থেকে চার পাঁচটা স্টেশন বইত নয়।"

আহারান্তে গিরীন্দ্র মালতীকে বলিল, "গোটা ত্রিশ টাকা বের ক'রে দাও—বাজার দেনাগুলো মিটিয়ে আসি।"

মালতী বলিল, "অবাক কথা! আমার কাছে আর টাকা আছে নাকি?"

"কেন, সে দিন যে আশি টাকা এনে দিলাম।"

"পশুর্দ্দ বাজারে যাবার সময় ত্রিশ নিয়ে গেলে, বাকী যা ছিল কাল সন্ধ্যেবেলা থেকে সে সবই ত প্রায় দিলাম তিন চার বারে। আর টাকা কোথায়?"—বলিয়া মালতী বাক্স

খুলিয়া দেখিল, দুই টাকা চৌদ্দ আনা মাত্র রহিয়াছে।

গিরীন্দ্র বলিল, "এখন উপায়? আমার কাছে ত কিছু নেই!"

মালতী চুপ করিয়া রহিল। খানিক পরে বলিল, "আমি কি করব? মদেই তোমার সর্ব্বনাশ করলে। সে সময় ত জ্ঞান থাকে না, তখন কেবল দাও টাকা দাও টাকা বল।"

গিরীন্দ্র একটু বিরক্ত হইয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "দেখি কারু কাছ থেকে ধার নিইগে।"

কাশীবাসিনী বাহিরে বসিয়া সব কথা শুনিয়াছিলেন। মালতীকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওঁকে বারণ কর মা, আমার কাছে টাকা রয়েছে, আমার ত এখন দেশে যাওয়া হল না।"

মালতী গিয়া স্বামীকে বলিল। গিরীন্দ্র বলিল, "সে কি কাযের কথা? ওঁর কাছে টাকা নেব, আলাপ নেই পরিচয় নেই!"

কাশীবাসিনী এ কথা শুনিয়া ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। বলিলেন, "তাতে আর ক্ষতি কি বাবা? তোমরা তাড়িঘাটে গিয়ে থিতু হয়ে বস; আমি কিছু দিন পরে আবার আসবো এখন তোমাদের কাছে; দেখাশুনোও হবে, টাকাও নিয়ে যাব।"

গিরীন্দ্র কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া বলিল, "তা হলে আপনি অনুগ্রহ ক'রে কাশী না গিয়ে আপাততঃ তাড়িঘাটেই চলুন আমাদের সঙ্গে। পাঁচ ছ' দিনেই আপনার টাকা ক'টি ফিরে দিতে পারব।"

"আচ্ছা সে তখন দেখা যাবে। কত চাই? তিরিশ? যদি বেশী দরকার থাকে তাও আমার কাছে আছে, যা লাগে বল বাবা।"

গিরীন্দ্র বলিল, "না মা বেশী চাইনে, ত্রিশ দিলেই হবে।"

কাশীবাসিনী বাক্স খুলিয়া দশ টাকার তিনখানি নোট বাহির করিয়া দিলেন।

সেই দিন রাত্রি এগারটার গাড়ীতে গিরীন্দ্রনাথ, স্ত্রী ও কাশীবাসিনীকে লইয়া যাত্রা করিল। ভজুয়ার মা কাঁদিতে লাগিল। গিরীন্দ্র তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিল, কিন্তু সে স্বীকার করিল না।

স্টেশনের পথে কাশীবাসিনী মালতীকে বলিলেন, "বাছা, বাবাকে বল যেন আমার কাশীর টিকিটই করেন। আমার বিশেষ দরকার আছে।"

গিরীন্দ্র ইঁহাকে তাড়িঘাটে লইয়া যাইবার জন্য জেদ করিল, কিন্তু ফল হইল না।

তাড়িঘাটে যাইতে দিলদারনগরে গাড়ী পরিবর্ত্তন করিতে হয়। গিরীন্দ্র ভোর রাত্রে স্ত্রীকে লইয়া দিলদারনগরে নামিয়া গেল;—কাশীবাসিনী চলিয়া গেলেন।

॥ ৫ ॥

বেলা সাতটার সময় গিরীন্দ্রনাথ নূতন কর্ম্মস্থান তাড়িঘাট স্টেশনে পৌঁছিল। সরকারী বাসা নির্দ্দিষ্ট আছে, সেইখানে গিয়া উঠিল। জিনিষপত্রগুলো কতক গুছাইয়া স্টেশনে বাবুদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল।

মালতী স্নান করিবে বলিয়া কাপড় বাহির করিবার জন্য একটা তোরঙ্গ খুলিল। সচরাচর তাহার গহনার বাক্সটি এই তোরঙ্গের মধ্যেই থাকিত। কাপড় বাহির করিতে গিয়া দেখে, সর্ব্বনাশ হইয়াছে, গহনার বাক্স নাই।

তখন মালতী ভাবিল, নিশ্চয়ই অন্য কোন বাক্সে আছে। যতগুলি বাক্স আছে একে একে সমস্ত খুলিয়া খুঁজিল, কোথাও নাই।

মন বোঝে না, দুইবার—তিনবার করিয়া প্রত্যেক বাক্সটির প্রত্যেক জিনিষ আলাদা আলাদা করিয়া খুঁজিল, তথাপি পাইল না। তখন সে হতাশ হইয়া ধূলায় বসিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

ঘণ্টাখানেক ধরিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া অনেক কাঁদিল। স্টেশনমাস্টারের মেয়ে চম্পকলতা তাহার ছোট ভাইটিকে কোলে করিয়া 'বউ দেখিতে' আসিয়াছিল, সে মালতীকে রোরুদ্যমানা দেখিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে চম্পট দিল।

শেষে গিরীন্দ্র আসিল। সে দেখিয়া বলিল, "এ কি!"

মালতী কাঁদিতে কাঁদিতে সব বলিল।

শুনিয়া গিরীন্দ্র মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। কিয়ৎক্ষণ পরে মৃদুস্বরে বলিল, "বেশ ক'রে সব খুঁজেছ?"

"কিছু বাকী রাখিনি।"

"শেষ তাকে কখন দেখেছ?"

"কাল খগোলে গুছিয়ে একখানি শালের টুক্‌রোতে বেঁধে ঐ কালো তোরঙ্গের মধ্যে রেখেছি, বেশ মনে পড়ছে।"

"গাড়ীতে কালো তোরঙ্গ খুলেছিলে? কোন জিনিষপত্তর বের করতে?"

"খুলেছিলাম একবার। শীত করতে লাগল, শালটা বের করেছিলাম।"

"সে সময় গহনার বাক্স বের ক'রে ফেলে রাখনি ত?"

মালতী বলিল, "কখখনো না। উপরে শালখানা ছিল—শুধু তয়ে তয়ে শাল তুলে নিয়েছি।"

"চাবি কোথা রেখেছিলে?"

"কোমরে ছিল।"

"তারপর ঘুমিয়েছিলে?"

"তা, ঘুমোলাম বইকি।"

গিরীন্দ্র নিশ্চিত স্বরে বলিল, "তবে কাশীর সেই মাগী নিয়েছে।"

মালতী চুপ করিয়া রহিল।

গিরীন্দ্র বলিতে লাগিল, 'যখন ঘুমিয়েছিলে. তখন আস্তে আস্তে কোমর থেকে চাবিটি খুলে নিয়ে, গহনার বাক্সটি বের করে নিয়েছে। তার নাম কি জান?"

"না। বুড়ো মাগীর নাম জিজ্ঞাসা করতে পারি কখনও?"

"কাশীতে কোথায় থাকে জান?"

"কি একটা মঠে।"

গিরীন্দ্র রাগিয়া বলিল, "কাশীতে ত দুশো ছাপ্পান্নটা মঠ আছে—কোন্ মঠে—কোনখানে সে মঠ কিছু শুনেছ?"

"না।"

"সেইকালেই বলেছিলাম, ও সব লোককে বিশ্বাস কোরো না। ওরা সর্ব্বনেশে লোক—কাশীর ঘাগী বেশ্যা। ত্রিশ টাকার চার ফেলে যথাসর্ব্বস্বটা নিয়ে গেল!"

মালতী বলিল, "তিনি কখখনো নেন নি। তিনি নেবেন কেন? আমিই বোধ হয় খগোলের বাসায় ফেলে এসেছি।"

গিরীন্দ্র কিন্তু তাহা কিছুতেই বিশ্বাস করিল না। বলিল, "ও সব কথা রেখে দাও—জান না ত পৃথিবীর গতিক! আচ্ছা সে মাগী কোনও দিন তোমার গহনা দেখতে চেয়েছিল?"

মালতী ভয়ে ভয়ে বলিল, "তা চেয়েছিলেন; সেই ভোজের দিন! বললেন, মা তোমার কি কি গহনা আছে দেখি।—আমি বের ক'রে সব দেখালাম।"

গিরীন্দ্র বলিল, "তবে আর কোনও সন্দেহ নেই। আমি চললাম পুলিশে টেলিগ্রাফ করতে।"—বলিয়া গিরীন্দ্র ষ্টেশনে গেল।

মালতী আবার একা বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

॥ ৬ ॥

দুই সপ্তাহ কাটিয়া গিয়াছে। এই দুই সপ্তাহে এই দম্পতী গহনার শোক প্রায় বিস্মৃত হইয়াছে। তাহারা পূর্ব্বমত হাসে, গল্প করে, আমোদ করে। নূতন কর্ম্মে

প্রবৃত্ত হইয়া অবধি গিরীন্দ্র বিলক্ষণ উপার্জ্জন করিতে লাগিল। তাহাতেই বোধ হয় গহনা লোকসানের কষ্ট অনেকটা চাপা পড়িয়া গেল।

যে দিন পুলিশে টেলিগ্রাফ করা হইয়াছিল, সেই দিনই দিলদারনগর হইতে হেড কনষ্টেবল আসিয়া গহনাগুলির ফর্দ্দ ও বিবরণ গিরীন্দ্রনাথের জবানবন্দীসহ লিখিয়া লইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাহার পর হইতে পুলিসের তরফ হইতে আর কোনও সংবাদ নাই।

বেলা সাড়ে এগারোটা; গিরীন্দ্রনাথ আপিসে গিয়াছে। মালতী খাইতে বসিয়াছিল, এমন সময় দিলদারনগর হইতে গাড়ী আসিল। গিরীন্দ্রনাথের বাসা প্ল্যাটফর্ম্মের নীচেই দুয়ারে দাঁড়াইলে প্ল্যাটফর্ম্ম, গাড়ী, লোকজন সব দেখা যায়। যতবার গাড়ী আসিত, ততবার মালতী দেখিতে ছুটিত, প্রতি গাড়ীটি না দেখিলে যেন তাহার কর্ত্তব্যের হানি হইবে! গাড়ীর শব্দ শুনিবামাত্র মালতী থালা ফেলিয়া এঁটো হাতে এঁটো মুখে গাড়ী দেখিতে গেল। বন্ধ দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া ফুটা দিয়া দেখিল, প্ল্যাটফর্ম্মের উপর কাশীবাসিনী নামিয়াছেন, একটা কুলি তাঁহার জিনিষ নামাইতেছে; তিনি কুলিকে কি জিজ্ঞাসা করিলেন, কুলিটা গিরীন্দ্রনাথের বাসার দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিল।

মালতী ছুটিয়া উঠানে গিয়া আচমন করিল। কম্পিত বক্ষে কাশীবাসিনীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কত কি যে তাহার মনে হইল! কত আহ্লাদ হইল, আর কতবার মনে মনে বলিল, হে ঠাকুর, স্বামী যে তাঁহাকে গহনা চুরির অপবাদ দিয়াছেন সে কথা যেন উঁহার কর্ণগোচর না হয়।—তিনি যে গহনা লন নাই এই বিশ্বাস মালতীর ছিল। আসিতে দেখিয়া সে বিশ্বাস দৃঢ় হইল। নাহলে কখনও তিনি স্বেচ্ছাক্রমে আসিয়া উপস্থিত হন?

কয়েক মিনিট পরে কাশীবাসিনী মালতীর নিকটে পৌঁছিলেন।

"মা এসেছেন?"—বলিয়া মালতী প্রণাম করিল। তিনি মালতীকে মাথায় হাত দিয়া সস্নেহে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

মালতী বলিল, "আপনি স্নান করে ফেলুন, আমি ভাত চড়িয়ে দিই।"

কাশীবাসিনী বলিলেন, "স্নান করেছি। ভাত চড়াতে হবে না—আজ একাদশী।"

মালতী লক্ষ্য করিল, কাশীবাসিনীর মুখখানা যেন বড় গম্ভীর—বিষণ্ণ। কথা কহিতে কহিতে তাঁহার চক্ষু দুইটি যে ছলছল করিয়া উঠে। জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার মনটা এত ভার ভার কেন?"

তিনি বলিলেন, "জান না?"

মালতী ভয়ে বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কি?"

"তোমাদের সন্দেহ, আমি তোমার গহনার বাক্স নিয়ে গেছি, পুলিশ পাঠিয়েছ, জান না?"

মালতী লজ্জায় মৌন হইয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "আমি যদি বলি, আমার মনে একদিনও এ সন্দেহ হয়নি, তবে আপনার বিশ্বাস হবে কি?"

কাশীবাসিনী ম্লান মুখে বলিলেন, "তোমার স্বামীর ত বিশ্বাস হয়েছিল বাছা!"

মালতী বলিল, "পুলিশ আপনার সন্ধান পাবে তা উনি ভাবেন নি। উনি ত আজও বলছিলেন, কাশীতে কত লক্ষ লক্ষ মঠ, কোটি কোটি সেবাধারী, কে কার সন্ধান পায়?"

"বের ত করেছিল আমায়। আমার উপর জুলুমটা কি করেছে কম? দুটিশো টাকা নগদ ঘুস গুণে দিয়ে তবে নিষ্কৃতি পেয়েছি।"

মালতী বলিল, "আমাদের সঙ্গে আত্মীয়তা করতে গিয়ে আপনার খুব শিক্ষা হল।"

কাশীবাসিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "গিরীন কখন আসবেন?"

"সন্ধ্যেবেলা।"

মালতী জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?" "আজই যাব।"

"আজই যাবেন ?"

কাশীবাসিনী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "তুমি ভারি ছেলেমানুষ! তোমার স্বামী আমাকে চোর বলে সন্দেহ করেন, আর তোমার ইচ্ছে যে আমি থাকি! আমি আড়াইটের গাড়ীতে ফিরব। আমাদের আরও অনেক লোক শ্রীক্ষেত্র যাচ্চে। কাল আমরা সবাই রওনা হব।"

মালতী জিজ্ঞাসা করিল, "কতদিনে ফিরবেন ?"

"কেন? ফিরলে কি দেখা হবে?"—বলিতে বলিতে কাশীবাসিনীর চক্ষু দুইটি ছলছল করিয়া উঠিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন, "একটি কায করবে?"

মালতী সাগ্রহে বলিল, "কি ?"

"আমার কতকগুলি গহনা আছে, সেগুলি তুমি পর দিকিন।"—বলিতে বলিতে কাশীবাসিনী তাঁহার সঙ্গের তোরঙ্গটি খুলিয়া একটি হাতবাক্স বাহির করিলেন। মালতী বিস্মিত হইয়া দেখিল, তাহার ভিতর বিস্তর গহনা, ভাল ভাল জড়োয়া গহনা।

কাশীবাসিনী বলিলেন, "এইগুলি সব তুমি নাও।"

সোণা, রূপা, হীরা, মোতি, চুনী, পান্নার চাকচিক্যে মালতীর চক্ষু ঝলসিত। তবু সে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিল, "সে আমি পারব না।"

"কেন?"

"আপনার এই রাশিকৃত গহনা আমি কেন নেব?"

"আমি দিচ্চি।"

"আপনি দিচ্চেন, কিন্তু আমি কোন অধিকারে নেব? সে আমি পারব না।"

আকাশে মেঘ বাড়িয়া উঠিল। ঝড় উঠিল। দিবালোক অত্যন্ত কমিয়া গেল।

কাশীবাসিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "অধিকার যদি থাকে?"

মালতী বলিল, "অধিকার? কি অধিকার?"

কাশীবাসিনী মুখখানি নীচু করিয়া বলিলেন "তা বলব, তা বলতেই আজ এসেছি।"

মালতীর বুকে গুরুগুরু করিয়া উঠিল। অবাক হইয়া সে কাশীবাসিনীর মুখপানে চাহিল।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার মা কি সত্যি মরেছে?"

মালতী থতমত খাইয়া বলিল, "কেন?"

"তাই জিজ্ঞাসা করি।"

"সবাই ত বলে।"

"তা হ'লে তুমি জান। আমিই তোমার পোড়ারমুখী মা।"—বলিতেই কাশীবাসিনীর চক্ষু দিয়া দরদর ধারায় অশ্রু বহিল।

মালতী শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল। নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

অল্পদিনের ঘটনা সে ভাবিতে লাগিল। মোক্ষদা ঠানদি তীর্থ করিয়া গ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছেন। বাড়ীতে রাত্রে শুইয়া শুইয়া তার জ্যেঠাইমার সঙ্গে অনেক কথা বলাবলি করিতেছেন। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন মালতী ঘুমাইয়া আছে। কিন্তু মালতী ঘুমায় নাই, সব শুনিতে পাইয়াছে। যাহা শুনিল, তাহাতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কেন্দ্রচ্যুত হইয়া যেন তার চক্ষের সম্মুখে ঘুরিতে লাগিল। যে মাকে এতদিন স্বর্গগতা জানিত, শুনিল তিনি বাস্তবিক জীবিতা, তাঁহার সহিত ঠানদির কোন্ তীর্থে হঠাৎ দেখা হইয়াছে। জানিল, যে মার স্মৃতি সে পবিত্রতম বলিয়া পরম ভক্তিভরে আশৈশব বক্ষে ধারণ করিয়া আছে—সে মার স্মৃতি সংসারে ঘৃণিত, মা তার কলঙ্কিনী। তাহার সে রাত্রের কষ্ট অবর্ণনীয়। এই সেই মা? আবার সেই রাত্রের তীব্র অনুভূতি হৃদয়ে ফিরিয়া আসিল।

মালতী শিহরিয়া উঠিল, অজ্ঞাতসারে একটু দূরে সরিয়া বসিল।

কাশীবাসিনী তখনও কাঁদিতেছিলেন। একটু আত্মস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "জামাই জানেন?" "না।"

"তুমি কতদিন হল শুনেছ?"

"বিয়ের পর।"

"মোক্ষদাপিসীর কাছে?"

"হ্যাঁ।"

"মোক্ষদাপিসীর মুখেই শুনলাম, তোমার বিয়ে হয়েছে, দানাপুরে মালঘরে জামাই কর্ম্ম করেন, পুজোর সময় তুমি দানাপুরে আসবে-তাও ঠিক হয়েছে।"

মালতী বলিল, "তা হলে দানাপুরে তুমি হঠাৎ এসে পড়নি, জেনে শুনে এসেছিলে? কেন?"

মালতীর স্বর এখন কঠোর।

কাশীবাসিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "আপনার সন্তানকে কেউ কি ভুলতে পারে?"

মালতীর একবার একটু একটু কান্না আসিতে লাগিল। আপনার মা না জানিয়াও ইঁহার যে মাতৃবৎ আকর্ষণ হইয়াছিল, তাই মনে পড়িল। কাঁদকাঁদ হইয়া বলিল, "কেন তুমি জানালে তুমি কে?"

"কি জানি। থাকতে পারলাম না।"

মালতী আবেগভরে একবার বলিতে যাইতেছিল—জানিয়েছ ভালই করেছ। নইলে মা ত কখনো চক্ষে দেখতে পেতাম না!

কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনে হইল, 'এ মা! নাই দেখতাম!'

এই দ্বিধায় সে কিছুই বলিল না, চুপ করিয়া রহিল।

গাড়ীর সময় হইল। কাশীবাসিনী কুলিকে বলিয়া দিয়াছিলেন, সে জিনিস লইতে আসিল।

মালতী বলিল, "গহনা নিয়ে যাও। আমি পরব না।"

কাশীবাসিনী কন্যার মুখপানে চাহিয়া তাহার মনের ভাব বুঝিলেন। বলিলেন, "যা ভেবেছ তা নয়। এ তুমি স্বচ্ছন্দে পোরো, নইলে আমিই তোমায় দিতাম না। জীবনে একবার যে পাপ করেছি, আজ চৌদ্দ বচ্ছর ধরে তার প্রায়শ্চিত্ত করলাম। আর, এর একখানিও পাপের অর্জ্জন নয়। আমি মস্ত বড়মানুষের মেয়ে ছিলাম—শোনোনি?"

মালতী বলিল, "তবুও আমার স্বামীকে সব না জানিয়ে, তাঁর মত না নিয়ে, আমি নিতে পারিনে।"

"তাই কোরো। যদি তিনি তোমায় পরতে না দেন, তবে এগুলি দেবসেবায় দিও।"

তিনি যাইবার জন্য উঠিলেন।

মালতী আর থাকিতে পারিল না। "মা আবার দেখা দিও"—বলিয়া কাঁদিয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিল, প্রণাম করিল।

"সাবিত্রী হও, রাজরাণী হও"—বলিয়া মা কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, দ্রুত গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

[বৈশাখ, ১৩০৮]

ধর্ম্মের কল

॥ ১ ॥

হারাধন চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিমার মত কন্যা মনোরমা পনেরো বৎসর বয়সে বিধবা হইয়া গেল।

সেকালের কথা। পিতা বিক্রমপুর হইতে বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান এক দিগ্‌গজ কুলীন আনিয়া জামাতা করিয়াছিলেন। দুইবেলা মাছভাত খাওয়া এবং সিঁদুর পরিতে পাওয়া ছাড়া মনোরমা আর কোনও সধবাসুখের অধিকারিণী ছিল না; তথাপি তাহার এই তরুণ

বৈধব্যে পিতা মাতা অত্যন্ত শোকাতুর হইয়া পড়িলেন। মনোরমাও তাহাদের দেখাদেখি দিনকতক একটু কাঁদিল, মুখটি ম্লান করিয়া রহিল। কিন্তু আসলে তাহার নিজের বুঝিবার সাধ্য ছিল না তার কিবা ছিল, কিবা গেল। মেয়েটির বছর পনেরো বয়স যদিও, কিন্তু বুদ্ধি ও প্রকৃতি শিশুবৎ। শরীরের সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনের বৃদ্ধি এ পর্যন্ত হয় নাই।

ঠিক এই সময় গ্রামে আর একটি দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল। ব্রজহরি মুখোপাধ্যায়ের সপ্তদশ বর্ষ বয়স্ক পুত্র হীরালাল পিতা মাতাকে শোকে ভাসাইয়া চিতারোহণ করিল। ব্রজহরির স্ত্রী হৈমবতী অনেকগুলি সন্তানের মুখ দেখিয়াছিলেন। একে একে পাঁচটিকে যমের মুখে সমর্পণ করিলেন। একটি যখন বারো বৎসরের, তখন সন্ন্যাসীরা তাকে চুরি করিয়া লইয়া যায়—সে আজ দশ বৎসরের ঘটনা। এখন শুধু একটি রহিল—সেটি দুই বৎসরের। তা যে রকম অদৃষ্ট, উহার আশাই বা কি, ভরসাই বা কি!

শোকের প্রথম বেগ কতকটা প্রশমিত হইলে, ব্রজহরি স্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিলেন, গৃহ সংসার আর কাহার জন্য, চল গিয়া তীর্থবাস করা যাউক। বাড়ী, বাগান, বিষয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া, গোরু বাছুর বিলাইয়া দিয়া, বাস উঠাইয়া কাশীতে বসিয়া হরিনাম করা যাউক। এই গুঁড়াটুকু যদি বাঁচে, তখন আবার সব হইবে।

কিন্তু সংসারের মায়া বড় মায়া, গৃহত্যাগ করা বড় কঠিন। আরও কিছু দিন পরে স্থির হইল, বাস উঠাইয়া কাশী যাইবার কল্পনা আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া, মাস দুই তীর্থ ভ্রমণ করিয়া আসা যাউক।

মনোরমা এই সব শুনিয়া বাড়ী আসিয়া বলিল—"মা, আমিও যাব কাকীমার সঙ্গে।" ব্রজহরি হারাধনের দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়—উভয় পরিবারে বহুদিনের সম্প্রীতি।

তাহার পিতামাতা উভয়েই আপত্তি করিলেন। মনোরমা কাঁদাকাটা করিল। এক বেলার এক মুঠা অন্ন, তাহাও পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইল। চোখের জল মুছিতে মুছিতে তাহার মা তখন স্বামীকে বুঝাইয়া বলিয়া মত করাইলেন।

কাশীর রেল তখন নূতন খুলিয়াছে;—লোকের তখন কাশী যাইবার ভারি ধুম! নৌকাপথে যে কাশী যাইতে এক মাসেরও অধিক সময় লাগিত, সেই কাশী দুই দিনের পথ হইয়া পড়িল। ইঁহাদের কাশী যাইবার পরামর্শ শুনিয়া ও পাড়ার কলুগিন্নি আসিয়া বলিল—"বামুনদিদি, আমাকে যদি নিয়ে যাও সঙ্গে করে তা হলে তোমাদের চরণ সেবা করি, দুটি দুটি পেসাদ পাই, আর বাবা বিশ্বনাথের মাথায় একটু গঙ্গাজল দুটো বিল্বপত্র দিয়ে আসি।"

কলুগিন্নির প্রার্থনা বিফল হইল না। যাত্রার দিন স্থির হইল ২৮শে ফাল্গুন।

যাইবার উৎসাহে মনোরমা ত আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিল! এমনভাবে চলিতে বলিতে লাগিল, যেন তাহার সর্ব্বনাশ হয় নাই, কপাল যেন পোড়ে নাই, সে যেন সেই মনোরমাই আছে! তাহার এই প্রফুল্লতায় তাহার পিতামাতাও কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিলেন।

কাশীর বিশ্বনাথ অপেক্ষা নগরার রেল দেখিবার জন্যই মনোরমা শতগুণ অধিক ব্যগ্র হইয়া পড়িল। গ্রামের কত লোক কলিকাতা গিয়াছে, বর্দ্ধমান গিয়াছে—তাহারা যে ব্যাখ্যাটা করে! যাহারা কোথাও যায় নাই, তাহারা সাত ক্রোশ দূর ষ্টেশনে গিয়া শুধু রেলগাড়ী দেখিয়া চক্ষুসার্থক করিয়া আসিয়াছে। সেই রেলে মনোরমা চড়িবে! উঃ—ভাবিতে তাহার বুক গুরগুর করিতে লাগিল; শরীর কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল! শব্দে ভয় করিবে না ত? না জানি সে কী শব্দ! বর্ষাকালে জলে যখন সমস্ত মাঠ ডুবিয়া গিয়াছিল, তখন একদিন অনেক রাত্রে, মার কাছে শুইয়া মনোরমা রেলের শব্দ শুনিতে পাইয়াছিল। অতি ক্ষীণ, শুধু একটা অনেক—অনেক দূরের গুম্‌গুম্‌গুম্ শব্দ।—আঃ—২৮শে ফাল্গুন কবে আসিবে গো?

মনোরমার আরাধনায় ২৮শে ফাল্গুন আর না আসিয়া থাকিতে পারিল না। রাত্রি এক প্রহর থাকিতে যাত্রা করিতে হইবে। যথাসময়ে দুইখানি গোরুর গাড়ী ভাঙ্গা লণ্ঠনের মধ্যে প্রদীপ জ্বালিয়া, চক্রশব্দে সুপ্ত গ্রামবাসীর কর্ণে বিদায়ের করুণ-গীতি গাহিতে

গাহিতে বাহির হইয়া গেল।

॥ ২ ॥

মগরায় যখন গাড়ী পৌঁছিল, তখন বেলা নয়টা। গাড়ী যখন বাজারে প্রবেশ করিতেছে, সেই সময় অদূরে একখানা এঞ্জিন বংশীধ্বনি করিতে করিতে ছুটিয়া আসিল। তাহা দেখিয়া মনোরমার যে আমোদ! কাকীমার গলা জড়াইয়া—"ওগো কাকীমা, ওটা কী গো?"—বলিয়া সে আকুল।

একটার সময় পশ্চিমের গাড়ী। দোকানে নামিয়া বিশ্রাম ও আহারাদি হইল।

যথা সময়ে ট্রেণ ছাড়িল। তখন সহসা সমস্ত উৎসাহ সমস্ত আনন্দ মনোরমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল। শব্দে, দোলানিতে, তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। ভয়ে জানালার বাহিরে চাহিতেও পারিল না। শেষে হৈমবতীর কোলে মাথা দিয়া ঘুমাইয়া পড়িল;—তিনি তাহার কপালে হাত বুলাইয়া আঁচল দিয়া মাথায় বাতাস করিতে লাগিলেন।

রাত্রি কাটিল। পরদিন মনোরমা সম্পূর্ণ সুস্থতা লাভ করিল। জানালার কাছে বসিয়া মাঠ, ক্ষেত, নদী, পাহাড় দেখিতে ও দুই বৎসর বয়স্ক খোকাকে দেখাইতে লাগিল। পাহাড় দেখিয়া একেবারে উন্মত্ত।

"কোন কোনও পাহাড় সবুজ গাছেপালায় ভরা, আর কোন কোনটা ওরকম শুকনো পোড়া মতন কেন কাকীমা?"

"সব পাহাড় কি আর সমান হয় বাছা?"

"সব মানুষ কেন তবে সমান?"

"সমান? কই সমান মা?"—বলিয়া হৈমবতী মুখ ফিরাইয়া, একবিন্দু জল চক্ষু হইতে আঁচলে লইলেন।—কাহার জন্য?

তাহার পরদিন প্রভাতে মোগলসরাইয়ে নামিতে হইল। সেখানে অনেক পাণ্ডা আসিয়া বসিয়া আছে। একজন ব্রজহরিকে দখল করিয়া ফেলিল।

মোগলসরাই হইতে অন্য গাড়ীতে রাজঘাট। রাজঘাট ষ্টেশন ঠিক গঙ্গার উপর। ওপারে কাশীর সৌধমন্দিরমালা নবরৌদ্রালোকে ঝক্‌মক্ করিতেছে। পুণ্যময়ী জাহ্নবী সফেন তরঙ্গ তুলিয়া বহিয়া চলিয়াছেন। তাহা দেখিয়া ট্রেণসুদ্ধ লোক—'জয় বাবা বিশ্বনাথজীকি জয়' বলিয়া বারম্বার উন্মত্তবৎ চীৎকার করিতে লাগিল।

ইঁহারাও কাশীর পানে বদ্ধদৃষ্টি হইয়া, গলায় কাপড় দিয়া যোড়হাত করিয়া প্রণাম করিলেন।

হৈমবতী বলিলেন—"জয় বাবা বিশ্বনাথ—হে মা অন্নপূর্ণা—মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কোরো। এত সাধু সন্ন্যাসী এখানে তোমার সেবা করছে, আমার বাছাকে যেন দেখতে পাই। দেবাদিদেব মহাদেব, বাবা বিশ্বনাথ দোহাই বাবা সাত দোহাই তোমার।"

॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ বিশ্বের অল্প লোকেরই প্রার্থনায় কর্ণপাত করিয়া থাকেন; হৈমবতী সেই অল্পের মধ্যে একজন পরিগণিত হইলেন। তিনি দশ বৎসরের হারানো পুত্রের দেখা পাইয়াছেন।

সেদিন তাঁহারা কালভৈরবের বাড়ী পূজা দিতে যাইতেছিলেন, পথে সাধনানন্দ স্বামীর মঠ। পাণ্ডা বলিল, "মাঈ—সাধ্‌নানন্দ্ সোয়ামিজিকো দেখিবি না? বড়া ভারি মহাৎমা আছে।"

সকলে সাধনানন্দ স্বামীকে দর্শন করিলেন। স্বামী তখন অধ্যাপনায় নিযুক্ত। কয়েকজন গৈরিকবসনধারী নবীন সন্ন্যাসী বসিয়া তাহা শ্রবণ ও তৎসম্বন্ধে প্রশ্নাদি করিতেছেন। এই শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে হৈমবতী তাঁহার শশিভূষণকে চিনিতে পারিলেন।

আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! যে ছিল দ্বাদশবর্ষীয় বালক সে এখন পূর্ণাবয়ব দীর্ঘায়তন নবীন যুবাপুরুষ হইয়াছে। তপশ্চর্য্যার ফলেই হউক আর যে কারণেই হউক, তাহার বর্ণ তপ্ত কাঞ্চনের মত প্রভাসম্পন্ন। মস্তকের তাম্র জটাভার ললাটের ঊর্দ্ধ প্রান্তে বিচিত্র

চিত্র রচনা করিয়াছে।

তাহাকে পাইয়া তাহার পিতামাতা যে আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু সে কিছুতেই সন্ন্যাস পরিত্যাগ করিতে চাহিল না। এমন কি মঠ ছাড়িয়া পিতামাতার সহিত কেদারঘাটের বাসায়ও থাকিতে সম্মত হইল না। তবে প্রত্যহ আসিয়া সারাদিন ইঁহাদের সঙ্গে যাপন করিত।

সপ্তাহকাল এইভাবে কাটিলে, একটু গোলযোগ ঘটিল। যতদিন হইতে উপন্যাস লেখার সৃষ্টি হইয়াছে—কোন কোনও পণ্ডিতের মতে আরও পূর্ব্ব হইতেই—অর্থাৎ যত-দিন হইতে পৃথিবী নরনারীসম্পন্ন এবং নরনারী হৃদয়নয়নসম্পন্ন হইয়াছে, ততদিন হইতেই—এ গোলযোগ ঘটিয়া আসিতেছে। অন্যের—ও প্রথম প্রথম নিজেরও—অগোচরে এই সন্ন্যাসীবর মনোরমার প্রতি একটু বেশীরকম চাহিতে লাগিল। সে দেখে আর দেখে আর দেখে। মনোরমার বুকের মধ্যেও কেমন একটা নূতন ভাবের তরঙ্গ খেলিতে থাকে। কেমন একটা অশোয়াস্তি, একটা সুখ।

একদিন এই চোখের ও বুকের ভাষা, মুখের ভাষায় পরিণত হইবার উপক্রম করিল।

সেদিন প্রাতঃকাল। শশী আসিয়া দেখিল, মনোরমা বসিয়া দুধ জ্বাল দিতেছে, খোকা ঘুমাইতেছে—গৃহে আর কেহ নাই। শুনিল তাহার পিতামাতা গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াছেন, কলুগিন্নি বাজারে গিয়াছে।

জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আজ গঙ্গাস্নানে যাওনি?"

"আমার একটু অসুখ করেছে।"

শশী ব্যস্ত হইয়া বলিল, "অসুখ করেছে? হাত দেখি?"

মনোরমা হাত বাড়াইয়া দিয়া, হাসিয়া বলিল, "তুমি বদ্যি নাকি?"

উত্তর না করিয়া শশিভূষণ নাড়ী পরীক্ষা করিতে লাগিল। তাহার পর কপালে হাত দিয়া বলিল, "ইস্! খুব গরম যে!"

মনোরমা হাসিয়া বলিল, "খুব বদ্যি হয়েছ! আমার মোটেই জ্বর হয়নি।"

"হয়নি ত কি! তোমার কপাল ভারি গরম।"

"ও বোধ হয় আগুন-তাতে ব'সে থেকে।"

"আচ্ছা, আগুনের কাছে থেকে সরে এস, দেখি ভাল করে হাত"—বলিয়া শশিভূষণ মনোরমার হাতটি ধরিয়া তাহাকে সরাইয়া, তাহার সুন্দর কোমল হাত নিজের একটি হাতে সতৃষ্ণভাবে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল, অন্য হাতের অঙ্গুলি দিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিতে লাগিল। মনোরমার মনে কি রকম একটা ভয় হইতেছিল। একটা যেন না—না—শব্দ উঠিতেছিল। তাহার পা স্পষ্টই কাঁপিতেছিল, আর বোধ হয় শরীরও।

শশী বলিল—"মনো!" এই প্রথম 'মনো' বলিল—পূর্ব্বে বরাবর মনোরমা বলিয়াছে।

মনোরমা বলিল—"কি?"

ভারি আশ্চর্য্য! চুপি চুপি 'কি' বলিবার এমন কি প্রয়োজন ছিল? বোধ হয় হৃদয়যন্ত্রের অভ্যন্তরে রক্তটা একটু বিশেষভাবে সঞ্চালিত হইতে থাকিলে, কথার স্বরটা ভারি নামিয়া যায়।

কিছুক্ষণ কাটিল, আর কোন কথা হইল না।

শেষে বাহিরে কলুগিন্নির স্বর শোনা গেল—"ওমা! এরা যে এখনো ফেরে না গো! ঠাকুর দেখে ফিরবে না কি? আমি তবে যাব কার সঙ্গে?"

শশী মনোরমার হাত ছাড়িয়া বাহির হইল। বলিল, "কলুগিন্নি! কোথায় গিয়েছিলে?"

কলুগিন্নি বলিল, "কে, দাদাঠাকুর? পেরণাম হই। দেখ না! আধ পয়সার এই ঝাঁত্তা থোড়! দেশে হলে কেউ ছোঁয়ও না। বল্লাম ত মাগী ক্যারোড় ব্যারোড় ক'রে কি সব বল্লে কিছুই বুঝতে পারলাম না। গাল দিচ্চে মনে ক'রে, আমিও যা নয় তাই ব'লে গাল দিয়ে চলে এলাম।"

শশিভূষণ এ নালিশে কিছুমাত্র মনোযোগ না করিয়া প্রস্থান করিল।

॥ ৪ ॥

সেদিন সারাদিন আর শশী আসিল না। মঠে গিয়া নিজের ঘরের দুয়ার বন্ধ করিয়া দিল।

প্রথমে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বিছানায় পড়িয়া রহিল। মনে হইতে লাগিল যেন নেশা হইয়াছে। মাথাটা যেন ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে।

মস্তিষ্ক একটু শীতল হইলে, মনে হইতে লাগিল, আজ সে মহা একটা দুষ্কর্ম্ম করিয়া আসিয়াছে।

নিজের চিত্তচাঞ্চল্যের বিষয় সে অনবগত ছিল না। তাহার জন্য সে নিজেকে ক্ষমা করিত। এরূপ চিত্তচাঞ্চল্য পূর্ব্বে কখন-কখনও হইয়াছে—কিন্তু মনের পাপ কর্ম্মে কখনও আত্মপ্রকাশ করে নাই। এ চাঞ্চল্য রক্তমাংসের দুরবচ্ছেদ্য ধর্ম্ম, উন্মূলন করিবার উপায় নাই। সহ্য করিতে হইবে, সংযত থাকিতে হইবে। ইহাই ধার্ম্মিকের, সজ্জনের কর্ত্তব্য। কিন্তু অদ্য প্রভাতে সে সংযম তাহার কোথায় গেল? আজ সে কি করিয়া বসিল! আর কখনও আকাঙ্ক্ষা লইয়া কোনও স্ত্রীজাতিকে সে স্পর্শ করে নাই; আজ কি হইল?

নিজের প্রতি ধিক্কারে, অনুশোচনায় শশিভূষণ অস্থির। উঃ এই তার সন্ন্যাসধর্ম্ম? এত গর্ব্ব—এত তেজ—সব মুহূর্ত্তের মধ্যে পথকর্দ্দমে লুণ্ঠিত হইল!

পুরাণ স্মরণ করিল—অপ্সরা পাঠাইয়া দেবতাগণ মুনিগণের তপোভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিতেন—চিৎশক্তির পরীক্ষা লইতেন। সে কত কঠিন পরীক্ষা! তাহার তুলনায় এ কি? কিছুই নয়। পরীক্ষাই নয়। তবু ত তাহার এই লজ্জাকর পরাজয়!

ক্রমে মনে হইল—মুনিগণের শত শত বর্ষের সাধনা—সে ত পরশ্ব জন্মগ্রহণ করিয়াছে মাত্র! আর, দশ বৎসর সে যাহা করিয়াছে তাহা ত তপস্যাও নহে।—খানকতক ব্যাকরণ পড়িয়াছে—কাব্য পড়িয়াছে—দর্শনের সূত্র মুখস্থ করিয়াছে—শ্রুতির ভাষ্য নকল করিয়াছে মাত্র।

একটু একটু করিয়া তাহার মনে সান্ত্বনার আলোক ক্রমে পড়িতে লাগিল। ভাবিল, আ মরি, মুনিগণই বা কি চিৎশক্তির পরিচয় দিয়াছেন! অধিকাংশই ত পরাজিত।

পুরাণের আরও অনেক কথা মনে পড়িল, তাহাতে আত্মসান্ত্বনার পথ আরও পরিষ্কৃত হইতে লাগিল।

তখন চিন্তা করিল—এ ভ্রম মনে পোষণ করা কেন? সে ত সন্ন্যাসী নহে: বিদ্যা-শিক্ষার জন্য এতদিন ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিতেছিল মাত্র।

তাহার পিতামাতার সপ্তাহব্যাপী করুণোক্তিগুলি ক্রমে ক্রমে মনে পড়িতে লাগিল—'আমার আর কেউ নেই বাবা—বাড়ী চল। আমার ঘর অন্ধকার—আমার চক্ষের মণি তুমি—বিয়ে কর,—বিয়ে কর,—বিয়ে ক'রে সংসারী হও!'

ধর যদি সে বিবাহই করে, যদি সে সংসারী হয়—তাহা হইলে কি হয়?

কি ভয়ানক, তাহা তখনও হয়? গুরু সাধনানন্দ বলিবেন কি? সহাধ্যায়ীবৃন্দ—বালগোপাল, করুণানন্দ, মাধো উপাধ্যায়, সীতাপতি বলিবে কি?

তখন ভাবিল—কি আশ্চর্য্য! কে কি বলিবে না বলিবে তাহাই ভাবিয়া আমি নিজের কর্ত্তব্য স্থির করিব? কি বলিবে? যাহা ইচ্ছা বলুক, যত পারে হাসুক, যত ছিলিম খুসী গাঁজা ভস্ম করুক। আমার তাহাতে কি আসিয়া যাইবে?

নিজের ভবিষ্যৎ জীবন কল্পনা করিতে চেষ্টা করিল। এ চুল নাই, গৈরিক বসন নাই, দেশে গিয়াছে, বিবাহ করিয়াছে। ঘরে বধূ—দেখি কেমন বধূ?—মনোরমা। ছি! মনোরমা নহে—আর কেহ। কিন্তু মন মানিল না। বালকের হাত হইতে একটি খেলনা কাড়িয়া লইয়া সেটি লুকাইয়া, অন্য শত শত খেলনা তাহার হাতে দিলেও সে যেমন

আছাড়িয়া ফেলে, শশিভূষণের প্রণয়াশিশুও সেইরূপ মনোরমা ভিন্ন অন্য কোনও দেবী. নারী বা কিন্নরীকে বধূবেশে গ্রহণ করিতে চাহিল না।

তখন হঠাৎ এক বৎসরের পুরাতন একটা ঘটনার কথা মনে হইল। এক বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এক শিষ্য, বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয়তা বিচার করিতে কাশী আসিয়াছিলেন। কাশীর পণ্ডিত সমাজে সে কি উত্তেজনা তখন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল! লোকে সে পণ্ডিতকে কত না বিদ্রূপ করিয়াছিল—কত না কঠিন কথা বলিয়াছিল। একজন প্রস্তাব করিয়াছিল, ইহার টাঁকি কাটিয়া আঠা দিয়া পশ্চাদ্ভাগে জুড়িয়া লেজ বানাইয়া দাও।

সেই পণ্ডিতের যুক্তি-তর্ক শশী মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিল। জানালা খুলিয়া ঘরে আলো আনিয়া, নিজের পুঁথিপত্র পাড়িল। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর, রঘুনন্দন,—পাতা উল্টাইয়া বিসংবাদের শ্লোকগুলি, পড়িতে লাগিল, তাহার টীকা ভাষ্য পড়িল; স্বার্থের নূতন আলোকে, সকল শ্লোকের অনুকূল অর্থই উপলব্ধি করিল।

বিধবা-বিবাহের আইন লইয়া বঙ্গদেশে কি প্রকার আন্দোলন হইয়াছিল সে জানিত না। সে ছিল কাশীতে। কাশীর পাণ্ডাগণ বিরোধ উত্থাপন করিলেন বটে, কিন্তু দুই একজন মতও দিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের উদ্যোগে আইন পাস হইল বলিয়া, কাশীর পণ্ডিতগণ তাবৎ বাঙ্গালীকে খৃষ্টান বলিয়া নিন্দা করিয়াছিলেন। সুতরাং শশিভূষণ সিদ্ধান্ত করিল, বাঙ্গালীর চক্ষে এটি আর নিন্দনীয় নহে।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে স্থির করিল, মনোরমাকে যথাশাস্ত্র বিবাহ করিবে। এই সকল শাস্ত্র দেখাইয়া যুক্তি দেখাইয়া উভয়ের পিতামাতাকেই স্বমতে আনয়ন করিবে। হায় বালক!

যখন বাহির হইল, তখন বিশ্বেশ্বরের আরতির ঘণ্টা বাজিতেছে। দলে দলে লোক মন্দিরাভিমুখে ছুটিয়াছে। কি সুন্দর সুগম্ভীর দৃশ্য! সহস্র কণ্ঠোচ্চারিত মন্ত্রময় বন্দনা গান।

॥ ৫ ॥

আরতির পর শশিভূষণ কেদারঘাটের বাসায় আসিল। দেখিল, বাড়ীতে মনোরমা ছাড়া আর কেহ নাই। শশীকে দেখিয়া মনোরমা আহ্লাদে চঞ্চল হইয়া উঠিল।

"মনো—সবাই কোথা ?"

"তাঁরা সব আরতি দেখতে গেছেন. এখনও ফেরেননি ত।"

"আমিও আরতি দেখতে গিয়েছিলাম, ভীড়ে বোধ হয় তাঁদের দেখতে পাইনি। তাঁরা অন্নপূর্ণার আরতি দেখে ফিরবেন হয়ত। কেমন আছ মনো ?"

"ভাল আছি। সারাদিন আসনি কেন ?"

"এই এবার যে এলাম. এখন আর শীগ্‌গির যাচ্ছিনে—তা জান ?"

"সত্যি ? মঠে যাবে না ?"

"না, মঠ ছেড়ে দিয়েছি। এবার সংসারী হব, বিয়ে করব মনো।"

"সত্যি ?—কাকীমা তা হ'লে কত খুসী হবেন। কত ঠাকুরদেবতাকে মানত করেছেন।" —বলিয়া মনোরমা ঘামিতে লাগিল।

দুইজনে অনেক কথা হইল। যে কথা চোখে চোখে অনেক বার হইয়া গিয়াছিল,—সেই কথা মুখে মুখেও হইল। শশী বলিল—বিধবার বিবাহ এখন শাস্ত্রসঙ্গত হইয়াছে। সে উভয়ের পিতামাতাকে বুঝাইয়া তাহাকে বিবাহ করিবে।

মূঢ় বালিকা সংসারের কিছুই জানিত না;—এই কথা ধ্রুব সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করিল। বিধবার বিবাহ হইবে এমন একটা কাণাঘুষা সেও শুনিয়াছিল কিনা। শশিভূষণকে মনে মনে স্বামী বলিয়াই গ্রহণ করিল।

শশী বলিল, "আজ রাত্রেই তবে মাকে বলি ?"

মনোরমা বলিল, "না—দেশে গিয়ে বোলো।"

শশী মনোরমার হাতটি ধরিয়া বলিল, "কেন মনো ?"

"তা হলে আমার ভারি লজ্জা করবে। আমি আর তোমার সঙ্গে কথা কইতে পারব না। এক বাড়ীতে যতদিন আছি, ততদিন বোলো না—তোমার দুটি পায়ে পড়ি।"

শশী বলিল, "তবে দেশে গিয়েই বলব।"

পিতামাতা ফিরিলেন। শশীর মা যখন শুনিলেন, শশী আর মঠে যাইবে না, বাড়ীতেই থাকিবে—তিনি হাতে স্বর্গ পাইলেন। মনের সুখে বেশী করিয়া ঠাকুর দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন—এই দুটি যুবক যুবতীও বেশী করিয়া পরস্পরের নিরালা সঙ্গলাভ করিতে লাগিল।

শশীর পিতামাতা বড় অদূরদর্শী।—অবশ্য শশী বা মনোরমা যে পরস্পরকে বিবাহ করিবার কথা ভাবিতেও পারে, এ তাঁহাদের মস্তিষ্কেই প্রবেশ করে নাই। তথাপি এ দুই জনের প্রতি তাঁহাদের একটা কর্ত্তব্য ছিল—ইহাদের নিভৃত সাক্ষাতের অবসর দেওয়া অবশ্যই তাঁহাদের উচিত ছিল না। কিন্তু দুইটি কারণে তাঁহাদের এ ভ্রান্তি উপস্থিত হইয়াছিল—প্রথম শশীর বিদ্যাবুদ্ধি ও ধার্ম্মিকত্ব—দ্বিতীয়তঃ সন্তানস্নেহ, 'আমার ছেলে দেবতুল্য সে কখনও' ইত্যাদি।

॥ ৬ ॥

শেষে দেশে ফিরিবার সময় হইল—শশীর মাতা ক্রমাগত মনোরমার সঙ্গে পরামর্শ করিতেন, কাহার মেয়ের সঙ্গে শশীর বিবাহের সম্বন্ধ করা যাইবে।

একদিন নির্জ্জনে শশীর কাছে এই সব গল্প করিতে করিতে মনোরমা বলিল, "মাকে যখন তুমি বলবে যে আমাকেই বিয়ে করবে, আর শাস্ত্র থেকে সব দেখিয়ে দেবে যে হতে আছে—তখন মার ভারি আহ্লাদ হবে—বোধ হচ্চে।"—

মনোরমা মনে করিত এই আমার শ্বশুর, এই আমার শাশুড়ী। ভাবিত, আমিই যে ইঁহাদের পুত্রবধূ হইব, তাহা এখন জানিতেও পারিতেছেন না—কি মজা!

সকলেই দেশে ফিরিলেন। শশিভূষণকে দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গেল। তাহার বাঙ্গালা কেমন বাঁকা বাঁকা হিন্দী সুরের হইয়া গিয়াছে।

হৈমবতী দেশে আসিয়াই শশীর বিবাহের জন্য পাত্রী খুঁজিতে আরম্ভ করিলেন।

শশী তাঁহাকে বলিল, "মা, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।"

কথাটা বলিল—শুনিয়া মা আকাশ হইতে পড়িলেন।

শশী বলিল, "সে কি মা! শোননি? বিধবা বিবাহ যে প্রচলিত হয়েছে—আইন হয়েছে।"

মা বলিলেন, "আইনের মুখে আগুন! ইংরাজেরা ম্লেচ্ছ, ওরা আইন করবে না কেন?"

"ইংরাজেরা ম্লেচ্ছ—কিন্তু বিদ্যাসাগর মশাই যে পরম পণ্ডিত, পরম হিন্দু। তিনি প্রমাণ করেছেন।"

মা বিদ্যাসাগরের প্রতি এমন একটা কটূক্তি করিলেন যাহা লেখনীর মুখে আনয়ন করা অসাধ্য।

শশিভূষণ ভারি হতাশ হইল। ভাবিল, মা নিরক্ষর, আমার পিতা শাস্ত্রদর্শী, তিনি বুঝিবেন।

পিতা শুনিয়া কাণে অঙ্গুল দিয়া কহিলেন, "ছি ছি ছি! এতদিন শাস্ত্রচর্চ্চার এই ফল তোমার?"

শশী শাস্ত্রের তর্ক পাড়িতে চাহিল। পিতা বলিলেন, "মহাভারত! এ কথার আলোচনাতেও পাপ আছে।"

শশী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা বলিল। পিতা বলিলেন, "বিদ্যাসাগর হোটেলে খায়। এ কথা আমি স্বকর্ণে শুনেছি।" *

* একবার কোথাকার ষ্টেশনে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত এক পণ্ডিতের দেখা হয়। পণ্ডিত জানিত না যে ইনিই বিদ্যাসাগর। সে তর্কের মুখে বলিয়াছিল—"বিদ্যাসাগর হ্যাট কোট পরে,

ইহার অপেক্ষা প্রবলতর বিরুদ্ধযুক্তি আর কি হইতে পারে? শশী যখন দেখিল পিতার কাছেও কূল পাইল না, তখন হতাশ হইয়া নিজের শয়নকক্ষে আসিয়া দুয়ার বন্ধ করিল।

ঠিক এই সময়, ও পাড়ার একটি কুটীরে শশিভূষণের নাম উচ্চারিত হইতেছিল। কলুগিন্নি তাঁতিদিদির সহিত কাশীর গল্প করিতেছিল। তাঁতিদিদি বলিল—"আহা, বামনীর ভাগ্যি ভাল। সে ছেলেটা যখন মরে গেল, আমরা মনে করলাম মাগী শোকে পাগল হয়ে যাবে। ধর্ম্ম কর্ম্মের ফল আছে বইকি দিদি, এই দেখ ধর্ম্ম করতে কাশী গেল বলেই না হারা ছেলেটিকে পেলে! খাসা ছেলে রাজপুত্তুরের মত চেহারা, নিষ্ঠের শরীর কিনা।"

কলুগিন্নি মুখ বাঁকাইয়া বলিল, "নিষ্ঠের কথা আর বলে কায কি! কলিকালে আবার ধর্ম্ম আছে না নিষ্ঠে আছে!"

তাঁতিদিদি শুনিয়া অত্যন্ত কুতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি রকম—কি রকম?"

"কি রকম আবার? আমার মাথা আর মুণ্ডু।"

অতঃপর চুপি চুপি অনেক কথা হইল। তাঁতিনী শুনিয়া অবাক হইয়া বলিল—"অ্যাঁ! গলায় দড়ি গলায় দড়ি।"

কলুগিন্নি অবশ্যই সাবধান করিয়া দিল—"কাউকে বলিসনে দিদি—দরকার কি আমাদের কারু কথায় থাকবার? যে আগুনে হাত দেবে সে নিজেই পুড়ে মরবে।"

তাঁতিনী বলিল, "দরকার কি বোন, এ কথা কি আর কাউকে বলবার না কারু শোনবার? কাউকে বলতে হবে না। ধর্ম্মের কল আপনিই বাতাসে নড়ে যাবে।"

সপ্তাহ মধ্যে গ্রামে ঢীঢী পড়িয়া গেল।

মনোরমার পিতা হারাধন চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া শশীর পিতা ব্রজহরির বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। দুয়ার বন্ধ করিয়া দুজনে অনেক পরামর্শ হইল। ঘণ্টাখানেক পরে ব্রজহরি বাহির হইয়া শশিভূষণকে আনিয়া সেই ঘরে দুয়ার বন্ধ করিলেন।

ইহার পর হারাধন প্রচার করিলেন, তাঁহার কন্যা মনোরমার হৃদ্‌রোগ উপস্থিত হইয়াছে, ডক্তার দেখাইতে কলিকাতায় যাইবেন। সপরিবারে কলিকাতা যাত্রা করিলেন।

কয়েক দিবস পরে গ্রামের লোক শুনিল, শশিভূষণ আবার কাশীর মঠে ফিরিয়া গিয়াছে।

আরও কয়েকদিন পরে শুনিল, মনোরমার মৃত্যু হইয়াছে।

কলিকাতায় বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া বর ও কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। সুপারিশের চিঠি দিয়া '—' কলেজে শশিভূষণকে সংস্কৃতের অধ্যাপক করিয়া পাঠাইলেন।

এখন শশিভূষণ পেন্সন লইয়া কাশীবাস করিতেছেন। ছেলেমেয়ে অনেকগুলি। মাঝে মাঝে সুপক্ক টিকিটি নাড়িয়া, স্ত্রীর হাতখানি হাতে লইয়া সস্নেহে তাহাকে বলেন—"বলি ব্রাহ্মণী, তোমার হৃদ্‌রোগটা কেমন আছে?"

হোটেলে খায়। আমি স্বচক্ষে দেখেছি।" বিদ্যাসাগর মহাশয় হাসিয়া বলিলেন—"বিদ্যাসাগরকে চেন তা হলে?" সে উত্তর করিল—"চিনি না? বিলক্ষণ চিনি। কতবার দেখেছি।"—এ গল্প বিদ্যাসাগর জীবনীতে আছে।

প্রণয়-পরিণাম

॥ ১ ॥

হিন্দু বয়েজ স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র মাণিকলাল, প্রতিবেশী বালিকা কুসুমলতার সঙ্গে প্রেমে পড়িয়া গিয়াছে।

কবি গাহিয়াছেন—'কে এমন প্রেমিক আছে, যে প্রথম দর্শনেই ভালবাসে নাই?'—কেন আমাদের মাণিকলাল! কুসুমের সঙ্গে বাল্যকাল হইতে সে কত খেলা করিয়াছে, গাছের

মগডালে উঠিয়া তাহাকে ছানাসুদ্ধ পাখীর বাসা পাড়িয়া দিয়াছে, ঘোড়া সাজিয়া পৃষ্ঠে তাহাকে বহন করিয়াছে, কিন্তু তখন ত সে কোনওরূপ চিত্তচাঞ্চল্য অনুভব করে নাই। কে জানে, হয়ত সে মনের মনে, হৃদয়ের হৃদয়ে ভালবাসিত, অন্তরের সুগোপন অন্তরালে সে প্রচ্ছন্ন প্রবাহের অস্তিত্ব নিজেও অবগত ছিল না।

মাণিকলাল নিজের কাছে নিজে ধরা পড়িয়াছে সংপ্রতি মাত্র। সেদিন মাণিক কুসুমদের বাগানে, পেয়ারা পাড়িতে গাছে উঠিয়াছিল। কুসুম-মাতার সঙ্গে গঙ্গাস্নান করিয়া বাড়ী ফিরিতেছে। কুসুমের পরিহিত বসনখানি জলসিক্ত, পৃষ্ঠলম্বিত ঘন কৃষ্ণ কেশরাজির প্রান্ত দিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িতেছে, আর্দ্র মুখখানি প্রভাতের সোণালি রৌদ্র লাগিয়া প্রতিমার মত চিক্ চিক্ করিতেছে। দেখিয়া, মাণিক হৃদয় হারাইল।

ইহারা চলিয়া গেলে পর, মাণিক তাহার অন্তরে যেন এক অপূর্ব্ব আলোকের রশ্মি প্রতিভাত দেখিল। সে আলোক তাহার মনোদেহের প্রতি পরমাণুটিকে যেন বেড়িয়া নৃত্য করিতে লাগিল। আলোক মন অতিক্রম করিয়া ক্রমে তাহার চক্ষুযুগলে আসিয়া উপনীত হইল এবং নিমেষের মধ্যে নিখিল বিশ্বচরাচরে ছড়াইয়া পড়িল। সেই নবীন আলোকে মাণিক আকাশের পানে চাহিল—আকাশ আশ্চর্য্য নীল—এমন কখনও দেখে নাই।—বসুন্ধরার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল, বসুন্ধরা আজ পরমা সুন্দরী। দূরে দীর্ঘিকাতীরে ঘুঘু ডাকিতেছে —উকু পাখী কলরব করিতেছে, বউ-কথা-কও মাঝে মাঝে ঝঙ্কার দিতেছে; পাখীর ভাষায় যেন আজ নূতন প্রাণ, নূতন সুর। মাণিক নিশ্বাস ফেলিয়া, গাছ হইতে নামিয়া আসিল।

তাহার কোঁচার খুঁটে গোটা দশেক পেয়ারা। ভাল দেখিয়া গোটা দুই রাখিয়া, বাকী সমস্ত বাগানে ছড়াইয়া দিল। পেয়ারায়—বিশেষতঃ কোষো পেয়ারায়—আর তাহার চিত্ত নাই।

সেদিন রবিবার ছিল—স্কুল যাইতে হইবে না। আহতবৎ মন্থরপদে বাড়ী আসিয়া মাণিক পড়িবার ঘরে প্রবেশ করিল। পড়িবার জন্য? হায়, না, পুড়িবার জন্য, চিন্তার অনলে নিজের হৃদয়কে আহুতি দিবার জন্য। শতরঞ্চ বিছান মেঝেতে ওয়েবষ্টার ডিক্সনারি মাথায় দিয়া চুপ করিয়া শুইয়া রহিল।

মাণিকের বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর। এই বয়সেই সে বাঙ্গালা উপন্যাস পড়িয়াছে রাশি রাশি। 'মৃণালিনী', 'চন্দ্রশেখর', 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' হইতে আরম্ভ করিয়া, বটতলার 'পারুল-বালা', 'সোহাগিনী', 'বউরাণী' প্রভৃতি কিছুই আর বাকী নাই।

শুইয়া শুইয়া মাণিক আকাশ পাতাল চিন্তা করিতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, দুঃখ যেন তাহার হৃদয়ে ধরিতেছে না—উথলিয়া যেন গ্রন্থ হইয়া বাহির হইতেছে। 'কেন দেখিলাম! হরি হরি কি দেখিলাম! দেখিলাম ত মরিলাম না কেন? আমার মনে এ আগুন—এ কুলকাঠের আঙার—কে জ্বালিল রে? নিবিবে কি? কতদিনে—হায় কতদিনে!' —ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিয়ৎক্ষণ পরে শিশ দিতে দিতে লম্ফ দিয়া মাণিকের সহপাঠী বন্ধু বিপিন ও শরৎ প্রবেশ করিল। বিপিন আসিয়া একেবারে মাণিকের চুল ধরিয়া বলিল, "কি রে ইণ্টুপিট্ ঘুমুচ্ছিস নাকি? মার্ব্বেল খেলবিনে?"

মাণিক উঠিয়া বিপিনের গালে হঠাৎ এক চড় কসাইয়া দিল।

বিপিন হতভম্ব। শরৎ বলিল, "তোর হয়েছে কি? মারামারি করতে চাস, আয়"—বলিয়া শরৎ আস্তিন গুটাইতে লাগিল।

বিপিন বলিল, "আঃ শরতা কি করিস।" মাণিকের পানে ফিরিয়া বলিল, "লেগেছে ভাই, রাগ করেছিস?"

মাণিক বলিল, "মানুষ শুয়ে রয়েছে, চুল ধ'রে টানলি কি ব'লে?"

শরৎ মাণিকের চুল ধরিয়া টানিয়া বলিল—"আহা এ রকম করে টানলে বুঝি আবার লাগে?"—তাহার আশা ছিল, তাহাকেও মাণিক চড় মারিবে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ শরৎ

তাহার সহিত ঘুসি লড়িতে আরম্ভ করিবে।

কিন্তু শরতের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল না। মাণিকের ক্রোধ নিরীহ বিপিনের উপরেই সবটা খরচ হইয়া গিয়াছিল। মাণিক সটান আবার শুইয়া পড়িল।

শরৎ বলিল, "না খেলিস—না খেলবি। ভারি ত বয়েই গেল কিনা।" বলিয়া বিপিনের হাত ধরিয়া বলিল, "চল্ রে বিপনে।"

বিপিন যাইবার সময় বলিয়া গেল, "মাণিক রাগ করিসনে ভাই—যদি লেগে থাকে তোর, বিলক্ষণ শোধ ত নিয়েছিস।"

॥ ২ ॥

মাণিক আর ফুটবল খেলে না—জিম্‌ন্যাষ্টিক্ করা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছে—দ্বিপ্রহরে ইস্কুল পলাইয়া গঙ্গাতীরে বসিয়া কবিতা লেখে! প্রভাতে, সন্ধ্যায় নানা ছলে কুসুমদের বাড়ী গিয়া কুসুমকে দেখিয়া আসে।

কুসুম মেয়েটি দেখিতে খুব সুন্দরী না হউক, মুখখানি বেশ ফুটফুটে। পিতামাতার শেষের সন্তান—ভারি আদরের মেয়ে। কুসুম এই কার্ত্তিক মাসে এগারো বছরে পড়িয়াছে। দুই এক স্থানে বিবাহের কথাবার্ত্তা হইতেছে; কিন্তু এখনও পাকাপাকি কোথাও স্থির হয় নাই।

মাণিক ক্রমাগত কুসুমের সঙ্গে দেখা করিয়া, কথা কহিয়া, জিনিষ দিয়া তাহার সঙ্গে একটু বেশ ঘনিষ্ঠতা করিয়া লইল। মাণিকের প্রতি কুসুমেরও একটা টান যেন দেখা যাইতে লাগিল।

বৈশাখের শেষে, কলেজ বন্ধ হওয়াতে, মাণিকের এক পিসতুতো ভাই প্রভাস আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রভাস মাণিক অপেক্ষা তিন বৎসরের বড়। মাণিক তাহাকে কতকটা গুরুজন বলিয়া গণ্য করিত এবং ভয় করিয়া চলিত। প্রভাস আসিলেই মাণিককে পড়া জিজ্ঞাসা করিত, আঁক কষিতে দিত, পিতা-মাতার প্রতি ভক্তি, অসৎসঙ্গের দোষ, অধ্যবসায় প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশাদি দিত।

কিন্তু কলিকাতার বন্ধুগণের মধ্যে প্রভাস একজন নীরব কবি বলিয়া বিখ্যাত। তাহার মনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে রোমান্স, কেবল প্রেমপাত্রীর অভাবে কোনও মতে প্রেমে পড়া হইতে বিরত আছে।

সে আসিয়া মাণিকের ভাবগতি দেখিয়া বারম্বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—ব্যাপারটা কি?

মাণিক ত কিছুই স্বীকার করে না। সন্ধান করিয়া করিয়া শেষে একদিন প্রভাস মাণিকের কবিতার খাতা হাতে পাইল। কবিতা পড়িয়া ব্যাপার কিছুই বুঝিতে বাকী রহিল না। মাণিকের উপর তাহার ভারি ভক্তি ও সৌহার্দ্দ্য বোধ হইল।

সেদিন জলখাবার খাইয়া প্রভাস মাণিককে বলিল, "গঙ্গার ধারে বেড়িয়ে আসা যাক চল।"

মাণিক প্রথমে আপত্তি করিয়াছিল—কিন্তু প্রভাস অনেক জিদ্ করিল, কিছুতেই ছাড়িল না।

গঙ্গাতীরে কিয়ৎক্ষণ বেড়াইয়া, তীরে উঠানো এক ভাঙ্গা নৌকার গায়ে দুইজনে উপবেশন করিল।

প্রভাস বলিল, "আমি সব জানতে পেরেছি।"

মাণিক আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "কি?"

"তোমার গোপন কথা।"

মাণিক ভাবিল—নিশ্চয়ই সিগারেটের বিষয়। ডেস্কের মধ্যে লুকানো বার্ড্সাই, কাগজ প্রভৃতি প্রভাসদাদা বোধ হয় দেখিতে পাইয়াছে, সুতরাং সন্দিগ্ধভাবে বলিল, "বেশী চালাকি কোরো না যাও।"

প্রভাস বলিল, "এ চালাকির কথা নয়—খুব গুরুতর কথা। জীবন মরণের সমস্যা।"

এবার মাণিক যথার্থ বিবর্ণটি সন্দেহ করিল। বলিল, "কি হয়েছে কি? কি বিষয়

বলই না।"

প্রভাস দূরস্থিত দূরগামী নৌকার পালে দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া বলিল, "তোমার ভালবাসার বিষয়।"

মাণিক ভাবিল—নিশ্চয়ই বাবাকে বলিয়া দিবে এবং মার খাওয়াইবে, সুতরাং শত্রুভাব ধারণ করিয়া মুখ খিঁচাইয়া বলিল, "আহা যা বল্লে আর কি! ইয়ার্কি ভাল লাগে না!"

প্রভাস বলিল, "ভাই—আমার কাছে আর লুকাও কেন? আমি সব জেনেছি। তোমাদের দুঃখে আমি খুব দুঃখী। তোমাদের সঙ্গে আমার আন্তরিক সহানুভূতি।"

মাণিক কতকটা আশ্বস্ত হইল। একটু অপ্রতিভও হইল। বলিল, "কে বললে তোমায়?"

নৌকার গায়ে জুতার গোড়ালি ঠুকিতে ঠুকিতে প্রভাস বলিল, "তোমার কবিতার খাতা দেখেছি। আমাদের অতুল বাঁড়ুয্যের মেয়ে কুসুম ত?"

মাণিক ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—তাই বটে।

"তোমার কবিতা থেকে যেন বোঝা যাচ্চে, আকর্ষণটা উভয়তঃ প্রবল—তাই কি?"

মাণিক বলিল, "মনে ত হয়।"

"স্পষ্ট কখনও বলেছে?"

"না।"

"তুমি কখনও তাকে স্পষ্ট করে বলেছ?"

"না।"

ইহার পর দুইজনে কিয়ৎক্ষণ নীরব হইয়া বসিয়া রহিল। শেষে প্রভাস বলিল—"দেখ ওরা আমাদের স্বঘর। মিলন হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু মা বাপকে জানানোর আগে, কুসুমের মন জানা দরকার। অনুমান ফনুমান নয়, স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করতে হবে।"

মাণিক বলিল, "সে কখনও পারা যায়?"

প্রভাস ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "সে না পারলে চলবে কেন? তুমি যদি সত্যই ওকে লাভ করতে চাও, তা হলে এ বিষয়ে যা কিছু কর্ত্তব্য, সব তোমায় সম্পন্ন করতে হবে। তা না হলে কি ক'রে হবে? আর দেরী করলেও চলবে না। কুসুমের কত জায়গায় বিয়ের কথা হচ্চে, কোন্ দিন বিয়ে হয়ে যাবে। তখন চিরদিনটে তোমায় আপশোষ করতে হবে।"

এ কথা শুনিয়া মাণিক চঞ্চল হইয়া উঠিল। এতদিন সে শুধু ভালই বাসিতেছিল। বিবাহ প্রভৃতির কল্পনা কখনও করে নাই। এখন মনে হইতে লাগিল, বিবাহ হইলে ত ভারি মজাই হয়!

"দাদা! কি ক'রে তার কাছে কথা পাড়ি বল দিকিন?"

"তা আমি শিখিয়ে দিচ্চি। একটু অবসর খুঁজে আড়ালে পেলে, তার হাতখানি এমনি করে ধরে, তাকে বলবে—'দেখ কুসুম—আমি তোমায় ভালবাসি। একটা দুরাশা মনে স্থান দিয়েছি, তুমি আমাকে ভালবাস কি?' যদি বলে 'বাসি'—তা হলে জিজ্ঞাসা করবে, 'তুমি আমার হবে কি—আমায় বিয়ে করবে কি?' যদি সে অনুকূল উত্তর দেয়—তা হলে তার হাতটি এই রকম করে ঠোঁটে তুলে চুমো খাবে।"

মাণিক বলিল, "কিন্তু দাদা! সে যদি রাজি না হয়?"

প্রভাস বলিল, "তা প্রথমবারেই রাজি নাও হতে পারে। ও রকম অনেক কেতাবে পড়া গেছে। প্রথমবারে কেউ কেউ একেবারেই 'না' বলে। কেউ কেউ বা বলে—'ভারি সহসা বলেছ, সময়ে উত্তর পাবে'। সে রকম হয়—তখন আবার তোমাকে শিখিয়ে দেবো।"

চাঁদ উঠিয়াছিল। দুইজনে নানা জল্পনা করিতে করিতে বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

॥ ৩ ॥

পরদিন হইতে মাণিকলাল অবসর অন্বেষণ করিতে লাগিল। কয়েক দিন চেষ্টার পর তাহা লাভও করিল। একদিন সকালে কুসুমদের বাড়ী গিয়া দেখে, বাড়ীতে কেহ নাই, কুসুম রান্নাঘরের বারান্দায় পা ছড়াইয়া বসিয়া মুড়ি খাইতেছে।

মাণিক বলিল, "কুসুম! বাগানে যাবে? তোমায় আম পেড়ে দিইগে চল।"

কাঁচা আমের নামে কুসুমের জিহ্বা জলসিক্ত হইয়া উঠিল। ঢোক গিলিয়া বলিল, "চল না মাণিকদাদা!"

বাগানে প্রবেশ করিয়া, এদিক ওদিক চাহিয়া মাণিক বলিল, "আমি ভারি ফুল ভালবাসি।"

কুসুম বলিল, "খবদ্দার—খবদ্দার—ফুল তুলো না—ফুল তুললে দিদিমা যে বকে।"

মাণিক বলিল, "না তুলছিনে। শুধু ফুল ভালবাসি তাই বলছি। ফুলকে ভাল কথায় কি বলে জান?"

কুসুম মুখ ঘুরাইয়া বলিল, "আহা, কে না জানে?—পুষ্প। আমাদের পদ্যপাদপে রয়েছে—

শাখীশাখে পুষ্পগুলি কিবা মনোহর।
পাখী ডাকে সুধা ঢালে শ্রবণ ভিতর॥

আচ্ছা মাণিকদাদা, তুমি ত ইংরেজী পড়, শাখী মানে কি বল দিকিনি?"—কুসুমের চক্ষু দুইটি মাণিকের পানে চাহিয়া হাসিতে লাগিল।

মাণিক বলিল, "পুষ্প ছাড়া ফুলের আর কি নাম হয়?"

"আহা! তুমি আগে আমার কথার উত্তর দাও না মশাই। শাখী মানে কি?"

"শাখী মানে বৃক্ষ।"

"জানে রে!"—বলিয়া কুসুম হাসিতে হাসিতে মাথা নাড়িল।

মাণিক বলিল, "এখন বল, পুষ্প ছাড়া ফুলের আর কি নাম হয়।"

"আর কি নাম? দাঁড়াও ভাবি।"—বলিয়া কুসুম ঠোঁট নাড়িয়া বিজ্‌বিজ্‌ করিয়া কি বকিতে লাগিল। বোধ হয় কোন কবিতা আবৃত্তি করিতেছিল।

মাণিক বলিল—"কু—"

কুসুম বলিল—"কু? কু কি?

কুহু কুহু রব করি ডাকিছে কোকিল।
কুসুম—

ওহো মনে পড়েছে। ফুলের আর একটা নাম কুসুম গো কুসুম!

কুসুম দুলায়ে ধীরে বহিছে অনিল॥

আচ্ছা, মাণিকদাদা, অনিল মানে যদি বলতে পার তবে ত বুঝি!"

মাণিক বলিল, "অনিল মানে বাতাস।"

বালিকার চক্ষে একটা আনন্দ ও প্রশংসার আলোক দেখা দিল।

মাণিক যথাশিক্ষা কুসুমের হাতখানি ধরিল। ধরিয়া বলিল, "বুঝতে পারলে না? আমি ফুল ভালবাসি বলেছি, তার মানে, আমি কুসুম ভালবাসি। আমি তোমায় ভালবাসি, কুসুম। তুমি আমায় ভালবাস?"

কুসুম দ্বিধামাত্র না করিয়া বলিল, "হ্যাঁ।"

মাণিক বলিল, "দেখ কুসুম, অনেক দিন থেকে একটা দুরাশা মনে স্থান দিয়েছি। তুমি আমায় বিয়ে করবে?"

প্রথম কথাটার মানে কুসুম কিছুই বুঝিতে পারে নাই। দ্বিতীয় কথাটার মানে বুঝিল। কিন্তু ঐ কথাতেই সব মাটি হইয়া গেল।—"ধেৎ"—বলিয়া মাণিকের হাত ছাড়াইয়া, কুসুম ছুটিয়া পলাইয়া গেল। তাহার পায়ের মল ঝম্‌ঝম্‌ করিয়া বাজিতে লাগিল। যতক্ষণ দেখা গেল, মাণিক তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

কুসুম চক্ষুর অন্তরাল হইলে, মাণিক ব্যাপারটা মনে মনে পর্য্যালোচনা করিতে লাগিল। বিবাহের নামে কুসুম অমন করিয়া ছুটিয়া পলাইল, তাহার অর্থ কি? তবে কি কুসুম সম্মত নয়?

অধীত উপন্যাসগুলি মাণিক একে একে স্মরণ করিতে লাগিল। ক্রমে মনে একটা

মীমাংসাও পাইল। লজ্জা প্রণয়ের চির-সহচর। কুসুমের পলায়নের কারণ যে লজ্জা, সে সম্বন্ধে তাহার মনে আর কোনও সংশয় রহিল না।

॥ ৪ ॥

প্রভাস শুনিয়া বলিল—তবে আর কোনও চিন্তা নাই। ভালবাসে যখন স্বীকার করিয়াছে, তখন বিবাহে সম্মতি ধরিয়াই লওয়া যাইতে পারে। এখন উভয় পক্ষের পিতা-মাতার সম্মতি করাইতে পারিলেই কার্য্যসিদ্ধি।

মাণিক বলিল, "বাবাকে তুমি বললে বাবা রাজী হবেন ত?"

প্রভাস বলিল, "দেখ, তার চেয়ে বরং তুমিই বল, আমার বলাটা তত ভাল দেখায় না। হাজার হোক তোমার বাবা—আমার মামা বই ত নয়! বাবায় মামায় ঢের তফাৎ।"

মাণিক বলিল, "সে আমি পারব না। তুমি গোড়া থেকেই বললে তুমিই প্রস্তাবটা করবে, এখন পিছুচ্চ কেন?"

প্রভাস প্রথমটা মাণিককে যে পরিমাণ উৎসাহ দিয়াছিল, কার্য্যকালে তাহা রক্ষা করিতে পারিল না। মাণিকের পিতা নন্দলালবাবু অত্যন্ত রাশভারি লোক। তাঁহার নিকট অগ্রসর হইয়া কথা পাড়ায় বিলক্ষণ সাহসের প্রয়োজন।

এইরূপে ইতস্ততঃ করিতে করিতে সপ্তাহখানেক কাটিল। মাণিক ও প্রভাস যখনই নির্জ্জনে থাকিত—তখন আর দুজনের অন্য কথা নাই। পূর্ব্বে দুজনের মধ্যে গুরুশিষ্য গোছের যে একটা অনির্দ্দিষ্ট সম্পর্ক ছিল, এখন তাহা ঘুচিয়া সখ্যে দাঁড়াইয়াছে।

একদিন মাণিক কুসুমের নামে একটা মস্ত কবিতা লিখিল। প্রভাস তাহা পড়িয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।. বলিল—স্বয়ং অনুভব করিয়া কবিতা না লিখিলে কি আর কবিতা! বলিল, ইহা কুসুমকে নিশ্চয়ই দেখান উচিত।

উত্তম চিঠির কাগজে লালকালির বর্ডার টানিয়া, নীল কালি দিয়া মাণিক কবিতাটি নকল করিল। তাহার পর আবার অবসর খুঁজিয়া কুসুমের সঙ্গে নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিল।

কুসুম কবিতা লইয়া পড়িল। কি বুঝিল সে জানে! মাণিক বলিল, "কুসুম, তুমি এটি রাখবে?"

কুসুম বলিল, "রাখব বইকি।"

মাণিক কুসুমের আগ্রহ দেখিয়া আনন্দে অধীর হইয়া বলিল, "কারুকে দেখাবে না ত কুসুম?"

কুসুম প্রবলভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "কারুখকে নয়।"

"খুব লুকিয়ে নিয়ে যেও। কোথায় রাখবে?"

"কেন আমার বাক্সে।"

মাণিক নিশ্চিন্ত হইয়া বাড়ী আসিল।

ওদিকে পরম সত্যবাদিনী কুসুম বাড়ী গিয়াই বলিল, "দিদি একটা কথা বলি শোন্।"

তাহার দিদির নাম নলিনী। সে ষোল বৎসরের, বিবাহিতা; স্বামীর প্রেমে ভরপুর—মনের সুখে হাস্য কৌতুকময়ী।

দিদি আসিলে কুসুম বলিল, "মেজদি একটা মজা দেখবি?"

"কি?"

কুসুম খামখানি বাহির করিয়া বলিল, "কারুকে বলবিনে?"

"কার চিঠি লা?"—বলিয়া নলিনী ছোঁ মারিয়া খাম কাড়িয়া লইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহা খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল:—

"কুসুমলতা
মনের কথা
শুন সই।"

পড়িয়া নলিনী অবাক। পাতা উল্টাইয়া নাম খুঁজিল, কোনও নাম নাই। জিজ্ঞাসা করিল, "এ কোথা পেলি?"

"মাণিকদাদা দিয়েছে।"

"কে? ম্যান্‌কা?"

"হ্যাঁ।"

নলিনী গালে হাত দিয়া বলিল, "ওমা কি হবে! তোকে এ সব লিখেছে কেন?"

কুসুম ভীত হইয়া বলিল, "তা কি জানি!"

"এ যে ভালবাসার কবিতা! তোদের ভালবাসা হয়েছে নাকি লো?"

কুসুম বলিল, "ম্যানকা আমায় একদিন বলছিল যে আমি তোকে ভালবাসি।"

নলিনী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল, "আহা তা বেশ! ছেলেটির পছন্দ ভাল"—বলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল—

"কুসুমলতা
মনের কথা
শুন সই।
দিবা রজনী
তব মুখখানি
মনে লই।"

পড়িয়া নলিনী হাসিয়া কুটিকুটি। বলিল—"দুনিয়ার আর মিল খুঁজে পেলে না, শেষে লিখলে কিনা 'মনে লই'। তার চেয়ে 'চিঁড়ে দই' লিখলে ঢের বেশী সরস হত। কি বলিস কুস্‌মি? শোন্‌ দিকিন—

কুসুমলতা
মনের কথা
শুন সই।
দিবা রজনী
তব মুখখানি
চিঁড়ে দই।

অর্থাৎ কিনা চিঁড়ে দই দেখলে, কারু কারু যেমন খাবার লোভ হয়, তোমার মুখখানি দেখলে—আমারও সেই রকম—লোভ হয়।"—বলিয়া নলিনী খুব হাসিতে লাগিল।

হাসির শব্দে মা আসিয়া প্রবেশ করিলেন। বলিলেন, "অত হাসছিস কেন? হয়েছে কি?"

নলিনী মার হাতে চিঠি দিয়া বলিল, "এই নাও মা, তোমার ছোট জামাই তোমার মেয়েকে কি লিখেছে দেখ।"

মা লেখার পানে চাহিয়া বলিলেন, "কথার ছিরি দেখ না! কি বলিস তার ঠিক নেই। কি এ?"

নলিনী মার কাছে সরিয়া গিয়া বলিল, "ভালবাসার চিঠি। এত বড় মেয়ে হল, বিয়ে দিচ্ছ না—তা মেয়ে নিজের বর নিজেই ঠিক ক'রে নিয়েছে।"

মা ত অবাক। বলিলেন, "কে লিখেছে এ সব?"

"সে পরে বলব। আগে শোনই না।"—বলিয়া মার হাত হইতে কবিতা লইয়া নলিনী পড়িতে আরম্ভ করিল—

"কুসুমলতা
মনের কথা
শুন সই।
তব মুখখানি
দিবা রজনী
মনে লই।

শয়নে স্বপনে
কিম্বা জাগরণে
সদা সর্ব্বদা
চিন্তা করি তোমা
রূপ নিরূপমা
ওগো প্রেমদা।
ভাবিয়া ভাবিয়া
নিদ্রা তেয়াগিয়া
ফেলি অশ্রুজল।
যথা শুষ্ক তরু
হনু এবে সরু
দেহ টলমল।—"

মা বাধা দিলেন। বলিলেন, "কি পাগলামি করছিস, রঙ্গ ভাল লাগে না। কে লিখেছে বল্ না?"

"চৌধুরীদের ম্যান্‌কা লিখেছে।"

"ম্যান্‌কা? আরে গেল যা! কি দস্যি ছেলে গো! এ কি বিদ্যে?"—বলিয়া মা কুসুমকে খুঁজিতে লাগিলেন, "কুস্‌মি, কুস্‌মি, কুস্‌মি কোথা গেল?"

কুসুম গোলযোগ দেখিয়া পূর্ব্বেই চম্পট দিয়াছিল।

ক্রুদ্ধা জননী বাহির হইয়া কুসুমকে গ্রেপ্তার করিলেন। বলিলেন, "এ কি রে শতেক-খোয়ারী?"

কুসুম গোঁ হইয়া বলিল, "আমি কি জানি!"

"তুই জানিসনে ত কে জানে আবাগী?—খেয়ে খেয়ে দিনকের দিন হাতী হচ্চেন—আর এই সব বিদ্যে হচ্চে! কি হয়েছে বল্।"

কুসুম বলিল, "হতভাগা লক্ষ্মিছাড়া ম্যান্‌কা আমায় দিলে ত আমি কি করব?—আমার বুঝি দোষ, বা রে!"

"কি বলেছে দেবার সময় তোকে?"

"বলেছে মাকে কি কাউকে দেখাসনে—বাক্সতে লুকিয়ে রাখিস।"

মা তখন কুসুমকে অনেক জেরা করিলেন। জেরার শেষে কুসুম বলিল, "একদিন বাগানে ডেকে নিয়ে গিয়ে ম্যান্‌কা আমায় বললে কি, তোকে আমি আম পেড়ে দেবো তুই আমায় বিয়ে করবি? 'দূর পোড়ারমুখো' বলে আমি পালিয়ে এলাম।"

এই কথা শুনিয়া, রাগের মধ্যেও মার ওষ্ঠের কোণে একটু হাসি দেখা দিল। শেষে তিনি বলিলেন—"শোন্ বলছি। ফের যদি ম্যান্‌কার ত্রি-সীমানায় যাবি কি ওর সঙ্গে কথা ক'বি, কি খেলা করবি—তা হলে গলায় পা দিয়ে মেরে ফেলব। বুঝেছিস?"

কুসুম কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "বা রে! আমি কি করব? আমায় দিলে কেন?"

মা তখন সে কবিতা কুচি কুচি করিয়া ছিঁড়িয়া উনানে ফেলিয়া দিলেন।

॥ ৫ ॥

অহো, কবি সত্যই বলিয়াছেন—যথার্থ প্রণয়ের পথ কখনও মসৃণ হয় নাই। যে ভালবাসিয়াছে, সেই কাঁদিয়াছে। প্রেম যে 'কেবলি যাতনাময়', তাহাতে যে 'কেবলি চোখের জল' এ কথা কে অস্বীকার করিবে?

কুসুম ত বকুনি খাইয়াই নিস্তার পাইল, কিন্তু মাণিকলালের অদৃষ্টে আরও দুর্গতি লেখা ছিল।

মাণিকের পিতা নন্দ চৌধুরী গ্রামের ডাক্তার—খুব পশার। প্রাতে রোগী দেখিতে

বাহির হন, যখন বাড়ী আসেন তখন প্রায় বারোটা। স্নান আহার করিয়া নিদ্রা যান।

সুতরাং প্রভাস ও মাণিক পরামর্শ করিল, বৈকালে নিদ্রাভঙ্গের পর প্রভাস গিয়া কথাটা পাড়িবে।

দুইজনে বাহিরের ঘরে বসিয়া প্রতীক্ষা করিতেছে। একটা প্রবল আশঙ্কা ও অনিশ্চয়তায় দুইজনের মুখই কালিমাময়।

শেষে চারিটা বাজিল শব্দ শোনা গেল, বিছানা হইতে নন্দ চৌধুরী হাঁকিলেন, "ওরে বুনো—তামাক নিয়ে আয়।"

আরও কয়েক মিনিট গেল। তার পর কাঁপিতে কাঁপিতে প্রভাস গিয়া মামাবাবুর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল।

নন্দ চৌধুরী বিছানার উপর তাকিয়া হেলান দিয়া বসিয়াছেন। নিদ্রাভঙ্গে তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ। নিম্নে একটি ক্ষুদ্র চৌকিতে গুড়গুড়ি রক্ষিত। ধূমপান করিতেছেন।

প্রভাস প্রবেশ করিয়া, বিছানার কাছে একটা চেয়ার ছিল তাহাতে বসিল।

নন্দ চৌধুরী বলিলেন, "কি প্রভাস!" তাঁহার স্বর বৈকালিক নিদ্রায় শ্লেষ্মাজড়িত।

প্রভাস কপালের ঘাম মুছিয়া বলিল, "আজ্ঞে একটা কথা আজ আপনাকে বলব মনে করেছি।"

নন্দ চৌধুরী উৎসুক হইয়া, গুড়গুড়ির নল মুখ হইতে খুলিয়া প্রভাসের পানে চাহিয়া অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "কি?"

প্রভাসের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। মনে হইতে লাগিল—কেন আসিলাম—কেন এ জালে নিজেকে জড়াইলাম?—কিন্তু আরম্ভ যখন করিয়াছে, আসরে নামিয়াছে, শেষ পর্য্যন্ত যাইতেই হইবে। সুতরাং বাক্যস্ফুরণ করিতে বাধ্য হইল। বলিল, "আমাদের মাণিকের জন্যে ভারি চিন্তিত হতে হয়েছে।"

"কেন? কি হয়েছে? কোনও ব্যারাম-স্যারাম নাকি?" ডাক্তার মানুষ, ব্যাধির কথাটাই প্রথমে মনে হয়।

প্রভাস বলিল, "আজ্ঞে শারীরিক ব্যারাম নয়, মানসিক বটে।"

চৌধুরী গুড়গুড়ির নল পুনরায় মুখে লইয়া বলিলেন—"কি রকম?"

"ও একটি মেয়ের সঙ্গে Love-এ পড়েছে।"

গুড়গুড়ির নল মুখ হইতে একেবারে বিছানায় ফেলিয়া নন্দ চৌধুরী উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন, "কি বললে?"

প্রভাস তাঁহার ভঙ্গী দেখিয়া বিপদ গণিল। বলিল, "আজ্ঞে, একটি মেয়ের সঙ্গে প্রণয় হয়েছে।"

"প্রণয় হয়েছে? সে আবার কি রকম? ব্যাপারখানা কি? কার সঙ্গে প্রণয় হয়েছে?"

"আজ্ঞে, অতুল বাঁড়ুয্যের যে কুসুমলতা ব'লে একটি মেয়ে আছে, তার সঙ্গে ও 'লভে' পড়েছে। তাই আপনাকে বলতে এসেছি, যদি ওর জীবনের সুখ চান, তবে কুসুমের সঙ্গে ওর বিবাহ দিন।"

নন্দ চৌধুরী শুনিয়া গম্ভীর হইয়া তামাক খাইতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, স্বর একটু নামাইয়া বলিলেন, "কি রকম ক'রে 'লবে' পড়ল?"

প্রভাস মনে মনে অত্যন্ত উৎসাহিত হইল। ভাবিল, তবে সন্তানের দুঃখে পিতার মন গলিয়াছে। বলিল, "আজ্ঞে, কি রকম করে পড়ল তা বলা বড় কঠিন—তবে এ পর্য্যন্ত বলতে পারি যে আকর্ষণটা উভয়তঃ প্রবল।"

চৌধুরী বলিলেন, "উভয়তঃ প্রবল?—বটে!"—বলিয়া তামাক খাইতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিয়ে করতে চায়?"

মাথা নীচু করিয়া, ধীরে ধীরে প্রভাস বলিল, "আজ্ঞে এই ত একমাত্র স্বাভাবিক পরিণাম। মাণিক বলেছে, যদি বিয়ে না হয়, তা হলে ওর জীবন মরুভূমি হবে যাবে।"

চৌধুরী বলিলেন. "মরুভূমি? ওঃ!"—বলিয়া তামাক টানিতে লাগিলেন।

প্রভাস একটু অপেক্ষা করিয়া বলিল, "প্রথম প্রণয় প্রায়ই ভারি গভীর হয়। তাকে বাধা দিতে যাওয়া অনেক সময় সর্ব্বনাশ।"

চৌধুরী বলিলেন, "ম্যান্‌কাকে ডাক।"

প্রভাস উঠিয়া পড়িবার ঘরে গেল। দেখিল, হাতে মুখ ঢাকা দিয়া মাণিক শুইয়া আছে। একটু হাসিমুখে বলিল, "মাণিক যাও ভাই, মামাবাবু ডাকছেন।"

মাণিক বলিল, "কি রকম বুঝলে?"

"এ পর্য্যন্ত ত খুবই আশাপ্রদ। খুব সহৃদয় ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন।"

মাণিকের কিন্তু বিশ্বাস হইল না। সত্যই কি এত সৌভাগ্য তাহার হইবে? বলিল, "চল তবে।"

প্রভাস বলিল, "তুমি একা যাও। কারণ এ সময় কোনও তৃতীয় ব্যক্তির থাকাটা ঠিক নয়। বিষয়টা ভারি—কি বলে গিয়ে—ইয়ে কিনা।"

মাণিক বলিল, "না ভাই তুমি এস—নইলে আমার ভারি ভয় করবে।"

প্রভাস বলিল, "আচ্ছা, মিনিট দশ পরে আমি যাচ্চি"—বলিয়া মাণিককে ঠেলিয়া দিল।

মাণিক প্রবেশ করিয়া দেখিল, তাহার পিতা আর্সির কাছে দাঁড়াইয়া একটা পাকা গোঁপ উঠাইবার চেষ্টা করিতেছেন। মাণিকের ছায়া আর্সিতে পড়িল।

নন্দ চৌধুরী ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। মাণিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর এগ্‌জামিন কবে?" মাণিক বলিল, "আর বারো দিন আছে।"

"কি রকম তৈরি হল?"

"আজ্ঞে, হয়েছে এক রকম।"

"পড়াশুনো করছিস বেশ মন দিয়ে? না খালি খেলিয়ে খেলিয়ে বেড়াচ্ছিস?"

"আজ্ঞে না, খেলা বেশী করিনে।"

"তবে কি করিস? 'লবে' পড়েছিস নাকি শুনলাম?"

মাণিক তাঁহার স্বর ও ভঙ্গিমা দেখিয়া উত্তর করিতে সাহস করিল না। দাঁড়াইয়া ঘামিতে লাগিল।

তাহার পিতা ধীরে ধীরে তাহার কাছে সরিয়া আসিলেন। আসিয়া, বাম হস্ত দ্বারা মাণিকের দক্ষিণ কর্ণটি ধারণ করিলেন। করিয়া বলিলেন, "উত্তর দিচ্ছসনে যে?"

মাণিক কি একটা কথা বলিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু কথা বাহির হইল না।

তাহার পিতার রক্ত-চক্ষু দুইটা ঘুরিতে লাগিল। দন্তে দন্ত ঘর্ষিত হইতে লাগিল।

ঘূর্ণায়মান চক্ষু স্থির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, "ইন্টুপিড্ শুয়োর! আজ বাদে কাল এগজামিন—লেখা গেল পড়া গেল, লব্ হচ্চে?"—বলিয়া ঠাস্ ঠাস্ করিয়া তাহার গণ্ডদেশে কয়েকটা চড় কষাইয়া দিলেন।

প্রভাস এই সময়ে দুয়ারের কাছ বরাবর আসিয়াছিল। চড়ের শব্দ শুনিয়া সে অবিলম্বে চম্পট দিল।

মাণিক দুই হাতে মুখ ও চক্ষু ঢাকিয়া অনুচ্চস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল।

নন্দ চৌধুরী তখন বালককে ছাড়িয়া বিছানায় আসিয়া বসিলেন। বলিতে লাগিলেন, 'এ ক'দিন দিবেরাত্তির কেবল প্রভাসের সঙ্গে গুজগুজ ফুস্‌ফুস্ হচ্চেই হচ্চেই—আমি ভাবি ব্যাপারটা কি—এরা কুইনের রাজ্য নেবারই মৎলব করছে—না কি করছে? হতভাগা পাজি নচ্ছার হনুমান! লবে পড়া হয়েছে! মরুভূমি হয়ে যাবে! এত কথা শিখলে কোথা তাই ভাবি। আমরা বুড়ো হয়ে মরতে চললাম, এত কথা ত জানিনে! পড়াশুনোর নাম নেই। খাবি কি এর পরে? আমি এই সারা দুপুর রোদ্দুরটা মাথায় ক'রে, রুগীর নাড়ী টিপে বেড়াচ্চি, দুটো পয়সার জন্য মুখে রক্ত উঠে মরছি—যতদিন বেঁচে আছি ততদিন মন দিয়ে পড়ে শুনে নিজের কায কিনে নে—তা নয় লবে পড়েছেন ছেলে আমার! আর প্রভাসটা যে কলেজে লেখাপড়া শিখে এত বড় বাঁদর হয়েছে তা ত জানতাম না!

ওকালংনামা নিয়ে এসেছে! আরে গেল যা!—ফের যদি ওসব পাগলামি শুনতে পাই ত জুতিয়ে পিঠ ছিঁড়ে দেবো।"

অতঃপর মাণিক কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান করিল।

ডাক্তারবাবুর চিকিৎসা আশু ফলপ্রদ হইল। মাণিক ছেলেটিকেও অতি সুবোধ বলিতে হইবে। উপন্যাসের অনুকরণে প্রেমে পড়িয়াছিল, কিন্তু উপন্যাসের অনুসারে গৃহ ত্যাগ করিল না—বিষও খাইল না। বিষ খাইল না বটে—তবে কুসুমের বিবাহের সময় লুচি খাইল বিস্তর। এত খাইল যে তাহার পরদিন অসুখ হইয়া পড়িল। সেই সুযোগে সপ্তাহখানেক স্কুলে গেল না। প্রভাস চলিয়া গিয়াছিল। প্রেমিকের আদর্শ খর্ব্বতার জন্য মাণিকের কাহারও নিকট জবাবদিহি করিবারও রহিল না। তাই অসুখ দুই দিনেই ভাল হইলে—বাকী দিনগুলির অধিকাংশ সময় মাণিক বৃক্ষের শাখায় শাখায় লম্ফ দিয়া অতিবাহিত করিল।

[ভাদ্র, ১৩০৮]

কলির মেয়ে

॥ ১ ॥

চৈত্রের দিবা অবসিতপ্রায়। গোপাল সরকারের বৈঠকখানায় বসিয়া বিজয় মিত্র পাশা খেলিতেছিলেন। হঠাৎ তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রটি ছুটিয়া আসিয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিল, "বাবা শীগ্‌গির বাড়ী এস, টেলিগেরাপ এসেছে।"

টেলিগ্রামের নাম শুনিয়া বৈঠকখানা-সুদ্ধ লোক চমকিয়া উঠিল। পল্লীগ্রামে টেলিগ্রাম সর্ব্বদা আসে না—যাহা আসে, তাহা প্রায়ই দুঃসংবাদ, বিপদের সংবাদ।

বিজয় মিত্র খেলা ফেলিয়া ভিজা গামছায় কপালের ঘাম মুছিয়া, চটিজুতা পায়ে দিয়া ত্বরিদপদে বাড়ী আসিলেন। দূর ষ্টেশন হইতে ঘর্ম্মাক্ত কলেবর টেলিগ্রাম পেয়াদা আসিয়াছে। সদর দরজার বারান্দায় বৃহৎ লাঠি লইয়া গম্ভীরভাবে বসিয়া আছে। অসংখ্য কুতূহলী বালক-বালিকা তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া।

বিজয় মিত্র রসিদে নাম সহি করিয়া দিয়া কম্পিতহস্তে টেলিগ্রাম খুলিলেন। পাঠমাত্র তাঁহার মুখে আনন্দের জ্যোতি দেখা দিল। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তাঁহার পত্নী উৎকণ্ঠিতভাবে প্রতীক্ষা করিতেছেন। বলিলেন, "ভাল খবর।"

"কি?"

"বিনু বাড়ী আসছে!"

"বিনু? কোথা থেকে? কবে আসবে?"

"তা লেখেনি। মোকামা থেকে তার করেছে, কাল এসে পৌঁছবে বোধ করি।"

বিজয়হরি ও বিনোদবিহারী দুই ভাই—সহোদর। বিনোদ যখন ছোট, তখন ইহারা পিতৃমাতৃহীন হয়। বিজয়হরির স্ত্রীই বিনোদকে মানুষ করিয়াছিলেন।

বিনোদ বড় হইলে ভারি দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিল। এই সূত্রে দাদার সঙ্গে প্রায়ই অহার বচসা হইত। একদিন ক্রোধান্ধ হইয়া বিজয়হরি বিনোদকে জুতার দ্বারা প্রহার করিয়াছিলেন। সেইদিন বিনোদ পলায়ন করিল। একদিন দুইদিন করিয়া এক সপ্তাহ গেল, বিনোদ ফিরিল না। তখন বিজয়হরি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিতে আরম্ভ করিলেন। দশ টাকা পুরস্কার পর্য্যন্ত ঘোষণা করিলেন—তথাপি বিনোদের কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না। দেখিতে দেখিতে মাস কাটিল বৎসর কাটিল, এইরূপে তিনটি বৎসর কাটিয়াছে। বিনোদ নিরুদ্দেশ হওয়ায় আত্মীয়বন্ধুসমাজে বিজয়হরি লজ্জায় মুখ দেখাইতে পারেন না—আজ সহসা সংবাদ আসিল, সেই ভাই বাড়ী আসিতেছে।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা উঠানের তুলসীগাছ সওয়া-পাঁচ আনার হরির্লুট পাইয়া গেল। গ্রামময় এ সংবাদ রটিত হইল। বন্ধুবান্ধব উৎসুকচিত্তে বিনোদের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

পরদিন অপরাহ্নকালে বিনোদের গাড়ী গ্রামে প্রবেশ করিল। বিনোদ গাড়ী হইতে নামিল। হাতে একটি সবুজ বনাতের ঘেরাটোপযুক্ত ক্যাশবাক্স। গাড়োয়ান এবং বাটীর ভৃত্য মিলিয়া জিনিসপত্র নামাইল।

বিনোদ বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দাদা ও বউদিদিকে প্রণাম করিল। ছেলেপিলেকে কোলে করিয়া, আদর করিয়া অনর্থ করিল। বউদিদিকে ঘরের মধ্যে ডাকিয়া, ক্যাশবাক্সটি তাঁহার হাতে দিয়া চুপি চুপি বলিল, "এটি খুব সাবধানে তোমার সিন্দুকে রেখে দাও বউদিদি।"

বউদিদি দেখিলেন বাক্সটি বিলক্ষণ ভারি।—খুসি হইয়া সিন্দুকে বন্ধ করিতে করিতে বলিলেন—"এতদিন কোথা ছিলে ঠাকুরপো?" "ছিলাম মোতিহারিতে।"

"এতদিনে মনে পড়ল?"

"চাকরি ফেলে কি ক'রে আসি বউদিদি?"

"কত টাকা মাইনে হয়েছে?"

"একশো কুড়ি টাকা।"

"বিয়ে করেছ?"

"বিয়ে? বিয়ে ক'রে কি হবে?"

বউদিদি হাসিয়া কি একটা ঠাট্টা করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় বিজয়বাবু আসিয়া বলিলেন, "সারাদিন খাওয়া হয়নি, যাও ঝাঁ ক'রে রান্না চড়িয়ে দাওগে, গল্প পরে কোরো এখন।"

জলযোগাদি করিতে সন্ধ্যা হইল। ক্রমে লোকজন আসিয়া বৈঠকখানা ছাইয়া ফেলিল। দুই ভ্রাতা গিয়া সমবেত বন্ধুমণ্ডলীর মধ্যে উপবেশন করিলেন। গুরুসম্পর্কীয়গণকে প্রণাম করিতে করিতে বিনোদের স্কন্ধে বেদনা ধরিয়া গেল। কেহ কেহ বলিল, 'এতদিন বাড়ী আসবার নাম নেই, আমরা ভাবি হল কি? ছোকরা গেল কোথায়? ছেলে বাহাদুর বটে। আজকালকার বাজারে, একশো কুড়ি টাকার চাকরি বাগানো সাধারণ কথা!'

গ্রামের অন্যান্য হতভাগ্য যুবক, যাহারা বি-এ পাস করিয়া কলিকাতা কনট্রোলর জেনারেলের আপিসে ত্রিশ টাকার কেরাণীগিরির জন্য উমেদারী করিতেছিল, এম-এ পাস করিয়া যাহারা পঞ্চাশ টাকা বেতনের মাষ্টারি জুটাইতে পারিতেছিল না, তাহাদের অনেকেরই কথা উঠিল। বৃদ্ধ চক্রবর্তী মহাশয় বলিলেন, "সকলই অদৃষ্টে করে রে ভাই, ও বি-এ পাস করলেও হয় না, মহা বি-এ পাস করলেও হয় না।"

অনেকে বলিল, 'তা বটেই ত'—'তার আর ভুল কি।'—নব্য গোছের একজন বলিল, "অদৃষ্ট ত বটেই,—তার সঙ্গে সঙ্গে উদ্যমও চাই।"

অন্য একজন মন্তব্য করিল, "বিনোদ বুদ্ধিমান, আমরা বরাবরই ব'লে এসেছি।"

সরকার মহাশয় এ মতের পোষকতা করিয়া বলিলেন, "ছেলেবেলায় একটু দুর্দ্দান্ত ছিল—তা অমন অনেকে থাকে,—একটু বয়স হলেই সেরে যায়। তা হোক, চাকরিটি এখন ভালয় ভালয় বজায় থাকুক—ক্রমে বেতন বৃদ্ধি হোক পদ বৃদ্ধি হোক, এই আমাদের আশীর্ব্বাদ।"

বিজয় ভ্রাতার পানে সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "সেই আশীর্ব্বাদ করুন সরকার মশায়।"

॥ ২ ॥

পরদিন প্রভাতে দাদার বালক-বালিকাগণকে লইয়া বারান্দায় বসিয়া বিনোদ বলিল,

"তোদের জন্যে কি নিয়ে এসেছি তা এখনো দেখিসনি বুঝি ?"

'কি কাকা ?' 'কি এনেছ কাকা'—ইত্যাকার প্রশ্নে বিনোদকে তাহারা ছাঁকিয়া ধরিল। বিনোদ উঠিয়া তোরঙ্গ খুলিয়া, কাহাকেও একটা রবারের বানর, কাহাকেও একটা লাল বল, কাহাকেও একটা মেমপুতুল বিতরণ করিল। তাহা লইয়া বালক-বালিকাগণ মহা লম্ফঝম্ফ আরম্ভ করিয়া দিল। হাস্যমুখী বউদিদির পানে চাহিয়া বিনোদ বলিল, "তোমার জন্য কি এনেছি জিজ্ঞাসা করলে না বউদিদি ?"

বউদিদি হাসিয়া বলিলেন, "কি এনেছ ভাই ?"

"কি বল দিকিন ?" "কি জানি !"

"কি পেলে খুসী হও ?"

"কি পেলে খুসী হই ? দাঁড়াও, দেখি। বাঁদর নয়. সে ত ঘরেই রয়েছে—"

বিনোদ কৃত্রিম কোপসহকারে বলিল, "অ্যাঁ! আমার দাদাকে বাঁদর বলছ বউদিদি ?"

বউদিদি বলিলেন, "এই দেখ, কারু নাম করেছি ? নিজেরা ধরা দিলে আমি আর কি করব ?"

বিনোদ বলিল, "মেমপুতুলও বোধ হয় চাও না, সেও ত নিজেই রয়েছ।"

বউদিদি বলিলেন, "না, মোমের মেমপুতুল চাইনে বটে। একটি সত্যিকার জ্যান্ত মেমপুতুল যদি বিয়ে করে এনে দিতে ভাই, তা হলে খুব খুসী হতাম।"

"যা এনেছি তা দেখলে আরও খুসী হবে। এই জন্যেই ত এতদিন বাড়ী আসিনি —টাকা জমাচ্ছিলাম। আমার ক্যাশবাক্সটা বের কর দিকিন বউদিদি।"

বউদিদি সিন্দুক খুলিয়া, সবুজ বনাত ঢাকা ক্যাশবাক্সটি বাহির করিলেন। বিনোদ চাবি খুঁজিতে লাগিল। এ পকেট সে পকেট, এ জামা সে জামা—কোথাও চাবি পাওয়া গেল না। শেষে তোরঙ্গ দুইটা খুলিয়া উলট পালট করিল, কোথাও চাবি নাই।

মুখখানি বিষণ্ণ করিয়া বলিল, "নিশ্চয়ই চাবি গাড়ীতে ফেলে এসেছি।"—বলিয়া বিনোদ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

বউদিদি সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, "চাবি হারিয়েছ তার আর ভাবনা কি ঠাকুরপো ? মাল ত আর হারাওনি—বাক্স ত ঘরেই আছে, চাবি হবে এখন। না হয় বাক্স ভাঙ্গতে হবে, এর বেশী আর কি হবে ?"

বিনোদ একটু বিষাদের হাসি হাসিয়া বলিল, "আমার যে হাতখরচের টাকা অবধি বাইরে নেই বউদিদি !"

বউদিদি বলিলেন, "তা তোমার যখন যা দরকার হবে, আমার কাছে নিও এখন!"

"কলকাতায় গিয়ে বাক্স না খোলালে আর উপায় নেই। এত সাধ ক'রে তোমার জন্যে গহনা গড়িয়ে নিয়ে এলাম, দেখাতে পেলাম না, এই দুঃখ।"

বউদিদি বলিলেন, "না, দুঃখ কোরো না। দুদিন পরেই না হয় দেখব। কি এনেছ বলই না—কাণে শুনি।"

"দশ ভরি দিয়ে তোমার জন্যে পুষ্পহার গড়িয়ে এনেছি।"

বউদিদি খুব আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন। বিনোদ ক্রমে সুস্থ হইল। তখন বলিল, "বউদিদি, চা তৈরী করতে পার ? সকালে চা খাওয়াটা ভারি অভ্যাস হয়ে গেছে।"— শুনিয়া বউদিদির মন সম্ভ্রমে পূর্ণ হইয়া উঠিল। ঠাকুরপোর এতদূর সৌখীন চালচলন হইয়াছে!

কিন্তু কিছু অপ্রতিভও হইলেন। বলিলেন, "সে পাট ত আমাদের নেই ভাই।"

বিনোদ বলিল, "চা আমার কাছে আছে, শুধু গরম জল, দুধ আর চিনি পেলেই হয়।"

এই কথা শ্রবণমাত্র বালক-বালিকাগণ 'ও কাকা, আমি চা খাব' 'ও কাকা, আমায় চা দিও' বলিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল।

উপযুক্ত পাত্রাভাবে একটা ঘটি করিয়া চায়ের জল গরম হইয়া আসিল। তাহারই মধ্যে

একমুঠো চা ফেলিয়া, মুখে পাথরবাটি চাপা দেওয়া হইল। বালকবালিকাগণ কেহ বাটি, কেহ গেলাস, কেহ বা পাণের ডিবার একটা খোল লইয়া বসিয়া গেল। চা সিদ্ধ হইলে, সেই ঘটিতেই দুধ ও চিনি ফেলিয়া দেওয়া হইল। ঘটির মুখে গামছা দিয়া ছাঁকিয়া, বউদিদি সকলকে চা পরিবেষণ করিলেন। চা বালকবালিকাগণের উদরস্থ যত হউক না হউক, ঘরের মেঝেতে ঢেউ খেলিয়া গেল।

॥ ৩ ॥

নিকটস্থ গ্রামের জমিদার অতুল ঘোষ মহাশয়ের এক চতুর্দ্দশবর্ষীয়া অবিবাহিতা কন্যা আছে। স্বজাতীয়, সম্বংশজাত, কৃতী, অবিবাহিত একটি নব্য যুবক বিনোদবিহারী গ্রামে উপস্থিত। অতঃপর ঘটনাস্রোত কোন দিকে প্রবাহিত হওয়ার সম্ভাবনা?

সেইদিন অপরাহ্ণেই ঘোষজা মহাশয় বিজয় মিত্রের নিকট লোক পাঠাইয়া প্রস্তাব করিলেন।

মিত্র বলিয়া পাঠাইলেন, "তা যদি হয়, তার বাড়া আর সুখ কি? বাড়ীতে জিজ্ঞাসা করি, বিনোদ কি বলে দেখি।"

'বাড়িতে' বলিলেন, "মেয়েটি চোখে দেখা—কিছু নিন্দের নয়। দেওয়া থোওয়া সম্বন্ধে যদি কৃপণতা না করে, আমাদের মান রাখে, তা হলে আর বাধা কি, এই বৈশাখ মাসেই হয়ে যাক।"

মেয়ে পূর্ব্বে হাজার বার দেখা থাকিলেও, বিবাহের সম্বন্ধ হইলে একবার ঘটা করিয়া মেয়ে দেখিতে যাইতে হয়। সুতরাং শুভক্ষণে বন্ধু বান্ধব লইয়া বিজয় মিত্র মেয়ে দেখিতে গেলেন। ঘোষজা মহাশয় অনেক বিনয় প্রকাশ করিয়া সকলকে অভ্যর্থনা করিলেন। কিন্তু টাকার বেলায় হাজারের বেশী আর উঠিতে চাহিলেন না।

বরপক্ষীয়েরা এ প্রকার অযৌক্তিকতায় হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না। বলিল, "এণ্ট্রান্স পাস করা ছেলে, এল-এ পড়ছে, তারই ত হাজার টাকা বাঁধা। তার কি ক্ষমতা বলুন? যদি চাকরির চেষ্টা করে ত পনেরো টাকা মাইনে জুটলে খুব সৌভাগ্য।"

কন্যাপক্ষীয়গণ বলিল, "আহা সে যে আলাদা কথা! সে যে পড়ছে। জলের মাছ —কত বড় হবে তার ত ঠিকানা নেই। চাই কি একদিন সে হাইকোর্টের জজও হতে পারে। আর যে কর্ম্মে ঢুকেছে, তার উন্নতি অনেকটা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে কিনা, এটা ত স্বীকার করেন?"

ইত্যাদি প্রকার বাদপ্রতিবাদে ঘোষজা মহাশয় দুই হাজারে উঠিলেন। ইঁহারা বলিলেন, "হাজার নগদ, হাজার গহনা, দানসামগ্রী ও অন্যান্য বাবদ হাজার, এই তিন হাজার নইলে আমরা পেরে উঠব না।"

ঘোষজা মহাশয় বলিলেন, পরে বিবেচনা করিয়া যেরূপ হয় বলিয়া পাঠাইবেন।

"উত্তম কথা।"—বলিয়া বরপক্ষীয়গণ শেষবার ধূমপান করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন।

পরদিন সংবাদ আসিল, অনেক কষ্টে মারিয়া কাটিয়া ঘোষজা মহাশয় আড়াই হাজার পর্য্যন্ত উঠিবেন। ইহাতে যদি হয়, উত্তম—নচেৎ অগত্যা তাঁহাকে ক্ষান্ত হইতে হইবে।

বিজয় মিত্র বলিয়া পাঠাইলেন—টাকা অতি তুচ্ছ পদার্থ, কুটুম্বসুখই বেশী প্রার্থনীয়। ঘোষজা মহাশয়ের সহিত কুটুম্বিতার লোভে তিনি আড়াই হাজারেই সম্মত। এখন দিন-স্থির হইতে পারে।

বিনোদকে রাজি করিতে কোনও কষ্ট হইল না, কিন্তু হাজার টাকার গহনা শুনিয়া সে ভারি খুঁৎখুঁৎ করিতে লাগিল। "হাজার টাকায় কি গহনা হবে বউদিদি? এই তোমার জন্যে পুষ্পহার গড়ালাম, দুশো পঁচাত্তর টাকা পৌনে তেরো আনা লাগল। হাজার টাকায় ক'খানা গহনা হবে?"

বউদিদি বলিলেন, "হাজার টাকায় কি আর গা সাজানো গহনা হয় ভাই? নইলে নয় খানকতক, তাই হবে। তারপরে, বেঁচে বর্ত্তে থাক, রোজগার কর, কত গহনা দেবে

দিও না।"

বিনোদ কিয়ৎক্ষণ ভাবিল। বলিল—"দেখ বউদিদি, এক কায করলে হয় না? ওদের বল, যেন গহনা না দিয়ে গহনার ঐ হাজার টাকা নগদে দেয়। ওতে আর এক হাজার আমরা মিলিয়ে, দু' হাজার টাকার পছন্দ মত গহনা আমরা তৈরি করাই। কলকাতায় ত যেতেই হবে রাস্তাটা খোলাবার জন্যে।"

বউদিদি কিয়ৎক্ষণ কপালে হাত দিয়া ভাবিয়া বলিলেন, "এ পরামর্শ মন্দ নয়। তাই বলা যাক, মেয়ে ফিরিয়ে পাঠাবার সময় আমরা গা সাজিয়ে ফিরে পাঠাব।"

"কলকাতায় গিয়ে গহনা গড়িয়ে আনতে কতদিন লাগবে বল, দিকিন বউদিদি?"

"কতদিন আর? নেবুতলায় কমলাদিদিদের বাড়ী যাবে, বাড়ীতে স্যাকরা ডাকিয়ে, বসে থেকে সাত দিনে গহনা তৈরি করিয়ে নেবে। ওরা ত যখন গহনা গড়ায় ঐ রকম করেই গড়ায়।" বিনোদ বলিল, "ঘোষেরা রাজি হবে ত?"

বউদিদি বলিলেন, "ইঃ, রাজি হবে না ত কি?"

বউদিদি গিয়া স্বামীর সহিত এ বিষয়ে কথা কহিলেন। বিজয় মিত্র বলিলেন, "রাজি না হবার ত কোন কারণ দেখিনে।" কিন্তু সব দেখিয়া শুনিয়া তামাক খাইতে খাইতে বৃদ্ধ ভাবিলেন—'ভায়ার আমার বড় চাকরি হয়েছে কিনা, মেজাজটা ভারি বেড়ে গেছে।'

অতুল ঘোষ রাজি হইলেন। একেবারে স্বর্ণশূন্য করিয়া মেয়েকে বিবাহের আসরে নামাইতেও পারিলেন না. অত্যাবশ্যক দুই চারিখানা গহনা দিতেই হইল। অথচ হাজার টাকাও দিতে হইল। শেষে সেই তিন হাজারেই দাঁড়াইল। সমারোহ করিয়া বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। কন্যার নাম শরৎকুমারী।

বিনোদের বউদিদি নববধূর মাতাকে বলিলেন, গহনা গড়াইতে একটু সময় লাগিবে. সুতরাং বধূকে দুই সপ্তাহের কম ফিরিয়া দিতে পারিবেন না।

মাতা বলিলেন. "তা বেশ. এই ত কাছেই, মাঝে দুই একদিন পাল্কী পাঠিয়ে দেবো, একবেলার জন্যে পাঠিয়ে দিও এখন তা হলেই হবে।"

সমীপস্থ একজন নবীনা বলিল. "ওগো এখন আর আগেকার মত মেয়েরা শ্বশুরবাড়ী এসে কাঁদেকাটে না। দু' দিনে স্বামী চিনে নেয়।"

বিবাহের পর সপ্তাহ অতীত হইল, তথাপি বিনোদ কলিকাতা যাইবার নাম করে না। ঠাট্টার সম্পর্কীয় লোকেরা চোখ টেপাটেপি করিতে লাগিল—বলিল 'গাছে না উঠতেই এক কাঁদি।' বউদিদি আসিয়া বলিলেন, "ঠাকুরপো, আর গহনা গড়াতে না দেওয়া যে ভাল দেখাচ্ছে না ভাই। বউয়ের পিসির সঙ্গে কাল ও-পাড়ায় দেখা হল, জিজ্ঞাসা করলে শরতের গহনা গড়িয়ে এসেছে?"

বিনোদ বলিল. "আমায় তাড়াতে চাও বউদিদি? খুব সুহৃদ্ ত!"

বউদিদি বলিলেন, "বুঝি ভাই, সব বুঝি। এক কায কর, যাতে দু'কুল বজায় থাকে। ভোরের বেলা উঠে কলকাতায় যাও। সারাদিন সেখানে থেকে সোণা কিনে, স্যাকরা ডাকিয়ে, মাপ দিয়ে, কমলাদিদিদের উপর ভার দিয়ে এস। সন্ধ্যের গাড়ীতে চ'লে এস, রাত বারোটার সময় পেঁছিবে এখন। আমি তোমার শোবার ঘরে খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে দেবো!'

বিনোদ বলিল, "তোমার কি বুদ্ধি বউদিদি!"

বউদিদি হাসিয়া বলিলেন. "এখনই আমরা বুড়োসুড়ো হয়েছি বটে, কিন্তু আমাদেরও একদিন ছিল তো ভাই! এখনও বেশ মনে পড়ে"—বউদিদি আরও যেন কি বলিতে যাইতেছিলেন. সামলাইয়া লইলেন।

বিনোদ বলিল, "বল বল, কি বলছিলে বউদিদি।"

বউদিদি, "না, এমন কিছু নয়।"—বলিয়া একটু সলজ্জ হাসি হাসিলেন।

বিনোদ পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। না শুনিয়া কিছুতেই ছাড়িবে না। না বলিলে

আড়ি করিবে।

বউদিদি তখন বলিলেন, "ঐ যে বললাম শোবার ঘরে খাবার ঢাকা দিয়ে রাখার কথা, ঐ থেকে একটা পুরোনো কথা মনে পড়ল। কারুকে না বল ত বলি।"

বিনোদ বলিল, "কারুকে বলব না।"

বউদিদি বলিলেন, "আমাদের তখন নতুন নতুন বিয়ে হয়েছিল। তোমার দাদা হুগলি গিয়েছিলেন সেখানে কি দরকার ছিল। অনেক রাতে ফেরবার কথা ছিল। শোবার ঘরে তাঁর খাবার ঢেকে রাখা হয়েছিল। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তোমার দাদা এসে, আমাকে উঠিয়ে, আমাকে সুদ্ধ সেই পাতে একসঙ্গে খেতে বাধ্য করলেন।"

বিনোদ শুনিয়া ভারি আমোদ অনুভব করিল। বলিল, "আমার দাদার এত বিদ্যে! আমি ভাবি উনি চিরকালই বুঝি চশমা চোখে দিয়ে ভাগবত পড়েন।"

স্থির হইল, আগামী কল্য ভোর রাত্রে বিনোদ কলিকাতা যাত্রা করিবে।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইল—আহারাদি হইল, শয়নের সময় উপস্থিত হইল। খোলা জানালার কাছে পালঙ্ক টানিয়া নববধূর সহিত বিনোদ শয়ন করিল। বাহিরে বাগান, দিব্য জ্যোৎস্না উঠিয়াছে, মিষ্ট বাতাস বহিতেছে।

বিনোদ অন্য দিনের অপেক্ষা আজ নীরব। শরৎকুমারী বলিল, "কি ভাবছ?"

বিনোদ বলিল, "অনেক দুঃখের কথা।"

কি দুঃখ, শুনিবার জন্য এই চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকা ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

বিনোদ বলিল, "আমি যদি বলি, তা হলে তুমি আর আমাকে ভক্তি করবে না।"

শরৎ বলিল, "স্বামীকে নাকি আবার কেউ কখনও ভক্তি না করে?"

বিনোদ বধূর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। দুই চারি গুচ্ছ স্খলিত কুন্তল তাহার ললাটে লুটাইতেছিল। তাহার চক্ষু দিয়া সরলতা উছলিয়া পড়িতেছিল।

বিনোদ বলিল, "আমি মহা পাষণ্ড। আমি তোমাদের সবাইকে ঠকিয়েছি।"

বালিকা নীরবে বিনোদের পানে চাহিয়া রহিল। বিনোদ বলিতে লাগিল, "আমি মোতিহারিতে চাকরিও করিনে, আমার একশো কুড়ি টাকা মাইনেও নয়।"

শরৎ বিস্মিত হইয়া বলিল, "তবে কোথায় চাকরি কর?"

"কোথাও করিনে। এলাহাবাদে রেল অফিসে চাকরি করতাম, সে চাকরি গেছে। আর কোনও উপায় না দেখে, বিয়ে করে কিছু টাকা সংগ্রহ করব ব'লে এ ফন্দি করে এসেছি। জানতাম বড় চাকরি শুনলে বিয়ে হতে এক দণ্ডও দেরী হবে না। তারপর টাকাকড়ি সব নিয়ে পালিয়ে যেতাম।"

কিছু পূর্ব্বে অগাধ সরলতায় ও প্রগাঢ় বিশ্বাসে বালিকা বলিয়াছিল, 'স্বামীকে নাকি আবার কেউ কখনও ভক্তি না করে'—কিন্তু সন্ধ্যাগমে দিবালোক যেমন দেখিতে দেখিতে কোথায় দ্রুতপদে মিলাইয়া অদৃশ্য হইয়া যায়, স্বামীর প্রকৃত পরিচয়ে তার স্বামীভক্তিও কোথাও অন্তর্হিত হইতে লাগিল বালিকা ঠিকানা পাইল না। একটা দারুণ আঘাতের বেদনায় নীরব হইয়া রহিল।

বিনোদ বধূর স্কন্ধে হাত দিয়া আবার বলিল, "বিয়ের আগে যখন বলেছিলাম, কলকাতায় গিয়ে গহনা গড়াতে দেবো, তখন এই মৎলবেই বলেছিলাম। গহনা গড়াতে যাবার নাম ক'রে এতদিন কোন্‌কালে পালিয়ে যেতাম। তুমিই সব মাটী করে দিয়েছ।"

শরৎ চট করিয়া স্বামীর হস্তস্পর্শ হইতে স্কন্ধ সরাইয়া লইয়া বিছানায় উঠিয়া বসিল। বলিল, "আমি কি করেছি?"

"তুমি সোণার শিকল হয়ে আমায় বেঁধে ফেলেছ—তোমায় ফেলে যেতে পারছিনে অথচ থাকতেও পারিনে। থাকলে আজ বাদে কাল সব প্রকাশ হয়ে যাবে। লজ্জায় আর মুখ দেখাতে পারব না।"

ক্রোধে ঘৃণায় লজ্জায় বালিকার ক্ষুদ্র বুক ভরিয়া গিয়াছিল। তবু জিজ্ঞাসা করিল,

"পালিয়ে কোথা যেতে ?"

"কয়লার খাদে যেতাম, এখনও তাই যাব—সেখানে কন্ট্রাক্টের কায করব—খুব খাটুনি কিন্তু খুব লাভ।"

শরৎ সহসা বলিল, "আমি সঙ্গে যাব!"

বিনোদও শয্যায় উঠিয়া বসিল! আহ্লাদে বলিল, "তুমি যাবে শরৎ? পারবে?"

"পারব। তুমি কি ভেবেছ তুমি চলে গেলে আমি এখানে বসে লোকের বাক্যযন্ত্রণা সইব? দেশসুদ্ধ ঢী ঢী পড়ে যাবে—যার মুখে যা আসবে সে তাই বলবে, আর আমি বসে বসে শুনব?"

বিনোদের আনন্দ ম্লান হইল। শরতের পলায়ন তবে আত্মসমর্পণ নহে—আত্মরক্ষা মাত্র। একটু পরে বলিল, "তবে দুজনে পালাই এস।"

"কখন?"

"পরশু ভোরে আমার কলকাতা যাবার কথা। শোবার আগে হাতবাক্সে টাকা গুছিয়ে এই ঘরে এনে রেখে দেবো। রাত একটা কি দুটোর সময় উঠে আমরা পালাব। কয়লার খনির কাছে একটা ছোট বাড়ী নিয়ে থাকব দুজনে। সম্পূর্ণ অজ্ঞাতবাস। জীবন নতুন করে আরম্ভ করব।"

বালিকা নববধূর মনে রাগের ও দুঃখের সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কি ভাব স্পন্দ করিতেছিল। মনের দুয়ারে একটা কথা বারবার ধাক্কা দিতেছিল—'তুমিই সব মাটী করে দিয়েছ।' ভাবিতে মিষ্ট লাগিতেছিল, তাহারই জন্য তাহার স্বামী পলায়ন করিতে পারে নাই—তাহাকে ফেলিয়া যাইতে পারে নাই। কাঁটাবনের মধ্যে যেন এই একটি মিষ্ট ফল। সেই সুখটুকু মনের মধ্যে ওলটপালট করিতে করিতে সে রাত্রি সে ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন কাটিল। শয়নঘরে টাকার বাক্স লইয়া রাত্রে বিনোদ শয়ন করিল।

ভোরে বউদিদি তাহাকে জাগাইয়া আসিতে দেখেন—কেহ নাই। শয্যায় তাঁহার স্বামীর নামে এই পত্র পড়িয়া রহিয়াছে ঃ—

"শ্রীচরণেষু—দাদা, আমি বউকে লইয়া পশ্চিম চলিলাম। আমি আপনাদের সকলকে ঠকাইয়াছি। আমি মোতিহারিতে চাকরি করি না। এলাহাবাদ রেল অফিসে একটি সামান্য চাকরি করিতাম, মদ খাইয়া সেটি খোয়াইয়াছি। তখন নিরুপায় হইয়া জুয়াচুরি করিয়া বিবাহ করাই স্থির করি। অনুসন্ধানে পাছে ধরা পড়ি তাই ডিরেক্টরি খুঁজিয়া দেখিলাম, আমার নামের কেহ কোথাও ভাল চাকরি করে কিনা। দেখিলাম মোতিহারিতে একজন বিনোদবিহারী মিত্র ভাল চাকরি করে। তাহার বেতনের পরিমাণ মুখস্থ করিয়া বাড়ী আসিয়া বিবাহ করিলাম।

"আমার এক পয়সাও নাই, আমার ক্যাশবাক্সে শুধু ভাঙ্গা কাঁচ বোঝাই করা আছে! বউদিদির পুষ্পহারও এখনও তৈরি হয় নাই! আমার বিবাহে যে হাজার টাকা পণ পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতেই তাঁহার জন্য পুষ্পহার গড়াইয়া দিবেন। গহনার হাজার টাকা সম্বল করিয়া, ব্যবসায় করা স্থির করিয়াছি। যদি কোনও দিন নিজের স্বভাব ও অবস্থা সংশোধন করিতে পারি তবে আবার দেখা দিব। আপাততঃ প্রণামান্তে বিদায়।

সেবকাধম

শ্রীবিনোদবিহারী মিত্র

পত্র পড়িয়া বউদিদি স্তম্ভিত হইলেন। সত্য কথা বলিতে গেলে ঠাকুরপোর উপর ততটা রাগ হইল না। কিন্তু নিরপরাধা বৌয়ের স্বামীসঙ্গগ্রহণেই যেন বেশী খট্‌কা লাগিল। মন আপনা হইতেই বলিতে লাগিল—কলি! ঘোর কলি।

একদাগ ঔষধ

প্রথম পরিচ্ছেদ

সুকুমারী আজ দুইদিন তাহার স্বামীর পত্র না পাইয়া অতিশয় চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে। সে এ বাটীর ছোট বউ। তাহার শ্বশুর বড়লোক। তাহাকে কোনও সাংসারিক কায করিতে হয় না—খালি অনেক উপন্যাস পড়িতে হয়; বড় যায়ের সঙ্গে, ননদ দুটীর সঙ্গে, গল্প করিতে হয়, তাস খেলিতে হয়। মধ্যে মধ্যে ঝগড়াঝাঁটিও করিতে হয়। সুতরাং স্বামীকে পত্র লেখা ও পত্র পাওয়া সুকুমারীর দৈনন্দিন জীবনের একটা প্রধান কায! আর একটা কায তাহার আছে, সেটা বড় প্রীতিকর নহে। তাহাকে অনেক ঔষধ খাইতে হয়। কারণ, মাঝে মাঝে কম্প দিয়া তাহার জ্বর আসে।

সুকুমারী যে স্বামীর পত্র না পাইয়া ভাবিতেছে, তাহা বাড়ীর বিড়ালটা পর্য্যন্ত অবগত ছিল। আজ বেলা দশটার সময় সুকুমারী কাপড় ছোপাইবে বলিয়া শিউলী ফুলের বোঁটা কাটিতে বসিয়াছিল, এমন সময় তাহার ছোট ননদ মগ্না আসিয়া বলিল, "ওলো ভেবে মরছিলি, এই নে তোর বরের চিঠি এসেছে।" সুকুমারী আগ্রহের সহিত চিঠি লইয়া নিজের শয়ন ঘরে পলায়ন করিল। চিঠি খুলিয়া যাহা পড়িল, তাহাতে তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল। চিঠি এইরূপ :—

সুকুমারী

আমি নিদারুণ মনস্তাপে দগ্ধ হইতেছি। আমি তোমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছি। আমি আর তোমার ভক্তিযোগ্য স্বামী নহি। আমার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছিল—কুসঙ্গের দোষে প্রলোভনের বশবর্ত্তী হইয়া অতি গর্হিত কার্য্য করিয়াছি। সব কথা পত্রে লিখিবার নহে, সাক্ষাতে বলিব। আজ সন্ধ্যাবেলায় বাড়ী আসিব। অকপটে তোমার কাছে সব বলিব। তোমার ভালবাসা যদি আমায় ক্ষমা করিতে পারে, তবেই আমি আবার আমি হইব—নচেৎ সব ফুরাইয়াছে।

তোমার হতভাগ্য
অবিনাশ

পত্রখানি প্রথম বার পাঠ করিয়া সুকুমারী বুঝিল, একটা কোনও ভয়ানক জিনিষ ঘটিয়াছে; কিন্তু কি ঘটিল ভাল উপলব্ধি করিতে পারিল না। বারম্বার পড়িতে পড়িতে একটা অর্থ তাহার মনে হইতে লাগিল। তাহার শরীর শিথিল হইয়া আসিল, আর দাঁড়াইতে পারিল না। খাটের উপর বসিয়া পড়িল। বসিয়া, আর একবার পত্রখানি পাঠ করিল। করিয়া, সেখানিকে কুচি কুচি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল! মুষ্টি ভরিয়া ছিন্নপত্র জানালা গলাইয়া বাহিরে বাগানে ফেলিয়া দিল।

পরমুহূর্ত্তে মনে হইল, যদি কেহ ছেঁড়া কাগজগুলি কুড়াইয়া লয়, যোড়া দিয়া পড়ে! তৎক্ষণাৎ সে বাগানে গিয়া ছেঁড়া কাগজগুলি একটি একটি করিয়া খুঁটিয়া তুলিয়া লইল। তাহার আঙুলের কাঁচ ডগাগুলিতে শিশির ও কাদা লাগিয়া গেল। কিছুদূরে অন্যবাটীর সদর দরজায় বৈষ্ণব ভিখারী খঞ্জনী বাজাইয়া গান করিতেছিল, দাঁড়াইয়া আনমনে একটু তাহাই শুনিল। ছেঁড়া চিঠির টুকরাগুলি আঁচলের খুটে বাঁধিয়া শয়নঘরে ফিরিয়া আসিল।

ভারী শীত করিতে লাগিল। জ্বর আসিবার পূর্ব্বে যেমন হয়, ঠিক সেই রকম। বিছানায় উঠিয়া, লেপ মুড়ি দিয়া সুকুমারী শয়ন করিল। লেপের মধ্যে, প্রথম তাহার চোখের জলের বাঁধ ভাঙ্গিল। একা ঘরে, পরিজনের অলক্ষিতে, সুকুমারী অনেক কাঁদিল।

এই সময় তাহার বড় ননদ বিনোদিনী আসিয়া বলিল, "সুকি, শুলি যে, অসুখ

করেছে নাকি?" বলিয়া সে সুকুমারীর মুখ হইতে হঠাৎ লেপ খুলিয়া দিল। মুখ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "একি, কাঁদছিস! কি হয়েছে লা? দাদা ভাল আছে ত?"

সুকুমারী তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, "না, কাঁদিনি ত।"

"না কাঁদিসনি বইকি! দাদা ভাল আছে ত?"

"হ্যাঁ ভাল আছে।"

শুনিয়া বিনোদিনী আশ্বস্ত হইল। কিন্তু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "তবে কাঁদছিস কেন?"

গালে চোখের জলের দাগ, তথাপি সুকুমারী বলিল, "কই, কাঁদিনি ত?"

"দাদা বকেছে?"

"দূর।"

"বল্না, কি হয়েছে বল্না ভাই?"

সুকুমারী বিরক্ত হইয়া বলিল, "কিছু হয়নি, হবে আবার কি?"

"না, হয়নি! বল্বিনে তাই বল। না বল্লি ত ভারি বয়ে গেল।"—বলিয়া বিনোদিনী রাগ করিয়া চলিয়া গেল।

সুকুমারী একা হইয়া আবার লেপে মুখ ঢাকিল। ভাবিতে লাগিল, সত্যই যদি তাহা হইয়া থাকে, তবে ত সকই শেষ হইয়াছে। সবই গিয়াছে! সে স্বামীকে আর কেমন করিয়া স্পর্শ করিবে, যত্ন করিবে, সেবা করিবে?

সে কি করিবে? তাহার এ কি হইল? এ সর্ব্বনাশ তাহার কে করিল?

এই সময় তাহার শাশুড়ী আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। বলিলেন, "আবার জ্বর করে বসেছ? বেশ করেছ! কি কুপথ্যি করেছিলে? আবার তেঁতুল-আচার খেয়েছিলে?"

সুকুমারী লেপের মধ্য হইতে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "তেঁতুল-আচার ত খাইনি মা।"

"খাওনি ত কি করেছিলে? এত করে বারণ করি ভিজে মাথায় শুয়োনা। তা ত শুনবে না; ভাতটি খেয়েই চুপ করে শুয়ে পড়। যা খুসি কর বাছা। গা কি খুব গরম হয়েছে? ভারী শীত করছে? এখনও আমার মালাজপ শেষ হয়নি, বিছানা ছুঁতে পারব না, যাই মন্না কি বিনিকে পাঠিয়ে দিইগে।"—বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

সুকুমারী আবার ভাবিতে লাগিল। কে সে? কোন্ রাক্ষসী তাহার সর্ব্বনাশ করিল—তাহার সুখের ঘরে আগুন লাগাইয়া দিল? তাহাকে যদি পায় একবার, তবে নখে করিয়া তাহার চক্ষু ছিঁড়িয়া ফেলে।

ভাবিল, না জানি সে কেমন সুন্দরী। আমার স্বামী ভুলিল—অবশ্যই সে আমার অপেক্ষা সুন্দরী। আর কেহ নয়, আমার স্বামী! আমার স্বামীকে যে আমি দেবতার তুল্য জ্ঞান করিতাম। কত লোক বলিয়াছে কলিকাতা অতি প্রলোভনপূর্ণ স্থান—যুবকগণের পক্ষে অতি বিষম স্থান,—কিন্তু আমার স্বামীর উপর আমার যে অগাধ বিশ্বাস ছিল!

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সুকুমারীর জ্বর দ্বিগুণ প্রবলতা ধারণ করিল। জ্বরের ঘোরে সে অচেতন হইয়া পড়িল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সুকুমারী যখন চক্ষু খুলিল, তখন দেখিল ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছে। ডাক্তার নিকটে বসিয়া ঔষধ প্রস্তুত করিতেছেন। তাহার শ্বশুর কিছুদূরে চেয়ারে বসিয়া তামাক খাইতেছেন। মন্না মেঝের উপর বসিয়া খোকাকে ঘুম পাড়াইতেছে।

ডাক্তার বলিলেন, "এই ঔষধটুকু খেয়ে ফেল দেখি মা!"—বলিয়া মুখের কাছে ঔষধ ধরিলেন। সুকুমারী পান করিল।

ডাক্তার বলিলেন, "অনেকটা নরম পড়েছে এখন। কোনও ভাবনা নেই। যতক্ষণ

একবারে জ্বরটা না ছাড়ে, ঐ ফিবার মিক্‌শ্চারটা দু' ঘণ্টা অন্তর খাইয়ে দেবেন।"—বলিয়া তিনি বিদায় লইলেন।

ডাক্তার গেলে সুকুমারীর শাশুড়ী আসিলেন। কপালে হাত দিয়া বলিলেন, "অনেকটা কম বইকি। গায়ে একবারে হাত রাখা যাচ্ছিল না। এখন কেমন আছ মা?"

সুকুমারী চুপি চুপি বলিল, "ভাল আছি।"

তিনি বলিলেন, "বিকেলের গাড়ীতে অবিনাশ এসেছে। মন্না, যা দিকিন, তোর দাদাকে ডেকে দে।"—তারপর স্বামীকে বলিলেন, "তোমার জলখাবার সাজিয়ে রেখেছে—যাও, দেরী কোরোনা।"

ঘরে শুধু সুকুমারীর শাশুড়ী রহিলেন। আর সকলে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে অবিনাশ আসিল। তাহার মা তখন কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গেলেন।

অবিনাশ বিছানার উপর বসিয়া, সুকুমারীর কপালের উপর হাত রাখিল। জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছ সুকু?"

সুকুমারী বলিল—"ভাল আছি।"

"আজ সকালে আমার চিঠি পেয়েছ?"

"পেয়েছি।—সত্যি?"

অবিনাশ বলিল, "সত্যি বইকি।"

"আমায় মনে পড়লো না?"

অবিনাশ চুপ করিয়া রহিল।

সুকুমারী বলিল, "সে কি বড় সুন্দরী?"

অবিনাশ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "কে?"

"সে।"

"কে সে? কার কথা জিজ্ঞাসা করছ?"

অবিনাশ মুহূর্ত্তের মধ্যে বুঝিতে পারিল সুকুমারী কি ভ্রমে পতিত হইয়াছে। ভাবিল—কি সর্ব্বনাশ! বলিল, "না—না—সুকু। তুমি কি ভেবেছ? তা নয়।"

"কি তবে?"

"যা জীবনে কখন স্পর্শ করতে বারণ করেছিলে, তোমার ভারি ঘৃণা জানিয়েছিলে, তাই খেয়েছি। মদ খেয়েছি। বেশী নয়, উপরোধে পড়ে এক চুমুক মাত্র খেয়েছি।"

দুই ঘণ্টা পরে সুকুমারীর আবার ঔষধ খাইবার কথা ছিল, কিন্তু প্রয়োজন হইল না। একদাগ ঔষধেই তাহার জ্বর সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়া গেল। বাস্তবিক, ডাক্তারবাবুর ঔষধগুলি বড়ই তেজস্কর বলিতে হইবে।

[পৌষ, ১৩০৮]

ছদ্মনাম

॥ ১ ॥

প্রেসের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করিয়া ছুটির পূর্ব্বেই পূজার 'বঙ্গপ্রভা' বাহির করিয়া ফেলিলাম। ডেস্প্যাচ সম্বন্ধে কার্য্যাধ্যক্ষকে উপদেশ দিতেছি, হ্যাটকোট পরিয়া সিগারেট মুখে করিয়া সতীশ আসিয়া উপস্থিত। বলিল, "দার্জ্জিলিঙ চল।"

সতীশ আমার বাল্যবন্ধু। আমরা এক ক্লাসে পড়িতাম, একত্র বসিতাম, একত্র বেড়াইতাম—পণ্ডিত মহাশয় আমাদিগকে বলিতেন কানাই বলাই।

এণ্ট্রান্স পাস করিয়া দুইজনে কলিকাতায় কলেজে আসিলাম—তখন হইতে আমাদের দুইজনের জীবনের আদর্শ বিভিন্নতা প্রাপ্ত হইতে লাগিল। সতীশ সর্ব্ববিষয়ে সাহেব হইয়া উঠিতে লাগিল;—আমি আমার মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগশালী হইলাম। আমি বাঙ্গালা

পড়ি, বাঙ্গালা লিখি বলিয়া সতীশ আমাকে বিদ্রূপ করিত; সতীশের সাহেবিয়ানাকে আমি সুযোগ পাইলেই গালি দিতাম।

তারপর সতীশ বিলাত গিয়া ব্যারিস্টার হইয়া আসিল—সাহেবিয়ানার যজ্ঞে পূর্ণাহুতি প্রদান করিল।

আমরা বাল্যকালে যেরূপ এক-প্রাণ এক-আত্মা ছিলাম, এখন আর সেরূপ নাই। সতীশের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সতীশ আমাকে হয় ত তাহার সকল মনের কথা আর বলে না। তথাপি আমরা পরস্পরের পরম বন্ধুই আছি।—সতীশ বলিল, "দার্জ্জিলিঙ চল।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কবে যাচ্চ?"

সে বলিল, "আজ।"

আমি বলিলাম, "পাগল! আজ সময় কোথা?"

সতীশ ঘড়ি খুলিয়া, দন্তে চুরোটিকা দংশন করিয়া বলিল, "মোটে দশটা বেজেছে। চারটের সময় ট্রেণ। ছ ঘণ্টা। তিনশো ষাট মিনিট। রাশি রাশি সময়।"

আমি বলিলাম, "সাহেব! অনুগ্রহ করে যদি বাংলাই বলছ, তবে খাঁটি বাংলাটাই বল। ইংরেজি থেকে তর্জ্জমা করে বোলো না। 'রাশি রাশি সময়' কি রকম বাংলা হল?"

সতীশ অধীর হইয়া বলিল, "হ্যাং ইওর বাংলা। যাবে কিনা বল।"

আমি বলিলাম, "ভাই! তুমি সাহেব হয়েছ—তোমরা যত চট্‌পট্‌ কায করতে পার, আমরা কালা আদমি কি তা পারি? স্নান করতে খেতে বারোটা বেজে যাবে। তারপর একটু বিশ্রাম—"

সতীশ বলিল, "নন্‌সেন্স! ওসব ওজর রেখে দাও।"

আমি বলিলাম. "তা দার্জ্জিলিঙ. যদি যাবারই ইচ্ছে. তবে দুদিন আগে বললে না কেন?"

"আজ সকালে মাত্র দার্জ্জিলিঙ থেকে ডাক্তার সেনের নিমন্ত্রণ পেলাম।"

আমি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম. "কি! ডাক্তার সেন দার্জ্জিলিঙে? সপরিবারে? সকন্যা?"

সতীশ বলিল. "অবশ্য।"—বলিয়া একটু একটু হাসিতে লাগিল।

ডাক্তার সেনের বিদুষী কন্যা নির্ম্মলা আমার বন্ধুরত্নের মনোহরণ করিয়াছেন. ইহা সত্য।

আমি বলিলাম, "কি ভয়ানক! চারটে পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে? তার আগে গাড়ী নেই?"

সতীশ অভিনেতার মত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "না।"

আমি গান ধরিলাম—

"এমনে কেমনে রব, না হেরে তাহায় রে,—
গণিয়ে নিমেষ পল, দিন না ফুরায় রে!"

যদিও নিজে কখনও রমণীর প্রেমে পড়ি নাই, তথাপি ব্যাপারটা জানা আছে। সতীশকে একদিন দেরী করিতে বলাও যা, আর ব্যাঘ্রকে অহিংসাধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার চেষ্টাও তাহাই। সুতরাং যাওয়াই স্থির করিলাম। জিনিসপত্র গুছাইয়া চারিটার গাড়ীতে দুইজনে যাত্রা করা গেল।

॥ ২ ॥

দার্জ্জিলিঙ ষ্টেশনে গাড়ী থামিবার পূর্ব্বেই কিছুদূর হইতে দেখা গেল, ডাক্তার সেন পুত্রকন্যা লইয়া প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়া আছেন। বাঙ্গালীর মেয়েকে জুতা মোজা পরিয়া প্রকাশ্যভাবে প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া আমার পিত্ত জ্বলিয়া গেল। ব্রাহ্ম-মহিলা আমি এ জীবনে অনেক দেখিয়াছি, দুই একজনের সঙ্গে পরিচয়ও আছে, এরূপ

আঘাতটা লাগিল। আমি স্ত্রীশিক্ষার খুব পক্ষপাতী কিন্তু স্ত্রীস্বাধীনতা জিনিষটা আচরণ কিছুই নূতন নহে, তথাপি সতীশের ভাবী বধূ, ভাবী শ্বশ্রূ বলিয়াই নতুন করিয়া দু'চক্ষে দেখিতে পারি না। আমার কাগজে সম্প্রতি এ বিষয়ে একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছি। ভবিষ্যতে আরও লিখিবার উপকরণ তখনই মাথার ভিতর গজাইতে লাগিল। খুব কড়া-কড়া চোখা-চোখা বাক্যাবলী মস্তিষ্কের ভিতর শ্রেণীবদ্ধ হইতে লাগিল। কিন্তু অল্প-ক্ষণেই তাহাদের ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িতে হইল।

গাড়ী হইতে নামিয়াই সতীশ আমাকে সকলের কাছে 'ইন্ট্রোডিয়ুস' করিয়া দিল। এরূপ অবস্থায় কি করা উচিত না জানা থাকায়, আমি থতমত খাইয়া কোনও কথা বলিতে না পারিয়া মূঢ়ের মত দন্তবিকাশ করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। সতীশটার লজ্জা সরম কিছুই নাই, নির্ম্মলার ভাইকে লগেজের সন্ধানে প্রেরণ করিয়া, নির্ম্মলার সঙ্গ জোঁকের মত ধরিয়া রহিল।

নির্ম্মলা একটু পরেই আমার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া হাস্যমুখে আমায় বলিল, "মন্মথবাবু, আমি আপনার কাগজের একজন নিয়মিত পাঠিকা।"—আরও যেন কি বলিতে যাইতেছিল, বলিল না।

নির্ম্মলার মা বলিলেন, "পূজোর 'বঙ্গপ্রভা' কবে বেরুবে মন্মথবাবু?"

আমি বলিলাম, "পূজোর বঙ্গপ্রভা? সে ত বেরিয়ে গেছে।"

মিসেস সেন কন্যার প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "পেয়েছিস?"

নির্ম্মলা বলিল, "কই না।"

আমি বলিলাম, "না না, মাফ করবেন। এখনও আপনাদের পাবার সময় হয়নি। এই কাল মোটে বেরিয়েছে। বিস্তর গ্রাহক, মফস্বলে সব ডেস্প্যাচ একদিনে হয়ে ওঠে না কিনা!"

নির্ম্মলা বলিল, "ওঃ—আমার বঙ্গপ্রভা প্রথমে ঢাকায় যাবে, তারপর ঠিকানা কেটে এখানে আসবে, তবে আমি পাব! আপনার কাছে একখানা নেই মন্মথবাবু?"

বঙ্গপ্রভার প্রতি নির্ম্মলার টান দেখিয়া আমার সম্পাদক-প্রাণ পুলকিত হইয়া উঠিল। ব্যস্ত হইয়া বলিলাম, "হ্যাঁ, আছে বইকি। আপনাকে কালই এক কপি পাঠিয়ে দেব।"

নির্ম্মলা বলিল, "বেশী কষ্ট করবেন না, সুবিধে মত পাঠিয়ে দেবেন।"

নির্ম্মলার মা বলিলেন, "মন্মথবাবু, কাল বিকেলে আমাদের বাড়ী চায়ে আপনার নিমন্ত্রণ রইল, আসবেন।"—বলিয়া সস্মিত অভিবাদনান্তর তাঁহারা চলিয়া গেলেন। আমি স্যানিটোরিয়ম্ অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

ভাবিলাম, শিক্ষা ও সংসর্গের এমনই গুণ, বাঙ্গালীর মেয়েও কথাবার্ত্তায় এমন নিঃসঙ্কোচ হইতে পারে!

রাত্রে বিছানায় ক্লান্তদেহ রাখিয়া সমাজতত্ত্বের অনেক কথা চিন্তা করিতে লাগিলাম। এই যে নূতন শিক্ষার সঙ্গে নূতন আচার ব্যবহার আমরা ইউরোপ হইতে আমদানি করিতেছি, ইহার ভাবী ফল কিরূপ দাঁড়াইবে?—চিন্তা অধিক দূর অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম।

॥ ৩ ॥

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া চা পান করিতে করিতে পূর্ব্বদিনের ঘটনাগুলি আলোচনা করিতে লাগিলাম। সমাজে স্ত্রী পুরুষের অবাধ মেলামেশা আমি সামাজিক নীতির পক্ষে নিরাপদ মনে করি না। তাই ভাবিলাম চায়ের নিমন্ত্রণে যাইব না; নিজের বিশ্বাস বিরুদ্ধ কায করিব কেন? 'বঙ্গপ্রভা'খানা চাকর দিয়া পাঠাইয়া দিলেও চলিতে পারে।

কিন্তু সতীশটা এমনই গন্দর্ভ—আসিল না। বোধ হয় নির্ম্মলাকে ছাড়িয়া আসিতে পারিল না। মনে মনে উহাদের প্রেমলীলা কল্পনা করিয়া কৌতুক অনুভব করিতে

লাগিলাম।

আহারাদির পর মনে হইল, চায়ের নিমন্ত্রণ যদি রক্ষা না করি, তাহা হইলে ঠিক ভদ্রতা হয় না। নিমন্ত্রণ যখন গ্রহণ করিয়াছি, তখন রক্ষা করিতে আমি বাধ্য। যদি প্রবাসবিরুদ্ধই হইল, তবে সেই সময়েই আমার উচিত ছিল—নিমন্ত্রণ কাটাইয়া দেওয়া। আজিকার মত যাই। ভবিষ্যতে সাবধান হওয়া যাইবে—আর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেছি না।

বৈকালে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। বেশবিন্যাস একটু যত্নপূর্ব্বকই করিলাম। নিজেকে বুঝাইলাম শুধু পুরুষ-সমাজে বিচরণ করিতে হইলে বেশভূষার তারতম্যে আসিয়া যায় না—কিন্তু রমণীসমাজে একটু পারিপাট্য অবশ্যকর্ত্তব্য।

দার্জ্জিলিঙ আমি বহুবার আসিয়াছি—পথঘাট আমার সর্ব্বত্র পরিচিত। যখন বাড়ীর কাছে পৌঁছিলাম, তখন চারিটা বাজিতে দশ মিনিট বাকী আছে—নিমন্ত্রণ চারিটার সময়! ভাবিলাম, ইহারা ইংরাজি মেজাজের লোক, যথাসময়ের পূর্ব্বে যাইলে হয়ত বা বর্ব্বর মনে করিবে। তাই বাহিরে এদিক ওদিক একটু বেড়াইয়া, ঠিক চারিটার সময় কার্ড পাঠাইয়া দিলাম।

সকলে আদর অভ্যর্থনা করিয়া আমাকে বসাইলেন। নির্ম্মলাকে আজ ভারি সুন্দর দেখাইতেছিল। ষ্টেশনে যখন দেখিয়াছিলাম, তখন তাহার গায়ে ইংরাজি কেপ, পায়ে ইংরাজি জুতা—দেখিতে আমার মোটে ভাল লাগে নাই। এখন দেখিলাম, পায়ে লাল মখমলের দেশী জুতা, নারাঙ্গি রঙের তাফ্তা শাড়ীখানি নব্য প্রথায় পরা, মাথায় মাথা-ভরা চুলের এলো খোঁপা এবং খোঁপায় একটি পীতবর্ণের পাহাড়ী গোলাপ। নির্ম্মলা বেশ সুন্দরী বটে!

সতীশকে প্রথমে দেখিতে পাইলাম না। তাহাকে নির্জ্জনে পাইলে নির্ম্মলার লাল মখমলের জুতার প্রসঙ্গে 'রাঙা পা দুখানি' বলিয়া কেমন রসিকতা করিব, তাহা মনে মনে সাধিয়া রাখিতে লাগিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে সতীশ আসিল। চা পান ও নানাবিধ কথাবার্ত্তা হইলে পর সকলে মিলিয়া বেড়াইতে যাইবার পরামর্শ হইল।

ঘণ্টাখানেক ভ্রমণের পর যখন বিদায় লইলাম, তখন মিসেস সেন বলিলেন, "মন্মথবাবু, কাল যদি আবার চায়ের সময় আসেন, তবে একত্র বেড়াতে যাওয়া যায়।"

মনে হইল, এইবার সময় হইয়াছে, এই বেলা নিমন্ত্রণ স্পষ্ট করিয়া অস্বীকার করি। সেই সঙ্গে অস্বীকার করিবার প্রকৃত কারণটাও খুলিয়া বলিব কি? তাহার ভিতর সমাজ-নীতি ঘটিত কত বড় একটা উচ্চতত্ত্ব ও আদর্শ নিহিত রহিয়াছে, তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বলিবার এই অবসর গ্রহণ করা উচিত নয় কি? কিন্তু আবার ভাবিলাম, নিমন্ত্রণ কই? 'যদি আসেন'—ইহাকে কি নিমন্ত্রণ বলা যাইতে পারে? এইরূপ মানসিক তর্কে ব্যস্ত থাকায় কোনও উত্তর দিয়া উঠিতে পারিলাম না: এদিকে ইঁহারাও নমস্কার করিয়া বিদায় লইলেন।

॥ ৪ ॥

পরদিন প্রভাতে বেলা দশটার সময় সতীশ আসিয়া উপস্থিত। নির্ম্মলাকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া আসিল জিজ্ঞাসা করায় বলিল, "তোমার সেই হতভাগা কাগজ বঙ্গদর্শন না বঙ্গপ্রভা কি দিয়ে এসেছ, সকাল থেকে তাই নিয়ে ব্যস্ত। আমি রাগ করে চলে এলাম।"

শুনিয়া আমার মনটা ভারি খুসী হইল। সাহিত্যের প্রতি নির্ম্মলার এত অনুরাগ! নির্ম্মলা যদি বাঙ্গালা লেখেন তবে সংশোধন করিয়া বঙ্গপ্রভায় ছাপাই।

নির্ম্মলার অনেক গল্প সতীশ করিল। এই দুইটি নব-প্রণয়ীর সুখে আমারও মনটা তারুণ্যপূর্ণ হইয়া উঠিল।

সতীশ বলিল, "এখন যাই। কেমন ঘর পেয়েছ দেখতে এসেছিলাম। চায়ের সময় দেখা হবে। আসছ ত?"

আমি বলিলাম, "চায়ে? আজ আর না। মিসেস সেন ত আমায় নিমন্ত্রণ করেন নি।"

সতীশ বলিল, "করেছেন বইকি! আমি নিজে শুনেছি।"

"কোথা করেছেন? শুধু বলেছেন 'আসেন যদি'।"

"বিলক্ষণ! ঐ ত নিমন্ত্রণ হল। তবে কি তোমার দরজায় এসে গলায় বস্ত্র দিয়ে যথাশাস্ত্র নিমন্ত্রণ করে যেতে হবে নাকি? আচ্ছা সেকেলে তুমি ত হে!"

আমি বলিলাম, "বল কি? কিন্তু আমি ত আজ যেতে পারছিনে। না গেলে কি ভয়ানক অভদ্রতা হবে? কি জানি, তোমাদের সব বিলিতি এটিকেট ফেটিকেট জানিনে ভাই।"

সতীশ গম্ভীরভাবে বলিল, "ভয়ানক অভদ্রতা হবে।"

শুনিয়া আমি নিজের প্রতি ভারি বিরক্ত হইয়া উঠিলাম। সেই সময় মিসেস সেনকে অন্ততঃ এইটুকু বলিলেই হইত, 'না কাল আর আসতে পারব না, একটু কায আছে'—তা না করিয়া, এটা রীতিমত নিমন্ত্রণ হইল কিনা সেই মানসিক তর্কে ব্যস্ত রহিলাম; এখন এই অবস্থা।

সতীশ হাসিয়া বলিল, "না না, 'ভয়ানক অভদ্রতা' হবে না, অত চিন্তিত হয়ো না। শুধু আবার দেখা হলে ক্ষমা প্রার্থনা করলেই চলবে। কিন্তু আসবে না কেন? না না—এস।"

প্রকৃত কারণ সতীশকে একা বলিতে ততদূর উৎসাহ হইল না। আমি বলিলাম, "ওহে আজ একটু বিশেষ—"

সতীশ বলিল, "বিশেষ কায কাল হবে, আজ ত এস। অন্ততঃ আসতে চেষ্টা কোরো।"—বলিয়া সে অন্তর্দ্ধান করিল।

আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, "যাই বল যাই কও, আর আমি যাচ্ছিনে।"

কিন্তু সময় যত অগ্রসর হইতে লাগিল, বড় একা অনুভব করিতে লাগিলাম। পূজার 'বঙ্গপ্রভা'খানা নির্ম্মলার কেমন লাগিল জানিবার জন্য একটু ঔৎসুক্যও জন্মিল। বিশেষতঃ আমার স্বলিখিত সেই 'নারী-জীবনের আদর্শ' প্রবন্ধটা সম্বন্ধে।—নির্ম্মলার শ্রেণীর আজি কালিকার আলোক-প্রাপ্তা নারীগণের জন্যই সে প্রবন্ধটা লিখিয়াছি কিনা। সে প্রবন্ধ পাঠ করিয়া নির্ম্মলার মতামত কিরূপ হইল তাহা জানা আবশ্যক।—সুতরাং যাওয়াই স্থির করিলাম।

॥ ৫ ॥

গিয়া দেখিলাম, ড্রইং রুমে কেহ নাই। কিয়ৎক্ষণ বসিয়া আছি, নির্ম্মলা আসিলেন, হাস্যমুখে নমস্কার করিয়া বলিলেন, "কি সৌভাগ্য! আপনার আশা ত আমরা ছেড়েই দিয়েছিলাম। বাবা, মা, সতীশবাবু বাগান দেখতে গিয়েছেন। সতীশবাবু বললেন আপনি আজ আর আসবেন না—ভারি ব্যস্ত আছেন। কোনও নূতন লেখায় বুঝি?"

আমি বলিলাম, "হ্যাঁ, না—একটু কায ছিল, তাই ভাবলাম—"

নির্ম্মলা বলিল, "আচ্ছা, বঙ্গপ্রভায় রোজ ক'ঘণ্টা করে আপনার সময় যায়?"

"আমার সমস্ত সময়ই প্রায় বঙ্গপ্রভায় যায়। আমি ত বঙ্গপ্রভা নিয়েই আছি।"

"বেশ আছেন। আমারও ইচ্ছে করে, আমিও ঐ রকম সাহিত্যচর্চ্চা নিয়ে দিনরাত থাকি। কিন্তু আপনার কাছে এ মত ব্যক্ত করা বোধ হয় খুব দুঃসাহসের কায?"

"কেন?"

"আপনি নারীজীবনের আদর্শ প্রবন্ধে যে সব কথা লিখেছেন—আপনার মতে, স্ত্রী-লোকের প্রশস্ত কর্ম্মক্ষেত্র গৃহ, নিজের প্রতি সম্পূর্ণ অমনোযোগী হয়ে পরসেবায় আত্ম-

নিয়োগই যথার্থই নারীধর্ম্ম।"

"আপনি তা হলে প্রবন্ধটা পড়েছেন?"

"পড়েছি বইকি; সব পড়ে ফেলেছি। কাল রাত্রে বিছানায় শুয়ে পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভেংগে দেখি—মোমবাতিটা শেষ অবধি পুড়ে দাউ দাউ করে জবলছে, ঘরে ভয়ানক আলো হয়েছে, দেখে প্রথমটা এমন ভয় হয়েছিল!"

আমি বললাম, "ওঃ—ভাগ্যে কিছু ধরে-টরে যায়নি।"

স্মিতমুখে নির্ম্মলা বলিলেন, "আপনার বঙ্গপ্রভা পড়তে গিয়ে যদি আমার মশারিতে আগুন ধরে যেত, আমি পুড়ে যেতাম, তবে এই দুর্ঘটনা কাগজে কাগজে ছাপা হ'লে আপনার বঙ্গপ্রভার খুব একচোট বিজ্ঞাপন হয়ে যেত।"

ইহার উত্তরে প্রথমটা আমার কথা যোগাইল না—শুধু একটা উপমা মাথার ভিতর ঘুরিতে লাগিল। যে মোমবাতি জবলার কথা বলিতেছেন, এই সুশিক্ষিতা নারীটি তাহারই মত কি সুকোমল, অথচ তাহারই শিখার মত কি দীপ্তিমতী? আমি একটু অর্থশূন্য হাসি হাসিলাম, শেষে বলিলাম, "বাংগলা সাহিত্যে আপনার এত ভক্তি বাংগলা লেখেন না কেন?"

"আমি লিখলে কে পড়বে? প্রথমতঃ, কে ছাপবে?"

আমার খুব সন্দেহ হইল, নির্ম্মলা গোপনে গোপনে লিখিয়া থাকেন। কিন্তু স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করিবার সাহস হইল না।

সম্পাদকীয় প্রসংগে ছোট গল্পের কথা উঠিল। আমি বলিলাম—প্রতিমাসে একটা করিয়া ছোট গল্প দেওয়ার যে রীতি হইয়াছে, তাহাতে সময়ে সময়ে ভাল গল্পাভাবে সম্পাদককে মুস্কিলে পড়িতে হয়।

নির্ম্মলা বলিলেন, "আমার একটি বন্ধু ছোট গল্প লেখেন। আমার কাছে একটা রয়েছে। আপনি দেখবেন?"

এ বিপদের সম্ভাবনা জানিলে ছোট গল্পের প্রসঙ্গই উত্থাপন করিতাম না। সম্পাদকীয় ঘানি টানিতে টানিতে শিক্ষানবীসের অনেক গল্প আমাদিগকে পড়িতে হয়। কিন্তু এ একমাস আমি ছুটি লইয়া পাহাড়ে বেড়াইতে আসিয়াছি।—তথাপি নিরুপায়। সুতরাং নির্ম্মলাকে বলিলাম, "তা দেবেন, দেখব।"

"দেখে আপনার যথার্থ মতামত আমায় বলতে হবে।" "তা বলব।"

"আমার বন্ধু বলে কিছু ঢেকে বলবেন না?"

"আপনি যদি যথার্থ মতই শোনবার জন্যে উৎসুক হন, তা হলে আমি যথার্থ মতই বলব।"

নির্ম্মলা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গেলেন। কয়েক মিনিট পরে, রুল টানা ফুলস্ক্যাপে হাফ মার্জ্জিনে সুন্দর সাবধান হস্তাক্ষরে লেখা, লাল রেশমে কোণ গাঁথা একটি পাণ্ডুলিপি আনিয়া আমার হাতে দিলেন।

প্রথম পৃষ্ঠায় চক্ষু রাখিয়া আমি বলিলাম, "নূতন লেখক?"

নির্ম্মলা বলিলেন, "হ্যাঁ, কি করে জানলেন?"

"নূতন লেখকেরা প্রায়ই বেশ ধরে ধরে যত্ন করে পাণ্ডুলিপি লিখে থাকেন। পুরোনো লেখকদের হস্তাক্ষর প্রায়ই অস্পষ্ট হয়।"

এই কথা বলিয়া, সম্পাদকীয় অভ্যাসবশতঃ শেষ পৃষ্ঠা উলটাইয়া নাম খুঁজিলাম। নাম নাই। শেষ পৃষ্ঠায় চোখ বুলাইয়া দেখিলাম, নায়ক বা নায়িকা বিষপান করিয়াছে কিনা। নূতন লেখকের নায়ক নায়িকা শেষটায় প্রায়ই বাঁচে না। দেখিলাম নায়ক নায়িকা বাঁচিয়াই আছে—অনেকটা ভরসা হইল।

সন্দেহ হইল, এ লেখা হয়ত বা নির্ম্মলার নিজেরই। অনেক লাজুক লেখক, প্রথম প্রথম অন্যকে নিজের লেখা দেখাইবার সময়, বন্ধুর লেখা বলিয়া থাকেন।

নির্ম্মলাকে বলিলাম, "আজ আমি বাসায় গিয়ে এ লেখা পড়ব, কাল এসে আপনাকে মতামত বলব।"

লেখা নির্ম্মলার হওয়াই বিশেষ সম্ভাবনা। মতামত কিরূপ ভাষায় প্রকাশ করিব তাহা আগে হইতেই জানা আছে। বন্ধুত্বের স্থলে নূতন লেখকের লেখার সমালোচনা শতসহস্রবার করিতে হইয়াছে। বাঁধি গৎ আছে—সেইগুলি গুছাইয়া বলা মাত্র। 'স্থানে স্থানে বেশ হৃদয়গ্রাহী'—'চর্চ্চা রাখিলে ক্রমে একজন ভাল লেখক হইতে পারেন'—ইত্যাদি।

ক্রমে সকলে ফিরিয়া আসিলেন। চা পানাদির পর বাড়ীতে বসিয়াই গল্প চলিল—বেড়াইতে যাওয়া আর হইল না।

॥ ৬ ॥

বাড়ী গিয়া গল্প পড়িলাম। দেখিলাম, খুব ভুল করিয়াছি। প্রথমতঃ নূতন লেখকের রচনা নহে। হাত বেশ পাকা—ভাষা তেজস্বী অথচ সংযত। দ্বিতীয়তঃ নির্ম্মলার লেখা নহে। এতকাল বৃথাই সম্পাদকতা করিতেছি না। কাহার লেখা তাহাও বুঝিতে বাকী রহিল না। গৌরীকান্ত রায়ের লেখা। সাক্ষাৎ আলাপ নাই—শুনিয়াছি ঢাকার ঐ দিকেই কোথায় থাকেন। লেখা তাঁহার অনেক পড়িয়াছি। তিনি নব্য লেখকগণের মধ্যে একজন প্রধান। তবে লেখায় অনেক দোষও আছে—সে সব অল্প বয়সের দোষ। ক্রমে শোধরাইয়া যাইবে।

পরদিন নির্ম্মলার কাছে গিয়া, লেখাটির সুখ্যাতি করিলাম। দুই এক স্থলে দোষও দেখাইলাম—কিন্তু প্রশংসার ভাগই বেশী দিলাম।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "লেখকের বয়স কি অল্প?"

নির্ম্মলা বলিলেন, "হ্যাঁ—আমার চেয়ে কিছু বড়।"

"আপনার খুব বন্ধু বুঝি?"

"হ্যাঁ, আমার একজন বিশেষ বন্ধু।"

কথাটা শুনিতে আমার ভাল লাগিল না। একজন যুবতী কন্যার একজন যুবক 'বিশেষ বন্ধু' থাকিবে কেন?

জিজ্ঞাসা করিলাম, "এঁর লেখা দুই একটা আমরা পেতে পারিনে?"

নির্ম্মলা বলিলেন, "কেন, আপনার খুব লোভ হচ্চে নাকি?"

"তা হচ্চে।"

"আচ্ছা, তা হ'লে আপনাকে একটা দেওয়াতে চেষ্টা করব। কিন্তু এটা নয়।"

"আপনার কাছে কি তাঁর অনেক লেখা আছে?"

"তাঁর অনেক লেখাই আমার কাছে আছে। তিনি নূতন লেখা শেষ হওয়া মাত্র আমাকে পাঠিয়ে দেন।"

আমি মনে মনে ভাবিলাম, গতিক ভাল নয়। এত অন্তরঙ্গতা! বলিলাম, "আপনিই তাহলে তাঁর প্রধানা পাঠিকা?"

"অন্ততঃ প্রথমা বটি। আমিই বোধহয় তাঁর লেখার সবচেয়ে বেশী ভক্ত।"

আমি বলিলাম, "তাঁর নামটা শুনতে পাইনে?"

নির্ম্মলা একটু ভাবিলেন। শেষে বলিলেন "গৌরীকান্ত নাম।" বলিতে তাঁহার কপোলদেশে কিঞ্চিৎ রক্তাভ হইল।

সতীশের জন্য আমার দুঃখ হইল।

তারপর, গৌরীকান্তের প্রকাশিত লেখার সম্বন্ধে আমরা কথা কহিতে লাগিলাম। আমি বলিলাম তাঁহার নব প্রকাশিত 'নন্দরাণী' উপন্যাস আমরা সমালোচনার্থ পাইয়াছি।

ইহার পর দুই তিন দিন নির্ম্মলার সঙ্গে গৌরীকান্ত রায়ের লেখার বিষয় অনেক

আলোচনা করিলাম। নির্ম্মলা গৌরীকান্তকে একেবারে পূজা করেন বলিলেই হয়। লোকটার উপর আমার কেমন একটা বিজাতীয় ক্রোধ জন্মিতে লাগিল।

॥ ৭ ॥

সতীশ এখনও সেন-দম্পতীর নিকট নির্ম্মলার পাণিপ্রার্থনা করে নাই। করিলে মঞ্জুর হইবার সম্ভাবনা। আমার ত দৃঢ় বিশ্বাস, সতীশ যেরূপ ডাক্তার সেনের জামাতৃ-পদাকাঙ্ক্ষী, ডাক্তার সেনও সেইরূপ সতীশের শ্বশুরত্বের জন্য সমুৎসুক। এ কয়দিনের ভাব-গতি দেখিয়া ইহাই স্পষ্ট অনুমান হয়।

কিন্তু ঐ গৌরীকান্ত বিভ্রাট আমায় দুশ্চিন্তান্বিত করিয়াছে। স্ত্রী পুরুষের মধ্যে 'পরম বন্ধুত্ব' আমি মোটেই বুঝিতে পারি না।

এখন ব্যাপারটা এইরূপ দাঁড়াইতেছে। সতীশ ও নির্ম্মলার বিবাহ হইল। নির্ম্মলা বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি বিশেষ অনুরাগশালিনী। সতীশ বাঙ্গালা সাহিত্যের নামে জ্বলিয়া যায়। এদিকে গৌরীকান্ত একজন প্রতিভাশালী লেখক, সে পৃথিবীর সমস্ত নারীজাতির মধ্যে বাছিয়া নির্ম্মলাকেই তাহার সাহিত্য-সঙ্গিনী করিয়া লইয়াছে। আর, নির্ম্মলার মনও গৌরীকান্তের প্রতি একটা ভাবাবেগে আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। ইহা একটা অজ্ঞাত বীজস্বরূপ:—ইহা হইতে ভবিষ্যতে কি জাতীয় তরু উদ্গত হইতে পারে তাহা কে জানে?

আমি ইহা হইতে দিব না। আমি আমার বন্ধুর দাম্পত্যজীবন নিষ্কণ্টক করিব। নির্ম্মলা গৌরীকান্তের পূজার জন্য নিজের মনের মধ্যে যে ভক্তিমন্দিরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, সে মন্দির আমি সমালোচনার বজ্র দিয়া ভস্মীভূত করিব। দেখাইব, গৌরীকান্ত অপেক্ষাও প্রতিভাবান লেখক নব্যবঙ্গে আছে। আমি গৌরীকান্তের ভাষার ভুল ধরিব, ব্যাকরণের ভুল ধরিব, নূতন পুরাতন পাশ্চাত্য সাহিত্য তন্ন তন্ন করিয়া ঘাঁটিয়া কোথায় গৌরীকান্তের কোন্ ভাবের সাদৃশ্য আছে আবিষ্কার করিব; পাশাপাশি দুই স্থান উদ্ধৃত করিয়া গৌরীকান্তকে চোর বলিয়া জগৎসমক্ষে ঘোষণা করিব। এইরূপ প্রতি-নিয়ত অধ্যবসায়ে নির্ম্মলার মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া দিব যে তাহার পূজার দেবতা মাটীর পুতুল মাত্র, ভিতরে শুধু খড়। সতীশকে, নির্ম্মলাকে রক্ষা করিব, সে আত্মরক্ষারই সমান। ঘরের টাকা দিয়া এতদিন বঙ্গপ্রভা চালাইয়া আসিয়াছি! আমার সমালোচনার রাজদণ্ড ছোট বড় সমস্ত লেখকেরই বিভীষিকা। এবার সে দণ্ডের সাহায্যে বন্ধুকৃত্য সাধন করিয়া লইব। একবার মনে সন্দেহ হইল, তাহাতে সম্পাদকীয় কর্ত্তব্যের হানি হইবে না ত? কিন্তু অনুকূল যুক্তি উদ্ভাবন করিয়া মনকে সহজেই আঁখি ঠারিলাম।

এইরূপ স্থির করিয়া, প্রথমতঃ 'নন্দরাণী'খানার একটা ভয়ঙ্কর তীব্র সমালোচনা লিখিলাম। কার্ত্তিক মাসের কাগজের জন্য সমালোচনা কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলাম। যথাসময়ে অর্ডার প্রুফ আসিল। অর্ডারে স্থানে স্থানে সমালোচনা আরও তীব্র করিয়া দিলাম।

সেদিন বৈকালে সতীশ আসিল। আমার টেবিলে 'নন্দরাণী' দেখিয়া বহিখানা উঠাইয়া লইল। আমি ব্যস্ত হইয়া বলিলাম, "উঁহু উঁহু ছুঁয়ো না, এটা বাঙ্গালা বই।"

সতীশ বলিল, "এই বইখানা নিয়ে ক'দিন থেকে এমনই মেতে আছ যে একহপ্তা আমাদের ওদিকে যাওনি। যখনই আসি তখনই দেখি এই বইখানা নিয়ে লিখছ, তাই এটা কেড়ে নিতে এসেছি।"

আমি বলিলাম, "বইখানা সমালোচনা করছিলাম। এখন কেড়ে নিতে পার, শেষ হয়ে গেছে।"

"সমালোচনা শেষ হয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ—এই কতক্ষণ অর্ডার প্রুফ ডাকে দিয়েছি।"

সতীশ বাংগালা সাহিত্যের খবর লইতেছে দেখিয়া ভাবিলাম, হইল কি?

সতীশ আমার মুখ পানে চাহিয়া হাসিতে লাগিল।

বলিলাম, "ব্যাপার কি হে?'

সতীশ বলিল, "এবার আমার জীবনের একটা গোপন কথা তোমায় বলি। শুধু নন্দরাণী'র সমালোচনা তোমার কাগজে বেরুবার অপেক্ষায় ছিলাম।"

আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "নন্দরাণীর সমালোচনা! নন্দরাণীর সমালোচনার সংগে তোমার জীবনের গোপন কথার যোগ কোথায়?"

বলিল, "বিশেষ যোগ আছে। আমিই গৌরীকান্ত রায়।"

আমি আকাশ হইতে পড়িলাম। বলিলাম, "তুমি?"

"আমি। দেখছ না—সতী মানে গৌরী, আর ইশ মানে কান্ত।"

আমি বলিলাম, "তুমি?" বলিবার সংগে সংগে চাকরকে ডাকিবার জন্য ঘণ্টা বাজাইলাম। চাকর আসিলে টেলিগ্রাম করিবার কাগজ আনিতে বলিয়া দিলাম।

সতীশ বলিল—বিলাতে থাকিতে ব্রিটিশ মিউজিয়মে বসিয়া সমস্ত ভাল বাংগালা বহি মনোযোগের সহিত সে পাঠ করিয়াছিল। পরে লেখা অভ্যাস করিয়াছে। তাহার প্রথম উপন্যাস 'নন্দরাণী'র সমালোচনা বংগপ্রভায় বাহির হওয়া অবধি অপেক্ষা করিতেছিল, তাহার কারণ, আগে জানিলে পাছে আমি তাহাকে অন্যায় প্রশংসায় বাড়াইয়া তুলি।

চাকর টেলিগ্রামের ফর্ম্ম আনিল। ম্যানেজারকে সংবাদ পাঠাইলাম—নন্দরাণী সমালোচনার অর্ডার প্রুফ ডাকে দিয়াছি—কিন্তু উহা যেন ছাপা না হয়। তাহার স্থানে অন্য একটা প্রবন্ধ দিতে বলিয়া দিলাম।

সচ্চরিত্র

॥ ১ ॥

যে বুধবারে গেজেটে খবর বাহির হইল সুরেন্দ্রনাথ সম্মানের সহিত বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহার পরের বুধবারেই ভাগলপুর হইতে তাহার কাকার মৃত্যুসংবাদ আসিল।

সুরেন্দ্রনাথ বাল্যকালেই পিতৃহীন হয়। তাহাকে ও তাহার দুই দাদাকে এই কাকাই ভাগলপুরে রাখিয়া মানুষ করিয়াছিলেন, লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন;—সুতরাং কাকার মৃত্যুতে সুরেন্দ্র দ্বিতীয়বার পিতৃহীন হইল।

কাকা ভাগলপুরের একজন বড় উকীল ছিলেন। সুরেনের দাদারা ভাল করিয়া লেখাপড়া শিখে নাই—তাহাদের তিনি সামান্য চাকুরী জুটাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, আইন পাস করিয়া সুরেন ওকালতী করে;—সুরেনও নিজের জীবনের গতি ঐ পথেই আঁকিয়া রাখিয়াছিল। হঠাৎ দেখিল, আইন পড়ার খরচা যোগাইবার আর কেহ নাই।

সুরেনের মাকে সকলে পরামর্শ দিলেন 'ছেলের বিয়ে দাও—শ্বশুর পড়ার খরচ যোগাবে।' কিন্তু সুরেন বলিল, "কৃতী না হয়ে বিয়ে করব না।"

আইন পড়িয়া উকীল হইবার মৎলবও সুরেন ছাড়িতে পারিল না! মাকে বলিল, "কলকাতায় যাই, ছেলে পড়িয়ে কিছু উপার্জ্জন করব, তাইতে আমার বাসা-খরচ চলে যাবে।"

বিধবা মাতার সামান্য পুঁজি ভাংগিয়া কয়েকটি টাকা লইয়া সুরেন্দ্র কলিকাতায় উপনীত হইল। আইন ক্লাসে নাম লেখাইল। কয়েক দিনের চেষ্টায়, দশটাকা বেতনের একটি প্রাইভেট টিউসনও জুটিল; আর দশটি টাকা জুটিলেই কোনও রকমে বাসা খরচের সংস্থানটা হইয়া যায়।

কিন্তু এই দশটি টাকা জুটিতে বড় বিলম্ব হইতে লাগিল। বাড়ী হইতে টাকা যাহা

আনিয়াছিল, তাহা ফুরাইল। সুরেন্দ্র মহা চিন্তিত হইয়া উঠিল।

শ্রাবণ মাস, কয়েকদিন বৃষ্টি বন্ধ হইয়া অত্যন্ত গ্রীষ্ম পড়িয়াছে। সন্ধ্যার পর আহারান্তে সুরেন তাহাদের বাসার ছাদে উঠিয়া পদচারণা করিতে লাগিল—আর ভাবিতে লাগিল। প্রেসিডেন্সি কলেজের ঘড়িতে নয়টা বাজিল, দশটা বাজিয়া গেল। ছাদের অন্যত্র বাসার অন্যান্য যুবকেরাও পদচারণা করিতেছে। কেহ সিগারেট খাইতেছে, কেহ গল্প করিতেছে, কেহ বা গুন্‌গুন্‌ করিয়া থিয়েটারের গান গাহিতেছে।

হঠাৎ নিম্নে একটা কণ্ঠ শুনিতে পাইল—"সুরেনবাবু হ্যায়?"

সরমন্‌ চাকর বাসন মাজিতেছিল, সে উত্তর দিল "বাবু ছাদমে আছে দেখা হোবে।" বঙ্গভাষায় আলাপ করা সরমনের উচ্চাভিলাষ; কেহ তাহাকে হিন্দীতে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেও সে বাঙ্গালাতেই উত্তর দিত।

আগন্তুক তখন খট্‌ খট্‌ করিয়া সিঁড়ি উঠিতে লাগিল। সুরেন্দ্র উৎসুক হইয়া প্রতীক্ষায় রহিল।

"কে ও—রজনীদাদা যে!"

"সুরেন, ভাল আছিস?"

রজনীদাদা সুরেনেরই গ্রামের লোক। বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ বৎসর। কন্‌ট্রাক্‌টারী ব্যবসায় করেন। অনেক টাকা উপার্জ্জন।

হ্যারিসন রোড হইতে বিদ্যুতের আলোক আসিতেছিল—সে আলোকে সুরেন্দ্র দেখিল, রজনীর পায়ে রেশমী মোজা চিক্‌চিক্‌ করিতেছে—তদুপরি পম্পশু। গায়ে রেশমী পাঞ্জাবীর উপর জরির পাড় দেওয়া কোঁচান চাদর। চুল হইতে সেণ্টের ও মুখ হইতে মদের গন্ধ আসিতেছে।

"সুরেন ভাল আছিস?"

"ভাল আছি। হঠাৎ যে রজনীদাদা? খবর কি?"

রজনী বলিল, "একটা কথা আছে, এখানে বলব? তোর ঘরে চল্‌ না!"

সুরেন স্বর নামাইয়া বলিল "ঘরেও ত লোক আছে।"

রজনী বলিল, "তবে আয়, আমার সঙ্গে আয়। পথে বলব। নে চট্‌ করে জামা পরে একটা চাদর নে।"

এই বলিয়া রজনী চুরুট বাহির করিয়া দেশলাই জ্বালিল। সুরেন নামিয়া গেল।

পাঁচ মিনিট পরে দুইজনে রাস্তায় নামিল। দরজার কাছে একখানা ঠিকাগাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল, উঠিয়া রজনী বলিল, "আয়।"

সুরেন উৎসুক হইয়া বলিল, "কোথায় নিয়ে যাচ্চ আমায়? কি বলবে এইখানেই বল না।"

গ্রামে রজনীর সচ্চরিত্রতা সম্বন্ধে বিশেষ সুখ্যাতি নাই। সুরেনের মা তাহাকে কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বে বারংবার সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন যেন রোজোটার সঙ্গে মিশিয়া বিগড়াইয়া না যায়। সেই কথা সুরেনের মনে পড়িতে লাগিল।

রজনী বলিল, "আমি যাচ্চি থিয়েটারে। এখানে দাঁড়িয়ে বললে আমার দেরী হয়ে যাবে। পথে বলব। এইটুকু আর হেঁটে আসতে পারবিনে? ভারি নবাব হয়েছিস যে দেখছি! আয় আয়।"

সুরেন্দ্র উঠিল। রজনী গাড়োয়ানকে হুকুম দিল, "বিডিন ইষ্টিট্‌!"

॥ ২ ॥

গাড়ী চলিলে সুরেন জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপারখানা কি?"

"তোর জন্যে একটা প্রাইভেট টিউশন ঠিক করেছি।"

সুরেন খুসী হইয়া বলিল, "কোথায়? কত?"

"মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীটে। পঁচিশ টাকা।"

সুরেন শুনিয়া মহা খুসী। বলিল, "পঁচিশ টাকা? বল কি রজনীদাদা? কখন?"

"বিকেলে দু'ঘণ্টা।"

"কি পড়াতে হবে?"

"এক ঘণ্টা বাংলা, এক ঘণ্টা ইংরেজী।"

হঠাৎ সুরেনের মনে হইল, যখন অত টাকা, তখন বোধ হয় একাধিক ছাত্র; সুতরাং জিজ্ঞাসা করিল, "ক'টি ছেলে?"

রজনী বলিল, "একটিও না।" বলিয়া জোরে জোরে চুরুট টানিতে লাগিল।

সুরেন বলিল, "একটিও না! তার মানে কি?"

"ছেলে একটিও না। মেয়ে একটি।"

"মেয়ে? কত বড় মেয়ে?"

রজনী হাসিয়া বলিল, "তোর সে খোঁজে কায কি? তুই যাবি, পড়াবি। বয়স যতই হোক না।"

সুরেন অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "না, তাই জিজ্ঞাসা করছি।"

রজনী তখন উদার ভাবে বলিল, "বয়স পনেরো ষোলো।"

সুরেন বয়স শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ব্রাহ্ম?"

"না।"

"ক্রিশ্চান্?"

"না।"

"তবে কি? হিন্দু নাকি?" "তাই।"

"হিন্দু! অত বড় মেয়ে, পড়বে? কার মেয়ে, বাপের নাম কি?"

রজনী হাসিয়া বলিল, "খোদা জানে। মার নাম জিজ্ঞাসা করিস ত বলতে পারি।"

সুরেন উত্তরোত্তর অধিক আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি?"

"মার নাম আমোদিনী। বেঙ্গল থিয়েটারের আমোদিনী। নাম শুনেছিস?"

কিন্তু এ সংবাদে সুরেনের সমস্ত উৎসাহ নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "শুনেছি।"

রজনী বলিল, "কি বলিস?"

সুরেন্দ্র দৃঢ় ভাবে বলিল, "আমার দ্বারা হবে না।"

রজনী জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

সুরেন্দ্র উত্তেজিত ভাবে বলিল, "বেশ্যার মেয়েকে পড়াব? কখনই না।"

রজনী বলিল. "অতি গর্দ্দভ তুই! কেন, আপত্তিটা কি শুনি?"

সুরেন বলিল, "আপত্তি অনেক।"

"কি? এ উপার্জ্জন অনেষ্ট্ নয়?"

"অনেষ্ট্ হবে না কেন?"

"তবে? নিজে পাছে প্রলোভনে পড়ে যাস?"

সুরেন গর্ব্বিতভাবে বলিল, "সে ভয় করিনে।"

"তবে? তবে কি আপত্তি বল্।"

"বেশ্যার মেয়েকে পড়াব? লোকে শুনলে বলবে কি?"

রজনী একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিল। বলিল, "অতি গর্দ্দভ তুই! বি-এ পাস করে এমন কথাটা বললি? লোকে কি বলবে না বলবে সেই ভয়েই জড়সড়?"

সুরেন্দ্র চুপ করিয়া রহিল।

রজনী বলিল—"শোন্। ও আপত্তি কোন কাযের নয়। আর, লোকের জানবার দরকারই বা কি? পড়াতে যাচ্চিস না পড়াতে যাচ্চিস। কাকে পড়াতে যাচ্চিস, কোথায় পড়াতে যাচ্চিস, এত খবর তোর লোকের কাছে দেবার দরকার কি? তবে হ্যাঁ, যদি

বুঝিস নিজের মনে যথেষ্ট বল নেই, চরিত্র ঠিক রাখতে পারবিনে, তাহলে অবিশ্যি নেওয়া উচিত নয়। সেইটে বেশ করে বুঝে দেখ্ নিজের মনে।"

নিজের চরিত্রের বলের প্রতি সুরেনের অগাধ বিশ্বাস ছিল। এ কথায় তাহার আত্মাভিমান আঘাতপ্রাপ্ত হইল। সগর্ব্বে বলিল, "সে জন্যে ভেব না।"

রজনী বলিল, "তবে নে। টাকা নিয়ে কথা রে ভাই! যে টাকা দেবে তার কাষ করব। অমনি ত আর টাকা নিচ্ছিনে।"

সুরেন ভাবিয়া বলিল, "বাড়ীর লোকে যদি শোনে ত কি বলবে?"

রজনী বলিল, "অতি গর্দ্দভ তুই! বাড়ীর লোক জানবে কি করে? এ কলকাতা সহর সমুদ্দুর! কে কার খবর রাখে—তুইও যেমন!"

গাড়ী এই সময় থিয়েটারে পৌঁছিল। রজনী বলিল, "তা হলে কি বলিস? আজ আমোদিনীর সঙ্গে দেখা হবে আমার—কি বলব?"

সুরেন একবার মনে করিল বলি—'না।' আবার ভাবিল, 'এত তাড়াতাড়ি কি—না হয় দু'দিন পরে বলব।' বলিল, "রজনীদা, ভেবে তোমায় দুই একদিন পরে বলব।" বলিয়া বিদায় চাহিল।

রজনী বলিল, "আচ্ছা, তা যে রকম হয় আমায় লিখিস. কিন্তু ঐ কথা রে ভাই। যদি বুঝিস নিজে ঠিক থাকতে পারবি, নিজের মনে এক চুল এদিক ওদিক হবে না—তবেই নিস। আমরা ত বয়ে গেছিই। তোরা এখন ছেলেমানুষ আছিস—গোড়া থেকে সাবধান হওয়া ভাল।"—বলিয়া রজনী থিয়েটারে প্রবেশ করিল।

সুরেনও ধীরপদে ভাবিতে ভাবিতে বাসায় আসিল।

॥ ৩ ॥

সে রাত্রি সুরেনের ভাল নিদ্রা হইল না। অনেক ভাবিল। পরদিনও সারাদিন ভাবিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, যদি কাযটা অস্বীকার করি তবে রজনীদাদা ভাবিবে নিজের চরিত্রবলের প্রতি যথেষ্ট বিশ্বাস নাই বলিয়াই অগ্রসর হইল না। এই ভাবের সহিত—অর্থকৃচ্ছ্রতাও মনে প্রবলরূপে আধিপত্য করিতে লাগিল। পঁচিশ টাকা। দশ টাকা আর পঁচিশ টাকা—পঁয়ত্রিশ টাকা। যদি মাসে কুড়ি টাকা করিয়া খরচ করি, তাহা হইলে পনেরো টাকা করিয়া জমিবে। তিন বৎসর যদি মাসে পনেরো টাকা করিয়া জমে, তাহা হইলে পাঁচশত টাকারও উপর হাতে হইবে; ওকালতী পাস করিয়া তাহা লইয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিতে পারিব।

আবার ভাবিল, তিন বৎসর ধরিয়া যদি আমি ঐ বেশ্যার মেয়েটাকে পড়াই, তাহা হইলে কি জানাজানি হইতে বাকী থাকিবে? ছি ছি ছি—সে বড় কেলেঙ্কারি হইবে।

অবশেষে স্থির করিল, এক কায করা যাউক। এখন কাযটা লই। এ দিকে অন্য প্রাইভেট টিউসন জুটাইবার জন্য চেষ্টাও করিতে থাকি। আর একটা সুবিধামত জুটিলেই ওটা ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে। রজনীদাদা যাহা বলিয়াছে ঠিকই বটে—পরিশ্রম করিব, টাকা লইব—কিরূপ লোকের টাকা অত আমার হিসাব করিবার দরকার কি?

জানাজানির ভয়টা যখনই মনে উদিত হইতে লাগিল, তখনই কিন্তু তাহার উৎসাহ ভারি কমিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু তাহারও ঔষধ রজনী দিয়া গিয়াছে। 'কলকাতা সহর সমুদ্দুর—কে কার খবর রাখে!'

ভাবিয়া চিন্তিয়া রজনীদাদাকে চিঠি লিখিতে বসিল। চিঠি শেষ করিয়া, খামে ভরিয়া, সতর্ক সুরেন্দ্রনাথ ভাবিল—কাগজে কলমে এর সাক্ষী সাবুদ রাখি কেন? যাই, মুখেই গিয়া রজনীদাদাকে বলিয়া আসি।

চিঠি ছিঁড়িয়া, আগুন জ্বালিয়া পোড়াইয়া ফেলিল। বাহির হইয়া বউবাজারে রজনী-দাদার বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, বন্ধুগণ সমভিব্যাহারে রজনী পাশা খেলি-

তেছে ও মদ খাইতেছে।

সুরেন খানিক বসিয়া খেলা দেখিল। একটা বাজি শেষ হইলে রজনী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কিরে, খবর কি?"

সুরেন বলিল, "খবর ভাল। একটা কথা বলতে এসেছিলাম।"

রজনী বলিল, "ওঃ, আচ্ছা দাঁড়া।"—বলিয়া তাহার গেলাসের মদটুকু নিঃশেষ করিয়া বলিল, "আয়।"

দুইজনে একাকী হইলে রজনী বলিল, "কি ঠিক করলি?"

সুরেন বলিল, "নেওয়াই ঠিক করলাম?"

রজনী বলিল "তা বেশ; কিন্তু খুব সাবধান রে ভাই! ধরি মাছ না ছুঁই পানি, বুঝেছিস ত! তোকে জানি ছেলেবেলা থেকে তুই অতি সৎ ছোকরা, তাই সাহস ক'রে তোকে এ কাযে যেতে দিচ্চি। আমি আমোদিনীকে গর্ব্ব করে বলেছি যে তুই অতি সচ্চরিত্র, কোনও রকম খেলাপ হবে না।"

সুরেন বলিল, "কেন রজনীদাদা, সচ্চরিত্রতা নিয়ে এত মারামারি কেন এসব লোকের?"

রজনী বলিল, "আঃ—এইটুকু বুঝতে পারলিনে, বি-এ পাস করেছিস! অতি গর্দ্দভ তুই। কেন, বলি শোন্। আমোদিনী একজন মস্ত অ্যাকট্রেস্। ওর ইচ্ছে, ওর মেয়েও একদিন একটা মস্ত অ্যাকট্রেস্ হয়। সেইজন্যে ভাল রকম লেখাপড়া শেখাচ্চে। ওরা প্রথম প্রথম মেয়ে পড়াবার জন্যে বুড়োগোছ পণ্ডিত-টণ্ডিত রাখত; কিন্তু বুড়ো হলে হবে কি—বুড়োদের প্রাণে আবার বেশী সখ! পড়ায় না—খালি ইয়ার্কি দেয়। কেউ কেউ মেয়ে নিয়ে চম্পটও দিয়েছে। তাই ওরা এখন ভাল লোক চায়। কলেজের সচ্চরিত্র দেখে লোক রাখলে কোনও ভয় থাকে না—এই জন্যে আর কি—বুঝেছিস?"

সুরেন বলিল, "ওঃ—তা বটে।" ভাবিতে তাহার মনে বেশ একটু গর্ব্ব হইতে লাগিল যে, সে একজন কলেজের ভাল সচ্চরিত্র শ্রেণীর লোক—নিজে যাহারা পাপ-পঙ্কে নিমগ্ন, তাহারাও এ বিশুদ্ধতার মূল্য বুঝে।

রজনী বলিল, "তবে ঠিকানা দিচ্চি। কাল কি পরশু একদিন যাস—গিয়ে সব ঠিক-ঠাক করে নিস।"

সুরেন বলিল, "না রজনীদাদা, আমি একলা যেতে পারব না।"

"কেন? মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট চিনিসনে?"

"তা চিনি, কিন্তু একলা যেতে পারব না রজনীদাদা।"

"অতি গর্দ্দভ তুই! আচ্ছা আসিস কাল বিকেলে, নিয়ে যাব এখন সঙ্গে করে।"

পরদিন রজনী সুরেনকে লইয়া গিয়া সমস্ত ঠিকঠাক করিয়া দিল।

॥ ৪ ॥

সুরেনের ছাত্রীর নাম নলিনী। পড়ে মেঘনাদবধ, সীতার বনবাস, আর রয়্যাল রীডার থ্রী। মেয়েটি বেশ বুদ্ধিমতী। আর এমন শান্ত ও শিষ্ট—যেন গৃহস্থঘরের মেয়ে। ইংরাজী কি পড়ে জিজ্ঞাসা করায় প্রথমে নলিনী বলিয়াছিল, 'রয়্যাল রীডার নম্বর থার্ড।' সুরেন সংশোধন করিয়া দিল, 'নম্বর থ্রী বলিবে, থার্ড হয় না।' তখনই বিনীতভাবে 'নম্বর থ্রী' বলিয়া নিজেকে বালিকা সংশোধন করিল।

শনিবার অবধি নিয়মিতভাবে সুরেন তাহাকে পড়াইল। তাহার মা আসিয়া মাঝে মাঝে পড়া শুনিয়া যাইত।

রবিবার ছুটি—রবিবারে আর পড়াইতে যাইতে হইবে না। সুরেন মনে মনে বলিল, 'আঃ বাঁচা গেল, আজ আর বেরুতে হবে না।' যতটা খুসি হইবার কথা, মন কিন্তু ততটা খুসি হইতে রাজি হইল না। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, মেয়েটি পরমা সুন্দরী।

পরের সপ্তাহে—পাঠের মাঝে মাঝে সুরেন একটু আধটু গল্প করিল। ভাগলপুরের

গল্প, আরও নানাদেশের গল্প, নানা বিষয়ের গল্প। গল্পের আধিক্যবশতঃ এক একদিন পড়ার কামাই হইয়া যাইত; সে অপব্যয়টুকু পুরাইয়া দিবার জন্য যেদিন সুরেন দুই ঘণ্টার একটু অতিরিক্তও থাকিত।

দ্বিতীয় সপ্তাহান্তে যে রবিবার আসিল, সেটা নিতান্তই নীরস মনে হইতে লাগিল। সেদিন নলিনীর কথা ভাবিতে ভাবিতে সে মনে করিল—আহা! মেয়েটির অদৃষ্টে কি আছে? এখনও অনাঘ্রাত কুসুমের মত নির্ম্মল, বিধাতার স্বহস্তনির্ম্মিত একটি শুভ্র আত্মা। এও কি পাপে পঙ্কিল হইবে—ইহাই ধ্রুব বিধান? ইহার বিশুদ্ধতা রক্ষার কোন উপায় কি নাই?

সে রাত্রে সুরেন স্বপ্ন দেখিল, যেন নদীর ধারে একটা শালবন, সেই শালবনে যেন নলিনীর সঙ্গে সে বেড়াইতেছে।

পরদিন পড়াইতে পড়াইতে স্বপ্নের গল্পটা নলিনীকে সুরেন বলিল।

নলিনী বলিল, "কি করে স্বপ্ন দেখে বলুন দেখি?"

সুরেন বলিল, "এ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন দিনের বেলা আমরা যা চিন্তা করি রাত্রে তাই স্বপ্ন দেখি।"

নলিনী বলিল, "না তা নয়। আমাদের আত্মা আছে কিনা! একজনকার আত্মা, যদি আর একজনকার আত্মার কাছে যায়, তাহলে দুজনেই স্বপ্ন দেখে। কিন্তু ঘুম ভাঙ্গলে শুধু একজনকার মনে থাকে, একজন ভুলে যায়।"

সুরেন বলিল, "বাঃ বেশ ত!"

মাষ্টারবাবু আসিলে ঝি রোজ টেবিলের উপর কয়েক খিলি পাণ রাখিয়া যাইত। একদিন সুরেন বলিল, "আজকের পাণটা খুব ভাল হয়েছে অন্য দিনের চেয়ে।"

নলিনী বালিকাসুলভ গর্ব্বে বলিল, "ভাল হয়েছে আজ?—আমি সেজেছি আজ মাষ্টার মশায়!"

সুরেন বলিল, "বটে! তুমি এমন পাণ সাজতে পার? আমাদের বাসায় যে পাণ সাজে, রাম রাম।"

পরদিন পাঠান্তে বিদায় লইবার সময় নলিনী সুরেনকে বলিল, "আপনাদের বাসায় পাণ ভাল হয় না বলছিলেন, গোটাকতক পাণ তৈরি করেছি নিয়ে যাবেন?"

সুরেন পাণ লইয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল, "ভারি লক্ষ্মী তুমি।"

নলিনীকে তাহার মাতা একটু স্বতন্ত্র রকমে পালন করিয়াছিল। তথাপি সুরেনের কাছে নলিনী যে জগতের সংবাদ পাইত, সে জগৎ নলিনীর কাছে সম্পূর্ণ নূতন: তাহার জগৎ, যে জগৎ আবাল্য তাহাকে ঘিরিয়া আছে সে জগতে এ জগতে কত প্রভেদ! সুরেন তাহার মার গল্প, কাকীমার গল্প, কাকার মেয়েদের বিবাহের গল্প যখন করিত, কি একটা অনির্দ্দিষ্ট আকাঙ্ক্ষায় নলিনীর হৃদয় ভরিয়া উঠিত। সুরেনের জগতের সংবাদ নলিনীর কাছে পিপাসার শীতল জলের মত লাগিত। সুরেনের প্রতি নলিনী একটা অপূর্ব্ব আকর্ষণ অনুভব করিতে লাগিল।

নলিনীর কণ্ঠস্বরের মধুরতায়, যৌবনের নবীনতায় ও অন্তরের সরসতায় সুরেনও যেন একটা নূতন জগৎ আবিষ্কার করিল। কিছু দিনে সে নিজের মানসিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিল; কিন্তু কোনও প্রতিকার-চেষ্টা করিল না। বুঝিল, মন তাহার বশের অতীত হইয়া গিয়াছে।

ক্রমে ক্রমে সুরেনের মনের অবস্থা এমন হইল যে নলিনীকে তাহার মন্দসংসর্গ হইতে উদ্ধার করাই সে তাহার একমাত্র পুরুষার্থ স্থির করিল। ইহাতেই তাহার মানব জন্মের সফলতা জ্ঞান করিল। প্রেমের নির্দ্দেশে কর্ত্তব্যের পথ অতি সরল বোধ হইল। নলিনীর কাছে মনোভাব ব্যক্ত করিতেও বিলম্ব হইল না। তাহাকে শ্রদ্ধায়, আশায় ও সুখে পুলককম্পিত ও উচ্ছ্বসিত করিয়া বলিল—"আমি তোমার স্বামী, তোমায় না পেলে আমি

সুখী হব না; আমায় না পেলে তুমিও সুখী হবে না। তোমাকে আমার ধর্ম্মপত্নী করব, লোকের কথার জন্যে ভয় করব না। পৃথিবী কি যথেষ্ট বৃহৎ নয়? আমরা এমন কোথাও যাব যেখানে লোকগঞ্জনা আমাদের অনুসরণ করতে পারবে না। কি খাব? পরিশ্রম করব;—আবশ্যক হয় দুজনে পরিশ্রম করব। দুবেলা না জোটে, একবেলা খেয়ে থাকব। তাতেও আমরা সুখে থাকব।—"

অন্ধকার হইয়া আসিতেছিল। ঝি আলো আনিল। সুরেনের সম্মুখে নলিনীর অনুবাদের খাতা ছিল, তাহা সংশোধনের জন্য দক্ষিণ হস্তে সে কলম ধরিয়াছিল। কিন্তু তাহার বাম হস্ত নলিনীর হস্তে সংযুক্ত ছিল। যখন ঝির পদধ্বনি শুনা গেল, তখন দুইজনেই ত্রস্ত হইয়া হাত সরাইয়া লইল।

॥ ৫ ॥

ইহার পর চারিটি সপ্তাহ সুরেন ও নলিনী পরস্পরের নেশায় ভরপুর মাতিয়া রহিল।

সোমবার বৈকালে পড়াইতে গিয়া সুরেন শুনিল, নলিনী নাই—সে তাহার মাসীর বাড়ী গিয়াছে। আমোদিনী আসিয়া বলিল—নলিনী এখন মাসকতক সেখানে থাকিবে, কলিকাতার জলবায়ু তাহার সহ্য হইতেছিল না। আবার যখন আসিবে, যদি প্রয়োজন হয় তবে আবার আমোদিনী সুরেন্দ্রকে সংবাদ পাঠাইবে। এই বলিয়া সুরেনের প্রাপ্য আমোদিনী চুকাইয়া দিল।

সুরেন চলিয়া গেল, কিন্তু বাসায় গেল না। গড়ের মাঠে গিয়া একটি নিভৃত স্থান খুঁজিয়া, ঘাসের উপর বসিয়া রহিল।

ভাবিতে লাগিল—এ কি হইল? বিনা মেঘে এ বজ্রাঘাত কেন? শনিবারে যখন নলিনীর কাছে বিদায় লইয়াছে, তখন নলিনী কিছুই জানিত না, জানিলে অবশ্যই সুরেনকে বলিত। সহসা এ কি হইল?

গিয়াছে, তাহাও দুই চারি দিনের জন্য নয়। কয়মাস থাকিবে তাহারও অবধি স্থিরতা নাই। কলিকাতার জলবায়ু সহ্য হইতেছিল না! বাজে কথা। আজ দুইমাস প্রতিদিন তাহাকে দেখিতেছে, একদিনও ত সেরূপ মনে হয় নাই।

অন্ধকার হইল; আকাশে নক্ষত্র, অদূরে গ্যাস জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি হইল।

নলিনী একদিন তাহাকে বলিয়াছিল, তাহার সম্মুখে অনেক বিপদ। সুরেনের এখন মনে হইতে লাগিল, সেই কথার সঙ্গে এ ঘটনার কোথাও সংযোগ আছে। হয়ত তাহার মাতা তাহার উপর কোনও জুলুম করিতেছে। নলিনী এখন কি অবস্থায় কোথায় আছে, মনে করিতে সুরেনের চক্ষু দিয়া টস্‌টস্‌ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

এই একমাসে কত ঘটনা, কত সুখ, কত হাসি, কত মিষ্ট কথা মনে পড়িতে লাগিল। কত স্বপ্ন দেখা—সেই স্বপ্নের জাগ্রৎ অনুকরণ, কত মানাভিমান মনে পড়িতে লাগিল। যত মনে পড়ে, তত যেন বুক ফাটিয়া যায়।

আর দেখা হইবে না।

ক্রমে ঘাসের উপর সুরেন শয়ন করিল। রাত্রি দশটা অবধি বালকের মত কাঁদিল। দশটা বাজিলে, উঠিয়া ধীরে ধীরে বাসায় আসিল।

সপ্তাহ কাটিল; সপ্তাহ পরে শোক অনেকটা লঘু হইল। তখন মনে হইল—উঃ খুব বাঁচিয়া গিয়াছি! কোথায় ভাসিয়া যাইতেছিলাম? কি সর্ব্বনাশটাই হইতে বসিয়াছিল! কি মোহেই পড়িয়াছিলাম! ভগবান এ জাল কাটিয়া দিলেন—এ পরম সৌভাগ্য। নিজে কাটিতে পারিতাম না। কোথায় গিয়া দাঁড়াইতাম কে জানে! যদি শুনিতাম তাহার মাতা তাহার প্রতি অত্যাচার করিতেছে, তাহা হইলে হয়ত তাহাকে লইয়া কোথাও চলিয়া যাইতাম। তাহা হইলে জন্মের মত যাইতাম আর কি! এ জীবনে সে ভাঙ্গা আর যোড়া লাগিত না।

দুই সপ্তাহ পরে সুরেন সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিল।

পূজার ছুটির আর দুই সপ্তাহ বাকী। বিকালবেলা সুরেন বাসার ছাদে বেড়াইতে

বেড়াইতে বঙ্কিমবাবুর 'ধর্ম্মতত্ত্ব' পড়িতেছিল, ঝি আসিয়া তাহার হাতে একখানি চিঠি দিল। শিরোনামা দেখিয়া সুরেনের বুক কাঁপিয়া উঠিল—নলিনীর হস্তাক্ষর।

চিঠির ছাপ দেখিল—ভবানীপুর।

চিঠি খুলিল। তাহা এইরূপ।

৪৪/১নং নীলমণি বসুর গলি,
ভবানীপুর

প্রিয়তম,

আজ একমাস তোমায় দেখি নাই, কিন্তু বাঁচিয়া আছি। বড় কষ্টে আছি। বেশী লিখিবার সময় নাই। এখানে আমি অত্যন্ত কড়া পাহারায় আছি। যে বৃদ্ধা আমার রক্ষয়িত্রী তাহার কন্যা আসিয়াছে। আমি তাহার সহিত ভাব করিয়া তাহারই সাহায্যে এ পত্র ডাকে দিবার আয়োজন করিয়াছি।

যেদিন তোমার সঙ্গে শেষ দেখা, সেদিন সন্ধ্যাবেলা মা আমার প্রতি ভারি অত্যাচার করে। আমি অনেক কাঁদি। মা আসিয়া তোমার কথা জিজ্ঞাসা করে—আমি স্বীকার করি যে আমি তোমায় ভালবাসি। মা বলিল—তুমি ভিক্ষুক নিজে খাইতে পাও না ইত্যাদি। যদিও বা আমায় বিবাহ কর, লোকগঞ্জনায় অপমানে অস্থির হইয়া দুইদিন বাদেই আমাকে পরিত্যাগ করিবে। আরও বলিল, আমি আর তোমায় দেখিতে পাইব না, তোমায় ভুলিতে হইবে। পরদিন প্রাতে আমায় এইখানে আনিয়া রাখিয়া গেল।

আমি এ একমাস অনেক ভাবিয়াছি। তোমার সঙ্গে যে আমার চিরবিচ্ছেদ হইল এ কথা এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমার মনে স্থান পায় নাই। একদিন আমাদের মিলন হইবে এ আশা এক মুহূর্ত্তের তরেও আমি পরিত্যাগ করিতে পারি নাই।

আমাদের মিলন হইলে তোমার অবস্থা কি হইবে তাহাও আমি ভাবিয়াছি। লোকে তোমায় কি বলিবে তাহা মনে করিতে আমার বুক ফাটিয়া যায়। আমার একার সুখের জন্য হইলে আমি তোমার জীবনের পথ হইতে সরিয়া যাইতাম, কিন্তু হে আমার স্বামী, আমায় না পাইলে তুমিও সুখী হইবে না এ বিশ্বাস তুমি আমার মনে জন্মাইয়াছ। তোমার সুখের ও আমার সুখের জন্য, আমাদের মিলনই আমি আকাঙ্ক্ষা করি।

আমার এ পত্রের উত্তর তুমি ডাকে দিও না। কাল সন্ধ্যাবেলা চিঠি হাতে করিয়া আসিও। ভবানীপুরে যে পদ্মপুকুর আছে, তাহার উত্তর পশ্চিম কোণে দাঁড়াইয়া থাকিও। একজন স্ত্রীলোক তোমার নাম করিয়া ডাকিবে, তাহার হাতে পত্র দিও, তাহা হইলে আমি পাইব।

তোমারই নলিনী

পুঃ। ঠিক সাতটার সময় আসিও।

পত্র পড়িয়া সুরেন তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেল। ঝিকে ডাকিয়া দুই আনার জলখাবার আনিতে দিল। নিজের জিনিসপত্র গুছাইতে আরম্ভ করিল। বাসার লোককে বলিল, "বাড়ী হতে এইমাত্র চিঠি পেলাম, মার ভারি ব্যারাম, এখনি আমায় রওনা হতে হবে।"

জলখাবার আসিলে চাকরকে বলিল, "সরমন্ একখানা গাড়ী ডাক, জল্‌দি।"

গাড়ী আসিলে জিনিসপত্র লইয়া হাওড়ায় গেল। রাত্রি এগারটার সময় বাড়ী পৌঁছিল। মাকে বলিল, "কলকাতায় ভয়ানক কলেরা হচ্ছিল তাই পালিয়ে এলাম।

[ফাল্গুন, ১৩০৮]

বাস্তুসাপ

॥ ১ ॥

বৈঠকখানার ঘড়িতে চারিটা বাজিবামাত্র দিদিমার ঘুম ভাঙিয়া গেল। তিনি বিছানার উপর বসিয়া বলিলেন, "দুর্গা দুর্গা দুর্গা।" পাশে বিধবা নাতিনী সুরবালা ঘুমাইতেছে, তাহাকে ডাকিলেন, "সুরি ও সুরি, ওঠ্, আজ যে অমাবস্যে।"

জ্যৈষ্ঠমাস সারারাত্রি খুব গ্রীষ্ম গিয়াছিল। এখন খোলা জানালা দিয়া অল্প অল্প বাতাস আসিতেছে। সুরবালা গভীর নিদ্রায় মগ্ন। দিদিমা আর অপেক্ষা করিতে পারেন না; সূর্য্যোদয় হইয়া গেলে আর গঙ্গাস্নানের পূর্ণফল হইবে না। তাই আবার ডাকিলেন, "সুরি, ও সুরি!"

সুরবালা উঠিয়া বলিল, "ওমা তাই ত, ভোর হয়ে গেছে যে!"

দিদিমা বলিলেন, "সব জিনিসপত্তর গোছান আছে, চল্ শীগগির বেরিয়ে পড়ি।"

কাপড়, গামছা, নামাবলী ইত্যাদি লইয়া দুইজনে বাহির হইলেন। তখন অল্প আলো হইয়াছে। উঠানে নামিয়া দিদিমা অগ্রবর্ত্তিনী হইলেন; সুরবালা তাঁহার পশ্চাতে চলিল।

খিড়কী দরজার কাছে যে আতাগাছ আছে, তাহার নিকট আসিয়াই দিদিমা 'ওগো মাগো!' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

সুরবালা সভয়ে বলিল, "কি দিদিমা?"

দিদিমা বলিলেন, "হায় হায় হায়, সর্ব্বনাশ হয়েছে।"

সুরবালা বলিল, "কি? কি হয়েছে দিদিমা?"

দিদিমা অঙ্গুলি দিয়া আতাগাছের তলা দেখাইয়া দিলেন। ভয়ে ভয়ে নিকটে গিয়া সুরবালা দেখিল, একটি ছোট মোটা কালো সাপ, রক্তাক্ত কলেবরে মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

সুরবালা বলিল, "হ্যাঁ দিদিমা, বাস্তু?"

দিদিমা বলিলেন, "বাস্তু বইকি! দেখছিস নে? আহাহা! এমন মহাপাপ কে করলে? বাবা, কে তোমায় এমন করে হত্যে করলে?"

দিদিমার চক্ষু দিয়া টস্‌টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। গঙ্গাস্নানে যাওয়া আর হইল না। রান্নাঘরের বারান্দায় উঠিয়া বসিয়া, হরিনাম জপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার হাত ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল, হাতের মালা দুলিয়া দুলিয়া উঠিতে লাগিল।

দিদিমার ভাবগতি দেখিয়া সুরবালা কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল, "কি হবে দিদিমা?"

দিদিমা বলিলেন, "হবে আর কি—আমার মাথা হবে! ভিটেয় ব্রহ্মহত্যে হল। এ বংশ কি আর থাকবে? নির্ব্বংশ হয়ে যাবে! লক্ষ্মী ছেড়ে যাবে, লক্ষ্মী ছেড়ে যাবে। কাচ্ছাবাচ্ছা নিয়ে কোথায় দাঁড়াব হে নারায়ণ! হে মধুসূদন! হায় হায় হায়!"

একটা ঘোর আশঙ্কায় সুরবালার মন বিপর্য্যস্ত হইল। সে চলৎশক্তি রহিত হইল। পিতামহীর জানু জড়াইয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িল। এই সময় উঠানে দূরে শ্বেতবস্ত্র-পরিহিতা একটি নারীমূর্ত্তি দেখা গেল।

দিদিমা বলিলেন, "কেও, বউমা?"

"হ্যাঁ, কেন মা?"

"এদিকে এস।"

সুরবালার মা তাঁহার শ্বশ্রূঠাকুরাণীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া ভীতা হইলেন। কাছে আসিয়া বলিলেন, "এখনো গঙ্গাস্নানে যাওনি মা?"

"আর মা, গঙ্গাস্নানে যাব! মা গঙ্গা এখন শীগগির নিলে বুঝতে পারি। সর্ব্বনাশ হয়েছে।"

"কি? কি হয়েছে মা?"

দিদিমা সব শুনিয়া বলিলেন।

বধূ শুনিয়া কপালে করাঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "বেশ করে দেখেছ, বাস্তুবাবাই বটে?"

"বাস্তুবাবা বইকি! ঐ দেখ না, আতা-তলায় পড়ে রয়েছেন। আজ তিন পুরুষ ধরে অধিষ্ঠান করে রয়েছেন, বাবার কৃপায় কোনও বিপদ আপদ হয়নি! এইবার সংসার ছারখার হয়ে যাবে।"

ক্রমে বাড়ীর সকলে উঠিল। বাড়ীতে একটা বিভীষিকার আবির্ভাব হইল। সকলের মুখ শুষ্ক। কর্ত্তা উঠিয়া আসিলেন। তিনি দেখিয়া রাগে ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। বলিলেন, "কে এ কায করেছ বল, নইলে ঘরে দুয়ারে আগুন লাগিয়ে দেবো।"

এ কথা শুনিয়া সকলে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। এমন সময় একজন বলিল, "ঐ দেখ, আতাগাছের তলায় রক্তমাখা লাঠি প'ড়ে রয়েছে। ভোজুয়ার লাঠি। আর কিছু নয়, সেই বেটার কায।"

সকলে বলিল, "নিশ্চয় ওরই কায।"

এই কথা বলিতে বলিতে ভোজুয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। সে একজন খোট্টা—কয়দিন হইল এ বাটীতে চাকর নিযুক্ত হইয়াছে। দেহের বর্ণটা মহিষের মত কালো। মাথার অগ্রভাগ কামানো। বয়স আন্দাজ কুড়ি বৎসর। এই নূতন বাঙ্গালা দেশে চাকরি করিতে আসিয়াছে।

কর্ত্তা তাহাকে বলিলেন, "ভোজুয়া ইধার আও।"

ভোজুয়া তাঁহার কাছে গিয়া মুখপানে চাহিয়া রহিল।

তিনি বলিলেন, "তোম্ সাপ মারা হ্যায়?"

ভোজুয়া সগর্ব্বে বলিল, "হাঁ হাম্ মারা হ্যায়।"

"কাহে মারা?"

"সাঁপ আদ্‌মিকা দুষমণ হ্যায়, মারেগা নেহি? মারা ত ক্যা হুয়া?"

কর্ত্তা বলিলেন, "ক্যা হুয়া রে শালা? তোর বাবার সাপ?"

ভোজুয়া পিছু হটিয়া উদ্ধতভাবে বলিল, "মু সামালকে বাত করনা বাবু।"

এই কথা শুনিবামাত্র কর্ত্তা ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া, পাগলের মত ভোজুয়ার উপর পড়িলেন। পা হইতে চটিজুতা খুলিয়া পটাপট তাহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন। গলা ধরিয়া 'নিকাল যাও শালা, নিকাল যাও' বলিতে বলিতে দরজার বাহির করিয়া দিলেন।

॥ ২ ॥

ক্রমে বেলা হইল, রৌদ্র উঠিল। প্রতিবেশীরা একে একে আসিয়া সহানুভূতি ও সান্ত্বনা দান করিতে লাগিল।

সংবাদ পাইয়া পুরোহিত আসিলেন। দিদিমা তাঁহার কাছে গিয়া বলিলেন, "বাবা এ বিপদে রক্ষে কর। আমার সংসার যাতে বজায় থাকে বাবা তাই কর।"

পুরোহিত বলিলেন, "ভয় কি মা, কোনও ভয় নেই। তোমরা ত আর করনি—তোমাদের কোন অপরাধ নেই। তবে ভিটেয় ব্রহ্মরক্তপাত হল, এইটেই বড় দুর্ভাগ্যের বিষয়।"

একজন প্রতিবেশী বলিলেন, "পুরুত মশায়, এখন কর্ত্তব্য কি?"

"কর্ত্তব্য এখন—প্রথম কর্ত্তব্য সৎকার করা—ব্রাহ্মণোচিত সৎকার করতে হবে। শাস্ত্রানুসারে সর্পের মুখে একটা তাম্রখণ্ড দিয়ে, গঙ্গাতীরে নিয়ে গিয়ে দাহ করতে হবে।"

পাড়ার ছেলেরা যাই শুনিল গঙ্গাতীরে লইয়া গিয়া মৃত সর্পকে দাহ করা হইবে, তৎক্ষণাৎ তাহারা স্থির করিল সেদিন আর ইস্কুলে যাইবে না।

সর্পকে বহন করিবার জন্য খাটুলী প্রস্তুত হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "তোমরা কোন চিন্তা কোরো না! সর্পযোনিতে কষ্ট পাচ্ছিলেন, মুক্ত হয়ে গেলেন। তোমরা তিন রাত্রি অশৌচ গ্রহণ কর। ভাদ্রমাসে নাগপঞ্চমীর দিন ব্রাহ্মণকে স্বর্ণদান আর একটা প্রায়শ্চিত্ত ক'রে ফেলো, তা হলেই সর্ব্বপাপ থেকে মুক্ত হবে। বাস্তুসাপ হচ্ছেন কুলদেবতা কিনা। শাস্ত্রে প্রমাণ রয়েছে—

সর্ব্বে বাস্তুময়া দেবাঃ সর্ব্বং বাস্তুময়ং জগৎ
পৃথ্বীধরস্তু বিজ্ঞেয়োর্বাস্তুদেব নমোস্তুতে।"

এদিকে খাটুলি তৈয়ারী হইল। সর্পের মুখে তাম্রখণ্ড দিয়া খাটুলীতে তুলিয়া রাখা হইল। কিন্তু কোনও বয়স্ক লোক তাহা বহন করিতে রাজি হইল না। সকলেই বলিল 'সাপকে বিশ্বাস নেই, মরে আবার বেঁচে ওঠে শুনেছি। ছেলেরা বলিল "কুছ পরোয়া নেই; আমরা যাব।"

ক্ষুদ্র খাটুলিখানি দুইদিকে দুইজনে ধরিয়া লইয়া চলিল। পরিবারস্থ পুরুষগণ সকলেই পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। পথে ক্রমশঃ লোক বৃদ্ধি হইতে লাগিল। যখন শ্মশান-ঘাটে পেঁাছিল, তখন এত লোক জমিয়াছে যে গ্রামের জমিদার মরিলেও তত লোক জমিত কিনা সন্দেহ।

যথারীতি শবদাহ হইল। চিতাভস্ম গঙ্গাজলে ভাসাইয়া দিয়া সকলে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

॥ ৩ ॥

এই অস্বাভাবিক শোকের মধ্যে সারাদিন কাটিল। সন্ধ্যাবেলায় বড়ঘরের বারান্দায় বসিয়া কর্ত্তা ধূমপান করিতেছেন। দেওয়ালে একটি বাতি জ্বলিতেছে। সদর দরজা খোলা ছিল। আস্তে আস্তে ভোজুয়া আসিয়া উঠানে দাঁড়াইল। তাহার হাতে একটা বৃহৎ হাঁড়ি, মুখে ময়দা দিয়া সরা আঁটা।

ক্রমে সে আসিয়া বারান্দার নিম্নে দাঁড়াইল। দিদিমা দূর হইতে বলিলেন, 'কেরে, ভোজুয়া নাকি?' সে প্রথমতঃ চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। নিকটে কেহ কোথাও নাই। দেখিয়া বলিল—"বাবু হুয়া, তুমহারা এক্ঠো সাঁপ মার ডালা—উস্‌কা বদ্‌লা দোঠো সাঁপ লায়া, ইয়ে লেও।"—বলিয়া হাঁড়িটা দড়াম করিয়া কর্ত্তার পায়ের কাছে ফেলিয়া দিয়াই ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইল। হাঁড়ি ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে দুইটা সাপ বাহির হইয়া পড়িল।

কর্ত্তা মহাভীত হইয়া 'ওরে বাপ রে' বলিয়া লাফাইয়া পলাইতে গেলেন, কিন্তু সাপ দুইটা তাঁহার পায়ে দুই তিন ছোবল বসাইয়া দিয়া, দ্রুতবেগে কোথায় অদৃশ্য হইল। কর্ত্তার চীৎকারে বাড়ীশুদ্ধ লোক আসিয়া জড় হইল। আসিয়া দেখিল তিনি মাটিতে পড়িয়া চক্ষু অর্দ্ধমুদ্রিত অবস্থায় কেবল বলিতেছেন—'হরে নারায়ণ ব্রহ্ম. হরে নারায়ণ ব্রহ্ম।'

দিদিমা আকুল হইয়া তাঁহার মস্তক ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে যে ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, দূরে হইতে তিনি তাহা সকলই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। মনে করিলেন বাস্তুহত্যার প্রতিফল হাতে হাতেই আরম্ভ হইল। সুরবালা ও সুরবালার মা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বলিল, পুরোহিত ঠাকুরের স্বস্ত্যয়নে কোন ত্রুটি হইয়া থাকিবে, নয়ত বাস্তুবাবা তুষ্ট হইলেন না কেন?

উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে যে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান ছিল, সকলের কথা অনুসারে সে রোজা ডাকিতে ছুটিল। গ্রামের প্রান্তভাগে একজন বেদিয়া বাস করে, সে চারিপাশের বহু গ্রামের সর্প-বৈদ্য। বেদিয়া আসিলে তাহার কথায় প্রকাশ হইল, তাহারই নিকট হইতে একটা খোট্টা পাঁচ টাকা দিয়া একযোড়া সাপ কিনিয়াছিল।

বেদিয়া বলিল, "সেই খোট্টা শালারই এই কায? এমন জানলে কি আমি তাকে সাপ

বেচি মশাই? পাঁচ টাকা ছেড়ে পঞ্চাশ টাকা দিলেও দিতাম না। সে বললে আমি সাপ মেরে ওষুধ তৈরি করব। হায় হায় হায়!"

নাড়ী টিপিতে টিপিতে তাহার মুখ কিন্তু ক্রমে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। বলিল, "কোন ভয় নেই, আপনাদের আশীর্ব্বাদে আমার পুণ্যির জোরে, তাকে দুটো বিষদাঁত ভাঙ্গা সাপ দিয়েছিলাম দেখছি। আঃ বাঁচলাম। নরহত্যার পাপ থেকে মুক্ত হলাম! বিষের কোনও লক্ষণই নেই—শুধু একটু রক্তপাত হয়েছে আর ভয়ে অবসন্ন হয়ে পড়েছেন। কোনও চিন্তা নেই।"

দিদিমা বলিয়া উঠিলেন, "জয় মা দুর্গা।"

কর্ত্তা বলিলেন, "নিশ্চয়ই জান, বিষ ছিল না?"

বেদিয়া রাগিয়া বলিল, "আমি আর জানিনে মশাই? আমি হলাম গিয়ে সাপের রোঝা!"

সে যাত্রা কর্ত্তা রক্ষা পাইলেন। কিন্তু যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, খোট্টা চাকর আর বাড়ীর ত্রিসীমানায় আসিতে দেন নাই।

[বৈশাখ, ১৩০৯]

ভুলশিক্ষার বিপদ

বড়দিনের ছুটিটা মধুপুরে গিয়া যাপন করিবার জন্য তাগাদার উপর তাগাদা পাই-তেছি; না গেলে আর চলে না। মধুপুরে আমাদের একটি ছোট বাংগালা আছে। শীতকালে প্রায়ই আমাদের বাড়ীর কয়েকজন করিয়া সেখানে গিয়া অবস্থান করেন। এবার বড়দিদি নিজের পুত্র কন্যাদের লইয়া সেখানে অবতীর্ণ; সুরেন ভায়া একার বি-এ পরীক্ষা দিবেন—তিনি সেখানে আপন পাঠ অভ্যাস এবং পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে-ছেন। দিদির মেয়ে মিনি বা মেনকারাণী আমায় মারাত্মক রকম শাসাইয়াছে। লিখি-য়াছে—'এবার যদি তুমি না আসবে তবে আর তোমার মাথার একটিও পাকা চুল তুলে দেবো না—যাও।' আর কি করিয়া থাকি? সুতরাং জিনিষপত্র গুছাইয়া অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময় হাওড়া ষ্টেশনে উপনীত হইলাম।

উঃ—সেদিন কি ভীড়!—কিন্তু একটা এই শুভগ্রহ, শুধু ভদ্রলোকের ভীড়। অধিকাংশই নব্যযুবক—উত্তম পরিচ্ছদে আবৃত সুগন্ধময়। সকলেরই মুখ প্রফুল্ল, হাস্য পরিহাসে প্রদীপ্ত। মনে হইল যেন কলিকাতার অধিকাংশ তরুণবিরহী বুঝি করিয়া এই ট্রেণেই শ্বশুরালয় যাত্রা করিয়াছে। এরূপ জনসংঘ ক্লান্তিজনক নহে—বরং তাহার বিপরীত।

গাড়ী ছাড়িল। যুবকগণ উচ্চহাস্যে ও সিগারেটের ধূমে কক্ষবায়ু ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিল। ব্যাণ্ডেল অবধি খুব ভীড় রহিল—তাহার পর হইতে একটু কমিতে আরম্ভ করিল।

পাণ্ডুয়া ষ্টেশনে একটি স্থূলকায় ভদ্রলোক আসিয়া আমাদের কামরায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মাথায় একটি কালো কম্ফর্টার পাগড়ীর আকারে জড়ান—চোখে রূপার ফ্রেমযুক্ত চশমা, দেহটি একযোড়া সেকালের দোঁড়দার হাঁসিয়াযুক্ত গঙ্গাজলী শালে আবৃত; পায়ে ফুলমোজার উপর ইংরাজি জুতা। বয়স বোধ করি ষাটের কাছাকাছি হইবে।

বাবুটির সংগে অনেক লোক আসিয়াছিল, জিনিসপত্রও বিস্তর। জিনিসপত্রে কামরা বোঝাই হইয়া গেল। নীচে হইতে একজন বলিল, 'সব উঠেছে ত—একবার গুণে নিন।' শ্রবণমাত্র বাবুটি 'এক' 'দুই' করিয়া উচ্চৈঃস্বরে জিনিস গণনা আরম্ভ করিলেন, গাড়ী ছাড়িবারও ঘণ্টা দিল।

দুইবার গণনা করিয়া বাবুটি বলিলেন, "ওরে ছ'টা কেন রে—কি ওঠেনি রে দ্যাখ্ দ্যাখ্।"

তখন গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাবুটি হঠাৎ জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়া প্রাণপণে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"হাঁড়িটা—হাঁড়িটা—"

একজন গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া আসিল, তাঁহার হাতে হাঁড়িটা দিতে গেল। কিন্তু তিনি ধরিতে পারিলেন না; হাঁড়িটা পড়িয়া গেল। আমরা ভাঙিয়া যাওয়ার শব্দটা শুনিতে পাইলাম।

ভদ্রলোকটি তখন ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া সবেগে বেঞ্চের উপর বসিয়া পড়িলেন। উপস্থিত ব্যক্তিমণ্ডলীর মধ্যে আমাকেই একটু 'মুরুব্বি' গোছ দেখিয়া বলিতে লাগিলেন —"দেখলেন মশাই? একবার কাণ্ডখানা দেখলেন? দিলে হাঁড়িটে ফেলে!"

আমি লোকটার এই নালিসে অত্যন্ত আমোদ অনুভব করিলাম। কষ্টে হাসি চাপিয়া বলিলাম, "কি ছিল হাঁড়িতে?"

"মশাই—খাবার ছিল। এক হাঁড়ি খাবার ছিল—দু'টাকার মাল। গেল প্ল্যাটফর্মে প'ড়ে ধুলো মাখামাখি হয়ে। ভোগে হল না। সেই বাড়ী থেকে পৈপৈ করে বলতে বলতে আসছি—ওরে দেখিস, যেন খাবারের হাঁড়িটে ভুলে যাসনে—ওরে দেখিস, যেন খাবারের হাঁড়িটে ভুলে যাসনে।—তা সেই খাবারের হাঁড়িটেই ভুলে গেল? এক হাঁড়ি খাবার মশাই! ভোগে হল না। আমি আবার বাজারের খাবারগুলো খাইনে কিনা। ও আমার আদৌ সহ্য হয় না। আমি যেখানে যাই, নিজের খাবার নিজে সঙ্গে করে নিয়ে যাই। আমার পিসিমা আজ ভোর পাঁচটার সময় উঠে লুচি ভাজতে বসেছেন। (এখানে বাবুটি আঙুল গণিতে আরম্ভ করিলেন) লুচি ছিল, কচুরি ছিল, আলুভাজা ছিল, বেগুনভাজা ছিল, মোহনভোগ ছিল মোল্‌নাইয়ের গোল্লা ছিল আধসের—মোল্‌নাইয়ের গোল্লা খেয়েছ কখন?"

বক্তৃতার আরম্ভ হইতে সহযাত্রী যুবকগণ মুখ টিপিয়া হাসিতেছিল; এই প্রশ্নে হাহা করিয়া হাসিয়া ফেলিল। আমি যথোচিত গাম্ভীর্য্য সহকারে বলিলাম, "কই মনে ত পড়ে না।"

বাবুটি বলিলেন, "তা হলে খাওনি। খেলে মনে থাকত। সে ভোলবার জিনিস নয়।"

আমি বলিলাম, "খুব সম্ভব।"

"মোল্‌নাইয়ের গোল্লার নামডাক শোননি?"

"না—ও বিষয়ে বড় চর্চ্চা রাখিনে।"

"কোথা থেকে আসছ?"

"কলকাতা।"

"নিবাস?" "কলকাতা।"

"আঃ—নিতান্ত ক্যাল্‌কেশিয়ান্ তুমি! আচ্ছা মোল্‌নাইয়ের গোল্লার একটা গল্প বলি শোন। দাঁড়াও তামাক একছিলিম সেজে নিই।" এই বলিয়া তিনি তামাক সাজিতে লাগিলেন।

এতকাল রেলপথে যাতায়াত করিতেছি, এমন অদ্ভুত মনুষ্যের সঙ্গে কখনও সাক্ষাৎ হয় নাই। হায় হায়, এমন বক্তা বঙ্গীয় রাজনীতিক্ষেত্রে স্থান পাইল না! মনে করিলাম, একটা বড় সুবিধা হইয়াছে। মধুপুরে ট্রেণটা পৌঁছে অতি বিশ্রী সময়ে—ঠিক ঘুমের সময়। ঘুমাইয়া পড়িলে মধুপুর ছাড়িয়া যাওয়ার আশঙ্কা। এই বাগ্মীবরের কল্যাণে জাগিয়া থাকিতে পারিব; নিদ্রাদেবী দূরে থাকিয়া নিজ মান রক্ষা করিবেন।

তামাক সাজিতে সাজিতে বৃদ্ধ বলিলেন, "বাবুর নাম?"

"মহানন্দ চট্টোপাধ্যায়।"

"আমার নাম শ্রীমদনগোপাল দেবশর্ম্মা মুখোপাধ্যায়। নিবাস মোল্‌নাইয়ের নিকট ইলছোবা গ্রাম। জেলা বর্দ্ধমান। যজ্ঞেশ্বর পণ্ডিতের সন্তান আমরা, নৈকষ্য কুলীন। যজ্ঞেশ্বর পণ্ডিতের সাত পুত্র ছিলেন—

যজ্ঞেশ্বরের সুত সাত
শঙ্কর জানকীনাথ।
আমরা সেই শঙ্কর জানকীনাথের সন্তান।"

এ বক্তৃতাটি এত সংক্ষিপ্ত হইল, তাহার কারণ মদনগোপালবাবু কলিকায় ফুঁ দিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার মুখভাব কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে করুণভাবাপন্ন ছিল—তাহার কারণ বোধ হয় সদ্যপ্রাপ্ত সন্দেশের শোক। এখন বরং একটু গর্ব্বিত দেখাইতে লাগিল; তাহা বোধ হয় কুলগৌরবের স্মৃতিজনিত। যাহা হউক, আমি পরম কৌতুকের সহিত লোক-টির পানে চাহিতে লাগিলাম। গাড়ীও বর্দ্ধমানে পৌঁছিল।

আমার চুরুট ফুরাইয়াছিল, নামিয়া কেলনারে গেলাম চুরুট কিনিতে। যতক্ষণ গাড়ী ছাড়িবার শেষ ঘণ্টা না হইল, ততক্ষণ প্ল্যাটফর্ম্মের উপর পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

গাড়ী ছাড়িলে দেখিলাম, আর সকলে নামিয়া গিয়াছে, শুধু আমরা দুইজনে আছি। মদনগোপালবাবু আমার প্রতি নেত্রপাত করিয়া বলিলেন, "তারপর—সদানন্দবাবু—"

আমি বাধা দিয়া বলিলাম, "আজ্ঞে আমার নাম মহানন্দ।"

"ওহো ঠিক ঠিক। মহানন্দবাবু, কতদূর যাওয়া হবে?" "মধুপুর।"

"আমি যাব কাশী। তুমি ত এখান পৌঁছে যাবে হে! দু ঘণ্টা কি তিন ঘণ্টা জোর! আমার যেতে হবে আজ সমস্ত রাত, কাল সমস্ত দিন। তাই ত বলছি কিনা, এই সমস্ত রাত সমস্ত দিন যে গাড়ীতে কাটবে, কি খেয়ে প্রাণধারণ করি? কাল সন্ধ্যা-বেলা কাশী পৌঁছে যাব এখন! কাশীতে আমার মা ঠাকরুণ রয়েছেন কিনা। আজ তিন বৎসর তিনি কাশীবাসী। বৃদ্ধ হয়েছেন—বয়স সত্তর বৎসরের উপর হয়েছে। এখনও প্রত্যহ ভোরে উঠে দশাশ্বমেধ ঘাটে গিয়ে স্নান করে আসেন—কি শীত—কি গ্রীষ্ম—কি বর্ষা—কি বাদল। গত ভাদ্র মাস থেকে একটু একটু ঘুস্‌ঘুস্ করে জ্বর হচ্চে শুনেছি। তাই একবার ভাবলাম দেখে আসি। আছেন ভাল জায়গাতেই—কোন চিন্তার কারণ নেই। তবে কিনা কাণে শুনে, সন্তান হয়ে কি করে চুপ করে থাকি বলুন। আমার গুরুদেবের মধ্যম পুত্রটি কাশীর কলেজে অধ্যাপক, সপরিবারে থাকেন সেখানে, সেইখানেই আমার মা ঠাকরুণকে রেখে দিয়েছি। গুরুপুত্রটি অতি উপযুক্ত লোক। ন্যায়ে তাঁর সমকক্ষ কাশীতে নেই বল্লেই হয়। আমারই বয়স, একত্র খেলা করতাম সেই অল্প বয়স থেকেই বুদ্ধির সূক্ষ্মতা দেখা গিয়েছিল—"

আমি বলিলাম, "মশাই চুরুট খান কি?"

"চুরুট? খাই কখনও কখনও। ছেলেবেলায় যখন কলকাতায় ছিলাম, ইংরেজি পড়তাম, তখন খুবই খেতাম। তখন তোমাদের ও বাড়সাই ফাড়সাই ওঠেনি।—ভাল চুরুট?"

আমি বলিলাম, "মন্দ নয়, দেখুন না!"—বলিয়া আমার সিগার-কেস খুলিয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিলাম। তিনি একটি চুরুট লইয়া ধরাইয়া লইলেন; আমিও একটি ধরাইলাম।

গাড়ী তখন রাণীগঞ্জ পার হইয়াছে। দুইধারে অনেক কয়লার খনি। স্থানে স্থানে স্তূপাকার কয়লায় আগুন ধরাইয়া দিয়াছে—খুব আলো হইয়াছে। কাছে খোলা ইঁট সাজাইয়া অস্থায়ী ঘর নির্ম্মাণ করিয়া কুলিরা বসিয়া আছে—কেহ বা খাদ্য পাক করিতেছে।

আমারও ক্ষুধা পাইয়াছিল। ভাবিলাম এইবেলা কিছু খাইয়া লই। সঙ্গে আমার টিফিন বাস্কেট ছিল, তাহাতে বাড়ী হইতে খাবার আনিয়াছিলাম। মদনগোপালবাবুর জিনিসপত্র সরাইয়া কষ্টে টিফিন বাস্কেট বাহির করিলাম। ভাবিলাম, আমি আহার করিব, আর আমার এই সহযাত্রীটি অভুক্ত থাকিবেন? অথচ যদি আহ্বান করি, তবে খাইবেন কিনা তাহারও স্থিরতা নাই—কারণ আমার এ জিনিসগুলি ঠিক হিন্দুধর্ম্মসংগত নহে। ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলাম, বলিয়াই দেখি, খান উত্তম—না খান কি করা যাইবে?

টিফিন বাস্কেটটি বেঞ্চের উপর তুলিয়া, খুলিয়া বলিলাম, "মদনবাবু—আপনি খাবার যা এনেছিলেন, তা ত গেল। আমার সঙ্গে কিছু খাবার রয়েছে। যদি আপত্তি না থাকে আপনার, তবে দুজনে খাওয়া যায়!"

মদনবাবু আমার বাস্কেটের প্রতি ঔৎসুক্যপূর্ণ নেত্রপাত করিয়া বলিলেন, "কি আছে তোমার ওতে?"

আমি (আঙ্গুল না গণিয়া) বলিলাম, "রুটি আছে, ডিম আছে, দু'তিন রকম মাংস আছে, মাখন-টাখন আছে।" "হিন্দু মাংস? হোটেলের নয় ত?"

"মাংস হিন্দু। আমার বাড়ীর ব্রাহ্মণের পাক করা, শুধু রুটিটি হোটেলের—নইলে আর সব জিনিস বিশুদ্ধ হিন্দুমতে তৈরী।"

মদনবাবু বলিলেন, "তা হোক, হোটেলের রুটিতে আপত্তি নেই। যখন কলকাতায় ছিলাম, ইংরেজি পড়তাম, তখন হোটেলের রুটি ঢের খেয়েছি। কত কি খেয়েছি! সে সব দিনে ছাত্রসমাজ ভারি উচ্ছৃংখল ছিল।"—বলিয়া তিনি হাস্য করিতে লাগিলেন।

আমি আর বাক্যব্যয় না করিয়া, মাংসাদি বাহির করিয়া প্লেট সাজাইলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "ছুরী কাঁটা ব্যবহার করেন কি?"

"না ভাই, ওসব পোষাবে না। দাও হাতে করেই খাই।"

খাইতে খাইতে মদনগোপালবাবু হিন্দুধর্ম্ম-বিষয়ক এক বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। তাহার সার মত এই যে, মুসলমানের হাতে খাইতে নাই এ কথা শাস্ত্রে পাওয়াই যাইতে পারে না; কারণ শাস্ত্র যখন তৈয়ারি হইয়াছিল তখন মুসলমান জন্মগ্রহণই করে নাই। তাহারা যখন আসিয়া আমাদের উপর অত্যাচার উৎপীড়ন আরম্ভ করিল, তখনই আমরা তাহাদের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ এ প্রকার লোকাচারের প্রবর্ত্তনা করিলাম।

মাংস ফুরাইলে মদনবাবুকে বলিলাম, "রুটি আরও রয়েছে। মাখন আছে, জ্যাম্ আছে, মার্ম্মালেড আছে, কি নেবেন?"

মদনগোপালবাবু বলিলেন, "মার্ম্মালেড? মার্ম্মালেড?—মার্ম্মালেড দাও একটু খেয়ে দেখি—কখনও খাইনি।"

দিলাম। আহারান্তে গেলাসে জল লইয়া জানালার বাহিরে তিনি হাত মুখ ধুইয়া ফেলিলেন। আবার শালখানি উত্তমরূপে দেহে জড়াইয়া বেঞ্চের উপর পা তুলিয়া উপবেশন করিলেন।

তাঁহাকে আর একটা চুরুট দিতে চাহিলাম, কিন্তু তিনি বলিলেন—"নাঃ—তামাক সাজি। হুঁকো কল্কের কাছে কেউ লাগে নারে দাদা!"

তামাক সাজা হইলে আমি বলিলাম, "কই মদনবাবু! সে মোলনাইয়ের গোল্লার গল্পটা বললেন না?"

তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ—ভুলে যাচ্ছিলাম। আমাদের আমলের কথা নয় এ—আমরা গল্প শুনেছি।—গল্পটা এই। বর্দ্ধমানের মহারাজ মোলনাইয়ের গোল্লা খেয়ে ভারি খুসী। তাই মহারাজ হুকুম করলেন—'মোলনাইয়ের যে প্রধান মোদক, তাকে নিয়ে এস, বর্দ্ধমানে ব'সে সে গোল্লা তৈরি করুক।' রাজার হুকুম, কি করে, প্রধান মোদক চাটু খুন্তী নিয়ে বর্দ্ধমানে উপস্থিত হল। গোল্লা তৈরি করলে, কিন্তু সে রকম স্বাদটি হল না। রাজা বললেন—'মোদকের পো! কই সে রকম ত হল না!' মোদক যোড়হস্ত করে বললে (এই স্থানে মদনগোপালবাবু স্বয়ং যোড়হাত করিলেন)—'মহারাজ ভয় ক'ব না নির্ভয় ক'ব?' মহারাজ বললেন—'ভয় ছেড়ে নির্ভয় কও।' মোদক বললে—'মহারাজ! মোল্নাই থেকে আমাকেই নিয়ে এসেছেন, মোল্নাইয়ের মাটিও আনতে পারেন নি, মোল্নাইয়ের জলও আনতে পারেন নি।'—বলিয়া মদনবাবু অত্যন্ত হাসিতে ও কাসিতে লাগিলেন। তাঁহার হাসি ও কাসি থামিলেই বলিলেন, "মোল্নাইয়ের গোল্লা না খেলে তার মর্ম্ম বুঝতে পারবে না। আচ্ছা আমি কাশী থেকে ফিরে আসি দাঁড়াও।

একটা রবিবার কি শনিবার আমাদের এখানে আসতে পার না?"

"অনায়াসে।"

"আচ্ছা, তা হলে তোমায় নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠাব—এস! ষ্টেশনে গোরুর গাড়ী পাঠিয়ে দেব—তোমায় নিয়ে যাবে। পাণ্ডুয়া থেকে ইলছোবা বেশী দূর নয়। মোলনাইয়ের গোল্লা খাইয়ে দেব—আর আমাদের দেশী মার্ম্মালেডও খাইয়ে দেব।"

আমি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম, "দেশী মর্ম্মালেড হয় নাকি? তা ত জানিনে।"

মদনগোপালবাবু হাসিয়া বলিলেন, "অ্যাঃ, তুমি নিতান্ত একবারে ক্যালকেশিয়ান্! খালের বাইরের আর কোন খবর রাখ না! ধানের গাছ দেখনি বোধ হয়? ধানের গাছের লাল লাল ফুল হয়, গুঁড়ি চিরে বড় বড় তক্তা হয়।"—বলিয়া তিনি পুনশ্চ হাসিতে ও কাসিতে আরম্ভ করিলেন। একটু সুস্থ হইয়া বলিলেন, "মার্ম্মালেড—বেলের মোরব্বা গো। কেন, কলকাতাতেও ত পাওয়া যায়।"

আমি চুরুটে একটা লম্বা টান দিয়া বলিলাম, "মাফ করবেন, মার্ম্মালেডের বেলের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই।"

"কি?"

"মার্ম্মালেডের সঙ্গে বেলের কোন সম্পর্ক নেই।"

"কেন? মার্ম্মালেড মানে কি? বেলের মোরব্বা নয়?" "না।"

"বিলক্ষণ! তুমি বললেই শুনব? আমরা ছেলেবেলায় পড়েছি মার্ম্মালেড মানে বেলের মোরব্বা।"

"মাষ্টার আপনাকে ভুল শিক্ষা দিয়েছিল।"

"বেলের মোরব্বা নয় ত কিসের মোরব্বা?"

"যদি মোরব্বাই বলেন ত কমলানেবুর মোরব্বা।"

এই কথা শুনিয়া মদনগোপালবাবু চমকিয়া উঠিলেন। ভীতস্বরে বলিলেন, "কমলানেবুর মোরব্বা?"

আমি ভাবিলাম ব্যাপারখানা কি? বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "কমলানেবুর বই কি।"

কমলানেবুর হলে একেবারে মিষ্টি হত। কমলানেবুর যদি, ত স্বাদ একটু মিষ্টির সঙ্গে কষা কষা কেন?"

"আমাদের এ রকম সাধারণ কমলানেবুর নয়। স্পেনে সেভিলদেশে একরকম কমলানেবু হয়, দেখতে ঠিক এই রকমই, তার স্বাদ একটু কষা। সেই নেবুতে মার্ম্মালেড হয়।"

মদনগোপালবাবুর মুখে ভয়ের স্থানে বিরক্তির চিহ্ন দেখা যাইতে লাগিল। বলিলেন, "ঠিক জান তুমি?" স্বরটি কিছু রুক্ষ।

"ঠিক জানি।"

মদনবাবু আমাকে ভেঙ্গাইয়া বলিলেন, "ঠিক জানি!"

অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলাম। ভয়ানক রাগও হইল। বলিলাম, "মশাই! মুখ ভেঙ্গানটা অনেকে ভদ্রতার লক্ষণ মনে করে না।" এই বলিয়া আমি জানালার দিকে পিঠ করিয়া বেঞ্চের উপর পা রাখিয়া কক্ষের ছাদে বাতির পানে চাহিয়া রহিলাম।

মদনগোপালবাবু বলিলেন, "মনে করে না ত রাজা করে! তোমার সঙ্গে কি আমার শত্রুতা ছিল? আমি আজ বিশ বচ্ছর কমলানেবু খাইনি—তুমি কি জন্যে আমায় কমলানেবু খাইয়ে দিলে?"

আমি বলিলাম, "কেন? কমলানেবু ত আর বিষাক্ত জিনিস নয়।"

"তোমার পক্ষে বিষাক্ত জিনিস না হতে পারে। আমার পক্ষে বিষাক্ত। আমি যখন কমলানেবু খাইনে, তখন তুমি কি জন্যে আমায় খাওয়ালে?"

বিরক্ত হইয়া বলিলাম, "মশাই কি আমায় সে কথা বলেছিলেন?"

মদনগোপালবাবু আবার মুখ ভেংগাইয়া বলিলেন, "মশাই কি আগে আমার সে কথা বলেছিলেন! তুমি কেন সেই সময়ে বল্লে না যে ওতে কমলানেবু আছে?"

লোকটার ব্যবহার দেখিয়া রাগে আমার সর্ব্বশরীর জ্বলিতে লাগিল। আমি বলিলাম, "আপনি ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করছেন!"

"যাও যাও ঢের দেখেছি তোমার মত কলকাতার বাবু। 'সীমা লঙ্ঘন করছেন!' ভদ্রতা শিক্ষা দিতে এসেছেন! ছুরী কাঁটা দিয়ে মাংস খেতে জানলেই ভদ্রলোক হয় না। একজন নিরীহ ব্যক্তি যা খায় না, তাকে তাই খাইয়ে দেওয়া খুব ভদ্রতা!"

আমি বলিলাম, "ক্ষিধেয় মরছিলেন—নিজের খাবার থেকে খেতে দিলাম, বেশ প্রতিফল তার!"

"ক্ষিধেয় মরছিলেন বইকি! তোমার কাছে কেঁদে পড়েছিলাম খাবার জন্যে!"

বিরক্ত হইয়া বলিলাম, "যা ইচ্ছে হয় বলুন।"—বলিয়া আমি কম্বল মুড়ি দিয়া বেঞ্চে শুইয়া পড়িলাম।

বাবুটি অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার স্বর নরম হইয়া আসিতে লাগিল। পাণ্ডুয়া ষ্টেশনে খাবারের হাঁড়ি লোকসানের শোক নূতন করিয়া উথলিয়া উঠিল। বলিতে লাগিলেন, 'খাবারের হাঁড়িটে যদি সংগে থাকত, তা হলে ত আর এ বিপত্তি হত না।' ইত্যাদি, ইত্যাদি।

ভাবিলাম লোকটা দেখিতেছি বদ্ধ পাগল। অনেক বকিয়া বকিয়া বোধ হয় শ্রান্তি বোধ হইল; তখন তামাক সাজিতে বসিলেন, শব্দে জানিতে পারিলাম। তাহার পর ধূমপান করিতে লাগিলেন। আমি কম্বলে মুখ ঢাকিয়া নিদ্রার চেষ্টা করিতেছিলাম, কিন্তু নিদ্রা আসিল না।

মদনবাবু অনেকক্ষণ ধরিয়া তামাক খাইলেন। ক্রমে গাড়ী আসিয়া আসানসোলে থামিল। মদনবাবু জানালা দিয়া গলা বাহির করিয়া বলিলেন, "চাপরাশি—ও চাপরাশি।"

কে একজন জানালার কাছে আসিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপু, কটা বেজেছে বলতে পার?"

সে বলিল, 'সাড়ে এগারোটা বেজেছে"

মধুপুরে কখন গাড়ী পোঁছবে?' "বারোটা।"

ভাবিলাম আমার উপর লোকটার এতই ক্রোধ হইয়াছে যে আমি না নামিয়া গেলে—পাপ না বিদায় হইলে—আর সুস্থির হইতে পারিতেছেন না।

গাড়ী ছাড়িল। কিয়ৎক্ষণ পরে আমার কম্বলের উপর হস্তস্পর্শ অনুভব করিলাম।

"সদানন্দবাবু—ওঠ।"

আমার নাম সদানন্দ নয় সুতরাং আমি উত্তর করিলাম না।

"ভায়া—ওঠ। মধুপুর এল বলে। ওঠ।"

আমি মুখ হইতে কম্বল খুলিলাম।

"ভায়া, রাগ করেছ?"

আমি উঠিয়া বসিলাম। শুষ্কভাবে বলিলাম, কেন, সব রাগ কি আপনারই একচেটে নাকি?"

ধীরে ধীরে আমার পিঠ চাপড়াইয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "না না রাগ কোরো না। বুড়ো মানুষ, যদি দুটো কথা বলেই থাকি, তাতে কি আর রাগ করতে হয়? হঠাৎ মেজাজটা গরম হয়ে উঠেছিল। সব দোষটাই তোমার বলে মনে হয়েছিল। আমায় মাফ কর।"

ভাবলাম মনুষ্যচরিত্র এই রকমই বটে! এখনও বলিতেছেন 'সব দোষটাই তোমার বলে মনে হয়েছিল।' অর্থাৎ এখনও মনে এই বিশ্বাস রহিয়াছে যে, সবটা না হোক, অন্ততঃ কিছুটা দোষ আমার তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বৃদ্ধের স্বর এমন কোমল ও কারুণ্যপূর্ণ যে তাঁহার প্রতি পূর্ব্ব বিরাগ তখন আমি মন হইতে বিদূরিত করিয়া ফেলিলাম।

ক্ষমাসূচক একটু হাস্য করিলাম।

মদনবাবু বলিলেন, "কমলালেবু আমি কেন খাইনে, তা যদি তোমায় খুলে বলি, ত তুমি বুঝতে পারবে।"

মদনবাবুর মুখ চক্ষু যেন কালিমাময়। একটু কাসিয়া বলিলেন, "শুনবে?"—তাঁহার স্বর অত্যন্ত নীচু।

তিনি আরম্ভ করিলেন, "সে বিশ বছরের কথা, আমি একটা মানুষ খুন করেছিলাম।"

আমি শিহরিয়া উঠিলাম। বলিলাম, "মানুষ খুন?"

"খুন বইকি! সে খুনই বলতে হবে। শোন। দোসরা মাঘ আমার বড় মেয়ের বিয়ে দেবো বলে পৌষের শেষে কলকাতায় গিয়েছিলাম বাজার করতে। একটা মেসের বাসায় গিয়ে উঠেছিলাম, সেখানে সব কলেজের ছেলেরা থাকত। কোনও ঘরে জায়গা ছিল না, শুধু একটি ঘরে একটু জায়গা ছিল, সে ঘরে একজন জ্বররোগী পড়ে ছিল, আর তার শালাও সেই ঘরে থাকত। ভগ্নীপতির নাম কেদার, শালার নাম প্রবোধ। ভগ্নীপতিটি বাঙ্গাল—বয়স কুড়ি বাইশ হবে। প্রবোধ তার চেয়ে দু' তিন বছরের ছোট ছিল। প্রবোধ কলেজ কামাই করে ভগ্নীপতির খুব সেবাটা করত। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ওষুধ খাওয়ান, তাপ নেওয়া, মাথায় হাত বুলানো, পায়ে হাত বুলানো, রাত্রে দু'বার তিনবার করে উঠত। ক'দিন ছোকরা খুব লুটোপুটি খেয়ে, একদিন কতকটা সুস্থ হল। জ্বরটা অনেক কম দেখা গেল। আমি সেইদিন সন্ধ্যেবেলা বাড়ী যাব। সকালে মাধববাবুর বাজার থেকে ভাল দেখে একশোটা কমলালেবু কিনে আনলাম। প্রবোধকে জিজ্ঞাসা করলাম 'রুগী মানুষ—এ ঘরে লেবুগুলো—।' প্রবোধ বললে—'পাগল হয়েছেন! তা কোনও চিন্তা নেই, স্বচ্ছন্দে রাখুন।' রেখে আমি আবার বাজার করতে বেরুলাম প্রবোধ ভগ্নীপতি একটু ভাল আছে দেখে ক'দিনের পর কলেজে গেল। সন্ধ্যেবেলা বাসায় এসে দেখি, সর্ব্বনাশ হয়েছে আর কি। একা ঘরে লোভ না সামলাতে পেরে কেদার সতেরোটা লেবু খেয়ে ফেলেছে, জ্বর একেবারে বিকারে দাঁড়িয়েছে। বাড়ী যাওয়া ঘুরে গেল। রোগীর সেবা করতে বসলাম। মেয়ের বিয়ের টাকা ভেঙ্গে ভাল ভাল ডাক্তার আনালাম কলকাতা সহরে যতদূর যা হতে পারে কিছুর ত্রুটি করলাম না। অনাহারে অনিদ্রায় ব'সে তিনদিন শুশ্রূষা করলাম, কিন্তু কিছুতেই বাঁচাতে পারলাম না।" বলিয়া বৃদ্ধ চুপ করিলেন।

আমি মন্ত্রমুগ্ধবৎ বসিয়া এই শোককাহিনী শুনিতেছিলাম। বাহিরে মহা অন্ধকার, গাড়ী দ্রুতবেগে ছুটিতেছে। ছাদের উপর লণ্ঠনটির আলো ম্রিয়মাণ, পলিতায় গুল জমিয়াছে। গভীর রাত্রে একটি কামরায় আমরা দুইটি প্রাণী বসিয়া। আমি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম—"তাতে আপনার অপরাধ কি? আপনি ত আর জেনে শুনে করেন নি। বিশেষতঃ তার শালা যখন ঐ কথা বললে।"

"শালা ছেলেমানুষ। আমি তার বাপের বয়সী। সে যে ভুল করলে, আমার সে ভুল করবার কি অধিকার ছিল?"

আমি বলিলাম, "ব্যাপারটা খুব শোচনীয় সন্দেহ নেই। তবু আপনি নিজেকে এর জন্যে যতটা দোষী স্থির করেছেন, সেটা নিতান্ত অনুচিত। পাপের পরিমাণ ত কার্য্যের ফলে নয়, কার্য্য-প্রণোদক ইচ্ছায়।"

মদনগোপালবাবু ক্ষীণ স্বরে বলিলেন, "সে কথা বললে মন বোঝে না। আমিই এর জন্যে দায়ী। প্রবোধের কান্নাটা যদি দেখতে! সে বললে তারা পাঁচ ভাই এক বোন ঐ একমাত্র বোন—কত আদরের বোন—তেরো বছর মোটে বয়স—তার এই সর্ব্বনাশ হল!—আমারও মেয়ে তখন তেরো বছরের। বাড়ী গিয়ে মেয়ের বিয়ে দিলাম। আমি আমার মেয়ের পানে চাইতে পারিনে। মেয়েকে দেখলে, সেই যে মেয়েকে দেখিনি যার সর্ব্বনাশ করেছি—তারই কথা খালি মনে হয়।"

গাড়ীর বেগ কমিয়া আসিতে লাগিল। এইবার মধুপুর। বৃদ্ধকে কি সান্ত্বনা দিব? বলিলাম, "মদনগোপালবাবু!—আপনি বৃথা নিজেকে দোষী করেন। জন্ম মৃত্যু—এ সব ঈশ্বরাধীন ঘটনা মনুষ্যের অধীন নয়। আপনি আমাদের শাস্ত্র বিশ্বাস করেন না?"

মদনগোপালবাবু নিরুত্তর রহিলেন। তাঁহার চক্ষে জল।

গাড়ী থামিল। নিদ্রাতুর খালাসীরা ক্ষীণ জড়িতকণ্ঠে বলিতে লাগিল, 'মধুপুর—মধুপুর। আমি মদনগোপালবাবুকে নমস্কার করিয়া নামিয়া গেলাম।

[জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৯]

অযোধ্যার উপহার

॥ ১ ॥

অখিলবাবু কাছারি হইতে বাড়ী আসিবামাত্র গৃহিণী তাঁহাকে ভৃত্য অযোধ্যার সকল গুণের কথা বলিয়া দিলেন।

অখিলবাবু সেদিন একটা মোকর্দ্দমা হারিয়া আসিয়াছিলেন। বিপক্ষ উকীল তাঁহাকে একটা তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে বিঁধিয়া দিয়াছিল। এই কারণে তাঁহার মেজাজটা অত্যন্ত বিগড়াইয়া ছিল। তাহার উপর বাড়ীতে আসিয়া দেখিলেন এই ব্যাপার! গৃহিণী চক্ষুযুগল জবাবর্ণ ও পক্ষ্মরাজি জলসিক্ত করিয়া বসিয়া আছেন। অখিলবাবু আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিলেন। অদূরে একজন ঝি যাইতেছিল, অযোধ্যাকে তৎক্ষণাৎ পাঠাইয়া দিতে আদেশ করিলেন।

এক মিনিট পরে অযোধ্যা আসিয়া দাঁড়াইল। আজ তাহার চক্ষু অন্যদিনের মত আনত নহে। গোঁফযোড়াটা সে উত্তমরূপে পাকাইয়া জর্ম্মণ সম্রাটের ন্যায় ঊর্দ্ধদিকে উঠাইয়া দিয়াছে। তাহার মস্তকে পাগড়ী। বাড়ীতে সচরাচর অযোধ্যা পাগড়ী পরে না—কিন্তু কোনও কারণে তাহার মেজাজটা যখন অত্যন্ত খাপ্পা হইয়া উঠে, তখনি সে তাড়াতাড়ি মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া লয়। মনে বীরত্বের ভাব জাগিয়া উঠিলে বাহিরে তাহার চিহ্ন-প্রকাশের ইচ্ছা স্বাভাবিক।

অযোধ্যার আকার প্রকার দেখিয়া অখিলবাবুর ক্রোধবহ্নি আরও প্রখরতা প্রাপ্ত হইল। কিন্তু তিনি আত্মস্থ হইয়া শান্তভাবে অথচ কঠোরস্বরে জজের রায় পড়ার মত ধীরে ধীরে বলিলেন—

"অযোধ্যা, তুই অনেক কালের চাকর। কিন্তু পুরোনো হয়ে কোথায় ভাল হবি, না যতই বুড়ো হচ্ছিস, ততই তোর বজ্জাতি বাড়ছে। মনিব বলে যে একটা সমীহ কি ভয় ডর তা তোর নেই। হাড় জ্বালাতন করে তুলেছিস। তুই পুরোনো চাকর ব'লে অনেক সহ্য করেছি, কিন্তু আর না। তুই যা। এই পয়লা তারিখ থেকে তোকে জবাব দিলাম।"

অযোধ্যা মাথা নাড়িয়া, উদ্ধতভাবে অবজ্ঞাপূর্ণ স্বরে উত্তর করিল, "যো হুকুম মহারাজ, হম্ রাজিকা সাথ চলা যায়েংগে। আপ জবাব নেহি দেতে' তো খুদ্ হম্ আজ ইস্তাফা দেনেকো তৈয়ার হুয়া থা।" অযোধ্যার ওষ্ঠদ্বয় কম্পিত হইতে লাগিল।

কেহ না মনে করেন যে অযোধ্যা বাঙ্গালা কহিতে জানে না। সে এ বাড়ীতে আঠারো বৎসর চাকরি করিয়াছে—প্রায় বাঙ্গালীর মতই বাঙ্গালা কহিতে পারে। কিন্তু রাগিলে সে আর বাঙ্গালা কহিত না। বাঙ্গালাভাষাটা ভালমানুষীর ভাষা: তৃণাদপি সুনীচ ও তরোরিব সহিষ্ণু জাতির ভাষা। অযোধ্যা কেন—অনেক বাঙ্গালীও প্রবল ক্রোধের সময় বাঙ্গালা কহিতে পারেন না—হিন্দী বা ইংরাজী কহিয়া থাকেন।

অযোধ্যার এ দুর্ব্বিনীত উক্তিতেও অখিলবাবু আত্মহারা হইলেন না। পূর্ব্ববৎ ধীরভাবে বলিলেন, "বেশ। কিন্তু খবরদার আর যেন এসে জুটিসনে। বার বার তিনবার

কসুর মাফ করেছি—আর করব না। এবার এলে আর কিছুতেই রাখব না। এই শেষ।"

অযোধ্যা বলিল, "নেহি গরীব পরবর, আওর নেহি আওয়েঙ্গে। হমভি দিকদারী হো গিয়া—"

তাহার বক্তৃতায় বাধা দিয়া, দুয়ারের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া, ঘূর্ণিতচক্ষে বাবু বলিলেন, "যাও।"

অযোধ্যা যাইতে যাইতে তাহার বক্তব্য সংক্ষিপ্তভাবে শেষ করিয়া লইল, "থক্ গিয়া। নোক্রী আওর নেহি করেঙ্গে। যো কিয়া সো কিয়া—বস্ অব্ হদ্ হো চুকা।"

অখিলবাবু চেয়ারের উপর উপবেশন করিয়া ঝিকে ডাকিয়া তামাক সাজিতে আজ্ঞা করিলেন। অন্যদিন অযোধ্যাই তাঁহার তামাক সাজিত।

॥ ২ ॥

বেলা দ্বিপ্রহর, চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ। অখিলবাবু কাছারি গিয়াছেন, ছেলেরা কলেজে, গৃহিণী পালঙ্কে নিদ্রামগ্না।

আজ শীতটা কিছু বেশী। অযোধ্যা বারান্দায় রৌদ্রে বিছানা টানিয়া একটু নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু নিদ্রা কিছুতেই আসিতেছে না। খুকী তাহার মাথার কাছে বসিয়া পাকাচুল তুলিয়া দিতেছে।

খুকী বলিল, "অযুধা তুই কেন যাবি ভাই?"

অযোধ্যা বলিল, "তোর বাবা যে হামায় ছোড়ায় দিয়েছে ভাই।"

কাল পয়লা তারিখ, অযোধ্যা কাল যাইবে। খুকী জিজ্ঞাসা করিল, "আবার কবে আসবি অযুধা?"

অযোধ্যা বলিল, "আর কেন আসব দিদি? এবার যাব আর আসব না।"

খুকী অযোধ্যার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "না অযুধা তোকে আসতে হবে।"

অযোধ্যা বলিল, আচ্ছা ভাই, তোর যখন সাদি হবে, তখন তুই হমায় খৎ লিখিস হামি আসব।"

খুকী দুঃখিত স্বরে বলিল, "আমি কি লিখতে জানি?"

"দাদাবাবুকে বলবি—দাদাবাবু লিখে দেবে তোর খৎ।"

অযোধ্যা কিয়ৎক্ষণ ঘুমাইবার চেষ্টা করিল। কৃতকার্য্য না হইয়া শেষে বলিল, "তুই হামার সাদিতে যাবিনে ভাই?"

খুকী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, "দূর পোড়ারমুখো—তোকে আবার সাদি করবে কে? তুই যে বুড়ো হয়ে গেছিস!"

অযোধ্যা বলিল, "দূর পোড়ারমুখী, হামি বুঢ়া হব কেন?"

অযোধ্যার মাথায় চুল পাকাইতে পাকাইতে খুকী বলিল, "না তুই বুড়ো নস্! আমি যেন আর কিছু জানিনে! সেদিন দিদি, মা, সবাই বলছিল।"

"কি বলছিল?"

"বলছিল অযুধা ড্যাকরার বুড়োবয়সে ভীমরতি হয়েছে, বলে কিনা বিয়ে করব। ওকে কেউ বিয়ে করলে ত ও বিয়ে করবে।"

অযোধ্যা বলিল, "আরে দেখিস দেখিস, যখন সাদি হবে তখন সবাই কি বলে দেখিস।"

খুকী বলিল, "অযুধা, তুই কেন সাদি করবি ভাই?"

"নইলে হামায় কে ভাত রেঁধে দেবে দিদি?"

এই উত্তরে অযোধ্যার জীবনের পূর্ব্ব ইতিহাস লুক্কায়িত ছিল। সে তিনবার কর্ম্মচ্যুত হইয়া দেশে গিয়াছিল, পুনরায় যখনি হঠাৎ আবির্ভূত হইয়াছিল—আসিয়া বলিয়াছিল, 'হাত পুড়িয়ে রেঁধে খেতে হয় মা, তাই চলে এলাম।' বাল্যকালে অযোধ্যার একবার বিবাহ হইয়াছিল। অযোধ্যা যখন অখিলবাবুর কর্ম্মে প্রথম নিযুক্ত হয়—তখন তাহার

স্ত্রী জীবিত ছিল। এখন সে বহু বৎসর ধরিয়া বিপত্নীক।

খুকী জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি এবার বিয়ে করবি অযুধ্যা?"

"সত্যি না ত কি ঝুট্ বলছি?"

"ক' হাজার টাকা পাবি?"

অযোধ্যা হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল "টাকা মিলবে কি আউর দেনে পড়ি রাক্কুসি! এ কি বাঙ্গালীর সাদি?"

"গহনাও দিতে হবে?"

"গহনাভি দেনে পড়ি না ত কি। বহুৎ রুপিয়া খরচ রে দিদি—বহুৎ রুপিয়া খরচ।" বলিয়া অযোধ্যা পুনরায় নিদ্রার চেষ্টা করিতে লাগিল।

খুকী কিয়ৎক্ষণ ভাবিল। তাহার পর আগ্রহের স্বরে বলিল, "অযুধ্যা তোর বউকে আমি একটা গহনা দেবো।"

অযোধ্যা হাই তুলিয়া বলিল, "কি গহনা দিবি ভাই?"

খুকী বলিল, "কেন? আমার পুরানো বালা রয়েছে সাড়ে তিন ভরির, সে ত আর আমার হাতে হয় না, সেই বালা তোর বউয়ের জন্যে দেবো এখন নিয়ে যাস।"

অযোধ্যা হাসিল। বলিল, "আগে কনিয়া ঠিক হোক—তখন বালা দিস, তাবিজ দিস, মল দিস—সব দিস!"

খুকী বলিল, "না তুই বালাযোড়াটি আমার নিয়ে যা।"—বলিয়া তাড়াতাড়ি খুকী উঠিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে বালা দুইটি আনিয়া বলিল, "রেখে দে এই বেলা। মা উঠলে জানতে পারলে হয়ত দিতে দেবে না।"

অযোধ্যা বলিল, "বালা কোথা থেকে নিয়ে এলি রাক্কুসি?"

"কেন, বালা কোথায় থাকে আমি জানিনে বুঝি?"

"যা যা বালা যেখানে ছিল রেখে আয়।"—বলিয়া অযোধ্যা হাই তুলিয়া পাশ ফিরিল।

খুকী বালা দুইটি বাজাইয়া গুন্ গুন্ স্বরে গান করিতে লাগিল। অযোধ্যা বলিল, "যা রেখে আয় বলছি, হারিয়ে ফেলবি ত মুস্কিল হবে।"

খুকী কোন কথা না বলিয়া উঠিয়া গেল। অযোধ্যা শেষবার একবার নিদ্রা যাইবার চেষ্টা দেখিল।

॥ ৩ ॥

খুকী তাহার মার ঘরে গিয়া দেখিল, মা তখনও নিদ্রিত। পালঙ্কের উপর হইতে তাঁহার রাশিকৃত চুল মেঝেতে লুটাইয়া পড়িয়াছে।

খুকী তাহার পর পূজার ঘরে গিয়া, কোশা হইতে একটু গঙ্গাজল লইয়া চরণামৃত পান করিল। পান করিয়া, ঘাড়টি বাঁকাইয়া, চক্ষু বুজিয়া বলিল—"আঃ।" ঘরের কোণে বিড়ালটা বসিয়া নিদ্রা যাইতেছিল। খুকী পূজার ফুল এক মুঠা লইয়া আস্তে আস্তে বিড়ালটার কাছে গিয়া 'নমো নমো' বলিয়া তাহার মাথায় একটি একটি করিয়া ফুল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। বিড়াল মস্তকে শীতলস্পর্শ অনুভব করিয়া চক্ষুরুন্মীলন করিল। কাতরতাসূচক একটি 'মেও' শব্দ করিয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

পূজা ভঙ্গ হইল দেখিয়া ভক্ত খুকী বিড়ালের পশ্চাৎ পশ্চাৎ কিয়ৎক্ষণ ধাবিত হইল। রান্নাঘরের কাছে আসিয়া দেখিল, কবাটে শিকল দেওয়া রহিয়াছে। কোথা হইতে একটা টুল বুকে করিয়া আনিয়া, দুয়ারের কাছে রাখিল। টুলের উপর উঠিয়া শিকল টানাটানি করিল কিন্তু কিছুতেই খুলিতে পারিল না। তখন নামিয়া ইতস্ততঃ কি যেন খুঁজিয়া খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। এক টুকরা কয়লা কুড়াইয়া পাইবামাত্র, তাহার মুখে হর্ষচিহ্ন দেখা দিল। কয়লাটি লইয়া খুকী স্নানের ঘরে প্রবেশ করিল। স্নানের স্থানে অনেকক্ষণ জল পড়ে নাই—বেশ শুকাইয়া ছিল। সেই শুষ্ক স্থানে কয়লাটি দিয়া খুকী কয়েকটা ঘর আঁকিল এবং প্রত্যেক ঘরে একটা করিয়া 'ক' লিখিয়া দিল। তাহার পর টব হইতে

ঘটি করিয়া জল লইয়া, ধীরে ধীরে স্বরচিত চিত্রের উপর ঢালিতে লাগিল। অন্ততঃ বিশ ঘটি জল ঢালিবার পর নিরস্ত হইল। একটু শীতও করিতে লাগিল। তখন খুকী বাহির হইয়া বারান্দায় গেল। গিয়া দেখিল অযোধ্যা দিব্য নাসিকাধ্বনি করিতেছে।

খুকী আস্তে আস্তে অযোধ্যার বিছানায় বসিল। তাহার কোমরে একটি চাবি বাঁধা ছিল, সাবধানে সেটি খুলিয়া লইল। অযোধ্যার দেবদারু কাঠের বাক্সটি কোথায় থাকিত তাহা খুকী জানিত। বাক্সটি খুলিয়া বালা দুইটি আস্তে আস্তে সব জিনিসের নীচে লুকাইয়া রাখিল। অন্যান্য নানা দ্রব্যের মধ্যে সে বাক্সে টিনে বাঁধানো—পৃষ্ঠদেশে গণেশের মূর্ত্তি অঙ্কিত একখানি আর্সি ও একটি কাঠের চিরুণী ছিল। খুকী নিজের চুলটা একটু আঁচড়াইয়া লইল। শেষে বাক্স বন্ধ করিয়া চাবিটি আবার পূর্ব্বমত অযোধ্যার কোমরে বাঁধিয়া রাখিল।

॥ ৪ ॥

পরদিন প্রভাতে সকাল সকাল আহার করিয়া, গৃহিণীকে প্রণাম করিয়া, বাবুকে প্রণাম করিয়া, দাদাবাবু ও খুকীর নিকট সাশ্রুনেত্রে বিদায় লইয়া অযোধ্যা যাত্রা করিল। খুকী হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল—গৃহিণীও বারম্বার বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষুজল মুছিলেন।

অযোধ্যার গ্রাম মুঙ্গের ষ্টেশন হইতে দশ ক্রোশ পথ। মুঙ্গের হইতে একখানি গোরুর গাড়ী করিয়া অযোধ্যা বাড়ী গেল।

এই মুঙ্গেরে সে প্রথম অখিলবাবুর কর্ম্মে নিযুক্ত হয়। সে কি আজিকার কথা? অখিলবাবু তখন নূতন আইন পাস করিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন। মুঙ্গেরে তাঁহার উত্তমরূপ পশার জমিলে তিনি হাইকোর্টে আসিলেন। যাত্রার দিন এই মুঙ্গের ষ্টেশনে গাড়ী চড়িবার গোলমালে অখিলবাবুর পুত্র সতীশ হারাইয়া যায়। কেল্লার ফটকের নিকট অশ্বত্থ গাছের নিম্নে দাঁড়াইয়া সতীশ কাঁদিতেছিল, অযোধ্যাই তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করে। বাবু খুসি হইয়া তাহাকে নিজের নূতন বিলাতী জুতাযোড়াটা বখশিশ দিয়াছিলেন। সে সকল কথা মনে পড়িল। তাহার পর সেই সতীশ কলিকাতায় জ্বরবিকারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সমানে রাত্রি জাগিয়া একুশ দিন অযোধ্যা সতীশের শুশ্রূষা করিয়াছিল। শবদাহ করিয়া আসিয়া অখিলবাবু অযোধ্যার গলা জড়াইয়া কাঁদিয়া বলিয়াছিলেন —'অযুধা—একবার তুই আমার হারা ছেলে খুঁজে দিয়েছিলি—এবার খুঁজে নিয়ে আয়।' —সুখে, দুঃখে, বিপদে, সম্পদে অষ্টাদশ বৎসর যাহাদের সহিত কাটিয়াছে, তাহাদের সহিত বন্ধন এবার চিরদিনের তরে ছিন্ন হইল। অযোধ্যার গাড়ী অনেক দূর অবধি গঙ্গার ধার দিয়া গেল। পথ যখন বাঁকিল, গঙ্গা দৃষ্টিপথের অন্তরাল হইলেন—তখন অযোধ্যা যোড়হস্তে গঙ্গাদেবীকে প্রণাম করিয়া মনের একটা কামনা নিবেদন করিল।

বাড়ী হইতে অনেক মাস অযোধ্যা কোনও পত্রাদি পায় নাই। বাড়ীতে তার এক বৃদ্ধ চাচী ছিল, আর কেহ ছিল না। এতদিন সে চাচী বাঁচিয়া আছে কি মরিয়াই গিয়াছে, মনে এইরূপ আন্দোলন করিতে করিতে গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিল।

বাড়ী পৌঁছিয়া দেখিল, দরজায় তালা বন্ধ। প্রতিবেশীগৃহে সন্ধান করিতে গেল। শুনিল তাহার চাচী ছয়মাস হইল দেহত্যাগ করিয়াছে। পাড়ার বিজ্ঞলোকেরা পরামর্শ করিয়া, 'অযোধ্যা মাহাতো, মোকাম কলকত্তা' এই ঠিকানা দিয়া, দামড়িলালের দ্বারা তাহাকে (বেয়ারিং) পত্রও লেখাইয়াছিল--কিন্তু সে পত্র মাস দুই পরে ফিরিয়া আসে এবং বেচারা দামড়িলালের এক আনা পয়সা জরিমানা দিতে হয়। অযোধ্যাকে তাহারা পরামর্শ দিল, দামড়িলালের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে অযোধ্যা যেন তাহার এক আনা পয়সার ক্ষতিপূরণ করিয়া দেয়।

চাবি লইয়া অযোধ্যা বাড়ী আসিল। দরজা খুলিয়া দেখিল, উঠান জঙ্গলে ভরিয়া গিয়াছে। ছোট বড় নানাজাতীয় আগাছা জন্মিয়াছে। ঘর খুলিল—বহুকাল বন্ধ থাকায় ঘরের মেঝে অত্যন্ত স্যাঁৎসেঁতে হইয়া গিয়াছে। খাটিয়ার একটা পায়ার আধখানা উইপোকায়

খাইয়া ফেলিয়াছে। গোটাকতক ইন্দুর ও আরসুলা হঠাৎ আলো দেখিয়া খড়খড় শব্দে পলাইয়া গেল।

অযোধ্যা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, চাবি আবার বন্ধ করিয়া, একজন প্রতিবেশীর বাড়ীতে আশ্রয় লইল। কর্ম্ম গিয়াছে, এ কথা তাহাদিগকে প্রাণ ধরিয়া বলিতে পারিল না;—বলিল ছুটি লইয়া আসিয়াছি।

তাহারা অযোধ্যাকে অভ্যর্থনা করিয়া তামাক দিল। সে তামাক দুই টান টানিয়াই, খক্‌খক্‌ করিয়া কাসিয়া, অযোধ্যা হুঁকা নামাইয়া রাখিল। বাবুর বাড়ী অম্বুরী তামাক খাইয়া খাইয়া তাহার পরকাল গিয়াছে।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া অযোধ্যা মজুর নিযুক্ত করিয়া বাড়ী ঘর দুয়ার পরিষ্কার করাইল। লোকে বলিল অযোধ্যা চাকরি করিয়া আমীর হইয়া আসিয়াছে, নহিলে, যাহার পূর্ব্বপুরুষগণ নিজেরা মজুরী করিয়া দেহপাত করিয়াছিল, সে কখনও দিনে দুই আনা হিসাবে মজুর নিযুক্ত করে!

নিজের বাড়ীতে সন্ধ্যাবেলা বসিয়া অযোধ্যা অন্নপাক করিল। আহারান্তে ঘরে প্রবেশ করিয়া, রেড়ীর তেলে প্রদীপ জ্বালাইল। সে ম্লান আলোক দেখিয়া, কেবলই তাহার প্রভুগৃহের বিদ্যুৎ-আলোক মনে পড়িতে লাগিল।

দিনের পর দিন গেল—মাস কাটিল। পাড়ার লোকে ক্রমাগত তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, কতদিনের ছুটি, আবার কবে কলিকাতা যাইতে হইবে? সে বলে, এই যাইব এবার দিনকতক পরে। অযোধ্যা একাকী থাকে—কাহারও সঙ্গে মেশে না। তাহার জ্ঞাতিবন্ধু প্রতিবেশি-গণকে ছোটলোক বলিয়া মনে হয়। তাহাদের সহিত হাস্যামোদ করিতে অযোধ্যার প্রবৃত্তিই হয় না। সে নিজের ঘরে নীরবে বসিয়া থাকে—আর কেবল ভাবে। অখিলবাবুর ছেলে-মেয়েগুলিকে সে স্বহস্তে মানুষ করিয়াছিল—তাহার মনটি অষ্ট প্রহর কলিকাতার সেই প্রিয় গৃহখানিতে পড়িয়া থাকে।

এইরূপে দুই মাস কাটিলে অযোধ্যা স্থির করিল—দাদাবাবুকে একটা চিঠি লিখিয়া সকলের সংবাদ আনাইতে হইবে। ইংরাজিতে চিঠি লেখাইতে হইবে। গ্রামে কেহ ইংরাজি জানিত না। এ অঞ্চলে ইংরাজি জানিত কেবল খড়কপুরের পোষ্টমাষ্টার। গ্রাম হইতে কিঞ্চিৎ উত্তম গব্যঘৃত সংগ্রহ করিয়া, দুই ক্রোশ দূরে খড়কপুরে গিয়া, পোষ্টমাষ্টরকে উহা উপঢৌকন দিয়া, অযোধ্যা কলিকাতায় চিঠি লেখাইয়া আসিল।

সপ্তাহ পরে দাদাবাবুর নিকট হইতে উত্তর আসিল। যে পেয়াদা এ চিঠি আনিয়া অযোধ্যাকে দিল, অযোধ্যা তাহাকে মাচা হইতে একটা বিলাতী কুমড়া পাড়িয়া বখশিস্‌ করিয়া ফেলিল। তৎক্ষণাৎ পাগড়ী বাঁধিয়া, খড়কপুরে গিয়া পোষ্টমাষ্টারের দ্বারা চিঠি পড়াইল।

দাদাবাবু তাহার পত্র পড়িয়া অত্যন্ত খুসী হইয়াছেন। বাড়ীর সকলে খুসী হইয়াছেন। ৫ই বৈশাখ খুকীর বিবাহ। অযোধ্যার জন্য খুকীর ভারি মন কেমন করে।

চক্ষের জল মুছিয়া অযোধ্যা বাড়ী ফিরিয়া আসিল। ভাবিল, দশটা টাকা মনিঅর্ডার করিয়া সে দাদাবাবুকে পাঠাইবে—দাদাবাবু যেন অযোধ্যার হইয়া খুকীর বিবাহে তাহাকে একখানি রঙীন-শাড়ী কিনিয়া দেন।

টাকা বাহির করিবার জন্য অযোধ্যা বাক্স খুলিল। এ বাক্স সে বাড়ী আসিয়া অবধি একদিনও খুলে নাই। বাক্স খুলিয়া দেখিল, সোণার বালা!

দেখিয়া প্রথমটা সে অবাক হইয়া গেল। [illegible]ণীখানা হাতে তুলিয়া দেখিল, তাহাতে খুকীর দুইগাছি লম্বা চুল লাগিয়া রহিয়াছে। তখন সমস্ত বুঝিতে পারিল।

কর্ত্তব্য স্থির করিতে তাহার পাঁচ মিনিটের অধিক বিলম্ব হইল না। পরদিন সে ঘরে-দুয়ারে চাবি বন্ধ করিয়া কলিকাতা যাত্রা করিল।

বড়বাজারে তাহার এক পরিচিত মহাজন ছিল। তাহার আড়তে গিয়া অযোধ্যা কয়েক দিবস রহিল। কিছু সোণা কিনিয়া, খুকীর বালাযোড়াটা ভাঙ্গিয়া ভাল করিয়া বড় করিয়া

গড়াইয়া লইল।

নিজের জন্যও বস্ত্রাদি খরিদ করিল। একখানি ধুতি হরিদ্রায় রঞ্জিত করিল। গোলাপী রঙের একটি পাগড়ী তৈয়ারী করিল। উৎসব-বেশ পরিধান করিয়া, পাতলা নীল কাগজে মুড়িয়া বালা দুগাছি লইয়া, অযোধ্যা ৫ই বৈশাখ অপরাহ্ণ সময়ে অখিলবাবুর বাটীতে উপস্থিত হইল।

বাটীর সকলেই তাহাকে দেখিয়া অত্যন্ত খুসী হইলেন। খুকী বালা পরিয়া আমোদে আটখানা। অখিলবাবু আসিয়া বলিলেন, "অযুধা তুই আমার চিঠি পেয়েছিস!"

অযোধ্যা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "দাদাবাবুর চিঠি?"

"দাদাবাবুর কেন? আমার চিঠি। খুকীর বিয়েতে আমি তোকে এক সপ্তাহ হল নেমন্তন্ন করে রেজেষ্টারি চিঠি লিখেছি—গাড়ীভাড়ার জন্যে দশ টাকার নোট পাঠিয়ে দিয়েছি—তুই পাসনি?"

গৃহিণী বলিলেন, "ও কি দেশে ছিল নাকি? ও এই কলকাতায় ছিল, খুকীর জন্যে বালা গড়াচ্ছিল।"

বালার কথা শুনিয়া বাবু রাগ করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "তুই গরীব মানুষ খেতে পাসনে, অত টাকা খরচ করতে গেলি কেন? এ দুর্ব্বুদ্ধি কেন তোর?"

অযোধ্যা তখন হাসিয়া হাসিয়া বালার ইতিহাস বলিল।

গৃহিণী বলিলেন, "বটে! তাই বলি খুকীর পুরাণো বালাযোড়াটা গেল কোথা? আলমারিতেই রেখেছিলাম, না সিন্দুকেই ছিল ঠিক করতে পারিনে।"

অখিলবাবু বলিলেন, "তা বেশ। খুকীরই জিৎ।"—বলিয়া হাসিতে হাসিতে কার্য্যান্তরে প্রস্থান করিলেন।

অযোধ্যা নিজের রঙীন পাগড়িটি খুলিয়া সন্তর্পণে উঠাইয়া রাখিয়া বিবাহ বাড়ীর কার্য্যে মাতিয়া গেল। [বৈশাখ, ১৩১০]

প্রতিজ্ঞা-পূরণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভবতোষ কলেজে ইংরাজি পড়িতেছে বটে, কিন্তু সে নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত। ইংরাজি বিদ্যার প্রতি তাহার তিলমাত্র শ্রদ্ধা নাই। ইংরাজি পড়িয়া পড়িয়াই দেশটা উৎসন্ন গেল ইহাই তাহার মত। দেশে 'আর্য্যভাব' ক্রমশঃই হ্রাস পাইতেছে, সে কালের সে শুভদিন ভারতে ফিরিবার আর উপায় থাকিতেছে না, এই বলিয়া ভবতোষ প্রায়ই আক্ষেপ করিত। আত্মীয়-স্বজনের তাড়নায় তাহাকে বাধ্য হইয়া ইংরাজি পড়িতে হয়, নহিলে তাহার ইচ্ছা নবদ্বীপ বা ভট্টপল্লীতে গিয়া কোনও টোলে প্রবেশ করে। যাহা হউক, ইংরাজি পড়া স্বত্ত্বেও ভবতোষ যেরূপ নিজের আচার ব্যবহার ও চিন্তাপ্রণালী অক্ষুন্ন রাখিতে সমর্থ হইয়াছে, আজিকালিকার দিনে সেরূপ দেখা যায় না।

ভবতোষ কলিকাতায় মেসের বাসায় থাকিয়া লেখাপড়া করিতেছিল, হঠাৎ একদিন পূজার ছুটি হইল। ভবতোষ বাড়ীর জন্য নূতন বস্ত্রাদি খরিদ করিয়া, বাক্স পুঁটুলী বাঁধিয়া, গৃহযাত্রা করিল। তাহাদের গ্রামটি কলিকাতা হইতে অধিক দূরে নহে।

পূজা হইয়া গেল, পূর্ণিমা আসিল। সেদিন ভোরে ভবতোষের বিধবা মাতা গঙ্গা-স্নান করিতে গিয়াছিলেন। গঙ্গার ঘাট গ্রাম হইতে কিঞ্চিৎ দূরে। ঘাটে বহুসংখ্যক পুরস্ত্রীর সমাগম হইয়াছে। স্নানান্তে ঘাটে উঠিয়াছেন, এমন সময় ভবতোষের মাতা দেখিলেন, তাঁহার একটি বাল্যসখী,—উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী।

"কি দিদি, ভাল আছ ত?"—বলিয়া উপেন্দ্রবাবুর স্ত্রী ভবতোষের মাতার কাছে আসিলেন। দুই সখীতে কুশল প্রশ্নাদির পর, উপেন্দ্রবাবুর স্ত্রী বলিলেন, "ভবতোষ বাড়ী এসেছে?"

"এসেছে। তার ছুটিও ফুরিয়ে এল,—আবার কলকাতায় আসবে গিয়ে।"

উপেন্দ্রবাবুর একটি সুন্দরী ত্রয়োদশবর্ষীয়া কন্যা আছে, তাহার নাম পুলিনা। মেয়েটি অবিবাহিতা। উপেন্দ্রবাবুর স্ত্রী বলিলেন, "দেখ দিদি, আমার পুলিনার সঙ্গে তোমার ভবতোষের যদি বিয়ে দাও, তা হলে বেশ হয়।"

ভবতোষের মা বলিলেন, "আমারও তাই ত অনেক দিন থেকে ইচ্ছে বোন—ছেলে যে, বিয়ে করতে চায় না, কি করি। কত সম্বন্ধ এসে ফিরে ফিরে গেল।"

"আচ্ছা, একবার বলে দেখ না। তোমার বড় ছেলেটি, একটি বউ আসবে, তোমার কত আহ্লাদ হবে, কেন বিয়ে করে না?"

ভবতোষের মা বলিলেন, আচ্ছা বলিয়া দেখিবেন। ছেলে যদি রাজি হয়, তাহা হইলে এমন কি এই অগ্রহায়ণ মাসেই বিবাহ হইতে পারে।

মা যখন গৃহে ফিরিলেন, ভবতোষ তখন বৈঠকখানায় বসিয়া, 'বঙ্গবাসী'র উপহার পরাশর-সংহিতার একখানি তর্জ্জমা মন দিয়া পাঠ করিতেছিল। মা আসিয়া বলিলেন, "বাবা বাড়ীর ভিতর এস, একটা কথা আছে।"

ভবতোষ বহি রাখিয়া ধীরে ধীরে মাতার অনুগমন করিল।

নিজের কক্ষে লইয়া গিয়া মা পুত্রকে বলিলেন, "বাবা, এইবার একটা বিয়ে থাওয়া করে ফেল। তুমি আমার বড় ছেলে, বউয়ের মুখ দেখব আমার কতদিনের সাধ, সে সাধ পূর্ণ কর।"

বলিয়াছি, পূর্ব্বে ভবতোষ বিবাহ করিতে অত্যন্ত অসম্মত ছিল। পঠদ্দশায় বিবাহ করা উচিত নয়,—কিম্বা উপার্জ্জনক্ষম না হইলে বিবাহ করা উচিত নয়,—এরূপ কোনও 'বিলাতী আপত্তি' ভবতোষের ছিল না। তাহার আপত্তিটি অন্যরূপ এবং শাস্ত্রসঙ্গতও বটে। সে শুনিয়াছে (এবং সংবাদপত্রেও পাঠ করিয়াছে) যে আজিকালিকার নব্যস্ত্রীরা আর যথার্থ হিন্দু গৃহলক্ষ্মী-স্বরূপ আবির্ভূতা হন না। তাঁহারা অত্যন্ত বিলাসিনী ও "বাবু" হইয়া পড়িয়াছেন। শাস্ত্রীয় রীতি অনুসারে স্বামীদিগকে ভক্তিটক্তি আর করেন না, পরন্তু স্বামীর সহিত সখ্য ব্যবহার করিতে উদ্যত। আরও নানা প্রকার অভিযোগ সে শুনিয়াছে।

কিন্তু বিধবা মাতার ঐকান্ত অনুরোধ—বেচারি কি করে? মাতৃ-আজ্ঞা অবহেলা করিবার পাপও সে সঞ্চয় করিতে ইচ্ছা করে না। সুতরাং অল্পদিন হইতে স্থির করিয়াছে, মা এবার অনুরোধ করিলেই বিবাহ করিবে, কিন্তু সে নিজের আদর্শানুযায়ী একটি মেয়ে বিবাহ করিবে।

এখন, এ সম্বন্ধে ভবতোষের স্বাধীনচিন্তা-প্রসূত অনেকগুলি মতাদি ছিল, তাহা তাহার বাসার সহপাঠীরা সকলেই বিলক্ষণ অবগত আছে। রাত্রে আহারের পর ছাদের উপর যখন বাসার ছেলেদের একটি দণ্ডায়মানসভা সমবেত হইত, যখন অনেকগুলি সিগারেটাগ্র যুগপৎ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত, তখন অনেক সময় এই বিষয়ের আলোচনা হইত। তর্কস্থলে ভবতোষ কতবার বলিয়াছে—"যদি আমি কখনও বিয়ে করি, যদি করি তবে একটি কালো কুৎসিত মেয়ে বিয়ে করব। কারণ সুন্দর মেয়ে প্রায়ই দেমাকে হয়। শ্বশুর শাশুড়ীকে ভক্তি শ্রদ্ধা করে না, স্বামীকে গুরুজ্ঞান করে না, সহধর্ম্মিণী না হয়ে সহবিলাসিনী হয়ে ওঠে। তা ছাড়া, তারা অত্যন্ত বাবু হয়। একটু রূপ আছে বলে' সে রূপকে ভাল করে সাজিয়ে প্রকাশ করবার জন্যে ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাকে। সাবান চাই সুগন্ধি চাই, পাউডার চাই, ভাল ভাল শাড়ী চাই, সেমিজ চাই—স্বামী বেচারীর প্রাণও ওষ্ঠাগত। —দ্বিতীয়তঃ, লেখাপড়া জানা মেয়েও বিয়ে করব না। তারা খালি নভেল পড়ে (কেউ কেউ নভেল লেখেও) আর তাস খেলে, স্বামীকে কবিতা করে' চিঠি লিখতেই দিন যায়, গৃহকার্য্য হয় না, ব্রত নিয়মাদির ত সময়ই নেই—ছেলে মাটীতে পড়ে' কাঁদে।"—ইত্যাদি।

এইরূপ ওজস্বিনী বক্তৃতা শুনিয়া ছেলেরা কেহ কেহ বলিত, "আচ্ছা ভবতোষবাবু,

কার্য্যকালে কি করেন দেখা যাবে। ও রকম বলে অনেকে। বলায় করায় ঢের তফাৎ।"

এই সন্দেহবাদে ভবতোষ আগুন হইয়া বলিত, "আচ্ছা দেখবেন মশায়, দেখে নেবেন। আমার যে কথা সেই কায।"

মা যখন বার বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন, তখন ভবতোষ সম্মত হইল। বলিল, "আচ্ছা মা, আমি বিয়ে করব, কিন্তু নিজে দেখেশুনে বিয়ে করতে চাই।"

শুনিয়া মা অত্যন্ত খুসী হইলেন। বলিলেন, "দেখেশুনে বিয়ে করতে চাও? তা বেশ ত। একটি খাসা সুন্দর মেয়ে আছে, তেরো বছরের।"

ভবতোষ শুনিয়া চমকিয়া বলিল, "খুব সুন্দর নাকি?"

মা সোৎসাহে বলিলেন—"খুব সুন্দর। মুখখানি যেন একবারে প্রতিমের মত। যেমন নাক, তেমনি চোখ, তেমনি কপালের ভুরু। রঙটি যেন একবারে গোলাপফুলের মত।"

ভবতোষ ধীরে ধীরে গম্ভীরস্বরে বলিল, "সে ত আমি বিয়ে করব না মা।"

মা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। বলিলেন, "কেন, কি হয়েছে?"

"সুন্দর মেয়ে আমি বিয়ে করব না।"

"তবে কি রকম মেয়ে বিয়ে করবি?"

"আমি একটি কালো কুৎসিত মেয়ে বিয়ে করব।"—ভবতোষের স্বর বজ্রের মত দৃঢ়।

মা শুনিয়া অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। বলিলেন, "পাগল ছেলে! সকলেই ত সুন্দর মেয়ে বিয়ে করতে চায়। লোকে পায় না।"

"সকলে করুক; আমি একটু অন্য রকম করব।"—বলিতে বলিতে ভবতোষের মুখ-মণ্ডল আত্মগৌরবে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সে কি সকলের মধ্যে একজন? সে কি সকলের মত বিলাসের জন্য বিবাহ করিতেছে?

মাকে একটু দুঃখিত দেখিয়া ভবতোষ সমস্ত কথা তাঁহাকে খুলিয়া বলিল। সুন্দরী মেয়ে যে আদর্শ হিন্দু-গৃহলক্ষ্মী কেন হইতে পারে না, তাহা তাঁহাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিল। শেষে বলিল—তাহার প্রতিজ্ঞা স্থির—অটল—অচল।

সেদিন আর জননী অধিক পীড়াপীড়ি করিলেন না। ভবতোষেরও ছুটি ফুরাইল, সে কলিকাতা যাত্রা করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উপরিউক্ত ঘটনার কয়েক দিন পরে, একদিন পাল্কী করিয়া উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী ভবতোষের মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন।

প্রথম অভ্যর্থনার কুশলপ্রশ্নাদির পর উপেনবাবুর স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদি, ভবতোষ রাজি হল?"

ভবতোষের মাতা বলিলেন, "বিয়ে করতে ত রাজি হয়েছে—কিন্তু তার আবার এক আজগুবি মত।" "কি রকম?"

"প্রথমে বললে আমি দেখেশুনে বিয়ে করব। আমি বললাম তা বেশ ত, একটি খাসা সুন্দরী মেয়ে আছে, দেখে এস। সে বলে, আমি সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করব না, একটি কালো কুৎসিত মেয়ে বিয়ে করতে চাই।"

উপেন্দ্রবাবুর স্ত্রী শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, "এমন অনাসৃষ্টি আবদারও ত কখন শুনিনি! এ রকম আবদার কেন তা কিছু বললে?"

ভবতোষের মাতা তখন, পুত্রের নিকট যেমন শুনিয়াছিলেন, সেইরূপ বলিলেন। উপেন্দ্রবাবু স্ত্রী বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন, "দেখ, তুমি এক কায কর দিকিন দিদি। ভবতোষকে এই শনিবারে আসতে লেখ। লেখ যে, তোমার যে রকম মেয়ে বিয়ে করা মত, সেই রকম মেয়ে একটি স্থির করেছি, তাকে দেখবে এস। তারপর, এলে, রবিবার দিন বিকেলে আমার ওখানে পাঠিয়ে দিও। আমি সব ঠিক করে নেব।"

ভবতোষের মাতা সম্মত হইলেন। ভাবিলেন, হয়ত উপেন্দ্রবাবুর স্ত্রী মনে করিয়াছেন ভবতোষ পুলিনাকে দেখিলে আর বিবাহে অসম্মত হইতে পারিবে না। বাস্তবিক তাহা আশ্চর্য্য নয়, কারণ মেয়েটি খুবই সুন্দরী বটে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভবতোষ শনিবার বাটী আসিল। পরদিন বৈকালে একখানি ঘোড়ার গাড়ী করিয়া, চুল উস্কোখুস্কো করিয়া (কারণ সেকালে মুনি ঋষিরা চুল আঁচড়াইতেন না) গ্রামান্তরে উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইল।

গিয়া শুনিল সেদিন উপেন্দ্রবাবু বাড়ী নাই, কার্য্য উপলক্ষে স্থানান্তরে গিয়াছেন। একটি যুবক মহা সমাদরে তাহাকে নামাইয়া লইল এবং বৈঠকখানায় বসাইল। যুবকটি উপেন্দ্রবাবুরই ভ্রাতুষ্পুত্র।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঝি আসিয়া সংবাদ দিল, অন্দরে যাইতে হইবে। ঝি ভবতোষের মুখের পানে চাহিয়া একটু ফিক্ করিয়া হাসিয়া গেল।

যুবকটির সঙ্গে ভবতোষ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। তাহার মনে হইল, চাকর-বাকর সকলেই যেন হাসি লুকাইবার চেষ্টা করিতেছে।

ভবতোষ একটি কক্ষে নীত হইল। কক্ষটি উত্তমরূপে সাজানো। মধ্যস্থলে একখানি আসন পাতা রহিয়াছে। আসনের সম্মুখে রেকাবীতে ফল ও মিষ্টান্ন সজ্জিত। অল্প দূরে আর একখানি আসন পাতা রহিয়াছে।

অনুরোধক্রমে ভবতোষ মিষ্টান্নের থালার সম্মুখে বসিল। এমন সময়ে বাহিরে মলের ঝম্ ঝম্ শব্দ উঠিল। ঝি মেয়েটিকে লইয়া প্রবেশ করিল। মেয়েটি অপর আসনখানিতে বসিয়া, ঘরের চতুর্দ্দিকে কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল।

লজ্জায় ভবতোষের মস্তক অবনত। একটু একটু করিয়া ফল খাইতেছে এবং আড়-চোখে আড়চোখে মেয়েটির পানে চাহিতেছে। মেয়েটির পরিধানে বেগুনে রঙের বোম্বাই শাড়ী। মাথাটি খোলা। চুলগুলি তেলে যেন চব্‌চব্ করিতেছে।

মেয়েটির রঙটি মসীনিন্দিত। চক্ষু দুইটি ছোট ছোট, কোটরান্তর্গত। সে দুটি আবার অবিশ্রান্ত ঘুরিতেছে। কপালটি উচ্চ। নাকটি চেপ্টা। চিবুক নাই বলিলেই হয়। সম্মুখের দাঁতগুলি কিঞ্চিৎ দেখা যাইতেছে।

ভবতোষের মনে হইল, রূপ সম্বন্ধে মেয়েটি তাহার আদর্শের অনুযায়ী বটে। একটু গলা ঝাড়িয়া, সাহস সংগ্রহ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি?"

মেয়েটি হঠাৎ ভবতোষের পানে চাহিয়া. কিঞ্চিৎ জিহ্বা বাহির করিয়া বলিল—"অ্যাঁ?"

"তোমার নাম কি?"

"আমার নাম জগদম্বা।"

এমন সময় যুবকটি ও সেই ঝি তাহার পানে সরোষ কটাক্ষপাত করিল। মেয়েটি তৎক্ষণাৎ বলিল, "জগদম্বা নয়,—আমার নাম পুলিনা।"

যুবকটি বলিল. "আগে ওর নাম ছিল জগদম্বা, এখন বদ্‌লে পুলিনা রাখা হয়েছে।"

ভবতোষ ভাবিল, পরিবর্ত্তনটা ভাল হয় নাই। পুলিনা।—গা জ্বলিয়া যায়। তাহার অপেক্ষা জগদম্বা ঢের ভাল। পৌরাণিক নাম. ঠাকুর দেবতার নাম। বিবাহ করিয়া সে জগদম্বা নামই বহাল রাখিবে।

ভবতোষ জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি পড়?"

বালিকা পূর্ব্ববৎ জিহ্বা দেখাইয়া বলিল, "অ্যাঁ?"

"তুমি কি পড়?"

"কিছু পড়িনে। আমার দাদা পাঠশালে—"

ঝি ও সেই যুবক তাহার প্রতি পুনরায় সরোষ কটাক্ষপাত করায় বালিকা থামিয়া গেল।

শুনিয়া ভবতোষ আরও আশ্বস্ত হইল। এই ঠিক হইয়াছে। ইহাকেই যথার্থ হিন্দু-গৃহিণী করিয়া তোলা সম্ভবপর হইবে। দেখিতে একটু—তাহা হউক। সেই ত তাহার প্রতিজ্ঞা। বিবাহের সময় বাসার ছেলেদের নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে হইবে।

ভবতোষ বলিল, "আচ্ছা তুমি যেতে পার।"

মেয়েটি জিহ্বাগ্রভাগ বিকশিত করিয়া পূর্ব্ববৎ বলিল—"অ্যাঁ?"

"যেতে পার।"

ঝি তখন তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল।

ভবতোষের জলযোগ ক্রমে শেষ হইল। এই সময় একটি ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকা, রূপার ডিবায় ভরিয়া পাণ লইয়া আসিল। মেয়েটি দেখিতে অত্যন্ত সুন্দরী, একখানা দেশী কালাপেড়ে শাড়ী পরিয়া আসিয়াছে। পায়ে চারিগাছি মল। হাতে গিনি সোণার টুকটুকে দুইগাছি বালা। ভ্রূযুগলের মাঝখানে খয়েরের টিপ।

পাণ রাখিয়া মেয়েটি চলিয়া গেল। যাইবার সময় অন্যদিকে চাহিয়া একটু মুচ্‌কি হাসিয়া গেল।

ভবতোষ মনে মনে ভাবিল, দেখ, এই একটি সুন্দরী মেয়ে। ধর, যদি ইহার সঙ্গেই আমার বিবাহ হইত, তাহা হইলে কি আর রক্ষা ছিল? আমার সকল আদর্শ, সকল সংকল্প, অতল জলে ডুবিয়া যাইত। বিলাস-বিভ্রমে মজিয়া হয়ত, আমি যে আমি, আমার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া যাইত। না না, আমি সুখের জন্য, আমোদের জন্য, প্রণয়ের জন্য বিবাহ করিতেছি না—আমি ধর্ম্মের জন্য, সংযমের জন্য, আদর্শ হিন্দুগার্হস্থ্য-জীবন যাপন করিবার জন্য বিবাহ করিতেছি। প্রতিজ্ঞা-পূরণ-জনিত আত্মগৌরব ভবতোষের মনে উছলিয়া উঠিতে লাগিল।

যুবকটির সঙ্গে ভবতোষ বাহিরে আসিল।

ঝি আসিয়া, ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "বাড়ীর মেয়েরা জিজ্ঞাসা করছেন, মেয়ে পছন্দ হয়েছে?"

ভবতোষ সগর্ব্বে বলিল—"হয়েছে।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গাড়ীতে আসিতে আসিতে ভবতোষ মনে মনে অপরাহ্নের ঘটনাগুলি আলোচনা করিতে লাগিল। গ্রামের পথ দিয়া আসিতেছে। কত যুবতী মেয়ে কলসীতে জল ভরিয়া বাড়ী ফিরিতেছে। সে সকল মেয়ের মুখগুলি ভবতোষ একটু মনোযোগের সহিতই দেখিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে সুন্দর মেয়ে আছে, কালো মেয়েও অনেক কিন্তু জগদম্বার মত অত কুৎসিত একটি মুখও দেখিতে পাইল না।

গাড়ী ক্রমে মাঠের মধ্যে আসিয়া পড়িল। তখনও তাহার মন আত্মজয়ের উৎসাহে ভরপুর। তথাপি মনে মনে ভাবিতে লাগিল, সে কালো মেয়ে বিবাহ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল বটে, কিন্তু একেবারে এত কুৎসিত না হইলেও ক্ষতি ছিল না। যাহা হউক পছন্দ হইয়াছে যখন বলিয়া আসিয়াছে, তখন সে আলোচনায় ফল কি?

এই অবস্থায় ভবতোষ বাড়ী পৌঁছিল। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বাবা, মেয়ে পছন্দ হল?"

"হ্যাঁ, পছন্দ হয়েছে।"

"তবে সব ঠিক করি?"

"কর।"

"এই অগ্রহায়ণ মাসেই হোক তাহলে?"

"আচ্ছা।"—বলিয়া ভবতোষ অন্যত্র চলিয়া গেল।

মা দেখিলেন, ছেলের মন যেন ভার ভার। ভাবিলেন, সুন্দর মেয়ে বিবাহ করিব না

বলিয়া অনেক লম্ফ ঝম্ফ করিয়াছিল, এখন রাজি হইয়াছে, তাই বোধ হয় ছেলের লজ্জা হইয়াছে।

ভবতোষ রাত্রে কিছু আহার করিল না। বলিল, উঁহাদের বাড়ী অনেক খাইয়া আসিয়াছে, ক্ষুধা নাই। তখন তাহার মন হইতে আত্মজয় ও প্রতিজ্ঞা-পূরণ-জনিত উৎসাহ অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে।

রাত্রে শয়ন করিয়া জগদম্বার মুখখানি যতই সে ভাবিতে লাগিল, ততই তাহার বুকের ভিতরটা যেন হিম হইয়া উঠিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল, যদি অত কুৎসিত না হইয়া, শ্যামবর্ণের উপর মুখচোখগুলা একটু মানানসই হইত তাহা হইলে মন্দ হইত না।

সোমবারে উঠিয়া ভোরের ট্রেণে ভবতোষ কলিকাতা যাত্রা করিল। মা বলিয়া দিলেন, বিবাহের আর দশ দিন মাত্র বাকী আছে; দুই দিন পূর্ব্বে ভবতোষ যেন বাড়ী আসে।

বাসায় পৌঁছিলে সহপাঠীরা দেখিল, ভবতোষের মুখখানি যেন মেঘের মত অন্ধকার। ভবতোষ গিয়া নিজ কক্ষ মধ্যে উপবেশন করিল।

"কি ভবতোষবাবু, খবর কি?"—বলিতে বলিতে রজনীবাবু, শরৎবাবু, রাখালবাবু, সতীশবাবু, কুমুদবাবু, নৃপেনবাবু, প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভবতোষ বাড়ী যাইবার সময় ইঁহাদের সকল কথাই বলিয়া গিয়াছিল। "খবর কি ভবতোষবাবু?"

ভবতোষ একটু কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিল, "খবর ভাল।"

তাহার পর সকলে প্রশ্ন করিয়া মেয়েটির রূপ, গুণ, বয়স প্রভৃতির সমস্ত খবর জানিয়া লইল। শরৎবাবু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন—"মেয়েটির নাম কি?"

ভবতোষ নাম বলিল।

তাহা শুনিয়া সকলেরই মুখে একটু একটু হাসি দেখা দিল। কেবল নৃপেনবাবু আত্মসংযম হারাইয়া উচ্চস্বরে হাসিয়া ফেলিলেন—"হা—হা—হা—জগদম্বা—হি—হি—হি—বেশ নামটি ত!"

শরৎবাবু বলিলেন, "নৃপেনবাবু, এটা এমনই কি হাসির কথা? হাসছেন কেন?"

নৃপেনবাবু বলিলেন, "না, হাসিনি। হি—হি—হি—হাসব কেন? হা—হা—!"

রজনীবাবু বলিলেন, "না, নামটি মন্দ কি? পৌরাণিক নাম। তোমাদের আজকালকার জ্যোৎস্নাময়ী, সরসীবালা, তড়িল্লতা, মণিমালিনী—এই সব নাটুকে নামই বুঝি ভাল?"

ভবতোষ ইহা শুনিয়া গম্ভীরভাবে মাথাটি নাড়িতে লাগিল। এ সকল বিষয়ে তাহার পূর্ব্ব উত্তেজনা আজি যেন আর নাই।

বিবাহের আর নয়দিন বাকী আছে। এই নয় দিন যে ভবতোষের কি অবস্থায় কাটিল, তাহা সেই জানে। বাসার লোকেও কিছু কিছু জানিতে পারিয়াছিল। জগদম্বাকে ভবতোষ যতই মনের মধ্যে ভাবে, ততই তাহার বুকের ভিতরটা অন্ধকারে ভরিয়া যায়। ভবতোষ কলেজে যায়, কিন্তু লেক্‌চার কিছুই শুনিতে পায় না। ক্ষুধার জন্য বাসায় সে বিখ্যাত ছিল, এখন তাহার পাতের অন্নব্যঞ্জন অর্দ্ধেকের বেশী পড়িয়া থাকে। ভবতোষ কাহারও সঙ্গে হাস্যালাপ করে না, সদাই অন্যমনস্ক থাকে। বাসার লোক তাহাকে বলিতে লাগিল, "ভবতোষবাবু, প্রেম-ব্যাধির সমস্ত লক্ষণগুলিই ক্রমে অপনার মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে।"

রাত্রে বিছানায় শুইয়া ভবতোষ আর সহজে নিদ্রা যায় না। কেবল এ-পাশ ও-পাশ করে। অতিকষ্টে যখন নিদ্রা আসে, তখন কেবল বিভীষিকাপূর্ণ স্বপ্ন দেখে। একদিন স্বপ্ন দেখিল, জগদম্বা যেন কালীমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। তাহার অল্প পরিমাণ রসনা ভবতোষ যাহা দেখিয়াছিল, তাহা যেন অর্দ্ধেক বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তাহার যেন দুইটা নূতন হস্ত উৎপন্ন হইয়াছে। তাহার এক হাতে যেন রক্তমাখা খড়্গ, অপরটাতে যেন ছিন্ন মুণ্ড দুলিতেছে। মুণ্ডটা যেন ভবতোষের মত দেখিতে। আর একদিন স্বপ্ন দেখিল, ভবতোষ যেন একটা কণ্টকময় জঙ্গলে পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে। আকুল হইয়া পথ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, এমন সময় একটা মহিষ যেন তাহাকে তাড়া করিয়া আসিল।

মহিষের পরিধানে যেন একখানি বেগুনি রঙের বোম্বাই শাড়ী; তাহার মুণ্ডের স্থানে যেন জগদম্বার মুখ, কেবল তাহাতে দুইটা শৃঙ্গ বাহির হইয়াছে।

যখন বিবাহের আর তিন দিন মাত্র বাকী আছে, তখন ভবতোষ ভাবিল, মাকে একখানি পত্র লিখিয়া এ বিবাহ বন্ধ করিয়া ফেলিবে। সেদিন অসুস্থতার ভাণ করিয়া সে কলেজে গেল না। সমস্ত দিন একাকী ঘরে বসিয়া মাকে একে একে অনেকগুলি চিঠি লিখিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। বাসার লোকেরা যখন শুনিবে যে বিবাহ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তখন তাহারা কি বলিবে? তাহাদের উপহাস, বিদ্রূপ সে কেমন করিয়া সহ্য করিবে?

সেদিন রাত্রে শুইয়া ভাবিতে লাগিল, কাহাকেও কিছু না বলিয়া সে পশ্চিম পলাইয়া যাইবে। উঠিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া টাইমটেবল উল্টাইয়া দেখিতে লাগিল। কিন্তু প্রভাতে আবার তাহার মতের পরিবর্ত্তন ঘটিল। ছি ছি, শেষে কি এত কাণ্ড কারখানার পর সে ভীরু নাম গ্রহণ করিবে? তাহা হইবে না, প্রতিজ্ঞা সে পূরণ করিবেই. তাহার পর তাহার অদৃষ্টে যাহাই থাকুক।

যথাদিনে সে বাড়ী গেল। যথাসময়ে সে বিবাহমণ্ডপেও উপস্থিত হইল। সেখানকার লোকসমাগম, আলোক ও কোলাহলে, আজ দশদিন পরে তাহার চিত্ত অনেকটা স্থির হইল। যুদ্ধকাল সমাগত হইলে ভীরুতম সৈন্যও ভয় ভুলিয়া যায়।

বিবাহ আরম্ভ হইল। তখন ভবতোষের চিত্ত নির্ব্বিকার। তখন তাহার মনে ভয় বা হর্ষ বা নৈরাশ্য কিছুই নাই।

ক্রমে স্ত্রী-আচারের সময় আসিল। শুভদৃষ্টির জন্য বর ও কন্যার মস্তকের উপর বস্ত্রাবরণ পড়িল। কন্যার পানে চাহিয়া দেখিয়া ভবতোষ আশ্চর্য্য হইয়া গেল। ইহা, তাহার দশদিনকার বিভীষিকা, নিদ্রার দুঃস্বপ্ন—জগদম্বা নহে। এ সেই চমৎকার সুন্দরী মেয়েটি যে রূপার ডিবায় পাণ রাখিয়া গিয়াছিল।

ফুলশয্যার রাত্রে যখন ভবতোষ তাহার নববধূকে কথা কহাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইল, তখন একটা বুদ্ধি করিল। সে শুনিয়াছিল, যে নববধূ কিছুতেই কথা কহে না, সেও আপনার আত্মীয়স্বজনের অপবাদ শুনিলে তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করিয়া থাকে। তাই ভবতোষ বলিল—"তোমার মা আমার সঙ্গে এ চাতুরী করলেন কেন?"

পুলিনা তখন বলিল, "আমি সুন্দর বলে, তুমি নাকি আমায় বিয়ে করতে চাওনি? কেমন জব্দ!"

ভবতোষ এ পর্য্যন্ত এ প্রহেলিকার মীমাংসা করিতে পারে নাই। তাই জিজ্ঞাসা করিল, "যাকে দেখেছিলাম, সে মেয়েটি কে?"

"সে, পাড়ার হলুদের মেয়ে। কেমন জব্দ!"

ক্রমে এমন দিনও আসিল, যখন ভবতোষ ডাক আসিবার পূর্ব্বে বাসার দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিয়া পিয়নের সহিত সাক্ষাৎ করিতে লাগিল।

[ভাদ্র, ১৩১১]

খুড়া মহাশয়

॥ ১ ॥

শরতের সন্ধ্যা উত্তীর্ণপ্রায়। বড় ঘরের বারান্দায় মাদুর পাতিয়া বসিয়া গগন চক্রবর্ত্তী তামাক খাইতেছেন। ঘরের মধ্যে তাঁহার বৃদ্ধ জ্যেষ্ঠভ্রাতাটি পীড়িত, এখনি ডাক্তার আসিবার কথা আছে।

ইঁহারা দুই ভাই, নবীন ও গগন। গ্রামটি নৈহাটির নিকটে চন্দ্রদেবপুরে। ইঁহারা

এখানকার মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, কিন্তু শুনা যায় নাকি বৃদ্ধ নবীনের হাতে নগদ দশ হাজার টাকা আছে। কেহ বলে ইহা বাজে গুজব, কেহ বলে ইহা সত্য কথা; কিন্তু কেহই সে টাকা স্বচক্ষে দেখে নাই। সে টাকা যে লোহার সিন্দুকটিতে আছে অথবা নাই, সেই সিন্দুকটিমাত্র সকলে দেখিয়াছে। সেটি বৃদ্ধের শয়নকক্ষে অবস্থিত। বৃদ্ধ সর্ব্বদাই সেই ঘরে থাকিয়া সিন্দুকটি আগলাইয়া থাকিতেন। তাঁহার পুত্র নবকুমার পশ্চিমে চাকরি করে, সে অনেকবার পিতাকে স্বীয় কর্ম্মস্থানে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু বৃদ্ধ কখনও যান নাই। সকলে বলে, তিনি সিন্দুকটি ফেলিয়া যাইতে পারেন না।

গগন চক্রবর্ত্তী বসিয়া নীরবে তামাক খাইতে লাগিলেন। ক্রমে ডাক্তারবাবুর লণ্ঠনের আলো উঠানে পড়িল। ডাক্তারবাবু আসিয়া বারান্দার নিম্নে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "চক্রবর্ত্তী মশাই। খবর কি?"

চক্রবর্ত্তী হুঁকাটি নামাইয়া বলিলেন, "ডাক্তারবাবু? এস, খবর ভাল! এখনও বেহুঁস রয়েছেন—বড্ড জ্বরটা রয়েছে কিনা। কিন্তু নাড়ী বেশ চলছে এখনও! উঠে এস—একবার দেখ না।"

ডাক্তারবাবু উঠিয়া আসিলেন। চক্রবর্ত্তী হুঁকাটি সযত্নে দেওয়ালে ঠেস দিয়া রাখিয়া দ্বার খুলিয়া রোগীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ডাক্তারও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রবেশ করিলেন। পিলসুজের উপর একটি মাটির প্রদীপ ম্লানভাবে জ্বলিতেছিল। একখানি লম্বা ও চওড়া তক্তপোষের উপর মলিন শয্যায় শয়ন করিয়া বৃদ্ধ রোগী নিদ্রা যাইতেছেন। তাঁহার পদতলে বসিয়া তাঁহার পুত্রবধূ সাবিত্রী পায়ে হাত বুলাইতেছে।

ইঁহাদের প্রবেশ করিতে দেখিয়া সাবিত্রী ঘোমটা টানিয়া দিল। গগন চক্রবর্ত্তী প্রদীপটা একটু উজ্জ্বল করিয়া দিলেন। ডাক্তার বৃদ্ধের নাড়ী পরীক্ষা করিলেন—থার্ম্মমিটার দিয়া উষ্ণতা লইলেন। পরীক্ষান্তে বলিলেন, "এখনও খুব জ্বর। সে ফিবার্ মিক্‌সারটা খাওয়ান হচ্চে?"

সাবিত্রী ঘোমটাবৃত মস্তক সঞ্চালন করিয়া জানাইল, হইতেছে।

ডাক্তার বলিলেন, "আজ সারারাত্রি ওটা দেওয়া হোক। ভোরের দিকে রিমিশন্ হবার সম্ভাবনা।"

বলিয়া ডাক্তারবাবু বাহিরে আসিলেন। গগনচন্দ্রও তাঁহার সহিত দরজা অবধি যাইলেন।

ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "নবুকে খবর দিয়েছেন?"

"না, দিইনি। কিছু ভাবনা নেই, দাদা ভাল হয়ে উঠবেন। ওরকম ত হয়ই ওঁর মাঝে মাঝে। নবুকে খবর দিলেই এখনই খরচপত্র করে বাড়ী আসবে—তাই খবর দিইনি।"

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "গতিক বড় ভাল বোধ হচ্চে না কিন্তু। আজ পাঁচ-পাঁচ দিন জ্বরটা ছাড়ল না—ভারি দুর্ব্বল হয়ে পড়েছেন। জ্বর ছাড়বার সময় সামলাতে পারলে হয়!"

গগন বলিলেন, "আরে না না। আমি এতকাল দেখেছি। কিছু ভয় নেই।"

"দেখা যাক। অনেক বয়সটা হয়েছে কিনা, তাই ভয় হয়।"—বলিয়া ডাক্তারবাবু মৃদুমন্দপদক্ষেপে প্রস্থান করিলেন।

ডাক্তারবাবুর কথাই সত্য হইল—ভোরবেলায় প্রাণপাখী বৃদ্ধের দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া গেল। মৃত্যুর পূর্ব্বে দুই এক মিনিটের জন্য মাত্র তাঁহার চেতনা হইয়াছিল। তখন তিনি শুধু বলিয়াছিলেন, "নবু—নবু এসেছে?"

বাড়ীতে ক্রন্দনের রোল উঠিলে, পাড়ার লোক দুইটি একটি করিয়া আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল।

সকলেই বলিল, "তা বেশ গেছেন, খুব গেছেন। বয়স হয়েছিল—তোমাদের সব রেখে গেছেন—এ ত ওঁর সৌভাগ্য। তবে নবু কাছে থাকলেই ভাল হত।"

সৎকারের সমস্ত আয়োজন হইতে লাগিল। সেখানে সত্যচরণ নামে একটি যুবক দাঁড়াইয়া ছিল, সে নবকুমারের একজন বিশেষ বন্ধু। তাহার হাতটি ধরিয়া গগনচন্দ্র বলিলেন, "তুমি বাবা গিয়ে, নবুকে একখানি টেলিগ্রাম করে দাও; আমার আর হাত-পা সরছে না।"

সত্যচরণ বলিল, "আচ্ছা, আমি আপিস যাবার সময় স্টেশন থেকে টেলিগ্রাম করে দেবো এখন।" সত্যচরণ কলিকাতায় চাকরি করে—রোজ নয়টার ট্রেণে আপিস যায়।

॥ ২ ॥

সে দিনটি শোকের মধ্যে কাটিয়া গেল। সন্ধ্যা হইলে সকলে দুগ্ধাদি পান করিয়া সকালে সকালে শয়ন করিল। গগনচন্দ্র বিপত্নীক। তিনি একা একঘরে শয়ন করিয়া ছিলেন। অনেক রাত্রি হইল—গৃহের কুত্রাপি আর কোন সাড়াশব্দ নাই—কেবল গগনচন্দ্র তাঁহার শয্যায় এপাশ ওপাশ করিতেছেন। শোকটা যেন ইঁহারই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাগিয়াছে বুঝি? ইহা শোক, না আতঙ্ক?—দুইটি নিকটসম্পর্কীয় বৃদ্ধের মধ্যে একটি মরিলে, অপরটির সহজেই একটা আতঙ্ক উপস্থিত হয়—তাহার মনে হয়, এইবার ত আমার পালা আসিল।

যাহা হউক, ক্রমে রাত্রি গভীর হইল। গগনচন্দ্র তখন ধীরে ধীরে শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিলেন। অন্ধকারে অতি সন্তর্পণে, নিজের ঘরের খিলটি খুলিয়া নগ্নপদে বাহিরে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। জমাট অন্ধকার—তাহার উপর আকাশ মেঘ করিয়াছে। মাঠের প্রান্তে শৃগাল একটা ডাকিয়া উঠিল। গগনচন্দ্র ক্ষণকাল নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বড় ঘরের বারান্দার দিকে অগ্রসর হইলেন। যে ঘরে গতরাত্রে বৃদ্ধের মৃত্যু হইয়াছে—সে ঘরটি আজ তালাবন্ধ। গগনচন্দ্র নিঃশব্দে তালাটা খুলিয়া সেই অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করিলেন। ভয়ে তাঁহার বুকটা দুরুদুরু করিয়া উঠিল। হায় ভ্রাতৃস্নেহ!—এতরাত্রে নিদ্রাহীনচক্ষে ভ্রাতা বুঝি ভ্রাতার মৃত্যুশয্যাটি একবার দেখিবার জন্য ও অশ্রুপাত করিবার জন্য আসিয়াছেন।

গগনচন্দ্র পূর্ব্ববৎ সাবধানতার সহিত ঘরের দুয়ারটি প্রথমে বন্ধ করিয়া দিয়া, একটি দিয়াশলাই জ্বালিলেন। প্রদীপটি জ্বালিয়া, পূর্ব্বকথিত লোহার সিন্দুকটির নিকট অগ্রসর হইলেন। সিন্দুকটির উপর হইতে একটি ভাঙ্গা কাঠের হাতবাক্স, একখানি ছিন্ন মহাভারত ও কয়েকটি খালি ঔষধের শিশি নামাইয়া সিন্দুকটি খুলিয়া ফেলিলেন। কয়েকটি কাপড়ের পুটুলি তাহা নামাইবার পর, নীচের দিক হইতে পুরাতন লাল চেলী বাঁধা একটি ছোট পুটুলি বাহির হইল। সেইটি খুলিয়া দেখিলেন, তাহার মধ্যে তাড়া-বন্দী অনেক নোট রহিয়াছে। তাহা দেখিবামাত্র, সেই ক্ষীণালোকে সেই মৃত্যুকক্ষে গগন-চন্দ্রের মসীকৃষ্ণ মুখমণ্ডলে শুভ্র দন্তপংক্তির ছটা ক্ষণকালের জন্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

ত্বরিতহস্তে অন্য পুটুলিগুলি যথাস্থানে পুনঃসন্নিবিষ্ট করিয়া গগনচন্দ্র সিন্দুকটি বন্ধ করিয়া ফেলিলেন। মহাভারত ও ভাঙ্গা বাক্স ও ঔষধের শিশিগুলি তাহার উপর পূর্ব্ববৎ সাজাইয়া রাখিয়া, প্রদীপ নিভাইয়া দুয়ারে তালা বন্ধ করিয়া, নিজ শয্যাগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

দুয়ারটি বন্ধ করিয়া, প্রদীপ জ্বালিয়া, গগনচন্দ্র শয্যার উপর উপবেশন করিলেন। বালিশের নিম্নে তাঁহার চশমার খোলটি ছিল। চশমাটি চক্ষে লাগাইয়া, নোটের তাড়া-গুলি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।—কেবল দশ টাকার নোট—একখানিও নম্বরওয়ারি নোট তাহাতে ছিল না। একটি তাড়া খুলিয়া নোটগুলি সাবধানে গণনা করিয়া দেখিলেন,—একশতখানি আছে—হাজার টাকা। প্রত্যেক তাড়াটি খুলিয়া একে একে গণনা করিলেন—প্রত্যেকটিতেই হাজার টাকা করিয়া। এরূপ দশটি তাড়া ছিল—দশ হাজার টাকা।

একবার গণিয়া তৃপ্তি হইল না—গগনচন্দ্র নোটগুলি বারংবার গণিয়া গণিয়া দেখিতে লাগিলেন। এরূপ করিতে করিতে ভোর হইয়া পড়িল। তখন তিনি পুটুলিটি নিজের সিন্দুকে বন্ধ করিয়া, প্রদীপ নিভাইয়া, ঘরের বাহির আসিলেন।

দুই একটা কাক ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে—অল্প অল্প আলো হইয়াছে। গাড়ুটি হাতে করিয়া, বাটীর বাহির হইয়া আমবাগানের ভিতর দিয়া গগনচন্দ্র পুষ্করিণীর তীরে উপস্থিত হইলেন। তখনও কোথাও জনমনুষ্যের দেখা নাই। প্রথমেই গগনচন্দ্র, দাদার লোহার সিন্দুকের চাবিটি ছুঁড়িয়া পুষ্করিণীর মধ্যস্থানে নিক্ষেপ করিলেন। তাহার পর হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিয়া গাড়ুতে জল ভরিয়া, ধীরে ধীরে বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন।

॥ ৩ ॥

এই দিন বেলা নয়টার সময় প্রবাস হইতে সদ্যপিতৃহীন নবকুমার বাটী আসিয়া পেঁৗছিল। সে ইতিমধ্যেই নিজের সাধারণ বেশ পরিত্যাগ করিয়া কাচা পরিয়াছে, পদ নগ্ন করিয়া আসিয়াছে।

নবকুমারের বাড়ী পেঁৗছিবার সঙ্গে সঙ্গে আর একবার ক্রন্দনের ধ্বনি উঠিল। তাহা শুনিয়া প্রতিবেশীরা আসিয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিল। সকলে বলিল—"নবু, কেঁদ না বাবা, চুপ কর। বাপ মা কি আর কারু চিরদিন থাকে? এই তোমার খুড়োমশায় রয়েছেন. ইনিই এখন তোমার বাপ হলেন। চুপ কর বাবা।"

প্রতিবেশীরা গৃহ ত্যাগ করিবার সময় পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিল, "আহা—গগন চক্রবর্ত্তী বুড়োর চেহারাটা কি হয়ে গেছে দেখেছ, একদিনে? চোখ-টোক সব একেবারে বসে গেছে।"

একজন বলিল, "আহা, ভাইয়ের শোকটা বড্ড লেগেছে বামুনের।"—চক্ষু বসার আসল কারণ যে সারারাত্রি জাগরণ ও মনের অঙ্গনে শয়তানের তাণ্ডব নৃত্য, তাহা কেহই অনুমান করিতে পারিল না।

যথাসময়ে নবকুমার খুড়ামহাশয়ের সহিত বসিয়া হবিষ্যান্ন ভোজন করিল।

ভোজনান্তে গগনচন্দ্র মাদুর পাতিয়া বসিয়া তামাক খাইতে লাগিলেন, নবকুমার তাঁহার কাছে বসিয়া ছিল। খুড়ামহাশয় বলিলেন, "শ্রাদ্ধশান্তির ত আয়োজন এই বেলা থেকে করতে হবে! টাকাকড়ি কিছু এনেছ?"

নবকুমার বলিল, "টাকাকড়ি আমি কোথায় পাব? বাবার সিন্দুক থেকে কিছু বেরুতে পারে বোধ হয়।"

"তা দেখ—যদি কিছু থাকে।"

"চাবিটা?"

"চাবি? চাবি কোথায় তা ত বলতে পারিনে। হয়ত বউমাকে দিয়ে গেছেন। জিজ্ঞাসা কর দেখি।"

নবকুমার গিয়া সাবিত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল। সাবিত্রী বলিল, "আমাকে ত দিয়ে যাননি। শেষ পর্য্যন্ত তাঁর কোমরের ঘুন্সিতে ছিল দেখেছি। খুড়োমশায় হয়ত খুলে নিয়ে থাকবেন।"

"না—উনি ত বললেন—চাবি কোথায়, কিছুই জানেন না।"

নবকুমার ফিরিয়া আসিয়া খুড়ামহাশয়কে এই কথা বলিল। তিনি বলিলেন, "তাঁর কোমরে ছিল? তা ত লক্ষ্য করিনি। তবে হয়ত তাঁর চিতায় উঠেছে।"

নবকুমার একটু বিরক্তির সঙ্গে বলিল, "ওটা আপনি লক্ষ্য করলেন না?"

খুড়ামহাশয় হুঁকো নামাইয়া কাঁদকাঁদ স্বরে বলিলেন, "আরে বাবা, সে সময় কি আমার চাবি সিন্দুক টাকাকড়ি ভাববার মত মনের অবস্থা ছিল? সে সব তোমরা পার।"

নবকুমার কিয়ৎক্ষণ নীরব রহিল। খুড়ামহাশয় ধূমপান করিয়া যাইতে লাগিলেন। শেষে নবকুমার বলিল, "তবে এখন উপায়?"

"উপায় আর কি? কামার ডাকিয়ে সিন্দুক খোলাতে হবে।"

কামার ডাকাইয়া সিন্দুক খোলান হইল। তাহা হইতে কেবল গুটি তিনেক নগদ টাকা আর নবকুমারের পরলোকগতা জননীর খানকয়েক সোণা রূপার পুরাতন অলঙ্কার বাহির হইল।

ইহা দেখিয়া নবকুমার ত মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। তাহারও বরাবর মনে ধারণা ছিল যে, তাহার পিতার সিন্দুকে নগদ দশ হাজার টাকা আছে। তাহার মনে বিশ্বাস হইল, খুড়ামহাশয়ই সে টাকা সরাইয়াছেন। অথচ তাহার সাক্ষিসাবুদ কিছুই নাই।

খোলা সিন্দুকের সম্মুখে নবকুমার বসিয়া ভাবিতেছিল, এমন সময় খুড়ামহাশয় আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছু পেলে?"

সিন্দুক হইতে যাহা বাহির হইয়াছিল, নবকুমার তাহা দেখাইল। পরে জিজ্ঞাসা করিল, "দশ হাজার টাকা ছিল যে, কোথা গেল?"

গগনচন্দ্র আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "কত টাকা?"

"দশ হাজার।"

খুড়া মহাশয়ের মুখখানি বিবর্ণ হইয়া গেল। একটু কাষ্ঠহাসি হাসিয়া তিনি বলিলেন, দশ হাজার টাকা? পাগল! কোথা পাবেন তিনি?"

নবকুমার বলিল, "কেন, সকলেই ত বলত এই সিন্দুকে তাঁর দশ হাজার টাকা আছে।"

"সকলে ত সব জানে। কেন, দাদা ত সর্ব্বদাই বলতেন, তাঁর এক পয়সাও নেই। তুমি পশ্চিম থেকে যা টাকাকড়ি পাঠাতে মাঝে মাঝে, তাই খরচপত্র করতেন, আর দু-পাঁচ টাকা জমিয়েছিলেন। হ্যাঃ—দশ হাজার টাকা! দশ হাজার টাকা কি সোজা কথা রে বাবা?"

নবকুমার আর কি করিবে? নীরবে মনের সন্দেহ ও রাগ হজম করিয়া যথাসময়ে পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিল। অল্পদিন পরেই তাহার ছুটি ফুরাইল—ভগ্নহৃদয় লইয়া কর্ম্মস্থানে ফিরিয়া যাইতে হইবে। এতদিন তাহার পিতার সেবাশুশ্রূষার জন্য স্ত্রীকে বাটীতে রাখিয়াছিল। এবার সাবিত্রীকে সে পশ্চিমে লইয়া গিয়া নিজের কাছে রাখিবে। স্ত্রীকে বলিয়া গেল, পূজার ছুটি হইতে আর বেশী বিলম্ব নাই। ইতিমধ্যে একটা বাসা ঠিক করিয়া, পূজার সময় আসিয়া তাহাকে লইয়া যাইবে।

॥ ৪ ॥

নবকুমার কলিকাতায় আসিল। পুরাতন গহনাগুলি বিক্রয় করিবে, কিছু কাপড় চোপড়ও কিনিবার প্রয়োজন আছে। সারাদিন বউবাজারে ও বড়বাজারে ঘুরিয়া আড়াইশত টাকায় গহনাগুলি বিক্রয় করিল। বড়বাজারে একটা কাপড়ের দোকানে বসিয়া কিছু কাপড় খরিদ করিল। তাহার পকেটবুকে নোট ছিল, টাকা দিবার জন্য পকেটবুক বাহির করিতে গিয়া দেখে, পকেটবুক নাই—গাঁটকাটায় কখন চুরি করিয়াছে জানিতে পারে নাই!

বিপদের উপর বিপদ! সেই পকেটবুকে তাহার রিটার্ণ টিকিটখানি পর্য্যন্ত ছিল, আড়াইশত টাকার নোট ছিল—খানকতক পুরাতন চিঠিপত্র ছিল।

দোকানের কাপড় দোকানে রাখিয়া নবকুমার বাসায় ফিরিয়া আসিল। আজ পাঞ্জাব মেলে কর্ম্মস্থানে ফিরিবে ভাবিয়াছিল—এমন টাকা নাই যে নূতন টিকিট কিনিয়া ফিরিয়া যায়।

ভাবিল, পরদিন সত্যচরণ আসিলে, আপিসে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া কিছু টাকা ধার লইয়া যাইবে। দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া কোনও রকমে নবকুমার বাসায় রাত্রিযাপন করিল।

প্রভাতে তখনও নবকুমার শয্যাত্যাগ করে নাই—বাসার একটি মোটা বাবু একখানি সংবাদপত্র হাতে করিয়া আসিয়া বলিলেন, "নবকুমারবাবু, দেখুন ঈশ্বর যা করেন, তা ভালর জন্যেই করেন। কাল যে আপনার পকেটবুক চুরি হয়েছিল, সেটা একটা খুব মঙ্গল বলতে হবে।"

নবকুমার আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "কেন, ব্যাপারটা কি?"

স্থূলকলেবর যুবকটি সংবাদপত্র হইতে পাঠ করিলেন—"গতরাত্রে পাঞ্জাব মেল আসানসোলের নিকট পৌঁছিলে একটি মালগাড়ীর সঙ্গে ভীষণ কলিশন হইয়া যায়। দুই তিনখানি যাত্রিগাড়ী চূর্ণ হইয়াছে। ড্রাইভার অত্যন্ত আহত হইয়া হাঁসপাতালে আছে। যাত্রিগণের মধ্যে ছয়জন মৃত ও বাইশজন সাংঘাতিক রকম আহত। মৃতের তালিকা—"

মৃতের তালিকার মধ্যে নবকুমার চক্রবর্ত্তীর নামও পাওয়া গেল।

স্থূলবাবুটি বলিলেন, "কি রকম? আপনিও মরেছেন নাকি?"

নবকুমার বলিল, "বোধ হয় আমার নামের অন্য কেউ।"

যুবকটি হাসিয়া বলিলেন, "আপনি নবকুমারের ভূত ন'ন ত? কি জানি মশাই, বিশ্বাস নেই।"—বলিয়া বাবুটি চলিয়া গেলেন।

এ কথা শুনিয়া নবকুমারের মস্তিষ্কে দুই-একটা কথার উদয় হইল।—সে সকাল-সকাল আহার সারিয়া, সত্যচরণের নিকট টাকা ধার করিয়া আসানসোলে চলিয়া গেল।

সেখানে গিয়া পুলিশ আফিসে সন্ধান লইল। জিজ্ঞাসা করিল, "একজন নবকুমার চক্রবর্ত্তী ব'লে যে মরেছে—আপনারা তার নাম জানলেন কি করে?"

দারোগা বলিল, "তার পকেট থেকে এই পকেটবুকটি বেরিয়েছে।"

নবকুমার দেখিল, তাহারই পকেটবুক—তাহাতে তাহার নোট, চিঠি, রিটার্ণ টিকিট, সবই রহিয়াছে। যাহা মনে করিয়াছিল, তাহাই—সেই গাঁটকাটাই তবে মারা পড়িয়াছে। পাপের এরূপ হাতে হাতে প্রতিফল আজকাল প্রায়ই দেখা যায় না।

দারোগা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কে?"

"আমি নবকুমারের একজন বন্ধু।"

"লাসের কি হবে? অ্যাক্সিডেণ্টের পর আমরা খবরের কাগজে টেলিগ্রাফ করেছি। লাসের আত্মীয়েরা একে কেউ জ্বালাবার বন্দোবস্ত করে ত করবে নইলে আমরা পুড়ে ফেলব।"

নবকুমার একবার ভাবিল, পুড়িয়াই ফেলুক। তাহার মস্তকে এই সময়ে একটা দুর্বুদ্ধি পাকা হইয়া আসিতেছিল। ভাবিল, যদি সংবাদ পাইয়া খুড়ামহাশয় আসেন, ত লাস দেখিয়াই জানিতে পারিবেন, আমি নহি।

দারোগার নিকট লাস জ্বালাইবার অনুমতি চাহিল। দারোগা বলিল, "আর এ টাকাকড়ি? লাসের ওয়ারিশান কে?"

"লাসের এক স্ত্রী আছে, খুড়া আছে। স্ত্রী ওয়ারিশ। খুড়াকে খবর দিলে এসে টাকা নিয়ে যাবে।"

দারোগা খুড়ার ঠিকানা নোট করিয়া লইল।

লাস জ্বালাইয়া নবকুমার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল। স্থূলবাবুটি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি মশাই? খবর কি?"

নবকুমার গম্ভীরভাবে বলিল, "গিয়ে দেখলাম—আমি নই—আর একজন মরেছে বটে!"

বাবুটি বলিলেন, "তবু ভাল।"

পরদিন সত্যচরণের আপিসে গিয়া নবকুমার তাহার সঙ্গে দেখা করিল। শুনিল, যদিও পল্লীগ্রামে দৈনিক কাগজ যায় না, তথাপি লোকমুখে বাটীর লোক তাহার মৃত্যুসংবাদ পাইয়াছে। সত্যচরণের সঙ্গে অনেকক্ষণ গোপন-পরামর্শ করিয়া নবকুমার বাসায় ফিরিয়া আসিল।

॥ ৫ ॥

সন্ধ্যাকালে—গগনচন্দ্র বৈঠকখানায় বসিয়া তামাক খাইতেছেন। পাড়ার দুইচারিজন বৃদ্ধ বসিয়া আছেন। গতকল্য নবকুমারের শ্রাদ্ধ হইয়া গিয়াছে। বৃদ্ধের যেমন ঘটা করিয়া হয়, যুবকের শ্রাদ্ধ সেরূপ হয় না। গগনচন্দ্র আসানসোল হইতে নবকুমারের যে আড়াইশত টাকার নোট আনিয়াছিলেন, তাহারই মধ্য হইতে কেবল পঞ্চাশটি টাকা খরচ করিয়া

শ্রাদ্ধ করিয়াছেন। বাকী দুইশত টাকা নবকুমারের বিধবাকে দিয়াছেন।

সাবিত্রী যখন সধবা ছিল, তখন সর্ব্বত্র তাহার যে একটা সুনাম ছিল—সংপ্রতি তাহাতে অত্যন্ত আঘাত লাগিয়াছে। যেদিন স্বামীর মৃত্যুসংবাদ আসে, সেই দিনমাত্র সে অত্যন্ত কাঁদাকাটি করিয়াছিল। রাত্রে সত্যচরণের স্ত্রী আসিয়া তাহাকে অনেক সান্ত্বনা দিল। পরদিন হইতে সে মুখখানি বিমর্ষ করিয়া থাকে বটে, কিন্তু সদ্যোবিধবার যেরূপ হওয়া উচিত, তাহার কিছুই দেখা যায় না। প্রায় রোজই দ্বিপ্রহরে সত্যচরণের স্ত্রীর কাছে যায়! এ অবস্থায় এরূপ করিয়া পাড়া-বেড়ানো কি তাহার উচিত? এরূপ অস্বাভাবিক বালবিধবা ত হিন্দুগৃহে দেখা যায় না!

সমবেত বৃদ্ধগণের মধ্যে হুঁকাটি নিয়মিতরূপে পরিক্রমণ করিতে লাগিল। এ সভাটি অদ্য প্রায় নীরব, কেবল মাঝে মাঝে কেহ কেহ বলিয়া উঠিতেছেন—'সংসার অনিত্য সকলই মায়া!' কেহ বলিতেছেন—'আহা নবকুমার বড় ভাল ছেলে ছিল—আজকালকার দিনে ও রকম প্রায় দেখা যায় না।'

একটু পরে বাহিরে দ্রুত পদশব্দ শুনা গেল। মুহূর্ত্তে পরে, বাড়ীর চাকর চিনিবাস হাঁপাইতে হাঁপাইতে, গলদঘর্ম্ম হইয়া, দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া বৈঠকখানার ভিতর প্রবেশ করিল। হাঁপাইতে হাঁপাইতে শুধু দুইবার বলিল—"কত্তা! কত্তা!" তাহার মুখে আর কোনও বাক্যনিঃসরণ হইল না—লোকটা সেইখানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

সকলেই অত্যন্ত বিস্মিত ও ভীত হইয়া, প্রচলিত উপায়ে তাহার মুখে জল দিয়া, তাহাকে পাখা করিয়া ক্রমে তাহার চেতনা সম্পাদন করিলেন। ক্রমে লোকটা সুস্থ হইতে লাগিল। সকলে তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে চিনিবাস, অমন করলি কেন?"

চিনিবাস তখন ভয়ে শিহরিয়া বলিল, "রাম রাম রাম! ভূত গো কত্তা!"

উহার মধ্যে যে বৃদ্ধ বাল্যকালে কিঞ্চিৎ ইংরাজি পড়িয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "দূর বেটা চাষা—ভূত কি? ভূত আছে নাকি?"

চিনিবাস চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিল, "ভূত নাই? ঐ পুকুরধারে বাঁশতলায় দেখগা ঠাকুর!"

অনেক প্রশ্নাদির পর ক্রমে ক্রমে চিনিবাস বলিল, কিছু পূর্ব্বে যখন সে পুকুরে বাসন মাজিয়া ফিরিতেছিল, তখন সেই পুকুরের ঈশানকোণে বাঁশঝাড়ের তলায় অন্ধকারে দেখিল—আপাদমস্তক শাদা-কাপড়ে ঢাকা একটা কি বেড়াইতেছে। নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র পদার্থটা কাছে আসিল—ঠিক নবকুমারের মত চেহারা—আর বলিল—'ওরে চিনে—একবার খুড়োমশাইকে ডেকে দিতে পারিস?'—তাহা শুনিবামাত্র চিনিবাস সমস্ত বাসন ও পাথরবাটী সেখানে আছাড়িয়া ফেলিয়া পলাইয়া আসিয়াছে।

ইহা শুনিয়াই খুড়ামহাশয় রামনাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "ঠিক দেখেছিস?"

"ঠিক না ত কি বেঠিক দেখেছি কত্তা? ওরে বাবারে, আর আমি সন্ধ্যাবেলায় বাসন মাজতে যাব না!"

পূর্ব্বোক্ত নাস্তিক-প্রকৃতির বৃদ্ধটি বলিলেন, "চক্রবর্ত্তী মশায়, ঐ কথা আপনি বিশ্বাস করছেন? বেটা অসাবধানে বাসনগুলো ভেঙে ফেলেছে, তাই এসে ঐ কথাটা ওজর করছে।"—কিন্তু বক্তার হৃদয়ের ভিতরটা গোপনে দুরদুর করিতে লাগিল।

সে সন্ধ্যা ত কাটিল। তাহার পর, তিনচার দিন ধরিয়া, পাড়ার ভদ্রলোকেরা আসিয়া গগন চক্রবর্ত্তীর নিকট সংবাদ দিলেন, কেহ দীঘির ধারে, কেহ ভাঙা শিবমন্দিরের নিকট, কেহ অন্য কোথাও, নবকুমারকে দেখিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত নাস্তিক বৃদ্ধটিকে আর সন্ধ্যার পর বাহির হইতে দেখা যায় না। অন্যান্য বৃদ্ধেরা গগন চক্রবর্ত্তীর বৈঠকখানায় আসিয়া বলিতে লাগিলেন, "শাস্ত্র ত মিথ্যে হবার নয়। অপঘাতমৃত্যুটো হল কিনা—ও রকম ত হবারই কথা। বছরটা পুরুক, গয়ায় গিয়ে প্রেতশিলায় একটা পিণ্ড দিইয়ে দাও, উদ্ধার হয়ে যাবেন।"

একদিন সন্ধ্যার পর খুড়ামহাশয় পুষ্করিণীর তীর হইতে মুখ ধুইয়া, জলভরা গাড়ুটি হাতে করিয়া, আমবাগানের ভিতর দিয়া ফিরিতেছিলেন। সহসা এক শ্বেতবস্ত্র-পরিহিত মূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখটি ছাড়া সমস্ত গাত্র বস্ত্রে আবৃত ছিল। আত্মপ্রকাশ করিবামাত্র সে বলিল, "খুড়োমশায়,—সে' দ'শ হাজার টাকা—"

আর শুনিবার পূর্ব্বে, খুড়ামহাশয় সেইখানে গাড়ু আছাড়িয়া ফেলিয়া 'রাম রাম' শব্দ করিতে করিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পলাইলেন।

পরদিন অমাবস্যা—সন্ধ্যার পর খুড়ামহাশয় আর বাটীর বাহির হইলেন না। রাত্রি নয়টার সময় আহার করিয়া শয়ন করিলেন। যখন তিনি গভীর নিদ্রায় মগ্ন—রাত্রি আন্দাজ বারোটার সময়, গাত্রে কাহার অতি শীতল হস্তস্পর্শে খুড়ামহাশয়ের নিদ্রাভঙ্গ হইল। খুড়ামহাশয় চমকিয়া ঘুমের ঘোরে বলিলেন, "কে—ও?"

অন্ধকারের মধ্য হইতে শব্দ হইল, "আমি নবকুমার।"

শুনিবামাত্র খুড়ামহাশয়ের ঘুমের ঘোর চট্ করিয়া ছাড়িয়া গেল।

ভূত বলিল, "সে' দ'শ হাঁজার টাঁকা আমার বঁউকে যঁতদিন না দিঁচ্চ, তঁতদিন রোঁজ আঁসব তাঁগাদা কঁরতে—রোঁজ আঁসব—রোঁজ আঁসব—রোঁজ আঁসব।" বলিয়া নবকুমার চুপ করিল।

খুড়ামহাশয়ের নিশ্বাস তখন ঘনঘন বহিতে লাগিল। ক্রমে তাঁহার দাঁত ঠক্‌ঠক্ করিয়া মূর্চ্ছা উপস্থিত হইল। নবকুমার তখন মেঝের উপর হইতে বরফ বাঁধা পুঁটুলিটি তুলিয়া লইয়া, খোলা জানালার কাছে গিয়া একটি গরাদে সরাইয়া, বাহির হইল। বাহিরে কিয়দ্দূরে সত্যচরণ অপেক্ষা করিতেছিল।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা সত্যচরণ আপিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহারই গৃহে লুক্কাইত নবকুমারকে সংবাদ দিল—খুড়ামহাশয় তাহার সহিত এক ট্রেণেই কলিকাতায় গিয়াছিলেন—সাবিত্রীর নামে দশহাজার টাকার কোম্পানির কাগজ কিনিয়া আনিয়াছেন। সত্যচরণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'এ টাকা কোথা থেকে এল?' গগনচন্দ্র বলিয়াছিলেন, 'টাকাটা ছিল আমার দাদার। সকলে যে বলত, তাঁর দশ হাজার টাকা আছে—তা দেখছি মিথ্যে নয়। কিন্তু তাঁর লোহার সিন্দুক থেকে বেরোয়নি। কালকে রাত্রে হঠাৎ তাঁর পুরাণো টিনের বাক্স খুলে দেখি, এক টুকরো লাল-চেলীতে মোড়া দশ হাজার টাকার নোট। দেখে আমার হরিষে বিষাদ উপস্থিত হল আর কি। আহা, আজ যদি নবু বেঁচে থাকত! পিতৃধন!—যা হোক, বিধবাটার উপায় হল।'

ইহার পর নবকুমার কলিকাতায় গিয়া, খুড়ামহাশয়কে এক চিঠি লিখিল। লিখিল, সে শুনিয়া দুঃখিত হইয়াছে যে, তাহার মৃত্যুর একটা গুজব উঠিয়াছে এবং শ্রাদ্ধশান্তিও হইয়া গিয়াছে—কিন্তু বাস্তবিক সে বাঁচিয়া আছে এবং একটু কার্য্য উপলক্ষ্যে স্থানান্তরে গিয়াছিল। অমুক তারিখে সে বাড়ীতে আসিবে এবং একদিন থাকিয়া স্ত্রীকে লইয়া পশ্চিম যাত্রা করিবে।

নবকুমার বাটী আসিয়া শুনিল, খুড়ামহাশয় কি একটা জরুরি কার্য্য উপলক্ষ্যে গ্রামান্তরে গিয়াছেন। স্ত্রীকে লইয়া সে পশ্চিম চলিয়া গেল।

[আশ্বিন, ১৩১১]

আধুনিক সন্ন্যাসী

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাঁকীপুরে কলেজে পড়িতাম, হিন্দুয়ানির দিকে ঝোঁকটা অত্যন্ত প্রবল ছিল। মস্তকে প্রকাণ্ড একটি শিখা ছিল। প্রত্যহ প্রাতে উঠিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতাম। মাছটা খাইতাম, কিন্তু মাংস খাইতাম না। আমাদের মেসের বাসায় সপ্তাহে একদিন

করিয়া মাংস হইত। সেদিন ম্যানেজার আমার জন্য পায়সের বন্দোবস্ত করিতেন।

বাঁকীপুরে একটি "মহাদেব-স্থান" আছে,—সেখানে প্রায়ই গিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতাম,—যদি কোন সাধুমহাত্মার দর্শন পাই। "সাধু"র দর্শন মোটেই দুর্লভ ছিল না, কিন্তু সাধুমহাত্মার দর্শন কখনও ঘটে নাই। অধিকাংশ সাধুই নিরক্ষর,—শাস্ত্রজ্ঞান আদৌ নাই বলিলেই হয়,—কেবল কতিপয় বাঁধা বুলি মুখস্থ আছে; আর গঞ্জিকা ভস্ম করিতে নিতান্তই সুনিপুণ। তবু তাহাদের কাছে গিয়া বসিয়া থাকিতাম, ধর্ম্মতত্ত্ববিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করিতাম। তুলসীদাস বলিয়াছেন—

সব সে বসিহো, সব সে রসিহো
সব সে মিলিহো ধায়
ক্যা জানে ক্যা ভেখ্ মে
নারায়ণ মিল যায়।

আমি তখন বি-এ ক্লাসে পড়ি, পরীক্ষার আর পাঁচদিন মাত্র বিলম্ব আছে। একজন আসিয়া সংবাদ দিল, গঙ্গাতীরে একজন যথার্থ সাধু আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। শুনিয়া আমি তৎক্ষণাৎ পুস্তকাদি বন্ধ করিয়া বাহির হইলাম। একাকী গঙ্গাতীরাভিমুখে প্রস্থান করিলাম।

তখন বেলা তিনটা। গঙ্গাতীরে, স্নানের ঘাটগুলি হইতে দূরে, একখানি খড়ে বাঁধা ক্ষুদ্র কুটীর আছে। সেইখানে সাধুবাবা আশ্রম স্থাপনা করিয়াছেন। আমি নগ্নপদে সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, তিন চারিজন হিন্দুস্থানী ব্যক্তি সাধুবাবার কাছে বসিয়া আছে। সাধুবাবা হিন্দিতে তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিতেছেন।

আমি একটি শালপাতার ঠোঙ্গায় করিয়া কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন লইয়া গিয়াছিলাম। সেই মিষ্টান্ন এবং একটি সিকি সাধুবাবার পদপ্রান্তে রাখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। দেখিলাম, অন্যান্য ভক্তগণেরও উপহার সেখানে রক্ষিত রহিয়াছে।

সাধুবাবা হিন্দুস্থানী কয়েকটির সঙ্গে তুলসীদাসের রামায়ণ সম্বন্ধে আলাপ করিতে লাগিলেন। বলিতে লাগিলেন, "দেখ, আমি বাঙ্গালী,—আমাদের বাঙ্গালা রামায়ণ আছে; কিন্তু তুলসীদাস তাঁহার গ্রন্থে ভক্তিরসের যেরূপ ফোয়ারা তুলিয়াছেন,—সেরূপ আমাদের রামায়ণে নাই।"—বলিয়া তিনি তুলসীদাস হইতে নানাস্থান আবৃত্তি করিয়া যাইতে লাগিলেন।

এ ব্যাপারে আমার মনে যেন একটু খট্‌কা লাগিল। কথাটা যেন একটু খোসামোদের মত শুনাইতেছে না?—খরিদ্দার খুসী করার মত? কাষ হাঁসিল করার মত? আমাদের গ্রামে একটি বিধবা ছিলেন,—পত্র লেখাইবার প্রয়োজন হইলে আমার কাছে আসিয়া বলিতেন—"আহা, রাজুর হাতের নেকাগুলি যেন মুক্তোর মত।—একখানি চিটি নিকে দেবে বাপধন?"

হিন্দুস্থানীরা প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। তখন সাধুবাবা প্রণামীর পয়সাগুলি জড় করিয়া গণিয়া দেখিলেন। সিকি, দুয়ানী ও পয়সা অনেকগুলি হইয়াছিল। গণিয়া বাবাজীর মুখ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। আমি তখন মনে ভাবিতেছি, 'ইনিও একটি ভণ্ড-সাধু। আমার সময় ও অর্থব্যয় বৃথা হইয়াছে।'—কিন্তু পরক্ষণেই সাধুবাবা যে কথা বলিলেন, তাহাতে আমার পূর্ব্বভাব তৎক্ষণাৎ তিরোহিত হইল, এবং মন ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

সাধুবাবা বলিলেন, "আজ প্রণামীতে প্রায় একটাকা পাইয়াছি। এই টাকাটি দুর্ভিক্ষ-ভাণ্ডারে যাইবে। ইহাতে ষোলজন লোকের একবেলার আহার সম্পন্ন হইবে।"

আমি অনেক সাধুর সঙ্গে বেড়াইয়াছি,—কোনও সাধুর মুখে ত কখন দুর্ভিক্ষ-ভাণ্ডার বা ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির প্রতি মমতার কথা শুনি নাই।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি প্রণামীতে যাহা পান, সমস্তই কি ঐ প্রকারে সদ্ব্যবহার করেন?"

"সমস্ত। একটি কর্পদকও আমি রাখি না।"

"তবে আপনার চলে কি করিয়া?"

তিনি আমার প্রদত্ত ও অন্য কয়েকটি মিষ্টান্নের ঠোঙ্গা দেখাইয়া বলিলেন, "এই দেখ। আমার কি ক্ষুধায় মরিবার উপায় আছে?"

আমি বলিলাম, "আপনি সন্ন্যাসী মানুষ,—নানাস্থানে পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়ান, —এমন ত অনেক দিন হইতে পারে যে ভক্তের উপহার আসিয়া পৌঁছিল না। সেদিন কি করেন?"

সাধুবাবা বলিলেন, "একটু ভুল করিয়াছ! ইহা ভক্তের উপহার নহে,—ভগবানেরই উপহার। আমার কায আমি করিয়া যাই, তাঁহার কায তিনি করেন।"

মনে হইল, লোকটি ভক্তির উপযুক্ত বটে। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার নাম কি?"

"রাজীবলোচন ঘোষাল।"

আমার অন্যান্য পরিচয়ও তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন। সমস্তই বলিলাম। সব শুনিয়া তিনি বলিলেন, "তোমার পরীক্ষার আর পাঁচ দিন মাত্র বিলম্ব আছে—আর তুমি পাঠে অবহেলা করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছ?"

আমি বলিলাম, "অর্থকরী বিদ্যার আমার চিত্ত নাই। সাধু মহাত্মাগণের সংগই আমার পক্ষে আনন্দপ্রদ।"

সাধুবাবা কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন "দেখ, পথ অনেক আছে। যে যে পথ অবলম্বন করিয়াছে, তাহার পক্ষে সেই পথ ধরিয়া চলাই কর্ত্তব্য। এক পথে দাঁড়াইয়া, অপর পথের পানে প্রলুব্ধ দৃষ্টিপাত করিলে, অপর পথেও তুমি পৌঁছিবে না, অথচ যে পথে আছ সে পথেও অগ্রসর হইতে পারিবে না। যে পথে থাক, আশে পাশে তাকাইবে না, সম্মুখে সিধা তাকাইবে। এই জন্যই ত ঘোড়ার চোখে দুইটা ঠুলি বাঁধিয়া দেয়: ঘোড়া কেবল সম্মুখের পথই দেখিতে পায়, সম্মুখে ছুটিয়া চলে।"

এখন হইলে এ যুক্তির মধ্যে ছিদ্র ধরিতে পারিতাম; কিন্তু তখন ইহা শুনিয়া মোহিত হইয়া গেলাম। মনে হইল, হাঁ—এইবার একটি প্রকৃত সাধুর দর্শন পাইয়াছি বটে। তাঁহার নিকট ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিতে আমার একান্ত আকাঙ্ক্ষা দেখিয়া বলিলেন, "আগে আরব্ধকার্য্য সমাপ্ত কর। পরীক্ষা হইয়া যাউক, তাহার পর আমার কাছে আসিও।"

আমি বলিলাম, "আপনার আদেশ শিরোধার্য্য। কিন্তু ইতিমধ্যে অন্ততঃ আর একবার মাত্র আপনার শ্রীচরণদর্শন করিতে আজ্ঞা করুন।"

"তোমার পরীক্ষা কবে?"

"এই সোমবার দিন।"

"আচ্ছা, সোমবার প্রভাতে একবার আমার কাছে আসিও। আমার 'শ্রীচরণদর্শন' করিবার জন্য নহে,—তোমার পরীক্ষা সম্বন্ধে তোমায় কোনও আবশ্যক কথা বলিব।"

কিয়ৎক্ষণ কথোপকথনের পরে, আমি উঠিবার সংকল্প করিতেছি, সাধুবাবা বলিলেন, "সাধুসেবা করিবার তোমার বড়ই আকাঙ্ক্ষা,—একটা কায কর দেখি।"

আমি যেন নিজেকে ধন্য মানিয়া বলিলাম, "আজ্ঞা করুন।"

বাবা বলিলেন, "ঐখানে কমণ্ডলুটা আছে, গঙ্গা হইতে জল ভরিয়া লইয়া আইস।"

আমি জল আনিয়া রাখিলাম। সাধুবাবা অন্যদিকে চাহিয়া, অন্যমনে বলিলেন—"Thanks."

সাধু সন্ন্যাসীর মুখে "Thanks"ও এই প্রথম শুনিলাম। তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিস্ময় ও আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

বাসায় আসিয়া পাঠে মনোনিবেশ করিলাম। এ পাঁচদিন অনবরত অধ্যয়ন করিয়া পরীক্ষার দিন প্রভাতে উঠিয়া সাধুদর্শন করিতে চলিলাম।

আমার পরীক্ষা সম্বন্ধে কি আবশ্যক কথা সাধুবাবা বলিবেন, এ বিষয়ে আমার মনে একটা কৌতূহল হইয়াছিল। বাসার সকলের কাছে সাধুবাবার গল্প করিয়াছিলাম। কেহ কেহ বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিল,—"বোধ হয় কোনও প্রশ্ন-টশ্ন বলে দেবেন। ওঁদের ভূত ভবিষ্যৎ সবই জানা আছে কিনা।"—আর একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি। গল্পের শুনা গিয়াছে ঐ সাধুবাবা ইংরাজিতে একজন ব্যুৎপন্ন লোক,—তিনি নাকি এম-এ পাস! সুধাংশুবাবু নামক আমার একজন সহপাঠী—তিনি এম-এ পাস শুনিয়া ঠাট্টা করিয়া বলিলেন—"এম-এ পাস না হাতী পাস।"—তাহার পর হইতে রাগে সুধাংশুবাবুর সহিত আমি ভাল করিয়া কথা কহিতাম না।

গঙ্গাতীরে গিয়া প্রথমে স্নান করিলাম। স্নানান্তে, সিক্ত বস্ত্রখানি হস্তে লইয়া, সাধুবাবার কুটীরের উদ্দেশে যাত্রা করিলাম।

তখন সেই মাত্র সূর্য্যোদয় হইয়াছে। গিয়া দেখিলাম, কুটীরের সম্মুখে অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছে, তাহার সম্মুখে বসিয়া সাধুবাবা ধ্যানস্থ।

কিয়ৎক্ষণ বসিয়া থাকার পর সাধুবাবা নয়ন উন্মীলন করিলেন। আমি প্রণাম করিলাম।

তিনি বলিলেন, "আজ তোমার পরীক্ষা?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তোমায় আজ কিছু বলিব বলিয়াছিলাম। তাহা অতি সামান্য কথা অথচ প্রয়োজনীয় কথাও বটে। দেখ, আর্য্যধর্ম্মে পুরাকাল হইতে ফুল দিয়া দেবতার পূজা করিবার কেন ব্যবস্থা আছে বলিতে পার?"

আমি বলিলাম, "ফুল সুগন্ধপূর্ণ জিনিষ দেবতার প্রীতির জন্য ফুল দিয়া পূজা করা হয়।"

সাধুবাবা বলিলেন "ভুল। দেবতা নির্ব্বিকার। ফুলের গন্ধে তাঁহার প্রীতি হইবে কি করিয়া? না, ফুল দেবতার প্রীতির জন্য নহে,—পূজকের প্রীতির জন্যই। ফুলের গন্ধে পূজকের মনে আনন্দের ভাব হইবে বলিয়া। আনন্দপূর্ণ মনে কোনও কার্য্য করিলে তাহা যেমন সফল হয়, সেরূপ আর কিছুতেই হয় না। তুমি বাসায় ফিরিবার সময় এক শিশি সুগন্ধি দ্রব্য কিনিয়া লইয়া যাইও। যদি দেশী পাও ত বিলাতী কিনিও না, কারণ দেশীয় শিল্পের উৎসাহবর্দ্ধন করা আমাদের সকলের কর্ত্তব্য। সেই সুগন্ধি রুমালে, চাদরে একটু মাখিয়া পরীক্ষালয়ে যাইবে। মন ভাল থাকিলে ভাল লিখিতে পারিবে।"

আরও দুই চারি কথার পর জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমাদের শেক্সপিয়রের কি কি নাটক পাঠ্য আছে?"

আমি বলিলাম, "Hamlet, Julius Caesar ও Tempest.

সাধুবাবা বলিলেন, "আহা, Hamlet! উহার তুল্য পুস্তক আর কোনও ভাষায় পাঠ করি নাই।" বলিয়া—"To be, or, not to be, that is the Question." হইতে আরম্ভ করিয়া সুন্দর রূপে আবৃত্তি করিলেন।

সাধুবাবা যে এম-এ পাস এ সম্বন্ধে তখন আর আমার অণুমাত্রও সন্দেহ রহিল না।

বাসায় ফিরিলে অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হে, বাবাজী কি বললেন?"

আমি সকল কথাই বলিলাম। শুনিয়া দুই একজন বলিল, "দেখ লোকটা এম-এ পাস হোক্ না হোক্;—বুজরুক নয়।" কেহ কেহ বলিল, "লোকটার উপর ভক্তি হচ্ছে। পরীক্ষাটা হয়ে যাক, একদিন দেখতে যেতে হবে।"

আমি মনে মনে অত্যন্ত গর্ব্ব অনুভব করিতে লাগিলাম। ভাবিয়া রাখিলাম, পরীক্ষাটা হইয়া যাউক—ইহাদিগকে একবার লইয়া দেখাইয়া আনিব,—সাধুবাবা কিরূপ অসাধারণ ব্যক্তি। ইংরাজি সাহিত্য সম্বন্ধে কথা তুলিয়া, সকলকে, বিশেষতঃ সুধাংশুকে দেখাইব, সাধুবাবা কিরূপ সুপণ্ডিত ব্যক্তি।

পরীক্ষা হইয়া গেল। সেইদিন সন্ধ্যাবেলাই বাসার কয়েকজনকে লইয়া সাধুদর্শনে চলিলাম। গর্ব্বে আমার বক্ষ স্ফীত হইতে লাগিল। এই সাধুবাবা যেন বিশেষ করিয়া আমারই সম্পত্তি—দেখুক সকলে, দেখিয়া বিস্ময়ে আপ্লুত হউক। যাহারা গৈরিক বসনে, জটা ধারণ করিয়া, ভস্ম মাখিয়া বেড়ায়, তাহারা যে সকলেই "হাম্বাগ" নহে,—তাহা দেখুক উহারা।

মাঠের ভিতর দিয়া গঙ্গাতীরে যাইতে হয়। বিজয়ী বীরের ন্যায় সগর্ব্বে পদক্ষেপ করিয়া অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলাম।

কুটীরে পৌঁছিয়া দেখিলাম, কুটীর শূন্য, কিন্তু তাহার চারিপাশে অনেক লোকের সমাগম হইয়াছে। সাধুবাবা কোথায় জিজ্ঞাসা করায় কতিপয় লোক বলিল—'সাধুবাবা! এই কতক্ষণ হইল সাধুবাবাকে পুলিসে ধরিয়া লইয়া গেল। তিনি কলিকাতার বেঙ্গল ব্যাঙ্কে জাল চেক ভাঙ্গাইয়া বিশ হাজার টাকা লইয়া সট্‌কাইয়াছিলেন। ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছিল। এই কতক্ষণ হইল ডিটেকটিভ পুলিস আসিয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেল।'

আমি বজ্রাহতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলাম। সুধাংশু আমার পানে চাহিয়া ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিতে লাগিল।

হাতে বন্দুক থাকিলে আমি তাহাকে গুলি করিয়া ফেলিতে পারিতাম।

[মাঘ, ১৩১১]

গুরুজনের কথা

॥ ১ ॥

ডাক্তার চৌধুরী হুগলির সিভিল সার্জ্জন স্বরূপ বদলি হইয়া আসিবার মাস দুই পরেই শুনা গেল, কলেজের অধ্যাপক রজনীবাবুর সহিত তাঁহার কন্যা প্রভাবতীর বিবাহ হইবে।

ইহার কিছুদিন পরে দেখা গেল, রবিবার ও অন্যান্য ছুটির দিন প্রভাতে এই দুইটি নবীন প্রণয়ী দুইখানি বাইসিক্লে চড়িয়া বেড়াইতে বাহির হয়।

প্রভা ও রজনী হুগলির চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী বহু গ্রামের ভিতর দিয়া চক্রচালনা করিয়া তত্তৎ গ্রামবাসীদের মধ্যে বিপুল বিতর্কের সৃষ্টি করিয়া তুলিল। বাঙ্গালীর মেয়েকে বাইসিক্লে দেখিয়া বৃদ্ধেরা মন্তব্য করিলেন ঠিক এতদিনে ঘোর কলিকাল উপস্থিত হইয়াছে;—নিষ্কর্ম্মা যুবকেরা পরামর্শ করিয়া, ঘটনাটির উপর বিলক্ষণ রঙ দিয়া—সংবাদপত্রে লিখিয়া পাঠাইল;—আর যুবতীরা ঘোমটার আড়াল হইতে এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া, পরস্পরকে বলিতে লাগিল—'ধন্যি মেয়ে বটে।'—কিন্তু এই সমস্ত মন্তব্যাদি প্রভা ও রজনীর কর্ণগোচর হইবার কোনই সুযোগ ছিল না:—তাহারা কেবল পরস্পরের বিরল সঙ্গসুখ উপভোগ করিতেই ব্যস্ত রহিয়া গেল।

এইরূপ করিয়া আরও মাস দুই কাটিয়াছে। বিবাহের দিনস্থির হইয়াছে ইংরাজি নববর্ষের দিন—১লা জানুয়ারী। ডাক্তার চৌধুরীর ইচ্ছা ছিল বিবাহ হুগলিতেই সম্পন্ন হয়—কিন্তু তাঁর সহধর্ম্মিণীর ইচ্ছা তাহা নহে। তাঁহার ইচ্ছা কলিকাতার বাড়ীতে গিয়া বিবাহ হয়; নহিলে আমোদ উৎসবের সুযোগ পাওয়া যাইবে না। ডাক্তার চৌধুরী প্রথমে ক্ষীণভাবে কিঞ্চিৎ আপত্তি করিলেন—বলিলেন কলিকাতায় গেলে খরচপত্র বেশী হইয়া যাইবে ইত্যাদি। কিন্তু গৃহিণী সে আপত্তিতে কর্ণপাত করিলেন না। সর্ব্বত্র

যাহা হয়—গৃহিণীর মতই বজায় রহিয়া গেল—কর্তাকে পরাস্ত মানিতে হইল।

কলিকাতায় গিয়া বিবাহ হইবে শুনিয়া কিন্তু প্রভা ও রজনী একটি অভিনব পরামর্শ করিয়া বসিয়াছে। তাহা যেমন অদ্ভুত তেমনই বিপজ্জনক। তাহারা পরামর্শ করিয়াছে ঐ দিন প্রভাতে অন্যান্য সকলের সঙ্গে রেলে কলিকাতায় না গিয়া—দুইজনে একাকী বাইসিক্লে যাত্রা করিবে। কিন্তু অভিভাবকেরা এ কথা শুনিয়া অবাক হইয়া গেলেন। প্রভা ও রজনীর উপস্থিতিকালে পারিবারিক সভায় এ বিষয়ের একদিন আলোচনা হইল। বাধাপ্রাপ্ত হইয়া প্রভার চক্ষু দুইটি জলপূর্ণ হইয়া আসিল।

তখন সকলে রজনীকে বলিল, "আচ্ছা প্রভা না হয় ছেলেমানুষ, তুমি কি বল?"

হায়, প্রেমটা এমনি জিনিস—তাহাতে পড়িলে কলেজের অধ্যাপকেরও বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া যায়। রজনী একটু হাসিয়া বলিল, "আপনারা যে রকম বিপদ আশঙ্কা করছেন, তার কোনও কারণ নেই। গঙ্গার ধার দিয়ে বরাবর ভাল রাস্তা আছে। শীতের সকালবেলা রোদ্দুরের প্রভাবে কোনও কষ্ট হবার ভয় নেই।"

প্রভার মা বলিলেন, "আচ্ছা কোনও বিপদের আশঙ্কা নেই যেন, কিন্তু তোমরা কি ঠিক সময় পৌঁছতে পারবে? কখ্‌খনো পারবে না। এখান থেকে দধিমঙ্গল ক'রে বেরুতে হবে। কলকাতায় গিয়ে গায়ে-হলুদের বন্দোবস্ত। ন'টা দশটার মধ্যে কলকাতায় পৌঁছতে পারবে? কখ্‌খনো পারবে না। ও সব মৎলব ছেড়ে দাও।"

বলিয়া রাখি, যদিও ইঁহারা নব্যতন্ত্রের লোক তথাপি বিবাহের আপত্তিবিহীন সনাতন আচারগুলি রক্ষা করিতে সমুৎসুক। দধিমঙ্গলে শাঁখ বাজাইবার জন্য কলিকাতা হইতে প্রভার দিদি নলিনী সংপ্রতি এখানে আসিয়াছেন।

রজনী বলিল, "কলিকাতা এখান থেকে চব্বিশ মাইল বই ত নয়—ন'টা দশটার অনেক আগে আমরা পৌঁছতে পারব।"

নলিনী বলিলেন, "গুরুজনের কথা না শোন কাণে—শেষকালে অনুতাপ করতে হবে দেখো।"

ইহা শুনিয়া প্রভা তাহার দিদির উপর কট্‌মট্‌ করিয়া সরোষ নেত্রপাত করিল। তাহার চক্ষে যদি সংপ্রতি জলের পরিবর্ত্তে অগ্নি থাকিত তবে দিদি অবিলম্বে ভস্মসাৎ হইয়া যাইতেন সন্দেহ নাই।

যাহা হউক, ক্রমে সকলের মত হইয়া গেল। প্রভারও সজলচক্ষে আবার হাসি দেখা দিল।

॥ ২ ॥

আজ নববর্ষ—আজ প্রভা ও রজনীর বিবাহ। ভোরবেলা চৌধুরী পরিবারের সকলে জাগিয়া উঠিয়াছেন। এখনি দধিমঙ্গল হইবে। প্রথমে অনেক আপত্তিসত্ত্বেও, রজনীও আসিয়া এইখানে প্রভার সহিত দধিমঙ্গল খাইতে স্বীকৃত হইয়াছে।

সমস্ত প্রস্তুত। রজনী আসিলেই হয়। ক্রমে বাহিরের অন্ধকার হইতে চক্রের শব্দ এবং ঘণ্টার ঠুংঠুং ধ্বনি আসিল।

মুহূর্ত্ত পরেই রজনী আসিয়া প্রবেশ করিল। সে তাহার জিনিসপত্র ভৃত্যহস্তে রেলে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিয়াছে। যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে।

নলিনী পরিহাস করিয়া বলিলেন, "আগে বরকনের দধিমঙ্গল আলাদা আদালা হত।"

প্রভার মা বলিলেন, "তুই ত জিদ্‌ ক'রে বেচারিকে আনালি। এখন আবার ঠাট্টা করছিস কেন?"

রজনী বলিল, "দেখুন ত একবার অন্যায়। উনি আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন—'আমার বিয়ের সময় আমাকে একলা দধিমঙ্গল খেতে হয়েছিল, সে দুঃখ আমার এখনও মনে আছে। আমার ত দিদি ছিল না। প্রভাকে দিয়ে আমার সে সাধ পূর্ণ হোক।' এখন এই কথা বলছেন!"

নলিনী শুনিয়া গালে হাত দিয়া বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! আমি বলেছি? কখন বললাম তোমায়?"

"আপনি বলেন নি?"

"কখনো না।"

"তা না হতে পারে। কিন্তু তখন আপনার মুখ দেখে আমার মনে হয়েছিল, আপনার মনের ভিতর ঠিক ঐ রকম ভাবটাই জাগছে।"

সকলে শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন।

নলিনী বলিলেন, "তোমার ত আশ্চর্য্য ক্ষমতা! মানুষের মুখ দেখে তার মনের কথা বলতে পার নাকি?"

"অনায়াসে।"

"আচ্ছা, আমার মনে এখন কি কথা হচ্ছে বল দেখি?"—বলিয়া নলিনী মুখখানি পরম গম্ভীর করিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

রজনী গম্ভীরতর ভাবে, পকেট হইতে তাহার চশমাখানি বাহির করিয়া চক্ষে লাগাইল। পরে অত্যন্ত বিচক্ষণভাবে, ঝুঁকিয়া, নলিনীর মুখখানি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। শেষে বলিল, "ভয়ে কব, কি নির্ভয়ে কব?"

"ভয় ছেড়ে নির্ভয়ে কও।"

"আপনার মনে হচ্চে, কতক্ষণে কলকাতায় পৌঁছবেন—কতক্ষণে একটি ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে।" নলিনীর স্বামী তখন কলকাতায় ছিলেন।

নলিনী বলিলেন, "ভুল। আমার মনে হচ্ছিল তুমি একটি প্রকাণ্ড গর্দ্দভ।"

রজনী অত্যন্ত বিনয়ের ভাণ করিয়া বলিল, "আহা অযথা আমায় কেন বাড়িয়ে তোলেন? আমি ক্ষুদ্র-প্রাণী মাত্র।"

আবার হাসি পড়িয়া গেল। এইরূপ হাস্যামোদের মধ্যে দধিমঙ্গল সমাপ্ত হইল।

তখন ভোর পাঁচটা। ছয়টার সময় ট্রেণ ছাড়িবে—সেই ট্রেণে সকলে কলিকাতা যাত্রা করিবেন। বাহিরে ঘোড়ার গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

সকলে প্রস্তুত হইয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। প্রভার মা রজনীকে বলিলেন, "খুব সাবধানে যাবে তোমরা। পথে যেন কোনও বিপদ ঘটিও না বাছা। আর, খুব সকাল সকাল পেঁাছতে হবে। বেলা আটটার বেশী দেরি না হয়। কলকাতায় গিয়ে তবে গায়েহলুদ হবে। তোমাদের বাড়ী থেকে তেল আসবে, ক্ষীর আসবে, মাছ আসবে, তবে সেই তেল হলুদ মেখে প্রভা স্নান করবে—সেই ক্ষীর, মাছ প্রভা খাবে। আর, পথে যেন কিছু খেও না। গায়েহলুদের আগে কিছু খেতে নেই।"

নলিনী বলিলেন, "খালি তেল হলুদ, ক্ষীর, মাছ আসবে কেন? তার সঙ্গে সঙ্গে রজনীও আসুক না।"

রজনী বলিল, "ফাউস্বরূপ নাকি?"

নলিনী বলিলেন, "না—বাহক হয়ে, বকশিস পাবে।"

হাস্যালাপের সঙ্গে সঙ্গে ইঁহারা গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। তখনও প্রভার মা জানালা হইতে মুখ বাহির করিয়া বলিতেছেন, "খুব সাবধানে যাবে।" নলিনীর কণ্ঠস্বর শুনা গেল, "গুরুজনের কথা না শুন কাণে—।"

আর শুনা গেল না। গাড়ী ফটকের বাহিরে গিয়া পড়িল।

॥ ৩ ॥

ক্রমে আলো হইতে লাগিল। রজনীকে একাকী রাখিয়া প্রভা যাত্রার জন্য সজ্জিত হইতে গেল। কয়েক মিনিট পরে দুইখানি বাইসিক্ল লইয়া দুজনে বারান্দার নিম্নে বাগানে আসিয়া দাঁড়াইল।

তখনও আলোকের পরিমাণ অত্যন্ত অল্প। বাগানে দেশী বিলাতী অনেকগুলি

ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে—দূরের ফুল তখনও ভাল নজর হয় না। তাহাদের মিশ্রিত সৌরভটুকু অনুভব করা যায় মাত্র। প্রভা ও রজনী কয়েক মুহূর্ত্ত একাকী এই বাগানে দাঁড়াইয়া রহিল।

যাত্রার পূর্ব্বে সস্নেহে রজনী প্রভার হস্ত নিজ হস্তযুগলের মধ্যে ধারণ করিয়া বলিল, "প্রভা, আজ আমরা কোথা যাচ্চি ?"

প্রভার মনে উত্তর জাগিল, 'সুখসাগরে স্নান করিতে'—কিন্তু লজ্জায় সে কথা মুখ দিয়া বাহির হইল না। সে শুধু সমীপস্থ একটি গাছ হইতে একটি শিশিরসিক্ত নবস্ফুট গোলাপ তুলিয়া রজনীর কোটে লাগাইয়া দিল। রজনী ধন্যবাদ দেওয়ার হিসাবে স্বীয় প্রিয়তমার আরক্তিম ওষ্ঠপুটে একটি চুম্বন মুদ্রিত করিয়া দিল।

তখন আরও একটু আলো হইয়াছে। আকাশ ধূসরতা পরিত্যাগ করিয়া নীলাভ হইয়া আসিতেছে। বাইসিক্লে আরোহণ করিয়া দুইজনে যাত্রা করিল।

হুগলি সহরের সীমানা অতিক্রম করিতে অধিকক্ষণ লাগিল না। এ পথে পূর্ব্বে ইহারা কতবার গিয়াছে—তবে কখন পাঁচ সাত মাইলের বেশী যায় নাই। বেশ শীত করিতে লাগিল। বাইসিক্ল দুইখানি দ্রুতভাবে পাশাপাশি যাইতেছে।

পথের দুইধারে তরুগুল্মের সারি। বামে মাঝে মাঝে গঙ্গা দেখা যায়। দক্ষিণে মাঠ। খানিকটা মাঠ—তাহার পরেই রেলওয়ে লাইন। কিয়ৎক্ষণ পরে সশব্দে কলিকাতাভিমুখে প্যাসেঞ্জার ট্রেণ বাহির হইয়া গেল। তাহাতে প্রভার পিতামাতা প্রভৃতি ছিলেন, কিন্তু কাহারও মুখ দেখা গেল না।

ক্রমে সূর্য্যোদয় হইল—তখন শীতক্লেশ অনেকটা নিবারিত হইল। এখন ইহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ভ্রমিত পথের বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে। পথে দুই একটি করিয়া লোকসমাগম আরম্ভ হইয়াছে। দুই একখানি গরুর গাড়ীও চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। রেলওয়ে লাইন আর দেখা যায় না। পথ গঙ্গার সন্নিকট দিয়া যাইতেছে। মাঝে মাঝে দক্ষিণ পার্শ্বে দূরে বৃক্ষাবলীর মধ্যে কোনও গ্রামের মন্দিরচূড়া জাগিয়া উঠে, আবার দেখিতে দেখিতে তাহা দ্রুতগামী আরোহিদ্বয়ের পশ্চাতে পড়িয়া যায়।

ক্রমে সূর্য্য উচ্চে উঠিল, বেশ রৌদ্র হইল। কিন্তু এখন একটু অসুবিধা বোধ হইতে লাগিল। ঠিক সম্মুখে সূর্য্য। উত্তাপে প্রভার মুখখানি লাল হইয়া উঠিল। এ সম্ভাবিত অসুবিধাটির কথা কিন্তু পূর্ব্বে প্রভা বা রজনী কাহারও মনে হয় নাই। নবপ্রণয়ীরা ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কবেই বা কার্য করিয়া থাকে ?

যখন অনুমান পনেরো ষোল মাইল অতিক্রান্ত হইয়াছে, তখন সম্মুখরৌদ্রে প্রভার বিশেষ কষ্ট হইতে লাগিল। রজনী বেশ বুঝিতে পারিল যে প্রভার কষ্ট হইতেছে, কিন্তু প্রভা তাহা স্বীকার করিবে না। স্বীকার করিলেই বা উপায় কি?

কিন্তু প্রভার যখন অত্যন্ত পিপাসা পাইল—তখন আর প্রভা থাকিতে পারিল না—রজনীকে বলিল। পার্শ্বেই গঙ্গা। রজনী প্রস্তাব করিল—এইখানে থামিয়া, গঙ্গাতীরে গিয়া তাহারা উভয়ে জলপান করিয়া আসিবে। পথে একজন রাখাল-বালক চলিতেছিল, বকশিসের লোভে সে বাইসিক্ল দুইখানা আগলাইতে সম্মত হইল।

প্রভা ও রজনী বাইসিক্ল হইতে অবতরণ করিয়া গঙ্গাভিমুখে চলিল। রাস্তা হইতে নামিয়া শস্যক্ষেত্র—মধ্যে সরু আল-পথ। গঙ্গার ঠিক তীরের উপর আমের বাগান।

ঘাটে পৌঁছিয়া, ঠিক সেইখানটাতেই জল খাইবার সুবিধা হইল না। একটুকু ওদিকে সরিয়া যাইতে হইল। সেখানে একটা বৃহৎ পাথর অর্দ্ধজলমগ্ন অবস্থায় পড়িয়াছিল। তাহার উপর বসিয়া প্রভা ও রজনী মুখে হাতে জল দিয়া শ্রান্তি দূর করিল। অঞ্জলি ভরিয়া শীতল গঙ্গার নির্ম্মল জল পান করিয়া বাঁচিল।

ঈষৎ বায়ুসঞ্চারে গঙ্গাবক্ষ তরঙ্গায়িত। সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গের উপর রৌদ্র পড়িয়া ঝলমল করিতেছে। ওপারে একটি গ্রাম দেখা যাইতেছে। দুই একখানি জেলে-নৌকা নাচিতে নাচিতে অনেক দূর দিয়া চলিয়া গেল।

শ্রান্তি দূর হইলে প্রভা ও রজনী ধীরে ধীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। যেখান দিয়া নামিয়াছিল, সেইখান দিয়া উঠিয়া নির্জ্জন আমবাগানের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিল। অনেকগুলি গাছে আম্রমুকুল ধরিয়াছে, তাহার মদিরগন্ধে বাতাস পরিপ্লাবিত। আমবাগানের পরেই শস্যক্ষেত্র। একদিকে কড়াইস্ুঁটির ক্ষেত, অপরদিকে সরিষা। সরু আল-পথ দিয়া দুইজনে চলিয়াছে; দাঁড়াইয়া কড়াইসুঁটির ক্ষেতের পানে দৃষ্টিপাত করিয়া রজনী বলিল, "দেখ, ফুলগুলি কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে।"

প্রভা বলিল, "চমৎকার।"

"আমি অনেক সময় ভাবি, এমন সুন্দর ফুল আমাদের কাব্যে কেন কখনও স্থান পায়নি।"

প্রভা বলিল, "ইংরাজি কাব্যে ত দেখা যায়, সুইট্ পীজ্। আমাদের কাব্যে যে সকল ফুলের আদর বেশী, সবই গন্ধযুক্ত ফুল। গন্ধ নেই ব'লে এ ফুল আমাদের কাব্যে অনাদৃত।"

রজনী বলিল, "আবার দেখা যায়, রূপের কোনও ভাণ নেই, শুধু গন্ধের জোরে ফুল কাব্যে স্থান পেয়েছে—যেমন বকুল।"

এইরূপ গভীর বিষয়ের আলোচনা করিতে করিতে প্রণয়িদ্বয় চলিল। পথের কাছে একথোলো মটরসুঁটি ফলিয়াছিল, প্রভা কয়েকটি তুলিয়া নিজে খাইল এবং রজনীকেও খাওয়াইয়া দিল।

যখন ইহারা রাস্তায় উঠিল, তখন যাহা দেখিল, তাহাতে দুইজনেরই চক্ষুস্থির হইয়া গেল।

রাখাল-বালক পথের ধারে বসিয়া কাঁদিতেছে। তাহার নাসিকা দিয়া রক্তস্রাব হইতেছে। প্রভার বাইসিক্‌খানি শুধু আছে, রজনীর খানি নাই।

রাখাল বলিল—একটা পল্টনের গোরা রাস্তা দিয়া যাইতেছিল, একখানা বাইসিক্ কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে। সে বাধা দিতে গিয়াছিল বলিয়া তাহার নাসিকার উপর মুষ্ট্যাঘাত করিয়া গিয়াছে।

রজনী উত্তেজিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ দিকে গেল?"

রাখাল অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া হুগলির দিকে পথ দেখাইয়া দিল। আরও বলিল, সে অধিকক্ষণ যায় নাই, এইমাত্র গিয়াছে।

রজনী প্রভাকে বলিল, "তুমি একটু অপেক্ষা কর আমি দেখি।"—বলিয়া সে মুহূর্ত্তমধ্যে প্রভার বাইসিক্লে আরোহণ করিয়া তীরবৎ বেগে সেইদিকে ছুটিল।

একমিনিট—দুইমিনিট—তিনমিনিট, বায়ুবেগে ছুটিয়া গিয়া, শেষে দূরে বাইসিক্লচোরকে দেখিতে পাইল। লাল কোর্ত্তা পরা মূর্ত্তি, বাইসিক্ল ছুটাইয়া চলিয়াছে।

তাহাকে দেখিতে পাইয়া, দ্বিগুণ বেগে রজনী তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিল। ক্রমে নিকটে, আরও নিকটে আসিয়া পড়িল। গোরাটা বোধ হয় নিজেকে পশ্চাদ্ধাবন হইতে নিরাপদ মনে করিয়া, সানন্দচিত্তে চলিয়াছে। রজনী ইংরাজিতে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "থাম্ বদমায়েস!"

এই অপ্রত্যাশিত শব্দে গোরাটা তৎক্ষণাৎ পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিল। চালনাকার্য্যে অপটুতাবশতই হউক, অথবা পথে ইষ্টকাদির বাধাপ্রাপ্ত হইয়াই হউক, সে তৎক্ষণাৎ বাইসিক্লসুদ্ধ মহাশব্দে পথে পড়িয়া গেল।

রজনী তাহার বাইসিক্ল পথে ফেলিয়া রাখিয়া, কয়েক লম্ফ দিয়া ব্যাঘ্রের মত সেই গোরাটার কাছে আসিয়া পড়িল।

সেই নরাকার বৃটিশ বন্যজন্তুটি সেইমাত্র পায়ে ভর দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। রজনী বিনা বাক্যব্যয়ে তাহার উপর পড়িয়া অবিশ্রান্ত ঘুসি ও লাথির চোটে তাহাকে পুনশ্চ ভূমিশায়ী করিয়া ফেলিল।

গোরা মাটিতে পড়িলে রজনী দেখিল, তাহার কপাল কাটিয়া রক্তপাত হইতেছে। তখন তাহার মনে হইল, ইহা ঠিক ন্যায়যুদ্ধ হইতেছে না—উহাকে প্রস্তুত হইবার জন্য সময় দেওয়া উচিত। ইহা ভাবিয়া রজনী আক্রমণ হইতে বিরত থাকিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

গোরাটা আবার ঝাড়িয়া উঠিল। রজনী বলিল, "প্রস্তুত ?"

রজনীর সেই জিমন্যাষ্টিক করা ডাম্বেল ভাঁজা বজ্রমুষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া গোরাটা বলিল, "থাক্—যথেষ্ট হইয়াছে। ক্ষমা কর। শুনিয়াছিলাম বাবুর বাইসিক্ল। বাবুদের মধ্যে এমন কেহ আছে তাহা জানিতাম না।"—বলিয়া লোকটা খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে হুগলী অভিমুখে রওনা হইল।

এতক্ষণ রজনী অপহৃত বাইসিক্লটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার অবকাশ পায় নাই। এখন দেখিল, চক্রদ্বয়ের যোজক-দণ্ডটি ভাঙিয়া বাইসিক্ল দুইখান হইয়া গিয়াছে। চাকাও স্থানে স্থানে বাঁকিয়া গিয়াছে।

রজনী কিয়ৎক্ষণ সেইখানে থাকিয়া, বাইসিক্লটি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল। পথ দিয়া একজন কৃষক যাইতেছিল, তাহাকে বলিল, "চাকা দু'খানি কাঁধে ক'রে খানিক দূরে নিয়ে যেতে পারিস। বকশিস পাবি।"

সে স্বীকৃত হইল। রজনী তাহাকে বলিল, "তুই নিয়ে আয়। এখান থেকে মাইল দেড়েক দূরে রাস্তায় যে প্যাকা সাঁকো আছে—আমি সেইখানে থাকব।" বলিয়া রজনী বাইসিক্ল ছুটাইয়া প্রভার নিকট পৌঁছিল।

॥ ৪ ॥

প্রভা তখন সাঁকোর উপর একখানি রুমাল বিছাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। রাখাল-বালক গঙ্গা হইতে নাক মুখ ধুইয়া আসিয়াছে, প্রভা তাহাকে চকলেট দিয়াছে। সে তাহাই খাইতেছে।

রজনী পৌঁছিয়া সংক্ষেপে সমস্ত জানাইল। প্রভা দেখিল রজনীর ভ্রূ কুঞ্চিত মন অত্যন্ত বিষন্ন। প্রভা তখন নিপুণা গৃহিণীর মত রজনীর মন হইতে বিরক্তি ও চিন্তা অপনোদন করিতে যত্নবতী হইল। সে হাসিয়া বলিল, "তার জন্যে অত ভাবনা কেন ?"

রজনী বলিল, "এখন কলকাতায় পৌঁছবার উপায় ?"

প্রভা বলিল, "কেন ? রেলে যাব আমরা। এখান থেকে রেল ত বেশী দূর হবে না। পরের ষ্টেশনে গিয়ে ট্রেণে উঠিগে চল।"

রজনী রাখালকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, শ্রীরামপুর সেখান হইতে দুই ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

প্রভা বলিল, "চল তবে আমরা শ্রীরামপুরে যাই। সে লোকটা ভাঙা বাইসিক্ল নিয়ে এলেই হয়।"

রজনী বলিল, "তুমি কি এত রোদ্দুরে দু'ক্রোশ চলে যেতে পার ? তোমার ভারি কষ্ট হবে।"

প্রভা প্রফুল্ল মুখে উৎসাহের সহিত বলিল, "কিছু না। দু'ক্রোশ ভারি ত; আমি খুব যেতে পারি।"

"রজনী রাখাল-বালককে বলিল, "কোনও গ্রাম থেকে একখানা পাল্কী ডেকে আনতে পারিস ?"

রাখাল বলিল—অবশ্য পারে। কিন্তু গ্রাম দূর, যাইতে আসিতে দুই ঘণ্টা লাগিবে।

প্রভা বলিল, "না না—পাল্কীর কোনও দরকার নেই। আমি বেশ চ'লে যেতে পারি। ওগো, তুমি আমায় যত সুকুমারী মনে করছ আমি তা নই। আমি সেকালের রাজ-কন্যাদের মত ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যাইনে।"

ফুলের কথা শুনিয়া রজনী তাহার কোটের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রভারও চক্ষু সেইদিকে পড়িল। প্রভা বলিয়া উঠিল, "আমার ফুল কি করলে? বুঝে খুইয়ে এসেছ নাকি বীর-মশাই?"

রজনী দুঃখিতভাবে বলিল, "ফুলটি গেছে দেখছি।"

প্রভা বলিল, "আচ্ছা, অত দুঃখ করতে হবে না।"—বলিয়া প্রভা ক্ষেতে নামিয়া গিয়া একগুচ্ছ কড়াইসুঁটি ফুল তুলিয়া আনিল। রজনীর কোটে পরাইয়া দিতে দিতে বলিল, "এ ফুলের যে ভারি প্রশংসা করছিলে—এই নাও।"

এতক্ষণে রজনীর মুখে একটু হাসি দেখা দিল। সেখানে রাখাল-বালক উপস্থিত ছিল, সুতরাং এবার আর 'ধন্যবাদ' দেওয়া হইল না। শুধু প্রভার হাতখানি নিজের হাতে লইয়া সস্নেহে নিষ্পেষণ করিল।

এমন সময় দেখা গেল, হুগলির দিক হইতে একখানি ঘোড়ার গাড়ী আসিতেছে। উভয়েই অত্যন্ত আগ্রহের সহিত আশা করিতে লাগিল গাড়ীখানি যদি খালি থাকে ত বড় ভাল হয়।

গাড়ীখানি খালিই আসিতেছিল। শ্রীরামপুর হইতে কোনও গ্রামের জমিদারের জামাতাকে শ্বশুরবাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসিতেছে।

রজনী গাড়ীকে আটক করিল। একটু পরে ভগ্ন বাইসিক্ল গাড়ীর ছাদে তুলিয়া লোক দুইটাকে পুরস্কৃত করিয়া প্রভা ও রজনী শ্রীরামপুরে অভিমুখে চলিল।

গাড়ী ছাড়িল। রজনী বলিল, "প্রভা, আজ তোমার বড় কষ্ট হল। খুব ক্ষিদে পেয়েছে, না? তোমার মুখখানি যেন শুকিয়ে গেছে।"

প্রভা হাসিয়া বলিল, "গুরুজনের কথা না শোন কাণে—!"

রজনী বলিল, "সে ত ক'দিন থেকেই শুনছি। আমার কথার উত্তর দাওনা। খুব ক্ষিদে পেয়েছে না? চল, শ্রীরামপুরে গিয়ে কিছু খাবে।"

প্রভা বলিল, "ক্ষিদে পেলে কি খেতে আছে? মা বলে দিয়েছেন গায়েহলুদের আগে, কিছু খেতে নেই।"

রজনী বলিল, "সে ব্রত ত একবার ভঙ্গ হয়ে গেছে।"

প্রভা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "কখন গো?"

"কড়াইসুঁটির ক্ষেতে।"

প্রভা বলিল, "ওগো তাই ত! তুমি আমায় মনে করিয়ে দিলে না কেন?"

"আমার দোষ? তুমি আমাকেও খাইয়ে দিয়ে আমারও ব্রতভঙ্গ করেছ।"

"তোমার দোষ নয় ত কার দোষ তবে?"

রজনী বলিল, "বেশ! তোমার দোষও বুঝি আমার দোষ? তবু এখনও বিয়ে হয়নি!"

প্রভা কৃত্রিম রোষসহকারে বলিল, "আমার কখনও কোনও দোষ হতে পারে? সব দোষ তোমার!"

এই অন্যায় অপবাদ রজনীর একান্ত অসহ্য হইল। সে প্রভাকে দণ্ডিত করিবার অভিপ্রায়ে—রাস্তার দুইপাশ জনশূন্য দেখিয়া—প্রভার মুখখানি নিজের বক্ষের কাছে টানিয়া লইল।

[ফাল্গুন, ১৩১১]

বিবাহের বিজ্ঞাপন

প্রথম পরিচ্ছেদ

সহর গাজীপুরে, মহল্লা গোরাবাজারে, রাম অওতার নামক একটি লালাজাতীয় যুবক বাস করে। তাহার বয়ঃক্রম দ্বাবিংশতি বৎসর হইবে। লোকটার কিঞ্চিৎ ইংরাজি লেখা-

পড়া জানা আছে। কয়েকবার উপর্য্যুপরি প্রবেশিকা পরীক্ষায় ফেল করিয়া লেখাপড়া ছাড়িয়া, এখন সে ঘরে বসিয়া আছে।

বৈশাখ মাস। সমস্ত দিন প্রচণ্ড গ্রীষ্মের পর এখন সন্ধ্যাবেলা একটু শীতল বাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। হস্তিদন্তের বোলাযুক্ত একযোড়া খড়ম পায়ে দিয়া, নগ্নগাত্রে, রাম অওতার তাহাদের সদর বাড়ীর বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। ভৃত্য একটি চেয়ার আনিয়া দিল। রাম অওতার উপবেশন করিয়া বলিল, "চতুরি—ভাঙ তৈয়ারী হইয়াছে? লইয়া আয়।"

কিয়ৎক্ষণ পরে চতুরি ওরফে চতুর্ভুজ, একটি রূপার গেলাসে করিয়া গোলাপ দেওয়া সিদ্ধি আনিয়া দিল। রাম অওতার অবস্থাপন্ন লোক।

বাড়ীটি ঠিক সদর রাস্তার উপর। স্থানটা বাজার হইতে কিছুদূরে, সুতরাং কিছু নির্ব্বিবিলি। পথচারী লোক বেশী নাই, কেবল মাঝে মাঝে দুই একখানা এক্কা ঝম্‌ঝম্‌ শব্দ করিয়া যাইতেছে। রাস্তার মোড়ে একটি শিরীষ গাছ—তাহাতে অজস্র কোমল ফুল ধরিয়াছে। অপর পার্শ্বে মিউনিসিপ্যালিটির একটি লণ্ঠন ক্ষীণ আলোক বিতরণ করিতে চেষ্টা করিতেছে।

রাম অওতার বসিয়া আরাম করিয়া সিদ্ধি পান করিতে লাগিল। সহসা অদূরে চাঁচা গলায় শব্দ উত্থিত হইল—"গুলাব-ছড়ী।"

গুলাবছড়ি-ওয়ালা তীব্র কেরোসিনের আলোক সহ পসরা স্কন্ধে লইয়া, বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া হাঁকিল—

ক্যা মজাদার গুলাব-ছড়ী!
যো খাওয়ে— মজা পাওয়ে;
যো চাখ্‌খে- ইয়াদ্‌ রাখ্‌খে;
গুলাব-ছড়ী!

বাটীর মধ্য হইতে তৎক্ষণাৎ একটি পঞ্চবর্ষীয় বালক বাহির হইয়া আসিল। রাম অওতারের কাছে আসিয়া বাহানা ধরিল, "ভাইয়া, আমি গুলাব-ছড়ি খাইব।"

একথা শুনিবামাত্র ফিরিওয়ালা রাস্তায় দাঁড়াইয়া, বারান্দার উপর তাহার পসরা নামাইল। বালক মোহনলালের প্রতি চাহিয়া বলিল, "গুলাব-ছড়ি, নানখাটাই, সোহন হালুয়া,—কি লইবে বল।"

বালক গুলাব-ছড়িরই বেশী পক্ষপাতী—তাহাই কয়েকটা ক্রয় করিল। ফিরিওয়ালা স্বীয় কক্ষতল হইতে একখানা হিন্দী সংবাদপত্র বাহির করিয়া, তাহার কিয়দংশ ছিন্ন করিয়া, গুলাবছড়িগুলি জড়াইয়া মোহনলালের হাতে দিল। তাহার পর পয়সা উঠাইয়া লইয়া, পূর্ব্ববৎ কড়িমধ্যম সুরে "গুলাব-ছড়ি" হাঁকিতে হাঁকিতে সে প্রস্থান করিল।

মোহনলাল পরম আনন্দে বারান্দাময় নৃত্য করিতে করিতে ভোজনে প্রবৃত্ত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে ভ্রাতার কাছে আসিয়া ছিন্ন কাগজটা দেখাইয়া বলিল, "দেখ ভাইয়া, একটা হাথীর তসবীর।"

রাম অওতার কাগজখানি হাতে লইয়া দেখিল, একটা হস্তীমার্কা ঔষধের বিজ্ঞাপন। কিন্তু তাহার পার্শ্বেই যাহা দেখিল, তাহাতে রাম অওতারের কৌতূহল অত্যন্ত উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। পার্শ্বে রহিয়াছে—"বিবাহের বিজ্ঞাপন।"

বামহস্তে সিদ্ধির গেলাস ধরিয়া, দক্ষিণে ছিন্ন কাগজখানি লইয়া, রাম অওতার বৈঠকখানার ঘরে প্রবেশ করিল। আলোকের কাছে দাঁড়াইয়া পড়িল ঃ—

বিবাহের বিজ্ঞাপন

প্রার্থনাসমাজভুক্ত ভদ্রলোকের একটি সপ্তদশবর্ষীয়া সুন্দরী কন্যা আছে। বিবাহের জন্য একটি সচ্চরিত্র সুশিক্ষিত কায়স্থজাতীয় পাত্র আবশ্যক। বিবাহান্তে যুবকটিকে শিক্ষালাভের জন্য আমরা বিলাতে পাঠাইতে ইচ্ছা করি। পূর্ব্বে পত্র লিখিয়া পাত্র বা

অভিভাবক আমার সহিত আসিয়া সাক্ষাৎ করিবেন।

লালা মুরলীধর লাল
মহাদেও মিশ্রের বাটী, কেদারঘাট,
বেনারস সিটি।"

রাম অওতার বিজ্ঞাপনটি দুইবার পাঠ করিল। পাঠান্তে তাহার মুখে কিঞ্চিৎ হাসি দেখা দিল। বারান্দায় ফিরিয়া গিয়া, চেয়ারে বসিয়া, সিদ্ধি পান করিতে করিতে সে নানা প্রকার ভাবিতে লাগিল।

ভাবিল, ইহা ত বড় মজার বিজ্ঞাপন! তাহার যে বাল্যকালেই বিবাহ হইয়া গিয়াছে;—নহিলে এই একটা বেশ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। সপ্তদশবর্ষীয়া সুন্দরী কন্যা—না জানি দেখিতে কি রকম? "প্রার্থনাসমাজী"র কন্যা। বাঙ্গালা দেশে যে "বরম্-সমাজী"রা আছে—"প্রার্থনাসমাজী"রাও সেইরূপ, তাহা রাম অওতার শুনিয়াছে। এতদিন অবধি যখন সে কন্যা অবিবাহিতা আছে, তখন নিশ্চয়ই শিক্ষিতা এবং গাহিতে বাজাইতে জানে। এই প্রকার মহিলাগণের সম্বন্ধে রাম অওতারের মনে বহুদিন হইতে অনন্ত কৌতূহল সঞ্চিত ছিল।

সিদ্ধিপান শেষ হইলে গেলাসটি নামাইয়া রাখিয়া রাম অওতার ভাবিল, "একটা কায করা যাউক। উহাদিগকে পত্র লিখিয়া, গিয়া দেখা করি। কিছুদিন উহাদের বাড়ী যাতায়াত করিয়া, মজাটাই দেখা যাউক না কেন! তাহার পর সট্‌কাইলেই হইবে।"

সিদ্ধির নেশায়, এই মজার মৎলব মনে আঁটিতে আঁটিতে রাম অওতারের অত্যন্ত হাসি পাইতে লাগিল। তাহার বিবাহ যে হইয়াছে, তাহা উহারা জানিবে কেমন করিয়া? কিছুদিন কোর্টশিপ্ করিয়া তাহার পর চম্পট! রাম অওতার হা হা করিয়া হাসিতে লাগিল।

ভাবিল আর বিলম্ব করা নয়। চিঠিটা এখনি লিখিতে হইবে। রাম অওতার উঠিয়া বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল। তক্তপোষে বসিয়া বাক্স সম্মুখে লইয়া চিঠি লিখিতে আরম্ভ করিল। অভ্যাসমত প্রথমে লিখিল—"শ্রীশ্রীগণেশায় নমঃ।" তাহার পর মনে হইল, ইহারা "প্রার্থনাসমাজে"র লোক, হিন্দু দেবদেবীর নাম শুনিলে ত চটিয়া যাইতে পারে! তাহাকে ত নিতান্ত অসভ্য পৌত্তলিক মনে করিতে পারে! সুতরাং আর একখানা কাগজে "শ্রীশ্রীঈশ্বরো জয়তি" বলিয়া আরম্ভ করিল। প্রবেশিকায় ফেল শুনিলে পাছে তাহারা যথেষ্ট শিক্ষিত বলিয়া মনে না করে, তাই লিখিয়া দিল সে বি-এ পরীক্ষায় ফেল করিয়াছে। নিজের সচ্চরিত্রতার কথা লিখিবার সময় তাহার মুখে হাসি দেখা দিল। কলম রাখিয়া, কিছুক্ষণ ধরিয়া হাসিল। পরে লিখিল, সে জাতিভেদ মানে না, বিলাত যাইতে কিছুমাত্র আপত্তি নাই। কুমারীর একখানি ফোটোগ্রাফ যদি থাকে, তাহা প্রার্থনা করিয়া পত্র শেষ

সেদিন রাত্রে রাম অওতারের ভাল করিয়া নিদ্রা হইল না। ভবিষ্যৎ ঘটনা সম্বন্ধে যতই সে কল্পনা করে, ততই তাহার হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হইয়া উঠে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কাশীর কেদারঘাটের নিকট, একটি ক্ষুদ্র গলির মধ্যে একটি ত্রিতল অট্টালিকা। বেলা দ্বিপ্রহরের সময় তাহার একটি কক্ষে, মেঝেতে শতরঞ্চ বিছাইয়া, দুই ব্যক্তি বসিয়া দাবা খেলিতেছিল। একজনের শরীর দৃঢ় ও বলিষ্ঠ, কিছু স্থূল, গৌরবর্ণ পুরুষ। অপরটির দেহ ক্ষীণ হইলেও শারীরিক বলের পরিচয় তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে দৃশ্যমান। এই দুই ব্যক্তি কাশীর দুইজন প্রসিদ্ধ গুণ্ডা। প্রথম বর্ণিত ব্যক্তির নাম মহাদেও মিশ্র—সে এই বাড়ীর অধিকারী। দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম কাহাইয়ালাল,—সে মহাদেও মিশ্রের একজন প্রিয় সাকিরদ।

ভৃত্য আসিয়া তামাক দিল। তাহার পর নিজ মেরজাইয়ের পকেট হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া বলিল, "চিঠি আসিয়াছে।"

কাহ্নাইয়ালাল চিঠি লইয়া ঠিকানা পড়িল—"লালা মুরলীধর লাল, মহাদেও মিশ্রের বাটি, কেদারঘাট, বেনারস সিটি।" পড়িয়া কাহ্নাইয়ালাল বলিল, "লালা মুরলীধর! তোমার ভাড়াটিয়া লালা মুরলীধর ত দুই তিন বৎসর হইল এ বাড়ী ছাড়িয়া গিয়াছে!"

মহাদেও ধূমপান করিতে করিতে বলিল, "লালা মুরলীধর ত নক্‌লৌ বদলি হইয়া গিয়াছে। চিঠি খোল্, দেখ্ কি সমাচার।"

কাহ্নাইয়া বলিল, "মুরলীধরকে ঠিকানা কাটিয়া পাঠাইবে না?"

মহাদেও বলিল, "আরে,—কি সমাচার সে ত আগে দেখিতে হইবে! খোল্,—পড়্।"

কাহ্নাইয়ালাল গুরুজীর আদেশমত পত্র খুলিয়া পাঠ করিল।

মহাশয়,

সংবাদপত্রে আপনার কন্যাবিবাহের বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়াছি। আমি একজন সম্বংশীয় কায়স্থ যুবক। আমার বয়স বাইশ বৎসর মাত্র। আমি এলাহাবাদ কলেজে বি-এ শ্রেণী অবধি অধ্যয়ন করিয়াছিলাম কিন্তু পরীক্ষার পূর্ব্বে পীড়াক্রান্ত হওয়ায় পাস করিতে পারি নাই। আমি জাতিভেদ মানি না। বিলাত যাইবার জন্য আমার বাল্যকাল হইতেই বাসনা। যদি মহাশয় আমাকে আপনার কন্যার যোগ্যপাত্র বিবেচনা করেন, তবে আমি বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছি। আমি বাল্যবিবাহের বিরোধী; একারণে অদ্যাপি বিবাহ করি নাই। আমি সচ্চরিত্র এবং সত্যবাদী। আজ্ঞা পাইলে আমি মহাশয়ের সহিত গিয়া সাক্ষাৎ করি। যদি কুমারীর একখানি ফোটোগ্রাফ থাকে ত পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

—ইতি

লালা রাম অওতার লাল,

মহল্লা গোরাবাজার, সহর গাজিপুর।

পত্র শুনিয়া মহাদেও মিশ্র হাসিতে লাগিল। বলিল, "এ ত বড় তামাসা! সে মেয়ের ত কবে বিবাহ হইয়া গিয়াছে।"

"বলিতেছে যে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেখিলাম। সে কি?"

মহাদেও বলিল, "জান না? লালা মুরলীধর অখ্‌বারে নুটিস্ ছাপাইয়া দিয়াছিল কিনা। উহারা বরম্‌সমাজী লোক,—উহাদের সঙ্গে ত ভাল কায়েথ কিরিয়া করম করিবে না। তাই নুটিস্ ছাপাইয়া দিয়াছিল।"

"আমি ত শুনিয়াছি যে কায়েথের সঙ্গেই বিবাহ হইয়াছে।"

"হাঁ হাঁ—কায়েথ বটে কিন্তু বিলাতে গিয়া বালিষ্টর হইয়া আসিয়াছিল।—কায়েথ বটে, বড় ঘরানাও বটে। নুটিস পড়িয়া সে সময় আরও অনেক লোক আসিয়াছিল, কিন্তু লালা মুরলীধর বলিল, আমি যখন বালিষ্টার পাস করা জামাই পাইতেছি তখন আর কাহাকেও দিব না। এই বাড়ীতেই ত বিবাহ হইল। সে আজ তিন বৎসরের কথা।"

কাহ্নাইয়ালাল ঘাড়টি নাড়িয়া বলিল, "ঠিক ঠিক।" কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, "ঐ যে লিখিয়াছে ফোটুগিরাপ পাঠাইতে, সে কি?"

মিশ্র বলিল, "জান না? ঐ যে তসবীর হয়; একটা বাক্স থাকে, তাতে একটা সিসা লাগানো থাকে; মানুষকে সমুখে খাড় করাইয়া দেয় আর ভিতরে তসবীর উঠে; তাহাকেই ফোটুগিরাপ বলে।"

কাহ্নাইয়ালাল শুনিয়া বলিল, "ওঃ হো ঠিক ঠিক। এইবার মালুম হইয়াছে। তবে একটা ভাল শিকার জুটিয়াছে। উহাকে চিঠি লিখিয়া আনান হউক।"

মহাদেও মিশ্র বলিল, "তাহার কাছে আর কি মিলিবে? দুই চার দশ টাকা মিলিবে কি না সন্দেহ।"

কাহ্নাইয়ালাল বলিল, "না। সে যখন সাদি করিবে বলিয়া আসিবে, তখন নিশ্চয়ই সোণার ঘড়ি চেন আংটি লাগাইয়া আসিবে। নিজের না থাকিলে অন্যের চাহিয়া লইয়া

আসিবে। তাহাকে আসিতে লিখি। কেবল ফোটোগিরাপটার কি করি ?"

মহাদেও বলিল, "সে জন্য ভাবনা কি? ফোটোগিরাপ বাজারে অনেক মিলিবে। চৌকে যে মহম্মদ খানের দোকান আছে কি না, সেখানে পার্সী থিয়েটর দলের অনেক খাপসুরৎ আউরতের তসবীর আছে। সেই একখানা কিনিয়া পাঠাইলেই হইবে।"

পরামর্শ তখনই স্থির হইয়া গেল। ইহাও স্থির হইল যে, এ বাড়ীতে আনা হইবে না, তাহা হইলে পরে পুলিসে সন্ধান পাইতে পারে। অন্য একটা বাড়ী সাজাইয়া, সেইখানে লইয়া গিয়া, কার্য্য সমাধা করিতে হইবে। এক পোয়া ভাঙ, সঙ্গে একটু ধুতুরার রস— আর কিছুই করিতে হইবে না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অপরাহ্নকাল। গোরাবাজারের সেই বৈঠকখানাটিতে অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় রাম অওতার ধূমপান করিতেছে, এবং মাঝে মাঝে রাজপথের পানে সতৃষ্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে। ডাকওয়ালার আসিবার আর বিলম্ব নাই। আজ দুই দিন হইতে রাম অওতার এই প্রকার সপ্রতীক্ষ, কারণ এখনও পত্রের উত্তর আসে নাই।

ডাকওয়ালা আসিয়া একখানি পত্র এবং একটি প্যাকেট দিয়া গেল। হস্তাক্ষর অপরিচিত। বেনারস সিটির মোহর রহিয়াছে।

হর্ষোৎফুল্ল হইয়া রাম অওতার তক্তপোষের উপর উঠিয়া বসিল। প্রথমেই প্যাকেটটি উন্মুক্ত করিল। ফটোগ্রাফ—সুন্দরী যুবতীর মনোজ্ঞ সুন্দর ছবি। সতৃষ্ণ নয়নে রাম অওতার ছবিখানির প্রতি চাহিয়া রহিল। পার্সী মহিলাদের ধরণে শাড়ীখানি পরিহিত। "বরম্‌সমাজী"দের স্ত্রী-কন্যারা এইরূপ ধরণেই শাড়ী পরিধান করে বটে—তাহা সে রেলে যাতায়াতের সময় অনেকবার দেখিয়াছে। মুখ চক্ষুর গঠন কি সুন্দর! রাম অওতার মনে মনে বলিতে লাগিল—"বাহবা কি বাহবা। বাহ্‌ রে বাহ্‌!"

ছবিখানি রাখিয়া সে পত্রখানি খুলিল।—তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল:—

মহাশয়,

আপনার পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াছি। আগামী শনিবার সন্ধ্যার গাড়ীতে যদি আপনি আসেন, তবে উত্তম হয়। আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হইলে তবে অন্যান্য কথাবার্ত্তা হইবে। আমি সম্প্রতি বাড়ী বদল করিয়াছি, সুতরাং কেদারঘাটের বাড়ীতে আসিবেন না। আমি ষ্টেশনে লোক পাঠাইয়া দিব, আপনাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিবে। ঐ দিন সন্ধ্যাকালে আমার আলয়ে আপনি ভোজন করিলে অত্যন্ত সুখী হইব। ফোটোগ্রাফ পাঠাইলাম।

লালা মুরলীধর লাল

পত্র রাখিয়া আবার ফোটোগ্রাফখানি লইয়া রাম অওতার দেখিতে লাগিল। একটি বাহু পার্শ্বদেশে লম্বিত, অপরটি অর্দ্ধোত্থিতভাবে শাড়ীখানির এক অংশ ধরিয়া আছে। চক্ষুযুগল যেন হাস্যপূর্ণ। ভাবিতে লাগিল, ইহার সহিত আলাপ হইলে কি মজাদারই হইবে!

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রাম অওতার ভাবিল,—লিখিয়াছে শনিবার সন্ধ্যার গাড়ীতে যাইতে। সে আজ দুই দিন বিলম্ব। শনিবার না লিখিয়া শুক্রবার লিখিল না কেন? যাহা হউক, এই দুই দিনে ভাল করিয়া প্রস্তুত হইতে হইবে।

শনিবার দিন আহারাদি শেষ করিয়া রাম অওতার বাড়ীতে বলিল—"একবার কাশীজী দর্শন করিয়া আসি!" বলিয়া, নিজ বেশবিন্যাস করিতে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপভাবে বেশ করিয়া যাইতে হইবে যে, প্রথমদর্শনেই কুমারীর মনে প্রণয়সঞ্চার হয়। ভাল রেশমী চাপকান বাহির করিয়া রাম অওতার সযত্নে পরিধান করিল। জরির কাযকরা সুন্দর মখমলের টুপী লইয়া মাথায় দিল। দিল্লী হইতে আনীত সুকোমল রঙীন জুতায় স্বীয় পদদ্বয়ের

গোভাবৃন্দি করিল। উৎকৃষ্ট হেনার আতর লইয়া রুমালে মাখাইল, নিজের গুম্ফে ও ভ্রূযুগলেও কিঞ্চিৎ লাগাইয়া দিল। কয়দিন কাশীতে থাকিতে হইবে তাহার স্থিরতা নাই—খরচপত্র একটু ভাল করিয়াই করিতে হইবে,—তাই দুইশত টাকাও নিজের সঙ্গে লইল। সোণার ঘড়ি, সোণার চেন এবং হীরকের অঙ্গুরীয় পরিধান করিয়া, ষ্টেশন অভিমুখে রওনা হইল।

রেলগাড়ীতে তাহার মনে হইতে লাগিল, যুবতীটির সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে তাহার সঙ্গে কি প্রকার সম্ভাষণ করিতে হইবে। ইংরাজি ধরণে এক প্রকার কোর্টশিপ হয়, তাহা সে অবগত ছিল মাত্র, কিন্তু তাহার প্রণালীর বিষয় কিছুই জানিত না। ইংরাজি উপন্যাসাদি সে কখনও পাঠ করে নাই। তবে "লাল-হীরাকী কথা", "লয়লা-মজনু", "গুল-ই-বকাওলি" প্রভৃতি তাহার পড়া ছিল। ভাবিল, তত্তৎ গ্রন্থে বর্ণিত প্রথা অবলম্বন করিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। কেবল প্রথম প্রথম একটু আত্মসংযম দেখানই ভাল। প্রথমে আদরের "তু" না বলিয়া সম্মানের "আপ" বলাই সমীচীন হইবে,—কারণ এসকল মহিলা শিক্ষিতা এবং সভ্যতাপ্রাপ্তা কিনা! কথাটা হইতেছে,—এরূপ কোনও সম্ভাষণ না করা হয় যাহাতে সে বিরক্ত হয়। দুই চারিদিন যাতায়াতের পর, একদিন নির্জ্জনে "পিয়ারী" বলিয়া সম্ভাষণ করিলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না।

রাম অওতার মনে মনে এইরূপ পর্য্যালোচনা ও ভবিষ্য-সুখ কল্পনা করিতেছে, ক্রমে গাড়ী আসিয়া রাজঘাট ষ্টেশনে পৌঁছিল।

রাম অওতার নামিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে, এমন সময় একটি যুবক তাহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। যুবকটির উত্তরীয় ও পঞ্জাবী কামিজ আবিরের রঙে রঞ্জিত।

যুবকটি আসিয়া বলিল, "আপনার নাম কি লালা রাম অওতার লাল?"

"হাঁ আপনার নাম কি?"

"কিষুণপ্রসাদ। আমি লালা মুরলীধর লালের ভ্রাতুষ্পুত্র। আমি আপনাকে লইতে আসিয়াছি।"—বলিয়া সমাদর করিয়া সে রাম অওতারকে বাহিরে লইয়া গেল।

সেখানে একখানা গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল। গাড়ীতে উঠিয়া কিষুণপ্রসাদ বলিল, জানালাগুলো বন্ধ করিয়া দিব কি? আজ বৈশাখী পূর্ণিমা বলিয়া কাশীতে ছোট দোল। দেখুন না আমার এই পোষাকে আসিবার সময় দুষ্টলোকে পিচকারী দিয়া দিয়াছে।"

রাম অওতার ব্যস্ত হইয়া বলিল, "বন্ধ করিয়া দিন—বন্ধ করিয়া দিন।" তাহার ভয় হইল পাছে তাহার রেশমী পোষাক কেহ পিচকারী দিয়া নষ্ট করিয়া দেয়।

দুইজনে কথোপকথন করিতে লাগিল। ক্রমে গাড়ী গন্তব্য স্থানে গিয়া পৌঁছিল। অবতরণ করিয়া রাম অওতার দেখিল, একটি প্রস্তর নির্ম্মিত অট্টালিকা। ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত না করিয়াই কিষুণপ্রসাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভিতরে প্রবেশ করিল।

প্রথমটা অত্যন্ত অন্ধকার। তাহার পর একটা সিঁড়ি দেখা গেল, সেখানে বাতি জ্বলিতেছে। সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া, রাম অওতার একটি বৃহৎ কক্ষে নীত হইল। সে প্রথমে ভাবিয়াছিল, ইহারা যখন নব্যতন্ত্রের লোক, তখন গৃহসজ্জাদি সাহেবী ধরনের হইবে। দেখিল তাহা নহে। কক্ষটির মধ্যস্থলে ফরাস বিছানা পাতা রহিয়াছে; তাহার উপর কয়েকটি তাকিয়া রক্ষিত। মধ্যস্থলে বসিয়া একটি স্থূলকায় বলিষ্ঠ গৌরবর্ণ পুরুষ আলবোলায় ধূমপানে প্রবৃত্ত।

কিষুণপ্রসাদ ওরফে কাহ্নাইয়ালাল পৌঁছিয়া বলিল, "চাচাজী—এই লালা রাম অওতার লাল আসিয়াছেন"—"চাচাজী" আর কেহই নয়—স্বয়ং মহাদেও মিশ্র। মহাদেও অভ্যর্থনা করিয়া রাম অওতারকে বসাইল। নানাপ্রকার কথোপকথনে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত করিয়া, কাহ্নাইয়ালালকে ডাকিয়া বলিল; "কিষুণ,—তবে আমি বাড়ীর ভিতর যাইয়া উঁহাদের প্রস্তুত হইতে বলি। তুমি ততক্ষণ ইঁহাকে জলযোগ করাও।"

ইহা বলিয়া মহাদেও মিশ্র বাহির হইয়া গেল। কাহ্নাইয়ালাল সেখানে বসিয়া রহিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে একটা ভৃত্য রূপার বাসনে কিছু মিষ্টান্ন এবং কিছু সুগন্ধি সিদ্ধি আনিয়া হাজির করিল।

কিষুণপ্রসাদ বলিল, "আপনি পরিশ্রান্ত হইয়া আসিয়াছেন,—তাই এক পেয়ালা সিদ্ধির বন্দোবস্ত করিয়াছি। আমরা কাশীবাসীরা সিদ্ধির বড় ভক্ত। ক্লান্তি দূরে করিতে সিদ্ধির মত পানীয় আর নাই।"

রাম অওতার অনুরোধ ক্রমে মিষ্টান্ন এবং সিদ্ধিটুকু শেষ করিয়া ফেলিল। পকেট হইতে ঘড়ি খুলিয়া দেখিল, রাত্রি ৮টা বাজে। ঘড়ি দেখিতে দেখিতে তাহার চোখ দুইটি যেমন ঘুমে জড়াইয়া আসিতে লাগিল।

কাহাইয়ালাল বলিল, "আপনি গীতবাদ্য জানেন কি?—আমাদের বাড়ীর মহিলারা অত্যন্ত গীতবাদ্য প্রিয়।"

রাম অওতার বলিল, "গীত? গীত?—জানি বইকি? শুনিবে একটা?"

তখন নেশায় তাহার মস্তিষ্ক চম্ চম্ করিয়া উঠিয়াছে। মনে হইতে লাগিল—যেন চতুর্দ্দিকে বহুসংখ্যক আলোকমালা জ্বলিয়া উঠিয়াছে: বহু লোক যেন তাহাকে চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া সারেং, বেহালা, বীণ হাতে করিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে; ক্রমে তাহারা যেন সকলে তালে তালে নৃত্য করিতে লাগিল।

রাম অওতার উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"গীত? শুনিবে একটা?" বলিয়া, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আরম্ভ করিল—

বতা দে সখি, কৌন গলি গয়ে মেরে শ্যাম।
গোকুল ঢুঁড়ি
বিন্দ্রাবন ঢুঁ—

আর কথা মুখ দিয়া বাহির হইল না। ঢুঁ—ঢুঁ—ঢুঁ—কয়েকবার বলিয়া সেই ফরাস বিছানার উপর সে পড়িয়া গেল। তাহার মুখ দিয়া লালা নিঃসৃত হইতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে মহাদেও মিশ্র আসিয়া প্রবেশ করিল। বলিল, "কি রে কাহাইয়া, ঔষধ ধরিয়াছে?"

কাহাইয়ালাল হাসিয়া বলিল, "ধরিয়াছে বইকি! যায় কোথা?"

মহাদেও বলিল, "দেখ্ ত কি আছে।" কাহাইয়ালাল তখন অচেতন রাম অওতারের দেহ হইতে তাহার ঘড়ি, চেন, হীরার আংটী, নগদ দুই শত টাকা, রৌপ্যনির্ম্মিত পাণের ডিবা প্রভৃতি বাহির করিয়া লইল। মহাদেও টাকাগুলা গণিতে গণিতে বলিল, "পোষাক খোল্, দামী পোষাক।"

গুরুজীর আদেশমত কাহাইয়ালাল সেই টুপি, জুতা, রেশমী পোষাক সমস্ত খুলিয়া লইয়া তাহাকে একখানা ছিন্নবস্ত্র পরাইতে লাগিল।

মহাদেও বলিল, "না—না। উহাকে সন্ন্যাসী বানাইয়া ছাড়িয়া দে। কাল সকালে যখন নেশা ছুটিয়া জাগিয়া উঠিবে, তখন খাইবে কি? একটা গেরুয়া কৌপীন পরাইয়া দে। সমস্ত গায়ে ভস্ম মাখাইয়া দে! একটা চিম্‌টা দে। একটা ঝুলিও সঙ্গে দিয়া দে। কাশীতে সন্ন্যাসীবেশী লোক কখনও ক্ষুধায় মরে না।"

কাহাইয়ালাল সমস্তই ঐরূপ করিল। মহাদেও পকেট হইতে গোটাকতক পয়সা বাহির করিয়া বলিল—"দে,—এই পয়সা কটাও ঝুলিতে দিয়া দে। এখন ঘণ্টাদুই এইখানেই পড়িয়া থাকুক। তাহার পরে অন্ধকার গলি দিয়া দিয়া লইয়া গিয়া, মান-মন্দিরের দেউড়িতে শোয়াইয়া দিয়া আসিস্। সমস্ত রাত্রি ঠাণ্ডায় ঘুমাইবে ভাল। নেশাও রাত্রি পোহাইতে পোহাইতে ছুটিয়া যাইবে।"

কয়েক দিবস পরে গাজীপুরের সকলেই শুনিল, রাম অওতার লাল ধনসম্পদ পরিত্যাগপূর্ব্বক সংসারবিরাগী হইয়া কাশীতে গিয়া সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছিল; সৌভাগ্য-

ফলতঃ তাহার মাতুল কাশীর রাস্তায় তদবস্থায় তাহাকে দেখিতে পাইয়া, অনেক কষ্টে গৃহস্থাশ্রমে ফিরাইয়া আনিয়াছেন। ধার্ম্মিক ব্যক্তি বলিয়া এখন হইতে রাম অওতারের একটা খ্যাতি জন্মিয়া গেল।

[বৈশাখ, ১৩১১]

স্বর্ণ-সিংহ

প্রথম পরিচ্ছেদ

সে আজ অনেক বৎসরের কথা। ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আলিপুরে "প্র্যাক্‌টিস্" আরম্ভ করিলাম, কিন্তু মক্কেল জুটিল না। মাসছয় কাল বার লাইব্রেরীতে বসিয়া অন্যান্য নব্য উকীলগণের সহিত নানাবিধ খোসগল্প করিয়া ক্রমে শ্রান্ত হইয়া পড়িলাম। ভাবিলাম পশ্চিম যাই। কিন্তু পশ্চিমেই বা যাই কোথায়? ডিরেক্‌টারি বাহির করিয়া পশ্চিমের নানা স্থানের উকীলের তালিকা অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিলাম, বিহারে সাসেরাম নামক একটা মহকুমা আছে, সেখানে বাঙ্গালী উকীল একটিও নাই—আর কোনও বাঙ্গালীই নাই। যাইবার পক্ষে বাধাও বিস্তর,—রেল নাই। আরা ষ্টেশনে নামিয়া এক্কা করিয়া তিন চারি দিন যাইতে হয়। ভাবিলাম, এই ঠিক হইয়াছে। এই পৃথিবীর বাহির কাশী—সাক্ষাৎ কৈলাস, এইখানে গেলেই আমার পসার হইবে। পশ্চিমের লোকের বিশ্বাস বাঙ্গালীরা অত্যন্ত বুদ্ধিমান জাতি। ওদিকটায় বাঙ্গালীর এখনও বেশ খাতির আছে। সুতরাং মাসখানেকের মধ্যেই সাসেরাম পৌঁছিয়া প্র্যাক্‌টিস আরম্ভ করিলাম।

সাসেরামে একজন উর্দ্দুওয়ালা উকীল ছিলেন,—তাঁহার নাম মুন্সী জোয়ালাপ্রসাদ। তিনিই সেখানকার প্রধান উকীল। আমাকে দেখিয়া কিন্তু বৃদ্ধ সন্তুষ্ট হইলেন না। যাহাকে তাহাকে বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন—"আরে উও তো বচ্চা হায়, কানুনকা হাল ক্যা জানতা হায়?"—প্রথম প্রথম একটা মোকদ্দমায় আমি তাঁহার বিপক্ষ পক্ষের উকীল নিযুক্ত ছিলাম। মোকদ্দমা শেষে বক্তৃতার দিন আইনের তর্ক করিবার জন্য অপরাধের মধ্যে আমি খানকতক মোটা মোটা পুস্তক লইয়া গিয়াছিলাম। জোয়ালাপ্রসাদ কোনও আইনের পুস্তকের ধার ধারিতেন না। প্রকাশ্য আদালতে হাকিমকে বলিলেন—

"হুজুর,—দেখিয়ে তো তমাশা! কলকত্তা সে এক উকীল আয়েহেঁ,—ন মোচ ন দাঢ়ী—ঔর বহস্ কে লিয়ে টোকড়ি ভরকে কিতাব লে আয়েহেঁ। হুজুরকো কানুন শিখলানে মাঙ্গতেহেঁ—যেয়সে কি হুজুরকো কানুন মালুম নেহি হায়!"

হাকিম একটু হাস্য করিয়া উকীল সাহেবকে বসিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

আমার প্রতি জোয়ালাপ্রসাদের এই বিদ্বেষের কারণ ক্রমে বুঝিতে পারিলাম। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রটি পাটনা কলেজে আইন অধ্যয়ন করিতেছিল। সেই ব্যক্তিই ভবিষ্যতে সাসেরামের একমাত্র ইংরাজি জানা উকীল হয়, ইহাই মুন্সী জোয়ালাপ্রসাদের বাসনা ছিল। তাই আমাকে দেখিয়া তাঁহার এত আক্রোশ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অল্পদিনের মধ্যেই আমার পসার হইতে আরম্ভ হইল। একটা বন্ধে কলিকাতায় গিয়া আমার স্ত্রীকে লইয়া আসিলাম। সদর রাস্তার উপর আমার দ্বিতল গৃহখানি। উপরের কক্ষে চিকে ঢাকা জানালাটির কাছে বসিয়া কৌতুকপূর্ণ নেত্রে এই নূতন প্রদেশের নূতনতর জীবন প্রবাহ দেখিতে আমার স্ত্রী ভালবাসিতেন। একদিন রাজপথে কতকগুলি বালক বালিকা সমবেত হইয়া নৃত্য করিতে করিতে এই গীতটি বারম্বার গাহিতে লাগিল:—

"বাঙ্গালী বিটিয়া,
কল্‌কত্তা মে বেচে তামাকুল টিকিয়া।"

আমার স্ত্রী তখনও হিন্দী শিখেন নাই। জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কি বলছে গো?"

আমি বলিলাম, "ওরা যা বলছে তার ভাবার্থ এই—হে বাঙ্গালীর মেয়ে,—আমাদের দেশে এসে তোমরা ভারি নবাব হয়েছ, চিকের আড়ালে দোতলায় বসে আছ,—কিন্তু কলকাতায় তো তোমরা তামাক টিকেও বিক্রি কর শুনেছি।"

আমার স্ত্রী শুনিয়া গালে হাত দিয়া বলিলেন, "ওমা কি হবে!"

গ্রীষ্মকাল আসিল। আমার বাড়ীর চারিদিকের তালগাছগুলিতে পাসীরা তাড়ির জন্য "লাবনি" বাঁধিয়াছে। প্রত্যহ প্রভাতে চারিদিক হইতে পাসীদের চীৎকার শুনা যায় —"তার চিঢ়ো"—অর্থাৎ—"আমি তালগাছে চড়িতেছি—কুলবধূগণ, তোমরা উঠান হইতে পলায়ন করিয়া ঘরের মধ্যে লুকাইয়া থাক।"

গ্রীষ্মের ছুটিতে মুন্সী জোয়ালাপ্রসাদের পুত্রটি পাটনা হইতে আসিল। সহরে ইংরাজি জানা লোকের সংখ্যা অল্প বলিয়া আমার সহিত তাহার বন্ধুভাব জন্মিল। তাহার নাম সুন্দরলাল। আমি তাহার পিতৃবৈরি হইলেও আমার কাছে সে সর্ব্বদা আসিত। মাঝে মাঝে আমরা একত্র বেড়াইতে যাইতাম। এখনকার বাঙ্গালীদের যেমন "সাহেব" হইবার উচ্চাভিলাষ,—সুন্দরলালের দেখিলাম সেইরূপ বাঙ্গালী হইবার ইচ্ছা অত্যন্ত বলবতী। পিতার অগোচরে সে মাঝে মাঝে আমার গৃহে সান্ধ্যভোজনের নিমন্ত্রণও রক্ষা করিতে লাগিল।

লোকটিকে আমার বড় ভাল লাগিত। ক্রমে দেখিলাম, সে যে শুধু ইংরাজি-শিক্ষা-লাভ করিয়াছে তাহা নহে একটি আনুষঙ্গিক ব্যাধিও তাহার উৎপন্ন হইয়াছে। সে ব্যাধিটি দাম্পত্য-বিষয়ক। সনাতন প্রথা অনুসারে পিতৃনির্ব্বাচিত কন্যাকে সে আর বিবাহ করিতে প্রস্তুত নহে। বলিল, এই কারণে পিতা তাহার উপর বিরক্ত।

আরও কয়েক দিনে বন্ধুত্ব একটু ঘনিষ্ঠভাব ধারণ করিল। এক দিন চন্দ্রালোকিত সন্ধ্যায় নদীতীরে আমরা দুইজনে বেড়াইতেছিলাম। সুন্দরলাল সে দিন আমাকে বলিল —সে একটি মেয়েকে ভালবাসে।

শুনিয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। মনে করিতাম, এই ব্যাধি উপন্যাস-প্লাবিত বঙ্গদেশের বাহিরে এখনও বুঝি প্রবেশ করে নাই।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "তাহার নাম কি?"

"পান্না।" "কত বড়?"

"তাহার বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর।"

দেখিলাম—তবে ত ইহা একটি রীতিমত রোমান্সের কাণ্ড! বন্ধুকে আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "মেয়েটি কোথায়?"

"আমাদের গ্রামে।"

আমি জানিতাম মুন্সী জোয়ালাপ্রসাদের বাড়ী সদর হইতে ছয় মাইল দূরে পাটৌলি গ্রামে। রহস্য করিয়া বলিলাম, "তাই এত ঘন ঘন বাড়ী যাওয়া হয় বুঝি?"

সুন্দরলাল বলিল, "কোথায় ঘন ঘন যাই? আসিয়াই একবার গিয়াছিলাম, আর সেদিন আর একবার গিয়াছিলাম মাত্র। প্রথমবার শুধু দেখা পাইয়াছিলাম, তাহার সহিত কথা কহিবার সুযোগ পাই নাই। তাই দ্বিতীয়বার গিয়াছিলাম।"

হাসিয়া বলিলাম, "এখানে তবে মরিতেছ কেন? আমি হইলে ত ছুটির কয়টা মাস সেইখানেই থাকিয়া যাইতাম!"

সুন্দরলাল বলিল "আকাঙ্ক্ষার যদি অনুসরণ করিতাম, তবে আমিও তাহাই করিতাম। আমি জানি, আমি যদি তাহার কাছাকাছি থাকি, তবে সর্ব্বদা তাহাকে দেখিবার, তাহার সঙ্গে কথা কহিবার সুযোগ অন্বেষণ করিয়া বেড়াইব। তাহা হইলে নিজেকে সংযত

করিয়া রাখিতে পারিব না। এইরূপ কিছুদিন চলিলে, গ্রামের লোকের মধ্যে কি প্রকার আলোচনা উত্থিত হইবে তাহা ভাবিয়া দেখ। আমি যাহাকে ভালবাসি, আমি কি তার—"

সুন্দরলাল আর বলিতে পারিল না,—কিন্তু আমি তাহার মনের ভাব বুঝিলাম। আমি এতক্ষণ ব্যাপারটিকে পরিহাসের বিষয়স্বরূপই মনে স্থান দিয়াছিলাম। সুন্দরলালের এই কথায় সে ভাব আমার মন হইতে তিরোহিত হইল।

পরিহাসের স্বর পরিত্যাগ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "মেয়েটি কে?"

"আমাদের গ্রামে একটি পেন্সনপ্রাপ্ত বৃদ্ধ সৈনিকপুরুষ আছেন। তাঁহার নাম সুবেদার অযোধ্যানাথ। পান্না তাঁহার পৌত্রী।"

"তাহারা কি তোমাদের স্বজাতি?"

"স্বজাতি বইকি!"

"তবে বাধা কি? তোমার পিতার নিকট তোমার বাসনা কখনও ব্যক্ত করিয়াছিলে?"

"করিয়াছিলাম। নিজে করি নাই—অন্য লোক দিয়া বলাইয়াছিলাম। অযোধ্যানাথ আমাকে তাঁহার নাতজামাই করিতে প্রস্তুতও ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের কুলগত কোনও দোষ আছে বলিয়া, জাতিভয়ে পিতা কিছুতেই সম্মত হন নাই। সে মেয়ের আরও অনেক স্থলে বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল, কিন্তু কেহই সম্মত হয় না। নহিলে আমাদের ঘরে অত বড় মেয়ে কখনও অবিবাহিত থাকে?"

শুনিয়া আমার মন কিছু বিষণ্ণ হইল। এ যে উপন্যাসের মতই কান্ড-কারখানা দেখিতেছি। কিন্তু উপন্যাসে সুখ-সম্মিলনটা প্রায়ই কোন না কোনও উপায়ে সংঘটিত হইয়া যায়। এ ক্ষেত্রেও কি তাহা হইবে না?

তাহার পর সুন্দরলাল অনেক কথা বলিল। সকল কথাই তাহার প্রণয়িণীর সম্বন্ধে। সুন্দরলাল স্পষ্ট বলিল—প্রণয়ের আবেগটা সমস্ত তাহার তরফ হইতে। বালিকা সম্ভবতঃ ভালমন্দ কিছুই জানে না। তাহার জানিবার বয়সও নহে, সুযোগ ঘটে নাই।

বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া, রাত্রে আমার স্ত্রীকে সকল কথা বলিলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইহার পর আর দুই মাস কাটিল। আমার বেশ পসার হইয়া আসিতেছে। এখন প্রত্যেক বড় মোকর্দ্দমায় কোন না কোন পক্ষে আমি নিযুক্ত থাকি। সুন্দরলাল পাটনায় ফিরিয়া গিয়াছে।

ইতিমধ্যে কয়েকবার সুন্দরলালের সহিত তাহাদের গ্রামে গিয়াছিলাম। সুবেদার অযোধ্যানাথের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছি। দূর হইতে অতর্কিতে আমার বন্ধুর মনোহারিণীকেও দেখিয়া আসিয়াছি। মেয়েটি বেশ সুন্দরী বটে। তাহাকে ভালবাসিয়াছে বলিয়া সুন্দরলালকে দোষ দিতে পারা যায় না।

প্রথম যেদিন পাটোলি হইতে যখন ফিরিয়া আসিলাম, আমার স্ত্রী সর্ব্বাগ্রে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পান্নাকে দেখলে?"

"দেখলাম বইকি।"

"কেমন দেখতে গো?"

জ্ঞানীজনেরা বলিয়া থাকেন, নিজের স্ত্রীর সমক্ষে কখনও অন্য কোন স্ত্রীলোকের রূপের প্রশংসা করিও না; করিলে বিপদের সম্ভাবনা আছে। তাই সাবধানতা অবলম্বন করিয়া বলিলাম, "দেখতে মন্দ কি?"

স্ত্রী বলিলেন, "তবু কি রকম দেখতে, কি রকম রঙ, মুখ চোখ কি রকম?"

বলিলাম, "তা—ভালই।"

আমার উত্তরে আমার স্ত্রী সন্তুষ্ট হইলেন না। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "খুব সুন্দরী?"

পূর্ব্ববৎ সাবধানতা অবলম্বন করিয়া বলিলাম, "কি জানি অত বুঝিসুঝিনে।"

গৃহিণী বলিলেন, "আহা কথার শ্রী দেখ। কচি খোকা কিনা—কিছু বোঝেন না। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তুমি যদি সুন্দরলাল হতে, তা হলে তুমি ভালবাসতে কি না?

আমি দুষ্টামি করিয়া বলিলাম, "কাকে? তোমাকে?"

শ্রীমতী রাগিয়া বলিলেন, "গা জ্বালা করে কথা শুনে। পান্নাকে—পান্নাকে।"

"আমি যদি সুন্দরলাল হতাম?"

"হাঁ গো হাঁ। একটা কথা বুঝতে পার না? এত পাস করলে কি করে?"

এরূপ প্রশ্নের উত্তরে কি বলিতে হইবে জ্ঞানীজনেরা তাহার কোনও নির্দ্দেশ করেন নাই। সুতরাং কপাল ঠুকিয়া বলিলাম, "তা, বাসতাম বোধ হয়।"

কপাল ঠুকিয়া বারুদের বাক্সতে দিয়াশলাই ধরাইয়া দিলাম না কেন? ফল ইহা অপেক্ষা গুরুতর হইত না।

অনেক কষ্টে মান ভাঙ্গাইলাম। মানান্তে তিনি পান্নার পরিজনাদি সম্বন্ধে যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রায় সকলগুলিরই সন্তোষজনক উত্তর দিতে সমর্থ হইলাম।

সুবেদারজী লোকটি বড় ভাল। ঐ কন্যাটি তাঁহার সর্ব্বস্ব। বলেন, ইচ্ছা করিলেই এখনি তাহার বিবাহ দিতে পারেন, কিন্তু মেয়েটিকে পরের হাতে সমর্পণ করিয়া দিয়া কি লইয়া থাকিবেন? আজীবন তিনি যুদ্ধ ব্যবসায় করিয়া কাটাইয়াছেন, তাহার অনেক গল্প করিলেন।

আষাঢ় মাস। রাত্রে গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিলাম। সহসা কি একটা শব্দে নিদ্রাভঙ্গ হইল। কাণ পাতিয়া রহিলাম। দরজার বাহির হইতে শব্দ আসিল—"বাংগালীবাবু—এ বাংগালীবাবু।"

আমার নাম এখানে অল্প লোকেই জানে। সাধারণে আমি "বাংগালী উকীল" অথবা "বাংগালীবাবু" বলিয়াই পরিচিত।

পুনশ্চ শব্দ হইল—"বাংগালীবাবু—এ বাবুজী।"

আমি "কোন্ হায়?" বলিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিলাম।

"জারা বাহার তো আইয়ে।"

আমার স্ত্রীও জাগিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "কোনও অমঙ্গলের টেলিগ্রাম এসেছে বুঝি।"

বাতি জ্বালাইয়া, চটিজুতা পায়ে দিয়া বাহির হইলাম। জ্যোৎস্না রাত্রি—কিন্তু আকাশে অল্প মেঘ ছিল, তাই জ্যোৎস্না ম্লান দেখাইতেছিল। তালগাছগুলি কাঁপাইয়া সন্ সন্ করিয়া বাতাস বহিতেছে। উঠানের পার্শ্বে টগরগাছে একগাছ ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে।

সদর দরজা খুলিয়া দেখি, একটি অপরিচিত ব্যক্তি দাঁড়াইয়া আছে। "কে তুমি?"

লোকটি বলিল, "মোহাক্কেল।" "এত রাত্রে কেন?"

"একটি বৃদ্ধ মৃত্যুশয্যায় শায়িত। উইল করিতে হইবে। এখনি না গেলে নয়। ভোর অবধি তাঁহার নিশ্বাস থাকিবে কিনা সন্দেহ।"

"কত দূর যাইতে হইবে?"

"বেশী নয়। এখান হইতে দুই তিন ক্রোশ মাত্র।"

"যাইব কি করিয়া?"

"ঘোড়া আনিয়াছি।"

"ফীজ্ আনিয়াছ?"

"আনিয়াছি। কত লাগিবে?"

"এই রাত্রে আমি একশত টাকার কমে যাইব না।"

"এই লউন।"—বলিয়া লোকটি তাহার চাদরের প্রান্ত হইতে টাকায় নোটে একশত টাকা গণিয়া দিল।

আমি তাহাকে কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করিতে বলিয়া, বাটির ভিতরে প্রস্তুত হইতে গেলাম। টাকাগুলি বাক্সে বন্ধ করিতে করিতে, আলিপুর বারের সেই নিরন্ন দিনগুলির কথা মনে পড়িল। সেই একদিন আর এই একদিন। তখন সারাটা দিন কাছারিতে হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকিয়াও মক্কেল-দেবতার দর্শন পাওয়া যাইত না;—আর এখন সেই দেবতা দুই প্রহর রাত্রে আসিয়া হাঁকাহাঁকি করিয়া ঘুমটুকু নষ্ট করিয়া দিল।

গৃহিণীকে অভয় দিয়া, ভৃত্যগণকে জাগাইয়া, প্রস্তুত হইয়া বাহির হইলাম। অশ্বারোহণ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বৃদ্ধটি কে?"

আমার সঙ্গী বলিল, "সুবেদার অযোধ্যানাথ।"

"সুবেদারজী? তাঁহারই আসন্নকাল উপস্থিত?"—বলিয়া আমি দুঃখে মৌন হইয়া রহিলাম। এই যে পনেরো দিন হইল তাঁহার কাছে বসিয়া কত যুদ্ধকাহিনী শ্রবণ করিয়া আসিয়াছি।

ঘণ্টাখানেক অশ্বারোহণের পর আমার সেই পূর্ব্বপরিচিত গ্রামটিতে গিয়া উপনীত হইলাম।

সুবেদারজী আমাকে বলিলেন, "বাবু আসিয়াছেন? আসুন—বসুন। আমি ত চলিলাম।"

আমি বলিলাম, "না সুবেদারজী। ও কথা কেন বলেন? আপনি ভাল হইবেন। আবার আপনার কাছে কত যুদ্ধের গল্প শুনিব।"

শুনিয়া সুবেদারজীর মুখে একটু ক্ষীণ হাস্যরেখা দেখা দিল। বলিলেন, "রামজীর ইচ্ছা। তাঁহার যাহা ইচ্ছা হইবে তাহাই হইবে। এখন আমার একটি কাম করুন। অনেক রাত্রে আপনাকে কষ্ট দিয়া আনিয়াছি।" আমি বলিলাম, "আজ্ঞা করুন।"

সুবেদারজী বলিলেন, "আপনি জানেন বোধ হয়, আমি নিঃসন্তান। আমার একটি মাত্র পুত্র ছিল, সে বীরের ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়াছে—স্বর্গে গিয়াছে। হতভাগ্য আমাকে রোগশয্যায় প্রাণত্যাগ করিতে হইল। রামজীর ইচ্ছা। আমার সেই পুত্রের একটি কন্যা আছে। তাহাকে বুকে করিয়া আমি জীবনের শেষভাগ কাটাইলাম। আমার একটি ভ্রাতুষ্পুত্র আছে, সে পঞ্জাবে চাকরী করে। আমার যাহা কিছু সম্পত্তি আছে, তাহাকে এবং আমার পৌত্রীকে বণ্টন করিয়া দিতে ইচ্ছা করি। আপনি এই মর্ম্মে একটি উইল প্রস্তুত করুন। আমার একটি স্বর্ণনির্ম্মিত সিংহ আছে। আমি যখন বর্ম্মাযুদ্ধে গিয়াছিলাম, সেই সময় রাজবাটী লুট করিতে গিয়া সেটি পাই। সিংহটি ওজনে তিশ সেরের উপর। সোণাটার দাম প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা হইবে। আমার পৌত্রীকে যে বিবাহ করিবে, সে ওই সিংহটি যৌতুক পাইবে। আমার লোহার সিন্ধুকটিতে ঐ সিংহ রক্ষিত আছে। এ কথা এতদিন কেহ জানিত না। জানিলে ডাকাতেরা আসিয়া সিংহটি লইয়া যাইত। লোহার সিন্ধুকে আমার এক হাজার টাকা আছে। ঐ টাকা আমার পৌত্রী পান্নার নামে লিখিয়া দিন। আর আমার এই বাড়ী, সামান্য জমিজমা যাহা আছে, বাসনপত্র, আর মেডেলগুলি, সমস্ত আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের নামে লিখিয়া দিন।"

উপরিউক্ত কথাগুলি বৃদ্ধ ধীরে ধীরে বলিয়া যাইতে লাগিলেন—আর আমিও সঙ্গে সঙ্গে নোট করিয়া যাইতে লাগিলাম। লিখিবার জন্য কাগজ ভাঁজ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার এ উইলের অছি কাহাকে নিযুক্ত করিবেন?"

বৃদ্ধ বলিলেন, "এই দেখুন। আসল কথাই ভুলিয়া যাইতেছিলাম। অছি আপনি হইবেন। ইহাও লিখিয়া দিন, আপনার মনোনীত পাত্র পান্নাকে বিবাহ করিলে তবেই সে ঐ সিংহ পাইবে। আপনি সুন্দরলালের বন্ধু। আপত্তি আছে কি?"

আমি বলিলাম, "আমি আহ্লাদের সহিত আপনার উইলের অছি হইতে প্রস্তুত

আছি।"

আমি সুন্দরলালের কথা—তাহা বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিয়া আমার সম্মতি জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য আমার বুঝিতে বাকী রহিল না।

উইল প্রস্তুত করিয়া ফেলিলাম। বৃদ্ধ সহি করিলেন। সাক্ষীদেরও সহি লইলাম।

বৃদ্ধ বলিলেন, "উইলখানি আপনি সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। আর এই লউন আমার লোহার সিন্ধুকের চাবি। আপনার পরিবার এখানে আছেন?"

"আছেন।"

"আমার অবর্ত্তমানে তবে আপনি দয়া করিয়া পান্নাকে লইয়া গিয়া বিবাহ পর্য্যন্ত আপনার বাটীতে রাখিবেন। পান্না নিজে রাঁধিয়া খাইবে।"

আমি বলিলাম, "আমার বাড়ীতে এই দেশের ব্রাহ্মণ ঠাকুর আছে। পান্নাকে নিজে রাঁধিয়া খাইতে হইবে কেন?"

উঠিয়া বৃদ্ধকে বলিলাম, "এখন আমি চলিলাম। কিন্তু আপনাকে ভাল হইতে হইবে। আরও অনেক দিন আপনাকে বাঁচিয়া থাকিয়া আমাদিগকে যুদ্ধের গল্প বলিতে হইবে।"

বৃদ্ধ অশ্রুগদ্‌গদ-কণ্ঠে বলিলেন, "রামজীর ইচ্ছা। আপনার হাতে আমার পান্নাকে, আর টাকাকড়ি, সমস্ত অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। যাহাতে পান্নার মঙ্গল হয় তাহাই আপনি করিবেন।"

আমি সুবেদারজীকে আমার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম।

ইহার পর একটি দিন মাত্র বৃদ্ধ জীবিত ছিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এক মাস কাটিয়াছে। সুবেদারজীর শ্রাদ্ধ-শান্তি হইয়া গিয়াছে।

পান্নাকে আনিয়া আমার স্ত্রীর কাছে রাখিয়া দিয়াছি। তাহার টাকা ও সিংহসুদ্ধ লোহার সিন্ধুকটি আনিয়া রাখিয়া দিয়াছি।

প্রথম কয়েকদিন পান্না পিতামহের শোকে অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হইয়া ছিল। আমার স্ত্রীর শুশ্রূষার গুণে ক্রমে সে সুস্থ হইয়া উঠিল।

একদিন রবিবার, প্রভাতে উঠিয়া চা খাইতেছি, ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল বাবু জোয়ালাপ্রসাদ সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। আমাকে এ অনুগ্রহ ইতিপূর্ব্বে আর কখনও তিনি করেন নাই।

আমি মাঝে মাঝে সুবেদারজীর সিন্ধুকটি খুলিয়া সেই স্বর্ণ-কেশরীর প্রতি দৃষ্টি-পাত করিতাম, আর ভাবিতাম, এখনও বাবু জোয়ালাপ্রসাদ এ দীনের কুটীরে পদার্পণ করিতেছেন না কেন?

বাহিরে গিয়া অভ্যর্থনা করিয়া উকীল সাহেবকে বসাইলাম। দুই এক কথার পর তিনি বলিলেন, "দেখুন, আপনার জন্য আমাদের ত বড় নিন্দা হইয়াছে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন?"

"আমাদের জাতি-ভাই সকলেই বলিতেছে যে, বুড়া মরিয়া গেল, তাহার পৌত্রীটা খাইতে না পাইয়া শেষে বাঙ্গালীর অন্ন খাইতেছে—জাতি-ভাই কেহ তাহাকে আশ্রয় দিল না।"

আমি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম, "খাইতে না পাইয়া? কেন, পান্না ত একেবারে নিঃস্ব নহে, সুবেদারজী উইল করিয়া তাহাকে কিছু দিয়া গিয়াছেন, তাহা কি আপনি শুনেন নাই?"

জোয়ালাপ্রসাদ বিস্মিতের মত বলিলেন, "উইল করিয়াছেন? তাঁহার ছিল কি যে তিনি উইল করিবেন? আপনি পরিহাস করিতেছেন।"

উকীল সাহেবের এই অভিনয়টুকু দেখিয়া, মনে মনে আমোদ অনুভব করিলাম।

অমায়িকভাবে বলিলাম, "না, উইল করিয়া গিয়াছেন। আমিই সে উইল লিখিয়াছি।"

জোয়ালাপ্রসাদ বলিলেন, "তা ভাল। বাড়ীটি আর দুই-দশ টাকা যাহা বুড়ার ছিল, তাহা উইল করিয়াছেন বোধ হয়। তাহা বুদ্ধির কার্য্যই হইয়াছে। ঐ যে পান্নার পিতা, সে বুড়ার বিবাহিতা স্ত্রীর সন্তান ছিল না বলিয়া একটা গুজব আছে কিনা। উইল না করিলে সম্ভবতঃ ও বাড়ীটি বুড়ার ভ্রাতুষ্পুত্র আসিয়া দখল করিত। ওকালতী করিতে করিতে বুড়া হইয়া গেলাম, সবই বুঝিতে পারি।"—বলিয়া তিনি একটু কাষ্ঠহাসি হাসিলেন।

লোকটার মুখ দেখিয়া আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম, আসল কথাটাই তাঁহার মনে তোলাপাড়া করিতেছে, অথচ প্রকাশ করিবার সাহস হইতেছে না।

নানা অসম্বন্ধ কথা পাড়িয়া, নিতান্ত অসংলগ্নভাবে, অবশেষে কথাটা বলিয়া ফেলিলেন। পান্নার সহিত সুন্দরলালের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন।

আমি মনে মনে বলিলাম, "হে স্বর্ণ-কেশরী—ধন্য তোমার মহিমা!"

জোয়ালাপ্রসাদকে বলিলাম, "মেয়েটির ঐ যে কুলগত দোষ আছে—তাহাতে আপনার জাতি-ভাই কোনও আপত্তি করিবে না ত?"

জোয়ালাপ্রসাদ বলিলেন, "করিবে। আমি বিলক্ষণ জানি—তাহারা আমাকে একঘরে করিবে। কিন্তু আমরা শিক্ষিত ব্যক্তিরা যদি নির্ব্বোধ সমাজ-শাসনের এত ভয় করিয়া চলি, তাহা হইলে দেশের কুসংস্কারাপন্ন রীতিনীতিগুলি কি কখনও সংশোধিত হইবে বলিয়া মনে করেন নবীনবাবু?"

অনেক কষ্টে হাস্য সংবরণ করিয়া গম্ভীরভাবে আমি মাথাটি নাড়িতে লাগিলাম। বলিলাম, "ঠিক ঠিক—উকীল সাহেব। আপনি আপনার বিদ্যাবত্তার উপযুক্ত কথাই বলিয়াছেন।"

জোয়ালাপ্রসাদ বলিলেন, "ইংরাজি পড়ি নাই বটে,—কিন্তু সমাজ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার মতাদি ইংরাজি-শিক্ষিতদিগের মতই।"

আমি পূর্ব্ববৎ গম্ভীরভাবে বলিলাম, "তা বটেই ত! তা বটেই ত!"

জোয়ালাপ্রসাদ বোধ হয় মনে করিলেন তাঁহার এ ভণ্ডামিটুকু আমি ধরিতে পারি নাই। তাই উৎসাহিত হইয়া বলিলেন "আচ্ছা নবীনবাবু, আপনি ত সুন্দরলালের সঙ্গে বিশেষ বন্ধুত্বস্থাপন করিয়াছেন। একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি। আমি সম্প্রতি শুনিলাম—সুন্দরলাল পান্নাকে বিবাহ করিবার জন্য পাগল। ইহা সত্য কি?"

আমি বলিলাম, "সত্য।"

জোয়ালাপ্রসাদ উৎসাহের সহিত বলিলেন, "তবে আমার মনের সকল দ্বিধাই এখন কাটিয়া গেল। হউক পান্না কু-জাতি—হউক সে অর্থহীনা—আমার পুত্র যাহাকে হৃদয় সমর্পণ করিয়াছে—আমি তাহাকে পুত্রবধূ করিব। আমার পুত্রের সুখ বড়, না আমার জাতি বড়, নবীনবাবু?"

হাস্যের এত প্রচণ্ড শক্তি রোধ করিবার ক্ষমতা আমার আছে পূর্ব্বে তাহা জানিতাম না। পূর্ব্ববৎ শান্তভাবে বলিলাম, "অবশ্য আপনার পুত্রের সুখই বড়, উকীল সাহেব।"

জোয়ালাপ্রসাদ বলিলেন, "তবে আপনার মত আছে?"

আমি কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিবার ভাণ করিলাম। জোয়ালাপ্রসাদের মুখ কালিমাময় হইয়া আসিতে লাগিল। তাহার মনে হইল, তবে বুঝি বা আমি অমত করি।

আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া জোয়ালাপ্রসাদ বলিলেন, "সুন্দরলাল যখন আপনার প্রিয় বন্ধু, তখন অবশ্যই তাহার শুভ ইচ্ছা আপনি করিবেন।"

শেষে আমি বলিলাম—"আমার মত আছে।"

শুনিয়া স্বর্ণলোভী বৃদ্ধ আনন্দে যেন অধীর হইয়া উঠিলেন। প্রথমে স্বর্ণসিংহের অস্তিত্ব বিষয়ে অজ্ঞতার ভাণটুকু দেখাইতে যেরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, এখন এই অপরিমিত আনন্দোচ্ছ্বাসটুকু গোপন করিতে সেরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অন্য

সকল চিত্তবৃত্তি অপেক্ষা, প্রবল আনন্দ গোপন করাই বোধ হয় মানুষের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন।

পান্না-সুন্দরলালের বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

উইলের প্রোবেট লইয়াছি। পান্নার হাজার টাকা, তাহার নামে কোম্পানির কাগজ কিনিয়া দিব বলিয়া রাখিয়া দিয়াছি। সিংহটি জোয়ালাপ্রসাদ লইয়া গিয়াছেন।

বিবাহের সপ্তাহখানেক পরে, আবার নিশীথের শান্তিভঙ্গ করিয়া আমার সদর দরজায় শব্দ উত্থিত হইল—"বাবু—এ গোবিন বাবু!"

জাগিয়া উঠিয়া ভাবিলাম, "আবার কাহারও উইল করিতে হইবে নাকি?"

বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, লণ্ঠনহস্তে একটা ভৃত্য দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পশ্চাতে পান্না ও সুন্দরলাল।

আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হে? ব্যাপার কি?"

"ভিতরে চল—বলিতেছি।"

ভৃত্যকে বিদায় দিয়া সুন্দরলাল পান্নাকে লইয়া আমার অঙ্গনে প্রবেশ করিল। বলিল, "বাবা আমাদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছেন।"

"কেন?"

"সে সোণার সিংহটা সমস্ত সোণার নহে। খুব পাতলা সোণার পাতে উপরটা মোড়া ছিল। ভিতরটা সমস্ত তামা। বাবা পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন, উহা গলাইয়া বিক্রয় করিয়া কোম্পানির কাগজ কিনিয়া রাখিবেন; নহিলে ডাকাইতে কোন্ দিন সিংহটা লইয়া যাইবে। আজ সন্ধ্যা হইতে গলানো হইতেছিল। দুইশত টাকার আন্দাজ সোণা বাহির হইয়াছে—বাকী সমস্ত তামা; বাবা ক্রোধে ক্ষিপ্তের মত হইয়াছেন। দূর দূর করিয়া আমাদিগকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিলেন।"

আমার স্ত্রী অন্ধকারে বারান্দায় দাঁড়াইয়া সমস্ত শুনিতেছিলেন। তাড়াতাড়ি আসিয়া পান্নার হাত ধরিয়া তাহাকে নিজকক্ষে লইয়া গেলেন। আমি সুন্দরলালকে লইয়া একটি কক্ষে বসিলাম।

[জ্যৈষ্ঠ, ১৩১১]

মুক্তি

প্রথম পরিচ্ছেদ

লণ্ডনে একটি বিদ্যুৎ-আলোকিত কক্ষে একজন বঙ্গীয় যুবক একাকী বসিয়া ছিল।

কক্ষটি অনতিপ্রশস্ত। মধ্যস্থলে একটি টেবিল, তাহা গৈরিকবর্ণের "বেজ" কাপড়ে আবৃত। চারিপাশে চারিখানি চেয়ার রহিয়াছে। কিছু দূরে জানালার কাছে একটি সোফা। দেওয়ালের কাছে একস্থানে একটি পুস্তকের আলমারি, তাহার মধ্যে ডাক্তারি শাস্ত্রের অনেকগুলি পুস্তক সারিবন্ধ রহিয়াছে। আলমারির মাথায় খানকতক "ডেলি নিউজ্" সংবাদপত্র এবং কয়েকখানা সচিত্র মাসিকপত্র গোছান আছে। অপর পার্শ্বে দেওয়ালে অগ্নিকুণ্ডের কয়লাগুলি ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে। কুণ্ডের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে ম্যাণ্টেল্-প্লেস্—তাহার মধ্যভাগে একটি ঘড়ি। দুই পার্শ্বে কয়েকখানি ফোটোগ্রাফ ও টুকিটাকি সৌখীন দ্রব্য সাজান আছে। ফোটোগ্রাফের মূর্ত্তিগুলি অধিকাংশই সেইদেশীয়। বাকীগুলির একখানিতে একটি বঙ্গীয় যুবতীর মুখ রহিয়াছে।

যুবকটির নাম চারুচন্দ্র চৌধুরী। সে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-বি পরীক্ষায় সম্প্রতি উত্তীর্ণ হইয়া লণ্ডনে আসিয়াছে; আই-এম-এস পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। এই বাড়ীটি লণ্ডনের কেন্‌সিংটন নামক অংশে অবস্থিত। চারু পূর্ব্বে অনেকবার এই

বাড়ীতে আসিয়া বাস করিয়াছে।

টেবিলের নিকটে একখানি চেয়ারে চারু উপবিষ্ট। তাহার মুখে একটি পাইপ, হস্তে একখানি সবুজরঙের সান্ধ্য-সংবাদপত্র। কিন্তু সংবাদের প্রতি চারুর বিশেষ মনোযোগ দেখা যাইতেছিল না। সে মুহুর্মুহু ঘড়ির পানে চাহিতেছিল।

তাহার কারণও ছিল। আজ শনিবার, শেষ ডিলিভারিতে ভারতবর্ষীয় ডাক আসিবার কথা আছে। ব্রিণ্ডিসি হইতে যে দিন যে সময় ডাকগাড়ী এবার লণ্ডনাভিমুখে রওনা হইয়াছে, তাহাতে ঘণ্টা হিসাব করিয়া, আজ শেষ ডিলিভারিতে পত্রবণ্টন হয় কি না হয় ইহা সংশয়ের বিষয়। আজ না আসিলে আর সোমবার প্রভাতের পূর্ব্বে পত্র পাওয়া যাইবে না, কারণ সভ্য-জগতের মধ্যে লণ্ডনই একমাত্র স্থান যেখানে রবিবারে চিঠি বিলি হয় না।

পৌনে দশটা হইল। তখন দূরের গৃহস্বারগুলিতে ডাকওয়ালার "নক্"—খট্ খট্ শব্দ—উত্থিত হইতে লাগিল। শব্দ ক্রমে নিকট হইতে নিকটে আসিতেছে। ক্রমে সেই বাড়ীর দরজাতেও শব্দ হইল। চারু নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া দাসীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

দাসী আসিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া দুয়ারে আঘাত করিল। বলিল, "ভিতরে আসিতে পারি মহাশয়?"

"এস।"

দরজা খুলিয়া ঈডিথ্ প্রবেশ করিল। তাহার হস্তে একটি ট্রে, সেটি পত্র, প্যাকেট্ ও পার্শেলে পরিপূর্ণ। সেগুলি সে চারুর সম্মুখে সন্তর্পণে নামাইয়া রাখিতে লাগিল।

চারু তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিল, "Good night, Edith."

"Good night, Sir"—বলিয়া দাসী প্রস্থান করিল।

চারু তখন পত্রগুলি একে একে পাঠ করিল। তাহার মধ্যে একখানিতে এইরূপ লেখা ছিল:—

কলিকাতা।

প্রিয় চারু,

এ মেলে তোমার পাস হওয়ার সংবাদ পাইয়া যে কি সুখী হইলাম, তাহা বলিতে পারি না। তুমি এডিনবরা ছাড়িবার সময় লণ্ডনের ঠিকানা দাও নাই। টমাস্ কুকের কেয়ারে পাঠাইলে পাছে পত্র পৌঁছিতে দেরী হয়, তাই আমি আন্দাজ করিয়া কেনসিংটনে তোমার পূর্ব্ব ঠিকানাতেই দিলাম। জানি তুমি সেখানে স্থান পাইলে অন্য কোথাও যাইবে না। অহো পোলাওয়ের কি মহিমা! তোমার কারিপোলাও-রন্ধন-নিপুণা ল্যাণ্ড-লেডির জন্য কিছু মশলা আজ পার্শেল করিয়া পাঠাইলাম।

তোমার পত্র যখন আসিল তোমার দাদা তখন কাছারিতে ছিলেন। তাই খোকাকে ধরিয়া আনিয়া তাহাকেই শুভসংবাদটা বলিলাম। শুনিয়া কিন্তু সে মোটেই প্রসন্ন হইল না। কেবল মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া বলিতে লাগিল, "আমি ওষুধ খাব না।" তাহার বিশ্বাস বাড়ীতে ডাক্তার হইলে প্রত্যহই তাহাকে ঔষধ খাইতে হইবে।

তোমার শেষ পরীক্ষাটা হইয়া গেলে বাঁচা যায় বাপু। ঘরের ছেলে শীঘ্র ঘরে ফিরিয়া এস। আমি তোমার জন্য একটি কনে ঠিক করিতেছি।

ভাল কথা—নির্ম্মলার বিবাহ হইয়া গিয়াছে তাহা তোমায় পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। তাহার বরটি যে বিলাত চলিল। নরেন এই মেলেই যাইতেছে। তাহার শাশুড়ী আমাকে বলিলেন, "চারুকে লেখ, সে যেন ষ্টেশন থেকে তাকে নামিয়ে নিয়ে যায়। বাসা-টাসা ঠিক করে দেয়। একটু দেখে শোনে।" নরেন মার্সেল্স্ হইয়া যাইতেছে সুতরাং পত্র পৌঁছিবার পরদিন সে লণ্ডনে পৌঁছিবে। ডোভারে নামিয়াই তোমায় টেলিগ্রাম করিয়া দিবে। ছেলেটি যদিও বি-এ ক্লাসে পড়িতেছিল, তবু সে অত্যন্ত নিরীহ, কিছু বোকা-সোকা রকমের। বিবাহের পূর্ব্বে আমাদের এ সমাজে কখনও মিশে নাই—একটু থতমত

ভাবটা। বেচারি নিতান্তই হিন্দুঘরের মা-মাসী-পিসীর অঞ্চলের নিধি। লণ্ডনে হারাইয়া না যায় দেখিও।

তোমার দাদাকে রোজ বলিতেছি, "কেবল ব্যারিস্টারি করিয়া টাকা জমাইয়া কি হইবে, চারু সেখানে থাকিতে থাকিতে আমায় একবার বিলাত দেখাইয়া আনিবে চল।" তা তোমার দাদা রাজি হন না। চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী। তাঁহার গুড়গুড়িটাই কাল হইয়াছে। বলিলেই বলেন, "ও গুড়গুড়িটে নিয়ে বিলেত যাই কি করে? ফেলেও ত যেতে পারিনে।"—তোমার নূতন ডাক্তারি বিদ্যা খাটাইয়া, গুড়গুড়িতে তামাক খাওয়া মহাদোষ এই বলিয়া, খুব ভয় দেখাইয়া তাঁহাকে একটা পত্র লিখিতে পার? তিনি গুড়গুড়ি পরিত্যাগ না করিলে আমার বিলাত দেখার কোনও আশা নাই।

আমরা সকলে ভাল আছি। আজ তবে আসি।

বউদিদি

তোমার স্নেহের

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রাতরাশের পর ঈডিথ্ যখন টেবিল পরিষ্কার করিতেছিল, চারু তাহাকে বলিল, "মিসেস জোন্সকে গিয়া জিজ্ঞাসা কর, তিনি কয়েক মিনিটের জন্য আসিয়া আমার সঙ্গে কথা কহিতে পারেন কি?"

মিসেস জোন্স চারুর ল্যাণ্ডলেডি। কিয়ৎক্ষণ পরে মধ্যবয়স্কা, কিঞ্চিৎ স্থূলাঙ্গী, হাস্যমুখী মিসেস জোন্স আসিয়া চারুকে শুভপ্রভাত ইচ্ছা করিয়া দাঁড়াইল।

চারু বলিল, "মিসেস জোন্স এ বাড়ীতে আর কোনও ভাড়া দিবার কক্ষ আছে কি? একটি শয়নকক্ষ ও একটি বসিবার কক্ষ দিতে পার?"

"বসিবার কক্ষ ত নাই মিস্টার চৌধুরী। কেবল একটি শয়নকক্ষ আছে। ঐ যে সে দিন ডাব্লিন হইতে আইরিশ দম্পতি কন্যাসহ আসিলেন কিনা, তাই একটি বসিবার কক্ষকে শয়নকক্ষে পরিণত করিতে হইয়াছে। সুইট্ ভাঙিয়া গিয়াছে।"

"আইরিশ দম্পতি? তাঁহারা কতদিন থাকিবেন?"

"এখন অনেক দিন থাকিবেন, কিন্তু মেয়েটি এক সপ্তাহ পরে স্কুলে চলিয়া যাইবে।"

"তবে এক সপ্তাহ পরে একটি বসিবার কক্ষও ত দিতে পার?"

"তা পারি বটে। কিন্তু দুই সপ্তাহ পর হইতে ও দুইটি কক্ষও বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে। যিনি আসিবেন তিনি স্থায়ী লোক, ছুটিতে সমুদ্রতীরে গিয়াছেন।"

"তবে ঐ শয়ন-কক্ষটিই দুই সপ্তাহের জন্য দাও। একটি বন্ধু আজ ভারতবর্ষ হইতে পৌঁছিবেন। আমার বসিবার ঘরই দুইজনে ব্যবহার করিব এখন।"

"ধন্যবাদ মিস্টার চৌধুরী। আমি যদি স্থায়ীভাবে আপনার বন্ধুকে রাখিতে পারিতাম তবে অত্যন্ত সুখী হইতাম। কিন্ত উপায় নাই।"

"ঐ শয়নকক্ষ ও বোর্ডিং সপ্তাহে কত লাগিবে মিসেস জোন্স?"

"পঁচিশ শিলিং।"

"বেশ, তবে তুমি সে কক্ষের জানালা খুলিয়া বিছানাপত্র ঠিক করিয়া রাখ। আজ ডিনারের পূর্ব্বে আমার বন্ধু আসিবেন।"

চারুকে ধন্যবাদ দিয়া মিসেস জোন্স চলিয়া যাইতেছিল, চারু তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "আর শুন মিসেস জোন্স, ভারতবর্ষ হইতে আমার বউদিদি এই পোলাওয়ের মশলা পাঠাইয়া দিয়াছেন, লইয়া যাও।"

পার্শ্বেলটি লইয়া—"Oh how good of her, how kind of her"—বলিতে বলিতে মিসেস জোন্স হাস্যমুখে প্রস্থান করিল।

বৈকালে চারু যখন চা পান করিতেছিল, তখন ডোভার হইতে নরেনের টেলিগ্রাম

পেঁৗছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সে Bus-এ আরোহণ করিয়া, "চেয়ারিং ক্রশ" ষ্টেশন অভিমুখে যাত্রা করিল।

ছয়টার সময় ডোভার-ট্রেণ আসিয়া পেঁৗছিল। নরেনকে খুঁজিয়া লইতে বেশী বিলম্ব হইল না।

প্রথমেই নরেন বলিল, "দেখুন, ডোভারে আমার জিনিষপত্র ব্রেকভ্যানে দিলাম, কিন্তু কোনও রসিদ দিলে না। এখন সেগুলো কি দেখিয়ে ছাড়িয়ে নিই?"

চারু বলিল, "না, এখানে রসিদ-টসিদ অত প্রচলিত নেই। চলুন ব্রেকভ্যানের কাছে, আপনার কোন্‌গুলো জিনিষ দেখিয়ে দিলেই পোর্টার (মুটে) গাড়ীতে তুলে দেবে এখন।"

নরেন বিস্মিত হইয়া বলিল, "বটে! ডোভারে আপনাকে টেলিগ্রাম করলাম, তারও রসিদ দিলে না। ভাবলাম আমার ছটা পেনিই আত্মসাৎ করে নিলে বুঝি।"

চারু হাসিয়া বলিল, "না, ও রকম হয় না।"—বলিতে বলিতে ইহারা ব্রেকভ্যানের কাছে উপস্থিত হইল। জিনিষ লইয়া হ্যান্‌সমে উঠিয়া চারু গাড়োয়ানকে বাড়ীর ঠিকানা বলিয়া দিল। গাড়ী লণ্ডনের সেই কাঠের-উপর-রবার-গলাইয়া ঢালা রাস্তা দিয়া, দ্রুত-বেগে ছুটিল।

পথে কথাবার্ত্তা কহিয়া পথপার্শ্বস্থ দৃশ্যাদি দেখাইয়া, চারু নরেনের চিত্তবিনোদন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। এই ট্রাফালগর স্কোয়ার, ঐ নেলসন-কলম উর্দ্ধে উঠিয়াছে, ঐ একটু দূরে ন্যাশন্যাল গ্যালারি দেখা যাইতেছে, এই রাস্তায় His Majesty's Theatre, সেখানে প্রসিদ্ধ অভিনেতা Beerbhom Tree অভিনয় করেন, এইবার পিকাডিলি দিয়া যাইতেছি, ঐ হাইড পার্ক—ইত্যাদি বলিতে বলিতে গাড়ী আসিয়া বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইল।

ঈভিথের সাহায্যে, জিনিষপত্রসহ নরেনকে তাহার শয়নকক্ষে তুলিয়া দিয়া চারু বলিল, "এখনও সাতটা বাজেনি। আপনি বেশ পরিবর্ত্তন করুন। সাড়ে সাতটায় ডিনার।"

নরেন বলিল, "দেখুন মিষ্টার চৌধুরী, আমার একটি অনুরোধ রাখতে হবে।"

চারু কিঞ্চিৎ কৌতূহলের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলুন দেখি?"

অত্যন্ত বিনয়ের সহিত নরেন বলিল, "আমাকে 'আপনি' 'মশাই' করবেন না। আমাকে নিজের ছোট ভাইটি বলে মনে করবেন, স্নেহ করবেন,—আমিও আপনাকে দাদার মতন ভক্তি সম্মান করব।"

চারুর পাঁচ বৎসরকাল বিলাতী শিক্ষায়, নরেনের এই উক্তিটি অসহনীয় 'ন্যাকামি' বলিয়া মনে হইল, এবং তাহার অত্যন্ত হাসি পাইল। কিন্তু সেই বিলাতী শিক্ষার বশেই মনের ভাব সম্পূর্ণ গোপন করিয়া বলিল, "তথাস্তু। তুমি প্রস্তুত হও। দাসী এখনই দরজার বাইরে গরম জল রেখে যাবে।"

সাড়ে সাতটার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, নরেন প্রস্তুত হইয়াছে কিনা দেখিবার জন্য, চারু তাহার দুয়ারে গিয়া আঘাত করিল। নরেন তাড়াতাড়ি আসিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল। তাহার মুখে একটি সিগারেট ছিল, চারুকে দেখিয়াই সেটি ফেলিয়া দিল।

নরেন তখন হাত মুখ ধুইয়া, বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া প্রস্তুত। চারু ভিতরে গিয়া বসিয়া, কক্ষখানির চারিদিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিল, "ঘর পছন্দ হয়েছে?"

নরেন একটু সমস্যায় পড়িয়া গেল। এ ঘর পছন্দ হওয়া উচিত কি উচিত নয়, এই দ্বিধায় পড়িয়া সাবধানে বলিল, "মন্দ কি।"

চারু বলিল, "হ্যাঁ। আমিও দুই একবার এসে এ ঘরে বাস করেছি। আর কিছুতে আমার আপত্তি নেই, কেবল এই wall paper-এর design-টা বড় aggressive—ওটা আমি ভারি অপছন্দ করি। আমি মিসেস জোন্সকে বলেওছিলাম, কিন্তু এমন অশিক্ষিত ল্যান্ডলেডিকে বোঝান শক্ত। কিম্বা হয় ত বদলাতে খরচ হবে বলে বদলাতে চায় না।"

নরেন দেওয়ালের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। ভাবিল—"কেন বেশ ত লতা পাতা আঁকা রয়েছে; মন্দটা কি?"—ইহাও মনে হইল,—আর একটু হইলেই ত সে বলিতেছিল 'সুন্দর ঘরটি'—তাহা হইলে চারু তাহাকে মনে মনে কি জানোয়ারই ঠাওরাইত। খুব রক্ষা হইয়াছে।

অন্য কথা পাড়িল। সে সমুদয়ই বিলাতী আচার ব্যবহার সম্বন্ধীয় কথা। এক সময় নরেন জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা দাদা, ঐ যে ঝিটা আছে, ওকে ডাকতে হলে কি বলে ডাকব?" "ওর নাম ঈডিথ্।"

"মিস ঈডিথ্ বলে ডাকব, না শুধু ঈডিথ্ বলব?"

"শুধু ঈডিথ্ বলবে।"—বলিয়াই একটু পরে চারু বলিল, "যেন মনে কোরো না ঝিকে তাচ্ছিল্য করা হিসেবে 'মিস'টা বাদ দেওয়া হয়। তা মোটেই নয়। এখনও অনেক সেকালকার chivalrous spirit-এর বৃদ্ধ দেখা যায়, যাঁরা পথে ঘাটে ঝির সঙ্গে হঠাৎ দেখা হলে টুপী স্পর্শ করে থাকেন। ওরকম দেখা হলে, কোন একটা pleasant remark করাই নিয়ম। তুমি যে ঝিকে দেখেও, তাকে notice না করে চলে যাবে, তা ভয়ানক অভদ্রতা। "Fine afternoon, Edith"—'Isn't it Sir?' বলে সে চলে যাবে এখন। তোমার যদি একটু বেশী বয়স হয়ে থাকে, তবে পরিহাস করে' এমন কথাও বলতে পার—'Going to meet your young man Edith?'—সে হয়ত বলবে—'Ain't got no young man, Sir.' বলে হেসে চলে যাবে।"

এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে ডিনারের সময় হইল। নরেনকে সঙ্গে করিয়া চারু নিজের বসিবার কক্ষে লইয়া চলিল। পথে নরেন বলিল, "দেখুন, এই থ্যাঙ্কিউটা বলতে সব সময় মনে থাকে না। এই ঈডিথ্ গরম জল দিয়ে গেল, থ্যাঙ্কিউটা বলতে ভুলে গেলাম। চলে গেলে পর মনে হল। হয় ত কি জানোয়ারই মনে করবে।"

চারু বলিল, "কিছু ভয় নেই। এখানে 'poor foreigner'-এর সাত খুন মাফ। এরা বিদেশী মাত্রকেই অত্যন্ত কৃপার চক্ষে দেখে থাকে—তা শাদা আদমি কালা আদমি নেই।"

ডিনারের পর, চারু নরেনকে হুইস্কি দিতে চাহিল, কিন্তু নরেন লইল না।

চারু বলিল, "খাওনা বুঝি, সে ভালই।"

নরেন গম্ভীরভাবে বলিল, "না, আসবার সময় প্রতিজ্ঞা করে এসেছি ও সব স্পর্শ করব না।"

চারু নিজের গ্লাসে একটু হুইস্কি ও সোডা ঢালিতে ঢালিতে হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কার কাছে প্রতিজ্ঞা করে এসেছ?"

নরেন লজ্জায় চুপ করিয়া রহিল। চারু তাহার পাইপটি পরিষ্কার করিতে করিতে একটি গানের এক চরণ সুর করিয়া বলিল—"He is married—He is married."

পাইপ ভরিতে ভরিতে, পাঁচ বৎসর পূর্ব্বেকার দেখা, নির্ম্মলার সেই বালিকা মূর্ত্তি, স্কুলের গাড়ীতে চড়িয়া সেই লক্ষ্মীটির মত পড়িতে যাওয়া, বাড়ী ফিরিয়া ছোট ভাইদের সঙ্গে পশ্চাতের বাগানে সেই ফুটবল খেলা করা, চারুর মনে পড়িল। মনে মনে হাসিয়া সে ভাবিল, "তারই এখন এত প্রতাপ!"

কিয়ৎক্ষণ কথাবার্ত্তার পর ঈডিথ্ প্রবেশ করিয়া নরেনকে বলিল, "আপনার বাক্সের চাবিগুলি কি পাইতে পারি মহাশয়?"

শুনিয়া নরেন একটু বিস্মিত হইয়া, বাঙ্গালায় চারুকে জিজ্ঞাসা করিল, "চাবি চায় কেন?"

চারু বলিল, "তোমার বাক্স থেকে কাপড়চোপড় বের করে wardrobe-এ সাজিয়ে রাখবে। খালি বাক্স সব box-room-এ নিয়ে গিয়ে জমা করে রাখবে।"

"কেন, তোরঙ্গেই আমার কাপড় থাকুক না?"

"না না। শয়নঘরে কি তোরঙ্গ পেটরা স্তূপাকার করে রাখা হয়? তাতে সৌন্দর্য-হানি হবে যে।"

ঈডিথ্ চাবি লইয়া চলিয়া গেল।

কোথায় নরেনের থাকা হইবে, সেই সম্বন্ধে কথা উঠিল। নরেন বলিল, "কলকাতায় যেমন ছাত্রদের মেস থাকে সে রকম এখানে কিছু নেই?"

"না।"

"তবে এখানে থাকবার কি রকম বন্দোবস্ত?"

চারু বলিল, "তিন রকম বন্দোবস্ত হতে পারে। এক তুমি কোনও পরিবারে থাকতে পার; কিন্তু ভদ্রপরিবারের মধ্যে থাকতে পাওয়ার সুযোগ দুর্লভ। তাঁরা নিজেদের বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে যথেষ্ট সুপারিশ না পেলে রাখেন না। তুমি তাঁদের স্ত্রী পুত্র কন্যার সঙ্গে ঠিক তাঁদের একজন হয়ে বাস করবে, তুমি যে ভাল লোক, তা তাঁরা না জানলে তোমায় রাখবেন কেন? কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে কেউ কেউ পরিবারে ঢুকতে চেষ্টা করেছে। ঢুকে দেখে তারা নিম্নশ্রেণীর লোক, দু'এক সপ্তাহ থেকে পালিয়ে আসে। দ্বিতীয়তঃ, তুমি কোন বোর্ডিং হাউসে থাকতে পার, কিন্তু সেখানে, অনেক সময় অবাঞ্ছনীয় লোকের সঙ্গে মিশতে বাধ্য হতে হয়। তৃতীয়তঃ, রুমসে থাকতে পার—এই আমি যেমন আছি। এই একটা ধর মস্ত বাড়ী রয়েছে, এর একজন ল্যান্ডলেডি আছে, সেই বাড়ীর কর্ত্রী। এই আমি একটা শয়নঘর, একটা বসবার ঘর নিয়ে আছি,—এমন আরও দু'চারজনে আছে—তাদের সঙ্গে আমার কোনই সম্বন্ধ নেই, তাদের আমি চিনিও না। আমার বসবার ঘরে ল্যান্ডলেডি আমার খাবার দিয়ে যায়। আমি হপ্তায় হপ্তায় ওকে পঁয়ত্রিশ শিলিং করে ফেলে দিয়ে খালাস।"

"এ তিন রকমে খরচের বিভিন্নতা কি?"

"তা বড় নেই। এই রকমই খরচ। তবে এর চেয়ে ভাল ষ্টাইলে থাকলে আরও পাঁচ সাত শিলিং বেশী লাগতে পারে। একটু কম ষ্টাইলে থাকলে দু পাঁচ শিলিং কমেও হতে পারে।"

"আপনি আমায় কোন্ রকম থাকতে উপদেশ দেন?"

"যদি ভদ্রপরিবারে স্থান পাও, তবে সেই খুব বাঞ্ছনীয়। আমি এই পাঁচ বৎসরের প্রায় তিন বৎসর ভিন্ন ভিন্ন পরিবারে বাস করে কাটিয়েছি। পরিবারে বাস না করলে, ওদের সামাজিক রীতি নীতি ভাল করে শিক্ষা করা যায় না। আমাদের মত ভারতবর্ষীয়-দের পক্ষে তার একটা মস্ত educative value আছে।"

"তবে দাদা অনুগ্রহ করে আমাকে কোনও ভদ্রপরিবারে স্থান করে দেবেন।"

চারু চেষ্টা করিতে স্বীকৃত হইল। আপাততঃ আগামী কল্য তাহাকে "ইনে" গিয়া ভর্ত্তি হইতে হইবে। চারু হিসাব করিয়া দেখিল, ভর্ত্তি হইবার টাকা অপেক্ষা নরেন পঞ্চাশ প্যাউন্ড অধিক আনিয়াছে। বলিল, "আচ্ছা, ঐ টাকা থেকে, গোটা দুই তিন সুট তৈরি করিয়ে নাও—বাকী টাকা ব্যাঙ্কে রেখে দিও এখন।"

নরেন্দ্র বলিল, "দাদা, কলকাতার এই সুটে যতদিন চলে চলুক না। মিথ্যে টাকা খরচ করে কি হবে?"

চারু বলিল, "সে ভাল কথা।"

রাত্রি দশটার পর, চারুকে 'শুভরাত্রি' ইচ্ছা করিয়া নরেন শয়ন করিতে গেল। গিয়া দেখিল, তাহার বাক্স তোরঙ্গ সমস্ত অন্তর্হিত। ওয়ার্ড-রোব খুলিয়া দেখিল, তাহার কামিজগুলি একস্থানে, সুটগুলি একস্থানে, রুমালগুলি একটা ছোট দেরাজে, অন্য একটাতে তাহার নেকটাইগুলি, আর একটাতে তাহার কলারগুলি—এইরূপ সুশৃঙ্খলায় সজ্জিত। আলোকের নিকট, কালো বনাতে সোণালি কাষ করা বস্ত্রে আচ্ছাদিত একটি টেবিল। তাহার উপর নরেনের রাইটিং কেশটি, চিঠির কাগজ, খামগুলি রক্ষিত।

ম্যাণ্টেল্-প্লেসের উপর দেখিল, তাহার স্ত্রীর ও অন্যান্য ফোটোগ্রাফগুলি সাজান, দুই পাশে দুইটি শুভ্র-"ভাজে" দুই গুচ্ছ শুভ্রবর্ণ নার্সিসস্ ফুল। বিছানার কাছে একটি টীপয়—তাহার উপর বাতিদানে একটি নূতন মোমবাতি। তাহার সিগারেটের বাক্সটি বাহির করিয়া সেখানে রাখা হইয়াছে। দস্তার উপর পিতলের কাযকরা একটি অ্যাশ্-ট্রে কোথা হইতে আনিয়া রাখিয়া গিয়াছে। তাহার চিরুণী, বুরুষ প্রভৃতি দ্রব্যগুলি ড্রেসিং টেবিলের উপর সজ্জিত।

নরেন দেখিয়া শুনিয়া, তখন সেই ছোট টেবিলের কাছে বসিয়া, স্ত্রীকে পত্র লিখিতে আরম্ভ করিল। সে প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছিল, প্রত্যহ রাত্রে শয়ন করিবার পূর্ব্বে স্ত্রীকে একখানি করিয়া পত্র লিখিবে. মেল্-ডে আসিলে সাতখানি চিঠি লেফাফায় ভরিয়া একত্র রওনা করিয়া দিবে।

চারু শুনিলে ভাবিত—"সেই নির্ম্মলার এত প্রতাপ!"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ছয় মাস অতীত হইয়া গিয়াছে। আবার আজ, কেন্‌সিংটনের সেই কক্ষটিতে বসিয়া চারু ভারতবর্ষীয় ডাক পাইল। এবার শনিবার প্রভাতে ডাক আসিয়াছে। প্রাতরাশের সঙ্গে চারু চিঠি পাইল।

তাহার বউদিদির পত্রখানি এইরূপঃ—

কলিকাতা

ভাই চারু,

তোমার পরীক্ষা নিকট হইয়া আসিতেছে। বোধ হয় অত্যন্ত ব্যস্ত আছ। শরীরের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পরিশ্রম করিও। তুমি নিজে ডাক্তার, তোমায় বলাই বাহুল্য।

একটা বড় মজা হইয়াছে জান? তোমার দাদাকে রাজি করিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন—"এখন আমরা গেলে চারুর পড়াশুনোর ব্যাঘাত হবে। তার পরীক্ষাটা হয়ে যাক, তখন যাওয়া যাবে।" দুই মাস পরে তোমার পরীক্ষা শেষ হইবে, আমরা দেড় মাস পরে যাত্রা করিব,—তাহা হইলে ঠিক তোমার পরীক্ষার পরে গিয়া পৌঁছিব।

নির্ম্মলা বেচারির বড় অসুখ। মাসখানেক হইতে ভুগিতেছে। আজ শুনিতেছি, অসুখ খুব বাড়িয়াছে। এ মেলে সে সংবাদ পাইয়া নরেন বেচারি বোধ হয় খুব চিন্তিত হইবে। আহা, তুমি যদি সময় পাও, তাহার সঙ্গে দেখা করিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিও।

বেশী বড় চিঠি লিখিলাম না। তোমার সময় নাই, পড়িবে কখন? এখন তবে আসি।

তোমার স্নেহের
বউদিদি

পত্রখানি শেষ করিয়া চারু ভাবিতে লাগিল। নরেনের সঙ্গে অনেক দিন দেখা হয় নাই। মাসখানেক পূর্ব্বে সে একবার টাকা ধার করিতে আসিয়াছিল,—তাহার পর হইতে আর কোনও সংবাদ পায় নাই।

নরেন এখন বেজ্‌ওয়াটারে রুম্‌সে থাকে। সেখানে মাস দুই তিন আছে। মিস ম্যানিংয়ের* সাহায্যে চারু তাহাকে প্রথমে একটি ভদ্রপরিবারে স্থান করিয়া দিয়াছিল। প্রথম সেখানে থাকিয়া নরেন খুব সন্তুষ্ট ছিল। ক্রমে যখন সে বেজ্‌ওয়াটারের দলে মিশিতে আরম্ভ করিল তখন একটু একটু করিয়া তাহার চক্ষু ফুটিতে লাগিল। সে দেখিল, তাহার যে সকল বন্ধুরা রুম্‌সে থাকে, তাহারা বেশ থাকে। তাহাদিগকে প্রত্যহ প্রভাতে ঠিক সাড়ে আটটার সময় পোষাক পরিয়া প্রস্তুত হইয়া প্রাতরাশে নামিয়া আসিতে হয় না। দশটা, এগারটা, যখন খুসী শয্যাত্যাগ করিয়া ল্যাণ্ডলেডিকে প্রাতরাশ আনিতে

হুকুম করিলেই হইল। রাত্রিবসনের উপর ড্রেসিং গাউন চড়াইয়া ব্রেকফাস্ট খাইয়া বেলা তিনটা চারিটার সময় পোষাক পরিতে আরম্ভ করিলেও কোন ক্ষতি হয় না। সন্ধ্যাবেলা যত ইচ্ছা বন্ধু লইয়া যেরূপ ইচ্ছা আড্ডা দেওয়া যাইতে পারে,—এবং অন্যত্র আড্ডা দিয়া যত রাত্রে খুসী ফিরিয়া আসিতে কোনও বিঘ্ন নাই। তাই নরেন চারি মাস কাল হ্যালাম্ পরিবারের মধ্যে বাস করিয়া, বেজ্ওয়াটারে আসিয়া রুম্স লইয়াছে।

অনেক বৎসর হইতে লণ্ডনে বেজ্ওয়াটার অংশটিই অধিকাংশ ভারতবর্ষীয় ছাত্রদের বাসের স্থান। বেজ্ওয়াটারে "আর্টেজিয়ান্" নামক একটি "পাবলিক-হাউস" বা পানালয় আছে। যদি কখনও ভারতবর্ষীয় ছাত্রেরা বেজ্ওয়াটার হইতে উঠিয়া অন্যত্র যায়, তবে ঐ "আর্টেজিয়ানের" স্বত্বাধিকারিগণকে দেউলিয়া হইতে হইবে। তবে সর্ব্বত্র যেমন 'সম্মানিত ব্যতিক্রম' থাকে, বেজ্ওয়াটারেও সেরূপ আছে। কর্ত্তব্য বোধে ইহা আমি এ স্থানে লিপিবদ্ধ করিলাম।

চারু সেদিন বৈকালে নরেনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল। টলবট্ রোডে যে বাড়ীতে নরেন থাকিত, তাহার সম্মুখে পৌঁছিয়া দেখিল, নরেনের দ্বিতলের বসিবার কক্ষটির জানালা অল্প খোলা রহিয়াছে,—এবং তাহার মধ্য হইতে পিয়ানো ও সঙ্গীতের শব্দ এবং হাসির গর্রা বাহির হইতেছে। গানের এই পদটি নরেনের কণ্ঠস্বরে শুনা গেল—

> There once was a black bird gay,
> A splendid fellow was he;

* সকলে অবগত না থাকিতে পারেন, মিস ম্যানিং ভারতবর্ষীয় ছাত্রগণের জননীস্বরূপা ছিলেন—তবে অনেক ছাত্র তাঁহার উপদেশ বা ভর্ৎসনার ভয়ে তাঁহার নিকট হইতে দূরে থাকিত। ভারতবর্ষীয় ছাত্রদের মঙ্গলার্থ এই বর্ষীয়সী মাননীয়া মহিলার যত্ন ও উদ্যম অসাধারণ ছিল। বিপদে আপদে তাঁহার শরণাপন্ন হইলেই তিনি উদ্ধার করিয়া দিতেন। ভারতবর্ষীয় ছাত্রগণের দুর্ভাগ্যবশতঃ এই মহিলা এখন পরলোকে।—লেখক।

> And thought he went out every day
> He always came home to tea,—
> To tea—to tea—to tea.

—সঙ্গে সঙ্গে খুব একটা হাসির ফোয়ারাও ছুটিল।

চারু দাঁড়াইয়া একটু চিন্তা করিল। পত্নীর পীড়ার জন্য নরেনের মনে যে বিশেষ একটা দুশ্চিন্তার আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা তাহার ঠিক ধারণা হইল না। একবার ভাবিল ফিরিয়া যাই। আবার কি ভাবিয়া দরজায় আঘাত করিল।

সে কক্ষে চারু যখন প্রবেশ করিল, তখন শুধু পিয়ানো চলিতেছে, গান বন্ধ হইয়াছে। তাহাকে দেখিয়াই নরেন পিয়ানো ছাড়িয়া উঠিয়া বলিল—"Hello—Hello—here's a black-bird come, to tea. How d'ye do birdie ?"

পাইপ মুখে, হুইস্কির গ্লাস পার্শ্বে—সেন, বসু, ব্যানার্জি প্রভৃতি আরও চারি পাঁচ-জন লোক বসিয়া ছিল, তাহারা সকলেই বলিয়া উঠিল—"Hello Chow—hellow."

একজন বলিল, "Black-bird-কে একটু হুইস্কি দাও—চায়ে উহার গলা শানাইবে না।"

নরেন চারুর পানে চাহিয়া বলিল, "Have a drop old chap ?"

চারু এই প্রথম দেখিল, নরেন হুইস্কি পান করিতেছে। বলিল, "না—ধন্যবাদ।"

একজন বলিল—"Is he a damned T—T ?"

নরেন বলিল, "Give the devil his due—he isn't *that*.—Do have a 'wee little drappie', as the Scotch say—just to keep us company, Chow."

চারু বলিল, "না,—ধন্যবাদ। আমি ডিনারের পূর্ব্বে পান করি না।"

একজন বলিল, "What a good little boy!"

অপর একজন বলিল, "Are you married?"

নরেন বলিল, "Heaven forbid."

সেন বলিল, "Then why the devil are you so 'tic'l'r?"

ব্যানার্জ্জি বলিল, "His mamma will be cross."

একজন গান ধরিল— He is his mammie's ae bairn,
With unco folk weary, sir.

খুব একটা হাসি পড়িয়া গেল।

এইরূপ কিছুক্ষণ চলিলে পর একজন উঠিয়া বলিল, "I must be off, boys."

একজন বলিল, "Why in such a darned hurry?"

ব্যানার্জ্জি বলিল, "Perhaps he's got an appointment to meet his girl."

পাইপ মুখে, বসু অস্পষ্টস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "Which of 'em?"

দস্তানা পরিতে পরিতে গমনোন্মুখ ব্যক্তি বলিল, "Oh shut up. I'am not like you fellows. One at a time is my motto."

সকলে হাহা করিয়া হাসিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে একে একে সকলেই উঠিয়া গেল। তখন চারু ও নরেন কেবল একাকী রহিল। বাঙ্গালায় কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল।

চারু জিজ্ঞাসা করিল, "বাড়ীর খবর পেলে?"

নরেন বলিল, "এখনই?"

"কেন, এবার Caledonia জাহাজে ডাক এসেছে, জান না?"

"Caledonia-তে নাকি? তবে এবার শীগ্‌গির পাওয়া যাবে। আজ রাত্রে কিম্বা কাল শনিবার সকালে চিঠি পাওয়া যেতে পারে।"

চারু বলিল, "কাল শনিবার সকালে? কেন, আজ কি তুমি শুক্রবার বলে মনে করছ নাকি?"

নরেন বলিল, "কেন, আজই ত শুক্রবার। আমি ঐ দেশের চিঠি লিখতে আরম্ভ করেছিলাম—ওরা এল—এখনই শেষ করে ছটার মধ্যে ডাকে পাঠাব।"

মনের বিরক্তি মনে চাপিয়া চারু বলিল, "আজ শুক্রবার নয়, আজ শনিবার। আজ সকালে আমি দেশের চিঠি পেয়েছি।"—এই বলিয়া উঠিয়া, কিয়দ্দূরে সোফার উপর হইতে অপঠিত দৈনিক সংবাদপত্রখানি আনিয়া সেদিনকার বার ও তারিখ দেখাইয়া দিল।

নরেন বলিল, "তবে এবার মেল মিস্ করলাম!"

চারু নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। নরেন বলিল, "আমার চিঠিগুলো বোধ হয় হ্যালাম্‌দের ওখানে এসে পড়ে আছে। তাঁরা রিডাইরেক্ট করে দেবেন, সন্ধ্যাবেলা পাব বোধ হয়।"

চারুর মনে পড়িল, নরেন প্রথম প্রথম যখন হ্যালাম্‌দের বাড়ী গিয়াছিল, কয়েক সপ্তাহ যখন তাহারই কেয়ারে নরেনের চিঠিপত্র আসিত,—নরেন সংবাদপত্র দেখিয়া ডাক পৌঁছিবার সময় ঘণ্টা হিসাব করিয়া, চারুর কাছে আসিয়া চিঠির জন্য ধরণা দিয়া বসিয়া থাকিত। তখনকার দিনে, প্রতি মেল-ডে আসিলে, সাতখানি করিয়া চিঠি তাহার স্ত্রীকে পাঠাইবার কথাও মনে পড়িল।

কিন্তু চারু কিছুই বলিল না। কি অধিকারে সে তাহাকে তিরস্কার করিবে? নরেন তাহার আত্মীয় নহে, বিশেষ বন্ধুত্বও তাহার সহিত জন্মে নাই। কি অধিকারে সে তাহার ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিবে?

কিয়ৎক্ষণ পরে চারু উঠিল।

নরেন অনেকক্ষণ নির্ব্বাক ছিল। এইবার বলিল, "চৌধুরী—আমার একটা কথা রাখতে

হবে।"

"কি?"

"এ সব কথা বাড়ীতে লিখ না কাউকে।"

"কি সব কথা?"

"এই হুইস্কি-টুইস্কির কথা।"

চারু একটু শ্লেষ করিয়া বলিল, "কেন, তাতে আর দোষ কি? আমিও ত হুইস্কি খাই—আমার বাড়ীর সকলেই জানেন।"

নরেন বলিল, "ও সব কথা ছেড়ে দাও। তুমি ভারি রাগ করেছ। For Heaven's sake চো, আমায় মাফ্ কর।"

চারু এবার তাহার সুযোগ বুঝিল। বলিল, "বাড়ীতে লিখব না এ প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে তুমি আমায় একটি প্রতিশ্রুতি দিতে পার?"

"কি বল?"

"বেজ্ওয়াটার ছাড়, দলটি ছাড়, আবার হ্যালাম্দের ওখানে যাও।"

"আচ্ছা—তা ছাড়ব।"

"এখনই। এই সপ্তাহে ল্যান্ডলেডিকে নোটিস দাও।"

নরেন বলিল, "Damn it—ল্যান্ডলেডির কাছে যে আট দশ পাউন্ড বাকী পড়ে গেছে—সে শোধ করে ত নোটিস দেব!"

"কেন, তোমার সে ব্যাঙ্কের পঞ্চাশ পাউন্ড কোথা গেল?"

"Bless my soul—সে অনেক দিন গেছে।"

চারু কিয়ৎক্ষণ পরে বলিল, "আচ্ছা, তুমি নোটিস দাও। আমি তোমায় দশ পাউন্ড ধার দেব।"

চারুর সঙ্গে সঙ্গে নরেন নীচে অবধি নামিয়া আসিল। দরজার বাহিরে গিয়া বলিল, "লিখবে না ত চো?"

"না।"

"Honour bright?"

"Honour bright"—বলিয়া চারু নরেনের করমর্দ্দন করিয়া প্রস্থান করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নরেন হ্যালাম্দের ওখানে গেল বটে, কিন্তু পূর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পারিল না। বাঁধাবাঁধি নিয়মের মধ্যে বাস করিতে তাহার বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। কিন্তু চারুর ভয়ে বেজ্ওয়াটারে ফিরিয়া রুম্স্ লইতেও সাহস করিল না।

একদিন মিসেস্ হ্যালাম্‌কে সে বলিল, "আজ কয়েকটি বন্ধুর সঙ্গে থিয়েটারে যাইবার বন্দোবস্ত আছে, আজ ফিরিতে একটু দেরী হইবে!"

মিসেস্ হ্যালাম্ বলিলেন, "আচ্ছা বেশ, আমি দুয়ারে চাবি দিব না। হলে মোমবাতি জ্বালাইয়া রাখিব।"

এখানে বিলাতী দুয়ারের সম্বন্ধে একটু টীকা আবশ্যক। সেখানে সদর দরজা সর্ব্বদা বন্ধ থাকে। দরজায় দুইটি করিয়া চাবিকল থাকে। একটি কল খুলিতে হইলে, ভিতর হইতে হাতে টানিয়া খোলা যায়, কিন্তু বাহির হইতে খুলিতে হইলে চাবি ভিন্ন তাহা খুলে না। বাড়ীর প্রত্যেক বয়ঃপ্রাপ্ত লোকের কাছে একটি করিয়া সেই চাবি থাকে। তাহার নাম 'ল্যাচ্-কী'! তুমি বাড়ীর লোক, বেড়াইয়া আসিলে, তোমার পকেটে যদি 'ল্যাচ্-কী' থাকে, তাহার দ্বারা তুমি কল খুলিয়া, দুয়ার খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে পার। যদি 'ল্যাচ্-কী' না লইয়া গিয়া থাক, তবে তোমায় 'নক্' করিতে হইবে, কিম্বা বৈদ্যুতিক ঘণ্টার বোতামটি টিপিতে হইবে, দাসী আসিয়া দরজা খুলিয়া

দিবে। দ্বিতীয় যে আর একটি চাবিকল আছে, তাহা কেবলমাত্র ভিতরদিকের কল, বাহির হইতে তাহা খুলিবার উপায় নাই। এ কলটি সমস্ত দিন খোলা থাকে, গৃহস্থ শয়ন করিতে যাইবার সময় ইহা বন্ধ করিয়া দেয়। সেটি বন্ধ থাকিলে, তুমি রাত্রে ফিরিয়া আর 'ল্যাচ্-কী'র সাহায্যে দুয়ার খুলিতে পারিবে না।

নরেন সন্ধ্যার সময় বাহির হইয়া গেল। লণ্ডনের সমস্ত থিয়েটর যদিও রাত্রি সাড়ে এগারোটার মধ্যেই বন্ধ হইয়া যায়, তথাপি নরেনের ফিরিতে দুইটা বাজিয়া গেল। হলে প্রবেশ করিয়া, মোমবাতিটির পানে সে একটু বিরক্তির সহিত চাহিয়া রহিল।

বিলাতী গৃহস্থালীর বন্দোবস্তে এই মোমবাতিটি ভয়ানক জিনিষ। যদি কেহ বাহিরে থাকে, সে কখন ফিরিয়াছে, মোমবাতিটি তাহার মূক সাক্ষী। পরদিন প্রভাতে সেই মোমবাতিটি কতখানি পুড়িয়াছে দেখিয়া গৃহিণী হিসাব করিয়া লইতে পারেন, তুমি কাল কত রাত্রে গৃহে ফিরিয়াছিলে। সেই মোমবাতিটা সরাইয়া, হিসাব করিয়া অপর একটা সেখানে বসাইয়া মিথ্যাসাক্ষীর সৃষ্টি করা যাইতে পারে বটে—কিন্তু ধরা পড়িবার ভয় আছে। দুয়ার খুলিবার শব্দটুকু, সিঁড়ি বাহিয়া তোমার শয্যাকক্ষে যাওয়ার শব্দটুকু গৃহিণীকে জাগাইতে পারে। পরদিন তোমার মিথ্যাসাক্ষী ধরা পড়িয়া যাইবে। সে দেশে যে যতই বদমায়েস হউক, মিথ্যাবাদী বা sneak বলিয়া সহজে ধরা পড়িতে কেহ চাহে না।

অত রাত্রে ফিরিবার সঙ্গত কারণাভাব—নরেন মনে করিল, পরদিন বোধ হয় হ্যালাম্ পরিবারের মুখে অপ্রসন্নতার চিহ্ন দেখিতে পাইবে। কিন্তু প্রাতরাশের সময় কাহারও, বিশেষতঃ মিসেস হ্যালামের মুখে সেরূপ কোনও চিহ্ন দেখিতে পাইল না। মিসেস হ্যালাম অন্যান্য দিনেও যেমন তাহার সঙ্গে—এবং সকলেরই সঙ্গে—হাস্যকৌতুকের ভাবে ব্যবহার করেন, আজও তাহাই করিলেন। সন্ধ্যাবেলা ডিনারের পর সে সকলের সঙ্গে ড্রয়িংরুমে সারা সন্ধ্যা গীতবাদ্য ও আমোদ আলাপে কাটাইল, তখনও মিসেস হ্যালাম পূর্ব্ববৎ। ক্রমে রাত্রি সাড়ে দশটা বাজিল। একে একে সকলে শয়ন করিতে গেল। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে নরেন একাকী হইল, সেই মুহূর্ত্তেই তাহার প্রতি মিসেস হ্যালামের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

নরেন অগ্রসর হইয়া, নত হইয়া বলিল, "শুভরাত্রি, মিসেস হ্যালাম।"

মিসেস হ্যালাম একটু রুক্ষস্বরে বলিলেন, "শুভরাত্রি। তোমার বোধ হয় খুব ঘুম পাইয়াছে মিষ্টার ঘোষ। গতরাত্রে বেশী ঘুমাইবার অবসর তুমি ত পাও নাই।"

শয়নকক্ষে গিয়া, নরেন এই নীরব ভর্ৎসনাটি হাড়ে হাড়ে অনুভব করিতে লাগিল। মনে মনে তাহার অনুশোচনা উপস্থিত হইল। স্থির করিল, আর না এবার অবধি জীবনের গতি অন্য পথে ফিরাইবে, পূর্ব্বের মত স্ত্রীকে প্রত্যহ একখানি পত্র লিখিবে, খরচপত্র বুঝিয়া-সুঝিয়া করিবে,—ভাল হইবে।

সপ্তাহখানেক ভাল হইয়া রহিল। টেম্প্‌লে আইনের লেকচার শুনিতে যাইতে লাগিল, লাইব্রেরিতে গিয়া পড়িতে লাগিল, ডিনারের পর ড্রয়িংরুমেই থাকিত। কিন্তু এক সপ্তাহেই তাহার ক্লান্তি বোধ হইল। আমোদের নেশা আবার তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল। আবার সেই দলের ঘূর্ণাবর্ত্তে গিয়া পড়িল—নিজেকে সামলাইতে পারিল না।

একদিন—সেদিন শুক্রবার—প্রাতরাশের পর টেম্প্‌লে যাইবার সময় মিসেস হ্যালামকে বলিল, "আজ আমি টেম্প্‌লেই ডিনার খাইব। পরে আর্লস্‌কোর্ট এগ্‌জিবিশন দেখিতে যাইবার ইচ্ছা আছে।"

মিসেস হ্যালাম বলিলেন, "বেশ। ট্রেণে ফিরিবে কি? না ক্যাব্ লইয়া আসিবে?"

নরেন বলিল, "না, ট্রেণেই ফিরিব। পাঁচ পেনির স্থানে আড়াই শিলিং খরচ করিব কেন?"

মিসেস হ্যালাম বলিলেন, "আচ্ছা, তোমায় টাইম্ টেবেল দেখিয়া বলিয়া দিতেছি শেষ ট্রেণ কখন।" বলিয়া মিসেস হ্যালাম টাইম টেবেল আনিয়া উল্টাইয়া দেখিতে লাগিলেন। বলিলেন, "এ দিকের শেষ ট্রেণ ১১টা ৩৭ মিনিটে ছাড়িবে, ১২টা ৫ মিনিটে এখানে

পৌঁছিবে।"

নরেন তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া, সময়টা টুকিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

টেম্পলে যখন ডিনার শেষ হইল, তখন সন্ধ্যা সাতটা। অপর দুইজন যুবকের সহিত সে টেম্পল ষ্টেশন হইতে আর্লস্‌কোর্ট যাত্রা করিল।

প্রতি বৎসরের মধ্যে ছয় সাত মাস ধরিয়া আর্লস্‌কোর্টে স্থায়ীভাবে এগ্‌জিবিশন হইয়া থাকে। ইহা কৃষি বা শিল্প বা পশ্বাদির এগ্‌জিবিশন নহে। ইহা প্রধানতঃ আমোদের এগ্‌জিবিশন। প্রতিদিন বেলা ১১টা হইতে রাত্রি সাড়ে এগারটা অবধি খোলা থাকে। রাত্রেই জমক বেশী। তখন সহস্র সহস্র বিদ্যুৎ-আলোক জ্বলিয়া উঠে। লণ্ডনের সর্ব্বস্থান হইতে রেলগাড়ী সহস্র সহস্র নর-নারী বোঝাই করিয়া আনিয়া এই আমোদের সমুদ্রে নিক্ষেপ করে। ধনী আসে, দরিদ্র আসে, পণ্ডিত আসে, মূর্খ আসে, সাধু আসে, অসাধু আসে, পাদ্রী আসে, নাস্তিকও আসে। যাহার যেরূপ রুচি, যাহার যেরূপ প্রবৃত্তি, সে সেইরূপ আমোদ বাছিয়া লইতে পারে।

নরেনের সাথী দুইটির নাম রায় এবং চাটার্জ্জি। ইহারা পৌঁছিয়া নানা আমোদে যোগ দিয়া বেড়াইতে লাগিল। পানশালায় প্রবেশ করিয়া মধ্যে মধ্যে তৃষ্ণানিবারণও চলিতেছে। ক্রমে রাত্রি দশটা বাজিল।

একস্থানে একটা বৃহৎ কৃত্রিম "লেক" আছে, তাহার তট বেষ্টন করিয়া শ্বেত, পীত, নীল, লোহিত অসংখ্য অসংখ্য বিদ্যুৎ-আলোক জ্বলিতেছে। সেই আলোকচ্ছটা জলে পড়িয়া জল ঝল্‌মলায়মান। লেকের একপ্রান্তে water-chute-এর তীব্র আমোদ চলিতেছে। তীর হইতে অনেকটা উচ্চ করিয়া একটা বেদী নির্ম্মিত আছে। সেই বেদীর উপরিভাগ হইতে জল পর্য্যন্ত ঢালুভাবে গাঁথা। সেই ঢালুস্থানের উপর দুই সেট্‌ রেল পাতা আছে। চক্রযুক্ত বোটে মানুষ বসাইয়া বেদী হইতে সেই রেলের উপর ছাড়িয়া দিতেছে। বোট নামিতে নামিতে প্রতি মুহূর্ত্তে গতিবল সংগ্রহ করিয়া প্রচণ্ডবেগে জলের উপর আসিয়া পড়িতেছে। বোট জল স্পর্শ করিয়া প্রথম কয়েক মুহূর্ত্ত জলের উপর দিয়া বায়ুর উপর দিয়া নাচিয়া নাচিয়া তীরবৎ বেগে অনেক দূরে গিয়া পড়িতেছে—তাহার পর আরও অনেকদূর জলের উপর দিয়া ছুটিয়া যাইতেছে। গতিবেগ প্রশমিত হইলে বোটকে তীরে লাগাইয়া লোক নামাইয়া দিতেছে। আবার সেই বোট কলের সাহায্যে বেদীর উপর উঠিতেছে—আবার লোক বোঝাই হইয়া নামিতেছে। এইরূপ বহুসংখ্যক বোট। এক মিনিট অন্তর একখানা করিয়া নামিতেছে এবং আরোহী স্ত্রীলোকগণের ভয়োল্লাসমিশ্রিত তীব্র চীৎকারে নৈশবায়ু যেন শাণিত তরবারি দ্বারা মুহুর্মুহু খণ্ড-বিখণ্ড হইতেছে।

যুবকত্রয় water-chute অভিমুখে অগ্রসর হইল। কিয়দ্দূরে কয়েকটা যুবতী, লেকের রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া হাস্য পরিহাস করিতেছিল। রায় বলিল, "Let's pick up some of these girls."

চাটার্জ্জি বলিল, "Let's. একা একা ওয়াটার-শুটে কোনও fun নেই। Let's go and speak to them."

নরেন বলিল, "নন্‌সেন্স। উহারা যদি ভাল মেয়ে হয়?"

রায় বলিল, "Oh, they are game. ওদের পোষাক দেখছ না?"

নরেন বলিল "না-না।"

"Just for a lark"—বলিয়া চাটার্জ্জি তাহাদের নিকট গিয়া হ্যাট্‌ উত্তোলন করিয়া বলিল, "Good evening."

"Good evening. How d'ye do?"—বলিয়া তাহারা হাসিয়া এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িতে লাগিল।

রায় বলিল, "Been on the water-chute?"

তাহাদের মধ্যে একজন বলিল, "Not this evening."

"Come along then"—বলিয়া রায় ও চাটার্জ্জি দুইটা যুবতীকে আহ্বান করিল। নরেন হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

চাটার্জ্জি নরেনের পিঠ চাপড়াইয়া তাহাদিগকে বলিল, "Won't one of you girls come with my shy little friend?"

একজন অল্পবয়স্কা অগ্রসর হইয়া বলিল, "I'll have him"—বলিয়া সে নরেনের কাছে আসিল। "Trot along, my beauty"—বলিয়া নরেনকে টানিয়া লইল।

রায় ও চাটার্জ্জি নিজ নিজ সঙ্গিনীর বাহুর সহিত বাহু সম্বন্ধ করিয়া চলিয়াছে। পশ্চাতে নরেন, তাহার সঙ্গিনীর পার্শ্বে পার্শ্বে চলিয়াছে মাত্র।

এক এক শিলিং দিয়া টিকিট কিনিয়া সকলে ভিতরে প্রবেশ করিল। ইহাদের সম্মুখে বিস্তর লোক। পুলিস দুই দুই করিয়া ভীড়কে সারিবন্ধ করিয়া দিতেছে। উপর হইতে যেমন একখানি করিয়া বোট নামিতেছে, সম্মুখ খালি হইতেছে, অমনই পশ্চাতের লোক একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইতেছে। নরেন ও তাহার সঙ্গিনী, দলের অপর যুগলদ্বয়ের পশ্চাতে পড়িয়াছিল। যে বোটে নরেনের উঠিবার পালা আসিল, তাহার সঙ্গীরা তাহার দুই বোট পূর্ব্বে নামিয়া গিয়াছে।

বোট লম্বা ধরণের, তাহাতে অনেক সারি। প্রত্যেক সারিতে দুই-দুই জনের বসিবার স্থান। ইহারা দুইজনে বোটে উঠিল। এখনই বোট নামিবে।

নরেনের সঙ্গিনী বলিল, "আমার বড় ভয় করিতেছে। আমার বাহু তোমার বাহুতে বদ্ধ করিয়া লও।"—নরেন তাহাই করিল।

'Sit tight'—বলিয়া বোট নামাইয়া দিল।

কয়েক মিনিট পরে ইহারা যখন তীরে অবতরণ করিল, তখন দলের বন্ধুরা হারাইয়া গিয়াছে। নরেন একটু খুঁজিল। তাহার সঙ্গিনী বলিল, "তাহাদের জন্য কি ভারি কাতর হইয়াছ?"

নরেন বলিল, "না।" "আমিও না।"

তখন দুইজনে বাহুসম্বন্ধভাবে ভীড় ছাড়িয়া চলিল।

নরেন জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি?"

"ক্লারা ব্রুকস্।"

ক্লারা বলিল, "দেখ, ওয়াটার-শুট আমার মোটেই সহ্য হয় না। আমি ভারি নার্ভস্। আমার বুক দুড় দুড় করিতেছে।"

"তবে আসিলে কেন?"

আরক্তিম ওষ্ঠ দুখানি ফুলাইয়া, কাঁদকাঁদ স্বরে ক্লারা বলিল, "Oh how cruel of you! তোমারই সঙ্গলাভের জন্য।"

নরেন দেখিল, বাস্তবিকই তাহার গা কাঁপিতেছে। বলিল, "চল গিয়া কিছু পান করা যাউক। তাহা হইলে তুমি সুস্থ হইবে।"

"চল।"

দুইজনে তখন কথা কহিতে কহিতে, একটি উচ্চশ্রেণীর পানশালার অভিমুখে অগ্রসর হইল। এ পানশালাটি একটি খোলা হলের মত, তাহার ভিতর বহুসংখ্যক ছোট ছোট টেবিলের কাছে বসিয়া অনেক নর-নারী পান করিতেছে। সম্মুখে খানিকটা স্থান খোলা, —একটু বাগানের মত। সেখানে আকাশের নিম্নে এখানে ওখানে অনেকগুলি ক্ষুদ্র গোলাকার মার্ব্বলমণ্ডিত টেবিল পাতা। ক্লারা ও নরেন একটু নিভৃতে, অন্ধালোক অন্বেষণ করিয়া বসিল। ওয়েটার আসিয়া হুকুমের প্রত্যাশায় দাঁড়াইয়া রহিল।

নরেন বলিল, "কি হুকুম করিব?"

"ব্র্যাণ্ডি ও সোডা।"

নরেন দুই গ্লাস ব্র্যাণ্ডি আনিতে আদেশ করিল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে ওয়েটার

রৌপ্যনির্ম্মিত ট্রের উপর দুই প্লাস ব্র্যাণ্ডি এবং বিলখানি হাজির করিল। নরেন মূল্য দিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া দিল।

দুইজনে পান করিতে করিতে অনেক গল্প করিতে লাগিল। মেয়েটি কৃশাঙ্গী—দেখিলে বড় দুর্ব্বল বলিয়া মনে হয়। তাহার সোনালী রঙের চুলগুলি গুচ্ছে গুচ্ছে পড়িয়া কপালটির কিয়দংশ ঢাকিয়াছে। মদিরার আপ্নের মোহ নরেনের মস্তিষ্কে যত প্রবেশ করিতে লাগিল, ততই তাহার সঙ্গিনীর নীল চক্ষু দুইটি তাহার কাছে সুন্দরতর মনে হইতে লাগিল। তাহার গ্রীবাভঙ্গি, তাহার কণ্ঠস্বর যেন বড় মিষ্ট লাগিতে লাগিল।

দুইজনেরই পানপাত্র নিঃশেষিত। নরেন বলিল, "আর এক প্লাস করিয়া হুকুম করিব?"

ক্লারা বলিল, "আমি আর চাহি না। আমি এক প্লাসের বেশী stand করিতে পারি না। আর তুমি?"

নরেন বলিল, "দেখি হিসাব করিয়া। টেম্প্‌লে ডিনারে বোধ হয় তিন প্লাস শ্যাম্পেন খাইয়াছি। এখানে আসিয়া কয় প্লাস হুইস্কি খাইয়াছি ঠিক মনে নাই।"—বলিয়া নরেন ওয়েটারকে ডাকিয়া নিজের জন্য আর এক প্লাস ব্র্যাণ্ডি আনিতে হুকুম করিল।

সে প্লাস যখন অর্দ্ধমাত্র শেষ হইয়াছে,—তখন কিয়দ্দূরে একব্যক্তি হাঁকিয়া গেল—"Half past eleven, ladies and gentlemen, closing time."

নরেন ঘড়ি খুলিয়া দেখিল, তিন মিনিট মাত্র বাকি আছে।

প্লাস ফেলিয়া, ক্লারাকে লইয়া, ফটকের দিকে অগ্রসর হইল। বাহির হইয়া ভীড় অতিক্রম করিলে ক্লারা তাহাকে বলিল, "What a pity you couldn't finish your drink. My rooms are quite close by—and I've got such a nice bottle of brandy. Won't you look in and have a drop?"

নরেন বলিল, "না—ধন্যবাদ, আমায় শেষ ট্রেণে ঘরে ফিরিতে হইবে।"

ক্লারা তথাপি বলিল, "What an awful baby you are! Will mamma be cross if you stay out late? Come along, you silly dear!"

নরেনের মস্তিষ্কে শয়তানের তাণ্ডব নৃত্য চলিতেছে—তবু সে নিজেকে সম্বরণ করিয়া বলিল, "এখনই আমায় যাইতে হইবে। আজ আমায় ক্ষমা কর ক্লারা।"—বলিয়া তাহার হস্তে একটি হাফ ক্রাউন গুঁজিয়া দিল।

ক্লারা বলিল, "কাল তবে এগজিবিশনে আসিবে?"

"আসিব।"

"আজ যেখানে দেখা হইয়াছিল, কাল ঠিক সেখানে রাত্রি ৯টার সময় আসিবে?"

"আসিব।"

নিজ হস্ত প্রসারণ করিয়া ক্লারা বলিল, "Good night—Pleasant dreams."

"Then I must dream of you, Clara, Good night."—বলিয়া নরেন ট্রেণ ধরিতে গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া নরেন দেখিল তাহার নামীয় কয়েকখানা পত্র রহিয়াছে। তখন তাহার নেশা খুব প্রবল। সেগুলিকে পাঠ করিবার অবস্থা তখন তাহার নহে। চিঠিগুলি পকেটে ফেলিয়া, দরজায় চাবি দিয়া মোমবাতিটি লইয়া সে সাবধানে শয়ন করিতে গেল।

শয়ন করিয়া যতক্ষণ জাগিয়া রহিল, ক্লারার মুখ কেবলই তাহার মনে পড়িতে লাগিল। সত্বর বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছে বলিয়া এক একবার আপশোষও হইতে লাগিল। ভাবিল, কাল আবার নিশ্চয় যাইবে—নিশ্চয়—নিশ্চয়।

পরদিন প্রভাতে নরেন জাগিয়া দেখিল, তাহার শরীর বড় অসুস্থ, শয্যাত্যাগ করি-

বার শক্তি নাই। দাসী বাহিরে মুখ ধুইবার গরম জল রাখিয়া "নক্" করিয়া গেল, তাহা শুনিয়া আবার নরেন ঘুমাইয়া পড়িল। ক্রমে সাড়ে ৮টার সময় প্রাতরাশের ঘণ্টা পড়িলে আবার সে জাগিয়া উঠিল, কিন্তু উঠিবার ক্ষমতা নাই।

কিয়ৎক্ষণ পরে দাসী আসিয়া বাহির হইতে বলিল, "Please Mr. Ghose, মিসেস হ্যালাম জিজ্ঞাসা করিতে পাঠাইলেন, আপনি কি প্রাতরাশে নামিবেন না?"

নরেন ক্ষীণস্বরে বলিল, "নেলি, তাঁহাকে বল গিয়া, আমার দেহ অসুস্থ। যেন দয়া করিয়া এক পেয়ালা চা এবং কিঞ্চিৎ প্রাতরাশ আমায় পাঠাইয়া দেন।"

কয়েক মিনিট পরে দাসী আবার আসিয়া বাহির হইতে বলিল, "আপনার অসুখ শুনিয়া মিসেস হ্যালাম দুঃখিত হইয়াছেন। আপনার প্রাতরাশ আমি এই বাহিরে রাখিয়া চলিলাম।"

দাসী নামিয়া গেল। কোনও ক্রমে নরেন উঠিয়া, দুয়ার খুলিয়া প্রাতরাশের ট্রে টানিয়া লইল। বিছানার কাছে টীপয়ের উপর তাহা রাখিল। কিছু খাদ্য এবং গরম চা-টার সাহায্যে নরেন কিছু সুস্থবোধ করিতে লাগিল।

সাড়ে নয়টার সময় দুয়ারে আবার টোকা পড়িল, "May I come in, Ghose?" —বৃদ্ধ মিষ্টার হ্যালামের কণ্ঠস্বর। "Come in."

মিষ্টার হ্যালাম প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "তোমার নাকি অসুখ করিয়াছে? কি অসুখ?"

"Very kind of you to come and enquire, Mr. Hallam. এমন কিছু অসুখ নাই। একটু run down মত অনুভব করিতেছি।"

অসুখটা যে কি, মিষ্টার হ্যালামের বুঝিতে বাকী রহিল না। তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, "Gay young dog! I can see what you have been up to." —পরে একটু গম্ভীরভাবে বলিলেন. "Bad, very bad."

বৃদ্ধ কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন; শেষে বলিলেন, "ঘুমাও।"—বলিয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া চলিয়া গেলেন।

নরেন আবার ঘুমাইয়া পড়িল। বেলা বারটার সময় ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখিল, তখনও দেহ অত্যন্ত দুর্ব্বল, কিন্তু মস্তিষ্ক অনেকটা পরিষ্কার হইয়াছে।

একে একে তাহার গত রাত্রের ঘটনাগুলি মনে পড়িল। মনে পড়িয়া শরীর যেন শিহরিয়া উঠিল। ভাবিল—"কি করিতে বসিয়াছিলাম! আমি ত চূড়ান্ত অধঃপতনের সীমারেখা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি!"—লণ্ডনে যে দিন পৌঁছিয়াছিল, সেই দিন হইতে অদ্যাবধি সমস্ত ঘটনা, নিজের সমস্ত কার্য্যকলাপ, একে একে মনে মনে পর্য্যালোচনা করিতে লাগিল। তাহার হৃদয়, অনুশোচনার বৃশ্চিকদংশনে যেন জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল। নিজের ভূতজীবনের কথা স্মরণ করিতে করিতে সহসা নির্ম্মলার মুখখানি মনে পড়িল। বিদায়ের দিনের তাহার সেই অশ্রুসিক্ত কোমল মুখখানি। সেই বিদায়ের ক্ষণে যদি কোনও দেবতা তাহাকে তাহার ভবিষ্যজীবনের এই দৃশ্যগুলি দেখাই দিত, তবে সে বিলাতে আসিতই না। নিজের উপর তখন তাহার কি অগাধ বিশ্বা ছল! সে বিশ্বাস চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আজ এখনও নিজের দুর্ব্বলতা, অপদার্থতা স্মরণ করিয়া তাহার মরিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। বিছানায় মুখ লুকাইয়া নরেন অনেকক্ষণ ধরিয়া অশ্রু-বিসর্জ্জন করিল। নির্ম্মলাকে ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ গত রাত্রের সেই পত্রগুলির কথা স্মরণ হইল। সে ত ভারতবর্ষীয় ডাক। উঠিয়া কোটের পকেট হইতে পত্রগুলি বাহির করিয়া আনিল। কই, এবার ত নির্ম্মলার পত্র নাই। তাহার শ্বশুরবাড়ীর কাহারও পত্র নাই। একি হইল? তবে নির্ম্মলার পীড়া কি বৃদ্ধি হইয়াছে—তাই নির্ম্মলা পত্র লিখিতে পারে নাই? নির্ম্মলা আজ দুই মাস পীড়িত, কিন্তু চিঠি ত কোনও মেলেই বন্ধ যায় নাই। যেমন করিয়া হউক অন্ততঃ দুই এক লাইনও সে লিখিয়া দিয়াছে। তবে

কি নির্ম্মলা বাঁচিয়া নাই? নিজের প্রতি ধিক্কারে মনে হইল,—"যদি তাহা হয়, তবেই আমার উপযুক্ত শাস্তি হয়!" আবার বিছানায় মুখ লুকাইয়া নরেন অশ্রুপাত করিল। কিন্তু তাহার অন্তরাত্মা, কিছুতেই নির্ম্মলার মৃত্যু-কল্পনা করিতে চাহিল না। সে আশা করিতে লাগিল, চিঠির গোল হইয়া থাকিবে, আগামী মেলে নির্ম্মলার দুইখানি চিঠি আসিয়া পোঁছিবে। ক্রমে দুর্ব্বলতাবশতঃ তাহার চিন্তা করিবার শক্তিও বিলুপ্ত হইল। আবার সে ঘুমাইয়া পড়িল।

ঘণ্টাখানেক পরে ঘুম ভাঙিয়া শুনিল—দাসী দুয়ারে ধাক্কা দিতেছে।—"মহাশয়, আপনার জন্য একখানি টেলিগ্রাম আসিয়াছে।"

নরেন বলিল, "নেলি, দুয়ার একটু ফাঁক করিয়া ভিতরে ফেলিয়া দাও।"—দাসী তাহাই করিয়া চলিয়া গেল।

নরেন টেলিগ্রাম খুলিয়া দেখিল, চারুর নিকট হইতে আসিয়াছে। সে জিজ্ঞাসা করিতেছে, আজ সন্ধ্যাবেলা নরেন গিয়া Hotel Cecil-এ তাহার সহিত ডিনার খাইতে পারে কি না।

টেলিগ্রাম পড়িয়া নরেন ভাবিল, তবে নির্ম্মলা সম্বন্ধে আশঙ্কা নাই। মন্দ সংবাদ কিছু থাকিলে, চারু তাহার বাড়ীর চিঠিতে জানিতে পারিত এবং তাহাকে ভোজের উৎসবে নিমন্ত্রণ করিত না।

নিজের প্রতি বিরাগ আবার তাহার মনে উথলিয়া উঠিল। ভাবিল, "এখন আমার শরীরের উপর অ্যালকোহলের শেষ ফল, অবসাদের প্রভাব বর্ত্তমান। এই অবসন্ন অবস্থায় আমার মনে অনুতাপ প্রভৃতি যাহা উদিত হইয়াছে, আমার শোণিত আবার স্বাভাবিক সবলতা প্রাপ্ত হইলে তাহা টিকিবে কি? হয় ত আবার এ সব ভুলিব, প্রলোভনের আকর্ষণে পড়িব, অধঃপতনের সোপানে অবতরণ করিতে আরম্ভ করিব। এখন আমার এরূপ অবস্থা; কিন্তু সন্ধ্যাবেলা আবার যে আর্লসকোর্টে ছুটিব না, তাহা কে বলিতে পারে? নিজের প্রতি আমার আর তিল মাত্র বিশ্বাস নাই, শ্রদ্ধা নাই। আমার আর মুক্তি নাই, মুক্তি নাই।"—আবার সে কিয়ৎক্ষণের জন্য বিছানায় মুখ লুকাইল।

চিন্তা করিয়া দেখিল, এই যে চারু আমার ডিনারে নিমন্ত্রণ করিয়াছে, এটা বড় পরিত্রাণ। আমি এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া টেলিগ্রাম করিব। সেখানে গেলে, আজ আর্লস-কোর্টে যাইবার পথ বন্ধ হইয়া যাইবে! আজিকার মত অন্ততঃ পরিত্রাণ হইবে। তাহাই লাভ।

এই ভাবিয়া নরেন স্নান করিতে গেল। স্নানান্তে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া চারুকে টেলিগ্রাম পাঠাইল।

সন্ধ্যাবেলা হোটেল সেসিলের একটি কক্ষে চারু তাহার দাদা ও বউদিদি এবং নির্ম্মলা বসিয়া ছিলেন। বউদিদি বলিলেন, "চারু, আমার চিঠি তুমি কখন পেলে? মার্সেলস্ দিয়ে আসায় চিঠি তুমি একদিন আগে পাবে বলে তাড়াতাড়ি খালি দু ছত্র লিখে দিয়েছিলাম।"

চারু বলিল, "আমি আপনার চিঠি কাল রাত্রে পেলাম।"

"নির্ম্মলা আমাদের সঙ্গে আসছে, তা ঘুণাক্ষরেও নরেনকে জানাওনি ত? আগে ত কিছু ঠিক ছিল না। ছাড়বার দুই একদিন আগে নির্ম্মলার মা এসে বললেন, ডাক্তার বলছে সমুদ্রযাত্রায় নির্ম্মলার শরীরে খুব উপকার হবে, তা তুমি ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও। নরেনকে একটা খুব pleasant surprise দেবার জন্যে নির্ম্মলাকে বারণ করে দিলাম, 'তুই নরেনকে কিছু লিখিসনে।' তোমাকেও তাই লিখলাম, কিছু নরেনকে যেন বোলো না। কেবল কৌশলে তাকে নিয়ে এস।"

চারু ঘড়ি খুলিয়া বলিল, "আর ত দেরী নেই। সাতটা বেজেছে। এখনই নরেন এসে হাজির হবে।"

বউদিদি বলিলেন, "এ মেয়ে নির্ম্মলার চিঠি না পেয়ে, আহা বেচারীর হয় ত কত ভেবেছে! তা এখনই তার সকল কষ্টের ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে।"

বাহিরে পদশব্দ শুনা গেল। ফুটম্যান দুয়ার খুলিয়া, নত হইয়া বলিল—"মিষ্টার ঘোষ।"

চারু, নির্ম্মলার হাতখানি ধরিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। নরেন প্রবেশ করিবামাত্র অগ্রসর হইয়া, রঙ্গ করিয়া স্মিতমুখে বলিল—"Allow me to introduce, Mr. Ghose—Mrs. Ghose."

[আষাঢ়, ১৩১১]

ফুলের মূল্য

প্রথম পরিচ্ছেদ

লণ্ডন নগরের স্থানে স্থানে নিরামিষ ভোজনশালা আছে। আমি একদিন ন্যাশন্যাল গ্যালারিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ছবি দেখিয়া নিজেকে অত্যন্ত ক্লান্ত করিয়া ফেলিলাম। ক্রমে একটা বাজিল, অত্যন্ত ক্ষুধাও অনুভব করিতে লাগিলাম। সেখান হইতে অনতিদূরে, সেণ্ট মার্টিন্স লেনে এইরূপ একটি ভোজনশালা আছে,—মৃদুমন্দ পদক্ষেপে তথায় গিয়া প্রবেশ করিলাম।

তখনও লণ্ডনের ভোজনশালাগুলিতে লাঞ্চের জন্য বহুলোক সমাগম আরম্ভ হয় নাই। হলে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, দুই চারিটি মাত্র ক্ষুধাতুর এখানে ওখানে বিক্ষিপ্ত-ভাবে বসিয়া আছে। আমি গিয়া একটি টেবিলের সম্মুখে বসিয়া, দৈনিক সংবাদপত্র-খানি উঠাইয়া লইলাম। নম্রমুখী ওয়েট্রেস্ আসিয়া দাঁড়াইয়া হুকুমের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

আমি সংবাদপত্র হইতে চক্ষু উঠাইয়া খাদ্যতালিকা হাতে লইয়া আবশ্যকমত অর্ডার দিলাম। "ধন্যবাদ, মহাশয়" বলিয়া ক্ষিপ্রগামিনী ওয়েট্রেস্ নিঃশব্দে অন্তর্হিত হইল।

এই মুহূর্ত্তে, আমার নিকট হইতে অল্প দূরে আর একখানি টেবিলের প্রতি আমার নজর পড়িল। দেখিলাম, সেখানে একটি ইংরাজ-বালিকা বসিয়া আছে। তাহার পানে চাহিবামাত্র, সে আমার মুখ হইতে নিজ দৃষ্টি অন্যত্র ফিরাইয়া লইল। অবাক হইয়া সে আমাকে দেখিতেছিল।

ইহাতে বিশেষ কোন নূতনত্ব নাই, কারণ শ্বেতদ্বীপে আমাদের চমৎকার দেহবর্ণটির প্রভাবে জনসাধারণ সর্ব্বত্রই মোহিত হইয়া থাকে, এবং মনোযোগের অংশ. প্রাপ্যের কিঞ্চিৎ অধিক মাত্রাতেই আমরা লাভ করি।

বালিকাটির বয়স ত্রয়োদশ কিম্বা চতুর্দ্দশ বৎসর হইবে। তাহার পোষাক যেন কিছু দরিদ্রতাব্যঞ্জক। চুলগুলি অজস্রধারায় পিঠের উপর পড়িয়াছে। বালিকার চক্ষু দুইটি বৃহৎ, যেন একটু বিষণ্ণতাযুক্ত।

সে জানিতে না পারে এমন ভাবে আমি মাঝে মাঝে তাহার পানে চাহিতে লাগিলাম। আমার খাদ্যদ্রব্যাদি আসিবার কিয়ৎক্ষণ পরেই সে আহার সমাধা করিয়া উঠিল। ওয়েট্রেস্ আসিয়া তাহার বিলখানি তাহাকে লিখিয়া দিল। বাহির হইবার দরজার নিকট আফিস আছে, সেখানে বিলখানি ও মূল্য দিয়া যাইতে হয়।

বালিকা উঠিলে, আমার দৃষ্টিও তাহাকে অনুসরণ করিল। স্বস্থানে বসিয়াই আমি দেখিলাম, বালিকা তাহার মূল্য প্রদান করিয়া, কর্ম্মচারিণীকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিতেছে— "Please Miss, ঐ যে ভদ্রলোকটি, উনি কি ভারতবর্ষীয়?"

"আমার তাহাই অনুমান হয়।"

"উনি কি সর্ব্বদাই এখানে আসেন?"

"বোধ হয় না। আর কখনও দেখিয়াছি বলিয়া ত স্মরণ নাই।"

"ধন্যবাদ"—বলিয়া মেয়েটি আমার দিকে ফিরিয়া, আর একবার চকিত দৃষ্টিপাত করিয়া বাহির হইয়া গেল।

এইবার কিন্তু আমি বিস্মিত হইলাম। কেন? ব্যাপার কি? আমার সম্বন্ধে তাহার এই কৌতূহল দেখিয়া, তাহার সম্বন্ধেও আমার অত্যন্ত কৌতূহল উপস্থিত হইল। আহার শেষ হইলে ওয়েট্রেস্‌কে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ঐ যে মেয়েটি ওখানে বসিয়াছিল, তাহাকে তুমি জান?"

"না মহাশয়, আমি ত বিশেষ জানি না, তবে প্রতি শনিবারে এখানে লাঞ্চ খাইয়া থাকে, তাহা লক্ষ্য করিয়াছি।"

"শনিবার ছাড়া অন্য কোনও বারে আসে না?"

"না, আর ত কখনও দেখি না।"

"ও যে কে তাহা তুমি কিছু অনুমান করিতে পার?"

"বোধ করি কোনও দোকানে কর্ম্ম করে।"

"কেন বল দেখি?"

"হয়ত সামান্য কিছু উপার্জ্জন করে, অন্য দিন লাঞ্চ খাইবার পয়সা কুলায় না, শনিবারে সাপ্তাহিক বেতন পায়, তাই একদিন আসে।"

কথাটা আমার মনে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বালিকাটির সম্বন্ধে কৌতূহল আমার মন হইতে দূর হইল না। এমন করিয়া আমার সংবাদ লইল কেন? ভিতরে এমন কি রহস্য আছে, যাহার জন্য আমার সম্বন্ধে উহার এত ঔৎসুক্য? তাহার সেই দারিদ্র্যক্লিষ্ট, চিন্তাপূর্ণ, বিষাদভরা মূর্ত্তি আমার মনে আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিল। আহা, কে বালিকা? আমার দ্বারায় তাহার কি কোনও উপকার হওয়ার সম্ভাবনা আছে? রবিবার দিন লণ্ডনের সমস্ত দোকান-পাট বন্ধ। সোমবার দিন প্রাতরাশের পর আমি বালিকার অনুসন্ধানে বাহির হইলাম। সেণ্ট মার্টিন্স লেনের কাছাকাছি রাস্তাগুলিতে, বিশেষতঃ ষ্ট্র্যাণ্ডে অনেক দোকানে অন্বেষণ করিলাম, কিন্তু কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। কোনও একটা দোকানে প্রবেশ করিলে, অন্ততঃ কিছু না কিছু ক্রয় করিতে হয়।* অনাবশ্যক নেকটাই, রুমাল, কলারের বোতাম, পেন্সিল, ছবি-পোষ্টকার্ড প্রভৃতি আমার ওভারকোটের পকেটে স্তূপাকার হইয়া উঠিল, কিন্তু কোথাও বালিকার সন্ধান পাইলাম না।

* ইহা কেবলমাত্র চক্ষুলজ্জার খাতিরে নহে, কতকটা দয়াধর্ম্মের অনুরোধেও বটে। লণ্ডনের প্রত্যেক বড় বড় দোকানে পুরুষ Shop-walkers আছে। তাহাদের কর্ত্তব্য, খরিদ্দারকে যথাবিভাগে পৌঁছাইয়া দেওয়া এবং সাধারণভাবে ক্রয়কর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণ করা। যদি কোনও খরিদ্দার কোনও বিভাগ হইতে জিনিষ দেখিয়া কিছু না কিনিয়া ফিরিয়া যায় তবে তৎক্ষণাৎ সেই Shop-walker দোকানের ম্যানেজারের নিকট রিপোর্ট করিয়া দিয়া থাকে—"Miss অমুকের বিভাগ হইতে একজন ক্রেতা ফিরিয়া গিয়াছে।" এইরূপ রিপোর্ট হইলে সেই কর্ম্মচারিণীর কৈফিয়ৎ তলব হয়। প্রথম প্রথম সাবধান করিয়া দেওয়া হয়, বারম্বার এইরূপ রিপোর্ট হইলে জরিমানা হয়, কর্ম্মচ্যুতিও হইতে পারে। এই সকল Shop-girls অত্যন্ত সামান্য বেতনে কর্ম্ম করিয়া থাকে। জিনিষ অপছন্দ হইলেও, তাহাদের চক্ষুর মিনতি উপেক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসা দুঃসাধ্য।—লেখক।

সপ্তাহ কাটিয়া গেল, শনিবার আসিল। আমি আবার সেই নিরামিষ ভোজনাগারে উপস্থিত হইলাম। প্রবেশ করিয়া দেখি, সেই টেবিলে বালিকা ভোজনে বসিয়াছে। আমি সেই টেবিলের নিকটে গিয়া, তাহার সম্মুখের চেয়ারখানি দখল করিয়া বলিলাম—"Good afternoon."

বালিকা সঙ্কোচের সহিত বলিল—"Good afternoon, Sir."

একটি আধটি কথা দিয়া আরম্ভ করিয়া, আমি ক্রমে জমাইয়া তুলিতে লাগিলাম। বালিকা এক সময় জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি ভারতবর্ষীয়?" "হাঁ।"

"আমায় ক্ষমা করিবেন,—আপনি কি নিরামিষভোজী?"

উত্তর না দিয়া বলিলাম, "কেন বল দেখি?"

"আমি শুনিয়াছি, ভারতবর্ষীয় লোকেরা অধিকাংশই নিরামিষ ভোজন করে।"

"তুমি ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় কথা কেমন করিয়া জানিলে?"

"আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা ভারতবর্ষে সৈন্য হইয়া গিয়াছেন।"

আমি তখন উত্তর করিলাম, "আমি প্রকৃত নিরামিষভোজী নহি; তবে মাঝে মাঝে আমি নিরামিষ ভোজন করিতে ভালবাসি বটে।"

শুনিয়া বালিকা যেন কিঞ্চিৎ নিরাশ হইল।

জানিলাম, এই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছাড়া বালিকার আর কোনও পুরুষ অভিভাবক নাই। ল্যাম্বেথে বৃদ্ধা বিধবা মাতার সহিত সে বাস করে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার দাদার নিকট হইতে পত্রাদি পাও?"

"না, অনেক দিন কোনও পত্রাদি পাই নাই। সেইজন্য আমার মা অত্যন্ত চিন্তিত আছেন। তাঁহাকে লোকে বলে, ভারতবর্ষ সর্প, ব্যাঘ্র ও জ্বররোগে পরিপূর্ণ। তাই তিনি আশঙ্কা করিতেছেন আমার ভ্রাতার কোনওরূপ অমঙ্গল ঘটিয়া থাকিবে। সত্যই কি ভারতবর্ষ সর্প, ব্যাঘ্র ও জ্বররোগে পরিপূর্ণ মহাশয়?"

আমি একটু হাসিলাম। বলিলাম, "না। তাহা হইলে কি মানুষ সেখানে বাস করিতে পারিত?"

বালিকা একটি মৃদুরকমের দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। বলিল, "মা বলেন, যদি কোনও ভারতবাসীর সাক্ষাৎ পাই, তবে সকল কথা জিজ্ঞাসা করি।"—বলিয়া, অনুনয়পূর্ণ নেত্রে, আমার পানে চাহিল।

আমি তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিলাম। বাড়ীতে মার কাছে লইয়া যাইবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিতে তাহার সাহস হইতেছে না; অথচ ইচ্ছা আমি একবার যাই।

এই দীন, বিরহকাতর জননীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আমার অত্যন্ত আগ্রহ হইল। দরিদ্রের কুটীরের সাক্ষাৎ পরিচয়লাভের অবসর আমার কখনও ঘটে নাই। দেখিয়া আসিব এ দেশে তাহারা কিরূপভাবে জীবন অতিবাহিত করে, কিরূপভাবে চিন্তা করে।

বালিকাকে বলিলাম, "চল না—আমাকে তোমাদের বাড়ী লইয়া যাইবে? তোমার মার নিকট আমায় পরিচিত করিয়া দিবে?"

এ প্রস্তাবে বালিকার দুইটি চক্ষু দিয়া যেন কৃতজ্ঞতা উছলিয়া উঠিল। বলিল, "Thank you ever so much,—it would be so kind of you! এখন আসিতে পারিবেন কি?"

"আহ্লাদের সহিত।"

"আপনার কোন কার্য্যের ক্ষতি হইবে না ত?"

"না—না, মোটেই না। আজ অপরাহ্ণে আমার সময় সম্পূর্ণ আমার নিজের।"

শুনিয়া বালিকা পুলকিত হইল। আহার সমাধা করিয়া আমরা দুইজনে উঠিলাম। পথে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার নামটি কি জানিতে পারি?"

"আমার নাম অ্যালিস মার্গারেট ক্লিফর্ড।"

রঙ্গ করিয়া বলিলাম,—"ওঃ হো—তুমিই Alice in Wonderland-এর অ্যালিস বুঝি?"

বিস্ময়ে বালিকা চক্ষুস্থির করিয়া রহিল। জিজ্ঞাসা করিল, "সে কি?"

আমি একটু অপ্রতিভ হইলাম। মনে করিতাম, এমন কোনও ইংরাজ বালিকা নাই, যে

Alice in Wonderland নামক সেই অদ্বিতীয় শিশুরঞ্জন পুস্তকখানি কণ্ঠস্থ করিয়া রাখে নাই।

বলিলাম, "সে একখানি চমৎকার বহি আছে। পড় নাই?"

"না, আমি ত পড়ি নাই।"

বলিলাম, "তোমার মাতা যদি আমায় অনুমতি করেন, তবে আমি তোমাকে সে বহি একখানি উপহার দিব।"

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে, সেণ্ট মার্টিন্স চার্চের পাশ দিয়া চেয়ারিং ক্রশ ষ্টেশনের সম্মুখে আসিয়া পৌঁছিলাম। ষ্ট্র্যাণ্ড দিয়া হুহু করিয়া বৃহদাকার শ্বিতল অমনিবস্‌গুলি উভয় দিকে ছুটিয়া যাইতেছে। ক্যাবেরও সংখ্যা নাই। টেলিগ্রাফ অফিসের সম্মুখে ফুটপাথে দাঁড়াইয়া বালিকাকে বলিলাম, "এস, আমরা এইখানেই ওয়েষ্ট-মিনষ্টার বাসের জন্য অপেক্ষা করি।"

বালিকা বলিল, "চলিয়া যাইতে আপনার আপত্তি আছে কি?"

আমি বলিলাম, "কিছুমাত্র না। কিন্তু তোমার কষ্ট হইবে না?"

"না, আমি ত রোজই চলিয়া বাড়ী যাই।"

কোথায় সে কর্ম্ম করে, এইবার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবার সুযোগ পাইলাম। ইংরাজি হিসাবে এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাটা নিয়ম নহে, কিন্তু সকল নিয়মেরই ফাঁকি আছে কিনা। যেমন রেলগাড়ীতে উঠিয়া সহযাত্রীকে, "কোথায় যাইতেছেন মহাশয়?" জিজ্ঞাসা করা ভয়ানক পাপ, তবে, "অধিকদূর যাইবেন কি?" ইহা জিজ্ঞাসা করিতে দোষ নাই। সহযাত্রী ইচ্ছা করিলে বলিতে পারে, "আমি অমুক স্থান অবধি যাইব।" ইচ্ছা না করিলে বলিতে পারে, "না এমন বেশী দূর নয়।" আমার পশ্নেরও উত্তর দেওয়া হইল, তাহার পর্দ্দাও বজায় রহিল! সেই হিসাবে আমি বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এদিকে তুমি প্রায়ই আস বুঝি?"

বালিকা বলিল "হাঁ। আমি সিভিল সার্ভিস ষ্টোসে টাইপরাইটারের কাষ করি। রোজ সন্ধ্যাবেলা বাড়ী যাই। আজ শনিবার বলিয়া শীঘ্র ছুটি পাইয়াছি।"

আমি তাহাকে বলিলাম, "চল, ষ্ট্র্যাণ্ড দিয়া না গিয়া এম্‌ব্যাঙ্কমেণ্ট দিয়া যাওয়া যাউক। ভীড় কম।" বলিয়া তাহার বাহুধারণ করিয়া সাবধানতার সহিত রাস্তা পার করিয়া দিলাম।

টেমস্‌ নদীর উত্তর কূল দিয়া এম্‌ব্যাঙ্কমেণ্ট নামক রাস্তা গিয়াছে। চলিতে চলিতে বলিলাম, "তুমি কি সচরাচর এই রাস্তা দিয়াই যাও?"

বালিকা বলিল, না, এ রাস্তায় যদিও ভীড় কম, তথাপি ময়লা কাপড়পরা লোকের সংখ্যা অধিক। আমি তাই ষ্ট্র্যাণ্ড এবং হোয়াইট হল্‌ দিয়াই বাড়ী যাই।"

আমি মনে মনে এই অশিক্ষিতা দরিদ্রা বালিকার নিকট পরাজয় স্বীকার করিলাম। ইংরাজ জাতির সৌন্দর্য্য-প্রিয়তার নিকট আমার আত্মপরাজয় ইহাই প্রথমবার নহে।

কথোপকথনে আমরা ওয়েষ্টমিনষ্টার ব্রিজের নিকটবর্ত্তী হইলাম। আমি বলিলাম, "তোমাকে কি অ্যালিস বলিয়া ডাকিব, না মিস ক্লিফর্ড বলিব?"

মৃদু হাসিয়া বালিকা বলিল, "আমি ত এখনও যথেষ্ট বড় হই নাই। আমাকে যাহা ইচ্ছা বলিয়া ডাকিতে পারেন। লোকে আমাকে ম্যাগি বলিয়া ডাকে।"

"তুমি কি বড় হইবার জন্য উৎকণ্ঠিত?" "হ্যাঁ।"

"কেন বল দেখি?"

"বড় হইলে আমি কর্ম্ম করিয়া অধিক উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইব। আমার মা বৃদ্ধ হইয়াছেন।"

"তুমি যে কর্ম্ম কর, তাহা তোমার মনঃপূত?"

"না। আমার কর্ম্ম বড় যন্ত্রের মত। আমি এমন কর্ম্ম করিতে চাহি, যাহাতে

আমার মস্তিষ্ক চালনা করিতে হয়। যেমন সেক্রেটারির কায।"

হাউসেস অব পার্লামেন্টের নিকট পুলিসপ্রহরী পদচারণা করিতেছে। তাহা দক্ষিণে রাখিয়া, ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ পার হইয়া, আমরা ল্যাম্বেথে গিয়া পড়িলাম। ইহা দরিদ্রের পল্লী। ম্যাগি বলিল, "আমি যদি কখনও সেক্রেটারি হইতে পারি, তবে মাকে এ পাড়া হইতে স্থানান্তরিত করিয়া অন্যত্র লইয়া যাইব।"

ছোটলোকের ভীড় অতিক্রম করিয়া আমরা চলিতে লাগিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার প্রথম নামটি ছাড়াইয়া দ্বিতীয় নামটি তোমার ডাকনাম হইল কেন?"

ম্যাগি বলিল, "আমার মার প্রথম নামও অ্যালিস, তাই আমাব পিতা আমার দ্বিতীয় নামটিই সংক্ষিপ্ত করিয়া ডাকিতেন।"

"তোমার পিতা তোমাকে ম্যাগি বলিতেন, না ম্যাগ্‌সি বলিয়া ডাকিতেন?"

"যখন আদর করিয়া ডাকিতেন, তখন ম্যাগ্‌সি বলিয়াই ডাকিতেন। আপনি কি করিয়া জানিলেন?"

রহস্য করিয়া বলিলাম, "হাঁ হাঁ, আমরা ভারতবর্ষীয় কিনা. আমাদের যাদুবিদ্যা ও ভূত ভবিষ্যৎ অনেক বিষয় জানা আছে।"

বালিকা বলিল, "তাহা আমি শুনিয়াছি।"

বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "বটে! কি শুনিয়াছ?"

"শুনিযাছি, ভারতবর্ষে অনেক লোক আছে যাহারা অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন। তাহা-দিগকে ইয়োগী (Yogi) বলে। কিন্তু আপনি ত ইয়োগী নহেন।"

"কেমন করিয়া জানিলে ম্যাগি, আমি ইয়োগী নহি?"

"ইযোগীগণ মাংস ভক্ষণ করে না।"

"তাই বুঝি তুমি প্রথমেই আমাকে জিজ্ঞাসা কবিযাছিলে, আমি নিবামিষভোজী কি না?"

বালিকা উত্তর না দিয়া মৃদু মৃদু হাস্য কবিতে লাগিল।

ক্রমে আমরা একটি সংকীর্ণ গৃহদ্বারের নিকট পৌঁছিলাম। পকেট হইতে ল্যাচ-কী বাহির করিয়া ম্যাগি দরজা খুলিয়া ফেলিল। ভিতবে প্রবেশ কবিযা আমাকে বলিল, "আসুন।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আমি প্রবেশ করিলে ম্যাগি দবজা বন্ধ কবিয়া দিল। সিঁড়িব নিকট গিযা একটু উচ্চস্বরে বলিল, "মা, তুমি কোথা?"

নিম্ন হইতে শব্দ আসিল, "আমি রান্নাঘরে রহিযাছি বাছা, নামিযা আইস।"

এখানে বলা আবশ্যক, লণ্ডনের রাজপথগুলি ভূমি হইতে উচ্চ হইয়া থাকে। রান্নাঘর প্রাযই রাস্তাব সমতলতা হইতে নিম্ন হয়।

মাব স্বব শুনিয়া আমাব প্রতি চাহিযা ম্যাগি বলিল, "Do you mind?"

আমি বলিলাম, "Not in the least, চল।"

সিঁড়ি দিয়া বালিকার সঙ্গে আমি তাহাদের রান্নাঘরে নামিয়া গেলাম।

দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া ম্যাগি বলিল, "মা, একটি ভারতবর্ষীয় ভদ্রলোক তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।"

বৃদ্ধা আগ্রহ সহকারে বলিলেন, "কই তিনি?"

আমি ম্যাগির পশ্চাৎ পশ্চাৎ সস্মিত মুখে প্রবেশ করিলাম। বালিকা পরস্পর পরিচয় করাইয়া দিল—"ইনি মিষ্টার গুপ্ত। ইনি আমার মা।"

"How do you do?"—বলিয়া আমি করপ্রসারণ করিয়া দিলাম।

মিসেস ক্লিফর্ড বলিলেন, "ক্ষমা করিবেন। আমার হাত ভাল নয়।" বলিয়া নিজ হস্ত প্রসারণ করিয়া দেখাইলেন, তাহাতে ময়দা লাগিয়া রহিয়াছে। বলিলেন, "আজ

শনিবার, তাই কেক্ প্রস্তুত করিতেছি। সন্ধ্যাবেলা লোক আসিয়া ইহা কিনিয়া লইয়া যাইবে, রাত্রে রাজপথে ইহা বিক্রয় হইবে। এইরূপ করিয়া কষ্টে আমরা জীবিকা নির্ব্বাহ করি।"

দরিদ্রপল্লীতে শনিবার রাত্রিটা মহোৎসবের ব্যাপার। পথে পথে আলোকময় ঠেলা-গাড়ীতে করিয়া অসংখ্য লোক পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। রাজপথে এই সন্ধ্যায় ভীড় সকল দিন অপেক্ষা অধিক। শনিবারেই দরিদ্রগণের একটু খরচপত্র করিবার দিন, কারণ সেইদিনই তাহারা সাপ্তাহিক বেতন পাইয়া থাকে।

ড্রেসারের* উপর ময়দা, চর্ব্বি, কিসমিস, ডিম্ব প্রভৃতি কেক প্রস্তুতের উপকরণগুলি সজ্জিত রহিয়াছে। টিনের আধারে সদ্য পক্ক কয়েকটি কেকও রহিয়াছে।

মিসেস ক্লিফর্ড বলিলেন, "গরীব মানুষের পাকশালায় বসা কি আপনার প্রীতিকর হইবে? আমার কার্য্য প্রায় শেষ হইয়াছে। ম্যাগি, তুই ইঁহাকে বসিবার ঘরে লইয়া যা। আমি এখনই আসিতেছি।"

আমি বলিলাম, "না না। আমি এখানে বেশ বসিতে পারিব। আপনি বেশ কেক্ তৈয়ারী করিতেছেন ত!"

মিসেস ক্লিফর্ড সস্মিতমুখে আমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

ম্যাগি বলিল, "মা বেশ টফি তৈয়ারি করেন। খাইয়া দেখিবেন?"

আমি আহ্লাদের সহিত সম্মতি জানাইলাম। ম্যাগি একটা কবার্ড খুলিয়া একটি টিনের কৌটাপূর্ণ টফি আনিয়া হাজির করিল। আমি কয়েকটি খাইয়া সুখ্যাতি করিতে লাগিলাম।

কেক্ তৈয়ারি করিতে করিতে মিসেস ক্লিফর্ড জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভারতবর্ষ কিরূপ দেশ মহাশয়?"

"সুন্দর দেশ।"

"বাস করিবার পক্ষে নিরাপদ কি?"

"নিরাপদ বইকি। তবে এদেশের মত ঠাণ্ডা নহে, কিন্তু গরম দেশ।"

"সেখানে নাকি সর্প ও ব্যাঘ্র অত্যন্ত অধিক? তাহারা মানুষকে বিনাশ করে না?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "ও সব কথা বিশ্বাস করিবেন না। সর্প ও ব্যাঘ্র জঙ্গলে থাকে, তাহারা লোকালয়ে আসে না। দৈবাৎ লোকালয়ে আসিলে তাহারা বিনষ্ট হয়।"

"আর জ্বর?"

"জ্বর ভারতবর্ষে কোথাও কোথাও একটু বেশী বটে—সর্বত্র নহে, এবং সব সময়েও নহে।"

"আমার পুত্র পঞ্জাবে আছে। সে সৈনিক-পুরুষ। পঞ্জাব কেমন স্থান মহাশয়?"

"পঞ্জাব উত্তম স্থান। সেখানে জ্বর কম। স্বাস্থ্য খুব ভাল।"

মিসেস ক্লিফর্ড বলিলেন, "আমি শুনিয়া সুখী হইলাম।"

তাঁহার কেক্ তৈয়ারী শেষ হইল। কন্যাকে বলিলেন, "ম্যাগি, তুই মিস্টার গুপ্তকে উপরে লইয়া যা। আমি হাত ধুইয়া চা প্রস্তুত করিয়া আনিতেছি।"

ম্যাগি অগ্রে অগ্রে, আমি পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাহাদের বসিবার ঘরটিতে প্রবেশ করিলাম। আসবাব-পত্র অতি সামান্য এবং অল্পমূল্য। মেজের উপর কার্পেটখানি বহু পুরাতন হইয়া গিয়াছে, স্থানে স্থানে ছিন্ন, কিন্তু সমস্তই অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

ম্যাগি কক্ষে আসিয়া পর্দ্দাগুলি সরাইয়া, জানালাগুলি খুলিয়া দিল। একটি কাচে আবৃত পুস্তকের কেস ছিল, আমি দাঁড়াইয়া তাহাই দেখিতে লাগিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে মিসেস্ ক্লিফর্ড চায়ের ট্রে হাতে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অঙ্গ হইতে রন্ধনশালার সমস্ত চিহ্ন অন্তর্হিত। চা পান করিতে করিতে আমি

*রান্নাঘরের টেবিলের নাম ড্রেসার।—লেখক।

ভারতবর্ষের গল্প করিতে লাগিলাম।

মিসেস ক্লিফর্ড তাঁহার পুত্রের একখানি ফোটোগ্রাফ দেখাইলেন। ইহা ভারতবর্ষ যাত্রার পূর্ব্বে তোলা হইয়াছিল। তাঁহার পুত্রের নাম ফ্রান্সিস্ অথবা ফ্রাঙ্ক। ম্যাগি একখানি ছবির বই বাহির করিল। তাহার জন্মদিন উপলক্ষে তাহার দাদা এখানি পাঠাইয়া দিয়াছেন। ইহাতে সিমলা-শৈলের অনেকগুলি অট্টালিকা এবং স্বাভাবিক দৃশ্যের ছবি রহিয়াছে। ভিতরের পৃষ্ঠায় লেখা আছে—"To Maggie on her birthday from her loving brother Frank."

মিসেস্ ক্লিফর্ড বলিলেন, "ম্যাগি, সেই আংটিটা মিষ্টার গুপ্তকে দেখা না।"

আমি বলিলাম, "তোমার দাদা পাঠাইয়াছেন নাকি? কই ম্যাগি কী রকম আংটি দেখি?"

ম্যাগি বলিল, "সে একটি যাদুযুক্ত অঙ্গুরীয়। একজন ইয়োগী সেটি ফ্রাঙ্ককে দিয়াছিল।" বলিয়া আংটি বাহির করিয়া দিল। আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি ইহা হইতে ভূত ভবিষ্যৎ বলিতে পারেন?"

Crystal gazing নামক একটা ব্যাপারের কথা অনেক দিন হইতে শুনিয়াছিলাম। দেখিলাম আংটিতে একটি স্ফটিক বসান রহিয়াছে। হাতে করিয়া সেটি দেখিতে লাগিলাম।

মিসেস্ ক্লিফর্ড বলিলেন, "ফ্রাঙ্ক ওটি পাঠাইবার সময় লিখিয়াছিল, সংযত মনে ঐ স্ফটিকের পানে চাহিয়া দূরবর্ত্তী যে কোনও মানুষের বিষয়ে চিন্তা করিবে, তাহার সমস্ত কার্য্যকলাপ দেখিতে পাওয়া যাইবে। ইয়োগী ফ্রাঙ্ককে এই কথা বলিয়াছিল। বহুদিন ফ্রাঙ্কের কোনও সংবাদ না পাইয়া, আমি ও ম্যাগি অনেকবার উহার প্রতি দৃষ্টিবদ্ধ করিয়া চিন্তা করিয়াছি, কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। আপনি একবার দেখুন না! আপনি হিন্দু, আপনি সফল হইতে পারেন।"

দেখিলাম কুসংস্কার শুধু ভারতবর্ষেই আবদ্ধ নহে। অথচ ইহা যে কিছুই নয়, একটা পিতলের আংটি এবং একটুকরা সাধারণ কাচমাত্র, তাহাও এই জননী ভগিনীকে বলিতে মন সরিল না। তাহারা মনে করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের ফ্রাঙ্ক সেই বহুদূর স্বপ্নবৎ ভারতবর্ষ হইতে একটি অভিনব অত্যাশ্চার্য্য দ্রব্য তাহাদিগকে পাঠাইয়া দিয়াছে, সে বিশ্বাসটুকু ভাঙ্গিয়া দিই কি প্রকারে?

মিসেস্ ক্লিফর্ড ও ম্যাগির আগ্রহ দর্শনে, অঙ্গুরীয়টি হাতে লইয়া স্ফটিকের প্রতি অনেকক্ষণ দৃষ্টিবদ্ধ করিয়া রহিলাম। অবশেষে প্রত্যর্পণ করিয়া বলিলাম, "কই, আমি ত কিছু দেখিলাম না।"

মাতা, কন্যা উভয়েই একটু দুঃখিত হইল। বিষয়ান্তরের প্রতি তাহাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করিবার জন্য বলিলাম, "ঐ যে একটি বেহালা রহিয়াছে দেখিতেছি, ওটি তোমার বুঝি ম্যাগি?"

মিসেস্ ক্লিফর্ড বলিলেন, "হাঁ। ম্যাগি বেশ বাজাইতে পারে। একটা কিছু বাজাইয়া শুনাইয়া দে না ম্যাগি।"

ম্যাগি তাহার মাতার প্রতি রোষকটাক্ষ করিয়া বলিল—"Oh mother!"

আমি বলিলাম, "ম্যাগি, একটা বাজাও না। আমি বেহালা শুনিতে বড় ভালবাসি। দেশে আমার একটি বোন আছে, সেও তোমারই মত এত বড় হইবে, সে আমায় বেহালা বাজাইয়া শুনাইত।"

ম্যাগি বলিল, "আমি যেরূপ বাজাই, তাহা মোটেই শুনিবার উপযুক্ত নহে।"

আমার পীড়াপীড়িতে শেষে ম্যাগি বাজাইতে স্বীকৃত হইল। বলিল, "আমার ভাণ্ডারে অধিক কিছুই নাই। কি শুনিবেন?"

"আমি ফরমাস করিব? আচ্ছা তাহা হইলে তোমার music-case লইয়া এস—কি কি আছে দেখি।"

ম্যাগি একটি কালো চামড়ার নির্ম্মিত পুরাতন মিউজিক-কেস বাহির করিল। খুলিয়া দেখিলাম, তাহার মধ্যে অধিকাংশ স্বরলিপিই অকিঞ্চিৎকর, যথা "Goodbye Dolly

Grey", "Honeysuckle and the Bee" প্রভৃতি। কয়েকটি রহিয়াছে যাহা যথার্থই ভাল জিনিষ, যদিও ফ্যাসান হিসাবে বহু পুরাতন হইয়া গিয়াছে—যথা, "Annie Laurie", "Robin Adair", "The Last Rose of Summer", ইত্যাদি। দেখিলাম, কয়েকটি স্কচ গানও রহিয়াছে। আমি স্কচ গানের বড়ই পক্ষপাতী। তাই "Bluebells of Scotland" নামক স্বরলিপিটি বাছিয়া আমি ম্যাগির হস্তে দিলাম।

ম্যাগি বেহালায় বাজাইতে লাগিল, আমি মনে মনে সুর করিয়া গানটি গাহিতে লাগিলাম— "Oh where—and oh where—is my
Highland laddie gone!"

বাজান শেষ হইলে, ম্যাগিকে ধন্যবাদ দিয়া আমি অনেক প্রশংসা করিতে লাগিলাম। মিসেস ক্লিফর্ড বলিলেন, "ম্যাগি কখনও উপযুক্ত শিক্ষালাভের সুযোগ পায় নাই। যাহা শিখিয়াছে, তাহা নিজের যত্নে শিখিয়াছে মাত্র। যদি কখনও আমাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় তবে উহাকে lessons লওয়াইবার বন্দোবস্ত করিব।"

কথাবার্ত্তা শেষ হইলে বলিলাম, "ম্যাগি, আর কিছু বাজাও না।"

এখন ম্যাগির সঙ্কোচ তিরোহিত হইয়াছে। বলিল, "কি বাজাইব নির্দ্দেশ করুন!"

আমি তাহার স্বরলিপিগুলির মধ্যে খুঁজিতে লাগিলাম। বর্ত্তমান সময়ে যে সকল গান সৌখিন সমাজে আদৃত, তাহার কোনটিই দেখিতে পাইলাম না। বুঝিলাম, সে সকল গানের প্রতিধ্বনি এখনও এ দরিদ্র পল্লীতে প্রবেশ করে নাই।

খুঁজিতে খুঁজিতে হঠাৎ একটি যথার্থ উচ্চশ্রেণীর স্বরলিপি হাতে পাইলাম। এটি Gounod কর্ত্তৃক বিরচিত Faust-নামক Opera হইতে Flower-song গান—হাতে তুলিয়া অনুরোধ করিলাম, "এইটি বাজাও।"

ম্যাগি বাজাইল। শেষ হইলে, আমি কিয়ৎক্ষণ বিস্ময়ে মৌন হইয়া রহিলাম। Culture নামক জিনিষটা ইউরোপীয় সমাজের কত নিম্নস্তর অবধি প্রবেশ করিয়াছে ইহাই আমার বিস্ময়ের বিষয়। ম্যাগি এই কঠিন স্বরলিপিটিও সুন্দর বাজাইল—অথচ সে একটি নিম্নশ্রেণীর বালিকামাত্র। ভাবিলাম, কলিকাতার কোনও দিগ্‌গজ ব্যারিষ্টার বা প্রসিদ্ধ সিভিলিয়ানের এই বয়সের কন্যা, গুনোর ফাউষ্ট হইতে একটি সঙ্গীত যদি এমন সুন্দরভাবে বাজাইতে পারিত, তবে সমাজে ধন্য ধন্য পড়িয়া যাইত।

ম্যাগিকে ধন্যবাদ দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এটিও কি তুমি নিজে শিখিয়াছ?"

"না। এটি আমি নিজে শিখিতে পারি নাই। আমাদের গির্জ্জার মিনিষ্টারের কন্যার নিকট আমি এটি শিখিয়াছি। আপনি কখনও এ অপেরা শুনিয়াছেন?"

আমি বলিলাম, "না। আমি অপেরায় কখনও ফাউষ্ট শুনি নাই। তবে গইটের ফাউষ্টের ইংরাজি অনুবাদ, লাইসীয়মে অভিনয় দেখিয়াছি বটে।"

"লাইসীয়মে? যেখানে আর্ভিং অভিনয় করেন?"

"হাঁ। তুমি কখনও আর্ভিং-এর অভিনয় দেখিয়াছ?"

ম্যাগি দুঃখিতভাবে বলিল, "না. আমি কোন ওয়েষ্ট-এণ্ড থিয়েটারে কখনও যাই নাই। আর্ভিংকে কখনও দেখি নাই। ছবির দোকানের জানালায় তাঁহার ফোটোগ্রাফ দেখিয়াছি মাত্র।"

"এখন আর্ভিং লাইসীয়মে Merchant of Venice অভিনয় করিতেছেন। মিসেস ক্লিফর্ড আর তুমি যদি একদিন এস, তবে আমি অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত তোমাদিগকে লইয়া যাই।"

মিসেস ক্লিফর্ড ধন্যবাদের সহিত সম্মতি জানাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি সান্ধ্য-অভিনয় দেখিতে ইচ্ছা করেন, না অপরাহ্নের অভিনয়?"

এখানে লণ্ডনের থিয়েটার সম্বন্ধে একটু টীকা আবশ্যক। কলিকাতার থিয়েটারের মত, আজ অমুক নাটকের অভিনয়ে "হৈ হৈ শব্দ রৈ রৈ কাণ্ড",—কাল-নাটকান্তরে "হাসির

হর্‌রা, গানের গর্‌রা, আমোদের ফোয়ারা" উপস্থিত হয় না। প্রথমতঃ, সেখানে থিয়েটারে প্রতি রাত্রেই অভিনয় হইয়া থাকে (রবিবার ছাড়া)। ইহা ব্যতীত কোনও থিয়েটারে শনিবারে, কোনটাতে বা বুধবারে, কোনটাতে বা শনি ও বুধ উভয় বারেই "ম্যাটিনে" অর্থাৎ অপরাহ্ণ-অভিনয়ও হইয়া থাকে। একটি নাটক কোনও থিয়েটারে আরম্ভ হইলে, প্রতিদিন তাহারই অভিনয় হয়। যতদিন অবধি দর্শকের অভাব না ঘটে, ততদিন পর্যন্ত এইরূপ চলে। এইরূপে কোনও নাটক দুই মাস বা ছয় মাস—বা লোকপ্রিয় Musical comedy হইলে এমন কি দুই তিন বৎসর অবধি অবিচ্ছেদে অভিনীত হইতে থাকে।

মিসেস ক্লিফর্ড বলিলেন, "আমার শরীর ভাল নহে। অপরাহ্ণ-অভিনয়ই সুবিধা। এক শনিবারে, ম্যাগির ছুটির পর একত্র যাওয়া যাইতে পারে।"

আমি বলিলাম, "উত্তম। সোমবার দিন গিয়া, সামনের যে শনিবারের জন্য পাই, সেই শনিবারের টিকিট কিনিয়া রাখিয়া আপনাকে তারিখ জানাইব।"

ম্যাগ বলিল, "কিন্তু মিষ্টার গুপ্ত, আপনি যেন অধিক মূল্যের টিকিট কিনিবেন না। তাহা যদি কেনেন, তবে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইব।"

আমি বলিলাম, "না, অধিক মূল্যের টিকিট কিনিব কেন? আপার সার্কেলের টিকিট কিনিব এখন। আমি ত আর একজন ভারতবর্ষীয় রাজা নহি।—ভাল কথা, Merchant of Venice পড়িয়াছ?"

"মূল নাটক পড়ি নাই। স্কুলে আমাদের পাঠ্যপুস্তকে Lamb's Tales হইতে গল্পাংশ কতকটা উদ্ধৃত ছিল। তাহাই পড়িয়াছি।"

"আচ্ছা, আমি তোমায় মূল নাটক একখানি পাঠাইয়া দিব। বেশ করিয়া পড়িয়া রাখিও। তাহা হইলে অভিনয় বুঝিবার সুবিধা হইবে।"

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল। আমি ইহাদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম।

সোমবার দিন বেলা দশটার সময় লাইসীয়মের বক্স-আফিসে গিয়া কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আগামী শনিবার অপরাহ্ণ-অভিনয়ের জন্য আমাকে তিনখানা আপার সার্কেলের টিকিট দিতে পারেন?"

কর্ম্মচারী বলিল, "না মহাশয়, এখন সামনের দুই শনিবার দিতে পারি না। সমস্ত আসন বিক্রয় হইয়া গিয়াছে।"

"তৃতীয় শনিবার?"

"সেদিন দিতে পারি।"—বলিয়া সে ব্যক্তি, সেই তারিখ অঙ্কিত একটি প্ল্যান বাহির করিল। দেখিলাম সে তারিখেও আপার সার্কেলের অনেক আসন বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। সেই সেই আসনের নম্বরগুলি নীল পেন্সিল দিয়া কাটা রহিয়াছে।

প্ল্যানখানি, হাতে লইয়া, খালি আসনগুলি হইতে বাছিয়া, পরস্পর সংলগ্ন তিনটি আসন পছন্দ করিয়া, তাহার নম্বর কর্ম্মচারীকে বলিয়া দিলাম। সেই নম্বরযুক্ত তিন-খানি টিকিট ক্রয় করিয়া বার শিলিং মূল্য দিয়া চলিয়া আসিলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তিন মাস কাটিয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে আরও কয়েকবার ম্যাগির সহিত গিয়া তাহার মাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছি। মধ্যে ম্যাগিকে একদিন জু-গার্ডেনে লইয়া গিয়াছিলাম। সেখানে Indian Rajah নামক হস্তীর পৃষ্ঠে অন্যান্য বালকবালিকার সহিত ম্যাগিও আরোহণ করিয়াছিল। হাতী চড়িয়া তাহার খুসীর আর সীমা নাই।

এখনও পর্য্যন্ত কিন্তু তাহার ভ্রাতার কোনও সংবাদ আসে না। একদিন মিসেস ক্লিফর্ডের অনুরোধক্রমে ইণ্ডিয়া আফিসে গিয়া সংবাদ লইলাম। শুনিলাম, যে রেজিমেণ্টে ফ্রাঙ্ক আছে, তাহা এখন সীমান্ত-সমরে নিযুক্ত। এই কথা শুনিয়া অবধি মিসেস ক্লিফর্ড চিন্তান্বিত হইয়া পড়িয়াছেন।

একদিন প্রভাতে ম্যাগির নিকট হইতে একখানি পোষ্টকার্ড পাইলাম, সে লিখিয়াছে—
প্রিয় মিষ্টার গুপ্ত,

আমার মা অত্যন্ত পীড়িত। আমি আজ এক সপ্তাহ কাল কর্ম্মস্থানে যাইতে পারি নাই। আপনি যদি দয়া করিয়া একবার আসেন তবে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হইব। ম্যাগি

আমি যে পরিবারে বাস করিতাম, তাঁহাদিগের নিকট পূর্ব্বেই ম্যাগি ও তাহার জননী সম্বন্ধে গল্প করিয়াছিলাম। আজ প্রাতরাশের সময় টেবিলে এই সংবাদ উল্লেখ করিলাম।

গৃহিণী আমাকে বলিলেন, "তুমি যখন যাইবে, সঙ্গে কিছু অর্থ লইয়া যাইও। মেয়েটি এক সপ্তাহ কর্ম্ম করে নাই, বেতনও পায় নাই। তাহারা বোধ হয় অত্যন্ত কষ্টে পড়িয়াছে।"

প্রাতরাশের পর, আমি কিছু টাকা সঙ্গে লইয়া ল্যাম্বেথ যাত্রা করিলাম। তাহাদের বাড়ীতে পৌঁছিয়া দরজায় ঘা দিলাম। ম্যাগি আসিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল।

তাহার চেহারা অত্যন্ত খারাপ হইয়া গিয়াছে। চক্ষু কোটরগত। আমাকে দেখিয়াই বলিল, "Oh, thank you Mr. Gupta. It is so kind—"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "ম্যাগি, তোমার মা কেমন আছেন?"

ম্যাগি বলিল, "মা এখন নিদ্রিত। তিনি অত্যন্ত পীড়িত। ডাক্তার বলিয়াছে, ফ্রাঙ্কের সংবাদ না পাইয়া, দুশ্চিন্তায় পীড়া এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। হয় ত তিনি বাঁচিবেন না।"

আমি ম্যাগিকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলাম। নিজের রুমাল দিয়া তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিলাম।

ম্যাগি একটু সুস্থ হইয়া বলিল, "আপনার নিকট আমার একটি ভিক্ষা আছে।"

আমি বলিলাম, "কি ম্যাগি?"

"বসিবার ঘরে আসুন, বলিব।"

পাছে আমাদের পদশব্দে পীড়িতা বৃদ্ধা জাগরিত হন, তাই আমরা সাবধানে বসিবার কক্ষে গিয়া প্রবেশ করিলাম। মাঝখানে দাঁড়াইয়া সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি ম্যাগি?"

ম্যাগি আমার মুখের পানে আকুল নেত্রে কয়েক মুহূর্ত্ত চাহিয়া রহিল। আমি প্রতীক্ষা করিলাম। শেষে ম্যাগি কিছু না বলিয়া দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া নীরবে ক্রন্দন করিতে লাগিল।

আমি বড় বিপদে পড়িলাম। এ বালিকাকে আমি কি বলিয়া সান্ত্বনা দিই?—ইহার ভ্রাতা সীমান্ত-সমরে, জীবিত কি মৃত তাহা ভগবানই জানেন! পৃথিবীতে এক-মাত্র সম্বল মাতা। সেই মাতা চলিয়া গেলে, ইহার দশা কি হইবে? এই যৌবনোন্মুখী বালিকা, এই লণ্ডনে দাঁড়াইবে কোথা?

আমি জোর করিয়া ম্যাগির মুখ হইতে তাহার হস্তাবরণ খুলিয়া দিলাম। বলিলাম, "ম্যাগি, কি বলিবে বল। আমার দ্বারা যদি তোমার কিছুমাত্র উপকার হয়, তাহা করিতে আমি পরাঙ্মুখ হইব না।"

ম্যাগি বলিল, "মিঃ গুপ্ত, আমি যাহা প্রস্তাব করিব, তাহা শুনিয়া আপনি কি ভাবিবেন জানি না। তাহা যদি অত্যন্ত গর্হিত হয়, তবে আমাকে ক্ষমা করিবেন।"

"কি? কি প্রস্তাব?"

"গতকল্য সারাদিন মা খালি বলিয়াছেন, মিষ্টার গুপ্ত আসিয়া যদি সেই স্ফটিকের প্রতি কিয়ৎক্ষণ দৃষ্টি করেন, তবে হয়ত ফ্রাঙ্কের কোন সংবাদ বলিতে পারেন। তিনি ত হিন্দু বটেন।—আমি তাই আপনাকে আসিবার জন্য পত্র লিখিয়াছিলাম।"

"তুমি যদি ইচ্ছা কর, সে অঙ্গুরীয় লইয়া এস,—আমি অবশ্যই পুনর্ব্বার চেষ্টা

করিয়া দেখিব।"

ম্যাগি আকুল স্বরে বলিল, "কিন্তু এবারও যদি নিষ্ফল হয়?"

আমি ম্যাগির মনের ভাব বুঝিলাম। বুঝিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলাম।

ম্যাগি বলিল, "মিস্টার গুপ্ত, আমি পুস্তকে পড়িয়াছি, হিন্দুজাতি অত্যন্ত সত্য-পরায়ণ। আপনি যদি স্ফটিক অবলোকন করিবার পর মাকে কেবলমাত্র বলেন, ফ্রাঙ্ক ভাল আছে, জীবিত আছে—তাহা হইলে কি নিতান্ত মিথ্যা হইবে? বড় অন্যায় হইবে?"

এই কথা বলিতে বলিতে বালিকার চক্ষু দিয়া দরদর ধারায় জল পড়িতে লাগিল!

আমি কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিলাম। মনে মনে ভাবিলাম, আমি পুণ্যাত্মা নহি—এ জীবনে আমি অনেক পাপ করিয়াছি। আজ এই পাপটিও করিব। এইটিই আমার সর্ব্বাপেক্ষা লঘু পাপ হইবে।

প্রকাশ্যে বলিলাম, "ম্যাগি তুমি চুপ কর, কাঁদিও না। কই সে অঙ্গুরীয়, দাও একবার ভাল করিয়া দেখি। যদি কিছু দেখিতে না পাই, তবে তুমি যেরূপ বলিতেছ সেইরূপই করিব। তাহা যদি অন্যায় হয়, ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করিবেন।"

ম্যাগি আমাকে অঙ্গুরীয় আনিয়া দিল। আমি সেটি হাতে লইয়া তাহাকে বলিলাম, "যাও তুমি দেখ তোমার মা জাগিয়াছেন কি না।"

প্রায় পনেরো মিনিট পরে ম্যাগি ফিরিয়া আসিল। বলিল মা জাগিয়াছেন। আপনার আগমন সংবাদ তাঁহাকে দিয়াছি।"

"আমি এখন গিয়া তাঁহাকে দেখিতে পারি?"

"আসুন।"

বৃদ্ধার রোগশয্যার নিকট উপস্থিত হইলাম। আমার হস্তে তখনও সেই অঙ্গুরীয়। তাঁহাকে সুপ্রভাত জানাইয়া বলিলাম—"মিসেস ক্লিফর্ড, আপনার পুত্র ভাল আছে, জীবিত আছে।"

এই কথা শুনিবামাত্র বৃদ্ধা তাঁহার উপাধান হইতে মস্তক কিঞ্চিৎ উত্তোলন করিলেন। বলিলেন, "আপনি স্ফটিকে ইহা দেখিলেন কি?"

আমি অসঙ্কোচে বলিলাম "হাঁ মিসেস ক্লিফর্ড, আমি স্ফটিকেই ইহা দেখিলাম।"

বৃদ্ধার মস্তক আবার উপাধানের সহিত মিলিত হইল। তাঁহার চক্ষুযুগল হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি শুধু অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিলেন, 'God bless you—God bless you.'

মিসেস ক্লিফর্ড সে যাত্রা আরোগ্যলাভ করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আমার দেশে ফিরিয়া আসিবার সময় ঘনাইয়া আসিল। একবার ইচ্ছা হইল ল্যাম্বেথে গিয়া ম্যাগি ও তাহার জননীর নিকট বিদায়গ্রহণ করিয়া আসি। কিন্তু সে পরিবার এখন শোকসন্তপ্ত। সীমান্ত-যুদ্ধে ফ্রাঙ্ক নিহত হইয়াছে। মাসখানেক হইল, কালো বর্ডার দেওয়া চিঠিতে ম্যাগিই এ সংবাদ আমাকে লিখিয়াছে। হিসাব করিয়া দেখিলাম, যে সময় আমি মিসেস ক্লিফর্ডকে বলিয়াছিলাম তাঁহার পুত্র ভাল আছে, জীবিত আছে,—তাহার পূর্ব্বেই ফ্রাঙ্কের মৃত্যু হইয়াছে। এই সকল কারণে মিসেস ক্লিফর্ডের নিকট আমার আর মুখ দেখাইতে লজ্জা করিতে লাগিল। তাই আমি একখানি পত্র লিখিয়া, ম্যাগি ও তাহার মাতার নিকট বিদায় বার্ত্তা জানাইলাম।

ক্রমে লন্ডনে আমার শেষ রজনী প্রভাত হইল। আমি অদ্য দেশযাত্রা করিব। পরি-বারস্থ সকলের সঙ্গে প্রাতরাশে বসিয়াছি, এমন সময় বহির্দ্বারে শব্দ উত্থিত হইল।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে দাসী আসিয়া বলিল "Please Mr. Gupta, মিস ক্লিফর্ড

আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।"

আমার প্রাতরাশ তখনও শেষ হয় নাই। বুঝিলাম ম্যাগি আমার নিকট বিদায়গ্রহণ করিতে আসিয়াছে। পাছে তাহার কর্ম্মস্থানে যাইতে বিলম্ব হইয়া যায়, তাই আমি তখনই গৃহকর্ত্রীর অনুমতি লইয়া টেবিল ছাড়িয়া উঠিলাম। হলে গিয়া দেখিলাম, কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদে দেহ আবৃত করিয়া ম্যাগি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

নিকটেই পারিবারিক লাইব্রেরী ছিল, তাহার মধ্যে ম্যাগিকে লইয়া গিয়া বসাইলাম।

ম্যাগি বলিল, "আপনি আজ চলিলেন?"

"হাঁ ম্যাগি, আজই আমার যাত্রা করিবার দিন।"

"দেশে পৌঁছিতে আপনার কয়দিন লাগিবে?"

"দুই সপ্তাহের কিঞ্চিৎ অধিক লাগিবে।"

"কোন স্থানে আপনি থাকিবেন?"

"আমি পঞ্জাব সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করিয়াছি। কোন্ স্থানে আমাকে থাকিতে হইবে, সেখানে না পৌঁছিলে জানা যাইবে না।"

"সেখান হইতে সীমান্ত কি অনেক দূর?" "না, অধিক দূরে নহে।"

"দেরা-গাজীখাঁর নিকট ফোর্ট মন্‌রোতে ফ্রাঙ্কের সমাধি আছে।"—কথাগুলি বলিতে বলিতে বালিকার চক্ষু দুইটি ছল ছল করিল।

বলিলাম, "আমি যখন ওদিকে যাইব, তখন অবশ্যই তোমার ভ্রাতার সমাধি দর্শন করিয়া, তোমায় পত্র লিখিব।"

ম্যাগি বলিল, "কিন্তু আপনার কষ্ট ও অসুবিধা হইবে না?"

"কি কষ্ট? কি অসুবিধা? আমি যেখানে থাকিব, সেখান হইতে দেরা-গাজীখাঁ ত অধিক দূর হইবে না। আমি নিশ্চয়ই একবার সুবিধা মত গিয়া, তোমায় পরে সব জানাইব।'

ম্যাগির মুখখানি কৃতজ্ঞতার পূর্ণ হইয়া উঠিল। সে আমাকে ধন্যবাদ দিল,—তাহার কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায়। নিজের পকেট হইতে একটি শিলিং বাহির করিয়া, আমার সম্মুখে টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল, 'আপনি যখন যাইবেন, তখন অনুগ্রহ করিয়া এক শিলিং দিয়া কিছু ফুল ক্রয় করিয়া, আমার ভ্রাতার সমাধির উপর সাজাইয়া আসিবেন।"

ভাবের আবেগে আমি চক্ষু নত করিয়া রহিলাম।

ভাবিলাম, বালিকার এই বহু কষ্টার্জ্জিত শিলিংটি ফিরাইয়া দিই। বলি, আমাদের দেশে ফুল যেখানে সেখানে অজস্র পরিমাণে পাওয়া যায়, পয়সা দিয়া কিনিতে হয় না।

কিন্তু আবার ভাবিলাম। এই যে ত্যাগের সুখটুকু, ইহা হইতে বালিকাকে বঞ্চিত করি কেন? এই যে বহু শ্রমলব্ধ শিলিংটি, ইহার দ্বারা বালিকা যেটুকু সুখ স্বচ্ছন্দতা ক্রয় করিতে পারিত, প্রেমের নামে সে তাহা ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছে। সে ত্যাগের সুখটুকু মহামূল্য—সে সুখটুক লাভ করিলে উহার বিরহতপ্ত হৃদয় কিয়ৎ পরিমাণে শীতল হইবে। তাহা হইতে বালিকাকে বঞ্চিত করিয়া ফল কি?—এই ভাবিয়া আমি সেই শিলিংটি উঠাইয়া লইলাম।

বলিলাম, "ম্যাগি, আমি এই শিলিং দিয়া ফুল কিনিয়া, তোমার ভ্রাতার সমাধির উপর সাজাইয়া দিব।"

ম্যাগি উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "আমি আর আপনাকে কি বলিয়া ধন্যবাদ দিব? আমার কর্ম্মস্থানে যাইবার বেলা হইল। Good bye;—পত্রাদি যেন পাই।"

আমি উঠিয়া ম্যাগির হস্তখানি নিজহস্তে লইলাম। বলিলাম—"Good bye Maggie—God bless you";—বলিয়া তাহার হাতখানি স্বীয় ওষ্ঠের নিকট তুলিয়া তাহাতে একটি চুম্বন করিলাম।

ম্যাগি চলিয়া গেল।

চক্ষের দুই ফোঁটা জল রুমালে মুছিয়া, বাক্স-তোরঙ্গ গোছাইতে উপরে উঠিয়া গেলাম।

[ভাদ্র ১৩১১]

পুনর্মূষিক

প্রথম পরিচ্ছেদ

গ্রীষ্মকাল। বারীন্দ্রনাথের সান্ধ্যভোজন শেষ হইয়া গিয়াছে—আটটা বাজিয়াছে—কিন্তু এখনও লণ্ডনে সুস্পষ্ট দিবালোক। জুন মাসে রাত্রি নয়টার পূর্ব্বে অন্ধকার হয় না।

বারীন্দ্রনাথ বেজ্‌ওয়াটারে থাকিত আইন পড়িত—অন্ততঃ আইন পড়িবার জন্যই তাহার খুড়া মহাশয় তাহাকে বিলাতে পাঠাইযাছিলেন। সে দুই বৎসর আসিয়াছে,—কিন্তু এখনও কোনও পুস্তকাদি ক্রয় করিবার কিম্বা আইনের বক্তৃতা শুনিবার সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই। সম্প্রতি সে একটি ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। এবার দেশ হইতে টাকা আসিলেই সে দুই একখানি আইনের বহি ক্রয় করিবে এবং গ্রীষ্মের বন্ধের পর টার্ম আরম্ভ হইলেই রীতিমত লেক্‌চর শুনিতে যাইবে। অধিক কি, সে আজ দুই সপ্তাহে কোনও থিয়েটারে যায় নাই এবং গত রবিবার মিস ম্যানিংয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছে।

ল্যাণ্ডলেডি আসিযা টেবিল পরিষ্কার করিতে লাগিল। সিগারেট মুখে বারীন্দ্র বলিল—"মিসেস ব্রাউন।

"কি মহাশয়?"

"আমাকে দশ শিলিং ধার দিতে পার?"

এপ্রন-বস্ত্রে হাত মুছিতে মুছিতে মিসেস ব্রাউন বলিল, দশ শিলিং? মিষ্টার চাটার্জ্জি, আমি বড় দুঃখিত হইলাম। আমার কাছে ত নাই। তিন সপ্তাহ আপনার বিল বাকী পড়িয়া গিয়াছে—সেই জন্য আমাকে অনেক কষ্টে চালাইতে হইতেছে। দুধওয়ালা দাম লইতে আসিয়াছিল, তিনবার ফিরাইয়া দিযাছি। মাংসবিক্রেতাকে—"

বারীন্দ্র বাধা বলিল, "মিসেস ব্রাউন।"

"মহাশয়?

"ও সব আমাকে বলিযা কোন ফল আছে কি? দেখ, আগামী সপ্তাহে দেশ হইতে আমার টাকা আসিবে। কুড়ি পাউণ্ড আসিবে, এক আধ টাকা নয়। তোমার বিশ্বাস না হয়, এই দেখ আমার বাড়ীর চিঠি।"

বলিযা, পকেট হইতে একখানা বাঙ্গালা চিঠি বাহির করিয়া বারীন্দ্র সগর্ব্বে মিসেস ব্রাউনের সম্মুখে ফেলিয়া দিল। তাহার পর মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

মিসেস ব্রাউন পত্রখানা লইয়া আলোকের নিকট ধরিয়া উল্‌টিয়া পাল্‌টিয়া দুই মিনিট কাল নিরীক্ষণ করিল। শেষে বলিল, "এ কোন্ ভাষা মহাশয়?"

"কোন্ ভাষা কি? বাঙ্গালা—বাঙ্গলা—পড়িতে পারিতেছ না?"

"বাঙ্গলা? Dear me!—তা, আমি কি বাঙ্গলা জানি মহাশয়?"

"বাঙ্গলা জান না?"

"না মিষ্টার চাটার্জ্জি।"

"I see—আমি মনে করিতাম তুমি বাঙ্গলা জান বুঝি। আচ্ছা, সেই স্থানটা তোমায় অনুবাদ করিয়া শুনাইতেছি।"

বলিয়া, বারীন্দ্র উঠিয়া ল্যাণ্ডলেডির নিকট গেল। পত্রখানি হাতে লইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিয়া বলিল, "এই দেখ—এই লেখা রহিয়াছে—'এখানে অত্যন্ত গরম পড়িয়াছে।

ষয়ফের সের এক টাকা করিয়া।'—দেখিতেছ ত?"

মিসেস ব্রাউন সংশয়ের সহিত বলিল, "দেখিতেছি বটে।"

বারীন্দ্র বলিল, "ইহার অনুবাদ—I am sending you twenty pounds next week—দেখ, এখন বিশ্বাস হইল ত? যাও, তোমার কাছে না থাকে, তোমার স্বামীর নিকট হইতে ধার করিয়া আনিয়া দাও। আগামী সপ্তাহে দিব্য একখানি ভারি গোছের চেক পাইবে।"

মিসেস ব্রাউন কিঞ্চিৎ চিন্তা করিল। শেষে বলিল, "এখনই চাই কি? কাল সকালে দিলে হইবে না?"

বারীন্দ্র প্রবলভাবে মস্তক নাড়িয়া বলিল, "The idea! দেখ, আজ রাত্রি নয়টার সময় মিস্ ম্যানিংয়ের Soiree-তে আমার নিমন্ত্রণ আছে। আমি কি সান্ধ্যবেশ পরিয়া, সাধারণ লোকের মত অমনিবসে আরোহণ করিয়া যাইব? আমার ক্যাব চাই।"

"কোথায় যাইবেন মহাশয়?"

"মিস্ ম্যানিংয়ের 'Soiree'-তে। 'Soiree' কাহাকে বলে জান?"

"কখনও শুনি নাই ত।"

"ঈভনিং পার্টি শুনিয়াছ? সেই তাই। ফরাসী ভাষায় 'সোয়ারি' বলে।"

সবিস্ময়ে মিসেস ব্রাউন বলিল, "Dear me!"

"যাও যাও যাও। আমি ততক্ষণ সান্ধ্যবেশ পরিধান করিয়া আসি।"

"আচ্ছা যাই।"

"আর, আমার এই বসিবার ঘরে খানকতক বিস্কুট আর একটু হুইস্কি রাখিয়া দিও; সেখানে সুন্দরী মহিলাগণের সহিত প্রেমালাপ করিয়া আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া আসিব। আমার অত্যন্ত ক্ষুধা পাইবে; বুঝিলে?"

"আচ্ছা, রাখিয়া দিব এখন।"

মিসেস ব্রাউন অন্তর্হিত হইয়া গেল। বারীন্দ্রও গুণগুণ স্বরে গান করিতে করিতে সান্ধ্যবেশ পরিধান করিবার জন্য নিজ শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাত্রি নয়টার পর, বারীন্দ্রনাথের ক্যাব্ আসিয়া ইম্পীরিয়ল ইন্‌ষ্টিটিউটের সম্মুখে দাঁড়াইল।

ইহা একটি প্রকাণ্ড বৃহৎ অট্টালিকা। ইহার বহু বিভাগ আছে, অনেক হল আছে। "জাহাঙ্গীর হলে" মিস্ ম্যানিংয়ের সান্ধ্যমিলন-সভা সমবেত। মিস্ ম্যানিং মাঝে মাঝে এইরূপ মিলন-সভা আহ্বান করিয়া থাকেন। লণ্ডন-প্রবাসী সকল ভারতবর্ষীয়গণেরই নিমন্ত্রণ হয়। বহুসংখ্যক ভারতহিতৈষী স্বদেশবাসী পুরুষ ও মহিলারও নিমন্ত্রণ হইয়া থাকে। কিছু আমোদ প্রমোদেরও বন্দোবস্ত থাকে। এই সভার উদ্দেশ্য, ভারতবর্ষীয়-গণের সহিত তত্রত্য বিশিষ্ট সমাজের পরিচয় সাধন করিয়া দেওয়া।

ক্যাব্ হইতে অবতরণ করিয়া বারীন্দ্রনাথ উপরে উঠিয়া গেল। সিঁড়ি হইতেই আলোকের উচ্ছ্বাস তাহার দৃষ্টিগোচর হইল। নর-নারীর মৃদু-আলাপের গুঞ্জনধ্বনিও তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। ভিতরে গিয়া দেখিল. সেই সুপ্রশস্ত হল বহুজনাকীর্ণ। মহিলাগণের পরিচ্ছদের পারিপাট্য নয়নলোভনীয়। দেখিল, একস্থানে একজন ভারতবর্ষীয় মহারাজা, প্রাচ্যবেশে সুসজ্জিত হইয়া কয়েকটি পুরুষ ও মহিলার সহিত সদালাপ করিতে-ছেন। অন্যত্র, ভারতবর্ষের একজন অবসরপ্রাপ্ত লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণর, একটি পার্সী ভদ্র-লোক ও তাঁহার স্ত্রীর সহিত হাস্যালাপে নিযুক্ত। অধিকাংশ লোকই দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছেন—ইতস্ততঃ পদচারণা করিয়াও বেড়াইতেছেন। এখানে ওখানে কয়েকখানি মখমলমণ্ডিত দীর্ঘাসনও রহিয়াছে—কেহ কেহ সেখানে গিয়াও বসিতেছেন।

বারীন্দ্র প্রবেশ করিয়া প্রথমে মিস ম্যানিংকে অন্বেষণ করিতে লাগিল। কিয়ৎপরে, হলের এক স্থানে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া, তাঁহার নিকট গিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল। মিস্ ম্যানিংয়ের পরিধানে একটি কৃষ্ণবর্ণ মহার্ঘ পরিচ্ছদ। তাঁহার মুখমণ্ডল প্রশান্ত, প্রফুল্ল ও হাস্যোদ্ভাসিত। তাঁহার শুভ্র কেশগুচ্ছ বিদ্যুতের আলোকে অপূর্ব্ব শোভাযুক্ত।

বারীন্দ্রের সহিত করমর্দ্দন করিয়া তিনি বলিলেন, "তুমি আসিয়াছ দেখিয়া সুখী হইয়াছি।" আরও দুই চারিটি এইরূপ স্নেহগর্ভ সম্ভাষণ করিয়া তিনি বারীন্দ্রকে কয়েকটি পুরুষ ও মহিলার সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন।

বারীন্দ্র দাঁড়াইয়া তাঁহাদের সঙ্গে কয়েক মিনিট আলাপ করিল। এমন সময় হলের এক প্রান্তে বেহালার শব্দ উত্থিত হইল। একজন ইংরাজ মহিলা, সার এড্উইন আর্ণল্ড রচিত একটি ভারতবর্ষীয় কবিতার অনুবাদ সুরসংযোগে গান করিলেন।

ইতস্ততঃ পদচারণা করিতে করিতে বারীন্দ্র দেখিল তাহার একটি বন্ধু, ভুবনচন্দ্র দত্ত. একজন বর্ষীয়সী ইংরাজ মহিলার সহিত আলাপ করিতেছে। বারীন্দ্রকে দেখিয়া সে তৎক্ষণাৎ তাহাকে মহিলাটির নিকট পরিচিত করিয়া দিল, "মিষ্টার চাটার্জ্জি—মিস্ টেম্পল।"

মিস্ টেম্পল একটি দীর্ঘাসনে বসিয়া ছিলেন। তিনি বারীন্দ্রকে বলিলেন, "আসুন, —আমার কাছে উপবেশন করুন।"

বারীন্দ্র উপবেশন করিয়া বলিল, "আপনি কতক্ষণ আসিয়াছেন?"

"আমি আসিয়াছি আধ ঘণ্টা হইবে। আপনার নামটি কি ভাল শুনিতে পাইলাম না।"

বারীন্দ্র বলিল, "আমার নাম চাটার্জ্জি।"

"চাটার্জ্জি? চাটার্জ্জি? চ্যাটোপাডিয়া? আপনি ব্রাহ্মণ?"

"তাহাই বটে। আপনি সব জানেন দেখিতেছি।"—বলিয়া বারীন্দ্রনাথ হাস্য করিল।

মিস্ টেম্পল তাহার কৌতুকহাস্য মোটেই লক্ষ্য না করিয়া, স্বীয় যুগ্মহস্ত প্রাচ্যভাবে ললাটের নিকট উত্তোলন করিয়া বলিলেন, "নমস্কার।"

হাসিতে হাসিতে বারীন্দ্রনাথও বলিল, "নমস্কার—নমস্কার! আপনি এ সব শিখিলেন কোথা?"

ভুবন দত্ত বলিল, "মিস্ টেম্পল যে সম্প্রতি ভারতভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন।"

বারীন্দ্র বলিল. "Oh, how interesting! কতদিন আপনি ভারতবর্ষে ছিলেন?"

"ছয় মাস।" "আপনার এই সময় আমোদে কাটিয়াছিল ত?"

বৃদ্ধা গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আমি আমোদ করিতে যাই নাই। শিক্ষা করিতে গিয়াছিলাম।"

মিস্ টেম্পলের এই ভাব দেখিয়া ও এই কথা শুনিয়া বারীন্দ্র মনে মনে কিঞ্চিৎ কৌতুক অনুভব করিল। কিন্তু মৌখিক গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া বলিল, "আমি শুনিয়া সুখী হইলাম। এদেশের অধিকাংশ লোকেই আমোদের উদ্দেশ্যে ভারতভ্রমণ করিতে যান। ভারতবর্ষের বহুসহস্র বৎসরের জ্ঞান গরিমার সন্ধান তাঁহারা পান না!"

মিস্ টেম্পল বলিলেন, "আপনি যথার্থ বলিয়াছেন। আমার সৌভাগ্যবশতঃ দুই চারিটি মহাত্মার সহিত সেখানে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যা তাঁহাদের মুখে শুনিয়া আমি ধন্য হইয়া আসিয়াছি।"

বারীন্দ্র পরম ধার্ম্মিক সাজিয়া বলিল, "হিন্দুধর্ম্ম জগতের শীর্ষস্থানীয় ধর্ম্ম। হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃত সাহিত্য—এই দুইটিই আমাদের চিরগৌরবের বিষয়।"

মিস্ টেম্পল বলিলেন, "আপনি কি সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছেন?"

"সামান্য!"

"আমি সংস্কৃত শ্লোক শুনিয়াছি। সে ধ্বনি যেমন মধুর তেমনই গম্ভীর। আপনি

দুই একটি সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করুন না।"

বারীন্দ্র বলিল, "আচ্ছা, শ্রবণ করুন—

কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ
শাপেনাস্তংগমিতমহিমা বর্ষভোগ্যেন ভর্তুঃ।
যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু
স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্য্যাশ্রমেষু॥"

বলিয়া বারীন্দ্র নিস্তব্ধ হইল।

মিস্ টেম্পল বলিলেন, "কি সুন্দর! কি সুন্দর! মিঃ চাটার্জ্জি, এ শ্লোকটি কি কোনও ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে আবৃত্তি করিলেন?"

বারীন্দ্র তাহার সঙ্গী ভুবন দত্তের প্রতি চাহিয়া, একটু হাস্য করিয়া বলিল, "ঠিক ধর্ম্মগ্রন্থ বলিতে পারি না। ইহা দর্শনশাস্ত্রসম্বন্ধীয় একটি গ্রন্থের প্রথম শ্লোক।"

মিস্ টেম্পল উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, "বটে! বটে! এ শ্লোকের ভাবার্থটি কি?"

পূর্ব্ববৎ গম্ভীরভাবে বারীন্দ্র বলিল, "ইহার ভাবার্থটি অত্যন্ত দুরূহ। এক কথায় বুঝাইয়া বলা অসম্ভব। তবে আত্মার অবিনশ্বরত্ব-প্রতিপাদক দুই একটি যুক্তি ইহাতে আছে।"

"গ্রন্থখানির নাম কি মিস্টার চাটার্জ্জি?" "মেঘদূত।"

মিস্ টেম্পল তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "মেঘা দূটা? By কালি ডাসা?"

কথা কয়েকটি শুনিবামাত্র বারীন্দ্রের মুখ শুকাইয়া গেল। সে মনে মনে প্রমাদ গণিল। ভাবিল, তবে বোধ হয় মিস্ টেম্পল সংস্কৃতে অভিজ্ঞা—মেঘদূত কোনও সময়ে পাঠ করিয়া থাকিবেন—তাহার সকল চালাকি ধরা পড়িয়া গিয়াছে।

অবস্থা দেখিয়া বারীন্দ্রকে একা ফেলিয়া ভুবন দত্ত চট্ করিয়া সরিয়া পড়িল।

এদিকে তৎক্ষণাৎ উত্তর না দিলেই নয়! বারীন্দ্র বলিল, "হাঁ, কালিদাস প্রণীত মেঘদূতই বটে।"

মিস্ টেম্পল বলিলেন, "আহা, আমি যদি সংস্কৃত জানিতাম! ঐ গ্রন্থ যদি পাঠ করিতে পারিতাম!"

শুনিয়া বারীন্দ্র হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। বুঝিল, বিপদাশঙ্কা অমূলক।

মিস্ টেম্পল বলিতে লাগিলেন, "আমি মনে করিতাম মেঘদূত একখানি কাব্যগ্রন্থ।"

বারীন্দ্র উৎসাহের সহিত বলিল, "হাঁ মিস্ টেম্পল, উহা কাব্যগ্রন্থও বটে। উচ্চ অঙ্গের কাব্যমাত্রই দর্শন। আর সুন্দর দার্শনিকতত্ত্বমাত্রই কবিতা।"

এই সময় হলের অপর প্রান্তে টুং টাং করিয়া পিয়ানো বাজিয়া উঠিল। একটি ভদ্রলোক গান ধরিলেন।

গান শেষ হইলে বারীন্দ্র মিস্ টেম্পলকে বলিল, "আপনাকে বড় ক্লান্ত দেখাইতেছে। আপনাকে কিছু পানীয় আনিয়া দিব কি?"

মিস্ টেম্পল বলিলেন, "চলুন, আমি আপনার সঙ্গেই যাইতেছি।"

বারীন্দ্র স্বীয় বাহুতে তাঁহার বাহু সম্বদ্ধ করিয়া, যে কক্ষে জলযোগের ব্যবস্থা ছিল সেখানে লইয়া গেল।

সেখানে কতিপয় মহিলা চা, কাফি প্রভৃতি পান করিতেছেন। তাঁহাদের সহচর পুরুষগণ তাঁহাদের সেবায় ব্যস্ত।

বারীন্দ্র মিস্ টেম্পলকে একটি আসনে উপবেশন করাইয়া বলিল, "আপনাকে কি আনিয়া দিব? চা না কাফি?"

মিস্ টেম্পল বলিলেন, "বড় গরম। ঠাণ্ডা কিছু আনিয়া দিন।"

"ক্লারেট্ কপ্?"

"না না। উহাতে মাদকদ্রব্য মিশ্রিত আছে। আমি ভারতবর্ষ হইতে ফিরিয়া অবধি

আর ওসব স্পর্শ করি না।"

মনে মনে হাসিয়া প্রকাশ্যে বারীন্দ্র বলিল, "তবে একটু হোম্ মেড্ লেমনেড ?"**

"ধন্যবাদ।"

মিস্ টেম্পলকে শীতল করিয়া, বারীন্দ্র তাঁহাকে পুনশ্চ হলে ফিরাইয়া আনিল। মিস্ টেম্পল বলিলেন, "আজ রাত্রি হইয়াছে, আমি গৃহে চলিলাম। আপনার সহিত আলাপ

* ক্লারেটমিশ্রিত এক প্রকার সরবতের নাম Claret cup.

** গ্যাসবিহীন লেমনেডের নাম Home made lemonade.

করিয়া সুখী হইলাম। আপনি মাঝে মাঝে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন। এই লউন আমার কার্ড।"

বারীন্দ্র তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইয়া, নিজের কার্ড একখানি দিল। বলিল, "আপনি কি একা আসিয়াছেন ?"

"হাঁ।"

"আমি নীচে আপনাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া আসিতে পারি কি ?"

"না—ধন্যবাদ। আপনি কষ্ট করিবেন না।"

"কষ্ট কি ? আমার তাহা অত্যন্ত আনন্দের কারণ হইবে।"

"বহু ধন্যবাদ। আচ্ছা, তবে আসুন।"

বারীন্দ্র ভাবিয়াছিল, একটা ভাড়াটিয়া ক্যাব ডাকিয়া মিস্ টেম্পলকে উঠাইয়া দিবে। অবতরণ করিয়া রাস্তায় পৌঁছিয়া দেখিল, একটি প্রকাণ্ড নিজস্ব জুড়ীগাড়ী মিস্ টেম্পলের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। দেখিয়া বারীন্দ্রের মন বিস্ময়ে ও সম্ভ্রমে আপ্লুত হইয়া উঠিল, কারণ লণ্ডনে যে সে লোক এরূপ গাড়ী ব্যবহার করিতে সমর্থ হয় না।

গাড়ীতে উঠিবার সময় মিস্ টেম্পল বলিলেন, "কাল অপরাহ্নে আপনার কোথাও কোন কায আছে কি ?"

"না।"

"তবে কাল আসিয়া আমার সহিত চা পান করিবেন ?"

"ধন্যবাদ। অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত।"

বারীন্দ্রকে শুভরাত্রি ইচ্ছা করিয়া মিস্ টেম্পল গাড়ীতে উঠিলেন। নিমেষের মধ্যে গাড়ী অদৃশ্য হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রাতরাশের পর বারীন্দ্রের ল্যান্ডলেডি তাহাকে বলিল, "গতরাত্রে সেখানে আপনার আনন্দে কাটিয়াছিল ত মহাশয় ?"

একটু মজা করিবার অভিপ্রায়ে, বারীন্দ্র একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "হাঁ মিসেস ব্রাউন।"

ল্যান্ডলেডি বলিল, "অমন নিঃশ্বাস ফেলিলেন যে ?"

ভণ্ডামি করিয়া বারীন্দ্র বলিল, "মিসেস ব্রাউন, আমার অবস্থা বড় সঙ্কটাপন্ন।"

"কেন, কি হইয়াছে ?"

"গতরাত্রে আমি প্রেমে পড়িয়া গিয়াছি।"

ল্যান্ডলেডি উচ্চহাস্য করিল। বলিল, "ভাল ভাল, সে ত সুখের কথা। মেয়েটি কি অত্যন্ত সুন্দরী ?"

"হাঁ মিসেস ব্রাউন, মারাত্মক রকম সুন্দরী।"

"How interesting। বলুন মহাশয়, সব কথা আমাকে বলুন।"

"কি বলিব ? কথা খুঁজিয়া পাই না।"

মিসেস ব্রাউন মৃদুহাস্য করিয়া বলিল, "প্রথম প্রণয়ের সময় ঐরূপই হয় বটে।"

বারীন্দ্র চেয়ারে উচ্চ হইয়া বসিয়া বলিল, "মিসেস ব্রাউন, তোমার সঙ্গে কেহ কখনও প্রেমে পড়িয়াছিল ?"

মিসেস ব্রাউন রুষ্ট হইয়া বলিল, "কেন মহাশয়? আমি কি কাহারও প্রণয় উদ্রেক করিবার উপযুক্ত নহি ?"

"না না, তা বলিতেছি না। শুধু জিজ্ঞাসা করিতেছি, রাগ কর কেন ?"

"কেহ যদি আমার সঙ্গে প্রণয়ে পড়ে নাই, তবে আমার বিবাহ হইল কেমন করিয়া মহাশয় ?"

"তাও ত বটে। তুমি যে বিবাহিতা রমণী, আমি তাহা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। তোমায় দেখিলে ত গিন্নীবান্নী বলিয়া মনে হয় না।"

মনে মনে খুসী হইয়া মিসেস ব্রাউন বলিল, "আপনি যথার্থ বলিয়াছেন। আমাকে কেহ কেহ বলে৷ বটে যে, আমার আসল বয়স অপেক্ষা আমাকে অনেক ছোট দেখায়। আচ্ছা আমার বয়স কত আপনি বলুন ত।"

মিসেস ব্রাউনের বয়স যে পঞ্চাশৎ বর্ষের উপরে উঠিয়াছে, সে বিষয়ে কোনও দর্শকের ভ্রান্তি হইবারই সম্ভাবনা নাই। বারীন্দ্র রঙ্গ দেখিবার জন্য বলিল, "কত? ত্রিশ ?"

মিসেস ব্রাউনের মুখ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বলিল, "না, কিছু বেশী হইয়াছে। আপনার প্রণয়িণীর নাম কি মহাশয় ?"

"মিস্ টেম্পল।"

"আপনার প্রতি তাঁহার কিরূপ ভাব ?"

"কি জানি, তাহা ত বলিতে পারি না, তবে তিনি আজ আমায় চা পান করিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।"

"বেশ বেশ। I wish you a happy afternoon"—বলিয়া ল্যান্ডলেডি প্রস্থান করিল।

পাইপ মুখে করিয়া বারীন্দ্র ভাবিতে লাগিল। গতকল্য তাহার মেঘদূতের শ্লোক লইয়া কি বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিয়া হাসি পাইল। আর যাহাই হউক, মিস্ টেম্পল লোকটি যথেষ্ট অদ্ভুত বটে। আজ ঘণ্টা দুই আগে বাহির হইয়া, ব্রিটিশ মিউজিয়ম হইতে গোটাকতক "আসল" ধর্ম্মশাস্ত্রের সংস্কৃত শ্লোক মুখস্থ করিয়া লইয়া যাইবে। যোগশাস্ত্র সম্বন্ধেও দুই চারিটা বোল সংগ্রহ করিয়া লইয়া গিয়া মিস্ টেম্পলকে অভিভূত করিয়া ফেলিবে।

বেলা চারিটা বাজিলে, ব্রিটিশ মিউজিয়ম হইতে বাহির হইয়া, ক্যাব লইয়া, বারীন্দ্র মিস্ টেম্পলের গৃহে উপস্থিত হইল। বাড়ীটি পোর্টল্যান্ড প্লেসে অবস্থিত। এখানে অনেক ধনবান ব্যক্তি বাস করেন।

বারীন্দ্র ড্রইংরুমে প্রবেশ করিয়া কয়েক মিনিট অপেক্ষা করিল। ক্রমে মিস্ টেম্পল প্রবেশ করিয়া প্রাচ্য প্রথায় তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন।

মিস্ টেম্পল বসিয়া বলিলেন, "দেওয়ালে ঐ ছবিখানি দেখিতেছেন? উনি আমার গুরু।"

বারীন্দ্র দেখিল, মুদ্রিতনেত্রে যোগাসনস্থ অর্দ্ধনগ্নকলেবর একটি বাঙ্গালী মূর্ত্তি। নিম্নে ইংরাজি ও সংস্কৃত ভাষায় লেখা রহিয়াছে—"স্বামী যোগানন্দ।"

যোগশাস্ত্র সম্বন্ধে কথা পাড়িয়া, নিজ সদ্য উপার্জ্জিত বিদ্যা প্রকাশ করিয়া বারীন্দ্র মিস্ টেম্পলকে চমৎকৃত করিয়া দিল। শেষে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি স্বামীজির নিকট যোগশাস্ত্র সম্বন্ধে কোন উপদেশ লইয়াছেন কি ?"

"না, কারণ অভ্যাস করিবার অধিকার আমার এখন নাই। স্বামীজি বলিয়াছেন, তিন বৎসরকাল নিরামিষ ভোজন করিয়া শুদ্ধাচারে থাকিয়া আবার ভারতবর্ষে গেলে, আমাকে তিনি শিখাইবেন। তিনি আমাকে প্রত্যহ গঙ্গাজল পান করিতে বলিয়াছিলেন—কিন্ত

এখানে পাইব কোথায়? আমি অত্যন্ত বিশুদ্ধ ও পরিস্কৃত জল এখানে পান করিয়া থাকি, তাহাতে কোনও আধ্যাত্মিক অপকার না হইতে পারে।"

বারীন্দ্র গম্ভীর ভাবে বলিল, "গঙ্গাজলের মাহাত্ম্য অতি অসাধারণ। আপনি Mark Twain-এর More Tramps Abroad পুস্তক পাঠ করিয়াছেন?"

"সে পুস্তকে Mark Twain ভারতবর্ষে নিজের ভ্রমণ বর্ণনা করিয়াছেন। বারাণসীতে একটি ইউরোপীয় সিভিল সার্জ্জেনের সহিত তাঁহার দেখা হইয়াছিল। ডাক্তার সাহেব Mark Twain-কে গঙ্গাজল সম্বন্ধীয় একটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার বিষয় বলিয়াছিলেন, তাহা অত্যন্ত বিস্ময়জনক।"

মিস্ টেম্পল কৌতূহলে উদ্‌গ্রীব হইয়া বলিলেন, "কি রকম?"

"লেখা আছে, ঐ ডাক্তার এক সময়ে একটা পাত্রে গঙ্গাজল ও অন্য পাত্রে কূপজল লইয়া একটা পরীক্ষা করিয়াছিলেন। প্রত্যেক পাত্রের মধ্যে কিছু কিছু কলেরার জীবাণু নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন। ৪৮ ঘণ্টা পরে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, গঙ্গাজলে নিক্ষিপ্ত সমস্ত জীবাণু মরিয়া গিয়াছে, কূপজলের জীবাণুগুলি বহুসহস্রগুণ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে।"

ইহা শুনিয়া মিস্ টেম্পল অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। আরও দুই চারিটা সংস্কৃত শ্লোক এবং গল্প বলিয়া বারীন্দ্র তাঁহাকে একবারে আত্মহারা করিয়া ফেলিল।

ছয়টা বাজিল, বারীন্দ্র বিদায় গ্রহণ করিবার জন্য উঠিল। মিস্ টেম্পল বলিলেন, "আগামী শনিবার সন্ধ্যায় আপনার কোনও কার্য্য আছে কি?"

"না।"

"তবে, সেদিন আসিয়া আমার সঙ্গে ডিনার খাইবেন?"

"ধন্যবাদ। অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত আসিব।"

"আমি কিন্তু নিরামিষভোজী। আপনি মাংসভোজন করেন?

"করি বটে।"

"তবে ত আপনার কষ্ট হইবে।"

"না মিস্ টেম্পল, আমার কোন কষ্ট হইবে না। আমার হিন্দুসংস্কার নিরামিষ ভোজনেরই পক্ষপাতী। তবে এ দেশে আসিয়া স্বাস্থ্যের অনুরোধে মাংসভোজন করিতে হয়।"

মিস্ টেম্পল উত্তেজিতভাবে বলিলেন, "ভুল। মহা ভুল। মাংসভোজন না করিলে এ দেশে স্বাস্থ্যরক্ষা হয় না, ইহা একটি কুসংস্কার মাত্র। এই দেখুন, আমি ভারতবর্ষ হইতে ফিরিয়া অবধি আজ ছয় মাসকাল নিরামিষ ভোজন করিতেছি। আমার কি স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়াছে?"

বারীন্দ্র বিস্ময়ের ভাণ করিয়া কহিল, "বলেন কি! তবে আমিও এবার অবধি নিরামিষ ভোজন করিব। আহাই আমার তৃপ্তিজনক।"

মিস্ টেম্পল শুনিয়া খুসী হইলেন। বলিলেন, "শনিবার ৭টার সময় আসিবেন।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শনিবার আসিল। বারীন্দ্র সান্ধ্যবেশ পরিধান করিয়া প্রস্তুত হইল। তাহার ল্যান্ড-লেডি আসিয়া বলিল, "মিস্টার চাটার্জ্জি, আজ কি আপনি বাহিরে ডিনার খাইবেন নাকি? আমায় ত পূর্ব্বে বলেন নাই।"

বারীন্দ্র বলিল, "মিসেস ব্রাউন, আমি বলিতে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছিলাম। আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল ছিল।"

ল্যান্ডলেডি বলিল, "প্রেমে পড়িলে মানুষের ঐ রকমই হয়। আপনার প্রণয়িণীর গৃহে নিমন্ত্রণ বুঝি?"

"হাঁ মিসেস ব্রাউন। নহিলে দেখিতেছ না, এত সাবধানতার সহিত বেশবিন্যাস

করিব কেন? আমাকে দেখিতে কেমন দেখাইতেছে বল দেখি?"

মিসেস ব্রাউন বলিল, "Stunning। আপনি যদি আজ প্রোপোজ করেন, তবে তিনি প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবেন না।"

"মিসেস ব্রাউন, কি বলিয়া প্রোপোজ করিতে হয় আমাকে শিখাইয়া দিতে পার? আচ্ছা, তুমি যখন মিষ্টার ব্রাউনকে প্রোপোজ করিয়াছিলে, কি বলিয়াছিলে?"

এই কথায় অগ্নিশর্ম্মা হইয়া মিসেস ব্রাউন বলিল, "মহাশয়! মহাশয়! প্রোপোজ করিয়াছিলাম কি আমি?"

ঈষৎ হাস্য করিয়া বারীন্দ্র বলিল, "তবে কে?"

"স্ত্রীলোক কখনও প্রোপোজ করে? মিষ্টার ব্রাউন আমাকে প্রোপোজ করিয়াছিলেন।"

বারীন্দ্র বলিল, "I see—আমি মনে করিয়াছিলাম, তুমিই বুঝি করিয়াছিলে। আচ্ছা, তিনি কি বলিয়াছিলেন?"

"শুনিবেন? আচ্ছা তবে বলি।"—বলিয়া মিসেস ব্রাউন জানালার নিকট একটি সোফার উপবেশন করিয়া বলিতে আরম্ভ করিল।—

"একদিন আমরা হাইড পার্কে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। একটি গাছতলায় দুইখানি চেয়ার ছিল, আমরা দুইজনে সেখানে বসিয়া গল্প করিতেছিলাম।"—

বাধা দিয়া বারীন্দ্র বলিল, "হাইড পার্কে—একাকী একটি যুবক বন্ধুর সঙ্গে—তুমি বেড়াইতে গিয়াছিলে? বিনা chaperone-এ? তোমার পিতামাতা জানিতেন?"

হাসিয়া ল্যান্ডলেডি বলিল, "না, আমার পিতামাতা জানিতে পারেন নাই। তাঁহারা অত্যন্ত কড়া ছিলেন। এমন কি engaged হইবার পরেও, বিনা শ্যাপেরোনে আমাদিগকে বাহির হইতে দিতেন না।"

"তবে তুমি লুকাইয়া গিয়াছিলে?"

মৃদু হাস্য করিয়া মিসেস ব্রাউন বলিল, "হাঁ মহাশয়।"

দুই হস্ত উপরে উঠাইয়া বারীন্দ্র বলিল, "Holy Moses! Oh, naughty Mrs. Brown! I *am* shocked."

বারীন্দ্রের ভাব দেখিয়া প্রৌঢ়া ল্যান্ডলেডি কিয়ৎক্ষণ হাস্য করিল। পরে বলিল, "আচ্ছা, আপনি যদি অত shocked হইয়া থাকেন, তবে আর বলিব না।"

"না, বল। আমি শিখিয়া যাই।"

মিসেস ব্রাউন বলিতে লাগিল, "গল্প করিতে করিতে ক্রমে সন্ধ্যা হইল। আমি বাড়ী ফিরিবার জন্য উঠিলাম। মিষ্টার ব্রাউন বলিলেন, 'বস বস, একটা কথা আছে।' বসিলে বলিলেন, 'মেরি, আমাকে তুমি বিবাহ করিবে?' আমি ত প্রথমে কিছুতেই রাজি হই না। শেষে তিনি ঘাসের উপর হাঁটু পাতিয়া বসিয়া বলিলেন, 'মেরি, তুমি যদি আমায় বিবাহ না কর, তবে আমি সৈন্য হইয়া বিদেশে চলিয়া যাইব, এবং যুদ্ধ করিয়া মরিব'।"

বারীন্দ্র বলিল, 'কি সর্ব্বনাশ! তখন তুমি কি করিলে?"

"কি আর করি মহাশয়, বাধ্য হইয়া সম্মতি দিলাম।"

বারীন্দ্র বলিল, "আহা! আমার প্রণয়িণী কি তোমার মত কোমলহৃদয়া হইবেন? আমি তাঁহাকে বলিব, তুমি যদি আমায় বিবাহ না কর, তবে আমি ব্যারিষ্টার হইয়া কলিকাতা যাইব এবং তথায় বার-লাইব্রেরিতে বসিয়া অনশনে প্রাণত্যাগ করিব।"

পোর্টল্যান্ড প্লেসে ডিনারের পর বারীন্দ্রের পক্ষে একটি অভাবনীয় ঘটনা ঘটিল।

মিস্ টেম্পলের সুসজ্জিত ড্রয়িংরুমে বারীন্দ্র বসিয়া আছে। আজ এই বৃদ্ধার মুখমণ্ডল কিছু চিন্তাযুক্ত।

দাসী আসিয়া কফি দিয়া গেল। কফি পান করিতে করিতে মিস্ টেম্পল বলিলেন, "আজ কয়েক দিন হইতে আমার মনে একটা চিন্তা প্রবেশ করিয়াছে। আমি আপনাকে কয়েকটি ব্যক্তিগত প্রশ্ন যদি জিজ্ঞাসা করি, তবে আপনি ক্ষমা করিবেন কি?"

বারীন্দ্র একটু সাবধানতার সহিত বলিল, "যদি কোন আপত্তিজনক প্রশ্ন না থাকে, তবে অবশ্যই আমি আহ্লাদের সহিত উত্তর দিব।"

মিস্ টেম্পল কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "আপনার পিতামাতা জীবিত নাই, ইহা পূর্ব্বেই আপনি বলিয়াছেন। আপনি কি বিবাহিত?"

"না।"

"আপনার এখানকার ব্যয় কে বহন করেন?"

"আমার পিতৃব্য আমার খরচ দেন।"

"আইন ব্যবসায়ের প্রতি আপনার বিশেষ অনুরাগ আছে?"

"না।"

"এ কয়দিন আপনার সহিত আলাপ করিয়া বুঝিয়াছি হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আপনার প্রবল অনুরাগ।"

বারীন্দ্র মনে মনে হাস্য করিল।

মিস্ টেম্পল বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "দেখুন, হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আমার যথেষ্ট ভক্তি। এই ধর্ম্ম আমি য়ুরোপে প্রচার করিতে বাসনা করি। আমার বিস্তর অর্থ আছে। আমি সেইজন্য আজ আপনার নিকট একটি প্রস্তাব করিব। এই উদ্দেশ্যে আমি আপনার সহায়তা চাই। আমি একজন শিক্ষিত হিন্দু-যুবককে পোষ্যপুত্রস্বরূপ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি। আপনি হইবেন?"

বারীন্দ্র নিরুত্তর রহিল।

মিস্ টেম্পল বলিলেন, "এখনই আপনার উত্তর আমি চাহি না। আপনি ভালরূপে চিন্তা করিয়া আমায় উত্তর দিবেন। যদি স্বীকার করেন, তবে আপনাকে অনন্যকর্ম্মা হইয়া প্রথমে হিন্দুশাস্ত্র ও ইউরোপীয় ভাষাগুলি ভাল করিয়া শিক্ষা করিতে হইবে। দুই তিন বৎসর পরে, আপনাকে লইয়া আমি য়ুরোপে হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিতে বাহির হইব।"

বারীন্দ্র বলিল, "আমি চিন্তা করিয়া পরে আপনাকে উত্তর দিব।"

মিস্ টেম্পল বলিলেন, "আমার আর কেহ নাই। আমার সমস্ত ধনের উত্তরাধিকারী আপনি হইবেন। আমি যতদিন বাঁচিয়া থাকিব, আপনার সমস্ত ব্যয় আমি নির্ব্বাহ করিব, এবং সপ্তাহে দশ গিনি করিয়া আপনাকে পকেট খরচ দিব। আপনাকে কঠোর অধ্যয়নে রত হইতে হইবে, এবং শুদ্ধাচারী হিন্দুর ন্যায় থাকিতে হইবে।"

বারীন্দ্রের মস্তক ঘূর্ণিত হইয়া উঠিল। বলিল, "আচ্ছা, এক সপ্তাহের পরে আপনাকে উত্তর দিব।"—বলিয়া, সে রাত্রির মত বিদায় গ্রহণ করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তিন মাস কাটিয়াছে। বারীন্দ্র মিস্ টেম্পলের পোষ্যপুত্র হইয়া তাঁহার গৃহে বাস করিতেছে। তাহার নাম এখন "বারীন্দ্রনাথ চাটার্জ্জি-টেম্পল।"

বারীন্দ্র এক হিসাবে বেশ সুখে আছে। পূর্ব্বে তাহার টাকাকড়ির অত্যন্ত টানা-টানি ছিল, এখন আর তাহা নাই। বণ্ড ষ্ট্রীট ভিন্ন অন্য কোথাও এখন আর সে সুট তৈয়ারী করায় না। অম্‌নিবসে আরোহণ করা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছে। উৎকৃষ্ট হাভানা ভিন্ন অন্য চুরুট মুখে করে না। বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া যখন থিয়েটারে যায়, তখন তিন চারি গিনি মূল্যে প্রায়ই বক্স লইয়া থাকে।

কিন্তু তাহার অসুবিধা, আহারে ও অধ্যয়নে। সে যখন ভণ্ডামি করিয়া বলিয়াছিল, তাহার হিন্দুসংস্কার নিরামিষ খাদ্যেরই পক্ষপাতী, তখন ভাবে নাই যে, তাহার হিন্দু-জিহ্বা একদিন এরূপভাবে দণ্ডিত হইবে। নিরামিষ খাদ্য রসনার তৃপ্তিদায়ক করিতে হইলে বিশেষ নিপুণতার আবশ্যক। সে নিপুণতা ইংরাজ রাঁধুনীর নাই। মিস্ টেম্পলের

টেবিলে দুগ্ধমিশ্রিত 'হোয়াইট সস্' আবৃত যে সকল নিরামিষ খাদ্য উপস্থিত হয় তাহা প্রায়ই অখাদ্য।—বারীন্দ্রের দ্বিতীয় অসুবিধা,—তাহার আলস্যচর্চার অবসর একেবারেই নাই। সপ্তাহে তাহাকে দুই দিন ফরাসী ও দুই দিন জর্ম্মন ভাষা অধ্যয়ন করিতে হয়, তাহার জন্য শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছে। তাহা ছাড়া মিস্ টেম্পল স্বয়ংও পর্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন। সপ্তাহে যে দুই দিন ব্রিটিশ মিউজিয়মে গিয়া হিন্দুশাস্ত্র চর্চা করিবার কথা, সেই দুই দিনই তাহার আরামে কাটে। ব্রিটিশ মিউজিয়মে গিয়া মনোরম উপন্যাসাদি সে পাঠ করে। অথবা সেখানে না গিয়া অন্য কোথাও বেড়াইতে যায়।

তিন মাস কাল মিস্ টেম্পলের সহিত বাস করিয়া, অর্থের স্বচ্ছলতা সত্ত্বেও বারীন্দ্র একটু ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। নূতন নূতন এই বৃদ্ধার সঙ্গ তাহার কৌতুকজনক মনে হইত। কিন্তু কৌতুক রসটা এমনই জিনিষ একটু পুরাতন হইলেই বিস্বাদ হইয়া পড়ে। ডিনারের পর যে সন্ধ্যাগুলি তাহার মিস্ টেম্পলের সহিত কাটাইতে হইত, তাহা কষ্টে কাটিতে লাগিল। এই জন্য সে প্রায়ই থিয়েটারে যাইত। মিস্ টেম্পল তাহাতে মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণ হইতেন বটে, কিন্তু প্রকাশ্যে বাধা দিতেন না। তবে জাতিচ্যুতির ভয়ে তাহাকে বাহিরে ডিনার খাইতে দিতেন না, বাড়ীতেই বারীন্দ্রকে ডিনার খাইয়া বাহির হইতে হইত।

আজ লণ্ডনে বড় ধুম। ঐতিহাসিক পুরাতন "গেয়েটি থিয়েটার" ভাঙিয়া নূতন করিয়া গড়া হইয়াছে। আজ রাত্রে "নিউ গেয়েটি থিয়েটার" প্রথম খুলিবে। "অর্কিড" নামক একটি নূতন গীতিনাট্য প্রথম অভিনীত হইবে। বারীন্দ্র বহুপূর্ব্বে হইতে একটি বক্স লইয়া রাখিয়াছিল।

অভিনয় আরম্ভ হইলে দেখা গেল, বারীন্দ্রের বক্সে তাহার তিন জন বন্ধু সমবেত। একটি আমাদের পূর্ব্বপরিচিত ভুবন দত্ত, অপর দুইটি পুরুষ নহে। তাহাদের বেশে জমক আছে, কিন্তু পারিপাট্য (refinement) নাই। তাহাদের ভাষায় মাধুর্য্য আছে কিন্তু শালীনতা নাই। স্ত্রীলোক হইলেও, মহিলা বলিয়া তাহাদিগকে ভ্রম করিবার কাহারও সম্ভাবনা অল্প।

তিন ঘণ্টা অভিনয়ের পর নাটক সমাপ্ত হইল। উহারা তখন বাহির হইয়া রাস্তার ফুটপাথে দাঁড়াইল। বারীন্দ্র প্রস্তাব করিল—"Let's go and have some supper at the Troc."

'Troc' অর্থাৎ Trocadero, লণ্ডনের একটি উচ্চশ্রেণীর ভোজনালয়। ট্রকাডেরোতে ভোজন করা সৌখীনতার একটি বিশেষ লক্ষণ। থিয়েটারফেরৎ ধনশালী ব্যক্তিরা সেখানে কিঞ্চিৎ আহার করিয়া গৃহে বা ক্লাবে যান। এই লোভনীয় প্রস্তাব শুনিয়া একজন যুবতী বলিল, "You *are* a dear."

অন্য একজন বলিল—"I like their champagnes awf'ly." গাড়ী লইয়া ইহারা ট্রকাডেরোতে উপস্থিত হইল। পূর্ব্বে হইতে একটি টেবিল বারীন্দ্র রিজার্ভ করিয়া রাখিয়াছিল। সেখানে গিয়া চারিজনে উপবেশন করিল।

মূল্যবান রৌপ্য পাত্রে ভরিয়া বিবিধ খাদ্য আসিল। বরফের বালতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত শ্যাম্পেনের বোতল আসিল। সান্ধ্যবেশধারী ওয়েটারগণ নিঃশব্দপদসঞ্চারে ভোক্তাগণের সেবায় তৎপর। মহিলাগণের পরিচ্ছদের শোভায় ভোজনশালা ঝলমলায়মান। উপরে অদৃশ্য স্থানে যন্ত্রিগণ বসিয়া বিবিধ বাদ্যযন্ত্রালাপ করিতেছে। পুরুষ ও রমণীগণের অবিশ্রাম গল্পের গুঞ্জনধ্বনি, মুহুর্মুহু হাস্য ও শ্যাম্পেনের কর্ক খুলিবার শব্দ বাদ্যযন্ত্র-ধ্বনির সহিত মিলিয়া স্থানটিকে উৎসবময় করিয়া তুলিয়াছে।

এদিকে ইহাদের পানাহার ও হাস্যামোদ চলিতে লাগিল। হলের অপর প্রান্তে, ইহাদের অদৃশ্যে দুইটি বর্ষীয়সী মহিলা আসিয়া প্রবেশ করিলেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন মিস্ টেম্পল।

তাঁহারা বসিয়া, দুই পেয়ালা কফি আনিতে হুকুম করিলেন। কফি পান করিতে

করিতে গল্প করিতে লাগিলেন। মিস্ টেম্পল তাঁহার সঙ্গিনীকে বলিলেন, "অদ্যকার এ কন্সার্টে আপনাদের অনাথাশ্রমের জন্য কত টাকা উঠিল ?"

অন্য মহিলাটি বলিলেন, "অনেকগুলি আসনই পূর্ণ হইয়াছিল। বোধ হয় দুই শত গিনির উপরে উঠিয়া থাকিবে।"

"সকল যন্ত্রিগণই বেশ সুন্দর বাজাইয়াছিলেন, বিশেষতঃ যিনি শোপে'য়া (Chopin) হইতে কয়েকটি বাজাইলেন, তিনি অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। আমার বড় ভাল লাগিয়াছে।"

"আপনি ত আসিতেছেন না, আমিই ত আপনাকে টানিয়া আনিলাম।"

কফি পান করিতে করিতে মিস্ টেম্পল বলিলেন, "আমি আপনাদের এ কনসার্টের জন্য টিকিট কিনিয়া রাখিয়াছিলাম বটে, কিন্তু আজ যে ইহা হইবে, তাহা মোটেই আমার স্মরণ ছিল না।"

কফি পান শেষ করিয়া ইঁহারা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এমন সময় হলের অপর প্রান্তে মিস্ টেম্পলের দৃষ্টি পড়িল।

কয়েক মুহূর্ত্ত বদ্ধদৃষ্টি হইয়া সেই দিকে চাহিয়া থাকিয়া, শেষে তিনি পকেট হইতে নিজ চশমাখানি বাহির করিয়া চক্ষে লাগাইলেন।

যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার বার্দ্ধক্যরেখাঙ্কিত মুখমণ্ডল, প্রলয়ের আকাশের মত গম্ভীর হইয়া উঠিল।

সঙ্গিনীকে বলিলেন, "আমায় এক মিনিটের জন্য ক্ষমা করিবেন, আমি আসিতেছি।"

বলিয়া তিনি মৃদু মৃদু পদক্ষেপে হলের অপর প্রান্তে গিয়া, বারীন্দ্রের অত্যন্ত নিকটে দাঁড়াইলেন। কিন্তু তাহা নিমেষমাত্রকালের জন্য।

তাহাকে দেখিয়াই বারীন্দ্র ত্রস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"Good evening"—তাহার সম্মুখে প্লেটে বিবিধ খাদ্য, পার্শ্বে ফেনমণ্ডিত তরল স্বর্ণের ন্যায় মদিরা এবং আপত্তি-জনক নারীমূর্ত্তি।

"Good evening. Don't let me interrupt you"—বলিয়াই মিস্ টেম্পল প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

সেই রাত্রে বারীন্দ্র যখন গৃহে ফিরিল, তাহার পূর্ব্বেই মিস্ টেম্পল শয়ন করিতে গিয়াছেন।

সমস্ত রাত্রি সে অনিদ্রায় কাটাইল।

পর দিন প্রভাতে, প্রাতরাশের সময় শুনিল, মিস্ টেম্পল তখনও শয্যাত্যাগ করেন নাই,—তাঁহার শরীর অসুস্থ।

বেলা দুইটা বাজিলে, লাঞ্চ খাইবার জন্য ভোজন কক্ষে প্রবেশ করিয়া শুনিল, মিস্ টেম্পল তখনও শয্যাত্যাগ করেন নাই।

একাকী নীরবে সে লাঞ্চ খাইল। উঠিবার সময় দাসী একখানি পত্র আনিয়া বারীন্দ্রের হাতে দিল। মিস্ টেম্পলের হস্তাক্ষর।

তাহাতে লেখা আছেঃ—

"কাল রাত্রে যাহা দেখিলাম তাহাতে মর্ম্মাহত হইয়াছি। তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ অদ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইল। আমি আর তোমার মুখ দর্শন করিতে ইচ্ছা করি না। অদ্য তুমি এ বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া যাইবে। তিন মাসে তোমার যে সময়ের ক্ষতি হইয়াছে, তাহার পূরণ স্বরূপ এই পত্র মধ্যে তোমায় একশত পাউণ্ডের একখানা চেক দিলাম।

এড্না টেম্পল।"

জিনিষ পত্র গোছাইয়া, ক্যাব ডাকিয়া সন্ধ্যার মধ্যে বারীন্দ্র হেডকোয়ার্টারে ফিরিয়া আসিল।

বলবান জামাতা

॥ ১ ॥

নলিনীবাবু আলিপুরের পোস্টমাস্টার। বেলা অবসানপ্রায়; আপিসে নলিনীবাবু ছটফট করিতেছিলেন। আশ্বিন মাস—সম্মুখে পূজা—নলিনীবাবু ছুটির দরখাস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু এখনও হেড আপিস হইতে কোনও হুকুম আসিল না। যদি আজ পাঁচটার মধ্যেও হুকুম আসে, তবে আজই মেলে এলাহাবাদ রওনা হইবেন। এলাহাবাদে তাঁহার শ্বশুরালয়। নলিনীবাবু এই প্রথম শ্বশুরবাড়ী যাইবেন। জিনিসপত্র কিনিয়া, বাক্স তোরঙ্গ সাজাইয়া, প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছেন, কিন্তু এখনও ছুটির হুকুম আসিল না। বেলা চারিটা বাজিল। হঠাৎ টং টং করিয়া টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। বড় আশা করিয়া নলিনীবাবু টেলিফোনের নল মুখে দিয়া বলিলেন—"Yes."

কিন্তু হায়, ছুটির হুকুম আসিল না। একটা মনিঅর্ডার সম্বন্ধে কি গোলমাল ঘটিয়াছিল, তাহারই সংক্রান্ত একটা প্রশ্ন।

নলিনী হতাশ হইয়া আবার চেয়ারে আসিয়া উপবেশন করিলেন। দুই একটা টুকীটাকী কার্য্যের পর পকেট হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন। পত্রখানি তাঁহার স্ত্রীর লেখা। ইতিপূর্ব্বেই সেখানি বহুবার পাঠ করা হইয়াছিল; আবার পড়িলেন—

(একটি পাখীর ছবি)
নিম্নে সোণার জলে মুদ্রিত—
"যাও পাখী যেথা মম আছে প্রাণপতি"

প্রিয়তম,

তোমার সুধামাখা পত্রখানি পাইয়া মনপ্রাণ শীতল হইল। নাথ, এতদিনের পর কি দীর্ঘ-বিরহের অবসান হইবে? তোমার চাঁদমুখখানি দেখিবার জন্যে আমার চিত্তচকোর উৎকণ্ঠিত হইয়া আছে। আজ দুই বৎসর আমাদের বিবাহ হইয়াছে, এখনও একদিনের তরে পতিসেবা করিতে পাইলাম না। ছুটি হইলে শীঘ্র চলিয়া আসিও। দুঃখিনী আশাপথ চাহিয়া রহিল। দিনাজপুর হইতে মেজদি আজ আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। কতদিনে তোমার ছুটি হইবে? পঞ্চমীর দিন যাত্রা করিতে পারিবে কি? আজ তবে আসি। মনে রেখ ভুল না।

তোমারই
সরোজিনী

নলিনীবাবু পত্রখানি উলটিয়া পালটিয়া পাঠ করিলেন। শেষে পুনর্ব্বার তাহা পকেটে রাখিয়া দিলেন।

পাঁচটা বাজিতে আর অধিক বিলম্ব নাই। আজও ছুটির কোনও সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। নলিনীবাবু একটি মৃদু রকমের দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আবার কার্য্যে মন দিতে চেষ্টা করিলেন। যাহা হউক, আজ চতুর্থী মাত্র। যদি আগামী কল্যও ছুটি আসে, তবুও পঞ্চমীর দিন যাত্রা করিতে সমর্থ হইবেন।

পাঁচটা বাজিতে আর যখন দুই এক মিনিট বাকী আছে, তখন আবার টেলিফোনের কল ঝঙ্কার করিয়া উঠিল। আবার নলিনীবাবু নলে মুখ দিয়া বলিলেন—"Yes."

॥ ২ ॥

ছুটি!—ছুটি!—ছুটি!—নলিনীবাবু দুই সপ্তাহের বিদায় পাইয়াছেন। ডেপুটি পোস্টমাস্টারকে চার্জ্জ বুঝাইয়া দিয়া আজই রাত্রে নলিনীবাবু রওনা হইতে পারিবেন।

সরোজিনীর পত্রে প্রকাশ, 'দিনাজপুরের মেজদি' আসিয়াছেন। ইঁহার আসিবার

কথা পূর্ব্বেই নলিনীবাবু অবগত ছিলেন, এবং সেইজন্যই বিশেষতঃ, এবার এলাহাবাদ যাইবার জন্য তাঁহার এত অধিক আগ্রহ। 'দিনাজপুরের মেজদি'র উপর তাঁহার বিলক্ষণ রাগ আছে—তাই তাঁহার সহিত এখন একবার সাক্ষাতের জন্য তিনি বড় ব্যস্ত। কিন্তু সে ব্যাপারটি কি, বুঝাইতে হইলে, মেজদির একটু পরিচয় এবং নলিনীর বিবাহ-বাসরের একটু ইতিহাস বিবৃত করা আবশ্যক।

মেজদির স্বামী মস্ত সাহেব লোক—তিনি দিনাজপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। মেজদির নামটি উল্লেখ করিলেই সকলেই তাঁহাকে অনায়াসে চিনিতে পারিবেন। শ্রীমতী কুঞ্জবালা দেবীর স্বাক্ষরিত ওজস্বিনী স্বদেশী কবিতাগুলি বর্ত্তমান সময়ের মাসিক পত্রাদিতে কে না পাঠ করিয়াছেন? সৌভাগ্যবশতঃ ফুলার সাহেব বাঙ্গালা জানেন না, জানিলে এতদিন কুঞ্জবালার স্বামীর চাকুরিটি লইয়া টানাটানি হইত।

কুঞ্জবালা বিদুষী, সুতরাং বলাই বাহুল্য তাঁহার রসনাটি ক্ষুরধার। তিনি ইংরাজিতে শিক্ষিতা, সুতরাং তাঁহার 'আইডিয়াল' সর্ব্ববিষয়ে সাধারণ বঙ্গললনা হইতে বিভিন্ন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, একবার তাঁহার এক দেবর এক শিশি সুগন্ধি কিনিয়া আনিয়াছিল। দেখিয়া কুঞ্জবালা জিজ্ঞাসা করিলেন—"ও কার জন্যে এনেছিস?"

"নিজে মাখব।"

"দূর—ও জিনিস ত কেবল স্ত্রীলোকে আর বাবুতে মাখে;—পুরুষমানুষ কখনও সুগন্ধি ব্যবহার করে?"

বালক দেবরটি, বউদিদির তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ বুঝিতে না পারিয়া ভালমানুষের মত বলিয়াছিল, "কেন? বাবুরা কি পুরুষ নয়?"

নলিনীবাবুর যখন বিবাহ হয়, তখন তাঁহার মূর্ত্তিটি দিব্য গোলগাল নন্দদুলালি ধরণের ছিল। গাল দুইটি টেবো টেবো, হাত দুখানি নবনীতোপম, প্রকোষ্ঠদেশের কোমল অস্থিগুলি কোমলতর মাংসে সম্পূর্ণভাবে প্রচ্ছন্ন। শীলতার অনুমোদিত না হইলেও, বিবাহ-বাসরে কুঞ্জবালা নলিনীর দেহখানির প্রতি বিদ্রূপের তীক্ষ্ণবাণ নিক্ষেপ করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারেন নাই। রবীন্দ্রবাবুর কাব্য কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া তিনি বলিয়াছিলেনঃ—

নলিনীর মত চেহারা তাহার
নলিনী যাহার নাম,
কোমল কোমল কোমল অতি
যেমন কোমল নাম।
যেমন কোমল, তেমনি বিকল,
তেমনি আলস্য ধাম,—
নলিনীর মত চেহারা তাহার
নলিনী যাহার নাম।

একটি শ্লেষবাক্য মনুষ্যকে যেমন সচেতন করে, দশটি উপদেশবচনেও সেরূপ হয় না। সেই শ্লেষবাক্য যদি সুন্দরীমুখনিঃসৃত হয় এবং সেই সুন্দরী যদি সম্পর্কে শ্যালিকা হন, তাহা হইলে একটি শ্লেষবাক্যের ফল শতগুণ সাংঘাতিক হইয়া উঠে।

বিবাহের পর নলিনীবাবু কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন, তাঁহার শ্বশুর মহাশয়ও সপরিবারে কর্ম্মস্থান এলাহাবাদে চলিয়া গেলেন। কিন্তু বিদুষী শ্যালিকার ব্যঙ্গ নলিনী কিছুতেই বিস্মৃত হইতে পারিলেন না।

একদা সন্ধ্যায় পোষ্ট আফিস হইতে বাসায় ফিরিয়া, ঈজিচেয়ারে পড়িয়া, নলিনীবাবু ধূমপান করিতেছিলেন, এমন সময় সহসা তাঁহার মনে একটা মৎলবের উদয় হইল—কেন, তিনি ত চেষ্টা করিলেই এ কলঙ্ক মোচন করিতে পারেন—শরীর পুরুষোচিত দৃঢ় করিতে পারেন। পরদিন বাজার হইতে তিনি স্যাণ্ডোর ডাম্বেলাদি ক্রয় করিয়া আনিয়া, বাড়ীতে রীতিমত ব্যায়াম অভ্যাস করিতে যত্নবান হইলেন। নিজ দৈনিক খাদ্য-

তালিকা হইতে মিষ্ট, দুগ্ধ, ঘৃত ও তণ্ডুল যথাসম্ভব কাটিয়া দিয়া, তত্তৎস্থানে রুটি, মাংস, ডিম্ব প্রভৃতি যোজনা করিলেন। প্রথম প্রথম পাঁচ সাত মিনিটের অধিক ব্যায়াম করিতে পারিতেন না—ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন। অভ্যাসের গুণে ক্রমে প্রভাতে ও সন্ধ্যায় অর্দ্ধঘণ্টা কাল ধরিয়া নিয়মিতভাবে ব্যায়াম করিতে লাগিলেন।

এক বৎসর এইরূপ করিয়া তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি বিলক্ষণ দৃঢ় হইল। তখন স্বীয় মূর্ত্তি আরও অধিক মাত্রায় পরুষ করিবার অভিপ্রায়ে তিনি দাড়ি কামানো বন্ধ করিয়া দিলেন। দুই একটি শিকারী বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া মধ্যে মধ্যে পল্লীগ্রামে গিয়া হংস, বন্যশূকরাদি শিকার করিতেও অভ্যাস করিলেন।

এইরূপ করিয়া দুই বৎসর কাটিয়াছে। এখন আর সে নলিনী নাই। এখন তাঁহার কপোলদেশ বসাশূন্য, চিবুকাগ্রভাগ সূক্ষ্মতাপ্রাপ্ত, হস্তপদাদি অস্থিবহুল হইয়াছে; ফলতঃ তিনি নামের এখন সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়া উঠিয়াছেন। এমন সময় একবার কুঞ্জবালার সহিত সাক্ষাৎ আকাঙ্ক্ষিত। হায় নামটাও যদি পরিবর্ত্তন করিবার উপায় থাকিত। নলিনীবাবু মনে করিয়াছেন, তাঁহার পুত্র জন্মিলে তাহার নাম রাখিবেন—খুব একটা ভীষণ রকমের—কি নাম রাখিবেন এখনও স্থির করিতে পারেন নাই।

॥ ৩ ॥

পরদিন বেলা দুইটার সময়, নলিনীবাবু এলাহাবাদ ষ্টেশনে অবতরণ করিলেন। তাঁহার পরিধানে পায়জামা ও লম্বা পাঞ্জাবী কোট, মস্তকে পাগড়ী। হস্তে একটি বৃহদাকার যষ্টি দেখা যাইতেছিল। জিনিসপত্রের সঙ্গে একটি বন্দুকের বাক্স। ইচ্ছা ছিল ছুটিতে কিঞ্চিৎ শিকারও করিয়া যাইবেন।

ষ্টেশনে নামিয়া চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন—কই, কেহ ত তাঁহাকে লইতে আসে নাই। গত কল্য যাত্রা করিবার পূর্ব্বে তিনি যে শ্বশুর মহাশয়ের নামে চারি আনার টেলিগ্রাম* একটি পাঠাইয়াছিলেন, তাহা পৌঁছে নাই কি?

কুলি ডাকিয়া, জিনিসপত্র লইয়া, নলিনীবাবু ষ্টেশনের বাহিরে গেলেন। একজন গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহেন্দ্রবাবু উকীলকা বাসা জান্‌তা?"

গাড়োয়ান উত্তর করিল, "হাঁ বাবু—আইয়ে।"

"চলো"—বলিয়া নলিনী গাড়ীতে আরোহণ করিলেন।

এলাহাবাদে নলিনীবাবু পূর্ব্বে কখনও আসেন নাই; এমন কি এই তিনি প্রথম বঙ্গদেশের বাহিরে পদার্পণ করিয়াছেন। পশ্চিমের সহরের নূতন দৃশ্য দেখিতে দেখিতে তিনি চলিলেন।

অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে গাড়ী একটি বৃহৎ কম্পাউণ্ডযুক্ত বাড়ীতে প্রবেশ করিল। সম্মুখেই বহির্ব্বাটী, বারান্দায় একটি নয় দশ বৎসরের বালিকা খেলা করিতেছিল। বারান্দার নিম্নে, বামে, একটা কূপ; সেখানে বসিয়া একজন পশ্চিমা ভৃত্য সজোরে একটা কটাহ মাজিতেছিল।

গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া, সেই ভৃত্যকে সম্বোধন করিয়া নলিনীবাবু বলিলেন —"এই মহেন্দ্রবাবু উকীলের বাড়ী?"

"হ্যাঁ বাবু।"

"বাবু আছেন?"

"না। তিনি কিদারবাবু উকীলের বাড়ী পাশা খেলতে গিয়েছেন।"

"আচ্ছা—ভিতরে খবর দাও—বল জামাইবাবু এসেছেন।"

এই কথা শুনিবামাত্র, যে মেয়েটি বারান্দায় খেলা করিতেছিল, সে ছুটিয়া বাড়ীর

* দিনকতক এরূপ টেলিগ্রাম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, কিন্তু এগুলি ছিল চিঠির অধম।

মধ্যে গিয়া গগন বিদীর্ণ করিয়া বলিল, "ওগো, তোমাদের জামাইবাবু এসেছেন।"

ভৃত্যটির নাম রামশরণ। সে এই কথা শুনিয়া, দন্ত বিকশিত করিয়া বলিল, "আরে! জামাইবাবু?"—বলিয়া সে চটপট হাত ধুইয়া ফেলিয়া, নলিনীকে একটি দীর্ঘ সেলাম করিল।

তাহার পর রামশরণ জিনিসপত্র গাড়ী হইতে নামাইয়া ফেলিল। এদিকে বাড়ীর ভিতর হইতে নানা আকারের বালকবালিকাগণ আসিয়া উঁকি মারিয়া জামাই দেখিতে লাগিল।

রামশরণ নলিনীবাবুকে বৈঠকখানার ঘরে লইয়া গিয়া বসাইল। বলিল, "বাবু চান করা হোবে কি?"

নলিনী বলিল, "হ্যাঁ—স্নান করব। তুমি গোসলখানায় জল দাও।"

এই সময় একজন বাঙ্গালী ঝি আসিয়া নলিনীকে প্রণাম করিয়া বলিল "ভাল ছিলেন ত?"

"হ্যাঁ ভাল ছিলাম। তোমরা কেমন ছিলে?"

হাসিয়া ঝি বলিল, "যেমন রেখেছেন। আজ ছ'মাস আমি এ বাড়ীতে চাকরী করছি, দিদিমণিকে রোজ জিজ্ঞাসা করি, 'জামাইবাবু কবে আসবেন গো?'—'জামাইবাবু কবে আসবেন গো?'—দিদিমণি বলেন, এই ছুটি হলেই আসবেন। তা এতদিনে মনে পড়ল সেও ভাল। আপনি চান করে ফেলুন। মা ঠাকরুণ জিজ্ঞাসা করলেন, এখন কি জলটল খাবেন, না ভাত চড়িয়ে দেওয়া হবে?"

নলিনী মোগলসরাই স্টেশনে, কেলনারের কল্যাণে, প্রাতরাশ সমাধা করিয়া আসিয়াছিলেন; বলিলেন, "এখন ভাত চড়াতে হবে না:—জলটল খাব এখন।"

ঝি বলিল, "আচ্ছা তবে স্নান করে ফেলুন। পরে আপনাকে একটি নতুন জিনিস দেখাব। আমার বখশিসের জন্যে কি গহনা টহনা এনেছেন বের করে রাখুন।"—বলিয়া ঝি নলিনীর প্রতি রমণীজন-সুলভ কটাক্ষপাত করিয়া, মৃদু হাস্য করিল।

রামশরণ বলিল, "তুই বখশিস লিবি, হামি বুঝি বখশিস লেব না?"

নলিনী ইহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিল না, কেবল গম্ভীরভাবে ঘাড়টি নাড়িতে লাগিল।

স্নানান্তে ফিরিয়া আসিয়া নলিনী দেখিল, কতকগুলি বালকবালিকা তাহার বন্দুকের বাক্স খুলিয়া বন্দুকটি বাহির করিয়াছে। সকলে মিলিয়া তাহার ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলি যোড়া দিবার চেষ্টা করিতেছে।

তাহাদের হাত হইতে বন্দুকটি লইয়া নলিনী সাবধানে স্থানান্তরে রাখিয়া দিল। এমন সময় পূর্ব্বকথিত ঝি আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহার কোলে একটি অল্পবয়স্ক শিশু। তাহার মুখখানি সদ্য পরিষ্কৃত, চক্ষুযুগল এই মাত্র কজ্জলিত, মাথার চুলগুলি সাবধানে আঁচড়াইয়া দেওয়া।

ঝি শিশুটিকে হাতে করিয়া তুলিয়া নাচাইয়া বলিল, "দেখ জামাইবাবু দেখ, কেমন সোণার চাঁদ হয়েছে। যেন রাজপুত্তুরটি। নাও—একবার কোলে কর।"

নলিনী কখনই ছোট শিশু পছন্দ করিত না। তথাপি ভদ্রতার খাতিরে বলিল, "বাঃ—বেশ ছেলেটি ত!"—বলিয়া কোলে লইল।

ঝি বলিল, "বেশ ছেলেটি বললেই হয় না, এখন কি দিয়ে মুখ দেখবে দেখ।"

নলিনী পকেট হইতে দুইটি টাকা বাহির করিয়া শিশুর বদ্ধমুষ্টির মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিল।

কলিকাতার ঝি তদ্দর্শনে গালে হাত দিয়া বলিল, "ওমা ওমা ওকি? লোকে বলবে কি গো? রূপো দিয়ে সোণার চাঁদের মুখ দেখা!"

সমবেত বালকবালিকাগণ খিলখিল করিয়া হাস্য করিয়া উঠিল। অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া, আর কোনও কথা খুঁজিয়া না পাইয়া, নলিনী বলিল, "সোণা ত আনিনি।" মনে

মনে স্বীয় পত্নীর উপরও রাগ হইল। তাহার কি উচিত ছিল না পত্রে নলিনীকে লেখা যে, অমুকের সন্তান হইয়াছে, তাহার মুখ দেখিবার জন্য একটা গিনি আনিও ?

ঝি বলিল, "সে কথা শোনে কে ? তা হলে আজই সেকরা ডেকে সোণার গহনার ফরমাস দাও। ছেলের বাপ হলেই হয় না!"

নলিনীর বুদ্ধিসুদ্ধি ইতিপূর্ব্বেই যথেষ্ট গোলমাল হইয়া গিয়াছিল; শেষের এই কথা শুনিয়া সে একেবারে দিশেহারা হইয়া পড়িল। 'ছেলের বাপ হলেই হয় না' ইহার অর্থ কি ? তবে নলিনীই কি ছেলের বাপ নাকি ?

শিশুকে ঝির কোলে ফিরাইয়া দিয়া, সভয়ে নলিনী জিজ্ঞাসা করিল, "ছেলেটি কবে হল ?"

ঝি পুনর্ব্বার গালে হাত দিয়া বসিল, "অবাক কল্লে যে! তোমার ছেলে কবে হল তুমি জান না, পাড়ার লোককে জিজ্ঞাসা করছ ?"

যে দুইটি বালকবালিকা উহারই মধ্যে একটু বয়ঃপ্রাপ্ত ছিল, তাহারা ঝির এই ব্যঙ্গোক্তি শুনিয়া হাসিয়া উঠিল। ক্ষুদ্রতর বালকবালিকাগণ তাহাদের দেখাদেখি, উচ্চতর হাস্য করিয়া মেঝেতে লুটোপুটি করিতে লাগিল।

সদ্যস্নাত নলিনীর ললাট তখন ঘর্ম্মসিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। সে, মনের বিস্ময় মনে চাপিয়া রাখিবার প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। এ গূঢ় রহস্য ভেদ করিবার ক্ষমতা তাহার নাই।

এই সময়ে একটি বালিকা আসিয়া, নলিনীর হাতে একটি গেলাস দিয়া বলিল, "জামাইবাবু! একটু সরবত খাও।"

নলিনী গেলাসে মুখ দিয়া দেখিল, জলটা লবণাক্ত। গেলাস নামাইয়া রাখিল। তখন হঠাৎ তাহার মনে হইল, তাহার প্রতি এই পিতৃত্ব আরোপটাও, জামাই ঠাট্টারই একটা অংশ হইবে। এই মীমাংসায় উপনীত হইয়া, নলিনীর মন একটু শান্ত হইল। তাহার কুঞ্চিত ভ্রূযুগল আবার সমতা প্রাপ্ত হইল।

সেই বৈঠকখানার একটা কোণে, একটা কবাট খুলিবার শব্দ হইল। কবাটের সম্মুখস্থিত পর্দ্দা অপসৃত করিয়া রামশরণ ভৃত্য বলিল, "বাবু আসুন—জলখাওয়া দেওয়া হয়েছে।"

নলিনী চাহিয়া দেখিল, অন্দরমহলের একটি কক্ষ দৃশ্যমান। উঠিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। কক্ষের মধ্যস্থলে সুন্দর কার্পেটের আসন পাতা রহিয়াছে। তাহার সম্মুখে রূপোর রেকাবী বাটী গেলাসে ভরা নানাবিধ খাদ্য ও পানীয়। নলিনী ধীরে ধীরে আসনখানির উপর উপবেশন করিয়া জলযোগে মন দিল।

এমন সময় কক্ষান্তর হইতে মলের ঝমঝম শব্দ উত্থিত হইল। একটি ক্ষুদ্র বালিকা দ্বারপথে মুখ দিয়া বলিল, "মেজদি আসছেন।"

নলিনী বুঝিল, কুঞ্জবালা আসিতেছেন। নিজ দক্ষিণ হস্তের আস্তিন সে ভাল করিয়া গুটাইয়া লইল। কুঞ্জবালা আসিয়া দেখুন, তাহার হাতের কব্জী এখন আর সুগোল নহে, মাংসল নহে, পরন্তু তাহা সুস্পষ্ট অস্থি ও শিরায় সমাকীর্ণ।

মলের শব্দ নিকট হইতে নিকটতর হইতে লাগিল। "কি ভাই এত দিনে মনে পড়ল ?"—বলিতে বলিতে যুবতী আসিয়া কক্ষমধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইলেন।

কিন্তু তাহা এক মুহূর্ত্তের জন্য মাত্র। চারি চক্ষে মিলিত হইতেই, সেই মহিলা একহাত ঘোমটা টানিয়া দ্রুতপদে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

নলিনী দেখিল, তিনি কুঞ্জবালা নহেন!

পার্শ্বের কক্ষ হইতে দুই-তিনটি রমণীর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর নলিনীর কর্ণে আসিল ;—

"কি লো, পালিয়ে এলি যে ?"

"ওমা, ও যে অন্য লোক।" "অন্য লোক কি লো ? আমাদের শরৎ নয় ?"

"না, শরৎ হবে কেন?"

"কে তবে?"

"আমি জানি?"

"এ কি কাণ্ড? জুয়াচোর নাকি?"

"যে রকম চোয়াড়ে চেহারা, আশ্চর্য্য নয়।"

"ওমা এ কি কাণ্ড! জামাই সেজে কে এল?"

একজন বালকের কণ্ঠস্বরে শুনা গেল, "একটা বন্দুক নিয়ে এসেছে।"

"অ্যাঁ—ওমা কি সর্ব্বনাশ হল গো! ওরে রামশরণা—রামশরণা—কোথা গেলি? যা, শীগগির বাবুকে খবর দে।"—রমণীগণের দ্রুত পদধ্বনি শ্রুত হইল। তাহার পর নলিনী আর কিছু শুনিতে পাইল না।

এই সময়ের মধ্যে, অদূরস্থিত একটি পুস্তকের আলমারির প্রতি নলিনীর দৃষ্টি পড়িয়াছিল। সারি সারি বাঁধান ল-রিপোর্ট; প্রত্যেকখানির নিম্নে সোণা জলে নাম লেখা—এম· এন· ঘোষ।

তখন সমস্ত ব্যাপার নলিনী দিনের আলোকের মত স্পষ্ট বুঝিতে পারিল। তাহার শ্বশুরের নাম মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি মহেন্দ্রনাথ ঘোষ। তবে ভ্রমক্রমে সে অন্য লোকের শ্বশুরবাড়ীতে চড়াও করিয়াছে।

নলিনী তখন মনে মনে হাস্য করিতে করিতে নিশ্চিন্তমনে একে একে জলখাবারের পাত্রগুলি খালি করিয়া ফেলিল।

॥ ৪ ॥

এদিকে রামশরণ ভৃত্য ঊর্দ্ধশ্বাসে বাবুকে খবর দিতে ছুটিল। কেদারবাবু উকীলের বাসায়, ছুটির সময়, প্রায়ই পাশা খেলার আড্ডা জমিয়া থাকে। অদ্য এখানে বড় মহেন্দ্রবাবু, ছোট মহেন্দ্রবাবু (নলিনীর আসল শ্বশুর) এবং অন্যান্য অনেকগুলি উকীল সমবেত হইয়াছেন।

পাশা খেলা চলিতেছিল, এমন সময় ঝড়ের মত আসিয়া রামশরণ সেখানে প্রবেশ করিল। নিজ প্রভুকে দেখিয়া বলিল, "বাবু—বাবু—জল্দি বাড়ী আসুন—"

তাহার মুখ চক্ষু দেখিয়া ভীত হইয়া মহেন্দ্র ঘোষ বলিলেন, "কেন রে—কারু অসুখ বিসুখ?"

"বাড়ীমে একঠো ডাকু এসেছে।"

সকলেই উৎসুক হইয়া উঠিলেন।

মহেন্দ্র ঘোষ বলিলেন, "ডাকু? দিনের বেলায় ডাকু?"

রামশরণ বলিল, "ডাকু হোবে কি জুয়াচোর হোবে কি পাগল আদ্মি হোবে কিছু ঠিকানা নাই। সে বলে কি হাম বাবুর দামাদ আছি।"

ইহা শুনিয়া অন্য সকলে হাস্য করিলেন। কিন্তু মহেন্দ্র ঘোষ উত্তেজিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কখন এল? কি করছে?"

"এই তিন বাজে এসেছে। একঠো লাঠি এনেছে, একঠো বন্দুক এনেছে—অন্দরমে গিয়ে জল উল খেয়েছে। মাইজি লোগ্‌কো বড়া ডর হয়েছে।"

"বন্দুক এনেছে? লাঠি এনেছে?—হতভাগা পাজি শুয়ার—তুই বাড়ী ছেড়ে এলি কার জিম্মায়?" বলিয়া ক্ষিপ্তের মত মহেন্দ্রবাবু বাহির হইলেন। গাড়ী প্রস্তুত ছিল। লম্ফ দিয়া গাড়ীতে উঠিয়া হাঁকিলেন, "জোরসে হাঁকাও।"

কয়েকজন উকীল সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিয়াছিলেন। কেহ বলিলেন—"বোধ হয় পাগল হবে।" কেহ বলিলেন—"না, পাগল হলে বন্দুক আনবে কেন? কোনও বদমায়েস গুণ্ডা হবে।" ছোট মহেন্দ্রবাবু (নলিনীর শ্বশুর) বলিয়া দিলেন, "পাগলই হোক, গুণ্ডাই হোক, ধরে পুলিসে হ্যাণ্ডোভার করে দিও।"

গাড়ী নক্ষত্রবেগে ছুটিল—বাড়ীতে পৌঁছিলে, গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া মহেন্দ্র বাবু বলিলেন, "কই? কোথায়?"

এমন সময় নলিনী কক্ষ হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। গৃহস্বামীকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "আপনিই মহেন্দ্রবাবু? আপনার কাছে আমার একটা ক্ষমা প্রার্থনা করবার আছে।"

নলিনীর ভাবভঙ্গী ও কথাবার্ত্তায় মহেন্দ্রবাবু একটু থতমত খাইয়া গেলেন। বাড়ী পৌঁছিয়াই যেরূপ প্রহারের বন্দোবস্ত করিবেন ভাবিয়াছিলেন, তাহাতে বাধা পড়িয়া গেল।

মহেন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে আপনি?"

"আমার নাম নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়। আমি মহেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জামাতা। মহেন্দ্রবাবু উকীলের বাড়ী গাড়োয়ানকে বলেছিলাম, সে আমাকে এখানে এনে ফেলেছে। আমি আমার ভুল এই অল্পক্ষণ মাত্র জানতে পেরেছি। এতক্ষণ চলে যেতাম। আপনাকে আনতে লোক গিয়েছে—আপনার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করে তবে যাব, এইজন্যে অপেক্ষা করছি।"

এই কথা শুনিয়া মহেন্দ্র ঘোষের রাগ জল হইয়া গেল। তিনি নলিনীর হাত দুখানি নিজ হস্তে ধারণ করিয়া হো-হো শব্দে অনেকক্ষণ হাস্য করিলেন।

শেষে বলিলেন, "মহিনের জামাই তুমি? বেশ বেশ। দেখ, এখানে দুজন মহেন্দ্র বাবু উকীল থাকাতে, মক্কেল নিয়ে মাঝে মাঝে গোলমাল হয় বটে। হয়ত মফঃস্বল থেকে কোনও উকীল, আমার কাছে এক মোকর্দ্দমা পাঠিয়ে দিলে, মক্কেল কাগজপত্র নিয়ে গিয়ে উপস্থিত হল তোমার শ্বশুরবাড়ীতে। কিন্তু জামাই নিয়ে গোলমাল এই প্রথম!"—বলিয়া মহেন্দ্র ঘোষ অপরিমিত হাস্য করিতে লাগিলেন।

তাহার পর নলিনীকে লইয়া বৈঠকখানায় বসাইলেন। কিঞ্চিৎ গল্পগুজবের পর, নলিনীর জন্য একটি ভাড়াটিয়া গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। নলিনী তখন বিদায় গ্রহণ করিয়া নিজ শ্বশুরালয় অভিমুখে যাত্রা করিল।

॥ ৫ ॥

এদিকে কেদারবাবু উকীলের বাড়ীতে, সে অপরাহ্নে পাশা খেলা আর ভাল জমিল না। মহেন্দ্র ঘোষ প্রস্থান করিলে, সেই সভায় অনেকে অনেক আশ্চর্য্য জুয়াচুরির গল্প করিলেন। অনেক পাগলের গল্পও হইল। ক্রমে সভাভঙ্গ হইল। উকীলগণ একে একে নিজ আলয়ে ফিরিয়া গেলেন।

মহেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ী শাগঞ্জ মহল্লায়। তিনি বাড়ী ফিরিয়া, চা ও তাওয়াদার তামাক হুকুম করিলেন। আপিস কক্ষে ঈজিচেয়ারে বসিয়া, চা-পান করিতে লাগিলেন। ভৃত্য একটি বৃহদাকার ছিলিম আলবোলায় চড়াইয়া, গুলের আগুনে মৃদু মৃদু পাখার বাতাস করিতে লাগিল।

চা-পান শেষ হইলে, মহেন্দ্রবাবু আলবোলার নলটি মুখে করিয়া আরামে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ এইরূপে কাটিলে পর, একটি ভাড়াটিয়া গাড়ী কম্পাউণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিল। উকীলের বাড়ী, কত লোক আসে যায়, মহেন্দ্রবাবু কিছুই ব্যস্ত হইলেন না, কিন্তু চক্ষু উন্মীলন করিয়া রহিলেন।

বাহির হইতে শব্দ শুনিলেন, একটি অপরিচিত কণ্ঠস্বর বলিতেছে, "এই মহেন্দ্র-বাবুর বাড়ী?"

"হাঁ বাবু!"

"খবর দাও, বল বাবুর জামাই এসেছেন।"

এই 'জামাই' শুনিয়াই মহেন্দ্রবাবু কেদারা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন। জানালার পর্দা তুলিয়া দেখিলেন—বৃহৎ যষ্টিহস্তে ষণ্ডামার্ক আকারের একজন লোক দাঁড়াইয়া আছে, গাড়োয়ান গাড়ীর ভেতর হইতে একটা বন্দুকের বাক্স বাহির করিতেছে।

দেখিয়াই মহেন্দ্রবাবু হাঁকিলেন, "কোই হ্যায় রে?"—বলিতে বলিতে বাহিরে আসিয়া বারান্দায় দাঁড়াইলেন।

তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়া বেচারা নলিনী একটু থতমত খাইয়া গেল।

মহেন্দ্রবাবু দাঁতমুখ খিঁচাইয়া সপ্তমে বলিলেন, "পাজি বেটা জুয়াচোর—ভাগো হিঁয়াসে। আভি ভাগো। ঘুরে ফিরে শেষে আমার বাড়ীতে এসেছ? শ্বশুর পাতাবার আর লোক পেলে না? বেটা বদমায়েস গুণ্ডা!"

ইতিমধ্যে অনেকগুলি ভৃত্য দারোয়ান আসিয়া পড়িয়াছিল। মহেন্দ্রবাবু হুকুম দিলেন, "মারকে নিকাল দেও। গর্দ্দান পাকড়কে নিকাল দেও।"

ভৃত্যগণ নলিনীকে আক্রমণ করিবার উপক্রম করিল। তাহা দেখিয়া নলিনী তাহার বৃহৎ যষ্টি মস্তকোপরি ঘূর্ণিত করিয়া বলিল, "খবরদার! হাম্ চলা যাতা হ্যায়। লেকেন্ যো হাম্‌কো ছুয়েগা, উস্‌কা হাড্ডি হাম্ চুরচুর কর ডালেঙ্গে!"

নলিনীর মূর্ত্তি ও লাঠি দেখিয়া ভৃত্যগণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নলিনী মহেন্দ্রবাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "আপনি ভুল করেছেন। আমি আপনার জামাই নলিনী।"

একথা শুনিয়া মহেন্দ্রবাবু অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বলিলেন, "বেটা জুয়াচোর! তুমি শ্বশুর চেন আর আমি আমি জামাই চিনিনে? আমার জামাইয়ের এ রকম গুণ্ডার মত চেহারা? —ভাগো হিঁয়াসে—নিকালো হিঁয়াসে—নয়ত আভি পুলিশমে ভেজেঙ্গে—"

নলিনী আর দ্বিরুক্তি করিল না। গাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া গাড়োয়ানকে বলিল, "চলো ষ্টেশন।"

॥ ৬ ॥

গোলমাল থামিলে, তাওয়াদার তামাকটা শেষ করিয়া মহেন্দ্রবাবু বাড়ীর মধ্যে গেলেন।

তাঁহার গৃহিণী তাঁহাকে দেখিবামাত্র বলিলেন, "মদ খেয়েছ নাকি? জামাইকে তাড়ালে?"

মহেন্দ্রবাবু গম্ভীরস্বরে বলিলেন "জামাই কাকে বল? সে একটা জুয়াচোর!"

"জুয়াচোর কিসে জানলে?"

তখন মহেন্দ্রবাবু, পাশা খেলিবার কালে কেদারবাবুর বাসায় যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন, সমস্ত বলিলেন।

শুনিয়া গৃহিণী বলিলেন, "বেশ ত, কিন্তু তাতেই কি প্রমাণ হয়ে গেল যে সে জুয়াচোর? দুজনেরই এক নাম—বাড়ী ভুল করে সেখানে গিয়ে ওঠাই কি আশ্চর্য্য নয়?"

স্ত্রীর মুখে এ যুক্তি শুনিয়া মহেন্দ্রবাবু একটু দমিয়া গেলেন। লাঠি ও বন্দুক দেখিয়াই হঠাৎ তিনি বুদ্ধিহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন—এ সকল কথার ভালরূপে বিচার করিয়া দেখিবার অবসর পান নাই।

একটু ভাবিয়া মহেন্দ্রবাবু বলিলেন, "সে যদি হত—তা হলে খবর দিয়ে আসত—আমরা ষ্টেশনে তাকে আনতে যেতাম। কথা নেই, বার্ত্তা নেই, হঠাৎ কখনও জামাই প্রথমবার শ্বশুরবাড়ী এসে উপস্থিত হয়? সে জুয়াচোর—জুয়াচোর!"

"কেন আসবার কথা থাকবে না? আসবার কথা ত রয়েছে। পূজোর আগেই আসবে আমরা ত জানি—তবে ঠিক কবে আসবে তা খবর ছিল না বটে।"

পিতার এই বিপদ দেখিয়া, কুসুমবালা বলিলেন, "ওগো সে নলিনী নয়—আমি তাকে

দেখেছি।"

মহেন্দ্রবাবু বলিলেন, "তুই দেখিছিস নাকি? বল্ ত!—বল্ ত! কোথা থেকে দেখলি?"

"যখন ঐ গোলমালটা হ'ল, আমি দোতালায় উঠে জানালা দিয়ে দেখলাম। নলিনী আমাদের ননীর পুতুল। এ ত দেখলাম একটা কাটখোট্টা জোয়ান।"

মহেন্দ্রবাবু অত্যন্ত আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, "ঠিক বলেছিস। আমি ত সে কথা তার মুখের উপরই বলে দিয়েছি। আমি আমার জামাই চিনিনে? তার কি অমন মিরজাপুরী গুণ্ডার মত চেহারা? তার দিব্যি নধর বাবু-বাবু চেহারাটি। বিয়ের সময় একদিন মাত্র দেখেছি বটে—তা ব'লে এমনিই কি ভুল হয়?"

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় একজন ভৃত্য আসিয়া বলিল, "বাবু, টেলিগেরাপ এসেছে।"

টেলিগ্রাম পড়িয়া মহেন্দ্রবাবুর মুখ শুকাইয়া গেল। ইহা সেই নলিনীর প্রেরিত গতকল্যকার চারি আনা মূল্যের টেলিগ্রাম।

গৃহিণী বলিলেন, "খবর কি?"

নিতান্ত অপরাধীর মত, মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে মহেন্দ্রবাবু বলিলেন, "এই ত টেলিগ্রাম এসেছে। সে তবে দেখছি জামাই-ই বটে।"

গৃহিণী বলিলেন, "তবে এখন ফেরাবার কি উপায় হয়?"

"যাই, নিজে গিয়ে দেখি। যাবার সময় গাড়োয়ানকে বলেছিল 'ষ্টেশনে চল'। এখন ত কলকাতা যাবার কোনও গাড়ী নেই। বোধ হয় ষ্টেশনে গিয়ে ব'সে আছে। যাই, গিয়ে বাপু বাছা বলে ফিরিয়ে আনি।"

বাড়ীর লোকে মনে করিয়াছিল, নলিনী এই ব্যাপার লইয়া শালীশালাজকে ঠাট্টা করিয়া গায়ের ঝাল মিটাইবে। কিন্তু নলিনী ফিরিয়া আসিয়া একদিনের জনাও সে কথা উত্থাপন করে নাই। যে ভুল হইয়া গিয়াছে তাহার জন্য তাহার শ্বশুরবাড়ীর সকলেই লজ্জিত, অনুতপ্ত—তাহাই নলিনীর পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছিল। একদিন কেবল অন্য প্রসঙ্গে মহেন্দ্র ঘোষ উকীলের কথা উঠিলে সে বলিয়াছিল—"যা হোক, পরের শ্বশুরবাড়ীতে উঠে যে আদর যত্ন পেয়েছিলাম—অনেকে সে রকম নিজের শ্বশুরবাড়ীতে পায় না।"

[বৈশাখ, ১৩১৩]

আমার উপন্যাস

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমি যখন শেষ পরীক্ষা দিয়া মেডিক্যাল কলেজ হইতে বাহির হইলাম তখন আমার বয়ঃক্রম দ্বাবিংশতি বর্ষ মাত্র। আমার যথেষ্ট পৈতৃক সম্পত্তি থাকাতে চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করার তাদৃশ প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু গ্রামস্থ সকলেই বলিলেন—যখন এত পরিশ্রম করিয়া, এত অর্থব্যয় করিয়া ডাক্তারিটা পাসই করিলে, তখন প্র্যাকটিস না করাটা মোটেই ভাল দেখায় না। কথাটা যথার্থ বলিয়াই মনে হইল। কিন্তু ডাক্তারি চোগা চাপকান পরিহিত স্থূলকায় (কারণ ভাল পসার হইলে ঘি দুধ নিশ্চয়ই বেশী করিয়া খাইব) অত্যন্ত গম্ভীর নিজের ভবিষ্য মূর্ত্তিটি কল্পনা করিয়া বড়ই হাসি পাইতে লাগিল।

ডাক্তার হইবার উচ্চাভিলাষ আমার কোন কালেই ছিল না। আমার একমাত্র উচ্চাভিলাষ ছিল, তাহা উপন্যাসের নায়ক হইবার জন্য। বাল্যকাল হইতেই উপন্যাস পাঠে আমার অতিরিক্ত পরিমাণ আসক্তি জন্মিয়াছিল। আমার প্রথম উপন্যাস পাঠ বঙ্কিমবাবুর

"আনন্দ-মঠ।"। মনে আছে আমার বয়স তখন একাদশ বর্ষ মাত্র। সেই বৎসর নূতন "আনন্দ-মঠ" বাহির হইয়াছে। আমার মেজদাদা মহাশয় কলিকাতায় কলেজে পড়িতেন. পূজার ছুটিতে বাড়ী আসিবার সময় বহিখানি আনয়ন করেন। তিনি আসিয়া হঠাৎ প্রচার করিয়া দিলেন যে তিনি একজন 'সন্তান', চিরদিন অবিবাহিত থাকিয়া দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করিবেন। গ্রামস্থ অন্যান্য নব্য যুবকগণের সহিত মিলিত হইয়া গোপনে অনেক পরামর্শ করিতে লাগিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলে আমায় কিছুই বলিতেন না, —আশা দিতেন, বড় হইলে আমায় দীক্ষিত করিবেন। অত্যন্ত কুতূহলী হইয়া "আনন্দ-মঠ"খানি অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু মেজদাদা সেখানি কোথায় যে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, কিছুতেই পাইলাম না। হতাশ হইয়া অবশেষে তাঁহাদের মন্ত্রণাসভায় আড়ি পাতিলাম। যে ঘরে তাঁহাদের সভা বসিত, পূর্ব্বে হইতে একদিন সেই ঘরে চৌকীর নীচে লুকাইয়া রহিলাম। যাহা শুনিলাম, তাহা আর এক্ষণে প্রকাশ করিব না, কারণ দাদা মহাশয় এখন পূর্ব্ববঙ্গের একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট্। সম্প্রতি একটি স্বদেশী মোকর্দ্দমায় কয়েকজন বিদ্যালয়ের বালককে জেলে দিয়া তাঁহার পদোন্নতির সম্ভাবনাও হইয়াছে।

অনেকক্ষণ ঠাণ্ডা মেজেতে উপুড় হইয়া পড়িয়া থাকার জন্যই হউক, অথবা অত্যধিক পরিমাণে কাঁচা তেঁতুল খাইয়াই হউক, ইহার একদিন পরেই আমি জ্বরে পড়িলাম। জ্বর ছাড়িলেও কয়েক দিন অবধি আমার সাবধান পিতামাতা আমাকে সাগু বার্লি ভিন্ন কিছুই খাইতে দিলেন না। পেটের জ্বালায় অস্থির হইয়া খাদ্যান্বেষণ করিতে করিতে হঠাৎ "আনন্দ-মঠ"খানি একদিন হাতে পড়িল। সেইদিনই সমস্ত বহিখানি পাঠ করিয়া ফেলিলাম। স্মরণ আছে, দুর্ভিক্ষপীড়িতগণ ইন্দুর পোড়াইয়া খাইতেছে পড়িয়া আমারও মনে হইয়াছিল, আমিও এ সময় দুই একটা পোড়া ইন্দুর পাইলে খাইয়া ফেলি।

তাহার পর হইতে যতই বয়স বাড়িতে লাগিল, বাঙ্গালা ইংরাজি বহু উপন্যাস গলাধঃকরণ করিতে লাগিলাম। নিজের দৈনন্দিন গদ্যময় জীবনটার উপর বড়ই অশ্রদ্ধা জন্মিতে লাগিল। অভিভাবকগণের নির্ব্বন্ধাতিশয় সত্ত্বেও বিবাহ করিলাম না; পূর্ব্বরাগ-বর্জ্জিত. অ্যাডভেঞ্চার-লেশ-হীন বিবাহ করিতে কিছুতেই মন উঠিল না।

উপন্যাসের নায়ক হইবার পক্ষে আমার একটা বিশেষ ব্যাঘাতও ছিল, তাহা আমার বাহ্যাবয়ব। চেহারাটি আমার মোটেই উপন্যাসের নায়কের মত নহে।

কিন্তু বিধাতা যে কি উপায়ে কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেন, বুঝা কঠিন। এই অনায়কোচিত মূর্ত্তিই একদিন আমাকে উপন্যাসের স্বপ্নরাজ্যে অবতীর্ণ করিয়া দিল।

বন্ধুগণের প্ররোচনায় ডাক্তারি ব্যবসায় করিব বলিয়াই কৃতসংকল্প হইয়াছিলাম। গ্রামে বসিয়াই ডাক্তারি করিব—বিষয় সম্পত্তিও দেখিতে শুনিতে পারিব। ঔষধ, আলমারি প্রভৃতি কিনিবার জন্য কলিকাতা যাত্রা করিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তখন বর্ষাকাল। কলিকাতায় প্রায়ই বৃষ্টি হইতেছে। পূর্ব্বে যে মেসের বাসায় থাকিয়া পড়িতাম. সেইখানেই গিয়া উঠিলাম। সপ্তাহখানেক থাকিয়া, দেখিয়া শুনিয়া, আসবাবপত্র কিনিব ইচ্ছা ছিল। প্রাতে উঠিয়াই প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিতে যাইতাম,—এটি আমার বহুদিনের অভ্যাস। একখানি শুষ্ক বস্ত্র ও গামছা স্কন্ধে করিয়া নগ্নপদে সাতটার পূর্ব্বেই স্নানে বাহির হইতাম। গঙ্গাস্নানের জন্য একযোড়া স্বতন্ত্র বস্ত্র ছিল. কারণ সে সময় গঙ্গার জল অত্যন্ত ঘোলা, কাপড় ময়লা হইয়া যাইত।

তিন চারিদিন কলিকাতায় অতিবাহিত হইলে, একদিন স্নান করিয়া যেই মাত্র ঘাটে উঠিয়াছি. সিক্ত বস্ত্রখানি পরিবর্ত্তন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনের উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় দেখিলাম. একটি বাবু হন্ হন্ করিয়া ঘাটে আসিয়া, ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে

লাগিলেন। লোকটির স্নানের বেশ ছিল না, কামিজের উপর চাদর লম্বমান ছিল। বয়স অনুমান চল্লিশ বৎসর। লোকটির চেহারা শুষ্ক, অনেক দিন ক্ষৌরকার্য্য না হওয়াতে মুখখানা দেখিতে বিশ্রী হইয়াছে,—যেন তাঁহাকে দেখিবার, যত্ন করিবার কেহ নাই বলিয়া, বোধ হইল। তিনি আসিয়া স্নানকারী ব্যক্তিগণের মধ্যে ব্যস্তভাবে যেন কাহাকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। হঠাৎ আমার কাছে আসিয়া আমার প্রতি তীক্ষ্ম দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "বামুন ঠাকুর?"

আমি ব্রাহ্মণ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই—কিন্তু বামুন ঠাকুর পদবীলাভ ইতিপূর্ব্বে কখনও ঘটে নাই। ভাবিলাম, বোধ হয় লোকটি আমাকে অন্য কোনও নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি বলিয়া ভ্রম করিতেছেন।

আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া বাবুটি অধীর হইয়া বলিলেন, "কি বিপদ! উত্তর দাও না কেন? তুমি কি বামুন ঠাকুর?"

হায়! আমার মূর্ত্তি নায়কোচিত না হইলেও কি একেবারেই পাচক ব্রাহ্মণের মত? বুঝিলাম, বাবুটি একজন রাঁধুনি অন্বেষণ করিতেছেন। মস্তকে কি খেয়াল চাপিল, বলিলাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কোথাও চাকরি কর?"

"আজ্ঞে না।"

"করবে?"

"পেলে ত করি।"

"রাঁধতে জান?"

"আজ্ঞে জাতব্যবসা,—ওটা আর জানিনে?"

"বাড়ী কোথা?"

"যশোর।"

"নাম?" "শ্রীহারাধন মুখোপাধ্যায়।"

"কলকেতায় কতদিন এসেছ?"

"এই, চার পাঁচদিন হবে।"

"চাকরির চেষ্টায়?"

"আজ্ঞে তা নইলে কি থিয়েটার দেখতে এসেছি?"

বাবুটি চটিয়া গেলেন। বলিলেন, "দেখ হ্যা, তোমার মুখটা ভাল নয়। তুমি বড় অসভ্য। ভদ্রলোকের সঙ্গে এই রকম করে কথা কইতে হয়?"

মনে মনে বড় আমোদ অনুভব করিলাম। ইহার রাঁধুনিগিরি দিন দুই করিয়া দেখিলে ক্ষতি কি? এই এক অ্যাডভেঞ্চারের সুযোগ জুটিয়া গিয়াছে। সুতরাং বিনীত হইয়া বলিলাম, "আজ্ঞে পাড়াগেঁয়ে মানুষ, কিছু জানি শুনিনে। তা, অপরাধ নেবেন না কর্ত্তা।"

বাবুটি নরম হইয়া বলিলেন, "হুঁ।" একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "সত্যি বামুন? না বামুন সেজেছ? গলায় একগাছা পৈতে দিয়ে অনেক ব্যাটা হাড়ি মুচি কলকেতায় এসে বামুন হয়।"

হায় হায়, আমার মূর্ত্তিটি কি তবে হাড়ি মুচির বলিয়াও ভ্রম হওয়ার সম্ভাবনা? বাবুটির "সভ্যতা"র আমি বিশেষ প্রশংসা করিতে পারিলাম না। প্রকাশ্যে, একটু বিনীত হাস্য করিয়া বলিলাম, "আজ্ঞে ও সব জাল জুয়াচুরির ধার দিয়েও যাইনে।"

বাবুটি আবার আমায় জেরা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন—

"আচ্ছা, কেমন বামুন, গায়ত্রী বল দেখি?"

আমি গায়ত্রী আবৃত্তি করিলাম। এই ভণ্ডামি করিবার সময় সুপবিত্র গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, মনে সাপরাধ অনুশোচনা উপস্থিত হইল।

বাবুটি ওষ্ঠযুগল কুঞ্চিত করিয়া, সন্দিগ্ধভাবে মাথাটি নাড়িতে লাগিলেন। বলিলেন, "কিছু বোঝা গেল না। আজকাল ছাপার বই হয়েছে, চার পয়সা দিয়ে একখানা কিনে গায়ত্রী, সন্ধ্যা মুখস্থ করে নিলেই হল।"

একটু দুঃখের ভাণ করিয়া বলিলাম, "কর্ত্তা যদি বিশ্বাস না করেন তা হলে কি করি?"

বাবুটির মুখে একটু উৎসাহের চিহ্ন দেখা গেল। সহসা বলিলেন, "আচ্ছা, পৈতে গ্রন্থি দেয় কি মন্ত্র বলে, বল দিকিন? এটা আর কোন ছাপার কেতাবে নেই।"

আমি গম্ভীরভাবে বলিলাম—"ভরদ্বাজ-আঙ্গিরস-বার্হস্পত্য-প্রবরস্য।"

শুনিয়া বাবুটি বলিলেন, "তবে ঠিক বামুনই বটে। কত মাইনে নেবে?"

"আজ্ঞে, কর্ত্তার কি হুকুম হয়?"

"তুমিই বল না।"

"কলকেতার রেট তো বাঁধা আছে।"

"কত?"

আমাদের বাসার বামুনের মাহিনা পাঁচ টাকা আর খোরাক পোষাক ছিল। তাই সাহস করিয়া বলিলাম, "পাঁচ টাকা।"

"পাঁচ টাকা না পঁচিশ টাকা! কে বললে তোমায় কলকেতার রেট পাঁচ টাকা?"

"আজ্ঞে, অনেক ছাত্রদের মেসের বাসায় ত বামুনের মাইনে পাঁচ টাকা আর খোরাক পোষাক আছে।"

"মেসের বাসা আর গেরস্তর বাড়ী সমান? ছাত্রদের মেসের বাসার চাকরি, আজ আছে কাল নেই। যদি চার টাকায় রাজি হও ত বল। চার টাকা, খোরাক, আর বছরে দুখানা কাপড় দুখানা গামছা।"

আমি মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলাম, "আজ্ঞে চার টাকায় কি করে চলবে? বহু পরিবার, তাদের খাওয়াব কি?"

"বহু পরিবার? ক'জন খানেওয়ালা?"

"আজ্ঞে বুড়ো মা বাপ, ভাই,—"

বাধা দিয়া বাবুটি বলিলেন, "ঈশ্! রাঁধুনিগিরি করে বুড়ো মা বাপ ভাইকে খাওয়াবেন! আমার একশো টাকা মাইনে, আমিই পারিনে!—নিজের স্ত্রীসন্তানকে খাওয়াতেই সব টাকা খরচ হয়ে যায়। চার টাকা থেকে এক টাকা জমাবে,—তিন টাকা মাসে মাসে তোমার স্ত্রীকে পাঠিয়ে দিও এখন।"

"আজ্ঞে, বিবাহ করিনি।"

"কি, কুলীন বামুন এখনও বিবাহ করনি?"

"না।"

"কেন? কোনও দোষ-টোষ আছে নাকি?"

"দোষ—দারিদ্র্যদোষ। এত গরীবকে কে মেয়ে দেবে?"

"বিয়ে করনি ভালই করেছ। সাহেবেরা নিজে বিলক্ষণ উপার্জ্জন করতে না পারলে বিবাহ করে না। যদি ইংরাজি জানতে, ওদের কেতাবেই দেখতে পেতে। আমাদের আপিসের ছোট সাহেব, পাঁচশো টাকা মাইনে পায়, এখনও বিবাহ করেনি।"

আমি চারি টাকা স্থানে পাঁচ টাকা করিবার জন্য অনেক পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলাম। অবশেষে সাড়ে চারি টাকায় রফা হইল। বাবুটি বলিলেন—যদি ভাল কাযকর্ম্ম করিতে পারি, পলায়ন না করি, তবে বৎসরান্তে বেতন বৃদ্ধি সম্বন্ধে "বিবেচনা" করিবেন। এখনি আমাকে গিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। তাঁহার গৃহিণী পীড়িতা। আজ দুই দিন তাঁহার বামুন পলায়ন করাতে বিশেষ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এইরূপে অভাবনীয় ভাবে পাচক ব্রাহ্মণ হইয়া বাবুটির পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। ভাবিতে লাগিলাম, অনেক আরাধনার পর অবশেষে আমার অদৃষ্টে এই এক অ্যাডভেঞ্চার জুটিল। দেখা যাউক, ইহার মধ্য হইতে কোনও রহস্যলাভ হয় কি না।

বাবুটির নাম কালীকান্ত রায়। ব্রাহ্মণ। তাঁহার বাসা চোরবাগানে। প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, ক্ষুদ্র উঠানটিতে আমের আঁটি, পরিত্যক্ত ভাত তরকারী ও শালপাতার রাশি স্তূপাকার হইয়া রহিয়াছে। উঠানের এক কোণে একটি জলের কল, তাহার পার্শ্বে একটি হাউজ। নলের গলায় কাপড়ের পাড় দিয়া একটি বাঁশের চোঙা বাঁধা রহিয়াছে, তাহা বহিয়া জল হাউজে পড়িতেছে।

কালীকান্তবাবু প্রবেশ করিয়া, ঊর্দ্ধে দ্বিতলের বারান্দার পানে চাহিয়া বলিলেন— "গিন্নী—অ গিন্নী"—

তাঁহার গলার স্বর শুনিয়া বারান্দায় একটি বালিকা আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "বাবা চেঁচিও না। মা এখন ঘুমুচ্ছেন।"

সেই আমাদের প্রথম চারিচক্ষে মিলন। রোমিও ও জুলিয়েটের অলিন্দ-দৃশ্য মনে পড়িল। আমার জুলিয়েট আলুলায়িত-কুন্তলা, দোতলার বারান্দা হইতে দেখিলেন স্কন্ধে গামছা, হস্তে ভিজা কাপড়, পাচক-ব্রাহ্মণরূপী রোমিও মুগ্ধনেত্রে দণ্ডায়মান। জুলিয়েটের বয়স চতুর্দ্দশ বর্ষ ছিল, আমার জুলিয়েটের বয়সও তাহাই বলিয়া অনুমান করিলাম। তাহার দেহবর্ণটি ইতালীয় 'জুলিয়েট অপেক্ষা কিছু মলিন হইলেও, কিন্তু মুখ চক্ষুর সৌন্দর্য্য অপরাভূত।

কালীকান্তবাবু বলিলেন, "প্রিয়, আয় নেমে আয় দিকিন।"

'প্রিয়'? প্রিয়তমা না প্রিয়ম্বদা? প্রিয়বালাও হইতে পারে। 'প্রিয়তমা' না হইলেই ভাল। পৃথিবীশুদ্ধ লোকই কি 'প্রিয়তমা' বলিয়া ডাকিবে? প্রিয়বালা নামটি মধুর। কিন্তু প্রিয়ম্বদা নামটি মধুর এবং কাব্যগন্ধি। প্রিয়ম্বদা শকুন্তলার, কিন্তু প্রিয়বালা আধুনিক উপন্যাসের মাত্র।

পায়ের চারিগাছি মল ঝুম্ঝুম্ করিয়া, বালিকা নামিয়া আসিল।

আসিয়া পিতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, তাঁহার মুখের প্রতি প্রশ্নযুক্ত দৃষ্টিপাত করিল।

আমাকে দেখাইয়া কালীকান্তবাবু বলিলেন, "প্রিয়, এই একজন বামুনঠাকুর এনেছি। সব যোগাড়-যন্তর করে দে।"

হায়, এরূপ সূচনা ত কোন কাব্যেই লেখে না! বালিকা কি পরীকন্যা ও রাজকন্যা-দের গল্প পাঠ করিয়া, জাগ্রতে বা নিদ্রায় স্বপ্ন দেখে নাই যে, তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য কোন পুষ্পময় রাজ্য হইতে একজন রাজপুত্র আসিয়া দণ্ডায়মান? তাহার কিশোর হৃদয়ে কোনও পাচক ব্রাহ্মণ কি ঈপ্সিতরূপে কখনও স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে?

আমার কবিত্বময় চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়া বাবু বলিলেন, "আটটা বাজে। দশটায় আপিসের ভাত চাই, পারবে?"

আমি বলিলাম, "আজ্ঞে, দেখি চেষ্টা করে।"

"যা হয় দুটো ভাতেভাত। দুটো উনান জেলে একদিকে ভাত একদিকে ডাল চড়িয়ে দাও। আমি বাজার থেকে মাছ কিনে আনি। তরী তরকারী সব ঘরেই আছে।"

প্রিয় বলিল, "সব আছে।"

অতঃপর বাবু একখানি গামছা লইয়া মাছ কিনিতে বাহির হইলেন।

আমি তখন বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "রান্নাঘর কোন্ দিকে?"

"এইদিকে এস।"—বলিয়া প্রিয়, আমাকে সঙ্গে করিয়া অন্য বারান্দায় লইয়া গেল। একটি ঘরের শিকল খুলিতে খুলিতে বলিল—"এই রান্নাঘর।"

প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, তখন চুল্লীতে অগ্নিসংযোগ হয় নাই। বলিলাম, "এখনও

যে কিছুই যোগাড় হয়নি। ঝি কোথায়, উনুন ধরিয়ে দিক না।"

বালিকা বলিল, "ঝি ত আমাদের নেই। মাসখানেক হল ঝি পালিয়েছে, মা বলেছেন ঝি আর রাখবেন না। আমিই সব করি। আমি উনুন ধরিয়ে দিচ্ছি।"

দেখিলাম ঘরের এক কোণে একগাদা কয়লা রহিয়াছে। আমি বলিলাম, "ঝি নেই? আচ্ছা তবে আমিই ধরাচ্ছি। তোমায় কষ্ট করতে হবে না।"—বলিয়া কয়লার গাদার নিকট গিয়া, একটি ডালায় করিয়া কয়লা ভরিয়া আনিলাম। উনান জ্বালিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

এ কার্য্য যে এত কঠিন তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না। প্রিয় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল, আর মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল। শেষে বলিল, "ঐ রকম করে বুঝি কয়লা ধরায়?"

আমি হতাশ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি রকম করে ধরায় বল দেখি?"

"সর আমি ধরাই। তুমি বরং এই মাছের ঝোলের জন্যে আলু পটোলগুলো কুটে ফেল।"

এই ময়লা পরিশ্রমসাধ্য কার্য্যে বালিকাকে নিযুক্ত হইতে দিতে আমার দুঃখ হইতে লাগিল। কিন্তু কি করি, উপায় নাই। দশটায় ভাত না পাইলে বাবু মহাশয় হৈচৈ কাণ্ড বাধাইয়া দিবেন। সুতরাং কয়লার চুলো বালিকাকে ছাড়িয়া দিয়া, হাত ধুইয়া আমি তরকারী কুটিতে বসিলাম।

দেখিলাম, বঁটিতে তরকারী কোটা মুস্কিল। ছুরী দিয়া এক রকম পারা যায়। আমাদের মেসে যখন ঠাকুর পলাইত, তখন আমরা অনেকে বসিয়া ছুরী দিয়া তরকারী কুটিতাম।

যাহা হউক, কোনমতে সাবধানে কুটিতে লাগিলাম। পাছে হাত কাটিয়া যায়, এ আশঙ্কাও ছিল। উনান ধরাইয়া প্রিয় আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল; গালে হাত দিয়া বলিল, "ও হরিবোল!"

আমি সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম "কি?"

"এই কি মাছের ঝোলের আলু কোটা নাকি?"

"কেন?"

"মাছের ঝোলের আলু কি চাকা চাকা করে কোটে? ও ত ভাজার আলু হচ্চে। মাছের ঝোলের আলু চৌচির করতে হয়।"

আমি অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম, "ওহ্!"

প্রিয় বলিল, "সর দেখি। আমি কুটি।"

আমি সরিলাম। কয়লার চুলায় পাখা দিয়া বাতাস করিতে লাগিলাম।

বালিকা একটু হাসিয়া বলিল, "রাঁধতে জান? না সেও এই রকম?"

আমি মনে মনে অত্যন্ত কৌতুক অনুভব করিয়া বলিলাম, "এই রকমই।"

"এই রকমই? আর কখনো এ কায করনি বুঝি? এই প্রথম নাকি?"

"এই প্রথম।"

"তবে চাকরি নিলে কেন?"

আমি চাকরি কেন নিলাম, তাহার উত্তর এখন দিলে সমস্তই পণ্ড হইয়া যাইবে। দিন দুই পরে যাইবার সময়, আর কাহাকেও না বলি, এই বালিকাকে বলিয়া যাইব স্থির করিলাম।

আমাকে নীরব দেখিয়া, বালিকা আমার মনোভাব অন্যরূপ বুঝিল। করুণায় তাহার মুখখানি ভরিয়া গেল। প্রশ্ন করিবার জন্য যেন অনুতপ্ত হইয়া বলিল, "তুমি বড় গরীব বুঝি?"

আমি চক্ষু নত করিয়া ধীরে ধীরে মাথাটি নাড়িলাম। তাহার সহানুভূতি গভীরতর

করিবার অভিপ্রায়ে বলিলাম, "আমি যে নতুন, কিছু জানিনে, তা শুনলে তোমার বাবা আমায় রাখবেন কি?—তাড়িয়ে দেবেন হয়ত।"

আমাকে সান্ত্বনা দিয়া বালিকা বলিল—"আচ্ছা আমি কাউকে বলব না। আমি সব তোমায় দেখিয়ে শুনিয়ে দেব এখন, তুমি দু'দিনে সব শিখে ফেলবে।"

"তোমার মা জানতে পারবেন না?"

"মা কি কখনও রান্নাঘরে আসেন? তিনি উপরেই থাকেন।"

"তাঁর নাকি অসুখ করেছে শুনলাম?"

"তাঁর বারমাসই অসুখ।"

"কি অসুখ?"

"এই কোন দিন মাথা ধরে, কোন দিন কিছু। তাঁর জন্যে কোন ভয় নেই। তিনি খুব বকেন বটে, কিন্তু উপর থেকেই বকেন। সিঁড়ি নামাওঠা করলে হাঁপিয়ে পড়েন।"

"খুব বকেন নাকি? তাই বুঝি ঝি বামুন সব পালায়?"

বালিকা এ কথায় যেন একটু লজ্জিত হইল। কথা ফিরাইবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার নাম কি?"

"প্রিয়ম্বদা।"

"প্রিয়ম্বদা? বেশ নামটি ত!"

মেয়েটি লজ্জায় মুখ নত করিল। আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমার ভাই বোন কটি?"

"আমার আপনার একটি ভাই।"

"আরও যে দু তিনটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে দেখলাম?"

"ওরাও আমার ভাই বোন। আমার এ মায়ের ছেলেপিলে।"

তখন বুঝিলাম, গৃহিণী প্রিয়ম্বদার বিমাতা। ঝি কেন আর রাখা হইবে না, তাহাও বুঝিতে পারিলাম। এই কোমলা বালিকার জন্য সহানুভূতিতে আমার হৃদয় ভরিয়া গেল।

এই সময় বাবু মাছ আনিয়া উপস্থিত করিলেন। বাহিরে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "কত দূর?"

আমি বলিলাম, "আজ্ঞে আর বেশী দেরী নেই।"

"যা হয় চট্‌পট্—বুঝলে? বেশী বাহুল্য কোরো না। আমি আপিসে বেরিয়ে গেলে তার পর বাকী সব কোরো এখন।"—বলিয়া তিনি উপরে উঠিয়া গেলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রথমে মনে করিয়াছিলোম, দিন দুই রাঁধুনিগিরির আস্বাদ গ্রহণ করিয়া আমার মাননীয় পূর্ব্ববর্ত্তিগণের পন্থানুসরণ করিব—অর্থাৎ 'পলায়ন' করিব। কিন্তু আজ একমাস যাবৎ স্থিরনিশ্চলভাবে চাকরি করিতেছি। বলা বাহুল্য, প্রিয়ম্বদার সুন্দর মুখখানি আমার স্বর্ণশৃঙ্খলরূপ হইয়াছে। অথচ প্রিয়ম্বদা আমাকে এখনও রাঁধুনি বামুন বলিয়াই জানে। তবে তাহার ব্যবহারে বুঝিতে পারি, আমাকে সাধারণ বামুনঠাকুর হইতে একটু স্বতন্ত্র বলিয়াই সে মনে করে। প্রিয়ম্বদা মোটামুটি রকম বাঙ্গালা লেখাপড়া জানিত; আমি রান্নাঘরে বসিয়াই গৃহকার্য্যের অবসরে, তাহাকে পড়াইতে আরম্ভ করিয়াছি। এই এক-মাসের মধ্যে দুই তিনখানি ভাল ভাল বাঙ্গালা বহি সে অধ্যয়ন করিয়া ফেলিয়াছে। একদিন আমায় সে বলিয়াছিল, "তুমি রাঁধুনি বামুন না হয়ে ইস্কুলের পণ্ডিত হলে না কেন?"

আমি বলিয়াছিলাম, "তাই করব মনে করেছি। তোমার বিয়ে হয়ে গেলে আমিও চাকরি ছেড়ে চলে যাব।"

বিবাহের প্রসঙ্গে বালিকার গাল দুটি রক্তাভ হইয়া উঠিল। পরে জানিয়াছি, প্রিয়ম্বদার

বয়স চতুর্দ্দশ বর্ষ নহে,—ত্রয়োদশ বর্ষ মাত্র। কিন্তু তাহাকে বয়সের অপেক্ষা একটু বড় দেখাইত। এত বড় মেয়ের বিবাহ হয় নাই কেন, প্রথমে আমার একটু আশ্চর্য্য বোধ হইত। ক্রমে জানিতে পারিলাম—কালীকান্তবাবুর পুত্রগণের প্রাইভেট মাষ্টারের নিকট শুনিলাম—প্রিয়ম্বদার বিবাহের সম্বন্ধ মাঝে মাঝে হয় বটে, কিন্তু ইঁহারা যত সস্তায় খোঁজেন, তত সস্তায় কোন বর পাওয়া যায় না।

আমি ইহা শুনিয়া অবধি মনে করিয়া রাখিয়াছিলাম যে, একদিন কালীকান্তবাবুর নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়া তাঁহার কন্যার পাণিপ্রার্থনা করিব। প্রথম দুই তিনদিন যাইতে না যাইতেই প্রিয়ম্বদার সাহচর্য্য আমার হৃদয়ে সুখসঞ্চার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সে সুখ দিনের পর দিন ঘনীভূত হইতে লাগিল। সে সাহচর্য্যের বিচ্ছেদক্লেশ দিনের পর দিন তীব্রতর হইতে লাগিল। তখন ভাদ্র মাস। রাত্রে শয়ন করিবার জন্য অল্পদূরে একটি ঘর ভাড়া লইয়াছিলাম। কর্ম্মান্তে, দিবসে ও রাত্রিকালে সেইখানেই অবস্থিতি করিতাম। অধিক মূল্য দিয়া ঘরটি ভাড়া লইয়াছিলাম। ছবিতে, পুস্তকে, সুখসেব্য আসবাবে সেখানি সাজাইয়াছিলাম। কিন্তু সেখানে আমি সুখ পাইতাম না। সেই প্রায়ান্ধকার, ধূমমলিন, অপকৃষ্ট রান্নাঘরখানিই আমার সুখের আগার হইয়া উঠিয়াছিল। গভীর রাত্রে এক একদিন নিদ্রাভঙ্গ হইলে, বাহিরে অন্ধকারে মেঘগর্জ্জন শুনিতে পাইতাম। প্রবলভাবে বৃষ্টি আসিত। প্রিয়ম্বদাকে স্মরণ করিয়া কত সুখকল্পনা আমার মনকে ঘিরিয়া ফেলিত। ভাদ্র মাসে হিন্দুর বিবাহ হয় না। ভাবিয়া রাখিয়াছিলাম, আশ্বিন মাস পড়িলেই কালীকান্তবাবুকে বলিব, পূজার পূর্ব্বেই প্রিয়ম্বদাকে বিবাহ করিয়া বাড়ী লইয়া যাইব।

কিন্তু আবার শঙ্কাও হইত। কালীকান্তবাবু যদি আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন? করিবার ত কোনও কারণ দেখি না: তথাপি, যদি করেন? মন হইতে এ আশঙ্কা কিছুতেই বিদূরিত করিতে পারিতাম না। আমার অদৃষ্টে যদি প্রিয়ম্বদা-লাভের সুখ না থাকে তবে কি হইবে? কেমন করিয়া দীর্ঘজীবন কাটাইব? তখন বৈষ্ণব-কবির পদ মনে মনে গাহিতাম—

এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।

আমার মন্দির যদি চিরদিনই শূন্য থাকিয়া যায়?

কিন্তু আশ্বিন মাস আগমন করিবার পূর্ব্বেই দ্বিতীয় একটি অভাবনীয় ঘটনায়, আমার প্রিয়ম্বদা-লাভ শুধু সম্ভাবিত নহে, অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। যে অমৃত পান করিবার জন্য পিপাসায় উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলাম, সেই অমৃত আমার মুখের কাছে আনিয়া একজন বলিল—"পান কর—পান করিতেই হইবে।"

একদিন প্রভাতে কর্ম্মে গিয়া দেখি, প্রিয়ম্বদা গায়ে একখানি র‍্যাপার দিয়া আসিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, রাত্রে একটু জ্বরের মত হইয়াছিল, এখনও যেন শীত শীত করিতেছে।

এইরূপ পরদিনও হইল। জ্বরগায়ে, উপবাসে প্রিয় তাহার নির্দ্দিষ্ট গৃহকার্য্যগুলি করিতে লাগিল। সে কার্য্য বড় অল্প নয়। বাসন মাজা, কাপড় কাচা প্রভৃতি ঝির সমস্ত কার্য্যই তাহাকে করিতে হইত।

সেদিন কালীকান্তবাবুকে বলিলাম, তাঁহার কন্যার যেরূপ অসুস্থ দেহ, অন্ততঃ একটা ঠিকা ঝি আনিলে ভাল হয়।

শুনিয়া বাবু রাগিয়া উঠিলেন, "তুমি ত বলে খালাস। পাই কোথা আমি ঠিকা ঝি?"

বড় রাগ হইল। দুঃখও হইল। প্রিয়ম্বদার প্রতি অবহেলা আমার অসহ্য হইয়া উঠিতে লাগিল। কোথায় গেলে ঝির সন্ধান পাওয়া যায় আমি ত কিছুই জানিতাম না। তথাপি বলিলাম, "একটা সন্ধান করে দেখব কি?"

"পাও, দেখ" বলিয়া বাবু মুখ বাঁকাইয়া চলিয়া গেলেন।

সেদিন আমি ঝির অনেক অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু কৃতকার্য্য হইলাম না।

আর এক বিপদ হইল, প্রিয়ম্বদা সাগু বার্লি কিছুই খাইতে চাহে না। প্রথম দিন সদ্য অনাহারে ছিল। দ্বিতীয় দিন তাহার জন্য মাত্র এক পয়সার খই ব্যবস্থা হইল।

প্রিয় খাইতে খাইতে বলিল, "এ আমার ভাল লাগে না।"

আমি সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি খেতে ইচ্ছা করে তোমার ?"

"একটা বেদানা-টেদানা পেলে খাই।"

পরদিন বাবুকে বলিলাম, "প্রিয় সাগু বার্লি খায় না, ওর জন্যে কিছু বেদানা কি আঙুর আনিয়ে দিলে ভাল হত।"

বাবু বলিলেন, "বেদানা! আঙুর! জ্বরের উপর ওসব খেলে সদ্য বিকারে দাঁড়াবে। সর্ব্বনাশ! ওসব ভারি ঠাণ্ডা জিনিষ।"

আমি নীরব রহিলাম। অথচ স্বচক্ষে দেখিয়াছি, গত সপ্তাহে বাবুর আদরের এ পক্ষের পুত্রটির যখন জ্বর হইয়াছিল, বেদানা, আঙুর, বিস্কুট প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণেই বাড়ীতে আমদানি হইয়াছিল। মনে স্থির করিলাম, আজ ওবেলা আমি প্রিয়র জন্য কিছু খাদ্য আনিব;—তাহাতে যদি ইঁহারা রাগ করেন ত করিবেন।

সেদিন বৈকালে কর্ম্মে আসিবার সময় আমি এক বাক্স আঙুর, কয়েকটা বেদানা এবং কিছু বিস্কুট আনিলাম। কিন্তু প্রিয়ম্বদা সেদিন নামিল না। তাহার ছোট ভাই সুধীরচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, জ্বর খুব প্রবল।

মনের অশান্তিতে সান্ধ্যকর্ম্ম সমাপন করিলাম। বাসায় গিয়া সারা রাত্রি আমার নিদ্রা হইল না।

পরদিন প্রভাতে গিয়া আবার সুধীরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার দিদি কেমন আছেন ?"

"দিদি সমস্ত রাত খালি জল জল করেছে।"

"গা কি খুব গরম ?"

"একেবারে আগুনের মত।"

"এখন কেমন ?" "এখন ঘুমুচ্ছে।"

"রাত্রে তাঁর কাছে কে ছিল ?"

"আমিই ছিলাম। আমি আর দিদি এক সঙ্গে শুই কিনা।"

"তোমার মা কি ৴প দেখতে আসেন নি ?"

"বাবা শুতে যাবার আগে একবার দেখতে এসেছিলেন। অনেক রাত্রে দিদি যখন মাগো মাগো করে চেঁচাচ্ছিল, তখন মা একবার উঠে এসেছিলেন। বাইরে থেকে জানালা দিয়ে বললেন—'অত চেঁচিয়ে মরছিস্ কেন? বাড়ীসুদ্ধ লোককে ঘুমুতে দিবিনি? চুপ করে শুয়ে থাক্ পোড়ারমুখী।' তাই শুনে দিদি ভয়ে চুপ করে শুয়ে রইল।"

আমি উপরে কখনও যাই নাই। ঘরগুলির অবস্থান জানিতাম না। গৃহিণীর ভাত উপরে যাইত, তাহা প্রিয়ম্বদাই বরাবর লইয়া যাইত। গত কল্য সন্ধ্যার সময় কেবল বাবু স্বয়ং লইয়া গিয়াছিলেন।

সুধীরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি আর তোমার দিদি যে ঘরে থাক, সেটা কোনখানে ?"

"সিঁড়ি দিয়ে উঠেই বাঁ দিকে।"

মনে মনে স্থির করিলাম, আজ কর্ম্মান্তে প্রিয়ম্বদাকে গিয়া দেখিয়া আসিব। সুধীরকে বলিলাম—"দেখ, তুমি আজ ইস্কুলে যেও না। তোমার দিদিকে ত দেখবার কেউ লোক নেই।"

বেলা সাতটার সময় দেখিলাম বাবু চাদর লইয়া বাহির হইতেছেন। ভাবিলাম, বুঝি বা ডাক্তার আনিতে যাইতেছেন। ঘণ্টাখানেক পরে ফিরিয়া আসিলেন, সঙ্গে ডাক্তার নহে,

একজন ঝি। বলিলেন, "একটি ঝি ডেকে এনেছি। কি করতে কর্ম্মাতে হবে একে সব বলে দাও।"

দুইদিন পূর্ব্বে, যতক্ষণ প্রিয় একেবারে শয্যাগত হইয়া পড়ে নাই, ততক্ষণ অবধি ঝি দুষ্প্রাপ্য ছিল। আজ সেই ঝি সুপ্রাপ্য হইল। দিনকতক আগে আনিলে হয় ত মেয়েটা এত অধিক পীড়িত হইয়া পড়িত না। লোকটার প্রতি ঘৃণায় আমার অন্তঃকরণ বিষাক্ত হইয়া উঠিল। ছি ছি, দ্বিতীয়বার বিবাহ করিলে কি আপনার সন্তানের প্রতি এতই নির্ম্মম নিষ্ঠুর হইতে হয়? একেবারে কি কসাই হইয়াই উঠিতে হয়? ডাক্তার নাই, ঔষধ নাই, পথ্যও নাই। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, আজ আমি উপরে গিয়া প্রিয়ম্বদাকে দেখিবই দেখিব; তাহার ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিব। আমি যে নিজে ডাক্তার সেজন্য আমি নিজেকে এই প্রথম অভিনন্দন করিলাম।

যথাসময়ে বাবু আপিসে বাহির হইয়া গেলেন। ছেলেরা (সুধীর ছাড়া) ইস্কুলে গেল। গৃহিণীর ভাত উপরে দিয়া আসিলাম। সর্ব্বকর্ম্মান্তে যখন অবসর হইল তখন সুধীরকে বলিলাম, "চল, তোমার দিদিকে দেখি।"

সুধীরের সহিত উপরে গিয়া প্রিয়ম্বদার কক্ষে প্রবেশ করিলাম।

একটি মলিন ছিন্ন বিছানা মেঝের উপর পড়িয়া আছে। তাহাতে শুইয়া বালিকা ছট্‌ফট্‌ করিতেছে।

আমি কাছে গিয়া শানের উপর বসিলাম। তাহার হাতখানি লইয়া বলিলাম, "প্রিয়, কেমন আছ?"

প্রিয় চক্ষু মেলিল। আমাকে দেখিয়া বলিল, "বামুনঠাকুর? আমার মাথা যে যায়! কি করি?"

দেখিলাম প্রবল সর্দ্দিজ্বর। বলিলাম, "তোমার মাথা কামড়াচ্ছে? আচ্ছা, এখনি আমি ভাল করে দিচ্ছি।"

বলিয়া রান্নাঘরে গিয়া খানিকটা সরিষার তৈল গরম করিলাম। একটা সরায় করিয়া খানিকটা আগুন লইলাম। উপরে গিয়া, প্রিয়ম্বদার পায়ের নীচে সেই গরম তৈল দশ মিনিট ধরিয়া জোরে মালিস্ করিলাম। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলাম "এখন মাথাটা কেমন আছে?"

প্রিয় বলিল, "অনেক ভাল। আর কষ্ট নেই।"

তখন আবার প্রিয়ম্বদার নিকট গিয়া বসিলাম। ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া, জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া, একখানি প্রেস্ক্রিপ্সন লিখিলাম। বলিলাম, "প্রিয়, তুমি একটু শুয়ে থাক। আমি একঘণ্টার মধ্যে তোমার জন্যে ওষুধ আনছি।"

বলিয়া বাহির হইয়া, গাড়ী ভাড়া করিয়া, একটি প্রথম শ্রেণীর ঔষধালয় হইতে ঔষধ প্রস্তুত করাইয়া আনিলাম।

সেদিন বৈকালের মধ্যে প্রিয় অনেকটা সুস্থতা লাভ করিল।

এইরূপে আমি তিন চারিদিন চিকিৎসা চালাইলাম। প্রথম দিন মনে করিয়াছিলাম; আমি ঔষধ পথ্যাদির ব্যবস্থা নিজ ব্যয়ে করিতেছি দেখিলে বাবু মহাশয় খাপ্পা হইবেন। দেখিলাম, তাহা কিছুই হইল না। অনুরাগও নাই, বিরাগও নাই—ভাবটা সম্পূর্ণ অবহেলার। যায় যাক, থাকে থাক। আমি মনে মনে আশা করিতে লাগিলাম, আমি যখন বাবুর নিকট তাঁহার জামাতৃপদপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইব, তখনও যেন এই অবহেলা ভরেই আমার হস্তে কন্যা সমর্পণ করিয়া দেন। কিন্তু শীঘ্রই এমন একটি ঘটনা ঘটিল, যাহাতে আমাকে আর আত্মপ্রকাশ করিয়া প্রার্থী হইতে হইল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রিয়ম্বদা দিন দিন আরোগ্যলাভ করিতে লাগিল। আমিও কাহারও বিনা আপত্তিতে

সারা দ্বিপ্রহর ও অপরাহ্ণকাল তাহারই সহিত যাপন করিতে লাগিলাম। তাহাকে কত গল্প বলিতাম; অনেক ভাল ভাল পুস্তক আনিয়া দিতাম।

সেদিন মিউনিসিপ্যাল মার্কেট হইতে অধিক মূল্য দিয়া একগুচ্ছ কালো আঙুর কিনিয়া আনিয়াছিলাম। প্রিয়ম্বদা উহার কয়েকটি খাইল, এবং আমাকেও খাইতে অনুরোধ করিল। আমিও দুই একটি মুখে দিলাম।

তখন ভাদ্রের শেষ। ভারি গরম পড়িয়াছে। প্রিয়ম্বদার ললাটদেশ স্বেদসিক্ত হইয়া উঠিল। তাহা দেখিয়া আমি পাখা লইয়া তাহাকে মৃদু মৃদু বাতাস করিতে লাগিলাম।

ক্রমে প্রিয়ম্বদা ঘুমাইয়া পড়িল। বহুদিন তৈলাভাবে তাহার চুলগুলি পাতলা হইয়া গিয়াছিল। ললাটের প্রান্তভাগের গুচ্ছগুলি বাতাসে ইতস্ততঃ উড়িতেছে।

আমি সতৃষ্ণনয়নে তাহার পাণ্ডুর মুখখানির পানে চাহিয়া রহিলাম। আজ ভাদ্র মাসের শেষ সপ্তাহ। এক সপ্তাহ পরে আমি কালীকান্তবাবুর নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিব। পূজার পূর্ব্বেই বিবাহ করিব। আমার প্রতি প্রিয়ম্বদার স্নেহের আকর্ষণের যথেষ্ট প্রমাণ এ কয়দিনে পাইয়াছি। এ কয়দিনে আমাকে সে নিজের পরমাত্মীয়স্বরূপই জ্ঞান করিয়াছে।

যে বালিকাকে অল্পদিনের মধ্যেই আমি আমার ধর্ম্মপত্নী করিয়া সুখী হইব আশা করিতেছি,—সে বিশ্বস্তচিত্তে, আমার শুশ্রূষাধীনে, আমার অতি নিকটে নিদ্রামগ্না। আমি যে মণিকে শীঘ্রই গলায় ধারণ করিয়া চিরজীবন সস্নেহে রক্ষা করিব, আমি তাহারই সুনির্জ্জন শিয়রে বসিয়া। আমি অবনত হইয়া, আঙুরের রসসিক্ত, আঙুরেরই মত কোমল লাবণ্যপূর্ণ তাহার অধরযুগল একবার চুম্বন করিলাম।

মাথা তুলিয়া দেখিলাম, যে জানালা বারান্দায় খুলিয়াছে, তাহার বাহিরে একটি মহিলা দাঁড়াইয়া। অনুমানে বুঝিলাম তিনিই গৃহিণী। আমাকে দেখিয়াই তিনি সরিয়া গেলেন।

সেদিন সন্ধ্যাকালে যখন রন্ধনশালায় ব্যস্ত ছিলাম, হঠাৎ বাবু আসিয়া বাহির হইতে ডাকিলেন—"মুখুয্যে।"

"আজ্ঞে।"

"একবার এ দিকে এস ত।"

বাবুর স্বর রোষযুক্ত। ব্যাপার বুঝিতে আমার কিছুই বাকী রহিল না। মনে মনে হাস্য করিয়া আমি বাহিরে আসিলাম।

ছেলেরা যে ঘরে প্রাইভেট মাষ্টারের নিকট পড়িত, সে ঘর তখন শূন্য ছিল। কালীকান্তবাবু আমায় সেই ঘরে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। রোষকষায়িত নেত্রে বলিলেন- "কি শুনছি?" "কি শুনছেন?"

"তুমি জান, প্রিয়ম্বদা নিতান্ত বালিকা নয়?"

"জানি।"

"তোমাকে অতি সচ্চরিত্র জেনে, অসুখের সময় প্রিয়ম্বদার সেবা শুশ্রূষা করায় কোন আপত্তি করিনি, তা জান?"

"আপনার অনুগ্রহ।"

"তুমি প্রিয়ম্বদাকে চুমো খেয়েছ?"

"খেয়েছি।"

"কাযটা কি রকম হয়েছে জান?"

"আপনিই বলুন।"

"পিনাল কোডের একটা ধারা অনুসারে অপরাধ হয়েছে। আমি যদি পুলিশ-কোর্টে তোমার নামে নালিশ করি ত কি হয় জান?"

নিতান্ত ভালমানুষের মত, যেন কতই ভীত হইয়াছি এইরূপ ভাণ করিয়া বলিলাম,

"কি হয়?"

"জেল হয়।" "জেল—অ্যাঁ?"

বাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন—"জেল হয়। সেদিন 'বঙ্গবাসী'তে পড়লাম, একজন মুসলমান, একটি ইউরেশিয়ান বালিকাকে বলপূর্ব্বক চুম্বন করেছিল, তার ছয় সপ্তাহ জেল হয়েছে।"

আমি অভিনয় করিয়া যাইতে লাগিলাম—"অ্যাঁ! বলেন কি? তবে আমার কি হবে?"

বাবু বলিলেন, "যদি তোমার নামে নালিশ করি ত তুমি কি করবে?"

কাতর স্বরে বলিলাম, "আজ্ঞে উকীল ব্যারিষ্টার দিয়ে একবার দেখব! নিতান্তই অদৃষ্টে থাকে ত জেল হবে।"

"উকীল ব্যারিষ্টার দেবে, পয়সা পাবে কোথা?"

"আজ্ঞে, দেশে যে সামান্য জমিজমা আছে তা বিক্রী করতে হবে।"

"জেল থেকে বেরিয়ে খাবে কি? আর ত কেউ চাকরি দেবে না।"

আমি অত্যন্ত ভীতভাব দেখাইয়া, ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া বাবুর মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম।

শেষে তিনি বলিলেন, "শোন। তুমি আমার যুবতী মেয়ের অজ্ঞাতসারে তার অংগ স্পর্শ করে, তার ভয়ানক অনিষ্ট করেছ। এখন, তাকে তোমায় বিবাহ করতে হবে।"

আমি পূর্ব্বেই ইহা বুঝিয়াছিলাম। উপন্যাসেও এরূপ দৃষ্টান্ত পাঠ করিয়াছি। রংগ দেখিবার জন্য বলিলাম—"আজ্ঞে তা—তা—তাতে কিছু আপত্তি নেই। তবে আমরা কুলীন ব্রাহ্মণ। গণ, পণ, কুলমর্য্যাদা, সকল বিষয়ে যদি মানরক্ষে করেন তবে আর আমার আপত্তি কি?"

বাবু অত্যন্ত রাগিয়া বলিলেন, "বটে? কুলমর্য্যাদা! আচ্ছা, যাও একবার জেল খেটে এস;—তাতে তোমার কুলমর্য্যাদা অনেক বাড়বে এখন। বিয়ে করে আরও বেশী রোজগার করতে পারবে।"

শেষে বলিলেন, "গণ পণ? চাও কোন লজ্জায়? তোমায় জেলে না দিয়ে যে মেয়ে দেবার প্রস্তাব করেছি এই তোমার পরম সৌভাগ্য।"

বিনয়ের ভাণ করিয়া বলিলাম—"আজ্ঞে, তা ত বটেই, তা ত বটেই! তবে কিনা—"

বাধা দিয়া বাবু বলিলেন, "কিনা ফিনা নয়। আমার এক কথা। সিকি পয়সা পাবে না। রাজি হও, উত্তম। না হও, জেল। ব্যস।"

আমি আর একটু রংগ দেখিবার অভিপ্রায়ে বলিলাম, "আজ্ঞে, আপনার কন্যাকে বিবাহ করা আমার মত লোকের পক্ষে ত বিশেষ সৌভাগ্যেরই কথা—তবে কিনা—তবে কিনা—"

বাবু রাগিয়া বলিলেন, "তবে কিনা কি? জেলে যাওয়াই যদি বেশী সৌভাগ্য বলে মনে কর, তাই যাও।"

"আজ্ঞে তা নয়,—উপার্জ্জনক্ষম না হয়ে বিবাহ করাটা ত ঠিক নয়। খাওয়াব কি?"

"কেন, এই ত বললে, জমিজমা বিক্রী করে উকীল ব্যারিষ্টার লাগাবে। সেই জমি-জমা চাষবাস করে স্ত্রীর ভরণপোষণ করতে পারবে না?"

"আজ্ঞে সে অতি সামান্য। কোনও রকমে গ্রাসাচ্ছাদনটা চলতে পারে বটে;—কিন্তু তার উপর নির্ভর করে কি বিবাহ করা উচিত? এই ধরুন আপনাদের আপিসের ছোট-সাহেব, পাঁচশো টাকা মাইনে পান, এখনও বিয়ে করছেন না।"

ইহা শুনিয়া বাবু জ্বলিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "ওরা সাহেব। আমরা কি সাহেব নাকি? ওরা যা করবে তাই কি আমাদের করতে হবে? অন্ধ অনুকরণ করে করেই ত দেশটা উচ্ছন্ন গেল!"

ব্যাপারখানা এইখানেই শেষ হওয়া ভাল মনে করিয়া বলিলাম, "আজ্ঞে, তবে না হয়

—তবে না হয়—বিবাহই করব।"

"সেই ভাল কথা। এই আশ্বিন মাস সম্মুখে। পুজোর ছুটি হলে, পশ্চিম বেড়াতে যাব। মধুপুর কি দেওঘর ঐ রকম কোথাও গিয়ে, পুরুত ডেকে, বিয়ে দেব।"

"আজ্ঞে, আবার অতদূর নিয়ে যাবেন? এখানে হয় না?"

"এখানে? রাঁধুনি বামুনের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলে সমাজে আর মুখ দেখাতে পারব? না না—সে হবে না। সেখানে বিয়ে হলে কেউ জানবে শুনবে না, চুপ চাপ। এখানে এসে প্রচার করে দিলেই হবে যে একটি ভাল পাত্র পেয়ে বিয়ে দিয়ে এসেছি।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পুজার ছুটি হইল। বাবু সপরিবারে দেওঘর যাত্রা করিলেন;—আমাকেও সঙ্গে লইলেন। এ পর্যন্ত প্রিয়ম্বদা এ সকল বিষয় কিছুই শোনে নাই। তাহার পিতামাতা গোপনে পরামর্শ করিয়া সব ঠিকঠাক করিয়াছেন।

আমার একটি উকীল বন্ধু সেবার ছুটিতে মধুপুর যাইতেছিলেন। তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, আমার জন্য একখানি ভাল বাড়ী যেন ভাড়া করিয়া রাখেন।

শুভদিনে দেওঘরে আমাদের বিবাহ হইল। নববধূকে লইয়া যাত্রা করিলাম। শ্বশুর-মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া নিজব্যয়ে আমাদিগকে যশোরের দুইখানি তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া দিলেন।

বিবাহ-রজনীর পর, প্রভাতে কুশণ্ডিকা সম্পন্ন করিয়া তৎপরদিন প্রভাতে আমরা যাত্রা করিলাম। তখন প্রিয়ম্বদা জানে আমরা যশোরেই যাইতেছি।

মধুপুরে গাড়ী থামিলে, স্ত্রীলোকের কামরা হইতে প্রিয়ম্বদাকে নামাইলাম।

প্রিয় বলিল "এখানে যে?"

আমি বলিলাম, "এখানে দিনকতক থেকে তারপর যাওয়া যাবে।"

যে বাড়ী ঠিক করা ছিল, সেইখানে গিয়া উঠিলাম।

প্রিয় বলিল, "এ বাড়ী কার?"

"এখন আমাদের। আমরা ভাড়া নিয়েছি। এইখানেই আমরা মাসখানেক থাকব দুজনে।"

অপরাহ্নকাল। দুইজনে নিভৃতসুখে বসিয়াছিলাম। এইবার প্রিয়ম্বদাকে সমস্তই বলিলাম। ভাবিয়াছিলাম, প্রিয় খুব আশ্চর্য্যান্বিত হইবে। কিন্তু প্রিয় বলিল, "আমি তা জানি।"

"তুমি জান? কেমন করে জানলে?"

"কেন, সেই যে তুমি আমাকে অসুখের সময় একবার রবীন্দ্রবাবুর কাব্য-গ্রন্থাবলী পড়তে এনে দিয়েছিলে, মনে পড়ে?"

"পড়ে।"

"তার মধ্যে একখানি চিঠি ছিল। বোধ হয় তোমার কোনও বন্ধুর চিঠি।"

আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম, "বন্ধুর চিঠি? কার চিঠি বল দেখি? কি লেখা ছিল তাতে?"

"নাম ত মনে নেই। তাতে লেখা ছিল, 'একি পাগলামি তোমার! জমিদারের ছেলে হয়ে, নিজে ডাক্তারি পাস করে, শেষে করছ রাঁধুনিগিরি?' আরও সব লেখা ছিল।"

তখন আমার স্মরণ হইল। এই উকীল-বন্ধু যিনি বাড়ী ভাড়া করিয়া দিয়াছেন, তিনিই সেই পত্র লিখিয়াছিলেন। তিনি আমার বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাঁহাকে আমি আদ্যোপান্ত সব কথাই জানাইয়াছিলাম। তাঁহার চিঠিতে ওকথা লেখা ছিল,—আরও লেখা ছিল, যদি আমি "প্রভু"-কন্যার প্রেমেই আবদ্ধ হইয়া থাকি, তবে সত্বর নিজের পরিচয় দিয়া বিবাহ করিলেই ত পারি। প্রত্যহ হাঁড়িঠেলার ভিতর কি কবিত্ব আছে তাহা তিনি বুঝিতে না পারিয়া আমায় তিরস্কার করিয়াছিলেন।

আমি তখন প্রিয়কে বলিলাম,—"ওহো মনে পড়েছে। আচ্ছা তাতে আর কি লেখা ছিল বল দেখি।"

প্রিয় সলজ্জ হাসি হাসিয়া বলিল, "যাও, বলব না।"

"না, বল।"

"না, বলব না।"

অনেক পীড়াপীড়ি করিয়াও বলাইতে পারিলাম না। শেষে বলিলাম, "আমি তোমায় ভালবাসি সে চিঠি দেখেই জানতে পেরেছিলে?"

প্রিয় চক্ষু আনত করিয়া, আঙুলে আঁচল জড়াইতে জড়াইতে, মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিতে লাগিল।

আমি তাহার গলদেশে বাহুবেষ্টন করিয়া তাহাকে চুম্বন করিলাম। বলিলাম, "তোমার ভারি অন্যায় ত!"

"কি?"

"পরের চিঠি পড়া।"

"তুমি বুঝি আমার পর?"

"তখনও ত বিয়ে হয়নি। আমি যে তোমায় ভালবাসি, তাও তখন জানতে না। তখন আমি পর নই?"

"তা বুঝি?"

"তবে কি?"

"আমরা যখন জন্মেছিলাম, তখনি ত বিধাতাপুরুষ আমাদের বিয়ে হবে তা ঠিক করে দিয়েছিলেন।"

প্রিয়ম্বদাকে আবার চুম্বন করিবার জন্য বাহু প্রসারণ করিব, এমন সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, "হুজুর, মালী ফুল এনেছে।"

বাহিরে গিয়া দেখিলাম, মালী অজস্র পরিমাণ নানা বর্ণের ফুল আনিয়াছে। সেই ফুলে রজনীতে আমার ফুলশয্যা হইল।

[আশ্বিন, ১৩১৩]

খালাস

প্রথম পরিচ্ছেদ

বড়দিনের ছুটি হইয়াছে, নগেন্দ্রবাবু কলিকাতায় শ্বশুরালয়ে আসিয়াছেন।

নগেন্দ্রবাবু পূর্ব্ববঙ্গের একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। তিনি সম্প্রতি ফরিদসিংহ জেলার সদরে বদলি হইয়াছেন। পূর্ব্বস্থান হইতে বদলি হইবার সময় স্বীয় স্ত্রী-পুত্রকে কলিকাতায় রাখিয়া যান; বড়দিনের ছুটিতে তাহাদিগকে লইতে আসিয়াছেন।

এবার কলিকাতায় বড় ধুম। জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন। শিল্প প্রদর্শনী ত পুষ্প বাধিই খুলিয়াছে।

নগেন্দ্রবাবুর শ্বশুরালয় ভবানীপুরে। তাঁহার শ্বশুর মহাশয় পেন্সনপ্রাপ্ত সব-জজ। তাঁহার তিনটি শ্যালক আছেন। একজন হাইকোর্টের উকীল। একজন গভর্ণমেণ্ট আপিসে কেরাণীগিরি করেন। অপরটি তাদৃশ কিছু করেন না, সভাসমিতিতে বক্তৃতা করিয়া বেড়ান।

নগেন্দ্রবাবুর বয়ঃক্রম সাতাইশ বৎসর। এই পাঁচ বৎসর ডেপুটি হইয়াছেন। ইনি এম-এ পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছিলেন, বিদ্যাবুদ্ধি যথেষ্টই আছে, সে জন্য ইঁহার শালী-শালাজগণ ইঁহাকে নিঃসঙ্কোচে 'ঘটিরাম' বলিয়া ডাকেন। মূর্খ ডেপুটির নামই দীনবন্ধু 'ঘটিরাম' রাখিয়াছিলেন। খোঁড়াকে খোঁড়া কাণাকে কাণা বলিলেই তাহাদের রাগের বা

দুঃখের কারণ হয়। পদ-চক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তি তাহা পরিহাস বলিয়াই গণ্য করে। নগেন্দ্রবাবু ঘটিরাম সম্ভাষিত হইলে রাগ করিতেন না।

কংগ্রেস অধিবেশনের পূর্ব্বদিন। ডেপুটিবাবু চা পান করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার ছোট শ্যালক ও শ্যালিকাগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া গল্প করিতেছে।

গিরীন্দ্রনাথ বলিল, "ফরিদসিংহে এখন আর কোনও হাঙ্গামা আছে না কি?"

"হাঙ্গামা হুজ্জৎ এখন আর কিছু নেই।"

ইন্দুমতী বলিল, "স্বদেশী কেমন চলছে?"

"মন্দ চলছে না। তবে ফরিদসিংহে যাবার আগে কাগজে যে রকমটা পড়তাম তেমন ত কই দেখিনে।"

সত্যেন্দ্র বলিল, "তা ত হবারই কথা। বরাবর সমান তেজটা থাকে না। এই কলকাতাতেই প্রথমে যে রকম দেখেছিলাম—"

ডেপুটিবাবু বলিলেন, "তোমাদের কলকাতার চেয়ে ফরিদসিংহে স্বদেশী ঢের বেশী চলছে। প্রকাশ্যভাবে সেখানে একখানি বিলিতী কাপড় কেনে কার সাধ্য! এক এক লাঠি কাঁধে ছেলেরা রাস্তায় পাহারা দিয়ে বেড়াচ্ছে।"

ছোট শ্যালক বলিল, "জাতীয় বিদ্যালয়ের ছেলেরা?"

"অধিকাংশই তাই। অন্য ইস্কুলের ছেলেরাও আছে।"

"মাস্টারেরা কিছু বলে না?"

"হাল ছেড়ে দিয়েছে।"

"পুলিস?"

"পুলিসকে তারা থোড়াই কেয়ার করে। বৈকালে বাজারে বেড়াতে বেড়াতে দেখেছি, পুলিস ঘুরছে, আর ছেলেরা বলছে—'এ জি. এ জি. সিপাহী, দেখো হাম পিকেট করতা হায়'—আর পিকেটিং করছে।"

ইহা শুনিয়া সকলেই হাসিতে লাগিলেন। সত্যেন্দ্র বলিল, "আচ্ছা নগেনবাবু, আপনি ফরিদসিংহে গিয়ে এবার খোকাকে জাতীয় বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করে দেবেন?"

নগেন্দ্রবাবু হাসিয়া বলিলেন, "আরে সর্ব্বনাশ! চাকরি যাবে।"

"চাকরি না গেলে আপনি দিতেন?"

"নিশ্চয়ই। তার আর কথা আছে?"

গিরীন্দ্র বলিল, "এমন চাকরি করেন কেন?"

"খাব কি?"

"কেন, আপনার ত ল-লেকচার কমপ্লীট রয়েছে। ওকালতীটে পাস করে দিব্যি বড় দাদার সঙ্গে হাইকোর্টে বেরুতে আরম্ভ করুন।"

"আর কি বুড়ো বয়সে এগজামিন পাস করা পোষায় ভাই!"

ইন্দুমতী বলিল, "ফিরিঙ্গির চাকরি ছাড়বেন না তাই বলুন। আচ্ছা আপনি বলুন ত, আপনি স্বদেশীর স্বপক্ষে না বিপক্ষে?"

"স্বপক্ষে। এই দেখ না, পঞ্চাশ টাকার দেশী কাপড় চোপড় কিনে এনেছি নিয়ে যাব বলে।"

"কেন, সেখানে দেশী কাপড় পাওয়া যায় না নাকি?"

"যায়, কিন্তু দাম বেশী।"

সত্যেন্দ্র হাসিয়া বলিল, "বুঝতে পারিসনে ইন্দু? সেখানে কিনলে পাছে সাহেবেরা জানতে পারে, এই ভয়ে এখান থেকে কিনে নিয়ে যাচ্ছেন।"

নগেন্দ্রবাবু হাসিয়া বলিলেন, "তাতেই বা ক্ষতি কি? লুকিয়ে পুণ্য কর্ম্ম করতে কি কোন হানি আছে?"

"তা নেই। তবে প্রকাশ্যে যেন পাপ করবেন না।"

এই সময় বাহিরে সমবেত কণ্ঠে সঙ্গীতধ্বনি শুনা গেল। সকলে বলিল, "ঐ 'মাতৃপূজক সমিতি' কন্‌গ্রেসের জন্যে ভিক্ষা করতে এসেছে।"

সকলে বাহিরে গিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন প্রায় পঞ্চাশ জন যুবক ও বালক, মাথায় পীতবর্ণ পাগড়ি, কেহ বা খোল বাজাইতেছে, কেহ বা মন্দিরা বাজাইতেছে, কাহারও হস্তে 'বন্দেমাতরম্' অঙ্কিত ধ্বজা, একজনের হস্তে একটি বৃহৎ থালা, তাহাতে অনেক টাকা পয়সা রহিয়াছে, সকলে সমস্বরে গান করিতেছে—

কে কোথা আছিস জনমভূমির
ভকত সন্তান,
মা'র পূজা হবে, আয় নিয়ে আয়
কে কি করিবি দান।
কার আছে সোণা, কার আছে রূপা
অঞ্জলি ভরিয়া আন,
ও ভাই এমন সুদিন কবে আর পাবি
দিয়ে নে ভরিয়ে প্রাণ;
যার বেশী নাই দিক্ সে কিঞ্চিৎ
ছেড়ে লাজ অপমান,
যার কিছু নাই, সে দিক্ কেবল
ব্যথিত হৃদয়খান।

বাটীর সকলেই কেহ টাকা, কেহ আধুলি, কেহ সিকি, থালার উপর দিতে লাগিলেন। নগেন্দ্রবাবু একখানি দশ টাকার নোট থালায় রাখিয়া দিলেন।

নোটখানি দেখিয়া, খাতা পেন্সিলধারী একজন যুবক আসিয়া বলিল, "মশায়ের নাম ?"

নগেন্দ্রবাবু বলিলেন. "নাম দরকার কি ?"

"পাঁচ টাকার বেশী হলে নাম লিখে নেওয়ার নিয়ম আছে।"

"তবে লিখুন 'জনৈক বন্ধু'।"

সত্যেন্দ্র বলিল, "ওহে, লেখ 'জনৈক ডেপুটি'। ইনি পূর্ববঙ্গের একটি ডেপুটি।"

গিরীন্দ্রবাবু বলিলেন "না, না। 'জনৈক বন্ধু' বলেই লিখে নাও।"

যুবকগণ তাহাই লিখিয়া লইয়া, গান গাহিতে গাহিতে প্রস্থান করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যা হইয়াছে। ফরিদসিংহ বাজারের রাস্তায় কতিপয় বিদ্যালয়ের বালক পদচারণা করিয়া বেড়াইতেছিল। দেখিল, একটি সওদাগরের দোকান হইতে এক ব্যক্তি এক টিন বিস্কুট হাতে করিয়া বাহির হইল।

দেখিবামাত্র ছেলেরা তাহার সঙ্গ লইল। একজন বলিল. "ওহে, কি রকম বিস্কুট কিনলে দেখি ?"

লোকটি বিস্কুটের বাক্স দেখাইল।

ছেলেরা বলিল, "ছি ছি, এ যে বিলাতী।"

"কাহে বাবু, বিলাতী তো আচ্ছা হায়!"

"তুমি হিন্দু না মুসলমান ?"

"মুসলমান।"

একজন ছেলে বলিল, "বিলাতী চীজ হারাম হায়।"

লোকটি বলিল, "তোবা তোবা। ঐসা বাত মৎ বোলিয়ে বাবু।"

"কত দাম নিলে ?"

"দেড় রুপিয়া।"

"অ্যাঁ—দেড় টাকা! এর চেয়ে ভাল, তাজা দেশী বিস্কুটের টিন এক টাকায় পাওয়া যায়।"

লোকটা সাহেবের চাপরাসি। তাহার মনিব একজন চা-কর, সম্প্রতি আসাম হইতে আসিয়া ডাকবাঙলায় অবস্থান করিতেছেন। সে ভাবিল, সাহেব ত আমায় বিস্কুটের জন্য দেড় টাকাই দিয়াছে, এক টাকায় যদি ইহা অপেক্ষা ভাল বিস্কুট পাওয়া যায়, আর আট গণ্ডা পয়সা লাভ। মন্দ কি? তাই জিজ্ঞাসা করিল, "সচ্ বাত বাবু?"

ছেলেরা একটু উৎসাহিত হইয়া বলিল, "হাঁ, সত্য বইকি। চল তোমাকে দেশী বিস্কুটের টিন দেখাই। এস, এ টিনটা ফিরে দিবে এস।"

চারি পাঁচ জন বালক সেই চাপরাসিকে লইয়া সওদাগরের দোকানে গেল। কিন্তু সওদাগর টিন ফিরাইয়া লইতে কিছুতেই রাজি হইল না। সে বলিল, "একে স্বদেশীর জ্বালায় বিলাতী টিন আর বিক্রয় হয় না। মাল পড়িয়া পচিতেছে। একটা যদি বিক্রয় করিয়াছি ত উহা আর কোনক্রমে ফিরিয়া লইব না।"

তখন বালকেরা দোকানের বাহিরে আসিয়া নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিয়া স্থির করিল, তাহারা নিজ ব্যয়ে এক টিন বিস্কুট কিনিয়া দিবে। চাপরাসিকে বলিল, "দেখ, তোমার ও টিন আমাদের দাও। আমরা এক টিন দেশী বিস্কুট তোমাকে কিনিয়া দিতেছি।"

চাপরাসিকে স্বদেশী দোকানে লইয়া গিয়া বালকেরা তাহাকে এক টিন দেশী বিস্কুট কিনিয়া দিল।

চাপরাসি বলিল, "বাবু, ইস্কাতো দাম এক রূপিয়া। হামারা বাকী আঠ আনা পয়সা?"

ছাত্রেরা দোকানে বলিল, "আট আনা পয়সা দিন ত। দেড় টাকাই আমাদের নামে লিখে রাখুন, কাল দিয়ে যাব।"—আট আনা লইয়া বালকেরা চাপরাসিকে দিল।

চাপরাসি পয়সাগুলি পকেটে রাখিয়া বলিল, "বাবু, আচ্ছা বিস্কুট তো?"

"বহুৎ আচ্ছা। খাকে দেখো। আউর কভি বিলাতী বিস্কুট মৎ খাও। হারাম হায়।"

"তোবা তোবা"—বলিয়া চাপরাসি ডাকবাঙলা অভিমুখে রওনা হইল।

ছেলেরা বলিল, "ভাই, এ টিনটাকে 'বন্দেমাতরম্' করা যাক এস।" বলিয়া টিন খুলিয়া, বিস্কুটগুলা রাজপথে ছড়াইয়া দিল। তখন সকলে 'বন্দেমাতরম্' এবং 'বিদেশী বাণিজ্যে কর পদাঘাত' গান করিতে করিতে বিস্কুটের উপর নৃত্য করিতে লাগিল। দুই এক মিনিটেই সমস্ত বিস্কুট চূর্ণ হইয়া রাজপথের সেই অংশ শুভ্র করিয়া ফেলিল। একজন খালি টিনটাকে পদাঘাতে তালতোবড়া করিয়া, এক লাথিতে রাস্তার পার্শ্বস্থিত ড্রেণে ফেলিয়া দিল। তখন সকলে আপন আপন গৃহে প্রস্থান করিল।

চাপরাসি অল্প দূর হইতে এ সমস্ত ব্যাপারই দেখিল। আসাম হইতে নূতন আসিয়াছিল, কিছুই বুঝিতে পারিল না। পথচারী একজনকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবুলোগ পাগল হুয়া না ক্যা?"

সে বলিল, "বন্দেমাতরম্ হইয়া অবধি লেড়কালোক কাহাকেও বিলাতী জিনিষ কিনিতে দেয় না।"

"কেয়া বোলতা হায়? বন্দুক মারম্?"

"নেই নেই, বন্দেমাতরম্।"

"উ ক্যা হায়?"

"ক্যা জানে ভাই। একঠো গালি হোগা। সাহেব লোগকো দেখনেসেই আজকাল লেড়কালোগ ঐ বাৎ বোলতা হায়।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নগদ আট আনা পয়সা 'মর্ভা' করিয়া, চাপরাসি প্রফুল্ল মনে ডাকবাংগলায় প্রত্যাবর্তন

কাবিল। দেখিল সাহেব বারান্দায় পায়চারী করিয়া বেড়াইতেছেন।

চাপরাসিকে দেখিয়া, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে'ও এত্তা দেরী কিয়া ?"—বলিয়া বিস্কুটের টিন হাতে করিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। "হিন্দু বিস্কুট" দেখিয়াই তৎক্ষণাৎ সেই টিন চাপরাসির মস্তক লক্ষ্য করিয়া সজোরে ছুড়িয়া মারিলেন। চাপরাসি বারান্দার প্রান্তে দাঁড়াইয়া ছিল, মার খাইয়া নিম্নে পড়িয়া গেল। টিনের আঘাতে কপাল কাটিয়া রক্তপাত হইল।

সাহেব, চাপরাসির পতনে দৃকপাত না করিয়া বলিলেন, "ড্যাম শুয়োরকা বাচ্চা—ইয়া দেশী বিস্কিট কাহে লায়া ?"

চাপরাসি ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া বারান্দায় আসিল। বলিল, "হুজুর—হাম বিলাতী বিস্কুট্ পহিলে লিয়া থা। লেকেন—"

"ক্যা হুয়া ?"

"লেকিন ইস্কুলকা লেড়কালোক"—চাপরাসি আট আনা পয়সার মায়া পরিত্যাগ করিয়া বলিতে যাইতেছিল যে, বালকগণের প্ররোচনায় দেশীয় বিস্কুটই ভাল শুনিয়া তাহাই লইয়াছে। কিন্তু সাহেব অগ্নিশর্ম্মা হইয়া, বাধা দিয়া বলিলেন—"ইস্কুলকে লেড়কালোক ? বন্দেমাতরম্ ? ছিন্ লিয়া ?"

এতক্ষণে চাপরাসিপুঙ্গব অকূল সমুদ্রের কূল পাইল। বলিল, "হাঁ হুজুর, ছিন্ লিয়া ?" "কাহেকো দিয়া ?"

"হুজুর, উওলোগ বিশ পঁচিশ আদমি—হাম একেলা কেয়া করে ?"

সাহেব বুঝিলেন, সংবাদপত্রে যাহা পাঠ করিয়া থাকেন, হুবহু তাহাই ঘটিয়াছে। বলিলেন, "ইউ ড্যাম্ কাউয়ার্ড, পুলিসকো কাহে নেই বোলায়া ?"

চাপরাসি বলিল, "হাম পুলিস পুলিস বোলকে বহুৎ চিল্লায়া হুজুর। লেকিন কোই কানেস্টিবিল নেহি আয়া। লেড়কালোক, বিস্কুট তোড়কে রাস্তামে ছিটায় দিয়া, আউর 'বন্দুক মারো' না ক্যা বোলকে সব বিস্কুট পয়েরসে চুর চুর কর দিয়া। হাম ক্যা করে' হুজুরকা চা ঠান্ডা হো যাতা হ্যায়, হামারা পাস আপনা একঠো রুপিয়া থা, তো ঐ একঠো দেশী বকস্ লে লিয়া। এক রুপিয়ামে তো বিলাতী টিন দেতা নেই গরীবপরবর।"

সাহেব বলিলেন, "আচ্ছা, হাম ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকা পাস আভি যাতা। লেড়কা লোগকে হাম্ জেহেলমে ভেজেগা।" বলিয়া টুপী লইয়া ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে চা-কর সাহেব ক্লাব অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব, জজ সাহেব, পুলিস সাহেব প্রভৃতি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কয়েকজন মেম সাহেবও ছিলেন। জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বিলিয়ার্ড খেলিতেছিলেন। জয়েণ্ট সাহেব, পুলিস সাহেব ও তাঁহাদের মেমদ্বয় তাস খেলিতেছিলেন। সাহেবরা হুইস্কি-পেগ এবং মেম সাহেবেরা ভার্মুথ পান করিতেছিলেন।

চা-কর সাহেব নিজ কার্ড ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে পাঠাইয়া দেওয়া মাত্র তাঁহার আহ্বান হইল। তিনি প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "Very sorry to intrude"—তাহার পর সকল কথা খুলিয়া বলিলেন।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব শুনিয়া আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিলেন। পুলিস সাহেবকে বলিলেন, "I say—this is serious."

পুলিস সাহেব বলিলেন, "আমি এখনই যাইতেছি।"—বলিয়া তাসের হাত ডাক্তার সাহেবকে দিয়া বাহির হইলেন। আর্দ্দালিকে বলিলেন, "কোতোয়ালী দারোগাকো আভি ডাকবাঙ্গলামে আনে কহো।"

সাহেবদ্বয় তখন ডাকবাঙ্গলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চা-কর বলিলেন, "'Tis really very good of you to take so much trouble."

পুলিস সাহেব বলিলেন, "দিন দিন 'বন্দেমাতরম্' নিউসেন্স অসহনীয় হইয়া দাঁড়াই-

তেছে। ইহা নিশ্চয়ই জাতীয় বিদ্যালয়ের ছেলেদের কাজ।"

চা-কর সাহেব বলিলেন, "While we wait for your Daroga, may I offer you a peg?"

"Thanks, I don't mind."

বোতল, গেলাস ও সোডাওয়াটার বাহির হইল। হাভানা চুরুট বাহির হইল। দুই জনে দেশের বর্ত্তমান অবস্থা, বাঙ্গালীর বে-আদবী, গভর্ণমেণ্টের শিথিলতা, বিলাতে "শ্বেত বাবু"গণের স্বদেশদ্রোহিতা সম্বন্ধে আলাপ করিতে লাগিলেন।

ক্রমে দারোগা কসিমুল্লা আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

পুলিস সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "দারোগা, আজ বাজারমে দাংগা হুয়া জানতা?"

"হাঁ হুজুর, আভি খবর মিলা।"

"ক্যা action লিয়া?"

"হুজুর, ফরিয়াদীকা তল্লাসমে জমাদার মোতায়েন কিয়া।"

"ফরিয়াদী ইঁহা হায়, ইতলা লিখ লেও।"

"যো হুকুম হুজুর"—বলিয়া দারোগা চাপরাসিকে লইয়া বারান্দায় গেল। আলোকাদি সংগ্রহ করিয়া এজেহার লিখিতে লাগিল। বলা বাহুল্য, মনিবকে যেমন বলিয়াছিল চাপরাসি দারোগাকেও সেইরূপ বলিল। লিখিতে লিখিতে দারোগা জিজ্ঞাসা করিল—"কোথাও জখম আছে?"

সাহেবের প্রহারে তাহার কপাল যে জখম হইয়াছিল, চাপরাসি তাহাই দেখাইয়া দিল। চা-কর সাহেব ইহা দেখিয়া মনে মনে হাসিয়া ভাবিলেন—"ড্যাম্ নেটিভগণ এইরূপ মিথ্যাবাদীই বটে!"—দারোগা লিখিয়া লইল—"বাদী কপালে জখম ও কাপড়ে রক্তের দাগ দেখাইল।"

এতেলা গ্রহণ শেষ হইলে পুলিস সাহেব হুকুম দিলেন, "আজ রাত্রেই যেমন করিয়া পার, আসামী গ্রেপ্তার করিতে হইবে। রাত্রে জামিন চাহিলে জামিন দিবে না।"—হুকুম দিয়া, চা-করকে শুভরাত্রি ইচ্ছা করিয়া পুলিস সাহেব প্রস্থান করিলেন।

দারোগা চা-কর সাহেবকে বলিল, "হুজুর, আপনার এই চাপরাসিকে আসামী সনাক্ত করিবার জন্য একটু ছুটি দিতে হইবে।"

"All right. চাপরাসি যাও। দারোগা সাথ আসামী দেখ্লাও।"

চাপরাসি বলিল, "হুজুর, অনেক ছেলে, তাহাতে রাত্রি হইয়াছিল। চিনিতে পারিব কি?"

সাহেব রাগিয়া বলিলেন, "শুয়ার, নেহি পচানে সকো, হাম তুমকো ডিস্‌মিস্ করেগা।"

"বহুৎ খুব হুজুর"—বলিয়া চাপরাসি প্রস্থান করিল।

দারোগা তাহার সহিত, আর কোনও অনুসন্ধান মাত্র না করিয়া, একেবারে জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে গিয়া উপস্থিত হইল। শিক্ষকেরা তখন কেহ ছিলেন না। ছাত্রেরাও অনেকে অনুপস্থিত ছিল। একটি ঘরে চারি পাঁচটি ছেলে প্রদীপ জ্বালিয়া পাঠ মুখস্থ করিতেছিল, তাহাদেরই মধ্যে তিনজনকে চাপরাসি অম্লানবদনে সনাক্ত করিয়া দিল। দারোগা তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিল।

বলা বাহুল্য এই বালকগণের মধ্যে কেহ কিছু জানিত না। বালকত্রয় বলিল, "দারোগা সাহেব, আমাদের কেন গ্রেপ্তার করিতেছ? আমরা কি করিয়াছি?"

দারোগা বলিল, "কি করিয়াছ তাহা আদালতেই মালুম হইবে।"—বলিয়া দারোগা তিন-জন কনেষ্টবলের জিম্মায় তাহাদিগকে থানায় পাঠাইয়া দিল।

তাহার পর দারোগা চাপরাসিকে হাসপাতালে লইয়া গিয়া সরকারী ডাক্তারের দ্বারায় তাহার জখম পরীক্ষা করাইয়া সার্টিফিকেট লেখাইয়া লইল। শেষে বলিল, "থানায় চল।"

"কেন?"

"আসামী চিনিবার জন্য।"

"আসামী ত চিনিয়া দিলাম।"

"আরে না না, ছেলেদের ভাল করিয়া চিনিয়া রাখিবে এস। কাল কোনও ডেপুটি বাবু আসিবে; অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে তাহাদের মিশাইয়া দাঁড় করাইয়া দিবে। তখন তোমায় আসামী চিনিয়া বাহির করিতে হইবে। না পারিলে, মোকর্দ্দমা ফাঁসিয়া যাইবে, চালান হইবে না। থানায় এস, ভাল করিয়া সেই তিনজনকে চিনিয়া রাখ।"

"দেরী হইলে সাহেব গোসা হইবে যে।"

"যাও সাহেবের কাছে ছুটি লইয়া আইস!"

চাপরাসি গিয়া সাহেবের কাছে সকল কথা বলিয়া ছুটি চাহিল। সাহেব ছুটি দিলেন: এবং মনে মনে বলিলেন—"ড্যাম্ নেটিভ পুলিস এই রকম dishonest-ই বটে!"

দারোগা তখন বাজার ও অন্যত্র হইতে আরও তিন চারিজন লোক এবং সেই সওদাগরকে সাক্ষীস্বরূপ ডাকাইয়া আনিল। পুলিসের শাসনে, তাহারা যাহা দেখিয়াছে তাহা, এবং যাহা দেখে নাই তাহাও সাক্ষ্য দিতে স্বীকৃত হইল। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত থানায় বসিয়া বালকত্রয়কে চিনিয়াও লইল।

এই মোকর্দ্দমার বিচারভার পড়িল ডেপুটি নগেন্দ্রবাবুর উপর।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। ডেপুটিবাবু কাছারি হইতে ফিরিয়া জলযোগাদি অন্তে, অন্তঃপুরের বারান্দায় বসিয়া আরাম করিতেছেন।

নগেন্দ্রবাবুর গৃহিণী বিংশতিবর্ষীয়া যুবতী। তাঁহার নাম চারুশীলা।

চারুশীলা আসিয়া পতির পার্শ্বে উপবেশন করিলেন; বলিলেন, "আজ মনটা এমন ভার ভার দেখছি কেন?"

নগেন্দ্রবাবু বলিলেন,—"না—এমন কিছু নয়।"

গৃহিণী কিন্তু শুনিলেন না। পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। শেষে ডেপুটিবাবু বলিলেন, "ছেলেদের মামলাটা, এত লোক থাকতে, আমার ঘাড়েই চাপিযাছে।"

চারুশীলা বলিলেন, "তোমার কাছে হবে? সে ত ভালই হল। আমার বরং ভাবনা ছিল।"

"কি ভাবনা?"

"যে, কার কাছে বা মোকর্দ্দমাটা পড়ে, হয়ত সাহেবদের খুসী করবার জন্যে অবিচার করে ছেলে তিনটিকে জেলেই পাঠাবে। তোমার কাছে হল, আমি নিশ্চিন্ত হলাম।'

তাঁহার স্বাধীনচিত্ততায় স্ত্রীর এই সরল বিশ্বাসে ডেপুটিবাবু মনে মনে একটু হাসিলেন। বলিলেন, "যদি প্রমাণ হয়, তা হলে ত ছেলেদের সাজা দিতে হবে। আমি ত আর অবিচার করে' তাদের খালাস দিতে পারব না।"

চারুশীলা বলিলেন, "ছি, অবিচার কেন করবে। যদি বাস্তবিক প্রমাণ হয়, ওরা আমার আপনার ছেলে হলেও আমি খালাস দিতে বলতাম না। কিন্তু আমি যে রকম শুনলাম, ছেলেদের ত কিছু দোষ নেই।"

"কোথায় শুনলে?"

"এই সেদিন মুন্সেফবাবুর বাড়ীতে বউভাতের নিমন্ত্রণে গিয়েছিলাম, সেখানে অনেকে বললেন যে ছেলেরা চাপরাসিকে রাজি করে', তার কাছ থেকে বিলিতি বিস্কুটের টিন কিনে নিয়েছে; নিয়ে ভেঙ্গেছে। কেড়েও নেয় নি, মারেও নি। তা ছাড়া, যে তিনজন ছেলেকে পুলিস ধরছে তারা মোটে সেখানে ছিল না, কিছুই জানে না।"

ডেপুটিবাবু একটু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন. "এ সব প্রমাণ হয় তবে না!"

"খুব প্রমাণ হবে। কত লোকে দেখেছে, কত লোকে জানে।"

"প্রমাণ হয় ত ভালই।"

"আর যদি প্রমাণ না হয, কিছু জরিমানা করে ছেড়ে দিও। আহা ছেলেমানুষ. না বুঝে যদি একটা অন্যায় কাজ করেই থাকে, তবে কি তাদের জেলে দেবে, যেমন অন্য

কয়েক জায়গায় হয়েছে?"

কিন্তু ডেপুটিবাবুর মনের বিষণ্ণতা দূর হইল না। এই সময় আর্দ্দালি আসিয়া একখানি পত্র দিল। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব লিখিয়াছেন, কল্য প্রাতে ৮টার সময় ডেপুটিবাবু যেন সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

পরদিন যথাসময়ে, পোষাক পরিয়া নগেন্দ্রবাবু সাহেব-ভবনে উপস্থিত হইলেন। আরও কয়েক ব্যক্তি দর্শনার্থী হইয়া বাহিরে বারান্দায় একখানি বেঞ্চির উপর বসিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। নগেন্দ্রবাবু কার্ড পাঠাইয়া দিলেন। এক মিনিট পরে চাপরাসি আসিয়া তাঁহাকে আফিস কক্ষে লইয়া গিয়া বসাইল ও বলিল, "সাহেব ছোট হাজরী খাইতেছেন, এখনই আসিবেন।"

সাহেব আসিয়া করমর্দ্দন করিয়া নগেন্দ্রবাবুকে বসাইলেন। বলিলেন, "এখন টাউনের অবস্থা কিরূপ?"

"এখন স্বাভাবিক অবস্থাই ত দেখা যায়।"

"স্বদেশীওয়ালাদের মধ্যে বিশেষ কোনও উত্তেজনা নাই?"

"কই তেমন ত কিছুই দেখি না।"

"This Swadeshi is a damned rot; নগেন্দ্রবাবু, আপনি স্বদেশী সম্বন্ধে কি মনে করেন?"

"আজ্ঞে—"

"যথার্থ স্বদেশী—অর্থাৎ দেশের শিল্পোন্নতির যথার্থ চেষ্টা—সে খুব ভাল। তাহার প্রতি আমাদের সকলেরই সহানুভূতি আছে। কিন্তু এই হল্লা, কাপড় পোড়ান, এসব কি?"

নগেন্দ্রবাবু অপরাধীর মত বলিলেন, "ওগুলো ভাল নয়।"

"By the way—সেই বিস্কিটের মোকর্দ্দমাটা আপনার ফাইলে আছে না?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"উঃ—ছেলেদের কি স্পর্দ্ধা! গরীব চাপরাসিকে মারিয়া কপাল ফাটাইয়া দিয়াছে। বিস্কিটগুলো রাস্তায় ছড়াইয়া তাহার উপর পৈশাচিক নৃত্য করিয়াছে। এসব ছেলে এখন হইতে যদি কঠিন শিক্ষা প্রাপ্ত না হয়, তবে বড় হইলে ইহারা চোর ডাকাত হইয়া উঠিবে। ইহাদের বিশেষ শিক্ষা হওয়া আবশ্যক।"

নগেন্দ্রবাবু মেঝের কার্পেটের উপর দৃষ্টিবদ্ধ করিয়া নীরব রহিলেন।

সাহেব বলিলেন, "নগেন্দ্রবাবু, ফরিদসিং কিরূপ স্থান মনে হইতেছে? আমি ত দেখিতেছি এখানে সমস্তই বড় দুর্ম্মূল্য।"

কথোপকথনের বিষয় পরিবর্ত্তনে নগেন্দ্রবাবু খুসী হইয়া বলিলেন. "হাঁ মহাশয়, সব জিনিষই এখানে বড় দুর্ম্মূল্য। দুধ চারি আনা করিয়া সের।"

"আমি যখন ভাগলপুরে জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট ছিলাম, সেখানে টাকায় ছয়টা করিয়া বড় বড় মুর্গি পাওয়া যাইত। এখানে এক টাকায় আড়াইটা তিনটার বেশী পাওয়া যায় না। সেখানে দশ টাকায় বাবুর্চ্চি বেয়ারা প্রভৃতি পাইতাম। এখানে পনেরো টাকা দিতে হয়।"

"হাঁ সাহেব। চাকর বাকরও এখানে বড় মহার্ঘ। আমাদের অল্প বেতন, কিছুতেই সঙ্কুলান করিতে পারি না।"

"আপনি এখন কোন্ গ্রেডে আছেন?"

"আড়াই শত।"

"কত দিন?"

"প্রায় তিন বৎসর।"

"তি—ন—বৎ—স—র। Shame! 'Tis a downright shame! আমি আপনার Service Book দেখিয়া তিন শত টাকার গ্রেডে উন্নতির জন্য শীঘ্রই কমিশনার সাহেবকে লিখিব।"

নগেন্দ্রবাবু অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হইয়া সাহেবকে ধন্যবাদ দিলেন। ক্রমে সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "Well Nagendra Babu, I won't detain you longer"—বলিয়া স্বীয় হস্ত প্রসারিত করিয়া দিলেন।

যাইবার সময় বলিলেন, "স্বদেশী সম্বন্ধে বিশেষ কোন সংবাদ পাইলেই আমাকে আসিয়া জানাইবেন। This Swadeshi must be stamped out—at any cost."

বেতন বৃদ্ধির সম্ভাবনায় উৎফুল্ল হইয়া নগেনবাবু বলিলেন. "হাঁ হুজুর। আমার যথাসাধ্য আমি করিব।"

বাহিরে যাহারা পূর্ব্বাবধি দর্শনার্থী হইয়া বসিয়াছিল, তাহাদের প্রতি গর্ব্বিত দৃষ্টি-পাত করিয়া নগেন্দ্রবাবু গাড়ীতে উঠিলেন।

ধার্য্য দিনে বালকত্রয়ের বিচার আরম্ভ হইল। যেদিন তাহারা গ্রেপ্তার হয়, তাহার পরদিন কয়েকটি প্রধান উকীলবাবু জামিন হইয়া তাহাদিগকে ছাড়াইয়া লইয়াছিলেন। তাঁহারাই নিজ অর্থব্যয়ে, নিজ বহুমূল্য সময় নষ্ট করিয়া, মোকর্দ্দমার তদ্বির ও পরিচালনা করিতেছেন।

চাপরাসি পূর্ব্ব উক্তিই বজায় রাখিল। জেরায় তাহাকে আসামীর উকীল জিজ্ঞাসা করিলেন, সাহেব তাহাকে বিস্কুটের টিন ছুড়িয়া মারিয়া কপালে রক্তপাত করিয়াছে কি না। সে অস্বীকার করিল। বলিল, কিল চড় দ্বারায় ছেলেরাই ও জখম উৎপন্ন করিয়াছে।

চা-কর সাহেবও, ড্যাম-নেটিভের পদানুসরণ করিয়া বিস্কুটের টিন ছুড়িয়া মারা সাফ্ অস্বীকার করিলেন।

বাজারের কয়েকজন লোক, পথে বিস্কুট ভাঙ্গা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিল, কিন্তু আসামীকে সনাক্ত করিতে পারিল না। ভাঙ্গা বিস্কুটের টিনটা এবং ধূলিমিশ্রিত বিস্কুটের গুঁড়া কাগজে করিয়া পুলিস কর্তৃক 'এগ্‌জিবিট' হইল।

সওদাগর আসামীত্রয়কে সনাক্ত করিয়া বলিলে, ইহারা এবং অপর কয়েকজন, চাপরাসির সহিত বিস্কুটের টিন ফিরাইয়া দিতে আসিয়াছিল। বাবুরা বাহির হইয়া গেলে, কিঞ্চিৎ পরে দূর হইতে মুহুর্মুহু "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি শুনিয়াছিল। জেরায় বলিল, ইস্কুলের ছেলেরা তাহার দোকানের নিকট পিকেট্ করিয়া তাহার অনেক ক্ষতি করিয়াছে বটে, কিন্তু তজ্জন্য ছেলেদের উপর তাহার কোনও রাগ বা শত্রুতা নাই।

হাসপাতালের ডাক্তার বলিলেন. "কপালের জখম কোনও শাণিত কঠিন বস্তুর দ্বারা হইয়াছে।" জেরায় বলিলেন, "চড় কিল দ্বারা ওরূপ জখম হওয়া অসম্ভব।"

বাদীর সাক্ষী শেষ হইলে সাফাই সাক্ষীর জন্য দিন ধার্য্য হইল।

স্বদেশী দোকানের কর্ম্মচারী আসিয়া প্রকৃত ঘটনা বলিল। আরও বলিল. যে ছাত্রগণ দোকানে আসিয়াছিল. তাহাদের মধ্যে ডকে কেহ নাই।

একজন ডাক্তার বলিলেন, তিনি পথ দিয়া যাইতেছিলেন. চাপরাসি স্বেচ্ছায় বিলাতী বিস্কুটের টিন ছেলেদের দিয়াছে দেখিয়াছেন। দেশী বিস্কুট কিনিবার জন্য ছাত্রের সঙ্গে সে স্বদেশী দোকানে গিয়াছে তাহাও দেখিয়াছেন। পুলিসের জেরায় ডাক্তারবাবু স্বীকার করিলেন যে, স্বদেশী দোকানে তাঁহার দুই শত টাকার শেয়ার আছে এবং তিনি নিজে একজন পাক্কা স্বদেশী।

ডাকবাঙ্গলার খানসামা আসিয়া সাক্ষ্য দিল। চা-কর সাহেব যে চাপরাসিকে টিন ছুড়িয়া মারিয়াছেন তাহা সে বলিল। সেই টিনে কপাল কাটিয়া জখম হইয়াছে; বাজার হইতে যখন আসে তখন জখম ছিল না। পুলিসের জেরায় খানসামা স্বীকার করিল যে, উকীলবাবুগণ মাঝে মাঝে তাহার নিকট ভৃত্য পাঠাইয়া মুর্গীর রোষ্ট, কাটলেট্ প্রভৃতি ফরমাইস দেন। সন্ধ্যার পর একটু গা-ঢাকা হইলেই ভৃত্যগণ আসিয়া সে সব খাদ্য লইয়া যায়। তাহাতে মাসে মাসে তাহার কিঞ্চিৎ উপার্জ্জন হইয়া থাকে।

মোকর্দ্দমা শেষ হইল। হুকুম হইল, সপ্তাহ পরে রায় বাহির হইবে।

ইতিমধ্যে দেখা গেল, ডেপুটিবাবু তিন দিন ধড়াচূড়া বাঁধিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে সেলাম করিতে গেলেন। লোকে কানাকানি করিতে লাগিল।

রায়ের দিন আদালতগৃহ লোকে লোকারণ্য। কিন্তর ইস্কুলের বালক আসিয়াছে। অন্যান্য লোকও আসিয়াছে।

রায় বাহির হইল। আসামীগণ সকলেই দোষী সাব্যস্ত হইয়াছে। প্রত্যেকের তিনমাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড এবং পঞ্চাশ টাকা করিয়া জরিমানা।

রায় শুনিয়া ছেলের দল 'বন্দেমাতরম্' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। পুলিস অনেক কষ্টে গোল থামাইয়া বালকগণকে আদালত গৃহ হইতে অপসৃত করিয়া দিল।

আসামীপক্ষের প্রধান উকীল কালীকান্তবাবু রায় চাহিয়া পাঠ করিলেন। বিচারক লিখিয়াছেন, বাদীর সাক্ষীগণের উক্তিতে অনেক স্থলে অনৈক্য দেখা যায় বটে, কিন্তু সে সকল 'minor discrepancies'—উহাতে বরং এই প্রমাণ হয় যে সাক্ষীরা শিখানো নহে। সত্য বটে কোন কোনও সাক্ষী বলিয়াছে, হাঙ্গামার সময় পনেরো কুড়ি জন ছেলে ছিল, আবার কেহ কেহ বলিয়াছে পঞ্চাশ ষাট জন ছিল, কিন্তু কেহই গণনা করিয়া দেখে নাই অনুমানে ভুল হওয়া আশ্চর্য্য নহে। বাদী বলিয়াছে, ছেলেরা চড় চাপড় মারিয়া তাহার কপালে ক্ষত করিয়াছে, কিন্তু ডাক্তার বলিতেছেন, কোন কঠিন শাণিত দ্রব্যে ঐ ক্ষত হইয়াছে, চড় চাপড়ে হইতে পারে না। ইহার উপর আসামীর উকীল বিশেষ জোর দিয়া বলিতেছেন যে, ঘটনা মিথ্যা। কিন্তু আমার বিবেচনায় ঐ সময়ে বাদী এত ভীত ও বিমূঢ় হইয়াছিল যে, তাহাতে বালকেরা ঠিক কি প্রকারে আঘাত করিয়াছে তাহা স্মরণ রাখা তাহার পক্ষে অসম্ভব। সাফাই সাক্ষীগণের সমস্ত কথাই যে মিথ্যা তাহাতে কোনও সংশয় নাই। সকলেই তথাকথিত স্বদেশীর দল। উকীল বলিয়াছেন, ডাকবাঙ্গলার খানসামা নিরপেক্ষ সাক্ষী, উহার কথা মিথ্যা হইতে পারে না। কিন্তু জেরায় দেখা যাইতেছে, খানসামা উকীলবাবুগণের বিশেষ অনুগৃহীত ব্যক্তি। যে বারো মাসের খরিদ্দারকে চটাইয়া আসাম হইতে আগত সাহেবের পক্ষাবলম্বন করিয়া সত্য বলিতে পারে না। ইত্যাদি।

উকীলবাবু রায়ের নকল বাহির করিয়া লইয়া জজ সাহেবের নিকট আপীল দায়ের করিয়া, জামিনের হুকুম লইলেন।

এই সংবাদ শ্রবণমাত্র বালকগণ ভীষণ রবে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি করিয়া উঠিল। কোথা হইতে একখানা গাড়ী আনিয়া, তাহাতে বালকত্রয়কে বসাইয়া, ঘোড়া খুলিয়া নিজেরা গাড়ী টানিয়া সহরময় ঘুরিয়া বেড়াইল এবং সমস্বরে গাহিতে লাগিল—

ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে,
মোদের বাঁধন ততই টুটবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সেদিন ডেপুটিবাবু ক্ষুণ্ণ মনে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। চোর যেন চুরি করিয়া ফিরিল। খুনী যেন খুন করিয়া আসিয়াছে। ডেপুটিবাবুর চক্ষু অবনত, মুখ কালিমাময়।

গৃহে আসিয়া দেখিলেন, চারুশীলা মুখখানি বিমর্ষ করিয়া চুপ করিয়া বারান্দার কোণে বসিয়া আছেন। ডেপুটিবাবু বুঝিলেন এ বিমর্ষতার কারণ কি।

বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া, স্ত্রীর নিকট অগ্রসর হইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি গো, অমন করে বসে কেন?"

চারুশীলা নিরুত্তর।

"কি হয়েছে?"

"মাথাটা ধরেছে।"

"মাথা ধরেছে? কখন ধরল? এস দেখি, রুমালে একটু ওডিকলোন ভিজিয়ে মাথায়

বেঁধে দিই। এখনই সেরে যাবে।"

চারুশীলা স্বামীর দিকে না চাহিয়া বলিলেন, "থাক দরকার নেই।"

ভাবগতিক দেখিয়া নগেন্দ্রবাবু সরিয়া গেলেন।

দাসী তাঁহার চা ও জলখাবার আনিয়া দিল। অন্যদিন গৃহিণী এ সময় উপস্থিত থাকিতেন, আজ তিনি অনুপস্থিত। নগেন্দ্রবাবু জলখাবার খাইতে গেলেন, কিন্তু তাহা গলা দিয়া যেন নামিতে চাহে না। বুকের ভিতরটা কে যেন পাথর বোঝাই করিয়া দিয়াছে। জলখাবার ফেলিয়া রাখিয়া, কেবল চাটুকু নিঃশেষে পান করিলেন।

তাহার পর অনেকক্ষণ ধরিয়া ধূমপান করিলেন। শেষে উঠিয়া, অপরাধীর মত, আবার স্ত্রীর নিকট গেলেন। তিনি তখনও সেইরূপ ভাবেই বসিয়া আছেন।

ধীরে ধীরে বলিলেন, "মাথাটা একটু সারল?"

চারুশীলা সঙ্কেতে জানাইলেন সারে নাই।

নগেনবাবু তাঁহার হাতটি ধরিয়া বলিলেন, "এস এস, উঠে এস। আজ একটা ভাল খবর আছে, বলব মনে করে কত আমোদ করে এলাম, আর তুমি রাগ করে বসে রইলে।"

স্বামীর আগ্রহাতিশয্যে চারুশীলা উঠিয়া আসিলেন। নগেনবাবু বলিলেন, "আজ সাহেব আমার পঞ্চাশ টাকা বেতন বৃদ্ধির জন্যে কমিশনর সাহেবকে অনুরোধপত্র লিখেছেন।"

এ কথা শুনিয়া, চারুশীলার চক্ষুযুগল দিয়া প্রবলবেগে অশ্রু বহিল।

নগেনবাবু বলিলেন, "ওকি, চোখের জল ফেল কেন?"—বলিয়া একহাতে স্ত্রীর হাতটি ধরিয়া, অন্য হাতে চোখের জল মুছাইতে চেষ্টা করিলেন।

চারুশীলা হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিলেন, "ওগো আজ আমায় মাফ কর। আজ আমার কাছে এস না, কোনও কথা বোলো না।"—বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

নগেন্দ্রবাবু বাহিরে বারান্দায় আসিয়া বসিলেন। আর একবার তামাকের হুকুম করিলেন। ধূমপান করিতে করিতে তাঁহার মানসিক অশান্তি আরও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। মনে হইল, যে দিন কর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেদিন কি ছিলেন, আর আজ কি হইয়াছেন। আজ চারুশীলা তাঁহাকে কাছে আসিতে, কথা কহিতে বারণ করিয়াছে। আজ তিনি পতিত, কলঙ্কিত। পবিত্র বিচারাসনে বসিয়া, জানিয়া শুনিয়া, আজ তিনি অবিচার করিয়া আসিয়াছেন। আজই কি প্রথম?—কিসের জন্য? কেবল দগ্ধোদরের জন্য। বহু-বর্ষব্যাপী শিক্ষা সাধনার ফল, ধর্ম্মবুদ্ধি, বিবেক, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা,—শুধু দগ্ধোদরের জন্য ভাসাইয়া দিয়াছেন। ছি ছি! পূর্ব্বকালে অর্দ্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত ডেপুটিরা ঘুষ লইত। তাহাদের মার্জ্জনা ছিল। সুশিক্ষাভিমানী নগেন্দ্রবাবু গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে পদবৃদ্ধিস্বরূপ ঘুষ লইয়া বিচারাসন কলঙ্কিত করিয়াছেন। তাঁহার কি মার্জ্জনা আছে?

ডেপুটিবাবু এই সকল কথা মনে মনে চিন্তা করিয়া, অনুতাপে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। শেষে অস্থির হইয়া, উঠিয়া পড়িলেন। চাদর লইয়া বেড়াইতে বাহির হইলেন। অন্ধকার অন্ধকার পথ খুঁজিয়া সে পথগুলিতে অনেকক্ষণ বেড়াইলেন।

সারারাত্রি ভাল নিদ্রা হইল না।

পর দিন কাছারি বন্ধ ছিল। প্রভাতে উঠিয়া ভৃত্যকে বলিলেন, "আজ মফস্বল যাইব।"—সকালে আহারাদি করিয়া প্রস্তুত হইলেন।

ইহা শুনিয়া চারুশীলা আসিলেন। স্বামীর মুখপানে চাহিয়া তাঁহার মনের অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। বুঝিয়া সতীর মন করুণায় দ্রবীভূত হইল। কাছে আসিয়া বলিলেন, "কবে ফিরবে?"

"কাল সকালেই ফিরব।"

"দেরী কোরো না।"

"কেন, দেরী হলে তোমার দুঃখ কি?"

স্বামীর এই অভিমানবাক্যে চারুশীলার কোমলহৃদয় ব্যথিত হইল। তিনি স্বামীর

বক্ষে মুখ লুকাইয়া নীরবে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

নগেন্দ্রবাবু বলিলেন, "ওকি—ওকি? শান্ত হও। এখনি কেউ এসে পড়বে।"

কিন্তু চারুশীলার দুঃখ দ্বিগুণে বর্দ্ধিত হইল।

নগেন্দ্রবাবু বলিলেন, "তোমার এ দুঃখ আমি আর দেখতে পারিনে। যা হবার তা হয়ে গেছে! এখন কি করলে তুমি সুখী হও বল।"

চারুশীলা স্বামিবক্ষ হইতে মুখ অপসৃত করিয়া বলিলেন, "আমায় একটি ভিক্ষা দেবে?" "কি বল।"

"এ চাকার ছাড়। যে চাকরি বজায় রাখবার জন্যে অধর্ম্ম করতে হয়, সে চাকরিতে কাজ কি? আমি তোমার তিনশো টাকা চাইনে। আমি এ ধনদৌলত, সোণা রূপো চাইনে। তুমি যদি মাষ্টারি করেও আমায় মাসে পঞ্চাশ টাকা এনে দাও আমি তাতেই সংসার চালিয়ে নেব।"

এ কথা শুনিয়া ডেপুটিবাবু একমুহূর্ত্ত মাত্র ভাবিয়া বলিলেন, "তাই হবে।"

বাহিরে গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। ট্রেণের সময় সন্নিকট। ডেপুটিবাবু বলিলেন, "তাই হবে। তুমি কেঁদ না।"—বলিয়া পত্নীকে সস্নেহে চুম্বন করিয়া বাহিরে আসিলেন।

পরদিন প্রভাতে চাপরাসি ডাক লইয়া আসিল। ডেপুটিবাবু তখনও মফস্বল হইতে ফেরেন নাই। চারুশীলা দেখিলেন কয়েকখানি চিঠির সঙ্গে, এক বোঝা সংবাদপত্র। এত সংবাদপত্র কোনও দিন আসে না। একখানি খুলিয়া দেখিলেন, "সন্ধ্যা" পত্রিকা। "ফরিদসিংহে ঘাটরামলীলা" নামক একটি প্রবন্ধ রহিয়াছে—তাহার চারি পার্শ্বে লাল কালীর রেখাঙ্কিত। ছাত্রদের মোকর্দ্দমার উল্লেখ করিয়া "সন্ধ্যা" তাহার নিজস্ব অপভাষায় নগেন্দ্রবাবুকে ভয়ঙ্কর গালি দিয়াছে। সমস্ত প্রবন্ধ পাঠ কবিবার ধৈর্য্য চারুশীলার রহিল না। অপর একখানি পত্রিকা খুলিয়া দেখিলেন, তাহাও ঐ তারিখের "সন্ধ্যা"—ঐ প্রবন্ধ লাল পেন্সিল দ্বারা রেখাঙ্কিত। এইরূপ গণিয়া দেখিলেন, ভিন্ন ভিন্ন প্যাকেটে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি সেই তারিখের সতেরো খানা "সন্ধ্যা" কলিকাতা হইতে সকৌতুকে নগেন্দ্রবাবুর নামে পাঠাইয়া দিয়াছে। পাছে স্বামীর দৃষ্টিপথে পতিত হয় এই আশঙ্কায় সমস্ত "সন্ধ্যা" গুলি চারুশীলা লইয়া জ্বলন্ত চুল্লীমধ্যে নিক্ষেপ কবিলেন।

বেলা ৯টার সময় ডেপুটিবাবু ফিরিলেন এবং তাড়াতাড়ি আহারাদি করিবা কাছারি গেলেন। চারুশীলা পুত্রকে বলিলেন, "আজ ইস্কুলে গেলিনে?" "না, আজ যাব না।"

"কেন, ছুটি আছে না কি?" "না।" "তবে?"

ইস্কুলে গেলে ছেলেরা আমায়—" বলিয়া আর বলিতে পারিল না। তার চক্ষু দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। ইতিমধ্যেই পথে ঘাটে অন্যান্য বালকেরা তাহাকে অপমান করিয়াছে।

চারুশীলা বুঝিলেন। বলিলেন, "আচ্ছা তবে থাক্। আমারও একটু কাজ আছে।"

দ্বিপ্রহরে গাড়ী ডাকিয়া, পুত্রকে সঙ্গে লইয়া তিনি বাহির হইলেন। কালীকান্ত বাবু উকীলের বাড়ী গিয়া তাঁহার স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

সেদিন সেখানে আরও দুই তিনটি উকীলের স্ত্রী সমবেত হইয়াছিলেন। চারুশীলাকে দেখিয়া অন্যান্য মহিলারা কোনও কথা বলিলেন না, মুখ ভার করিয়া রহিলেন। কালীকান্তবাবুর স্ত্রী তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। কিন্তু সে অভ্যর্থনা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের মত সাদর নহে। চারুশীলা বসিয়া, অন্যান্য কথার পর, ছেলেদের মোকর্দ্দমার কথা তুলিলেন। একটি মহিলা বলিলেন, "ওটা বড়ই দুঃখের বিষয় হয়েছে।"

কালীকান্তবাবুর স্ত্রী বলিলেন, "আপীলে বোধ হয় টিক্‌বে না, ওঁরা বলছিলেন।"

একজন বলিলেন, "তবে যদি স্বদেশী মোকর্দ্দমা বলে সাহেবেরা অবিচার করে।"

চারুশীলা জিজ্ঞাসা করিলেন; "আপীলের দিন কবে হয়েছে জানেন?"

"কবে ঠিক বলতে পারিনে। শীঘ্রই হবে।"

"ছেলেরা কলকাতা থেকে কোনও ভাল ব্যারিষ্টার নিয়ে আসুক।"

"সে অনেক টাকা খরচ। ছেলেরা কোথায় পাবে? এ'রাই করবেন এখন।"

চারুশীলা অবনত মস্তকে বলিলেন—"টাকা আমি দেব।"

এ কথায় সকলে একটু বিস্মিত হইলেন। কালীকান্তবাবুর স্ত্রী বললেন, "আপনি দেবেন কেন?"

চারুশীলার মনে যাহা ছিল, মুখে তাহা ব্যক্ত করিলেন না। করিলে তাহা পতিনিন্দার মত শুনায়। কিন্তু তাঁহার চক্ষু দুইটি জলপূর্ণ হইয়া আসিল। বলিলেন, "আপনারা এই মোকর্দ্দমায় ছেলেদের সাহায্যের জন্যে কত টাকা ব্যয়, কত ত্যাগস্বীকার করছেন। আমি কি এর জন্যে কিছু ত্যাগস্বীকার করবার অধিকারী নই? আমি এই একযোড়া বালা আর একযোড়া অনন্ত এনেছি। এ বেচলে হাজার টাকার উপর হবে। এই টাকা দিয়ে কলকাতা থেকে ছেলেদের আপীলের দিন কোন ভাল ব্যারিষ্টার আনাবার বন্দোবস্ত করুন। আমার মনে একটু শান্তি যাতে পাই, তার উপায় করুন।"—ইহা বলিতে বলিতে চারুশীলার গণ্ড বাহিয়া অশ্রু ঝরিল।

কালীকান্তবাবুর স্ত্রী গহনাগুলি লইলেন। বলিলেন, "আচ্ছা, উনি বাড়ী আসুন, ওঁকে বলবো।"

এই ঘটনায় অন্যান্য মহিলাগণের মনও দ্রবীভূত হইল। তাঁহারা তখন চারুশীলার সঙ্গে হাসিমুখে আলাপ করিতে লাগিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ছেলেদের আপীল শেষ হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা হইতে বড় ব্যারিষ্টার আনা হইয়াছিল, কিন্তু কিছু হইল না। জজ সাহেব আপীল ডিস্‌মিস্ করিলেন। ছেলেরা জেলে গিয়াছে। হাইকোর্টে মোশনের বন্দোবস্ত হইতেছে।

এ দিকে নগেন্দ্রবাবুর স্ত্রী যে গহনা বিক্রয় করিয়া ছেলেদের সাহায্য করিয়াছেন, তাহা সহরময় রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাণেও এ কথা উঠিয়াছে। শুনিয়া অবধি তিনি নগেন্দ্রবাবুর উপর বড় কঠোর আচরণ করিতেছেন। ইতিমধ্যে একদিন কার্য্যোপলক্ষে সাহেব খাস-কামরায় নগেন্দ্রবাবুকে তলব করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের মত তাঁহাকে বসিতে অনুরোধ করেন নাই। আমলার মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া এবার সাহেবকে কাজ বুঝাইতে হইয়াছিল।

কয়েক দিন পরে নগেন্দ্রবাবুর একটা রায়, জজ সাহেব উল্টাইয়া দিলেন। এই উপলক্ষে, নগেন্দ্রবাবুর দোষ না থাকিলেও কার্যে ভুল ধরিয়া আমলাগণের সমক্ষেই নগেন্দ্রবাবুকে সাহেব অভদ্রভাবে কটূক্তি করিলেন।

নগেন্দ্রবাবু কর্ম্মত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুতই হইয়াছেন। কলিকাতায় গিয়া আইন পরীক্ষা দিয়া, ওকালতী করিবেন। মাঝে মাঝে স্বামী স্ত্রীতে এ বিষয়ে জল্পনা কল্পনা হইয়া থাকে। মাসখানেকের মধ্যেই কর্ম্মত্যাগ করিবেন ইহাই আপাততঃ স্থির হইয়াছে।

জজ সাহেব কর্ত্তৃক ছেলেদের আপীল ডিসমিসের দুই এক দিন পরে, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহাকে কুঠিতে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। পূর্ব্বে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মাঝে মাঝে তিনি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে সেলাম করিতে যাইতেন, ইদানীং আর যান নাই।

সেদিন প্রভাতে পোষাক পরিয়া, গাড়ী করিয়া নগেন্দ্রবাবু সাহেবের কুঠিতে উপস্থিত হইলেন। নিজ কার্ড পাঠাইয়া দিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের রীতি ছিল, হাকিম কিম্বা বড় জমিদার আসিলে আফিস কামরায় তাঁহাদিগকে অপেক্ষা করাইতেন; চুনাপুঁটি দরের লোক আসিলে তাহাদিগকে বারান্দায় বেঞ্চে বসিয়া থাকিতে হইত। আজ চাপরাসি ফিরিয়া তাঁহাকে আফিস কামরায় না লইয়া গিয়া, সেই বেঞ্চিতে বসিতে অনুরোধ করিল।

সেখানে কয়েকজন 'চুনাপুঁটি' পূর্ব্ব হইতেই বসিয়াছিল। তাহাদের সহিত একাসনে না বসিয়া, নগেন্দ্রবাবু পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বুঝিলেন, সাহেব তাঁহাকে ইচ্ছা করিয়া অপমান করিতেছে।

কিয়ৎক্ষণ বেড়াইবার পর, ভিতর হইতে একজন চাপরাসি ছুটিয়া বাহির হইয়া বলিল, "বাবু জুতাকা আওয়াজ মৎ কীজিয়ে, সাহেব গোস্‌সা হোতা হয়। বেঞ্চপর বৈঠিয়ে।"

দন্তে ওষ্ঠ দংশন করিয়া নগেন্দ্রবাবু বেঞ্চে উপবেশন করিলেন। 'চুনাপুটি'গণ তাঁহাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে একটু সরিয়া বসিল।

ইতিমধ্যে আরও দুইজন সেলামার্থী আসিয়া বেঞ্চে বসিল। নগেন্দ্রবাবু রুমাল বাহির করিয়া মুহুর্মুহু কপালের ঘাম মুছিতে লাগিলেন। ক্রোধে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতে লাগিল।

ক্রমে সাহেব ছোটহাজরি সারিয়া আফিস কামরায় আসিলেন। প্রথমে ডাকিয়া পাঠাই-লেন—নগেন্দ্রবাবুকে নয়। যাঁহারা নগেন্দ্রবাবুর পূর্ব্বে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের একে একে ডাক পড়িল। যাঁহারা পরে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও ডাক পড়িল। শেষে নগেন্দ্রবাবু একা বেঞ্চে অধিষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

এই সময়টা তাঁহার যে কিরূপ ভাবে কাটিয়াছিল, তাহা তিনিই জানেন এবং তাঁহার ইষ্টদেবতাই জানেন। এই সময়ের মধ্যে নগেন্দ্রবাবু দন্তে দন্ত দৃঢ়বন্ধ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন, একমাস পরে নহে,—অদ্যই।

অবশেষে নগেন্দ্রবাবুর ডাক পড়িল। তিনি ক্রোধে মাতালের মত টলিতে টলিতে, সাহেবের কামরায় প্রবেশ করিলেন। অন্য দিনের মত সাহেব আজ উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার সহিত করমর্দ্দন করিলেন না। "গুড়্‌মর্ণিং সার্।" 'গুড্ মর্ণিং বাবু।"

"বাবু!"—অন্য দিন হইলে সাহেব বলিতেন—নগেন্দ্রবাবু। সাহেব বিলক্ষণ জানিতেন, শুধু বাবু বলিয়া সম্ভাষিত হইলে পদস্থ বাঙ্গালী অপমান বোধ করে।

নগেন্দ্রবাবু ইহাও লক্ষ্য করিলেন। কিন্তু তাঁহার মন কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইয়াছিল, এই আঘাতে নূতন কোন বেদনা অনুভব করিল না।

সাহেব চুরুট মুখে করিয়া বলিলেন, "সহরে এখন স্বদেশীর অবস্থা কিরূপ?"

নগেন্দ্রবাবু বলিলেন, "ভালই।"

"শুনিয়া সুখী হইলাম। ইহা বিস্কিট-মোকর্দ্দমার কঠিন শাস্তির সুফল।"

নগেন্দ্রবাবু মনে মনে একটু হাসিলেন। বলিলেন, "আপনি বোধ হয় আমার কথাটা ভুল বুঝিলেন। ভালই—অর্থাৎ স্বদেশীর পক্ষে ভালই, গভর্ণমেণ্টের পক্ষে নয়। সেই মোকর্দ্দমার পর হইতে লোকের স্বদেশীপণ দৃঢ়তর হইয়াছে।"

সাহেব যেন একটু আশ্চর্য্য হইয়া নগেন্দ্রবাবুর মুখপানে চাহিলেন। বলিলেন, "তবে 'ভালই' কেন বলিলেন? আপনি কি একজন স্বদেশী নাকি?"

নগেন্দ্রবাবু গর্ব্বিতভাবে বলিলেন, "স্বদেশী আন্দোলন হইয়া অবধি, এক পয়সার বিলাতী দ্রব্য আমার গৃহে আসে নাই।"

সাহেবের মুখ ও কর্ণ ক্রোধে লাল হইয়া উঠিল। তিনি জানিতেন যে, অনেক সরকারী কর্ম্মচারী লুকাইয়া লুকাইয়া স্বদেশীয়তা রক্ষা করে, কিন্তু সাহেবের সাক্ষাতে এমন করিয়া দর্প ত কেহ করে না! তিনি বুঝিলেন যে, এই ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়া নগেন্দ্রবাবু সদ্যপ্রাপ্ত অপমানের প্রতিশোধ লইতেছেন। সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে, এই নীতির অনুসরণ করিয়া সাহেব বলিলেন, "হাঁ, আমি শুনিয়াছি, বাঙ্গালী মহিলারা স্বদেশী বিষয়ে পুরুষগণের অপেক্ষাও দৃঢ়তর।"—বলিয়া সাহেব একটু হাসির ভাণ করিলেন। একটু পরেই বলিলেন—"By the way—শুনিলাম নাকি আপনার স্ত্রী ঐ মোকর্দ্দমার আপীলে হাজার টাকা দিয়া ছেলেদের সাহায্য করিয়াছেন? ইহা সত্য নাকি?" "সত্য। হাইকোর্টে মোশন হইবে, তাহার খরচও বহন করিতে আমার স্ত্রী প্রস্তুত হইয়াছেন।"

সাহেব নিজ স্থৈর্য্য আর রক্ষা করিতে পারিলেন না। আবার তাঁহার মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। বলিলেন, "এটা কি গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণ নয়?"

নগেন্দ্রবাবু অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "সম্ভবতঃ, কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমার

স্ত্রী গভর্ণমেণ্টের চাকর নহেন।”

ক্রোধের সহিত বিস্ময়ের ভাবও সাহেবের মনে আধিপত্য করিতে লাগিল। তিনি এতদিন চাকরি করিতেছেন, এ প্রকার তেজের কথা ত বাঙ্গালীর মুখে অদ্যাবধি শুনেন নাই! সাহেব বুঝিলেন, আজ নগেন্দ্রবাবু তাঁহাকে অপমান করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। আচ্ছা, তাহার অমোঘ ঔষধও সাহেবের কাছে আছে। তাহা প্রয়োগ করিলে, চাকরিগতপ্রাণ বাঙ্গালী এখনই নতজানু হইয়া ক্ষমাভিক্ষা করিবে।

এই ভাবিয়া তিনি বলিলেন, “সে কথা যাউক। আজ যে জন্য আপনাকে ডাকিয়াছি তাহা বলি। সম্প্রতি আপনার কাবকর্ম্মে অত্যন্ত শিথিলতা দেখা যাইতেছে। আপনি যদি এখনই সাবধান না হন, তবে আপনার বেতন বৃদ্ধির অনুরোধপত্র আমাকে ত প্রত্যাহার করিতে হইবেই, হয় ত আপনাকে ডিগ্রেড করিতেও বাধ্য হইতে পারি।”

এই কথা বলিয়া সাহেব নগেন্দ্রবাবুর মুখের পানে সাগ্রহে দৃষ্টিপাত করিলেন—ঔষধ ধরিল কিনা। বাবুর মুখ নিশ্চয়ই ভয়ে বিবর্ণ হইয়া যাইবে এবং তিনি ক্ষমাপ্রাপ্তির জন্য আকুল হইয়া উঠিবেন।

কিন্তু তাহা হইল না। নগেন্দ্রবাবুর মুখে, অল্পে অল্পে, একটু ঘৃণামিশ্রিত হাস্য-রেখা ফুটিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, “তাহা স্বচ্ছন্দে আপনি করিতে পারেন। কারণ উহাতে আমার কোনই ক্ষতি হইবে না।”

সাহেব অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, “তাহার অর্থ কি?”

“আমি স্থির করিয়াছি, কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিব। অদ্যই আফিসে আমার কর্ম্মত্যাগপত্র আপনার হস্তগত হইবে। আমাকে মাসান্তে যাহাতে বিদায় দিতে পারেন, বিলম্ব না হয়, অনুগ্রহপূর্ব্বক সে চেষ্টা করিলে অত্যন্ত বাধিত হইব।”

শুনিয়া, সাহেব যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। বাঙ্গালী! বাঙ্গালী হইয়া এত বড় চাকরিটা এক কথায় ছাড়িতে উদ্যত হইয়াছে?

নগেন্দ্রবাবু পকেট হইতে ঘড়ি খুলিয়া দেখিলেন। দেখিয়া দণ্ডায়মান হইয়া বলিলে ‘আমি আর আপনার সময় নষ্ট করিব না। গুড্মর্ণিং।”

সাহেব অন্যমনস্ক হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন—“গুড্মর্ণিং।”

একমাস কাটিল। আজ নগেন্দ্রবাবুর চাকরির শেষ দিন। বিকাল বেলা দেখা গেল, তাঁহার এজলাসের বাহিরে বহুসংখ্যক ইস্কুলের বালক সমবেত হইয়াছে। অনেকের হাতে বন্দে মাতরম্ ধ্বজা।

তিনি বাহির হইবামাত্র বালকেরা তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিল। একখানা ফেটন্‌গাড়ী আনিয়াছিল। তাহাতে নগেন্দ্রবাবুকে আরোহণ করিতে অনুরোধ করিল।

কিন্তু নগেন্দ্রবাবু সম্মত হইলেন না।

বালকেরা জিদ করিতে লাগিল। বলিল, ঘোড়া খুলিয়া আজ তাঁহাকে তাহারা টানিয়া লইয়া যাইবে।

পথ দিয়া একজন গ্রাম্য ও একজন নাগরিক নিরক্ষর লোক যাইতেছিল। ব্যাপারখানা বুঝিতে না পারিয়া গ্রাম্য ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল—“একি বাহে? বাবুর সাদি নাকি?”

নাগরিক ব্যক্তি উত্তর করিল—“আমার পছন্দ হয়, বাবুর জ্যাল হইছিল, আজ খালাস হইছে। আজকাল দোহি বাবুদের জ্যাল থেহে খালাস হইলে এই রকমডা করে।”

এ দিকে, বালকেরা নগেন্দ্রবাবুকে টানিবার জন্য বিস্তর পীড়াপীড়ি করিল, কিন্তু নগেন্দ্রবাবু কিছুতেই রাজি হইলেন না; অন্য দিনের মতই পদব্রজে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

দুইমাস-ব্যাপী বিচ্ছেদের পরে আজ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে পুনর্ম্মিলন সংঘটিত হইল।

[ভাদ্র, ১৩১৪]

মার্তঙ্গিনীর কাহিনী

ষোড়শবর্ষীয়া যুবতী এলোকেশী, তারকেশ্বরের মোহান্তের সহিত ব্যভিচারিণী হইয়াছিল বলিয়া, এলোকেশীর স্বামী তাহাকে খুন করিয়াছিল। সেই ব্যাপার লইয়া একদিন বাঙ্গালা দেশে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। সে সম্বন্ধে কত ছড়া কত গান উঠিয়াছিল, গ্রামে গ্রামে ভিখারীরা সেই গান গাহিয়া ভিক্ষা করিত। এলোকেশীর মত না হউক, মাতঙ্গিনীর ব্যাপারেও এক সময় বাঙ্গালা-দেশকে অত্যন্ত চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। মাতঙ্গিনী অথবা তাহার জার অথবা দুইজনে মিলিয়া, মাতঙ্গিনীর স্বামীকে হত্যা করিয়াছিল। তাহার জার পলাইয়াছিল—পুলিস তাহাকে ধরিতে পারে নাই। মাতঙ্গিনীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের হুকুম হয়।

এই ঘটনাটি, বিখ্যাত সাহিত্যিক কৃষ্ণনগরনিবাসী রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বাহাদুরের মুখে যেমন শুনিয়াছি, নিম্নে তাহাই বর্ণনা করিলাম।

মাতঙ্গিনীর স্বামীর (নামটি শুনি নাই) বাস ছিল নদীয়া জেলার কোনও এক পল্লীগ্রামে। সংসারে কেবল স্বামী, স্ত্রী ও একটি শিশুপুত্র। স্বামী বড় গরীব, কিছু ইংরাজি লেখাপড়া শিখিয়াছিল, নানাস্থানে চাকরির জন্য দরখাস্ত পাঠাইত। ক্রমে তাহার চাকরি একটি জুটিল, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের কোন্ এক সহরে। কিন্তু বেতন এত অল্প যে, সে ব্যক্তি স্ত্রী-পুত্রকে নিজ সঙ্গে লইয়া যাইতে সাহস করিল না। প্রতিবেশীরা তাহাকে অভয় দিলেন, "তোমার চিন্তা কি বাবা? আমরা সব রয়েছি, আমরা সর্ব্বদা দেখবো শুনবো, তোমার স্ত্রী-পুত্রের জন্যে কোনও চিন্তা তুমি কোরো না। যাও গিয়ে কর্ম্মে ভর্ত্তি হও, মন দিয়ে কাজকর্ম্ম করলে নিশ্চয়ই তোমার উন্নতি হবে, মাইনে বাড়বে, তখন এসে তোমার স্ত্রী-পুত্রকে সেখানে নিয়ে যেও।"

যুবক, প্রতিবেশীদের তত্ত্বাবধানে স্ত্রী ও দুই বৎসর বয়স্ক পুত্রকে রাখিয়া কর্ম্ম-স্থানে গমন করিল। সেখানে গিয়া কঠোর পরিশ্রমে সে আপন কার্য্য করিতে লাগিল। মনিব খুসী হইয়া মাঝে মাঝে কিছু কিছু করিয়া তাহার বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিতেন।

মাতঙ্গিনী, তখনকার দিনেও লেখাপড়া জানিত। স্বামীর সহিত নিয়মিতভাবে সে পত্র-বিনিময় করিত। স্বামী তাহাকে মাসে মাসে খরচের টাকা মনিঅর্ডারে পাঠাইয়া দিত।

স্বতন্ত্র বাসা ভাড়া করিয়া, স্ত্রী-পুত্র আনিয়া বাস করিবার উপযোগী বেতন যখন তাহার হইল, তখন তাহার চাকরি প্রায় তিন বৎসর পূর্ণ হইয়াছে।

স্বামী তখন এক মাসের ছুটির দরখাস্ত করিল—ছুটি মঞ্জুরও হইল। সে তখন স্ত্রীকে পত্র লিখিল, "ভগবান এতদিনে মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। এতদিনে আমার এমন ক্ষমতা হইয়াছে যে, বাসা ভাড়া করিয়া তোমাদের আনিয়া নিজের কাছে রাখি। এক মাসের ছুটি পাইয়াছি। অমুক দিন হইতে আমার ছুটি আরম্ভ। অমুক তারিখে বাড়ী পৌঁছিব, এক মাস বাড়ীতে থাকিয়া, বাড়ী তালা বন্ধ করিয়া, তোমাদের লইয়া এখানে চলিয়া আসিব।"

মাতঙ্গিনী ছিল, অত্যন্ত রূপসী। স্বামীর বিদেশগমনের বছরখানেকের মধ্যেই, তাহার অধঃপতন ঘটিয়াছিল। ক্রমে প্রতিবেশীরা সকল কথা জানিতেও পারিয়াছিল, কিন্তু কেহই তাহার স্বামীকে এ অপ্রিয় সংবাদ প্রেরণ করে নাই।

পত্র আসিবার পর, মাতঙ্গিনী ও তাহার জার, মহা ভাবনায় পড়িয়া গেল। "তাই ত! এক মাস পরে লইয়া যাইবে, আর দেখাশুনা হইবে না।" এই জাতীয় চিন্তাই বোধ হয়।

ক্রমে তাহাদের পরামর্শ হইল, সে আসুক, রাতারাতি তাহাকে হত্যা করিয়া, লাসে পাথর বাঁধিয়া নদীর জলে ফেলিয়া দিলেই হইবে। কেহ জানিবে না শুনিবে না। পরদিন প্রচার করিয়া দিলেই হইবে যে, ভোরে উঠিয়া সে কলিকাতা চলিয়া গিয়াছে।

নির্দ্দিষ্ট দিনে হতভাগ্য স্বামী বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল। প্রবাস-যাপনকালে নিজেকে সকল রকম সুখ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত করিয়া অতি কষ্টে তাহার স্বল্প বেতন হইতে কিছু কিছু সঞ্চয় করিত। আসিবার সময় এই সঞ্চিত অর্থে, স্ত্রীর জন্য একযোড়া সোণার বালা সে গড়াইয়া আনিয়াছিল—তাহা স্ত্রীকে উপহার দিল।

পথশ্রমে ক্লান্ত ছিল—একটু সকালেই নৈশ-ভোজন শেষ করিয়া পুত্রসহ সে শয্যায় আশ্রয় লইল। ছেলেটি তখন তাহার পাঁচ বৎসরের হইয়াছে। তারপর কি ঘটিল, নদীয়া জজ আদালতে সেই পাঁচ বৎসরের ছেলের মুখে শুনুন।

"একদিন একব্যক্তি আমাদের বাড়ী আসিল, মাকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, "তোর বাবা।" আমি বলিলাম, "আমার একটা বাবা ত রহিয়াছে।" মা বলিল, "এও তোর বাবা, সে বাবার কথা এ বাবাকে কিছু বলিস্ না।"

নূতন বাবা আমাকে কাছে লইয়া রাত্রে শয়ন করিলেন। আমায় কত চুমো খাইলেন, কত আদর করিলেন। আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম।

অনেক রাত্রে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে দেখিলাম, আমার মা ও পুরাতন বাবা, ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া আছে, আমার নূতন বাবা যে সেদিন আসিয়াছিল, তার গলা কাটা, রক্তে বিছানা ভাসিয়া যাইতেছে। দেখিয়া আমি কাঁদিয়া উঠিলাম। বাবা আমায় ধমক দিয়া বলিল, "চুপ কর্ পাজি! চেঁচাবি ত তোরও গলা এমনি ক'রে কেটে দেবো।" ভয়ে আমি চক্ষু মুদিলাম এবং ঘুমাইয়া পড়িলাম।"

গ্রামের একজন ডোম এ মোকদ্দমায় একটা প্রধান সাক্ষী ছিল, তাহার উক্তি হইতে প্রকাশ—

খুনের পর মাতঙ্গিনী তাহার জারকে বলিতে লাগিল, "চল, এবার দুজনে লাসটা নদীতে দিয়ে আসি।"

সে ব্যক্তি বলিল, "দাঁড়াও, একটু স্থির হয়ে নিই। রক্ত দেখে আমার মাথাটা কেমন ঘুরছে। ভয় কি? একটু সবুর কর—সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি।"

কিছুক্ষণের পর সে ব্যক্তি বলিল, "একবার চট্ করে বাইরে থেকে আসি"—বলিয়া সে বাহির হইয়া রাত্রির অন্ধকারে কোথায় গেল, পুলিস তাহার কোনও সন্ধান করিতে পারে নাই।

মাতঙ্গিনী বসিয়া তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। দশ মিনিট—পনেরো মিনিট—আধ ঘণ্টা হইয়া গেল, তখন সে বুঝিতে পারিল, তাহার পেয়ারের লোকটি—এই অবস্থায় তাহাকে ফেলিয়া—পলায়ন করিয়াছে।

মাতঙ্গিনী তখন বাড়ীতে তালা বন্ধ করিয়া, সেই অন্ধকারে বাহির হইল। গ্রামের ডোমপাড়ায় গিয়া, তাহার বিশ্বস্ত একজন ডোমকে জাগাইল। তাহার নিকট আমূল সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিয়া বলিল, "তুমি আমার বাবা, তুমি আমার প্রাণ বাঁচাও। এখন মাত্র দুপুর রাত, রাতারাতি লাসটা নদীতে দাও। তোমার পুরস্কার, আমার হাতের এই নূতন বালাযোড়াটা। একটা তোমায় আমি এখনি দিয়ে যাচ্চি—আগাম। আর একটা কাজ শেষ হ'য়ে গেলেই তুমি পাবে।"—বলিয়া মাতঙ্গিনী এক হাতের বালা খুলিয়া ডোমকে দিল।

সমস্ত শুনিয়া বালা লইয়া ডোম বলিল, "আচ্ছা মাঠাকরুণ, যা করবার আমি সুরু করছি। তামাকটা খেয়ে নিই, খেয়ে, আমার এক বন্ধু ডোমকেও ডাকি। তাকেও সঙ্গে নেওয়া দরকার, একলা ত আমি পারবো না। অন্য বালাটা বরঞ্চ তাকেই দেবেন, সেও

ত পুরস্কারের আশা করবে। আপনি বাড়ী যান, আমি আধ ঘণ্টার ভিতরই তাকে নিয়ে আসছি।"

মাতঙ্গিনী বাড়ী চলিয়া গেল। ডোম, তামাক শেষ করিয়া, অন্য কোনও ডোমকে জাগাইতে গেল না,—সে গেল থানায়। দারোগাকে জাগাইয়া মাতঙ্গিনী যাহা যাহা তাহাকে বলিয়াছিল, সমস্তই দারোগাকে জানাইল, এবং বালাটিও দারোগাকে দিল।

দারোগা সেই রাত্রেই গিয়া মাতঙ্গিনীকে গ্রেপ্তার করিলেন।

অবশেষে, সেসন জজের আদালতে মাতঙ্গিনীর বিচার হইল। কে যে হত্যা করিয়াছিল,—মাতঙ্গিনীই গলা কাটিয়াছিল, অথবা তাহার জারই ও-কার্য্য করিয়াছিল,—তাহা নির্ণীত হইল না। চাক্ষুষ সাক্ষী কেবলমাত্র সেই পাঁচ বৎসরের বালক। কিন্তু আইন এই যে, যদি দুই বা তদধিক ব্যক্তি একমত হইয়া কোনও দুষ্কার্য্য করে, তবে প্রত্যেকেই সমভাবে অপরাধী (পীনাল কোড, ৩৪ ধারা)। স্বেচ্ছাকৃত নরহত্যার ধারাতেই জজ মাতঙ্গিনীকে অপরাধী সাব্যস্ত করিলেন, কিন্তু স্ত্রীলোক বলিয়া দয়া করিয়া চরম-দণ্ড (ফাঁসি) না দিয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ দিলেন।

জজ আদালত হইতে মাতঙ্গিনীকে কয়েদী গাড়ীতে (prison van) যখন জেলে লইয়া যাইত, সেই সময় পথের দুই ধারে কৃষ্ণনগরের লোক সারি দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। গাড়ী দৃষ্টিগোচর হইবামাত্র, তাহারা অকথ্য ভাষায় মাতঙ্গিনীকে গালাগালি দিত,—কেহ গাড়ীর কাছে যাইয়া তাহাতে থুথু ফেলিত, ছেঁড়াজুতা প্রভৃতি, এমন কি কাগজে মোড়া বিষ্ঠা পর্য্যন্ত গাড়ীতে ছুঁড়িয়া মারিত। জনসাধারণের ক্রোধ (public indignation) এই ভাবে আত্মপ্রকাশ করিত। তারকেশ্বরের মোহান্তের বেলায়ও এইরূপ ঘটিয়াছিল। মোহান্তের চারি বৎসর জেল হয়—হুগলি জেলে সে আবদ্ধ হইয়াছিল। গুজব রটিয়াছিল, মোহান্তকে ঘানি টানাইতেছে। সহরে জেলের উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের একটা দোকান (jail depot) ছিল। মোহান্তের নিষ্কাশিত সর্ষপ তৈল সে দোকানে একটাকা সেরে বিক্রয় হইয়াছিল। (তখনকার দিনে এক সের সর্ষপ তৈলের মূল্য দুই আনা দশ পয়সা মাত্র ছিল—আমিই চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে চারি আনা সের সর্ষপ তৈল কিনিয়াছি)।

সান্যাল-মহাশয় ছিলেন একজন সরকারী ডাক্তার—অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জ্জন। (ক্রমে তিনি সিভিল সার্জ্জন পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। এখন পেন্সন ভোগ করিতেছেন)। এক সময় পোর্ট ব্লেয়ারের মেডিক্যাল অফিসারস্বরূপ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বদলি করে। তিনি স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া পাঁচ বৎসর কাল পোর্ট ব্লেয়ারে সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি আমাকে বলিয়াছেন—

"পোর্ট ব্লেয়ারে পৌঁছানর অল্প দিনের মধ্যে আমি জানিতে পারি যে, মাতঙ্গিনী তথায় রহিয়াছে। একজন বাঙ্গালী অফিসার আসিয়াছেন শুনিয়া, মাতঙ্গিনী আমাদের বাসায় আসিল, আমার স্ত্রীর সহিত আলাপ করিয়া গেল। তারপর হইতে মাঝে মাঝে সে আসিত, আমার স্ত্রীর সহিত গল্প-গুজব করিয়া চলিয়া যাইত। তখন সে বৃদ্ধা, সমস্ত চুল তার পাকিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহাকে দেখিয়া মনে হইত, যৌবনে সে খুব সুন্দরীই ছিল।

একদিন নির্জ্জন পথে মাতঙ্গিনীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। আমি তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলাম। অন্যান্য কথার পর বলিলাম, "মাতঙ্গিনী, তোমার মত, আমিও নদীয়া জেলার লোক, কৃষ্ণনগরে আমার বাড়ী, ইহা আমার স্ত্রীর কাছে তুমি শুনিয়া থাকিবে। সেসন আদালতে যখন তোমার মোকর্দ্দমা হয়, তখন আমি বালক, স্কুলে পড়ি। সে সময় লোকে বলাবলি করিত, খুনটা কে করিল, তুমিই করিলে, অথবা তোমার সেই লোকই করিল, তাহা কিছুই জানা গেল না। এ বিষয়ে, অন্য সকলের মত, আমার

মনেও অত্যন্ত কৌতূহল ছিল। সে ঘটনার পর বহু বৎসর গত হইয়াছে। এখন তুমি আমায় সে কথা বলিবে?"

সান্যাল-মহাশয় আমায় বলিলেন. "এই কথা শুনিয়া মাতঙ্গিনী কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া নতমুখে রহিল।" তার পর ধীরে ধীরে, মুখ পশ্চাৎদিকে ফিরাইয়া বলিল, 'সে কথা আর জিজ্ঞাসা করবেন না।"

পরের চিঠি

আহারাদি করিয়া, ধড়াচূড়া পরিয়া, বেলা ১১টার সময় সাব-ডেপুটিবাবু কাছারি রওয়ানা হইলেন। তাঁহার ভার্য্যা মণিকা দেবী তখন চুল খুলিয়া উহাতে চিরুণী দিতে দিতে স্নানের ঘরে প্রবেশ করিতেছেন।

মণিকার বয়স অষ্টাদশ বর্ষ, সবেমাত্র এক বৎসর বিবাহ হইয়াছে। মণিকা বেথুনে আই-এ পড়িতেছিল, বিবাহ হইয়া পড়া বন্ধ হইল। স্বামীর নাম সুরেন্দ্রনাথ দেব, জাতিতে কায়স্থ, বয়স ২৭ বৎসর, বেশ স্বাস্থ্যপূর্ণ বলিষ্ঠ দেহ, তবে রঙটি মণিকার মত ধবধবে নহে,—উজ্জ্বল শ্যামবর্ণই বলিতে হইবে। সুরেনবাবু ইংরাজি সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর এম-এ, তাহার উপর একজন সুকণ্ঠ গায়ক। মণিকার মনে স্বামিসৌভাগ্য-গর্ব্বের অন্ত নাই।

কৈশোর কাল হইতে উপন্যাস পড়িয়া পড়িয়া দাম্পত্য প্রেমের একটা উচ্চ আদর্শ মনের মধ্যে মণিকা প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছিল। তাহার বিশ্বাস, প্রত্যেক মানুষ জীবনে একবার মাত্র ভালবাসিতে পারে। যদি কেহ প্রথমা স্ত্রীকে ভালবাসিয়া, তাহার মৃত্যুর পর আবার বিবাহ করে, তবে সেই দ্বিতীয় পক্ষের পত্নীর প্রতি তথাকথিত ভালবাসা জাল ও জুয়াচুরি মাত্র। উহাতে দেহের মিলন হয় বটে, প্রাণের মিলন, আত্মার মিলন অসম্ভব। মণিকার পিতা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ;—সুশিক্ষিত এবং আধুনিক ভাবাপন্ন। সংসার খুব স্বচ্ছন্দের না হইলেও, কষ্টে সৃষ্টে মেয়েকে পড়াইতেছিলেন। মেয়ের রূপ আছে, তাহার উপর বিদ্যা-সংযোগ হইলে, কালে এমন কি একটা সিভিলিয়ান জামাতা জুটিয়া যাওয়াও আশ্চর্য্য নহে. ইহাই ছিল তাঁর মনের গোপন আশা। কিন্তু কার্য্যকালে দেখিলেন, বিলাত-ফেরৎ হইলে কি হইবে? চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী! সে শ্রেণীর পাত্রের দর অতিরিক্ত চড়া। চারি অঙ্কে কুলায় না, পাঁচ অঙ্ক আবশ্যক। তাই অবশেষে তিনি হতাশ হইয়া একটি উচ্চপদস্থ দ্বিতীয়পক্ষ পাত্র স্থির করিয়াছিলেন। বয়স তাহার এমন কিছু বেশী নয়, সন্তান সন্ততিও ছিল না। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ শুনিয়া মণিকা এমন বাঁকিয়া বসিয়াছিল যে, সে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিতে হয়। অবশেষে সাব-ডেপুটি সুরেন্দ্রনাথের হস্তেই তিনি কন্যাদান করিয়াছেন। সুরেন্দ্রবাবু এক্ষণে রঙ্গপুরে কার্য্য করিতেছেন।

স্নান সারিয়া, মণিকা ঝিকে আদেশ করিল, "বামুনঠাকুরকে বল্ আমার ভাত বেড়ে নিয়ে আসতে।"

আহারান্তে তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে করিতে মণিকা একটা বাংলা মাসিক পত্রিকা হস্তে সোফায় অঙ্গ ঢালিল। এখানি "তরুণ" দলের কাগজ। মণিকা একটা গল্প পড়িতে আরম্ভ করিল। স্বামিপ্রেম-বঞ্চিতা এক তরুণী গোপনে কিরূপ ভাবে পুরুষান্তরের সহিত প্রেম করিয়াছিল তাহারই বর্ণনা। কিছুদিন পরে স্ত্রীর সতীত্ব সম্বন্ধে স্বামীর মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়, তখন সেই সেকেলে সঙ্কীর্ণমনা নরপশুটা মাঝে মাঝে অসময়ে অতর্কিতে গৃহে আসিয়া দেখিত স্ত্রী কি করিতেছে! এই ভাবে লাঞ্ছিতা অপমানিতা তরুণী অবশেষে স্বামীর নামে সমাজতত্ত্বঘটিত খুব উচ্চ দরের চিন্তাপূর্ণ একটা পত্র লিখিয়া রাখিয়া, গৃহত্যাগ করিয়া তাহার প্রণয়ীর গৃহে গিয়া আশ্রয় লইল এবং তথায় নিজ "নারীত্ব সফল" করিতে লাগিল। গল্পটা পড়িয়া ঘৃণায় মণিকার ওষ্ঠ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। সে মনে মনে বলিল, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমাদের প্রেমে অমন অভিশাপ লাগেনি।"

গল্পের শেষাংশ পাঠ করিতে করিতে মণিকার চক্ষু ঘুমে জড়াইয়া আসিতেছিল। গল্প শেষ করিয়া, মাসিকপত্রখানি পার্শ্বস্থ টেবিলে রাখিয়া মণিকা সেই সোফাতেই একটু গড়াইবার আয়োজন করিতেছে,—এমন সময় বাংলোর হাতায় একটা গাড়ী প্রবেশ করিবার শব্দ শুনিতে পাইল। কে আসিল? ইন্স্পেক্টারবাবুর স্ত্রী? যদুবাবু উকিলের স্ত্রীও হইতে পারেন। কিন্তু সিঁড়িতে পদশব্দ উঠিল—তার স্বামীর। মণিকা দেওয়াল-ঘড়ির পানে চাহিয়া দেখিল, বেলা সবে তখন দেড়টা। পাঁচটার পূর্ব্বে স্বামী ত কোনও দিন ফেরেন না, তবে আজ এমন অসময়ে কেন? সে মনে মনে হাসিয়া বলিল, "ওগো, আমার নারীত্ব বিফল হয়নি। তোমার গোয়েন্দাগিরির কোনও দরকার নেই!"

পদশব্দ হঠাৎ অত্যন্ত মৃদুভাব ধারণ করিল। মণিকা বেশ বুঝিতে পারিল, আগন্তুক সাবধানে পা টিপিয়া টিপিয়া আসিতেছেন। সত্যই তবে এটা গোয়েন্দাগিরি নাকি? অবশেষে সুরেনবাবু ভেজানো দুয়ারটি আস্তে আস্তে ফাঁক করিলেন। তারপর ভিতরে আসিয়া বলিলেন, "কি গো, তুমি এখনও ঘুমোওনি? পাছে তোমার ঘুম ভেঙ্গে যায় সেই ভয়ে আমি পা টিপে টিপে আসছি।"—বলিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন।

মণিকা সপ্রেম দৃষ্টিতে স্বামীর পানে চাহিল। বলিল, "আজ হঠাৎ এমন অসময়ে যে?"

"হঠাৎ সাহেবের হুকুম হল, একটা সরেজমিন তদন্তের জন্যে বাইরে যেতে হবে। ৩টের গাড়ীতেই রওয়ানা হতে হবে।"

"কোথায়?"

"তিস্তা জংসন থেকে নেমে ১২ মাইল। তুমি যাবে? চল না বেড়িয়ে আসবে। সেখানে ছোটখাট রকমের একটা ডাকবাংলা আছে।"

মণিকা হাসিতে হাসিতে বলিল, "কেন, আমাকে বাড়ীতে একা রেখে যেতে তোমার অবিশ্বাস হয় নাকি?"

"অবিশ্বাস? তোমাকে? তোমার প্রতি যেদিন অবিশ্বাস হবে সেদিন যেন আমার মৃত্যু হয়।"—বলিতে বলিতে তিনি স্ত্রীর পাশে সোফায় বসিলেন।

মণিকা রাগিয়া স্বামীর গালে একটা ঠোনা মারিয়া বলিল, "আহা! কথার ছিরি দেখ না পুরুষের! খুব রসিকতা হল, না?"

"রসিকতা আমি করলাম? না তুমি করলে?"

"আমিও করিনি। দেখ, ঐ হতভাগা মাসিকপত্রের একটা হতভাগা গল্প আমার মাথার ভিতরে ঘুরছিল। আমি যেতাম গো, তোমার সঙ্গে গিয়ে এই বাহের দেশের পাড়া-গাঁ দেখে আসতাম। কিন্ত শরীরটে কেমন ভাল ঠেকছে না।"

"কেন আবার জ্বর করবে নাকি?" "কি জানি!"

"তাই ত! ভারি মুস্কিল করলে যে! স্নানটা আজ বাদ দিলেই হত! কিন্তু

আমার ত না গেলেই নয়!"

তুমি এস গিয়ে। ও আমার কিছু নয়! রাত্রে একটা উপোস দেবো না হয়। চল তোমার গোছ-গাছ ক'রে দিইগে।"

গোছগাছের বিশেষ কিছু প্রয়োজন ছিল না। দুই একদিনের জন্য টুরে যাইবার বস্ত্রাদি একটা সুটকেসে গোছানই থাকিত। গৃহভৃত্য ও আর্দ্দালিতে মিলিয়া বিছানা বাঁধিয়া ফেলিল। আর্দ্দালি ঠিকাগাড়ী ডাকিয়া আনিল। বিছানা, সুটকেস ও জলের সোরাই সহ সাব-ডেপুটিবাবু ষ্টেশন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বলিয়া গেলেন, পরশু দুপুরবেলা নাগাইদ ফিরিয়া আসিবেন।

সেইদিন বৈকালে ধোবা আসিল। গতবারে তাড়াতাড়িতে ধোবাকে দেওয়া কাপড়ের তালিকা লিখিয়া রাখা হয় নাই—তবে কোন্ কোন্ কাপড় গিয়াছে তাহা মণিকার বেশ মনে ছিল। মণিকা কাপড়গুলি নাড়িয়া চাড়িয়া বলিল, "বাবুর একটা এণ্ডির কোট গিয়েছিল যে! সেটা আনিসনি?"

ধোবা বলিল, "না মা, এ ক্ষেপে ত যায়নি।"

মণিকা বলিল, "গিয়েছিল বইকি। আমার মনে হচ্চে।"

ধোবা সবিনয়ে প্রতিবাদ করিল। বলিল, উহা গত মাসে গিয়াছিল. এবং যথাসময়ে সে উহা দিয়াও গিয়াছে, মা খুঁজিয়া দেখিলে নিশ্চয়ই উহা বাড়ীতেই পাইবেন।

মণিকা বলিল, "আচ্ছা আমি খুঁজে দেখবো। কিন্তু যদি না পাই তা হলে তোমার হিসেব থেকে দাম কাটা যাবে বাপু!"

দুই

পরদিন প্রাতে উঠিয়া মণিকা দেখিল, মাথাটা কেমন ভার ভার, চোখ দু'টাও জ্বালা করিতেছে। চা-পান শেষ করিয়া সে স্বামীর এণ্ডির কোটের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইল। শয়নকক্ষের আলমারি ট্রাঙ্ক প্রভৃতি খোঁজা শেষ হইলে, অপর এক কক্ষে একটা কালো রঙের সুটকেসের প্রতি মণিকার নজর পড়িল;—তখন তাহার স্মরণ হইল, ঐ সুটকেস ত কোনও দিন সে খোলে নাই, উহাতে কি আছে তাহাও সে অবগত নহে। নাড়িয়া দেখিল. উহা ভারি মন্দ নহে, বস্ত্রাদি থাকাই সম্ভব। সেই এণ্ডির কোট স্বামী যদি উহার ভিতর রাখিয়া থাকেন! কিন্তু উহার চাবি কই? যে রিঙে অন্যান্য চাবি রহিয়াছে. সে রিঙে উহার চাবি ত নাই! সে রিঙের সব চাবিই ত মণিকার সুপরিচিত। আর একটা রিঙ আছে, উহাতে স্বামীর আফিসের চাবি থাকে। উহা শয়নঘরে শেলফের উপর থাকে, আপিস যাইবার সময় স্বামী উহা পাৎলুনের পকেটে পুরিয়া লইয়া যান। মণিকা শয়নঘরে গিয়া সেই রিঙ লইয়া আসিয়া. দুই তিনটা চাবি লাগাইতেই কলটা খুলিয়া গেল।

সুটকেসের ভিতর হইতে কয়েকটা পুরাতন কাপড় জামার তলেই বাহির হইল, সিল্কের রুমালে বাঁধা কতকগুলি চিঠি। কোনওখানিরই খাম নাই। স্ত্রীলোকের সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা চিঠি, স্বাক্ষর স্থানে "তোমারই মনোরমা।" রুমালখানি সহ চিঠির বাণ্ডিলটি বাহির করিয়া লইয়া. সুটকেস বন্ধ করিয়া মণিকা শয়নকক্ষে ফিরিয়া আসিয়া সোফায় বসিল: চিঠিগুলি কোলের উপর রাখিয়া, পড়িবে কি না. তাহাই ভাবিতে লাগিল।

কার চিঠি কে জানে! তবে, স্বামীর সুটকেসের মধ্যে আর কার চিঠি থাকিবে? পরের চিঠি পড়া কি উচিত?—কিন্তু স্বামী কি পর? স্বামী যে তার অন্তরের অন্তরতম দেবতা। তারা দু'জনে যে এক প্রাণ এক আত্মা, দেহই কেবল ভিন্ন। না না. পর তিনি কখনই নহেন। মনে মনে এইরূপ তর্ক করিয়া, অবশেষে মণিকা মাঝখান হইতে একখানি চিঠি টানিয়া লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল।

পত্রখানির আরম্ভ ভাগ পড়িয়াই মণিকার মাথা ঘুরিয়া গেল। এ কি, এ যে রীতিমত

প্রেমপত্র! চিঠিতে তারিখ দেখিল, তার বিবাহের পূর্ব্বের তারিখ। রচনায় ভাষার ভুল নাই, বানান ভুল নাই,—কোনও শিক্ষিতা মেয়ের হস্তাক্ষর। তবে, বিবাহের পূর্ব্বে স্বামী কি অন্য কাহারও সংগে প্রেমে পড়িয়াছিলেন? উঃ—কি সর্ব্বনাশ!

পত্র শেষ করিয়া মণিকার মাথা ঝিম ঝিম করিতে লাগিল। আর একখানি খুলিয়া পাঠ আরম্ভ করিল। পরস্পরের অটুট অনাবিল গভীর প্রেমের পরিচায়ক। মনোরমার পিতা-মাতা কিন্তু এ বিবাহে সম্মতি দিবেন কি না, সে বিষয়ে আকুল আশঙ্কা। পড়িয়া মণিকার কান্না আসিতে লাগিল।

তৃতীয় পত্রে, পিতা-মাতা মত করিলেন না ইহাই প্রকাশ। আজীবন উভয়ের কৌমার্য্য ব্রত অবলম্বনে, জন্মান্তরে মিলন প্রতীক্ষায় এ জীবন যাপনের প্রস্তাব। মণিকার চক্ষু হইতে ঝর ঝর ধারায় অশ্রু বাহিল।

ঝি আসিয়া বলিল, "মা, ১১টা যে বাজতে চলল,—চান করবে না?"

মণিকা চক্ষু মুছিয়া ধরা গলায় বলিল, "না স্নান করবো না, শরীরটে আজ ভাল বোধ হচ্চে না।"

"তা হলে. বামুন ঠাকুরকে ভাত বাড়তে বলি?"

"না, খেতেও ইচ্ছে নেই।"

ঝি কাছে আসিয়া হাতের উপর হাত রাখিয়া বলিল, "গা যে গরম হয়েছে দেখছি; ওমা, জ্বর করবে নাকি? বাবুও যে বাড়ী নেই! কি হবে গো মা!"

আর কোনও পত্র পড়িতে মণিকার প্রবৃত্তি হইল না। সবগুলি গুছাইয়া বাঁধিয়া মণিকা এখন বেশ স্পষ্টই বুঝিতে পারিল, ঝির কথা মিথ্যা নয়, জ্বরই আসিতেছে বটে।

মণিকা তখন চিঠির বাণ্ডিল আলমারিতে তুলিয়া রাখিয়া শয্যায় উঠিয়া শয়ন করিল। দেখিতে দেখিতে খুব কম্প দিয়াই জ্বর আসিল। ম্যালেরিয়া। রঙ্গপুরে আসিয়া আর একবার সে এইরূপ জ্বরে পড়িয়াছিল।

ইন্‌স্পেক্টরবাবুর স্ত্রী কল্যাণী বেলা দুইটার সময় বেড়াইতে আসিয়া দেখেন, এই ব্যাপার! মণিকা তখন বেহুঁস। তিনি তখনই বামুন ঠাকুরকে কাছারিতে পাঠাইয়া নিজ স্বামীকে ডাকাইয়া আনিলেন। ইন্‌স্পেক্টরবাবু আসিয়া, স্ত্রীর নিকট সাব-ডেপুটি-গৃহিণীর অবস্থার কথা শুনিয়া, নিজেই ডাক্তার ডাকিতে ছুটিলেন। ডাক্তার আসিলেন, ঔষধ দিলেন, বলিলেন, "কোনও ভয় নেই, ম্যালেরিয়া জ্বর। সহরে জ্বরটা আজকাল খুবই হচ্ছে।"

পরদিন বেলা ২টার সময় সাব-ডেপুটিবাবুও ফিরিলেন।

তিন

এক সপ্তাহ অবিশ্রান্ত শুশ্রূষার পর গতকল্য হইতে মণিকার জ্বরটা ছাড়িয়াছে। আজ সে দু'খানা সুজির রুটি খাইবে। বলা বাহুল্য সে অত্যন্ত কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। সুরেনবাবু তাহার মুখধোয়ানো শেষ করিয়া ঔষধ পান করাইয়া দিয়াছেন। খোলা জানালার কাছে সোফা টানিয়া, দুই তিনটা কুশনে ঠেস দিয়া তাহাকে বসাইয়াছেন। বুক অবধি একটা পাৎলা শাল চাপা। সুরেনবাবু পার্শ্বে একটা চেয়ার টানিয়া বসিয়া স্ত্রীর সংগে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন।

বেলা ৯টা বাজিলে মণিকা গম্ভীরভাবে বলিল, "তুমি আর কতদিন আফিস কামাই করবে?"

সুরেনবাবু বলিলেন, "আমি যে তিন মাসের ছুটি নিয়েছি।"

"তিন মাসের! তুমি কি মনে করেছিলে আমার এদিক ওদিক যা হোক একটা কিছু হ'তে তিন মাস লেগে যাবে?"

"এদিক—আবার 'ওদিক' কেন?"—বলিয়া সুরেনবাবু শাস্তি স্বরূপ পত্নীর গাল টিপিয়া দিলেন। তার পর বলিলেন, "রঙ্গপুরে থাকবার আর ইচ্ছে নেই। যে

ম্যালেরিয়া! তিন মাস ছুটি নিলে অন্য জায়গায় বদলি ক'রে দেয় কিনা, তাই তিন মাসের ছুটিই নিয়েছি। তুমি একটু সেরে উঠলেই, আমি তোমায় দার্জিলিঙে নিয়ে যাব হাওয়া বদলাতে। এপ্রিল মাসে লাট সাহেবের দপ্তরও দার্জিলিঙ যাবে। সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা ক'রে আলিপুরে বদলি হবার চেষ্টা করবো।"

মণিকা ক্লান্তভাবে বলিল, "কেন, তোমার মনোরমা আলিপুরে থাকে নাকি?"

সুরেনবাবু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "আমার মনোরমা? আমার মনোরমা আবার কে? কি বলছো তুমি?"

মণিকা স্বামীর পানে না চাহিয়া ক্লান্তস্বরে বলিল, "মনোরমা—তোমার ভালবাসা গো! আজকাল সে আর তোমায় চিঠি লেখে না? চিঠি এখন আপিসের ঠিকানায় আনাও বুঝি?. ওহো, তুমি কৌমার্য্য ব্রত ভঙ্গ করেছ কিনা, সেই রাগে মনোরমা আর বোধ হয় চিঠি লেখে না তোমায়, না?"

সুরেনবাবু বলিলেন, "এ সব কি তুমি ভুল বকছো বল দেখি? মনোরমা ব'লে কোনও জন্মে আমার কোনও ভালবাসাও ছিল না, কেউ আমায় চিঠিও লেখে না।"

মণিকা বলিল, "বিয়ের পর থেকে তোমায় কতবার আমি জিজ্ঞাসা করেছি, হ্যাঁ গা, আমি ছাড়া তুমি কোনও দিন আর কাউকে কি ভালবেসেছিলে? তুমি বরাবর উত্তর করেছ—স্বপ্নেও না। আমি আগে মনে করতাম তুমি সত্যবাদী। এখন দেখছি সেটা আমার ভুল। আমি তোমার চিঠি দেখেছি। নিজে পড়েছি।"

"আমার চিঠি? কাকে চিঠি লিখেছি আমি? কোথা সে চিঠি?"

"তুমি লেখনি। তোমার মনোরমা তোমায় লিখেছিল। তোমার সুটকেসের ভিতরে ছিল। যত্ন করে রেশমী রুমালে তুমি বেঁধে রেখেছিলে মনে নেই? এক গাদা চিঠি। ভয় নেই, বেশী পড়িনি আমি, তিন চারখানা মাত্র পড়েছি। আর পড়তে ভাল লাগলো না।"

সুরেনবাবু বলিলেন, "আমার সুটকেসের ভিতর কারু কোনও চিঠি ত কোনও দিন ছিল না। কই সে চিঠি?"

"যে সুটকেস তুমি টুরে নিয়ে যাও, সে সুটকেস নয়। যে সুটকেসটা তুমি লুকিয়ে রেখেছিলে ও-ঘরে! তুমি যেদিন টুরে যাও, তার পরদিন সকালে তোমার এণ্ডির কোট খুঁজতে গিয়ে আমি সেই সুটকেস খুলে সেই সব চিঠি দেখতে পাই।"

সুরেনবাবু আর বাক্যব্যয় মাত্র না করিয়া, তাড়াতাড়ি গিয়া সেই সুটকেস হাতে করিয়া লইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই সুটকেসের মধ্যে চিঠি ছিল?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু এ সুটকেস ত আমার নয়!"

"ঐ যে ডালায় তোমার নামের অক্ষর ছাপা রয়েছে—S. D.!"

সুটকেস মেঝের উপর নামাইয়া রাখিয়া, সুরেনবাবু স্ত্রীর পানে চাহিয়া হা হা হা করিয়া হাসিতে লাগিলেন। দীর্ঘ এবং উচ্চ হাসি। তাঁহার ভাব-ভঙ্গি দেখিয়া মণিকা একটু বিব্রত হইল। বলিল, "ও সুটকেস তোমার নয় ত কার তবে শুনি!"

কষ্টে হাসির বেগ সম্বরণ করিয়া সুরেনবাবু বলিলেন, "আচ্ছা আমি কি তোমায় বলিনি যে আমার একজন বন্ধু আছে তার নাম শরৎ দত্ত?"

"যে কাশ্মীরে চাকরি করতে গেছে?"

"হ্যাঁ। আমি কি তোমায় বলিনি যে কলকাতায় সে টিউশানি করতে করতে ল আর এম-এ পড়তো?"

"বলেছ।"

"আমি কি তোমায় বলিনি, যে ব্রাহ্ম মেয়েটিকে সে পড়াতো, তার সঙ্গে প্রেমে পড়ে গিয়েছিল, তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, কিন্তু মেয়ের বাপ-মাও রাজি হয়নি, আর

শরতের বাপ তাকে ধ'রে নিয়ে গিয়ে অন্যত্র বিয়ে দিয়ে দেয় ?"

"হ্যাঁ, সে কথাও বলেছ।"

সুরেনবাবু বলিলেন, "আচ্ছা, আর এ কথাও বোধ হয় তোমায় বলেছি যে, এখানকার কলেজে একটা মাস্টারির চেষ্টায় সে এসে আমার বাসায় দিন কয়েক ছিল—তখনও তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়নি।"

"কই আমার মনে পড়ে না।"

"ও সুটকেস তারই। এখানকার সে মাস্টারি চাকরিটা হল না। যাবার সময় সুটকেসটা এখানে সে ভুলে ফেলে কলকাতায় চ'লে যায়। আমি তাকে ওটা রেল পার্শেলে পাঠিয়ে দিতেও চেয়েছিলাম। সে লিখলে কাশ্মীরে একটা চাকরি পেয়ে সে রওয়ানা হচ্চে; ওতে বিশেষ দরকারী জিনিষ তার কিছু নেই,—আমার কাছেই রেখে দিতে বলে,—পরে এসে নেবে।"

মণিকা কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল। শেষে একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "ওঃ, তাই বুঝি!"

সুরেনবাবু বলিলেন, "আচ্ছা, এ সুটকেস তুমি খুললে কি ক'রে? এর চাবি ত আমাদের কাছে নেই!"

মণিকা বলিল, "কেন, তোমার আপিসের রিঙে এর চাবি ছিল। আমি ভেবেছিলাম, পাছে আমি ও সুটকেস কোনও দিন খুলি, সেই ভয়ে ওর চাবি তুমি বাড়ীর রিঙে রাখনি।"

সুরেনবাবু চাবির রিং লইয়া আসিয়া বলিলেন, "কোন্‌টা?"

মণিকা একটা চাবি বাছিয়া বলিল, "এইটে বোধ হয়।"

"এটা ত আমার আপিসের একটা টানার চাবি।"—বলিয়া সেই চাবি দিয়া সুটকেস খুলিলেন। কাপড় জামা হাঁটকাইতে হাঁটকাইতে দুইখানা বহি এবং একটা খামে ভরা খানকতক সার্টিফিকেট বাহির হইল। বহিগুলিতে ইংরাজিতে নাম লেখা এস ডট্। সার্টিফিকেটগুলি কলেজের প্রোফেসারদের লিখিত। তাহাতে পুরা নাম শরৎচন্দ্র দত্তই লেখা আছে। সেগুলি স্ত্রীকে দেখাইয়া সুরেনবাবু হাতজোড় করিয়া বলিলেন, "হুজুরাইন ধর্ম্মাবতার, আমার এই সাফাই সাক্ষীগুলির এজেহার কি আপনি বিশ্বাস করছেন না?"

হুজুরাইন রায় প্রকাশ করিলেন—"যাও, তুমি বে-কসুর খালাস।"

বাপকী বেটী

এক

বৈশাখ মাস। আপার সার্কুলার রোডের একটি বাড়ীতে, মিষ্টার জি· লাহিড়ী বার-এট-ল (পুরো নাম গিরীন্দ্রনাথ লাহিড়ী) সন্ধ্যার পর পায়জামা সুট পরিধান করিয়া, দ্বিতলের খোলা বারান্দায় ঈজি চেয়ারে বসিয়া আছেন। একটা খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে, দুই এক পেগ হুইস্কি পান করিয়া ডিনারের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। তাঁহার বেয়ারা একটা কলাই করা ট্রের উপর একখানা চিঠি আনিয়া, টেবিলের উপর তাঁহার সামনে রাখিয়া প্রস্থান করিল। চিঠিখানি পড়িয়া লাহিড়ী সাহেব ডাকিলেন, "সরযু—ও সরযু—শোন!"

তাঁহার পত্নী মিসেস লাহিড়ী এই আহ্বানে বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন, "কেন?"

"সুরেশের মুহুরি কি চিঠি লিখেছে দেখ।"—বলিয়া লাহিড়ী সাহেব পত্রখানি পত্নীর হস্তে দিলেন।

সরযু পত্রখানি পড়িয়া বলিলেন, "তাই ত! সুরেশবাবুর এমন অবস্থা? পরশুও

ত তুমি তাঁকে দেখে এসে বললে, অনেকটা ভাল। তা তুমি কি এখনই বেরুতে চাও? ডিনার খেয়ে গেলে হত না? তৈরী প্রায়। সেখানে গিয়ে কি অবস্থা দেখবে, ফিরতে কত রাত হবে, বলা ত যায় না!"

লাহিড়ী সাহেব বলিলেন, "না, দেরী ক'রে দরকার নেই। দেখছ না, লিখেছে, এখন-তখন অবস্থা। আমি এখনই যাই, ফিরে এসেই ডিনার খাব। তোমরা বরং খাওয়া-দাওয়া সেরে আমার খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে দিও। এই বেয়ারা—একঠো ট্যাক্সি বোলাও—জল্‌দি।"

"বহুৎখুব"—বলিয়া বেয়ারা ট্যাক্সি আনিতে গেল।

মিসেস লাহিড়ী নিকটস্থ একখানা চেয়ারে বসিয়া বলিলেন, "আহা সুষমা ছুঁড়ির অদৃষ্টটা দেখ, একবার! বিয়ের পর দু'বছর যেতে না যেতেই স্বামী গেল। মা ত আগেই গিয়েছিল, বাপও চলল: কি যে দশা হবে মেয়েটার কে জানে! আত্মীয়স্বজন কে কে আছে?

"বাগবাজারে সুষমার মামারা আছে। সুরেশ তার শ্বশুরবাড়ীতে থেকেই কলেজে পড়তো কিনা। তারপর, আমি গেলাম ব্যারিষ্টারি পড়তে, সুরেশ ল-কলেজ জয়েন করলে।"

"ওর শ্বশুরবাড়ীতে?"

"শ্বশুর শ্বাশুড়ী ত আগে থেকেই ছিল না। দেওর ভাসুর-টাসুর আছে বোধ হয়। কিন্তু সে কি এখানে? মুর্শিদাবাদ জেলায় জঙ্গিপুর গ্রামে। তাদের সংসারে গিয়ে পড়লে বউকে তারা ফেলতে পারবে না বটে। কিন্তু সুষমা লেখাপড়া গান বাজনা জানা নব্যতন্ত্রের মেয়ে, সেখানে বাস করা কি ওর পোষাবে? বিশেষ তারা গরীব গৃহস্থ। ও সেখানে গিয়ে তাদের ঘরও নিকাতে পারবে না, ধানও সিদ্ধ করতে পারবে না।"

মিসেস লাহিড়ী বলিলেন, "দেখ, এইগুলো কিন্তু বাপ মায়েদের ভারি অন্যায়। মেয়েকে যদি কলেজে পড়িয়ে মেমই ক'রে তুললি, তা হলে সেই রকম ঘর বরে তাকে দে—গরীবের ঘরে দিস্ কেন?"

"গরীবের ঘরে কি আর সাধে লোকে মেয়ে দেয়?—টাকার জোর না থাকলে কাজেই দিতে হয়। ওকালতী ব্যবসাতে কোন দিন তেমন সুবিধে ত করতে পারেনি! তবে বাঙ্গালী ষ্টাইলে থাকে, খরচপত্র কম, এই যা সুবিধে। নইলে অবস্থা ত সুরেশের আমারই মত! তুমি খাও ভাঁড়ে জল আমি খাই ঘাটে বইত নয়!"

এই সময় ভৃত্য আসিয়া জানাইল ট্যাক্সি আসিয়াছে। লাহিড়ী সাহেব বেশ-পরিবর্ত্তন না করিয়াই, সেই পায়জামা সুটের উপরেই একটা ড্রেসিং গাউন চড়াইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। ট্যাক্সির নিকট গিয়া দেখিলেন, পত্রবাহক ভৃত্য সেখানে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, "তুই এখনও রয়েছিস? আচ্ছা গাড়ীতে ওঠ্, ড্রাইভারের পাশে বোস্।"—বলিয়া নিজেও আরোহণ করিয়া আদেশ দিলেন, "বৌবাজার।"

ট্যাক্সি ছুটিল। এই সময় লাহিড়ী সাহেবের ঘর গৃহস্থালীর কথা কিঞ্চিৎ বলিয়া রাখি। আজ প্রায় বিশ বছর তিনি ব্যারিষ্টারি করিতেছেন। তাঁহার নিজ মুখেই প্রকাশ, তেমন সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। মাঝে মাঝে রিসিভারি কর্ম্ম পান। ব্রীফও মাঝে মাঝে দুই চারিটা যে না পান, এমন নহে। কিন্তু পুরাদস্তুর সাহেবিয়ানার খরচ তাহাতে পোষায় না। বাড়ীখানি তাঁহার নিজের নহে,—ভাড়ার। মোটর কিনিতে পারেন নাই, ট্যাক্সিতে আদালত যান। গৃহে তাঁহার স্ত্রী মাত্র। কোনও সন্তানাদি জীবিত নাই। একটা বাসনমাজা জলতোলা চাকর এবং একটা বেয়ারা আছে। ঝিকে ঘাগরা পরাইয়া তাহাকে আয়া বানাইয়াছেন। বাবুর্চ্চি আছে কিন্তু রাঁধে সে দিনেরবেলায় ভাত, ডাল, "ছেঁচকি কারি", মাছের ঝোল—বাঙ্গালীর খাদ্য সবই রাঁধে। তবে সব ব্যঞ্জনেই পেঁয়াজ দেয়, মায় মাছের ঝোলে পর্য্যন্ত। রাত্রে লুচি ভাজে, বেগুন ভাজে, কোনও দিন বা মাছের, কোনও দিন বা পাঁঠার কালিয়া রাঁধে, ফাউল কারিও মাঝে মাঝে

রাঁধে। সে সকল রান্না, ডিশের ভিতর ভরিয়াই টেবিলে আসে,—ছুরি কাঁটা চামচের সাহায্যেই ভক্ষিত হয়। মৃত্যুপথযাত্রী বাল্যবন্ধু সুরেশবাবুও মাঝে মাঝে নিমন্ত্রিত হইয়া খাইয়া যাইতেন। সুরেশবাবু কুসংস্কারবর্জ্জিত আধুনিক হিন্দু। ব্রাহ্মসমাজের খাতায় নাম লেখান নাই সে হিসাবে লাহিড়ী সাহেবও হিন্দু। তবে তিনি বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ হইয়া, রাঢ়ী শ্রেণীর কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন—অবশ্য হিন্দুমতেই। আজকাল ত অনেকেই বলিতেছেন, ইহাতে জাতি যায় না এবং না যাওয়াই ত উচিত।

দুই

বৌবাজারে বন্ধুগৃহে পৌঁছিয়া লাহিড়ী সাহেব দেখিলেন, সুরেশবাবুর দেহ যেন শয্যার সঙ্গে মিশিয়া রহিয়াছে। কন্যা সুষমা পিতার পদতলে পাষাণ-প্রতিমাব মত বসিয়া। শয্যাপার্শ্বে চেয়ারের উপর একজন ডাক্তার এবং দুইজন বন্ধু—ইঁহারাও হাই-কোর্টের উকিল, লাহিড়ী সাহেবেরও পরিচিত। কিয়দ্দূরে, মাদুর পাতিয়া বসিয়া সুরেশবাবুর মুহুরী প্রৌঢ়বয়স্ক হরনাথ চক্রবর্ত্তী। ভৃত্য তাড়াতাড়ি লাহিড়ী সাহেবের জন্য একখানি চেয়ার আনিয়া দিল।

লাহিড়ী নিম্নস্বরে একজন উকীল বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঘুমুচ্ছেন ?"

"হ্যাঁ,—একটু আগেও জিজ্ঞাসা করছিলেন, লাহিড়ী এখনও এল না? উইল করেছেন আপনাকেই তার একজিকিউটার করেছেন। মুখে আপনাকে কিছু বলে যাবেন, সেই জন্যে বড় ব্যস্ত হয়েছেন।"

"ডাক্তার কি বলছেন ?"

"আজ রাত কাটার আশা কম।"

নিদ্রিত বন্ধুর মুখপানে কিয়ৎক্ষণ একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়া, একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সজল নয়নে লাহিড়ী সাহেব উঠিলেন। ইঙ্গিতে সুষমাকে ডাকিয়া, তাহাকে পার্শ্বের ঘরে লইয়া গেলেন।

সোফার উপর নিজ পার্শ্বে সুষমাকে বসাইয়া স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন "মা, সব বুঝছ ত ?"

সুষমা এবার ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। বলিল, "কি হবে জেঠামশাই ?"

লাহিড়ী সাহেব সুষমার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "কেঁদ না মা চুপ কর। ঈশ্বর যা করবেন, তাই হবে। তোমার মামাদের খবর দেওয়া হয়েছে ?"

"হ্যাঁ, বড়মামার কাছে মুহুরীবাবুকে পাঠিয়েছিলাম।" "কবে ?"

"আজ বেলা দুটোর পর। তার আগে ত বিশেষ কোনও ভয় আছে বলে জানতে পারিনি।" "মামারা কি বলেছেন ? এখনও এলেন না ?"

"সন্ধ্যার পর আসবেন বলে দিয়েছেন।"

এই সময় উকিল বন্ধু আসিয়া বলিলেন, "আসুন মিষ্টার লাহিড়ী, সুরেশবাবু জেগেছেন।"

লাহিড়ী তাড়াতাড়ি রোগীর গৃহে ফিরিয়া গেলেন। চেয়ারে বসিয়া বন্ধুর একখানি হাত নিজ দুই হাতের মধ্যে ধরিয়া বলিলেন, "কেমন আছ ভাই, এখন ?"

সুরেশবাবু কোনও উত্তর না করিয়া, ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া লাহিড়ীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। লাহিড়ী আবার বলিলেন, "কোন কষ্ট হচ্ছে কি ?"

রোগী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "কষ্ট ? কই ? হ্যাঁ। গিরীন, ভাই, আমি ত চললাম। একটা বিশেষ কথা—কি একটা কথা ছিল। হ্যাঁ—তাই তোমায় ডেকে পাঠিয়েছি।"

একজন উকিল বন্ধু দাঁড়াইয়া উঠিয়া অপর সকলকে বলিলেন, "চলুন না, আমরা একটু ও ঘরে যাই।"

রোগী ধীরে ধীরে একটি শীর্ণ হস্ত তুলিয়া ক্ষীণ স্বরে বলিলেন, "না—না—কেউ যেও না। থাকো।"

উকিলবাবু আবার বসিলেন।

রোগী তখন কন্যার মুখ পানে চাহিয়া বলিলেন, "জল।"

সুষমা তাড়াতাড়ি জল আনিয়া ফীডিং কাপের সাহায্যে পিতাকে পান করাইয়া দিল।

জলপান করিয়া, রোগী ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "গিরীন, ভাই, আমার সুষীকে আমি তোমার জিম্মায় দিয়ে যেতে চাই। ওর ভার তুমি নিতে পারবে ভাই?"

লাহিড়ী বলিলেন, "নিশ্চয়! ও যেমন তোমার মেয়ে, তেমনি আমারও মেয়ে। আমার ত কোনও সন্তানাদি নেই, আমি ওকে নিজের মেয়ের মতন করেই পালন করবো, তার জন্যে তুমি কিছু ভেব না ভাই।"

রোগী বলিলেন, "তুমিই নাও। ও যেমন লেখাপড়া শিখছে, তেমনি শিখতে থাকুক। ওর মার পনেরো হাজার টাকা ছিল, সেই টাকাটা ওর জন্যে রেখে যাচ্ছি। তাই থেকে ওর খরচপত্র চালিও। একটি ভাল পাত্র দেখে ওর আবার বিয়ে দিও ভাই। ষোল বছর বয়সে বিধবা হয়েছে—পুরো দুটি বছরও স্বামীর ঘর করতে পায়নি। ওর জীবনের কোনও সাধ আহ্লাদই ত মেটেনি। সেইজন্যেই ওকে আমি তোমার হাতেই দিয়ে যেতে চাই। ওর মামারা বড়লোক হলেও, গোঁড়া হিন্দু—তারা ওর বিয়ে দেবে না। ওর ভাসুর দেওররা, তাদের ত কথাই নেই। তুমিই আমার মেয়েটিকে নিয়ে যেও ভাই, —নিয়ে গিয়ে, যাতে ওর ভাল হয় যাতে ও সুখে থাকে, তাই কোরো—তা হলে পরলোকে আমি শান্তি পাব।"

কথাগুলি শেষ করিয়া, সুরেশবাবু অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন এবং হাঁফাইতে লাগিলেন। একটু সামলাইয়া উঠিলে সুষমা কহিল, "বাবা, একটু বেদানার রস খাবেন?"

ইঙ্গিতে সুরেশবাবু সম্মতি জানাইলেন। দুই চামচ বেদানার রস পান করিয়া আবার তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন।

এই সময় সংবাদ আসিল, বাগবাজার হইতে সুষমার মামারা আসিয়াছেন। মুহুরি-বাবু ইঁহাদের আনিতে তাড়াতাড়ি নামিয়া গেলেন। সুষমার দুই মামা ও তিন মামী উপরে উঠিয়া আসিলেন। সিঁড়িতে উঁহাদের পদশব্দ পাইয়া, ডাক্তারবাবু প্রভৃতিকে লইয়া লাহিড়ী সাহেব পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে সুষমার বড়মামা অবিনাশবাবু সেই কক্ষে আসিয়া বলিলেন, "হাঁহে গিরীন সুরেশের এ রকম অসুখটা হয়েছিল, আগে আমাদের খবর দিতে নেই?"

লাহিড়ী বলিলেন, "আগে কি আমরাই জানতে পেরেছিলাম? পরশুও ত আমি দেখে গেছি, তখনও কোন ভয়ের কারণ উপস্থিত হয়নি।"

কিয়ৎক্ষণ কথাবার্ত্তার পর, কল্য প্রাতেই আবার আসিবেন বলিয়া লাহিড়ী সাহেব বিদায় গ্রহণ করিলেন। অবিনাশবাবুরা সকলেই রাত্রে এখানে থাকিবেন।

ভোর রাত্রে সুরেশবাবুর আত্মা, দেহপিঞ্জর ভেদ করিয়া অনন্তের পথে উধাও হইল। লাহিড়ী সাহেব বেলা ৮টার সময় আসিয়া দেখিলেন, "বল হরি হরিবোল" শব্দে শবাধার সিঁড়ি বাহিয়া নামান হইতেছে।

তিন

সুষমার বয়স যখন ১১ বছর, সেই সময় তাহার মাতৃবিয়োগ হয়। সুরেশবাবুর বয়স তখন ৩৫ বৎসর মাত্র। বন্ধুবান্ধব সকলেই তখন পুনরায় বিবাহ করিতে তাঁহাকে পরামর্শ দিয়াছিলেন। কয়েকজন "ডাগর" মেয়ের পিতাও তাঁহাকে এজন্য বিলক্ষণ পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন। কিন্তু সুরেশবাবু সম্মত হন নাই। ইতিপূর্ব্বে মেয়েকে তিনি বাড়ীতেই লেখাপড়া শিখাইতেন। চাকর বামুন লইয়া বাসা,—তিনি আদালতে চলিয়া গেলে দীর্ঘ

দিন মেয়েকে দেখে কে, তাই সুষমাকে তিনি বেথুন স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। তিন বৎসর পরে, গরীব গৃহস্থ ঘরের একটি শিক্ষিত সচ্চরিত্র সুদর্শন যুবাকে পাইয়া, তাহার হস্তে কন্যা সমর্পণ করিয়াছিলেন। মেয়েকে তখন অবশ্য স্কুল হইতে ছাড়াইয়া লইতে হইয়াছিল। ষোল বৎসর বয়সে সুষমার কপাল পুড়িল। মেয়েকে সুরেশবাবু শ্বশুরালয় হইতে লইয়া আসিলেন। আবার তাহাকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। সুষমা এখনও সেই বিদ্যালয়েরই ছাত্রী, আগামী বৎসর তার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিবার কথা।

বিধবা হইয়া, থান কাপড় পরিয়া, রিক্ত প্রকোষ্ঠেই সুষমা শ্বশুরালয় হইতে ফিরিয়াছিল। কিন্তু মেয়ের সে বেশ দেখিয়া বাপের বুকে বড় বাজিল, তাই পিতাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য সুষমা সরুপাড় ধুতি, গলায় একটি সরু গোট হার এবং দুই হাতে দুইগাছি করিয়া চারিগাছি সোণার চুড়ি পরিল। হিন্দু বিধবার নিরম্বু একাদশী পিতা তাহাকে করিতে দিলেন না;—বলিলেন, "তুই যদি মা নিরম্বু উপবাস করিস, তবে আমিই বা কোন্ লজ্জায় খাব?" পিতা পুত্রী উভয়েই একাদশীর দিন ফল ও মিষ্টান্ন মাত্র গ্রহণ করিতেন। মাছ খাওয়াইবার জন্য কন্যাকে তিনি পীড়াপীড়ি করেন নাই, বিপত্নীক হইবার পর হইতে নিজে তিনি মাছ মাংস ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ছুৎমার্গের পথিক তিনি ছিলেন না। দুই তিনমাস পূর্ব্বেও তিনি লাহিড়ী-গৃহিণী কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া কন্যা সহ তাঁহার টেবিলে বসিয়া নিরামিষ আহার করিয়া আসিয়াছিলেন।

মামা মামীরা উপস্থিত থাকিয়া, বৌবাজারের বাসাতেই সুষমাকে দিয়া তাহার পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করাইলেন। সুষমা লাহিড়ী সাহেবের তত্ত্বাবধানে তাঁহারই পরিবারভুক্ত হইয়া অতঃপর বাস করিবে, একথা উইলেই স্পষ্টাক্ষরে লিখিত ছিল। ইহা অবগত হইয়া মামারা কিন্তু বড়ই বিরক্ত হইলেন। একে ত ভাগিনেয়ীর কপালদোষে ইহকালটি তাহার নষ্ট হইয়াই গিয়াছে, তদুপরি ম্লেচ্ছাচার-সম্পন্ন বিলাতফেরত লাহিড়ী সাহেবের গৃহে অবস্থান করিয়া এবং সম্ভবতঃ পুনরায় বিবাহ (তাঁহারা বলিয়াছিলেন 'নিকা') করিয়া পরকালটিও নষ্ট হইয়া যায় ইহা তাঁহাদের অসহ্য বোধ হইল। কিন্তু তাঁহাদের গৃহিণীরা একবাক্যে বলিলেন, "সেই ভাল, সেই ভাল। নিকুনে পড়ুনে গাইয়ে বাজিয়ে ঐ আগুনের খাপরা ক'ড়ে রাঁড়িকে আগলে থাকা কি সোজা কথা? ও দায় যে আমাদের ঘাড় থেকে নেমেছে সে ভাগ্যিই বলতে হবে।"

শ্রাদ্ধশান্তি হইয়া গেলে, লাহিড়ী সাহেব উদ্যোগী হইয়া মৃত বন্ধুর জিনিষপত্র বিক্রয় করিয়া, দেনা-পাওনা মিটাইয়া, সুষমাকে নিজগৃহে লইয়া গেলেন। মিসেস লাহিড়ী স্নেহ ও সমাদরে তাহাকে বুকের মধ্যে গ্রহণ করিলেন।

চার

এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। সুষমা বেথুন স্কুলে পড়িতেছে, স্কুলের গাড়ীতে যাতায়াত করে। তবে এখন পূজার ছুটি—সারাদিন সে বাড়ীতেই থাকে। তার বড়মামা অবিনাশবাবু, মাঝে একদিন মাত্র আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গিয়াছিলেন।

লাহিড়ী সাহেব সুষমার সমস্ত টাকা ব্যাঙ্কে জমা করিয়া তাহারই নামে হিসাব খোলাইয়া দিয়াছেন। তবে চেক-বহিখানি তিনি নিজের কাছে রাখেন। তাহার খরচপত্রের হিসাবে প্রতিমাসে একখানি করিয়া চেক তিনি তাহাকে দিয়া সহি করাইয়া লন।

সুষমা যে পনেরো হাজার টাকার মালিক, ইহা হাইকোর্ট বার লাইব্রেরী, ও উকীল লাইব্রেরীতে প্রচার হইতে দেরী লাগে নাই। সুষমার পুনরায় বিবাহ দিবার জনাই যে তাহার পিতা মৃত্যুকালে কন্যাকে লাহিড়ী সাহেবের জিম্মা করিয়া দিয়া গিয়াছেন, তাহাও অনেকে শুনিয়াছে। কিছু দিন হইতে হাইকোর্টের দুই চারিজন জুনিয়র ব্যারিষ্টার লাহিড়ী সাহেবের গৃহে যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু সুষমার নিকট তাহারা কেহই আমল পায় না। লাহিড়ী সাহেব তাহাদের মনোগত অভিপ্রায় বিলক্ষণ বুঝিতে পারেন, কিন্তু তিনিও উহাদিগকে উৎসাহ দেন না। কারণ তিনি জানেন এই যুবকগণের অবস্থা

কাহারও তেমন ভাল নয় এবং সুষমার টাকার গন্ধেই তাহাদের এই ঘন ঘন যাতায়াত।

একদিন বিকালে স্বামীস্ত্রীতে কথাবার্ত্তা হইতেছিল। সুষমা তখন তাহার সখী ললিতার গৃহে চা-পানের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছে। সুষমা ও ললিতা এক ক্লাসে পড়ে। মিসেস লাহিড়ী বলিলেন, "হ্যাঁগা সুষীর বিয়ের কি করছ?"

লাহিড়ী বলিলেন, "তেমন মনের মতন পাত্র কই?"

"চেষ্টা করলে পাত্র কি আর মেলে না?"

"এ ত সাধারণ হিন্দু ঘরের মেয়ের বিয়ে নয় যে ঘটক লাগিয়ে পাত্র স্থির করব! লভ্ ম্যারেজ (প্রেমের বিবাহ) ভিন্ন আর অন্য উপায় কি আছে? কোনও ছেলের সঙ্গে যদি ওর ভালবাসা জন্মে যায়,—সে ছেলে নিজেই তখন বিয়ের প্রস্তাব করবে, তার গুণাগুণ, তার সাংসারিক অবস্থা বিবেচনা ক'রে আমরা যদি ভাল বুঝি, তখন মত করবো।"

"ঐ যে কুমুদ চাটার্জ্জি আসে, ও ছেলেটি ত মন্দ নয়। সুষীর সঙ্গে ওর একটু মেলামেশায় দিনকতক একটু উৎসাহ দিলে হয় না?"

"ও তো এই সবে বছর তিনেক হল ব্যারিষ্টার হয়ে ফিরেছে। এখনও কিছুই করতে পারেনি। বাড়ীর অবস্থা ভাল নয়। বিয়ে ক'রে সংসার চালাবে কোথা থেকে?"

"আর, বিনয় সেন?"

"বাপের বিষয় সম্পত্তি কিছু পেয়েছিল বটে, কিন্তু শুনি, তার বেশীর ভাগই উড়িয়েছে। পাঁড় মাতাল!" "আর ঐ যোগেশ মজুমদার?"

"ওর মা বাপ মহা হিন্দু। বিষয় আশয় বেশ আছে বটে; কিন্তু ছোঁড়াটা বড় অলস কিছু করতে চায় না। বাপের কাছে মাসহারা পায়, তাইতে সাহেবিয়ানা চলে। ওর বাপের চেষ্টা খাঁটী হিন্দু মতে ওর বিয়ে দেন। তাঁর অমতে যদি ও বিধবা বিবাহ করে, বাপ হয়ত রেগে মাসহারাটি বন্ধ ক'রে দেবেন, তখন খাবে কি?"

শুনিয়া লাহিড়ী গৃহিণী নীরবে বসিয়া রহিলেন। একটু পরে লাহিড়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেখ তেমন মনের মতন পাত্র একটি পাওয়াই যদি যায়, সুষী আবার বিয়ে করতে রাজি হবে ত? এত চেষ্টা করেও ওকে মাছ মাংস খাওয়াতে পারা গেল না। তারপর তোমারই কাছে ত শুনেছি, আয়াকে দিয়ে ফুল আনায়, রোজ ঘরে দোর বন্ধ ক'রে ঠাকুরপুজো করে। ওকি ফের বিয়ে করতে রাজি হবে? তুমি বরঞ্চ আগে ওর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়ে, ওর মনটি বুঝে দেখ। এ বিষয়ে কথাবার্ত্তা কয়েছিলে কোনও দিন?"

"না, তা কইনি বটে। কিন্তু মনের মত বর পেলে বিয়ে করতে ওর আপত্তি হবে ব'লে ত বোধ হয় না। এত লেখাপড়া করছে, জুতো মোজা পরে বেড়াচ্চে, টেবিলে বসে বাবুর্চ্চির রান্না খাচ্চে—তা মাছ মাংস নাই খাক, বিলেতেও ত কত ভেজিটেরিয়ন (নিরামিষাশী) আছে—বিধবার বিয়ে করাকে নিশ্চয়ই ও দূষ্য ব'লে মনে করবে না।"

লাহিড়ী সাহেব হাসিয়া বলিলেন, "ওটা ভাবা কিন্তু তোমার ভুল। জুতো মোজা প'রে বেড়ায়, বাবুর্চ্চির রান্না খায়, ওগুলো সব বাইরের জিনিষ। কোন্‌টা কর্ত্তব্য, কোন্‌টা অকর্ত্তব্য, কোন্‌টা ধর্ম্ম, কোন্‌টা অধর্ম্ম,—এ সব হল অন্তরের জিনিষ। বাইরের আচারের সঙ্গে তার যে বড় বেশী যোগ আছে তা নয়। যা হোক, কথায়বার্ত্তায় তুমি ওর মনটি বুঝে দেখবার চেষ্টা কোরো।"

"আচ্ছা তা আমি করবো।"

এই সময় সুষমা ফিরিয়া আসিল। তাহার হাতে ফিকা নীল ফিতায় বাঁধা সুন্দর একটি বাক্স। আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "জ্যেঠাইমা, তোমার জন্যে আমি একটি গন্ধ এনেছি।"—বলিয়া বাক্সটি মিসেস লাহিড়ীর হাতে দিল।

মিসেস লাহিড়ী উহা খুলিয়া বলিলেন, "বাঃ শিশিটি কি সুন্দর! কোথায় কিনলি

মা ?"

"আমরা যে মার্কেটে গিয়েছিলাম।"

"তোবা কারা ? কে কে গিয়েছিলি ?"

"ললিতা, আমি, আর ললিতার দাদা ডক্টর ঘোষ।"

"কত দাম নিলে ?"

'সাত টাকা। গন্ধ অবশ্য কেমন হবে জানিনে. কিন্তু শিশিটি দেখে আমার ভারি পছন্দ হ'ল, কিনে ফেললাম। আমার সঙ্গে টাকা ছিল, দাম দিতে গেলাম কিন্তু ডক্টর ঘোষ কিছুতেই আমায় দাম দিতে দিলেন না। মনে করলাম তা হ'লে ফিরিয়ে দিই, নেবো না। কিন্তু হয়ত সেটা অভদ্রতা হবে, তাই অগত্যা নিতে হ'ল। আমাকেও এটা কিনে দিলেন, ললিতাকেও ঠিক এই রকম একটা কিনে দিলেন। আচ্ছা জ্যেঠামশাই, নিয়ে অন্যায় ক'রেছি কি ?"

লাহিড়ী সাহেব হাসিয়া বলিলেন, "ফিরিয়ে দিলে অসৌজন্য হ'ত বইকি।"

গৃহিণী বলিলেন. "ওরাই তোকে নামিয়ে দিয়ে গেল, বুঝি ?"

"হ্যাঁ।"

"ওদের উপরে আনলিনে কেন, চা-টা খেয়ে যেত।"

চা আমরা ওদের বাড়ী থেকেই খেয়ে বেরিয়েছিলাম। তবু আমি বললাম, চলুন, উপরে চলুন. জেঠাইমা জ্যেঠামশাইয়ের সঙ্গে দেখা ক'রে যাবেন না ? ডক্টর ঘোষ বললেন, তোমার জেঠাইমা জ্যেঠামশাইকে আমার নমস্কার দিও আমি আর একদিন এসে তাঁদের সঙ্গে দেখা ক'রব।"

গৃহিণী বলিলেন, "আমরা এখনও চা খাইনি। যাও ত মা আমাদের চা দিতে বল; আর গন্ধটিও আমার ঘরে রেখে এস।"

সুষমা চলিয়া গেলে মিসেস লাহিড়ী স্বামীর প্রতি কুটিল চাহনি হানিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কি গো ? হাওয়া কোন্ দিক থেকে বইছে, কিছু বুঝতে পারছ ?"

লাহিড়ী সাহেব উত্তর করিলেন. "কিছু না। ঐ ঘোষ ছোকরা কি রকম ডাক্তার ? পুরো নাম কি ?"

'সুষীর কাছে শুনেছি, তার নাম সরোজনাথ—সে বিলেতফেরৎ ডাক্তার।

"বয়স কত ?"

'তা শুনিনি।'

অল্পক্ষণ পরে সুষমা ফিরিয়া আসিয়া ইঁহাদের নিকট বসিল।

লাহিড়ী সাহেব বলিলেন. 'হ্যা সুষী, ললিতারা তোকে নেমন্তন্ন ক'রে নিয়ে গিয়ে খাওয়ায়, জিনিষ দেয়, তুই ওদের নেমন্তন্ন করিস না কেন ?

'করবো জ্যেঠামশায় ?"

"করা উচিত নয় কি ? তুমি কি বল গো —বলিয়া তিনি পত্নীর পানে চাহিলেন।

গৃহিণী বলিল, "নিশ্চয়ই উচিত।'

স্থির হইল, আগামী রবিবারে. ললিতাদের ভাই বোনকে সুষমা নিমন্ত্রণ করিবে—দিনের বেলায়।

পাঁচ

নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ চলিতে লাগিল।

ইঁহারা দেখিলেন. সরোজ ছেলেটি ভাল। তার বাপ-মা জীবিত নাই। ঐ বোন ললিতা, আর, একটি ছোট ভাইও আছে। লাহিড়ী সাহেব খবর লইয়া জানিলেন. সরোজ যদিও তিন চারি বৎসর মাত্র বিলাত হইতে ফিরিয়াছে, তথাপি ইহারই মধ্যে বেশ পশার করিয়া লইয়াছে। ক্রমে ইহাও লক্ষ্য করিলেন, সরোজের পক্ষে সুষমা একটা আকর্ষণের বস্তু।

মাস দুই পরে একদিন সরোজ আসিয়া লাহিড়ী গৃহিণীর নিকট বলিল, "আপনারা কি সুষমার আর বিয়ে দেবেন না?"

গৃহিণী বলিলেন, "দেবারই ত ইচ্ছে। ওর বাবা এই জন্যেই ত ওকে আমাদের হাতে দিয়ে গেছেন। নইলে ওর মামারা অবস্থাপন্ন লোক,—সেইখানেই ত ওর থাকবার কথা। কিন্তু তাঁরা আবার গোঁড়া হিন্দু কিনা! এ কথা তুমি কেন জিজ্ঞাসা করছ, সরোজ? তোমার সন্ধানে কি কোনও ভাল পাত্র আছে?"

সরোজ বলিল, "পাত্র একটি আছে—তবে ভাল কি মন্দ সেটা অবশ্য আপনাদেরই বিচার্য্য।"

"কে বল দেখি?"

সরোজ একটু সলজ্জ হাসি হাসিয়া বলিল, "আমাকে কি আপনি সুষমার যোগ্য পাত্র মনে করবেন?"

গৃহিণী, খুব বিস্মিত হইয়াছেন এইরূপ ভাণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুমি? তুমি সুষীকে বিয়ে করবে? সে ত তার পরম সৌভাগ্য! কিন্তু সুষীর মন কি তুমি বুঝেছ?"

"না, সে চেষ্টাই আমি এখনও করিনি মিসেস লাহিড়ী। আপনাদের অনুমতি না পেলে—"

গৃহিণী বলিলেন, "সে ত ঠিক। তুমি যেমন ভদ্র ছেলে, তার উপযুক্ত কাজই করেছ। আচ্ছা, উনি বাড়ী আসুন, ওঁকে জিজ্ঞাসা করি। উনি যে রকম বলেন, তোমায় জানাবো।"

"তাহলে দয়া ক'রে আজ কি মিষ্টার লাহিড়ীর মতটা জেনে রাখবেন? কাল আবার এ সময় আমি আসবো কি?"

মিসেস লাহিড়ী মনে মনে হাসিয়া ভাবিলেন, বাবাজীর যে আর তর সইছে না দেখছি! প্রকাশ্যে বলিলেন, "হ্যাঁ, বেশ ত, আমি ওঁর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে রাখবো এখন, কাল আবার তুমি এস।"

সরোজ আশান্বিত হৃদয়ে প্রস্থান করিল।

রাত্রে নিভৃতে গৃহিণী স্বামীর নিকট কথাটা পাড়িলেন। লাহিড়ী বলিলেন, "সরোজ যে সুষীর দিকে খুব ঝুঁকেছে তা আগে থেকেই বোঝা যাচ্ছিল।"

গৃহিণী বলিলেন, "সে ত বটেই। কেমন, তোমার কোনও অমত নেই ত?"

লাহিড়ী বলিলেন, "ছেলেটি ত বেশ ভালই। ডাক্তারীতে এরই মধ্যে বেশ পশার ক'রে নিয়েছে। সুশিক্ষিত, সচ্চরিত্র—কিন্তু সুষী বেটী কি রাজী হবে?"

"কেন রাজি হবে না? এর চেয়ে ভাল পাত্র আর কোথায় পাবেন শুনি?"

"ভাল মন্দর কথা আমি বলছিনে। আমার কিন্তু মনে হয় ওর কেবল বাইরেটাই আধুনিক, কিন্তু ভিতরটা নিতান্ত সেকেলে। বিধবার আবার বিয়ে করা, ও হয়ত মহাপাপ ব'লে মনে করে। তা যদি না হত, তবে ও মাছ মাংসও ছাড়তো না, একাদশীতে ফলমূলও খেত না, আর লুকিয়ে ঠাকুর পুজোও করত না।"

"বেশ ত, সরোজ চেষ্টাই করুক না।"

"হ্যাঁ—সরোজকে বোলো, সে আগে বেশ ক'রে ওর মন বুঝে দেখুক। সরোজ যেমন ওকে ভালবেসেছে, সুষীও যদি তাকে সেই রকম ভালবেসে থাকে, তাহলে আর কথা কি!"

"তা হলে ঐ কথাই সরোজকে বলি?" "হ্যাঁ, বোলো।"

দিন পনেরো পরে সুষমা একদিন মিসেস লাহিড়ীকে বলিল, "পরশু রবিবার বিকেলে ললিতার দাদা ললিতাকে আর তার ছোট ভাইকে আলিপুরে ফ্লাওয়ার শো (পুষ্প প্রদর্শনী) দেখাতে নিয়ে যাবেন। ললিতা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছে তুই যাবি ভাই,

তাহলে তোকে আমরা তুলে নিয়ে যাই। আমি বলেছি, আচ্ছা, জেঠাইমাকে জিজ্ঞাসা ক'রে কাল বলবো।".

গৃহিণী সস্নেহে সুষমার গায়ে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "বেশ ত! তা যেও মা! আর, ওদের দুজনকে নেমন্তন্ন কোরো, শো থেকে ফিরে, রাত্রে এখানে এসে খাওয়া-দাওয়া ক'রে যাবে।"

রবিবার বিকালে সরোজ আসিল, কিন্তু ললিতা কিংবা তার ছোট ভাই আসে নাই। বলিল, ললিতাকে এবং ছোট ভাইকে মাসীমা নিজ গৃহে লইয়া গিয়াছেন, আজ রাত্রে সেখানে তারা থাকিবে।

মিসেস লাহিড়ী বলিলেন, "তা হ'লে আর কি হবে?"

সরোজ বলিল, "সুষমাকে নিয়ে যেতে পারি?"

মিসেস লাহিড়ী বলিলেন, "বেশ ত নিয়ে যাও।"

সুষমা বলিল, "আজ থাক্‌না জেঠাইমা। অন্য একদিন গেলেই ত হবে।"

সরোজ বলিল, "আজ কিন্তু বিশেষ ক'রে গোলাপ ফুলেরই এগ্‌জিবিশন। এটা মিস্‌ করা উচিত নয়।"

সুষমা বলিল, "তা হলে তুমিও চল জেঠাইমা।"

"আমার কি সময় আছে মা? কত কাজ আমার পড়ে রয়েছে, তা ছাড়া উনিও বাড়ী নেই। যাওনা, সঙ্গে গিয়ে তুমি ফুল দেখে এস! সরোজ, ফিরে এসে এইখানেই খাবে ত তুমি?"

"হ্যাঁ খাব বইকি মিসেস লাহিড়ী।"

সুষমা নিতান্ত অনিচ্ছায় বেশ পরিবর্ত্তন জন্য উঠিয়া গেল।

এই সুযোগে, সরোজ বলিল, "দেখুন, অনেক চেষ্টা করেও ওর মনের কথা আমি কিছুমাত্র বুঝতে পারলাম না।"

গৃহিণী কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া তারপর বলিলেন, "ওঁর পরামর্শে চলতে গিয়েই ত এ রকম হল। নইলে এতদিন কোন্‌কালে যাহোক একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যেত।"

"আমার প্রতি ওর যে মন আছে, তার কোনও লক্ষণ আপনি কি বুঝতে পারেন?"

"ও বড় চাপা মেয়ে। ও সবে আর দরকার নেই। আমি নিজে বরং আজ রাত্রে খোলাখুলি ওকে জিজ্ঞাসা করি।"

সরোজ মিনতির স্বরে বলিল, "আমি চলে গেলে তারপর জিজ্ঞাসা করবেন।"

"বেশ, তাই হবে।"

ছয়

লাহিড়ী সাহেব সস্ত্রীক ড্রয়িংরুমে বসিয়া আছেন। সন্ধ্যার পর সুষমাকে লইয়া সরোজ ফিরিয়া আসিল। সুষমার হস্তে গোলাপ ফুলের মস্তবড় একটা সাজি, তাহাতে নানা আকার ও বর্ণের ফুল ফার্ণ-পাতা সহযোগে সজ্জিত। লাহিড়ী সাহেব ও তাঁহার গৃহিণী পর্য্যায়ক্রমে সাজিটি হাতে লইয়া পরীক্ষা ও আঘ্রাণ করিয়া, উচ্চ প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

লাহিড়ী সাহেব বলিলেন, "সরোজ, তুমি মুখ হাত ধোবে না?"

"হ্যাঁ ধোব।"

লাহিড়ী সাহেব বেয়ারাকে ডাকিয়া সরোজকে গোসলখানায় লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। সরোজ চলিয়া গেল।

লাহিড়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত নিলে ফুলগুলো রে সুষী?"

"সাড়ে আট টাকা। কিনে, আমি দাম দিতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু সরোজবাবু কিছুতেই আমায় দাম দিতে দিলেন না। একবার ভাবলাম তবে থাক্‌—নিয়ে কাজ নেই। আবার মনে হল, সেটা হয়ত একটু অভদ্রতা হয়, তাই অগত্যা নিলাম। অন্যায় করেছি জেঠামশাই?"

"না, অন্যায় করনি মা!"—বলিয়া লাহিড়ী সাহেব পত্নীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি কি বল গো?"

গৃহিণী বলিলেন, "না নিলেই অন্যায় হত। যাও মা তুমি কাপড়চোপড় বদলাওগে—তারপর ফুলগুলি, কয়েকটা ফুলদানীতে জল দিয়ে বেশ ক'রে সাজিয়ে ফেলো।"

পনেরো মিনিট পরে সরোজ ড্রয়িংরুমে ফিরিয়া আসিল। আর কিছুক্ষণ পরে সুষমাও আসিল—তার হাতে দুটি গোলাপ। একটি জ্যেঠাইমার চুলে পরাইয়া দিল, একটি জ্যেঠামহাশয়ের কোটে বটন্ হোল করিয়া দিতে লাগিল।

লাহিড়ী সাহেব হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমি বুড়োমানুষ আমার কি সাজে রে বেটী? সরোজের কোটে পরিয়ে দে।"

সুষমা কিন্তু শুনিল না, জ্যেঠামহাশয়ের কোটেই ফুলটি পিন দিয়া আটকাইয়া দিল।

লাহিড়ী সাহেব উহা খুলিয়া, হাসিতে হাসিতে সরোজের কোটে লাগাইয়া দিলেন। ইহা দেখিয়া গৃহিণী নিজের খোঁপার ফুলটি সুষমার চুলে গুঁজিয়া দিলেন।

"বাঃ—এ কি?"—বলিয়া সুষমা আর দুইটি ফুল লইয়া, জ্যেঠামহাশয় ও জ্যেঠাইমাকে অলংকৃত করিল।

আহারান্তে, রাত্রি ১০টার সময় সরোজ বিদায় গ্রহণ করিল। লাহিড়ী সাহেবও রাতকাপড় পরিবার জন্য নিজ শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

সুষী বলিল, "আমিও তা হলে শুইগে জ্যেঠাইমা।"

"হ্যাঁ মা। চল্—আমিও তোর ঘরে যাচ্চি,—একটু কথা আছে।"

সুষমার শয়নকক্ষে গিয়া, একটা চেয়ারে বসিয়া গৃহিণী বলিলেন, "সরোজ ত মহা বায়না নিয়েছে মা।"

নিজ শয্যাপ্রান্তে বসিয়া সুষমা বলিল, "কি বায়না জ্যেঠাইমা?"

"তোকে বিয়ে করবার জন্যে ক্ষেপেছে।"

কথাটা শুনিবামাত্র সুষমা চক্ষু অবনত করিল। গৃহিণী দেখিলেন, তাহার মুখে ক্রোধ ও বিরক্তির লক্ষণ ফুটিয়া উঠিতেছে। ক্ষণপরে সুষমা বলিল, "তা হলে, তিনি ক্ষ্যাপার মত কাজই করেছেন জ্যেঠাইমা!"

"কেন?"

"কারণ, বিয়ে ত আমি করবো না।"

"কেন করবে না বাছা? তোমার এই কাঁচা বয়স; ভাল ঘর বর পেলে বিয়ে ত করাই উচিত। কেন, সরোজকে কি তোমার পছন্দ হয় না? বিদ্বান্, সচ্চরিত্র, দেখতেও ভাল, নিজে যথেষ্ট টাকা উপার্জ্জন করছে। এর চেয়ে ভাল পাত্র কোথায় পাওয়া যাবে মা? সুষমা বলিল, "সে কথা নয় জ্যেঠাইমা। কিন্তু আমি যে—বিধবা।"

"কেন, বিধবা-বিবাহ কি তুমি তবে ন্যায়সঙ্গত ধর্ম্মসঙ্গত মনে কর না? লেখাপড়া শেখার ফল কি হল তবে?"

সকল বিধবার পক্ষে আবার বিবাহ করা অধর্ম্ম বা অন্যায় ব'লে আমিও মনে করিনে জ্যেঠাইমা।"

"তবে কেন তুমি বিয়ে করতে চাওনা বাছা?"

সুষমার মুখে আসিয়াছিল, "কারণ, আমি আমার স্বামীকে ভালবাসি, আর যতদিন বেঁচে থাকবো, বাসবো।"—কিন্তু একথা বলিতে তাহার লজ্জা করিল। কয়েক মুহূর্ত্ত ভাবিয়া লইয়া সে বলিল, "আপনি ত জানেন জ্যেঠাইমা, আমার মা যখন চ'লে গেলেন, কতলোক ত বাবাকে ফের বিয়ে করার জন্যে বলেছিলেন। বাবার তখন মাত্র ৩৫ বৎসর বয়স—পুরুষ মানুষের পক্ষে সেটা পূর্ণ যৌবন কাল। কিন্তু বাবা ত বিয়ে করেন নি। বাবার ঘরে, মার যে অয়েলপেণ্টিং ছবিখানি টাঙ্গানো থাকতো, বাবা রোজ রাত্রে

শুতে যাবার আগে, মার সেই ছবিখানি ফুল দিয়ে সাজাতেন—ব্যারাম হবার পরও কয়েক-দিন তার অন্যথা হয়নি। বাবা যদি আবার বিয়ে করতেন, তা হলে কেউ ত তাঁকে বলতে পারতো না যে তিনি অন্যায় বা অধর্ম্ম করলেন।"

লাহিড়ী গৃহিণী অবাক হইয়া কিছুক্ষণ সুষমার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার কথাগুলির তাৎপর্য্য মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তারপর বলিলেন, "তোমার বাবা, তোমার মাকে নিয়ে কত বচ্ছর ঘরকন্না করেছিলেন—কিন্তু তুমি ত বাছা, তোমার স্বামীর সংগ পুরো দুটি বছরও পাওনি।"

সুষমা, নীরবে নতমুখে বসিয়া রহিল। কোনও উত্তর করিল না।

গৃহিণী আরও কিয়ৎক্ষণ নীরবে বসিয়া চিন্তা করিলেন। সুষমার প্রতি তাঁহার মন শ্রদ্ধায় পূর্ণ হইয়া উঠিল।

বলিলেন, "তোমার বাবা, তোমার মাকে বড্ড ভালবাসতেন তা আমরা জানতাম। তোমার মার মৃত্যুর পর কিছুদিন অবধি তিনি পাগলের মত হয়ে গিয়েছিলেন। আচ্ছা, একটা কথা আজ তোমায় জিজ্ঞাসা করি। তুমি রোজ আয়াকে দিয়ে ফুল আনাও, আমরা মনে করতাম, লুকিয়ে লুকিয়ে তুমি ঠাকুর পুজো ক'রে হিঁদুয়ানী বজায় রাখ। তুমিও কি তোমার বাবার মতন—"

সুষমা ধীরে ধীরে বলিল, "আমার স্বামীর একখানি ফোটোগ্রাফ আমার কাছে আছে।"

গৃহিণী আরও কিয়ৎক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন। তার পর বলিলেন, "আচ্ছা মা রাত হল, শোও এখন। এ বিষয়ে আর কখনও আমি তোমায় অনুরোধ করবো না, তুমি আমার উপর রাগ কোর না মা।"

"না জ্যেঠাইমা, রাগ করবো কেন? আপনি ত ভাল ভেবেই বলেছিলেন। আপনি আমার অপরাধ নেবেন না, জ্যেঠাইমা।"—বলিয়া সুষমা গলায় আঁচল দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।

জ্যেঠাইমা চলিয়া গেলে সুষমা দ্বারে খিল বন্ধ করিয়া, যে দেরাজে তার মৃত স্বামীর ছবি থাকিত, উহা খুলিল। ছবিখানির চারিদিকে অদ্য প্রাপ্ত তাজা গোলাপ ফুলগুলি তুলিয়া লইয়া সুষমা জানালা গলাইয়া ফেলিয়া দিল; বস্ত্রাঞ্চলে ছবিখানি বেশ করিয়া মুছিয়া, উহা মাথায় ঠেকাইয়া বলিতে লাগিল,—"তুমি আমায় ক্ষমা কর—ক্ষমা কর—আমি ত জানতাম না যে ও ফুলগুলোর সঙ্গে অলক্ষ্যে একজনের বাসনার কালি মাখানো আছে।"

দিব্যদৃষ্টি

জ্যৈষ্ঠ মাস। কলিকাতা পটলডাঙ্গায় একটি ছাত্রাবাসে আজ মহা উৎসব লাগিয়াছে। ব্যাপারটা এই—

সুরেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় ম্যাট্রিক ও আই-এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগের উচ্চস্থান অধিকার করিয়াই পাস হইয়াছিল, কিন্তু বি-এ পরীক্ষার মনোবিজ্ঞান বিভাগে সে একেবারে উচ্চতম স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। প্রথম হইবার খবর যে দিন বাহির হইল, সে দিন ছিল বুধবার।

সুরেনের পিতা জীবিত নাই—দেশে, পাবনা জেলায় চৌরীপুর গ্রামে, তাহার জননী আছেন; সুরেনের পিতৃব্যের অভিভাবকতায় তিনি বাস করেন। বাড়ীর অবস্থা তেমন ভাল নহে। তাই বি-এ পরীক্ষা, কবে শেষ হইয়া গেলেও সুরেন কলিকাতায় থাকিয়া প্রাইভেট টিউশনি করিতেছে। সুরেনের বয়স তেইশ বৎসর, দিব্য সুশ্রী চেহারা, সদাই হাস্যবদন। সুরেন আজিও অবিবাহিত।

তাহার পরবর্তী শনিবারে মেস-বন্ধুগণ এক সান্ধ্যভোজের আয়োজন করিল। খরচটা অবশ্য সুরেনেরই। বাসার শরৎবাবু, বিপিনবাবু, যোগেশবাবু, উমাপদবাবু, যতীন্দ্র-বাবু, সতীশবাবু, ললিতবাবু ত আছেনই। বাহির হইতে অতুলবাবু, কুমুদবাবু ও কুঞ্জবাবু নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়া এই আনন্দ-উৎসবে যোগদান করিয়াছেন।

ভোজন-শক্তি-বৃদ্ধিকল্পে সিদ্ধির আয়োজন হইয়াছিল। যুবকগণ সকলে এ হইলে, সিদ্ধি বিতরিত হইল। কেহ এক পাত্র, কেহ দুই পাত্র গ্রহণ করিলেন, মা... দুইজন করিলেন না। তাঁহারা বলিলেন, সিদ্ধি তাঁহাদের মোটেই সহ্য হয় না।

কিয়ৎক্ষণ গল্প-গুজবের পর, গান-বাজনা আরম্ভ হইল। হার্ম্মোনিয়ম ও বাঁয়া-তবলা সহযোগে দেড় কি দুই ঘণ্টা গান-বাজনার পর গায়ক ও বাদকেরা শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। তখন সিদ্ধির নেশা সকলেরই বেশ জমিয়া আসিয়াছে। আবার গল্প-গুজব আরম্ভ হইল।

সতীশবাবু এক কোণে বসিয়া সে দিন প্রভাতের সংবাদপত্রখানা লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিলেন। হঠাৎ তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ওহে, একটা মজার খবর শুনেছ?"

সকলে বলিয়া উঠিল, "কি? কি?"

"এই যে পড় না শুনি—অর্থাৎ শোন না, পড়ি।"—বলিয়া তিনি পড়িতে আরম্ভ করিলেন:—

মফঃস্বল সংবাদ

কৃষ্ণনগর—নদীয়া

ছাত্রীর কৃতিত্ব। কৃষ্ণনগর বারের সুপ্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত বাবু রামজীবন মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল মহাশয়ের কন্যা কুমারী কুন্দমালা দেবী বিগত ম্যাট্রিক পরীক্ষায় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন, ইহা কৃষ্ণনগরবাসী সকলেরই অত্যন্ত আনন্দ ও গৌরবের বিষয়! এই উপলক্ষে রামজীবনবাবু সহরস্থ তাবৎ গণ্যমান্য লোককে আগামী শনিবারে সান্ধ্যভোজে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। স্থানীয় যুব-নাট্যসমিতি নিমন্ত্রিত-গণের আনন্দবর্দ্ধনার্থ ঐ রজনীতে রামজীবনবাবুর গৃহ-প্রাঙ্গণে ডি-এল্ রায়ের "চন্দ্রগুপ্ত" নাটকের অভিনয় করিবেন।

ললিত চীৎকার করিয়া উঠিল—"হুররে—থ্রী চিয়ার্স ফর এম-এ, বি-এল মহাশয়ের কন্যা মুণ্ডমালা!"

সুরেন বলিল, "মুণ্ডমালা নয় রে, কুন্দমালা। নামটি কিন্তু বেশ মিষ্টি।"

অতুলবাবু নামক এক ভদ্রলোক দেওয়ালে হেলান দিয়া উর্দ্ধমুখে গম্ভীর-স্বরে বলিলেন, "আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!"

ললিত বলিল, "আহা, কি আর আশ্চর্য্য? বাঙ্গালীর মেয়ের ইউনিভার্সিটিতে ফার্ষ্ট হওয়া, আজকালকার দিনে মোটেই আর আশ্চর্য্য ব্যাপার নয়।"

অতুলবাবু বলিলেন, "সে জন্যে আশ্চর্য্য বলিনি হে!—আমি দিব্যদৃষ্টিতে ব্যাপারটা যা দেখতে পাচ্ছি—তা আশ্চর্য্য! অতীব আশ্চর্য্য!"

যোগেশবাবু বলিলেন, "দিব্যচক্ষে কি দেখছ অতুল, বলই না শুনি!"

অতুল বলিল, "এর ভিতরে প্রজাপতির হাত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।"

উমাপদ বলিল, "কিসের ভিতর?"

অতুল বলিল, "প্রথমতঃ দেখ, সুরেনও ফার্ষ্ট হয়েছে, কুন্দমালাও তাই।"

"দ্বিতীয়তঃ?"

"দ্বিতীয়তঃ, সুরেনের কৃতিত্বের জন্যে আনন্দ-ভোজের আয়োজন আজ এখানে পটল-ডাঙ্গায়, কুন্দমালার কৃতিত্বের জন্যে আনন্দভোজের আয়োজন ঠিক আজই, ঠিক এই সময়েই কৃষ্ণনগরে চলছে।"

"তৃতীয়তঃ?"

"তৃতীয়তঃ, সে কুমারী, আর আমাদের সুরেন্দ্র—কুমার।"

"তার পর?"

"একজন চাটুয্যে, একজন মুখুয্যে—করণীর ঘর।"

"আর কিছু আছে?"

"নিশ্চয়ই আছে। যে মুহূর্ত্তে সুরেনের কাণের ভিতর দিয়া কুন্দমালা নামটি পশিল, অমনি আকুল করিল ওর প্রাণ। নামটি শুনেই ও বলেছে—বাসা মিষ্টি নামটি কিন্তু। —সুরেন, বলনি তুমি? এই একঘর লোক সাক্ষী আছে।"

সুরেন একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "ঠিক ঐ কথাগুলিই বলিনি, তবে ঐ ভাবের কথা বলেছি বটে।"

অতুল অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বলিল, "এ বিবাহ অনিবার্য্য।"

শরৎ বলিল, "কি হে সুরেন, তুমি কি বল? অনিবার্য্য নাকি?"

সুরেন হাসিয়া বলিল, "জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ এ তিনটের কোনটাই ত মানুষের হাতে নয় ভাই। প্রজাপতির তাই যদি নির্ব্বন্ধ হয়, তবে আমায় পরতেই হবে মাথায় টোপর, পালাবো কোথা?"

ললিত বলিল, "কি ভয়ানক কথা! আমাদের মধ্যে যে এমন একজন দিব্যদৃষ্টি-ওয়ালা মহাপুরুষ বিচরণ করছেন, তা আমরা কোন দিনই সন্দেহ করিনি! আচ্ছা অতুল-বাবু, মেয়েটির বয়স কত হবে?"

অতুল বলিল, "সতেরো—সতেরো বছরে পড়েছে, এখনও পূর্ণ হয়নি।"

"আচ্ছা, তার চেহারাটা কি রকম, দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছ ত?"

"আলবৎ পাচ্ছি।"

"কি রকম, বল না শুনি। কৃষ্ণা, না শ্যামা, না গৌরী?"

"গৌরী। নাম শুনেই বুঝতে পারছ না? কুন্দফুলের রঙ কি?"

উমাপদ বলিয়া উঠিল, "কুন্দশুভ্র নংনকান্তি সুরেন্দ্রবন্দিতা, অয়ি অনিন্দিতা।"

যতীন চীৎকার করিয়া বলিল, "ওহে অতুল, এই দেখ আর একটা ভয়ঙ্কর মিল। সুরেন ভাই, সুরেন,—তোমার ভাবী প্রিয়ার একটা বন্দনা-গান গাও।"

কুঞ্জ গাহিয়া উঠিল—

'পদপ্রান্তে রাখ সেবকে।"

খুব একটা হাসি পড়িয়া গেল। হাসির হিল্লোল থামিলে যতীন বলিল, "যাই বল তাই বল ভাই, এতগুলো মিল কিন্তু আশ্চর্য্য বটে।"

অতুল যতীনের পানে চাহিয়া, হাসিতে হাসিতে ভেঙ্গাইল—"দেয়ার আর মোর থিংস্ ইন্ হেভেন অ্যান্ড আর্থ, হোরেশিও দ্যান আর ড্রেম্‌ট্ আফ ইন ইওর ফিলাজাফি!"

ললিত বলিল, "সে যাক্—তুমি ব'লে যাও হে। মেয়েটির বয়স মাত্র সতের বছর, গৌরবর্ণা—আর কি কি সব বল দেখি?"

"সংক্ষেপেই বলি। মুখ, চোখ, চুল, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সবই ভাল, তবে একটু ত্রুটি আছে। চোখের তারা দুটি মিশ কালো নয়, একটু ফিকে বাদামী রঙের। এই ত্রুটি-টুকু ছাড়া, মেয়েটিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বলা যেতে পারে।"

সুরেন বলিল, "ওটা কি ত্রুটি নাকি? আমি ত ওটা সৌন্দর্য্যের লক্ষণ বলেই মনে করি।"

এই সময় খবর আসিল, আহার্য্য প্রস্তুত। যুবকগণ আনন্দকলরব করিতে করিতে নীচে নামিয়া গেল।

দুই

পরদিন বিকালে ৫টার সময় যতীনবাবু কলতলায় স্নান করিতেছিলেন, দুইটি অপরিচিত ভদ্রলোক বাসায় প্রবেশ করিলেন। একজন প্রবীণ-বয়স্ক, অন্য জন যুবা-

পুরুষ। প্রবীণ ভদ্রলোক যতীনবাবুকে দেখিয়া বলিলেন, "এ বাসায় সুরেন্দ্রবাবু ব'লে কেউ থাকেন কি? সুরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জ্জী।"

যতীন প্রশ্নের উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা কোথা থেকে আসছেন?"

"কৃষ্ণনগর থেকে।"

শুনিবামাত্র যতীনের দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। উত্তর করিল, "সুরেনবাবু ত এখন বাসায় নেই, বেরিয়েছেন।"

"কখন ফিরবেন তিনি?"

"সন্ধ্যার আগেই আসবে বোধ হয়।"

"তাঁর ঘরে ব'সে আমরা কি অপেক্ষা করতে পারি?"

"নিশ্চয়। তাঁর ঘর বোধ হয় তালাবন্ধ আছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলায় ডান-হাতি প্রথম ঘরটা আমার। দয়া ক'রে সেখানে ব'সে অপেক্ষা করুন, আমি স্নান সেরে আসছি।"

"আচ্ছা থ্যাঙ্কস্"—বলিয়া বাবু দুইজন সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন।

যতীন তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া নিজ কক্ষে গিয়া দেখিল, বাবু দুইটি দুইখানি চেয়ার দখল করিয়া বসিয়া আছেন। যতীন মাথায় শুষ্ক তোয়ালে ঘষিতে ঘষিতে বলিল, "আপনাদের এক এক পেয়ালা চা দিতে পারি কি?"

প্রবীণ বাবুটি বলিলেন, "দোকানের চা? না, থ্যাঙ্কস্।"

যতীন বলিল, "দোকানের চা নয়। ঐ যে ষ্টোভ রয়েছে, আমি নিজে তৈরী করবো।"

প্রবীণ ভদ্রলোক সঙ্কুচিত হইয়া বলিলেন, "আবার কষ্ট করবেন আপনি?"

যতীন বলিল, "ষ্টোভ ত আমায় জ্বালতেই হবে। আমি একটু খাব কিনা!"

বাবুটি বলিলেন, "আচ্ছা, তা হ'লে—"

যতীন ষ্টোভ জ্বালিয়া চায়ের জল চড়াইয়া দিয়া, নিজ তক্তপোষের প্রান্তে আসিয়া বসিল। বাবুটি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার নাম কি?"

"শ্রীযতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।"

"এখানে পড়াশুনো করেন বুঝি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ,—সিটি কলেজে বি-এ পড়ি। এবার ফোর্থ ইয়ার।"

"বাড়ী কোথায় আপনার?"

"আজ্ঞে, খুলনা জেলায়।"

"কোথায়?"

"মাধবপুর গ্রামে।" একটু থামিয়া যতীন বলিল, "যদি বেয়াদবি না মনে করেন, মশাইয়ের নামটি জানতে পারি কি?"

"আমার নাম শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। আমি কৃষ্ণনগরে দ্বিতীয় মুন্সেফের পেস্কার। এটি আমার ভাগ্নে, নাম সুধীরকুমার মুখুয্যে। ইনি সম্প্রতি ওকালতী পাস ক'রে কৃষ্ণনগরেই প্র্যাক্টিস আরম্ভ করেছেন। এঁর পিতার নাম আপনি শুনে থাকবেন বোধ হয়, তিনি কৃষ্ণনগরের খুব নামজাদা উকীল, রামজীবন মুখুয্যে।"

গত কল্যকার আসরে, সংবাদপত্র হইতে পঠিত নামটা যেন রামজীবন বলিয়াই যতীনের মনে হইল। সন্দিগ্ধস্বরে বলিল, "রামজীবন? রামজীবন? আচ্ছা, তাঁরই মেয়ে কি এবার ম্যাট্রিকে ফার্ষ্ট হয়েছেন?"

সঞ্জীববাবু বিনীত হাস্য করিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ,—কুন্দমালা—আমার ভাগ্নী।"

যতীনের সর্ব্বাঙ্গ দিয়া একটা রোমাঞ্চ বহিয়া গেল। কি আশ্চর্য্য, অতুলবাবু কি তবে একটা ছদ্মবেশী যোগী নাকি? মানুষের দিব্যদৃষ্টি সত্যই কি তবে থাকিতে পারে? হিন্দুধর্ম্ম কি তবে নিতান্ত বুজরুকি নয়? সে মনে মনে বলিল, "নাঃ, সন্ধ্যে-

আহ্নিকটা ছেড়ে দেওয়া ভাল হয়নি। কাল থেকে ফের শুরু করতে হবে!"

যতীন জিজ্ঞাসা করিল, "সুরেনের সঙ্গে আপনার কি প্রয়োজন, জানতে পারি কি?"

সঞ্জয়বাবু ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া, তার পর বলিলেন, "আমরা শুনেছি, সুরেনবাবু এখনও অবিবাহিত। তাঁর পিতাও বর্ত্তমান নেই, নিজেই তিনি নিজের অভিভাবক। কোথাও তাঁর বিবাহের সম্বন্ধ হচ্ছে কি না, তিনি এখন বিবাহ করতে রাজি আছেন কি না, আপনি বলতে পারেন?"

যতীন বলিল, "আজ্ঞে না—তা—ঠিক জানিনে।"

চায়ের জল ফুটিয়া উঠিয়াছিল, যতীন তিন পেয়ালা চা প্রস্তুত করিল। চা-পান করিতে করিতে সঞ্জীববাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুরেনবাবু বি-এ ত পাস করলেন, এবার তিনি কি করবেন? আইন-ক্লাস জয়েন করবেন কি?"

"না, উকীল হবার তার ইচ্ছে নেই। এইবার এম-এ পড়বে।"

"বাড়ীতে ওঁর কে আছে?"

"মা আছেন। কাকা-টাকা কাকী-টাকাও আছেন শুনেছি।"

"ক' ভাই ওঁরা?"

"ভাই-টাই কিছু নেই। একটি বোন আছে, তার বিয়ে হয়ে গেছে।"

এই সময় সিঁড়িতে জুতার শব্দ হইল। যতীন বলিল, "এই বোধ হয় আসছে।

সুরেন্দ্র, যতীনের ঘরের সামনে আসিবামাত্র যতীন বলিল, "ওহে এদিকে এস। এই ভদ্রলোক দুটি তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ব'সে আছেন।"

"ওঃ, আচ্ছা—আমার ঘরে আসুন।"—বলিয়া সুরেন্দ্র অগ্রসর হইল। আগন্তুকদ্বয় তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

ঘণ্টাখানেক পরে বাবুরা বিদায় গ্রহণ করিলেন। যতীনের ঘরের সামনে আসিয়া সঞ্জীববাবু বলিলেন, "আজ আসি তা হ'লে যতীনবাবু। আবার দেখা হবে, নমস্কার।"

যতীন লক্ষ্য করিল, সঞ্জীববাবুর মুখখানি হাসি হাসি। "আজ্ঞে, আসুন, নমস্কার"—বলিয়া সে ইঁহাদের সঙ্গে সিঁড়ি পর্য্যন্ত গেল। তার পর দ্রুতপদে সুরেনের ঘরে গিয়া দেখিল, সুরেন অত্যন্ত গম্ভীরভাবে গালে হাত দিয়া বসিয়া আছে। বলিল, "ব্যাপার কি হে?"

সুরেন চমকিয়া উঠিয়া যতীনের মুখপানে চাহিল। বলিল, "এঁরা কি জন্যে এসেছিলেন, তুমি জান যতীন?"

"স্পষ্ট জিজ্ঞাসাই করেছিলাম হে! উত্তর দেন নি, অন্য কথা পেড়ে আমার প্রশ্নকে চাপা দিয়েছিলেন। কিন্তু কি জন্যে এসেছিলেন, তা অনুমান করতে পারি। কুন্দমালার সঙ্গে তোমার বিয়ের সম্বন্ধ করতে এসেছিলেন ত?"

সুরেন্দ্র বলিল, "হ্যাঁ, কিন্তু কি আশ্চর্য্য কথা, বল দেখি!"

"আশ্চর্য্য বইকি!"

"কিন্তু এর এক্সপ্ল্যানেশন্ কি?"

"আমি ত কিছুই খুঁজে পাইনে।—কি হ'ল, তাই বল। রাজি হয়েছ?"

"হয়েছি। দেখ, যাই শুনলাম, উনি কৃষ্ণনগর থেকে এসেছেন, কুন্দমালার মামা, আমি যেন কি রকম হতভম্ব হয়ে গেলাম। যা যা বললেন, তাতেই আমি হাঁ ব'লে গেলাম। আসছে রবিবারে আমি কৃষ্ণনগর যাব মেয়ে দেখতে। মেয়ে দেখে আমার পছন্দ হ'লে ওঁরা দেশে আমার কাকা-মশাইকে চিঠি লিখবেন পরে যা যা করতে হয় সব করবেন। আষাঢ় মাসেই বিয়েটা সেরে ফেলতে চান, কেন না, তার পরেই মেয়ের যোড়া বছর পড়বে। আচ্ছা যতীন, একটা জিনিষ তুমি লক্ষ্য করেছ?"

"কি?"

"ওর ভাইয়ের চোখের তারা? অতুলবাবু কুন্দ সম্বন্ধে যা বলেছিলেন, এরও অবিকল

তাই। চোখের তারা কালো নয়, ফিকে বাদামী রঙের।"

"না ভাই, আমি ত সেটা লক্ষ্য করিনি!"

"আমি করেছি। কিন্তু যা-ই বল যতীন, অতুলবাবুর কিন্তু আশ্চর্য্য ক্ষমতা।"

"ব্যাপার কি, অতুলবাবুকে গিয়ে একবার জিজ্ঞাসা করলে হয় না? এখন ত কোনও কাজ নেই, চল না যাওয়া যাক তার বাসায়। একটু বেড়ানও হবে।"

সুরেন বলিল, "তাকে এখন কি বাসায় পাবে? সে ত আজ চলল রাইবেরেলী। সেখানে একটা চাকরি জুটিয়েছে যে। এতক্ষণ বোধ হয় সে হাওড়া ষ্টেশনের পথে।"

তিন

অবিলম্বে মেসের অন্যান্য লোকের মধ্যে কথাটা প্রচার হইয়া গেল। সন্ধ্যার পর সকলে আসিয়া সুরেনের ঘরে জটলা আরম্ভ করিল। যোগেশবাবু বলিলেন, "অতুলটা কি কোনও সূত্রে জানতে পেরেছিল যে, কুন্দমালার মামা তোমাকে আজ দেখতে আসবেন? জেনে শুনে ঐ রকম চালাকি খেলে গেল নাকি?"

শরৎ বলিল, "আমি ত' তার পাশেই ব'সে ছিলাম, কিন্তু সে সময় তার মুখ-চোখ দেখে ত ওরকম আমার মনে হয়নি ভাই! বিশেষ, সে ত নিজে কোনও কথাই তোলেনি, —হঠাৎ খবরের কাগজ প'ড়ে শোনালে ত সতীশ!—সতীশ, তুমিই প'ড়ে শোনালে না?"

সতীশ বলিল, "হ্যাঁ, আমিই ত প'ড়ে শোনালাম। কাগজখানা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলাম, হঠাৎ ঐ প্যারাটা আমার চোখে পড়লো। তারও ফার্ষ্ট হওয়ার জন্যে আনন্দ-ভোজ শনিবারেই হচ্ছে এই কথা প'ড়ে আমার ভারি মজা লাগলো, তাই তোমাদের সেটা প'ড়ে শোনালাম।"

বিপিন বলিল, "হয় ওৎলোটা জানতো, নয়, সত্যিই তার একটা ক্ষমতা আছে—ওকেই ত ক্লেয়ারভয়েন্স বলে।"

উমাপদ বলিল, "যারা সাধনার খুব উচ্চ স্তরে উঠেছে, তাদের এ রকম হয় জন্মে তা স্বীকার করি। কিন্তু ওৎলোটা ত মহা নাস্তিক। মুসলমানের রান্না মুর্গী ভক্ষণ করে, ওর ওরকম ক্ষমতা থাকা আমি ত অসম্ভব বলেই মনে করি। নিশ্চয়ই সে জানতো।"

শরৎ বলিল, "জানতো কি না, সে সম্বন্ধে আমি কিছু বলছিনে অবশ্য, কিন্তু কোন-কোনও মানুষের স্বভাবতঃ ওরকম একটা আশ্চর্য্য ক্ষমতা থাকে, সেটা আমি জানি। আমি যখন প্রথম বছর কলকাতায় আসি, অষ্ট্রেলিয়া থেকে একটা সার্কাসের দল এসেছিল খেলা দেখাতে। তখন বড়দিনের ছুটী। গড়ের মাঠে প্যাণ্ডাল খাটিয়ে তারা খেলা দেখাচ্ছিল। নানা রকম খেলা হবার পর, একটা খেলা দেখালে, তা একেবারে অদ্ভুত। এক ছুঁড়ী মেম, বয়স এই আঠারো উনিশ, সে এসে বললে, 'দর্শকদের মধ্যে যে কাউকে আমি ছুঁয়েই, তার জন্মবার ব'লে দেবো। যদি আমার ভুল হয়, অনুগ্রহ ক'রে তিনি যেন বলেন।' এই ব'লে সে প্রথম সারি, দ্বিতীয় সারি, এক এক জনকে ছোঁয়, আর এক একটা বারের নাম ব'লে যায়, যেমন—শনিবার, বুধবার, মঙ্গলবার, শুক্রবার—এই রকম। একটি লোকও বললে না যে, 'না ঠিক হ'ল না, তোমার ভুল হয়েছে।' আমি তৃতীয় সারিতে ব'সে ছিলাম, খালি ভাবছি, আমার জন্মবার ত সোমবার, দেখি ঠিক বলে কি না। ঐ রকম বলতে বলতে তৃতীয় সারিতে এসে, ছুঁড়ী আমার দিকে চ'লে এল, আমাকে ছোঁবামাত্র বললে—সোমবার।"

অনেকেই আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "অ্যাঁ, বল কি? নিজে তুমি দেখেছ—"

শরৎ বলিল, "নিজে নয় ত কি প্রক্সিতে?—পাঁচটি টাকা দিয়ে টিকিট কিনে আমি ঐ তামাসা দেখতে গিয়েছিলাম। আমার মনে হ'ল, আমার টাকা খরচ সার্থক হয়েছে। তার পর আরও মজা শোন। তৃতীয় সারি শেষ ক'রে ছুঁড়ী ফিরে গেল। তার পর বললে, 'প্রত্যেক লোককে ছুঁয়ে, কার পকেটে কি আছে, আমি তা ব'লে দিতে পারি।' এই

ব'লে আবার প্রথম সারি থেকে আরম্ভ করলে। এক এক জনকে ছোঁয় আর বলে—রুমাল, চাবি, পেন্সিল, নস্যির ডিপে ইত্যাদি। জনপ্রাণী কেউ প্রতিবাদ করলে না। আমার সারিতে এসে, আমায় ছুঁয়ে ছুঁড়ী বললে—ঐ সব রুমাল চাবি-টাবি—আর একটা জিনিষ, যা বয়স্ক পুরুষমানুষের পকেটে থাকা সম্ভব নয়,—ছেলেপিলের পকেটে থাকতে পারে। বললে, ভাঙ্গা বিস্কুট। আমি চমকে, পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম হ্যাঁ, ভাঙ্গা বিস্কুট রয়েছে আমার পকেটে—কিন্তু সত্যি বলছি ভাই, আমার নিজেরই তা মনে ছিল না। হয়েছিল কি জান? তার চার পাঁচ দিন আগে, সেই কোট গায়ে পায়ে হেঁটে আমি সহর দেখতে বেরিয়েছিলাম। চাঁদনীতে এসে বড় ক্ষিদে পায়। চার পয়সার বিস্কুট কিনেছিলাম খানকতক খেয়েছিলাম, খান দুই পকেটে প'ড়ে ছিল।—এ আমার প্রত্যক্ষ দেখা ঘটনা। কি বলতে চাও তোমরা? সে ছুঁড়ী ঋষি-তপস্বীও নয়, সাধনাও করে না, গরু-শুয়োর খায়, মদ খায়, এবং সম্ভবতঃ খারাপ চরিত্রের মেয়ে। ও কি জান? কোন-কোনও লোকের ঐ রকম একটা আশ্চর্য্য ক্ষমতা থাকে,—তাকে ক্লেয়ার-ভয়েন্সই বল, আর দিব্যদৃষ্টিই বল, আর যাই বল।"

বিপিন বলিল, "মাদ্রাজ অঞ্চলের গোবিন্দ চেট্টির কথা শুনেছ ত? এই পনর-ষোল বছর আগেকার কথা। সে সময় খবরের কাগজে প্রায়ই তার কথা বেরুতো। তবে সে ভবিষ্যৎ বলতো না, বর্ত্তমান বলতো। মাদ্রাজে সে নিজের ঘরে ব'সে তোমায় ব'লে দেবে, দেশে তোমার মা সে সময় কি করছেন, বাবা কি করছেন, তোমার স্ত্রী কি করছেন, ইত্যাদি। কলকাতা থেকে কত লোক দেখতে গিয়েছিল। সুরেশ সমাজপতির 'সাহিত্য' কাগজে তার বিবরণ বেরিয়েছিল। মনে আছে, আমার বাবা বলতেন, 'যদি আমার দেহটা ভাল থাকতো, আমি যেতাম।' সেই গোবিন্দ চেট্টিও শুনেছিলাম বদ্ধ মাতাল।"

কুমুদবন্ধু থিওজফি সম্বন্ধে কয়েকখানি পুস্তক পাঠ করিয়াছিল। সেও কয়েকজন মহাত্মার আশ্চর্য্য ক্ষমতার কথা প্রকাশ করিল। এইরূপ আলোচনায় রাত্রি-ভোজনের সময় সমাগত হইল।

পরবর্ত্তী রবিবারে সুরেন্দ্র কয়েকজন মেসবন্ধুসহ কৃষ্ণনগর যাত্রা করিল। মেয়ে দেখিয়া সকলেই খুসী। প্রত্যেকেই লক্ষ্য করিল, কুন্দমালার চক্ষুতারকা সাধারণ বাঙ্গালী মেয়ের মত কালো নহে, উহা ফিকা বাদামী রঙেরই বটে।

চার

আষাঢ়ের শেষ সপ্তাহে কুন্দমালার সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের শুভ-বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। বিবাহের দুই দিন পূর্ব্বে দেশ হইতে তাহার পিতৃব্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। পরদিন সকলে সদলবলে কৃষ্ণনগর যাত্রা করিলেন।

শুভ-দিনে কুন্দমালার সহিত সুরেন্দ্রের বিবাহ হইয়া গেল। কৃষ্ণনগরেই কুশণ্ডিকা-ক্রিয়া শেষ করাইয়া কাকা-মহাশয় বর-কনে লইয়া দেশে গেলেন, বরযাত্রীরা কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল।

ফুলশয্যার রাত্রিতে প্রথম সম্ভাষণের পর সুরেন্দ্র নববধূকে বলিল, "দেখ, আমাদের এ মিলন-ব্যাপারের সঙ্গে খুব একটা আশ্চর্য্য ঘটনা জড়িত আছে।"

কুন্দ কৌতূহলী হইয়া বলিল, "কি আশ্চর্য্য ঘটনা?"

সুরেন বলিল, "যখন তোমাতে আমাতে বিয়ের কোনও কথাই হয়নি, যখন তোমার মামা আমাকে দেখতেও যান নি, তখনই আমাদের এক বন্ধু ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে, তোমাতে আমাতে বিয়ে অনিবার্য্য। আমার সে বন্ধুর এক আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে। ভবিষ্যতের সব ঘটনা তিনি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পান।"

কুন্দ বলিল, "বল কি? আমার নাম তোমার সে বন্ধু জানলেন কি করে?"

পটলডাঙ্গার বাসায় এক মাস পূর্ব্বে শনিবারে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সুরেন তাহা

সবিস্তারে বর্ণনা করিল। 'কুন্দমালা' নামটি শুনিবামাত্র কিছু না জানিয়াও সুরেন যে মধুর মন্তব্যটি প্রকাশ করিয়াছিল, তাহাও উল্লেখ করিতে ভুলিল না।

কুন্দ অবাক্ হইয়া সমস্ত শুনিতেছিল। সুরেনের কথা শেষ হইলে বলিল, "খুব আশ্চর্য্য ত! তোমার সে বন্ধু নিশ্চয়ই একজন খুব ভাল গুরু পেয়েছেন, যোগসিদ্ধ বোধ হয়?"

সুরেন্দ্র বলিল, "ছাই সিদ্ধ।"

"তবে? তিনি কি করেন?"

"এই, আমরা সকলেই যা করি। অন্নের জন্যে রাত জেগে বই মুখস্থ ক'রে এগ্‌জামিন পাশ করেছেন, তার পর চাকরীর উমেদারী।—ওটা কি জান? এক একজন মানুষের ঐ রকম একটা ক্ষমতা জ'ন্মে যায়। আপনা আপনি জন্মায়, তার জন্যে জপ-তপ সাধনা-টাধনা কিছুই করতে হয় না। ওকে বলে ক্লেয়ারভয়েন্স—ক্লিয়ার ভিশন—দিব্যদৃষ্টি আর কি। আর, ওরকম ক্ষমতা যার আছে, তাঁকে বলে ক্লেয়ারভয়েণ্ট।"—মুরুব্বিয়ানা-স্বরে এই কথাগুলি বলিয়া সুরেন গোবিন্দ চেট্টির ক্ষমতার কথা এবং অষ্ট্রেলিয়ান সার্কাস দলের সেই মেয়ের ক্ষমতার কথাও যথাশ্রুত বর্ণনা করিল।

কিয়ৎক্ষণ কুন্দ বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিল। তার পর মিনতির স্বরে বলিল, "হ্যাঁগা, তুমি এবার যখন এখানে আসবে তাঁকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এস না। আমি তাঁকে দেখবো।"

সুরেন বলিল, "সে ত এখন কলকাতায় নেই। পাঞ্জাব গেছে চাকরী করতে। যে দিন সে ঐ সব কথা বললে, তার পরদিনই সে চ'লে গেছে। রাইবেরেলী হাই স্কুলের হেড মাষ্টারী চাকরী নিয়ে সে গেছে।"

কুন্দ শুইয়া ছিল, হঠাৎ উঠিয়া বসিয়া বলিল, "কি বললে? রাইবেরেলী ইস্কুলের হেড মাষ্টার?"

সুরেন, কুন্দমালার এই হঠাৎ উত্তেজনায় বিস্মিত হইয়া বলিল, "হ্যাঁ। কেন?"

"তোমার বন্ধুর নাম কি বল দেখি?" "অতুল—অতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী।"

"ও আমার পোড়াকপাল!"—বলিয়া কুন্দ মুখে হাত চাপা দিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া হাসিতে লাগিল। হাসি আর থামে না।

"কেন? কেন? হাসছ কেন?"—বলিয়া সুরেনও উঠিয়া বসিয়া, কুন্দমালার মুখ হইতে হাত টানিয়া খুলিয়া দিল।

আরও মিনিটখানেক হাসিয়া তার পর কুন্দ আত্মসম্বরণ করিতে পারিল। বলিল, "হাসছি কেন জান? তোমার সে বন্ধুটি যোগীও নন, ঋষিও নন, গোবিন্দ চেট্টিও নন, ক্লেয়ারভয়াণ্টও নন। তিনি আমার অতুল-দা। ঐ যে আমার মামা তোমায় দেখতে গিয়েছিলেন, তিনি অতুলদার পিসেমশাই। অতুলদা ত কতবার এখানে এসেছেন। বাবা তাঁকে একটি ভাল পাস-করা পাত্রের সন্ধান করবার জন্যে চিঠি লিখেছিলেন, অতুলদা-ই ত বাবাকে তোমার কথা লেখেন। অতুলদা রাইবেরেলী চ'লে যাবেন ব'লেই দাদাকে নিয়ে মামা তাড়াতাড়ি ঐ দিন তোমায় দেখতে গিয়েছিলেন। তিনি যখন তোমাদের ভোজের সভায় ঐ ক্লেয়ারভয়েণ্টগিরি ফলাচ্ছিলেন, তখন তিনি বিলক্ষণ জানতেন যে, মামাবাবু দাদাকে সঙ্গে নিয়ে পরের দিন ১০টার গাড়ীতে কৃষ্ণনগর থেকে কলকাতা রওয়ানা হবেন। বাবা আগে তাঁকে চিঠি লিখেছিলেন যে!"

"তোমায় সে দেখেছে?"

"হাজার দিন।"

সুরেন কয়েক মুহূর্ত্তকাল নীরবে বসিয়া রহিল। তার পর বলিল, "কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! ভারি ঠকানটাই শালা আমাদের ঠকিয়েছিল ত! উঃ—আমার চোখের সামনে থেকে একটা পর্দ্দা উঠে গেল। আমার এক গেলাস জল দাও।"

সুশোভনা

এক

শরৎকাল, পূজার ছুটীতে সহরের আফিস আদালত সবেমাত্র বন্ধ হইয়াছে। সেদিন বেলা ৯টার সময় রাইনগর ষ্টেশনে, কলিকাতা হইতে আগত ট্রেণের প্রথম শ্রেণীর একটি কামরা হইতে গুলী, বন্দুক প্রভৃতি শিকারের সরঞ্জামসহ দুইজন বাঙ্গালী যুবক অবতরণ করিল। একজনের অঙ্গে ইংরাজি ধরণের শিকারীর বেশ—বয়স্ আন্দাজ পঁচিশ হইবে। সুগঠিত বলিষ্ঠ দেহ, রঙটি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। নাম অমরেন্দ্রনাথ মল্লিক। অপর যুবকটি বয়সে ইহার অপেক্ষা দুই একবৎসরের ছোট হাতে বন্দুক থাকিলেও, পরিধানে ধুতি ও কোট। ইহার রঙটি অপেক্ষাকৃত ফরসা দেহ-গঠনেও পারিপাট্য আছে—বিশেষ করিয়া তাহার চুলগুলি ও চোখ দুটি বড় সুন্দর। ইহার নাম সুকুমার মজুমদার। সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় শ্রেণীর এক কামরা হইতে খানসামার উর্দ্দি-পরা এক মুসলমান ভৃত্য নামিল। তাহার সঙ্গে নামিল আমকাঠের এক সিন্দুক এবং একটা বড় বালতী। ঐ বালতীর ভিতর একটা বিলাতী চুলা (ষ্টোভ) ও অন্যান্য জিনিষ ভর্ত্তি ছিল। যুবকদ্বয় ধীরপদে অগ্রসর হইয়া ষ্টেশনের ওয়েটিং-রুমে গিয়া যখন প্রবেশ করিল তখন গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা বাজিয়াছে। কুলীর মাথায় আমকাঠের সিন্দুক ও হাতে বালতী দিয়া খানসামাও আসিয়া ওয়েটিং-রুমে প্রবেশ করিল এবং কুলীকে পশ্চাতের বারান্দায় লইয়া গিয়া জিনিষ-পত্র নামাইয়া, ষ্টোভ জ্বালিয়া চায়ের জল চড়াইয়া দিল।

বখশিস লইয়া কুলীটা প্রস্থান করিতেছিল অমরেন্দ্র তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "কি রে, তোর নাম কি?"

"আজ্ঞে, আমার নাম হরিদাস আমরা কেবর্ত্ত।"

"এইখানেই বাড়ী?"

"আজ্ঞে না, এখান থেকে কোশ-তিনেক হবে।"

"আচ্ছা, কুমীরদীঘি কোথায় জানিস?"

"তা আর জানিনে হুজুর? আমাদের গাঁ থেকে কোশখানেক পথ বইত নয়!"

"এখান থেকে কত দূর সেই দীঘি?"

"এখান থেকে কোশ-দুই-আড়াই হবে।"

"কুমীরদীঘিতে কি সত্যি সত্যি কুমীর আছে?"

"আজ্ঞে ছিল, খুবই ছিল। কলকাতা থেকে সাহেবরা এসে মেরে মেরে তাদের বংশনাশ করে দিয়েছে। তবে এখনও কুমীর যে একেবারে নেই, তা বলতে পারলাম না, হুজুর!"

অমরেন্দ্র ইংরাজিতে সুকুমারকে বলিল, "আমাকে বন্দুক-টন্দুক, টিফিন-বাক্স বইবার জন্যে একটা লোক ত দরকার, একেই নিযুক্ত করা যাক না।"

সুকুমার বলিল, "সেই ভাল। সেই জায়গারই লোক, চেনে শোনে।"

অমরেন্দ্র হরিদাসের মজুরী স্থির করিয়া, সারাদিনের জন্য তাহাকে নিযুক্ত করিল। হরিদাস বলিল, "কখন বেরুতে হবে, হুজুর?"

"এই, আধ ঘণ্টা পরেই।"

"আজ্ঞে হুজুর, তবে আমি বাসা থেকে ঘুরে আসি।"—বলিয়া সে প্রস্থান করিল।

চায়ের জল তৈয়ারি হইলে, খানসামা টেবিল "লাগাইয়া" টিফিন-বাক্স হইতে লুচি, আলুভাজা, বেগুনভাজা, ফুলকপি-ভাজা ইত্যাদি বাহির করিয়া মনিব ও তাঁহার বন্ধুকে "ব্রেকফাষ্ট" খাওয়াইল। জলের পরিবর্ত্তে চা দিল।

ব্রেকফাস্ট খাইতে খাইতে অমরেন্দ্র দেখিল, কয়েকজন লোক দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া, হাঁ করিয়া তামাসা দেখিতেছে। অমরেন্দ্র খানসামাকে বলিল, "পর্দ্দাটা টেনে দে।" খানসামা ছুটিয়া গিয়া, তাহাদিগকে ধমক দিয়া তাড়াইয়া, দ্বারের পর্দ্দা টানিয়া দিল।

প্রাতরাশ সমাধা করিয়া দুই বন্ধু সিগারেট সেবন করিতেছিল, হরিদাস আসিয়া পৌঁছিল।

অমরেন্দ্র তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ রে, মুর্গী পাওয়া যায় এখানে?"

হরিদাস অঙ্গুলি নির্দ্দেশে মুক্ত বাতায়ন-পথে দেখাইল, "হুজুর, ঐ যে দেখছেন মাঠের পারে আমগাছগুলো, ঐখানে মোমিনপুর গেরাম। ওখানে অনেক চাষী মুসলমানের বাস। তাদের কাছে তালাস করলে মুর্গী, এণ্ডা সবই পাওয়া যাবে।"

অমরেন্দ্র নিজ ভৃত্যকে বলিল, "আমরা বেরিয়ে গেলেই ঐ মোমিনপুরে গিয়ে গোটা দুচ্চার মুর্গী আর ডজন-খানেক ডিম কিনে আনবি। রাত্রের জন্যে একটা মুর্গীর রোস্ট আর একটা মুর্গীর কারি বানিয়ে রাখবি। আমরা ফিরে এলে, তার পর ভাত বানাবি—বুঝলি?"

খানসামা বলিল, "জী হুজুর।"

বিধাতাপুরুষ কিন্তু অদৃশ্যে থাকিয়া এই ভোজনের আয়োজন শুনিয়া হাসিলেন,—কারণ, এখন কিছুকাল এই দুই যুবকের অন্ন তিনি স্থানান্তরে "মাপাইযা" রাখিয়াছিলেন।

খানসামা, প্রভুর আদেশ অনুসারে, তাহার আমকাঠের সিন্দুক হইতে, বরফজল-পরিপূর্ণ দুইটি বড় বড় থার্ম্মোফ্লাস্ক বাহির করিয়া, টিফিন-বাক্স সাজাইতে বসিল। হরিদাস সন্দিগ্ধনেত্রে টিফিন-বাক্সের পানে চাহিয়া বলিল, "হুজুর, এই বাক্সে রান্না মুর্গী-টুর্গীও যাচ্ছে নাকি?" অমরেন্দ্র হাসিয়া বলিল, "না রে না। ঐ দেখ্ না, কচুরি, সিঙ্গাড়া, সন্দেশ-টন্দেশ ছাড়া আর কিছু নেই। ও কচুরি-সিঙ্গাড়াও আমার বাড়ীর বামুন-ঠাকুরের ভাজা। তোর কোনও ভয় নেই।"

টিফিন-বাক্স, বন্দুকের বাক্স প্রভৃতি হরিদাসের মাথায় চাপাইয়া দুই বন্ধু শিকারে যাত্রা করিল। উভয়েই হিন্দুর ছেলে "দুর্গা শ্রীহরি" বলিয়া যাত্রা করাই উচিত ছিল, কিন্তু কলির প্রাবল্যে সে কথা তাহাদের স্মরণ ছিল না।

দুই

এইখানে এই যুবকদ্বয়ের একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান আবশ্যক। কলিকাতা বাদুড়বাগানে উভয়েরই বাস, উভয়েই বৈদ্যবংশসম্ভূত। অমরেন্দ্রনাথ "মুখে রূপার চামচ" লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল—তার পিতা অত্যন্ত ধনী ছিলেন, কলিকাতায় তাঁহার বিস্তৃত কারবার। নিজ বসত-বাটী ছাড়া এখানে ওখানে তাঁহার পাঁচখানি বাড়ী ভাড়া খাটে। তিনি এখন স্বর্গগত, তাঁহার একমাত্র পুত্র অমরেন্দ্রনাথই তাঁহার পরিত্যক্ত ব্যবসায় ও তাবৎ ভূসম্পত্তির মালিক। তিন বৎসর পূর্ব্বে অমরেন্দ্রনাথের বিবাহ হইয়াছিল, গত বৎসর তাহার একটি পুত্রসন্তান জন্মিয়াছে। স্ত্রী সুভাষিণী রূপে-গুণে অমরেন্দ্রনাথের মনোমত সহধর্ম্মিণী, তাহার সহিত অমরেন্দ্রনাথের প্রণয় এখনও উদ্দাম। অমরেন্দ্রনাথের জননী, সধবা অবস্থাতেই স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। স্ত্রী ছাড়া, গৃহে তাহার একটি অবিবাহিতা ভগিনী আছে, তার নাম সান্ত্বনা, এবং এক বৃদ্ধা জেঠাইমা আছেন, তিনি বধূর হাতে সংসারের ভার তুলিয়া দিয়া এখন হরিনাম জপ, এবং লোকজনকে তর্জ্জন-গর্জ্জন ও এ-কালের সর্ব্ববিষয়ের নিন্দা করিয়া কাল-যাপন করেন।

অপর যুবক সুকুমার মজুমদার দরিদ্রের সন্তান। তার পিতা অল্পবেতনে কেরাণী-গিরি করিতেন, দুইটি কন্যার বিবাহ দিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়া ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। সুকুমারও কেরাণীগিরি করিয়া জীবন-যাপন করিতেছেন। গৃহে বিধবা জননী

ছাড়া দুইটি ছোট ভাই এবং একটি অবিবাহিতা ভগিনীও বর্ত্তমান।

সাংসারিক অবস্থার তারতম্য সত্ত্বেও, অমরেন্দ্র ও সুকুমারের মধ্যে বাল্যকাল হইতে বন্ধুত্ব অত্যন্ত নিবিড়। বিদ্যালয়ে তাহারা একই শ্রেণীতে পড়িত। প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া, অমরেন্দ্র পড়া ছাড়িয়া, পিতার হউসে প্রবেশ করে। সুকুমার বি-এ পাস করিয়া এম-এ পড়িতেছিল, এমন সময় তাহার পিতৃবিয়োগ ঘটিল, কাজেই উদরান্নের জন্য বাধ্য হইয়া তাহাকে পড়া ছাড়িতে হইল। বাপের আফিসের বড়সাহেব অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে চাকরী দিলেন:—সেই চাকরীই সে করিতেছে।

আর একটি কথা বলিলেই ইহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় শেষ হয়। অমরেন্দ্রনাথ প্রকাশ্য-ভাবে স্থির করিয়াছে, তাহার ভগিনী সান্ত্বনার সহিত সুকুমারের বিবাহ দিয়া নিজেদের বন্ধুত্ব পাকা করিয়া লইবে, এবং তাহার মনের গোপন অভিপ্রায়, বিবাহান্তে সুকুমারকে তার অল্পবেতনের কেরাণীগিরি ছাড়াইয়া নিজ ব্যবসায়ে শুন্য অংশীদার করিয়া লইবে। কিন্তু সান্ত্বনা অগ্রজের মনের এই গোপন অভিপ্রায় অবগত ছিল না। এখন সে আর নিতান্ত ক্ষুদ্র বালিকা নহে, তাহার বয়স হইয়াছে চতুর্দ্দশ বর্ষ। এ বিবাহের প্রস্তাব হওয়া অবধি সে মনঃক্ষুন্ন হইয়া আছে। সুকুমারদের বাড়ী সে কতবার গিয়াছে। সে বাড়ীতে বিদ্যুৎ নাই—সুতরাং ফ্যান নাই, এবং তেলের আলো জ্বলে। আসবাবপত্র কুশ্রী এবং বিরল। দাস-দাসী ও অশন-বসনের ব্যবস্থাও তাহার পিতৃগৃহের তুলনায় অত্যন্ত হীন। তাই এ বিবাহে তার কিছুমাত্র উৎসাহ নাই। ফলে সুকুমারকে দেখিলেই তাহার গা জ্বলিয়া যায়। এ পর্যন্ত মুখ ফুটিয়া সে এ কথা কাহাকেও না বলিলেও তার বৌদিদি তার মনের ভাব বুঝিতে পারেন, কিন্তু ইহা বালিকাসুলভ নির্ব্বুদ্ধিতা বিবেচনা করিয়া, ওটা বড় গ্রাহ্য করেন না।

বিবাহ অগ্রহায়ণ মাসের সুরুতেই হইবে, ইহার স্থির হইয়া আছে।

তিন

চারিদিকে নীচু প্রাচীর-ঘেরা একটি ছোট বাগান, মধ্যস্থলে একটি নবনির্ম্মিত দ্বিতল অট্টালিকা। ফটকের দুই পাশে দুইটি ঘর, একটিতে একজন দ্বারবান্ থাকে, অপরটিতে মালী বাস করে। গৃহের নিম্নতলের ঘরগুলি প্রায় সবই খালি মাত্র একটিতে বাড়ীর সরকার থাকে। বাটীর পশ্চাতে কয়েকটি মৃৎকুটীরে কয়েকজন দুলিয়া-জাতীয় লোক বাস করে, তাহারা গৃহস্বামীর পাল্কীবাহক। দ্বিতলে গৃহস্বামী তাঁহার একমাত্র কন্যাকে লইয়া বাস করেন, তাঁহার আর কেহ নাই।

দ্বিতলে পূর্ব্বদিকের বারান্দায় একটি চেয়ারে পড়িয়া গৃহস্বামী পেন্সনপ্রাপ্ত সব-জজ্ বৃদ্ধ হরিশঙ্করবাবু মধ্যাহ্ন-ভোজনান্তে সংবাদপত্র পাঠ করিতেছেন।

একটি ছোট টেবিলে রূপার ডিবায় দুই খিলি পাণ। অপর পার্শ্বে মেঝের উপর তাঁহার গুড়গুড়ি রহিয়াছে—সটকা-নলটি চেয়ারের হাতলের উপর পড়িয়া। ভদ্রলোক মাঝে মাঝে কাগজ নামাইয়া নলটি তুলিয়া লইয়া কিঞ্চিৎকাল ধূমপান করিতেছেন আবার নল রাখিয়া কাগজ উঠাইয়া পাঠে মন দিতেছেন।

চটিজুতা পায়ে ষোল-সতেরো বছরের একটি সুন্দরী মেয়ে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিল। তার কুঞ্চিত কেশরাশি পিঠের উপর পড়িয়াছে—পরিধানে একখানি দেশী ডুরে শাড়ী, গায়ে শিমপাতা রঙের ফ্ল্যানেলের একটি হাপ-হাতা ব্লাউজ। রঙটি যাহাকে বলে দুধে-আলতা চক্ষু দুইটি বড় বড়, দেহটি যৌবন-লাবণ্যে টলটল করিতেছে। মেয়েটি বৃদ্ধের চেয়ারের কাছে আসিয়া বলিল, "বাবা, আপনাকে আর দুটো পাণ দিয়ে যাব কি?"

হরিশঙ্করবাবু মুখ তুলিয়া বলিলেন, "দিয়ে কোথা যাবি? শুতে?"

"না বাবা, আমি ছাদে যাব চুল শুকুতে।"

"তা যাবি যা, কিন্তু দিনের বেলায় ঘুমুসনে, মা। শীতকালে দিনে ঘুমুলে শরীর খারাপ হয়।"

"না বাবা, ঘুমুবো না আমি। যদি ঘুম পায়, নেমে বাগানে গিয়ে বেড়াব। কিন্তু পানের কথা ত আপনি বললেন না, আর দুটো পাণ দিয়ে যাব কি?"

হরিশঙ্করবাবু পাণের ডিবার পানে এক নজর চাহিয়া বলিলেন, "ঐ ত দুটো রয়েছে, আর পাণ কি হবে?"

মেয়েটির নাম সুশোভনা। সে কলিকাতায় কলেজে পড়ে, বোর্ডিং-এ থাকে, পূজার ছুটিতে বাড়ী আসিয়াছে।

সুশোভনা তখন ধীরপদে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল এবং আপন শয়ন-ঘরে গিয়া, টেবিলের উপর বিক্ষিপ্ত খানকয়েক বহি হইতে একখানি উপন্যাস বাছিয়া লইয়া ছাদে গিয়া দেখিল, বাটীর ঝি কিশোরীর-মা, আহারান্তে পাণ ও দোক্তা গালে দিয়া, এক বাটি দাইল-বাটা লইয়া বড়ী দিতে বসিয়াছে। সুশোভনা কিছুক্ষণ ঝির নিকট দাঁড়াইয়া তাহার বড়ী দেওয়ার কৌশল দেখিল। জিজ্ঞাসা করিল, "কি ডাল বেটেছিস্, কিশোরীর-মা?" ঝি বলিল, "কড়াইয়ের ডাল, দিদিমণি।"

সুশোভনা তখন ঝির নিকট হইতে সরিয়া, ছাদের আলিসার নিকট গিয়া দাঁড়াইল। সম্মুখে মাঠ ধু-ধু করিতেছে, কোথাও একটা বৃক্ষের অন্তরাল পর্য্যন্ত নাই। মাঠের মাঝে উচ্চ পাড়যুক্ত কুমীরদীঘি নামক জলাশয়। সুশোভনা লক্ষ্য করিল, দীঘির পাড়ে তিনটি মনুষ্য বিচরণ করিতেছে—একজনের মাথায় শাদা শিকার-হ্যাট রৌদ্রে চক্‌চক্ করিতেছে। বলিল, "ঐ দেখ্ কিশোরীর-মা, কারা আবার কুমীর মারতে এসেছে!"

কিশোরীর-মা বড়ী-হাত বাটির কাণায় মুছিয়া সুশোভনার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল। সেই দিকে দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া বলিল, "একজন সায়েব এসেছে দিদিমণি!"

সুশোভনা বলিল, "সায়েব তোকে কে বললে?"

ঝি বলিল, "দেখছনি, টোপা মাথায় দিয়ে বেড়াচ্চে।"

সুশোভনা বলিল "সায়েব না হাতী! টোপা মাথায় দিলেই বুঝি সায়েব হয়? বাঙ্গালীরাও ত শিকার করতে যাবার সময় ইংরেজি কাপড় পরে, হ্যাট মাথায় দেয়। না, আমার ঘর থেকে দূরবীণটে নিয়ে আয় না, ভাল করে দেখি ওদের।"

কিশোরীর-মা নামিয়া গিয়া, একটা বাইনকুলার দূরবীণ লইয়া আসিল। এটি তাহার গত জন্মদিনে, তাহার পিতার উপহার। সুশোভনা বাইনকুলার চোখে দিয়া ফোকাস্ ঠিক করিয়া দীঘির পাড়ে মনুষ্যদিগকে দেখিল। একজন ইংরাজি বেশধারী এবং একজন ধুতি-পরা বাঙ্গালী, উভয়েরই হাতে বন্দুক! অপর ব্যক্তি মুটিয়া-শ্রেণীর বলিয়া বোধ হইল। তখন যন্ত্রটি ঝির হাতে দিয়া বলিল, "বাঙ্গালীই ত। সবাই বাঙ্গালী। দ্যাখ্।"

ঝি কিন্তু যন্ত্রটি চোখে লাগাইয়া কিছুই দেখিতে পাইল না। সে কথা সে বলিলে, সুশোভনার স্মরণ হইল, বয়সের পার্থক্য-হেতু উভয়ের দৃষ্টিশক্তির তারতম্য হওয়াই স্বাভাবিক। তখন সে ঝির চক্ষুলগ্ন যন্ত্রটির পেঁচ ঘুরাইতে লাগিল: ক্ষণকাল পরে ঝি বলিল, "হ্যাঁ, এইবার বেশ পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। সায়েব ত নয়, বাঙ্গালীই ত বটে, দিদিমণি!"

কয়েক মুহূর্ত্ত ইহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া, ঝি বলিল, "ঐ দেখ দিদিমণি, অন্য লোক দুটো স'রে গেল, সায়েবটা শুয়ে পড়লো।"

সুশোভনা বলিল, "বোধ হয়, কোনও কুমীরে গা ভাসান দিয়েছে, গুলী করবে।" —বলিয়া যন্ত্রটি চাহিয়া লইয়া সে নিজ চক্ষুতে লাগাইল।

তাহার অনুমানই সত্য হইল। ধোঁয়া দেখা গেল, দুই তিন সেকেণ্ড পরেই বন্দুকের আওয়াজও কর্ণে আসিয়া পৌঁছিল।

সুশোভনা দেখিল, শিকারী উঠিয়া দাঁড়াইল, যে লোক দুই জন পশ্চাতে সরিয়া গিয়াছিল, তাহারাও ছুটিয়া আসিল। তিনজনেই একত্র উচ্চ পাড় হইতে নামিতে লাগিল, এবং হঠাৎ শিকারী পদস্খলিত হইয়া, গড়াইতে গড়াইতে জলের কাছে গিয়া স্থির হইল।

সুশোভনা দূরবীণ নামাইয়া বলিয়া উঠিল. "যাঃ, প'ড়ে গেল।"

"কে দিদিমণি ?"

"ঐ শিকারী।"

"দূরবীণটে দাও না দিদিমণি, দেখি।"

"দাঁড়া!"—বলিয়া সুশোভনা দেখিতে লাগিল। সে দেখিল, অপর লোক দুইজন. সাবধানে পাড় হইতে নামিয়া সেই শিকারীর কাছে গিয়া দাঁড়াইল। শিকারীর নিকট তারা ঝুঁকিয়া বসিল। একজন দীঘি হইতে জল আনিয়া শিকারীর মুখে-চোখে সেচন করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ এইরূপ করিতে করিতে, ভূপাতিত ব্যক্তি উঠিয়া বসিল, তার পর আবার সে শুইয়া পড়িল।

সুশোভনা বলিল, "আহা, বড্ড বোধ হয় জখম হয়েছে!" বলিয়াই তাহার মাথায় এক বুদ্ধি আসিল। আহা, এই জনশূন্য তেপান্তর মাঠে, এই বিপদে, উহাদের কি হইবে? বাইনকুলার ঝির হাতে দিয়া, সে ছুটিয়া নীচে নামিয়া গিয়া ডাকিল—বাবা।"

হরিশঙ্করবাবুর একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল, তিনি চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, "কি মা?"

সুশোভনা বলিল, "বাবা, কুমীরদীঘিতে এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক শিকার করতে এসে, পাড় থেকে নীচে প'ড়ে ভয়ানক আঘাত পেয়েছেন। এই তেপান্তর মাঠের মধ্যে তাঁর কি উপায় হবে, বাবা?"

হরিশঙ্করবাবু চেয়ারে উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "কে বললে তোমায়?"

"আমি ছাদ থেকে বাইনকুলার দিয়ে দেখছিলাম বাবা। তাঁকে প'ড়ে যেতে দেখলাম। অজ্ঞান হয়ে গেছেন বোধ হ'ল।"

"কতক্ষণ?"

"এখনও পাঁচ মিনিট হয়নি বোধ হয়। বাবা, পাল্কী-বেয়ারা ছুটিয়ে দিন, তাঁকে নিয়ে আসুক এখানে। নইলে আর ত কোনও উপায় নেই!"

হরিশঙ্করবাবু চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "আচ্ছা, আমি নিজেই তা হ'লে পাল্কী নিয়ে যাই। তুমি ততক্ষণ এক কাজ কর, মা। তাকে এনে উপরে তোলা বোধ হয় চলবে না। নীচের ঘরে যে লোহার খাটখানা আছে তারই উপর ততক্ষণ বিছানা ক'রে রাখ। আমার জামাটা জুতোটা দাও।"

সুশোভনা ছুটিয়া ঘরের মধ্যে গিয়া পিতার জামা ও জুতা লইয়া আসিল। পাল্কী-বাহকগণ বাড়ীতেই থাকিত—তাহারা তখন আহারান্তে দিবানিদ্রার আয়োজন করিতেছিল। পাল্কীতে বিছানা বিছাইয়া হরিশঙ্করবাবু স্বয়ং উহাতে আরোহণ করিয়া কুমীরদীঘি অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সুশোভনা ছাদে গিয়া ঝির হাত হইতে বাইনকুলার লইয়া, চোখে লাগাইয়া দেখিল, শিকারীর সঙ্গে যে দুইজন লোক ছিল, তাহাদের একজন কোথায় অদৃশ্য হইয়াছে,—অপর জন আহতের শুশ্রূষায় নিযুক্ত। তার পর ঝিকে বলিল, "কিশোরীর-মা, বাবা রোগীকে আনতে পাল্কী নিয়ে নিজে গেছেন। নীচের ঘরে যে লোহার খাটখানা আছে, তাতে গদি পাতাই আছে, গদিটার ধুলো বেশ ক'রে ঝেড়ে, তার উপর একখানা তোষক আর একটা সাফ চাদর পেতে, বালিস-টালিস দিয়ে বিছানা পেতে রাখ্ গে—বাবা ব'লে গেছেন।"

"ও মা, কি আপদ হ'ল! হে মা মধুসূদন!"—বলিয়া ঝি প্রস্থান করিল।

সুশোভনা দেখিতে লাগিল। ঐ তাহার পিতার পাল্কী ছুটিয়াছে। এক মিনিট, দুই মিনিট, প্রায় মাঝামাঝি গিয়া পৌঁছিল। হঠাৎ একটা কথা তাহার স্মরণ হইল। সে নীচে নামিয়া গেল। কিশোরীর-মা তোষক ও বিছানার চাদর অন্বেষণে-ব্যাপৃত। সুশোভনা জিজ্ঞাসা করিল, "কিশোরীর-মা তুই চূণে-হলুদ তৈরি করতে জানিস?"

"হ্যাঁ দিদিমণি, তা আর জানিনে?"

[illegible] বেটে একটা এনামেলের বাটিতে চূণ আর হলুদ মিশিয়ে ষ্টোভ জেবলে চড়িয়ে দিগে যা, বিছানা-টিছানা আমিই সব ঠিক ক'রে রাখছি।"

কিশোরীর-মা চলিয়া গেল। তোষক প্রভৃতি লইয়া সুশোভনা শয্যা প্রস্তুত করিয়া, আবার ছাদে গিয়া উঠিল। যন্ত্রে চক্ষুলগ্ন করিয়া দেখিল, পাল্কী ফিরিতেছে—তাহার পিতা ও অপর ভদ্রলোকটি পদব্রজে আসিতেছেন। পাল্কী দ্রুত আসিতেছে।

তাই ত, রোগী আসিয়া পড়িবে, পিতা পশ্চাতে রহিলেন যে! সুশোভনা আবার নামিয়া গেল। সরকারবাবুকে ডাকিয়া তাঁহাকে সব কথা বুঝাইয়া বলিল। সরকারবাবু ফটকের নিকট গিয়া দ্বারবান্ ও মালীকে ডাকিয়া, রোগীকে নামাইয়া বিছানায় লইয়া যাওয়া সম্বন্ধে যথোপযুক্ত উপদেশ দিতে লাগিলেন। বামুনঠাকুর ও রামকিষণ ভৃত্যও সাহায্য করিবে। সুশোভনা বারান্দায় উঠিয়া পথপানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

দেখিতে দেখিতে পাল্কী আসিয়া পেঁাছিল। পাল্কী বারান্দার উপরে উঠানো হইল। সকলে মিলিয়া ধরাধরি করিয়া রোগীকে নামাইয়া শয্যায় তাহাকে শয়ন করাইয়া দিল। রোগী যন্ত্রণায় কাৎরাইতে কাৎরাইতে, একবার চক্ষু খুলিয়া সুশোভনার প্রতি চাহিল। বলিল, "টেলিগ্রাম ক'রে কলকাতা থেকে ডাক্তার আনান্—বড় যন্ত্রণা।"

সুশোভনা বলিল, "তাই আনাচ্ছি। বাবা আসুন। আপনার কোন্‌খানে বেশী লেগেছে, বলুন দেখি!"

রোগী কাৎরাইতে কাৎরাইতে বাম পদে হাঁটুর নিম্নস্থান দেখাইয়া বলিল, "বোধ হয়, ফ্র্যাকচার হয়েছে।"

অল্পক্ষণ মধ্যেই, হরিশংকরবাবু রোগীর বন্ধু সুকুমারের সংগে আসিয়া পেঁাছিলেন। চূণে-হলুদ প্রস্তুত জানিয়া তিনি জখমের স্থানে উহা লাগাইয়া ফ্ল্যানেল জড়াইয়া বেশ কবিয়া বাঁধিয়া দিলেন। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই রোগীর যন্ত্রণার লাঘব হইল, তাহার কাৎরানি বন্ধ হইল, নিদ্রার আবেশ দেখা দিল।

হরিশঙ্করবাবু বলিলেন, "সন্ধ্যার আগে কলকাতায় যাবার ট্রেণ ত নেই—তাতে অনেক সময় নষ্ট হবে যে! বরঞ্চ অমববাবুর ফার্ম্মের ম্যানেজার—কি নাম বললেন যে—তাঁকে টেলিগ্রাম ক'রে দিন, তিনি মেডিকেল কলেজের কোন ভাল সার্জ্জনকে সংগে নিয়ে আসুন। এখন বেলা দেড়টা—সন্ধ্যা নাগাদ তিনি ডাক্তার নিয়ে এসে পড়তে পারবেন।"

তদনুসারে রোগীর অবস্থার সব কথা খুলিয়া একখানি দীর্ঘ টেলিগ্রাম প্রেরিত হইল।

রোগী জাগিলে, মাঝে মাঝে তাহাকে গরম দুধ পান করানো হইল।

বেলা পাঁচটার সময় তার আসিয়া পেঁাছিল, ম্যানেজারবাবু সাহেব ডাক্তারসহ সন্ধ্যা আটটার ট্রেণে আসিয়া পেঁাছিবেন, অমরেন্দ্রনাথের স্ত্রী ও ভগিনী ঐ সংগে আসিতে-ছেন; ষ্টেশনে যান-বাহনের যেন ব্যবস্থা থাকে।

হরিশঙ্করবাবু যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিবার জন্য তাঁহার সরকারকে ষ্টেশনে পাঠাইয়া দিলেন। সুকুমার বলিল, "সরকার-মশাই, অমরেন্দ্রবাবুর একজন বাবুর্চ্চি এসেছিল আমাদের সংগে, ওয়েটিং-রুমে বারান্দায় তাকে দেখতে পাবেন, তাকে একখানা টিকিট কিনে দিয়ে কলকাতায় ফিরে যেতে বলবেন, এই টাকা নিন।"

রাত্রি নয়টার মধ্যেই সকলে আসিয়া পেঁাছিলেন।

ডাক্তার সাহেব অমরেন্দ্রনাথের ভাঙ্গা হাড় "সেট" করিয়া যক্ষমরূপে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া, এক্সটেন্সন প্রোসেসে লোহার শিকের ফর্ম্মায় উহা আটকাইয়া, সেই ফর্ম্মা পালঙ্কের ছত্রীতে দড়ি বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দিলেন। ভাঙ্গা পা বিছানা হইতে চার-পাঁচ ইঞ্চি উর্দ্ধে, বন্ধ অবস্থায় দোদুল্যমান। বলিলেন, পুরা তিন সপ্তাহকাল, যত দিন ভাঙ্গা হাড় না যোড়া লাগিবে, ততদিন রোগীকে এই অবস্থাতেই থাকিতে হইবে। সে শুইয়া থাকিবে, যদি যন্ত্রণাবোধ না হয়, তবে একটু উঠিয়া বসিতেও পারে। কিন্তু শয্যাত্যাগ করিতে

পারিবে না।

ডাক্তার সাহেব সপ্তাহে একবার করিয়া আসিয়া রোগীকে দেখিয়া যাইবেন স্থির হইল।

অমরেন্দ্রনাথের স্ত্রী ও ভগিনী উভয়েই এখানে রহিয়া গেলেন। সুকুমারও রহিল। হরিশঙ্করবাবু ও তাঁহার কন্যার যত্ন ও সৌজন্যে সকলেই আপ্যায়িত।

চার

এক মাস কাটিয়া গিয়াছে—এখনও অমরেন্দ্রনাথের বন্ধাবস্থা। প্রথমে ডাক্তার সাহেব তিন সপ্তাহের কথা বলিলেও, গত সপ্তাহে তিনি রোগীর ভাঙা পায়ের এক্স-রে ফটো তুলিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, এ সপ্তাহে সেই ছবি আনিলেন এবং সকলকে উহা দেখাইলেন যে, হাড় বেমালুমভাবে যোড়া লাগিয়া গিয়াছে। বলিলেন, তথাপি নিশ্চয়কে নিশ্চয়তর করিবার জন্য আরও দুই সপ্তাহ রোগীর বাঁধন খুলিবেন না। বাঁধন খুলিলেও রোগী বাড়ী যাইতে পাইবে না, এক সপ্তাহ বিছানায় পড়িয়া থাকিয়া পায়ে মালিস করাইতে হইবে, কারণ, এই দীর্ঘকালের অ-সঞ্চালনে পা অসাড় হইয়া গিয়াছে, আরও যাইবে।

অমরেন্দ্রনাথের স্ত্রী সুভাষিণী ও ভগিনী সান্ত্বনা দুজনেই এখানে। প্রথম চারি পাঁচ দিনের পর যখন দেখা গেল যে, রোগীর কোনও প্রকার দৈহিক যন্ত্রণা আর নাই, অধিক শুশ্রূষারও আবশ্যক হয় না, তখন ইঁহারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিয়াছিলেন যে, সান্ত্বনাকে লইয়া সুভাষিণী ফিরিয়া যাউন, গৃহস্থের যথেষ্ট আশ্রমপীড়া ঘটানো হইতেছে তাহার যতটুকু লাঘব করা যায়। সুকুমারের আপিস খুলিলে একদিনমাত্র গিয়া সে এক মাসের ছুটী লইয়া আসিয়া এখানে থাকুক। কিন্তু হরিশঙ্করবাবু কিছুতেই এ প্রস্তাবে রাজি হন নাই—বিনীতভাবে উত্থাপিত আশ্রমপীড়ার কথা তিনি হাসিয়াই উড়াইয়া দিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন, আমরা এতগুলি লোক যদি দুবেলা দুমুঠো খেতে পাই, তবে তোমাদেরও দুমুঠো খাওয়াতে আমার কষ্ট হবে না। এই সংকটের দিনে স্ত্রী, ভগিনী কাছে থাকলে, আর কিছু না হোক, মনটাও ভাল থাকবে, তাই কি কম লাভ? না না, ও সব ছেলেমানুষী খেয়াল তোমরা ছেড়ে দাও।"

ও দিকে আবার এক বিষম বিভ্রাট বাধিয়া গিয়াছে। সুভাষিণী, সান্ত্বনা রোগীর পরিচর্য্যার জন্য রহিয়া গেল সুকুমারের থাকিবার বিশেষ কিছু আবশ্যকতা ছিল না, কিন্তু সে-ও আছে। আপিস খুলিবার দিন আপিসে গিয়া সে দুই সপ্তাহের ছুটী লইয়া আসিয়াছে—এবং তাহার থাকিবার কারণ যে নিছক বন্ধুপ্রীতি, এ কথাও জোর করিয়া বলা চলে না। আসল কথা এই যে, এ বাড়ীর মেয়ে সুশোভনাকে তাহার বড়ই মিষ্ট লাগিয়াছে। সান্ত্বনা, সুভাষিণী প্রায় সারাদিনই রোগীর নিকট থাকে, সুকুমার আসিলে সুভাষিণী একটু সঙ্কুচিতা হয়, সান্ত্বনা "মুখ হাঁড়ি" করে,—সুতরাং রোগীর পার্শ্বে বসিয়া থাকার তাহার প্রয়োজনও হয় না এবং উহা প্রীতিকরও নয়। সুতরাং সে প্রায় সারাদিন সুশোভনার আশে-পাশেই থাকে এবং এটাও সে বুঝিতে পারিয়াছে যে, সুশোভনা তাহাতে বিরক্ত ত নয়ই, বরং তাহার উল্টা। সুশোভনা ও সান্ত্বনাকে যখনই সে একত্র দেখে, তখনই তাহার মনের কম্পাস-কাঁটা সান্ত্বনার প্রতি বিমুখ হইয়া, সুশোভনার প্রতি বেগে ধাবিত হয়। মেয়েরা স্নান করিতে গেলে, সুকুমার আসিয়া বন্ধুর শয্যাপার্শ্বে বসে। বন্ধুকে সব কথাই সে বলিয়াছে।

কবে এবং কি অবস্থায় ইহাদের দুজনের মন জানাজানি হইয়াছিল, তাহা আমরা ঠিক জানি না; কিন্তু সুশোভনার কলেজ খুলিবার দুই দিন পূর্ব্বে, অপরাহ্নে বাগানের আমগাছের ছায়ায় লোহার বেঞ্চে বসিয়া দুইজনে এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল।

সুকুমার। পরশু ত তোমার কলেজ খুলছে, তুমি ত চললে!

সুশোভনা। হ্যাঁ, যেতেই ত হবে। ঐ দিন তোমারও ত ছুটী ফুরোবে?

সুকু। হ্যাঁ, আমাকেও যেতে হবে। কিন্তু তার আগে, বাবার কাছে আমি কথাটা

পাড়তে চাই, তুমি কি বল?

সুশো। আমি আর কি বলবো? বাবা শুনে যে কি বলবেন, তাই ভেবেই আমার গা কাঁপছে।

সুকু। আমি অবশ্য তাঁকে বলবো যে আমার সাংসারিক অবস্থার বিষয় সম্পূর্ণ জেনে শুনেই তুমি আমাকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়েছ। তা' হলেও কি তিনি অমত করবেন?

সুশো। কি জানি, হয়ত বলবেন, ও ছেলেমানুষ, ও নিজের ভাল-মন্দের কি বোঝে, ওর কথা ধর্ত্তব্যই নয়।

সুকু। তিনি যদি বোঝেন যে. আমাদের এই মিলনে বাধা দিলে দুটো বুক ভেঙ্গে যাবে—আমার যাক না হয়, তাতে তাঁর কি আসে যায়?—তোমার বুকও ভেঙ্গে যাবে—তা হ'লে কি তিনি মত না দিয়ে থাকতে পারবেন? মা যদি বেঁচে থাকতেন এ সময়, তা হ'লে বোধ হয়, আমাদের এত ভাবতে হ'ত না।

সুশো। বাবা যে মা'র চেয়ে আমায় কম ভালবাসেন, তা নয়। কিন্তু তবু ভয় যে ঘোচে না!

উভয়ে কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল। তার পর সুকুমার বলিল, "আচ্ছা, কলকাতায় কি তোমাতে আমাতে দেখা-সাক্ষাৎ সম্ভব হবে না?"

সুশো। তা কি রকম ক'রে হবে?

সুকু। বোর্ডিং-এ ত মেয়েদের আত্মীয়-বন্ধুরা গিয়ে দেখা করতে পারে, সপ্তাহে একদিন না মাসে একদিন, কি একটা নিয়ম আছে, শুনেছি।

সুশো। হ্যাঁ, সে বাপ-মা। অন্য কেউ দেখা করতে চাইলে, বাপের চিঠি চাই।

সুকু। আচ্ছা, বাবা যদি রাজি হন, তা হ'লে তিনি কি আমাকে ঐ রকম চিঠি দেবেন না?

সুশো। কি জানি। কিন্তু বাবা অনুমতি দিলেও, তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে গেলে মহা মুস্কিল হবে যে।

সুকু। কেন?

সুশো। অন্য মেয়েরা সবাই আমায় জিজ্ঞাসা করবে, ও তোর কে? তুমি যে আমার কে, এবং কি তা ত আমি প্রকাশ করতে পারবো না! তা হ'লেই তারা বুঝে নেবে—ভারি ঝানু মেয়ে সব। তখন ঠাট্টা ক'রে তারা আমায় দেশছাড়া করবে যে। কিন্তু তার দরকারই বা কি? সে শুভযোগই যদি আসে বাবা যদি সম্মতই হন, তা হ'লে পরীক্ষা পর্য্যন্ত এ ক'টা মাস কি আমরা ধৈর্য ধ'রে থাকতে পারবো না?

এই সময় দেখা গেল, রামকিষণ ভৃত্য এই দিকে আসিতেছে, সুতরাং ইহারা কথা-বার্ত্তা স্থগিত রাখিল। ভৃত্য আসিয়া বলিল, "কর্ত্তা-বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, আপনাদের চা কি এইখানে পাঠানো হবে, না আপনারা টেবিলে যাবেন?"

সুকুমার সুশোভনার প্রতি চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "এইখানেই আনুক না।" কিন্তু সুশোভনা বলিল, "না, আমরা বাড়ীতেই যাই চল। রামকিষণ, বাবাকে বলগে, আমরা আসছি।"

ভৃত্য চলিয়া গেল। পথে যাইতে যাইতে সুশোভনা জিজ্ঞাসা করিল, "বাবার সঙ্গে ও-কথা কখন কইবে তুমি?"

"রাত্রে, খাওয়ার পর। তুমি কি বল?"

"বেশ।"

পাঁচ

রাত্রিতে আহারের পর, সুশোভনা সুভাষিণীর সহিত দেখা করিতে রোগীর কক্ষে প্রবেশ করিল, সুকুমার হরিশঙ্করবাবুর সহিত উপরে চলিয়া গেল।

হরিশঙ্করবাবু বারান্দায় ইজি-চেয়ারে উপবেশন করিলেন। রামকিষণ তামাক দিয়া গেল। হরিশঙ্করবাবু বলিলেন, "সুকুমার, তোমায় কবে আপিসে জয়েন করতে হবে?" "পরশু। কালই আমি কলকাতায় ফিরবো ভাবছি।"

"কোন্ ট্রেণে?"

"বিকেলের ট্রেণে!"

"আমিও ত ঐ ট্রেণেই শোভনাকে কলেজে রাখতে যাব।"

"ভালই হ'ল, তা হ'লে একসঙ্গেই যাওয়া যাবে।" বলিয়া সুকুমার নীরব হইল। হরিশঙ্করবাবুও নীরবে ধূমপান করিতে লাগিলেন।

প্রায় এক মিনিটকাল অপেক্ষা করিবার পর সুকুমার হঠাৎ বলিয়া উঠিল "হরিশঙ্কর বাবু, আজ আমি একটা বিশেষ কথা আপনাকে বলবার জন্যেই অপেক্ষা করছি।"

হরিশঙ্করবাবুর মুখে ঈষৎ হাসির রেখা দেখা দিল কিন্তু অন্ধকারে সুকুমার উহা দেখিতে পাইল না। তিনি শান্তস্বরে বলিলেন, "কি বলবে, বল।"

সুকুমার তখন তাহার আবেদন জানাইল। নিজ দারিদ্র্যের কথাও অপকটে প্রকাশ করিল। সুশোভনা যে উহা জানিয়া শুনিয়াই তাহার সহধর্ম্মিণী হইতে সম্মত সে কথাও বলিতে সে ত্রুটি করিল না।

সুকুমারের কথা শেষ হইলে হরিশঙ্করবাবু কিয়ৎকাল মৌন হইয়া রহিলেন। সুকুমারের বুকটি দুরু দুরু করিতে লাগিল,—খুনী আসামী যেন জজ সাহেবের রায় শুনিতে আসিয়াছে।

অবশেষে হরিশঙ্করবাবু বলিলেন, "আচ্ছা, সুকুমার, তোমরা ত পাকা হিন্দু?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তোমাদের আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে কেউ বিলেত-টিলেত গিয়েছিলেন?"

"আজ্ঞে না।"

"তোমার মা বেঁচে আছেন বলেছিলে না?"

"হ্যাঁ।"

হরিশঙ্করবাবু আবার মৌনভাব ধারণ করিলেন। সুকুমার মনে মনে ভাবিতে লাগিল তাহার এ সব প্রশ্নের অর্থ কি?

শেষে হরিশঙ্করবাবু বলিলেন, "দেখ, তুমি তোমার সাংসারিক অবস্থার কথা যা বললে সেটা আমার পক্ষে কোনও বাধা নয়। মেয়ের বিয়ের সময় জামাইকে আমি যে যৌতুক দেবো তাতে অনেক বছর তাদের জীবন সুখে-স্বচ্ছন্দে কেটে যেতে পারবে। আমার ঐ একমাত্র মেয়ে। আমার অবর্ত্তমানে সমস্তই আমার মেয়ে-জামাইয়ের হবে। তবে আর একটু বাধা আছে—সে বিষয়ে আজ রাতটা আমায় বিবেচনা করতে সময় দাও—আমি কা'ল সকালে তোমার কথার উত্তর দেবো।"

পরদিন বেলা আটটার সময় সুকুমার যখন হরিশঙ্করবাবুর শয়নকক্ষ হইতে বাহির হইল, তখন তাহার মুখখানি উল্লসিত।

নীচে নামিবার সিঁড়ির কাছে সুশোভনা দাঁড়াইয়া ছিল, কোন ভৃত্যাদি তখন সেখানে নাই। সুশোভনা অগ্রসর হইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা কি বললেন?"

সুকুমার সুশোভনাকে বক্ষে জড়াইয়া তাহার মুখ-চুম্বন করিয়া বলিল, "আসছি, এসে বলবো।"—বলিয়া সে ক্ষিপ্রপদে নিম্নে অবতরণ করিল। সুশোভনাও হাসি-মুখে নিজ কার্য্যে গেল।

সুকুমার রোগীর কক্ষে গিয়া দেখিল, অমরেন্দ্র একা। জিজ্ঞাসা করিল "এঁরা কোথায়?"

অমরেন্দ্র বলিল, "স্নানের ঘরে।"

"ভালই হ'ল।"—বলিয়া সুকুমার শয্যাপার্শ্বস্থ একখানা চেয়ারে বসিয়া বন্ধুর হাত-

খানি ধরিয়া বলিল, "ভাই, আমি তোমার বোনকে বিয়ে করতে পারবো না বলো তাতে তুমি মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিলে, নয়?"

"সেটা ত খুব স্বাভাবিক।"

"না ভাই, তুমি মনঃক্ষুণ্ণ হয়ো না, আমার উপর রাগ কোরো না, তোমার আমি বিয়ে করবো।"

"কেন, কি হ'ল? সুশোভনা সম্বন্ধে হরিশঙ্করবাবু অমত করলেন? তবে মুখ এমন হাসি হাসি কেন? তুমি যে একটি প্রহেলিকা হয়ে দাঁড়ালে হে!"

"তোমায় বুঝিয়ে বলছি। হরিশঙ্করবাবু একটা বাধা সম্বন্ধে বিবেচনা ক আমার প্রস্তাবের উত্তর দেবেন বলেছিলেন, জান ত?"

"কা'ল রাতে তুমি আমায় ব'লে গিয়েছিলে।"

"ওঁর বাধাটা কি শোন। শোভনা ওঁর ঔরস-কন্যা নয়, ওঁর পালিতা-কন্যা, কুড়িয়ে পাওয়া। ও কি জাতের মেয়ে, তা-ও তিনি জানেন না। আমরা পাক হয়ত সব কথা জানলে আমাদের আপত্তি হ'তে পারে, তাই ছিল ওঁর বাধা। চৌ পূর্ব্বে, তিন বছর বয়সের সুন্দরী মেয়েটিকে কোথায় কি অবস্থায় তিনি পেয়ে সমস্ত আমায় আজ বললেন।"

"কোথায় পেয়েছিলেন?"

"লক্ষ্ণৌয়ে।"

শুনিবামাত্র অমরেন্দ্রনাথ চমকিয়া উঠিল। বলিল, "লক্ষ্ণৌয়ে?"

সুকুমার বলিল, "হ্যাঁ, লক্ষ্ণৌয়ে। যে বদমাইসরা লক্ষ্ণৌয়ে তোমার বোনকে ক'রে নিয়ে যায়, তারা ওকে তিনশো টাকায় এক পতিতা স্ত্রীলোকের কাছে বিক্রী ছিল। হরিশঙ্করবাবু তার কিছুদিন পরেই সস্ত্রীক লক্ষ্ণৌয়ে গিয়েছিলেন। ল বাসী ওঁর এক মুসলমান বন্ধুর কাছে মেয়েটির কথা শোনেন,—আর শোনে বদমাইসরা বলেছিল, ওটি বাঙ্গালীর মেয়ে। উনি সেই পতিতা স্ত্রীলোককে প ভয় দেখিয়ে, তার উপর পাঁচশো টাকা দিয়ে, মেয়েটি কিনে নেন। তার পর থেকে মেয়ের মত পালন করেছেন। তোমার বোন হারানোর সমস্ত ইতিহাসই আমি কাছে, তোমার বাবার কাছে, তোমার মা'র কাছে শুনেছিলাম ত! স্থান, কাল, দেখ মিলে যাচ্চে। সুশোভনাই যে তোমার সেই হারানো বোন তাতে আমার কোন সন্দেহই নেই।"

অমরেন্দ্র বলিল, "তুমি এ কথা হরিশঙ্করবাবুকে বলেছ?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়।"

"ভাই, তুমি একবার গিয়ে তাঁকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে এস, আমি নিজে সব কথা জিজ্ঞাসা করি।"

হরিশঙ্করবাবু আসিলেন। বোন হারানোর সময় অমরেন্দ্রনাথ বারো বৎসরের সকল কথাই তার স্মরণ ছিল। হরিশঙ্করবাবুর প্রদত্ত বিবরণ সমস্তই ঠিক ঠিক গেল।

অমরেন্দ্র বলিল, "হ্যাঁ, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। সুশোভনার বাঁ-কনুয়ের টায় একটা জড়ুল আছে কি? আমার নিজের অবশ্য সেটা ঠিক স্মরণ নেই, মা'র কাছে আমি শুনতাম যে, আমার সে বোনের হাতে ঐ চিহ্ন ছিল।"

হরিশঙ্করবাবু বলিলেন. "হ্যাঁ, ঠিক সেইখানে জড়ুল আছে।"

স্থির হইল, এখন শোভনাকে এ-সব কথা জানাইবার কোনই প্রয়োজন নাই: হরিশঙ্করবাবু তাহার জন্মদাতা পিতা নহেন শুনিলে বালিকার হৃদয়ে আঘাত পারে। বিবাহের পর. সময় বুঝিয়া, প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়া সুকুমারই তাহাকে কথা জানাইবে।